প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭১, দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১০, গ্রন্থস্বত্ব : যাহেদ করিম, প্রচ্ছদ : সুখেন দাস, দিলীপ রায় কর্তৃক নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বিজয় রায় কর্তৃক অনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

[illegible]

শিক্ষা-সাহিত্য-মনন

সমাজ-রাজনীতি

শিল্পী-সংগীতজ্ঞ





ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

রুগী ও আর্তের সেবা-পরিচর্যাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যে মহীয়সী মহিলা এবং এই সেবাব্রতকে ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর দেশে দেশে, যাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে আধুনিক নার্সিং ব্যবস্থা, তাঁর নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। Lady with the lamp বা দীপ হাতে রমণী তাঁরই প্রতীকী নাম।

১৮২০ খ্রিঃ ১২ই মে ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্ম ফ্লোরেন্সের। তাঁর পিতামাতা জন্মস্থানের নাম অনুসারে কন্যার নাম রেখেছিলেন।

ইংলন্ডের ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন ফ্লোরেন্সের বাবা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার তাই শিশু বয়স থেকেই মেয়েকে সঙ্গীত, ছবি আঁকা ও ভাষা শিক্ষা দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

ছেলেবেলাতেই ফ্লোরেন্স আযত্ত করতে পেরেছিলেন লাটিন, গ্রিক, ইটালিয়ান, ফরাসী ও জার্মানি ভাষা।

ফ্লোরেন্সের ছেলেবেলা কেটেছে ইংলন্ডে ডার্বিশায়ার অঞ্চলে তাঁদের পুরনো বাড়িতে।

গ্রাম্য পরিবেশের এই বাড়িতে থাকার সময়েই জীবজন্তুর প্রতি তাঁর গভীর মমত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবল জীবজন্তুই নয়, বাড়ির বা প্রতিবেশীদের বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সবার আগে তাদের সেবা করার জন্য এগিয়ে যেতেন ফ্লোরেন্স।

ফ্লোরেন্সের যখন ১৭ বছর বয়স, তখন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে পাঠানো হল লন্ডন শহরে। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না তাঁর। সেবাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করবেন এই ছিল তাঁর অভিলাষ।

সেই যুগে সেবা বা nursing বলে সুসংগঠিত কোন পেশা ছিল না। সেবার অভাবে হাসপাতালগুলির অবস্থা ছিল খুবই করুণ। সেবার কাজ বলতে যা ছিল তার সব কিছুই করত সমাজের নিচুতলার মানুষেরা। সামাজিক বা পেশাগত কোন সম্মান তারা পেত না। তাই মেয়ের ইচ্ছার কথা শুনে ফ্লোরেন্সের পিতামাতা খুবই আহত হলেন।

অভিজাত ঘরের একটি মেয়ের মন কী করে এমন একটি নীচুস্তরের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এ কথা ভেবে তাঁরা খুবই বিব্রত বোধ করলেন।

নানাভাবে মেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তাঁরা। শেষে মেয়ের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য তাকে পাঠিয়ে দিলেন দেশ ভ্রমণে।

ফ্লোরেন্সকে পাঠানো হয়েছিল ব্র্যাকব্রিজ দম্পতির সঙ্গে। তাঁরা প্রথমে গেলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোম নগরীতে।

স্বাভাবিকভাবেই সেখানে সকলে প্রাচীন শিল্পকলা ও ভাস্কর্যাদি দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ফ্লোরেন্স কিন্তু সেসবে কিছুমাত্র আকর্ষণ বোধ করলেন না। তিনি গেলেন রোমান ক্যাথলিক কনভেন্টে সন্ন্যাসিনীদের সেবামূলক কাজ দেখতে।

দশদিন সেখানে থেকে ফ্লোরেন্স তাঁদের সাংগঠনিক কাজকর্ম দেখলেন এবং সেবার কাজে এখানেই প্রশিক্ষণ নেবেন মনস্থ করলেন।

সেই সময়ে নার্সিং শিক্ষা দেবার জন্য একটি স্কুল ছিল জার্মানীর এক শহরে। সেটি পরিচালনা করত সন্ন্যাসিনীরা। ফ্লোরেন্স তিন মাস সেখানে থেকে প্রশিক্ষণ নিলেন।

এই সময়েই তিনি সংকল্প নেন, ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে এই ধরনের একটি স্কুল খুলবেন।

ব্র্যাকব্রিজ পরিবারের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে ফ্লোরেন্সের পরিচয় হয় যুবক সিডনি হার্বার্টের সঙ্গে। হার্বার্ট ছিলেন ইংলন্ডের এক আর্ল-এর পুত্র। ফ্লোরেন্সের বয়স তখন ২৮ বছর।

সুগঠিত চেহারার সুদর্শন হার্বার্টের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হলেন ফ্লোরেন্স। প্রথম আলাপে হার্বার্টও উপলব্ধি করলেন ফ্লোরেন্সের প্রতিভা ও তাঁর অন্তস্থিত আকাঙ্ক্ষা।

তিনি সম্মান জানালেন ফ্লোরেন্সের পবিত্র ব্রতকে, উৎসাহিত করলেন আন্তরিক ভাবে।

স্বাভাবিকভাবেই দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। আর এই বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হল দুটি জীবন।

পরের বছর, ১৮৪৯ খ্রিঃ, ২৯ বছর বয়সে আবার দেশভ্রমণে বের হলেন ফ্লোরেন্স। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে প্যারিসে পরিচয় হল সেন্ট ভিনসেন্ট সোসাইটির দুজন সন্ন্যাসিনীর।

এই সোসাইটির একটি বড় হাসপাতাল ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়। ফ্লোরেন্স সেখানে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন হাসপাতাল পরিচালনার কাজ।

এরপর ইউরোপের নানাদেশ ঘুরে তিনি দেখলেন বিভিন্ন হাসপাতালের সেবামূলক কাজকর্ম ও সংগঠন।

এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের পর তিনি পড়ে ফেললেন নার্সিং-এর সামান্য কয়খানি বই, যা পাওয়া যেত তার সব।

এমনি ভাবে যেমন তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন বাইরের দিক

থেকে, তেমনি মনের দিক থেকেও তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করে নিলেন নিজেকে। সংকল্প নিলেন, ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে সেবার আদর্শকেই জীবনে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করবেন।

বিদেশ ভ্রমণে দীর্ঘদিন কাটিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন ফ্লোরেন্স। তাঁর বাবা-মা ভাবলেন এবারে তাঁদের মেয়ে নিশ্চয় অভিজাত পরিবারের কোন যুবককে বিয়ে করে সংসারজীবন শুরু করবে।

কিন্তু ফ্লোরেন্স বললেন, সংসার-বন্ধন নয় আমি চাই সেবিকা হতে।

বাবা-মার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। এমনকি তাঁদের চোখের জলও বিচলিত করতে পারল না ফ্লোরেন্সকে।

তিনি তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বাবা-মা মেয়ের ইচ্ছায় সম্মতি জানালেন।

সেই সময়ে ইংলন্ডের হার্লে স্ট্রিটে মেয়েদের জন্য একটি হাসপাতাল চালু হয়েছিল। ফ্লোরেন্স সেই হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে যোগ দিলেন।

কাজে যোগদান করেই ফ্লোরেন্সের প্রথমে যা নজরে পড়ল তা হল হাসপাতালের পরিবেশ।

তিনি লক্ষ্য করলেন নোংরা আবর্জনা ভরা স্যাঁতসেতে অবস্থা চারপাশে, এর মধ্যে রুগীদের স্বাস্থ্য ভাল হওয়া তো দূরের কথা নতুন করে রোগাক্রান্ত হওয়াই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

তাছাড়া রুগীদের ওষুধ দেওয়া ছাড়া সেখানে আর কোনও স্বাস্থ্যবিধিই মেনে চলা হয় না।

ফ্লোরেন্সের নির্দেশে শীঘ্রই হাসপাতাল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা ফিরে এলো। সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করা হল, বন্ধ দরজা জানালাগুলো খুলে দেওয়া হল আরো বেশি করে মুক্ত বাতাস চলাচলের জন্য। প্রয়োজনে স্থানে স্থানে নতুন জানালা দরজা লাগানো হল।

তারপর তিনি নজর দিলেন রুগীদের শুশ্রূষার দিকে।

ফ্লোরেন্স বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র ওষুধই রুগীকে রোগমুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। উপযুক্ত সেবা-পরিচর্যাই পারে রুগীকে মানসিকভাবে সবল করে তুলতে। আর মানসিক সুস্থতাই শারীরিক সুস্থতাকে ফিরিয়ে এনে রুগীকে নবজীবন দান করে।

ফ্লোরেন্সের চেষ্টায় সেবা-পরিচর্যার উপযুক্ত ব্যবস্থা হবার পর ফলও পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। হাসপাতালে রুগীর মৃত্যুর হার কমে গেল।

ফ্লোরেন্সের প্রবর্তিত সেবা-প্রধান চিকিৎসা ব্যবস্থার সুনাম অল্পদিনেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লন্ডনের বড় বড় হাসপাতাল থেকে ফ্লোরেন্সের ডাক আসতে

লাগল। সব প্রতিষ্ঠানই চাইছিল, তাঁর হাতে হাসপাতাল পরিচালনার ভার ছেড়ে দিতে।

সেই সময়ে কিংস কলেজ হাসপাতাল ছিল ইংলন্ডের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। ফ্লোরেন্স এই হাসপাতালকেই তাঁর কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বিবেচনা করলেন।

কেন না, এখানেই তিনি পাবেন তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার উপযুক্ত সুযোগ।

কিংস কলেজ হাসপাতালের কাজে যোগদানের জন্য তিনি মনস্থির করে ফেললেন। কিন্তু সেই সময়েই ঘটল অপ্রত্যাশিত এক বিপর্যয়। ইংলন্ড জড়িয়ে পড়ল এক বিধ্বংসী যুদ্ধে।

সময়টা ১৮৫৪ খ্রিঃ। রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তুরস্কের বিরুদ্ধে। বিপন্ন তুরস্ককে সাহায্য করবার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইংলন্ডের সেনাবাহিনী।

ক্রিমিয়ার প্রান্তরে এই ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল বলে ইতিহাসে তার নাম হয়েছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রের খবরাখবরও ছাপা হতে লাগল খবরের কাগজে।

যুদ্ধক্ষেত্র ফেরত এক সংবাদদাতা জানালেন, উপযুক্ত সেবা-পরিচর্যার ব্যবস্থার অভাবে যুদ্ধে আহত সৈনিকরা অকালে প্রাণ হারাচ্ছে।

এই খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে শুরু হল প্রতিক্রিয়া। জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিল ক্ষোভ উত্তেজনা। চাপ সৃষ্টি হল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ওপরে।

সিডনি হার্বার্ট তখন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী। তিনি ফ্লোরেন্সকে অনুরোধ করলেন যুদ্ধে আহত সৈনিকদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেবার জন্য।

দেশের সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার এই তো উপযুক্ত সময়। ফ্লোরেন্স আর পেছনে ফিরে তাকালেন না।

যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়, আত্মীয় পরিজনের বাধা সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি হার্বার্টের অনুরোধে সাড়া দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোরেন্সকে পাঠিয়ে দেওয়া হল তুরস্কের হাসপাতালের পরিচালনার দায়িত্বে।

লন্ডনের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের শিক্ষিত সুন্দরী মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবার কাজে যোগ দিয়েছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অভাবিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল চতুর্দিকে।

বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত দেশের সর্বশ্রেণীর জনগণ ফ্লোরেন্সের কাজে

সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। জড়ো হতে লাগল তাঁদের পাঠানো দান আর উপহার।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবাশুশ্রূষার জন্য তখন সবচেয়ে বেশি অভাব ছিল নার্সিং-এর উপযুক্ত সহযোগীর।

ফ্লোরেন্স রোমান ক্যাথলিক সিস্টারস চার্চের সভ্য ও বিভিন্ন হাসপাতালের নার্স মিলিয়ে মোট ৩৮জন মহিলার একটি সেবাদল গঠন করলেন।

সব ভাল কাজেই থাকে অনিবার্য বাধা। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। শীঘ্রই ফ্লোরেন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, তিনি সেবিকা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

কিছু লোক এই নিয়ে শুরু করল হৈচৈ। শেষ পর্যন্ত এই অসমীচীন বিতন্ডা বন্ধ করতে এগিয়ে আসতে হল স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়াকে। তিনি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ফ্লোরেন্সের স্বেচ্ছাসেবীদলের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা পাঠালেন। অমনি সব বিরূপ সমালোচনা বন্ধ হয়ে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কাজের দায়িত্ব এতকাল পালন করে এসেছে পুরুষরাই। এবারে পরিস্থিতির দাবিতে মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হল সেবার কাজে।

কিন্তু মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পুরুষ সৈনিকদের সেবা করবে এই অবস্থা মেনে নিতে পারছিলেন না কিছু সামরিক অফিসার।

কিন্তু তাঁদের কোন সমালোচনা বা মন্তব্যই গ্রাহ্য করলেন না ফ্লোরেন্স। তিনি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ তাঁর লোকজন নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন স্কুটারি প্রান্তরের দিকে।

আহত সৈনিকদের জন্য স্কুটারিতেই গড়ে তোলা হয়েছিল সামরিক হাসপাতাল।

স্কুটারি পৌঁছতে পনেরো দিন কাটল পথে। ফ্লোরেন্স যখন তাঁর সেবাদল নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন তখন তাঁরা সকলেই পথশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে এক মুহূর্ত সময় নিজের বিশ্রামের জন্য ব্যয় করলেন না ফ্লোরেন্স। প্রথমেই তিনি গেলেন হাসপাতালের ব্যবস্থাপত্র দেখতে। কিন্তু সেখানকার অব্যবস্থা দেখে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। প্রয়োজনীয় সবকিছুই প্রায় নেই পর্যায়ে।

শোবার উপযুক্ত বিছানাপত্র, পরিচ্ছন্ন যথেষ্ট পোশাক, এসব কিছুই নেই রুগীদের।

খাদ্য-খাবার যা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সবচেয়ে বড় কথা, প্রয়োজনীয় ওষুধেরই রয়েছে অভাব।

সামরিক বিভাগের সংগ্রহে এসব কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু নানা

বিধিনিষেধের জন্য সেসব কিছুই কাজে লাগাতে পারলেন না ফ্লোরেন্স। ফলে সঙ্গে করে যা নিয়ে এসেছিলেন তাই দিয়েই কাজ শুরু করতে হল তাঁকে।

হাসপাতালে আহত সৈনিকের সংখ্যা বাড়ার বিরাম নেই। যুদ্ধ চলছে পুরোদমে। তাই হাসপাতাল চত্বরে কেবল আহত মানুষের ভিড় আর তাদের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ।

একমুহূর্ত বিলম্ব করলেন না ফ্লোরেন্স। অপ্রতুল সঙ্গতি নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আহত মানুষদের সেবার কাজে।

ইতিমধ্যে ফ্লোরেন্সের নামে বাইরে থেকে কিছু কিছু সাহায্য এসে পৌঁছতে লাগল।

কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা ছিল নামমাত্র। তাই সাহায্য চেয়ে ফ্লোরেন্স দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন।

তাঁর আবেদনে সাড়া দিল সমস্ত ইংলন্ডের মানুষ। তাদের পাঠানো অর্থে গড়ে উঠল সাহায্য ভান্ডার। ইতিপূর্বে টাইমস পত্রিকার পক্ষ থেকেও খোলা হয়েছিল একটি তহবিল।

ফ্লোরেন্স প্রথমে হাত লাগালেন হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে। কিন্তু ঝাড়ন আর তোয়ালে নিয়েই দেখা দিল সমস্যা।

সব কিছুই ছিল সরকারী দপ্তরের কর্মচারিদের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সেগুলো পেতে গেলে যে বিধিনিষেধের বাধা অতিক্রম করা দরকার তার জন্য ব্যয় হবে দীর্ঘ সময়।

ফ্লোরেন্স অত ঝামেলায় গেলেন না। তিনি আবেদন জানালেন টাইমস তহবিলের কাছে। কিন্তু সেখানেও নানা নিয়মের কড়াকড়ি।

এদিকে আহত সৈনিকদের জন্য আশু যা প্রয়োজন তা হল পরিচ্ছন্ন পোশাক। বাধ্য হয়ে ফ্লোরেন্স স্কুটারিতে নিজেই একটি লন্ড্রী খুলে ফেললেন।

এদিকে ততদিনে সাহায্য হিসেবে পোশাক তোয়ালে ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী এসে পৌঁছতে লাগল।

ফ্লোরেন্স তাঁর সহকর্মীদের নির্দেশ দিলেন, আইনের বিধি-নিষেধের কথা ভুলে গিয়ে মালের পেটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তা খুলে ফেলা হয়।

ফ্লোরেন্সের কর্মোদ্যোগ ও তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হল হাসপাতাল চত্বর।

এরপর আহত সৈনিকদের সেবা যত্নের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। আর তা করতে গিয়ে সামরিক বাহিনীর কাজকর্মের পদ্ধতি প্রায় গোটাটাই পাল্টে ফেলতে হল।

ফ্লোরেন্স কাজের ক্ষেত্রে ছিলেন নির্মম। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও তিনি সহ্য

করতে পারতেন না। ফলে যে সব কর্মচারীকে তিনি হাসপাতালে কাজের অনুপযুক্ত মনে করলেন তাদের সরিয়ে দিলেন অন্যত্র।

রুগীর শুশ্রূষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ানো সরকারী বিধিনিষেধ সম্পর্কে ফ্লোরেন্সের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এই সময়ে বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে।

তিনি লিখেছেন, যেসমস্ত কর্মী মানুষের মৃত্যু মেনে নিতে পারবে, কিন্তু সরকারী নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে একটা ঝাঁটাও দেবে না, তাদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও নেই।

ফ্লোরেন্স কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হাসপাতালের বিধি ব্যবস্থা একেবারে আমূল পাল্টে দিলেন। হাসপাতালের কর্মচারীদের নিয়ে তিনি একটি সহযোগী দল তৈরি করলেন। তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজের বিলি-ব্যবস্থাও করলেন।

কাউকে দিলেন হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব, কারোর হাতে দিলেন পোশাক-পরিচ্ছদের ভার। আবার প্রয়োজনীয় কেনাকাটার কাজে লাগালেন কাউকে।

দায়িত্ব বন্টন করেই কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকলেন না তিনি। প্রত্যেকে তাদের দায়িত্ব ঠিক ঠিক পালন করছে কিনা সে বিষয়েও সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁর।

কেউ কাজে ভুলত্রুটি করলে কিংবা কোন কাজের গুরুত্ব বিষয়ে পর্যালোচনা করতে হলে, তা তিনি করতেন দিনের শেষে। ভুল-ত্রুটি শুধরে সকলে যাতে যথাযথভাবে নিজ নিজ কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে সেই বিষয়ে তিনি প্রত্যেককে পরামর্শ দিতেন।

হাসপাতালের কাজকর্ম আগের তুলনায় অনেক সুচারু শৃঙ্খলাপূর্ণ হল। তাই নতুন কয়েকটি ওয়ার্ডও খোলা হল। হাসপাতালের পরিসরও বৃদ্ধি পেল।

ফ্লোরেন্সের আত্মত্যাগ, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও কর্মনিষ্ঠা এমন ছিল যে, তাঁর পাশে যারা থাকতো কিংবা যাঁরা তাঁর কর্মতৎপরতা দেখতো, তারা উজ্জীবিত না হয়ে পারত না। তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে এসে সকলেই নিজেদের ধন্য মনে করত।

নতুনভাবে সেজে ওঠা হাসপাতালে ফ্লোরেন্স নিজেকে নিয়োজিত করলেন নিরলস সেবাকর্মে।

দিন রাত্রির ব্যবধান ঘুচে গেল। সারা সময়ই তাঁকে দেখা যেত কোনও না কোন রুগীর পাশে শুশ্রূষারত। কেবল তাই নয়, রুগীদের খাবার তৈরি করার কাজেও তিনি হাত লাগাতেন।

রাত গভীর হলে, নিদ্রিত রুগীদের প্রতিটি বিছানার পাশে তাঁকে দেখা যেত একটি প্রদীপ হাতে। মুহূর্তের জন্যও তিনি শুশ্রূষারত রুগীদের অসহায় ভাবতে দিতেন না।

সেবার প্রতিমূর্তি ফ্লোরেন্সকে প্রদীপ হাতে দেখে শয্যাশায়ী রুগীদের মনে হত যেন স্বর্গের কোনও দেবী তাদের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করার জন্য নেমে এসেছেন।

মূর্তিময়ী করুণা ফ্লোরেন্সের উপস্থিতির প্রভাব এমনই ছিল যে, রুগীরা তাদের দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে তাকিয়ে দেখত। এক স্বর্গীয় আনন্দে তাদের মন প্রাণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

যুদ্ধ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে আহত সৈনিকদের জন্যও নানা স্থানে গড়ে উঠতে লাগল নতুন নতুন হাসপাতাল।

বেড়ে উঠল ফ্লোরেন্সের দায়িত্ব ও কর্মব্যস্ততা। সব হাসপাতালের তদারকির ভার তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হল।

ক্রমবর্ধমান কর্মভার হাসিমুখেই গ্রহণ করতেন তিনি। নিরলস তৎপরতায় সমাধা করতেন কর্তব্য।

বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে বেড়ানোর সময় তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। ঝড়, তুষারপাত, বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য করতেন না।

ফ্লোরেন্স কেবল যে আহত মানুষের দেহেরই শুশ্রূষা করতেন তাই নয়। তাদের মনে আনন্দ যোগাবার প্রতিও তিনি সমান সজাগ ছিলেন।

তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ও উদ্যোগে হাসপাতালে হাসপাতালে লাইব্রেরি গড়ে উঠল। সেখানে নানা বিষয়ের বইয়ের সঙ্গে সংবাদপত্র রাখারও ব্যবস্থা হল, হল আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা।

এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হাসপাতালের প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গড়ে উঠল আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা।

সেবাকার্যে নিবেদিত প্রাণ ফ্লোরেন্সের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়তে লাগল। মাঝেমাঝেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে লাগলেন।

অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়েও বিশ্রাম ছিল না তাঁর। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ঠিক চলছে কিনা নিয়মিত তার খোঁজখবর নিতেন।

শরীর ক্রমশই জীর্ণ হয়ে পড়ছিল। উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তাররা তাঁকে অবিলম্বে লন্ডনে ফিরে বিশ্রাম নেবার অনুরোধ জানাতে লাগলেন।

কিন্তু ফ্লোরেন্স তাঁদের জানালেন, যতক্ষণ পর্যন্ত একজনও আহত সৈনিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকবে, ততক্ষণ স্কুটারি ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

দীর্ঘ দু বছর চলার পর ১৮৫৬ খ্রিঃ যুদ্ধের অবসান হল। যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকদের এবার স্বদেশে ফেরার পালা। ফ্লোরেন্সও চললেন তাঁদেব সঙ্গে একই জাহাজে।

কৃতজ্ঞ, শ্রদ্ধায় আনত ব্রিটিশ সরকার ফ্লোরেন্সের জন্য আলাদা জাহাজ

পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ফ্লোরেন্স।

সেবাগতপ্রাণ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল আর্ত রুগ্ন মানুষের সেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই সম্মান প্রশংসার প্রতি তিনি ছিলেন নিস্পৃহ।

দেশে পৌঁছবার পর দেশবাসী তাঁর সংবর্ধনার বিপুল আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

কিন্তু সবকিছুই তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে মহারানী ভিক্টোরিয়ার আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ তাঁকে রক্ষা করতে হয়েছিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু ফ্লোরেন্সের কাজ তখনও শেষ হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে সেবার কাজে নারীর যে পবিত্র ভূমিকা সংস্কারবদ্ধ সমাজের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন, তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার কাজ তখনও বাকি।

নারীর মমত্ব-স্পর্শে সেবার কাজ ততদিনে এক উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীনপন্থী সমাজ সেই মর্যাদার বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সেবার কাজকে আর হীন চোখে দেখার সুযোগ নেই।

দেশে ফিরে ফ্লোরেন্স একটা নার্সিংস্কুল খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর স্বদেশবাসী এগিয়ে এল স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা নিয়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করে তাঁরা তাঁর হাতে তুলে দিল। সেই অর্থে ইংলন্ডে প্রতিষ্ঠিত হল আধুনিক নার্সিংশিক্ষার প্রথম শিক্ষালয়। সময়টা ১৮৫৯ খ্রিঃ।

স্কুল পরিচালনার বিধিব্যবস্থা এমনকি, পঠন-পাঠন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ ফ্লোরেন্সের তত্ত্বাবধানেই চলতে লাগল।

স্কুলসংলগ্ন সেন্ট টমাস হাসপাতালে শিক্ষার্থিনী সেবিকারা সব রকম সহযোগিতাই পেতেন। তাঁদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সময় ফ্লোরেন্স নার্সিং-এর ওপর বইও লেখেন।

তাঁর সামরিক ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও নার্সিং-এর বাস্তব অভিজ্ঞতা বিবৃত করে ৮০০ পাতার একটি মূল্যবান বিবরণী ফ্লোরেন্স স্কুল প্রতিষ্ঠার আগের বছরই প্রণয়ন করেছিলেন। তার নাম দেন Notes on matters affecting the health, efficiency and Hospital Administration of the British Army.

সেবিকা হিসাবে ফ্লোরেন্সের সম্মান ও প্রভাব দেশের প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক নতুন প্রণোদনা সঞ্চার করল।

হাসপাতালগুলির পরিচালনা ও বিধিব্যবস্থার সংস্কার হতে লাগল। ক্রমে

ইংলন্ডের বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের হাসপাতালেও তাঁর প্রচারিত বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে লাগল।

অত্যধিক পরিশ্রমে ফ্লোরেন্সের শরীর আগেই ভেঙ্গে পড়েছিল। শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তাঁর উৎসাহ ও তৎপরতার কখনো অভাব ঘটেনি।

তাঁরই অনুপ্রেরণায় দেশে বিদেশে গড়ে উঠেছে নার্সিং আন্দোলন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নার্সিং স্কুল। অবহেলিত সেবাবৃত্তি হয়ে উঠেছে সম্মানের ও আদরনীয় পেশা। নতুন যুগের মেয়েরা এই পেশাকেই এখন গ্রহণ করছে ব্রত হিসেবে।

অবশেষে ১৯১০ খ্রিঃ ১৩ই আগস্ট জীবন-প্রদীপের প্রহরিণী লেডি অব দি লাইট, মহীয়সী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁর স্বদেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুন্সী প্রেমচন্দ

প্রকৃত নাম ধনপত। মা-বাবা ডাকতেন নবাব। কিন্তু বর্তমানে যে নামে তিনি পরিচিত তা হল প্রেমচন্দ। পরিণত বয়সে সাহিত্য সৃষ্টির সময়ে তিনি গ্রহণ করেন এই নাম।

দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্যের যে মহান স্রষ্টাদের নাম উচ্চারিত, মুন্সী প্রেমচন্দ তাঁদের একজন।

তাঁর রচনায় ব্যক্ত হয়েছে সর্বকালের সর্বহারা নিঃস্ব মানুষদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা আর সহানুভূতি।

মানবতার এই অকৃত্রিম মহান শিল্পী হিন্দী ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও, তাঁর রচনা আজ বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

জন্ম ১৮৮০ খ্রিঃ ৩১শে জুলাই। বাবা ছিলেন ডাক বিভাগের সামান্য একজন কর্মচারী। মা ছিলেন অসুস্থ। এমনি এক পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেছিলেন প্রেমচন্দ।

আট বছর বয়সে মা মারা গেলে বাবা পুনরায় বিয়ে করলেন। সৎমায়ের সঙ্গে শিশু প্রেমচন্দের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না।

সাত বছর বয়সে তাঁকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। এক মৌলভীর কাছে শিখেছেন ফারসী আর উর্দু।

সংসারে একরকম নিঃসঙ্গ প্রেমচন্দের শৈশবের একমাত্র সঙ্গী বলতে ছিল

তাঁর বড়দিদি। বিয়ে হয়ে দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে কিশোর প্রেমচন্দ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন।

সংসারে স্নেহ পাবার মতো আর কেউ ছিল না। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকতেন বলে বাবার সঙ্গও তিনি পেতেন না। তাছাড়া বাবা ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ।

কর্মসূত্রে বাবা মাঝে মাঝে নানা স্থানে বদলি হয়ে যেতেন। বাবার সঙ্গে প্রেমচন্দও গেছেন বান্দা, আজমগড়, কানপুর, গোরখপুর, লক্ষ্ণৌ। মাঝেমাঝে এই পরিবেশ পরিবর্তন প্রেমচন্দ খুব পছন্দ করতেন। পরিবেশের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর কিশোর মন। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা তাঁর রচনাকে পুষ্ট করেছে।

শাসনহারা কিশোর বয়সে অনিবার্যভাবেই প্রেমচন্দের জীবনে জুটেছিল কিছু বদ সঙ্গী। সঙ্গীদের প্রভাবে তাঁর জীবন হয়তো অন্য খাতেই প্রবাহিত হত, যদি না সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হত বুদ্ধিলালের।

বুদ্ধিলাল ছিল বই-এর দোকানদার। শিশু বয়স থেকেই প্রচন্ড বই পড়ার নেশা ছিল প্রেমচন্দর। হিন্দী জানতেন না। তাই বুদ্ধিলালের দোকানে এসে তিনি পড়তেন উর্দু ভাষার বই।

এইভাবে অল্প বয়সেই সমৃদ্ধ উর্দু ভাষার অনেক বিখ্যাত উপন্যাস তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল।

বুদ্ধিলালের দোকানে প্রেমচন্দ বই পড়ার সুযোগ পেতেন, কিন্তু তার বদলে তাঁকে করে দিতে হত কিছু কাজ। বুদ্ধিলালের দেওয়া ইংরাজি ইস্কুলের বই তাঁকে স্কুলে স্কুলে ঘুরে বিক্রি করতে হত।

পনেরো বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করা হল প্রেমচন্দকে। কিন্তু নবম শ্রেণীতে ওঠার আগেই বাবা তাঁর বিয়ে দিয়ে বাড়িতে ছেলের বৌ নিয়ে এলেন।

বিয়ের কিছুদিন পরেই মারা গেলেন বাবা। ফলে একেবারে অসহায় হয়ে পড়লেন প্রেমচন্দ।

সৎমা, দুটি সৎভাই আর নিজের বালিকা বউ নিয়ে গোটা সংসারের দায়-দায়িত্ব চাপল তাঁর কাঁধে।

বাবার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে সেই বছর পরীক্ষায় বসা হল না। পরের বছর পাশ করলেন দ্বিতীয় বিভাগে, কিন্তু ফেল করেছিলেন অঙ্কে।

আর্থিক অনটন ও অঙ্কে ফেল থাকার জন্য তিনি কোন কলেজেই ভর্তি হতে পারলেন না।

অভাব অনটনে সংসার তখন ধুঁকছে। নিরুপায় হয়ে প্রেমচন্দ এলেন শহরে। এক উকিলের বাড়িতে বাচ্চাদের পড়াবার কাজ নিলেন।

মাইনে ছিল পাঁচ টাকা। দুটাকা নিজের কাছে রেখে তিনি তিন টাকা পাঠিয়ে দিতেন বাড়িতে।

সেই উকিলের বাড়িতেই বাইরের একটা ছোট ঘরে তিনি থাকতেন। দু'টাকাতে সারা মাস পেট ভরে খাওয়া জুটতো না। ভাল কাপড় জামাও ছিল না।

একদিন খাবার কেনার মতো পয়সা হাতে ছিল না। ঠিক করলেন একটা বই বিক্রি করে দেবেন। বাধ্য হয়ে অঙ্কের বইটা নিয়ে গেলেন বাজারের একটা বইয়ের দোকানে।

সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে আলাপ হল এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি ছিলেন একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রেমচন্দের সঙ্গে কথা বলে তার দুরবস্থার কথা জানতে পেরে দয়াপরবশ তিনি তাঁকে নিজের স্কুলে শিক্ষকের চাকরি দিলেন। মাইনে ছিল আঠারো টাকা।

প্রেমচন্দের কর্মস্থল ছিল চুনারে। বারাণসী থেকে দূরত্ব চল্লিশ মাইল। কিন্তু স্কুলের পরিবেশ ছিল শান্ত নির্জন। এই পরিবেশে এসে তাঁর নিরীহ ভাবুক মন যেন ডানা মেলার অবকাশ পেল।

শিক্ষক হিসেবে প্রেমচন্দ ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। এখানে কর্মরত অবস্থাতেই তিনি কুইন্স কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ বেকনের সাহায্যে একটি সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে যান।

এবারে এলো কিছুটা নিশ্চয়তা। ফলে নিভৃতে সাহিত্যচর্চার অবকাশ পেলেন।

কুড়ি বছর বয়সেই তিনি উর্দুতে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। একটি ছোট পত্রিকায় আসবাব-ঈ-মাবিদ নামে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই লেখায় ছিল স্বপ্নচারী কল্পনাবিলাসী মনের ছোঁওয়া। কিন্তু এর পর নিজের কঠোর জীবন-সংগ্রাম ও বাস্তবের রূঢ় আঘাত তাঁর চিন্তায় আনল আমূল পরিবর্তন।

জীবনের চলার পথে তিনি লাভ করেছিলেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কৃষক, শ্রমিক, কুলী, শিক্ষক, ছাত্র—এদের জীবন ও যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন কাছে থেকে।

তাই তাঁর হৃদয়ের সহানুভূতি সবটুকুই দখল করেছিল সমাজের নিচুতলার অবহেলিত নির্যাতিত মানুষেরা। তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবারে উপজীব্য হল তাঁর রচনার।

ফলে বাস্তবমুখী রচনার এক নতুন ধারার প্রবর্তন করতে সক্ষম হলেন তিনি ভারতীয় সাহিত্যে।

ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে আর কারও রচনাতেই বাস্তবের এমন বাঙ্ময় রূপ প্রকাশ লাভ করেনি।

এক বাল্যবিধবার দুঃখময় জীবনের কাহিনী নিয়ে লেখা প্রেমচন্দের প্রেমা উপন্যাস প্রকাশিত হল ১৯০৭ খ্রিঃ। সেই রচনায় তিনি বিধবাবিবাহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় তাঁর এই পদক্ষেপ ছিল অসমসাহসিক।

প্রেমা প্রকাশের দু'বছর পরে প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প সংকলন মজ-ঈ-ওতান। এই রচনাগুলির মধ্যে প্রকাশ পেল ইংরাজ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।

বলাবাহুল্য, ইংরাজ শাসনাধীন থেকে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারণ করার জন্য তিনি নিয়েছিলেন নবাব রাই ছদ্মনাম।

ছোটগল্পের এই সংকলনটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পড়লেন তিনি ইংরাজ সরকারের রোষ দৃষ্টিতে। বাজেয়াপ্ত হল মজ-ঈ-ওতান (মাতৃভূমির ব্যথা)।

নিরীহ গোবেচারা চেহারার মানুষ প্রেমচন্দের ভেতরে ছিল এক অদম্য সাহসী ও তেজী মানুষ।

আঘাত পেয়ে এবারে জেগে উঠল অন্তস্থিত সেই সংগ্রামী মানুষটি। নাম পাল্টে, প্রেমচন্দ নামে লিখতে শুরু করলেন তিনি।

দেশের ও বিদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন প্রেমচন্দ। রুশ বিপ্লবের সংবাদ তাঁর মনে গভীব রেখাপাত করেছিল। এই সময়ে তাঁর চিন্তাভাবনায়ও যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর গোসা-ঈ-আফিয়াত উপন্যাসে।

স্কুল আর সাহিত্য রচনার মধ্যেই প্রেমচন্দের জীবন ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। স্কুল থেকে বিকেলে বাড়ি ফিরে এসে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে তিনি বসতেন লিখতে।

কখনো রাত জেগে লেখার কাজ করতেন। সংসারের টুকটাক কাজে যেটুকু সময় ব্যয় হত তা তিনি পুষিয়ে নিতেন রাত জেগে কাজ করে। এ ভাবেই অক্লান্ত পরিশ্রমে সাহিত্য রচনার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন তিনি।

দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা যন্ত্রণা-জ্বালা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন প্রেমচন্দ। তাই তিনি সমাজের একজন হিসেবে নিজেও বেছে নিয়েছিলেন অতি সাধারণ জীবনযাত্রা।

তাঁর জীবনে ছিল না সুখ ভোগ বা বিলাসিতার বিন্দুমাত্র স্থান। এই সরল সাধারণ জীবনই ছিল তাঁর হাতিয়ার আর ছিল তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস।

যাকে সত্য বলে মনে করতেন তা প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধা করতেন না।

ঋজু প্রতিবাদে তাই লেখনী হয়ে উঠেছিল ক্ষুরধার তরবারির মতো।

সমসাময়িক সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক সঙ্কট, আন্দোলন ও জনমতের বাস্তবচিত্র রূপায়িত হয়েছে তাঁর রচনায়।

দেশাত্মবোধক ছোট গল্প ছাড়া দুটি উপন্যাসও লিখেছিলেন প্রেমচন্দ। তার একটি জলবা-ঈ-ইশার। অন্যটি বাজার-ঈ-হুসন।

প্রথম উপন্যাসটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের অনুসরণে লেখা।

সেই সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। জনজাগরণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি ঘুরছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। সেই পরিক্রমায় তিনি এলেন গোরখপুরে। সময়টা ১৯২১ খ্রিঃ।

গান্ধীজির বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হলেন প্রেমচন্দ। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ইংরাজ সরকারের চাকরি ছেড়ে সামিল হবেন স্বাধীনতার আন্দোলনে।

ইংরাজের গোলামি আর করবেন না বলে সরকারী স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিলেন তিনি। জোগাড় হল একটি পত্রিকার সম্পাদকের চাকরি। এই কাজে তাঁকে একা হাতেই প্রচুর কাজ করতে হত বলে সারাক্ষণ প্রচন্ড চাপের মধ্যে কাটত। বাধ্য হয়ে কিছুদিন পরে এই কাজ ছেড়ে দিতে হল।

এভাবে নিজেই প্রকাশ করলেন হংস আর জাগরণ নামে দুটি পত্রিকা। কিন্তু ব্যবসা চালাবার মত ব্যবসায় বুদ্ধি তাঁর ছিল না।

তার ওপরে ছিল আর্থিক সংকট। ফলে হাজারো ঝামেলায় তাঁকে সারাক্ষণ উত্যক্ত থাকতে হত।

কিন্তু অদম্য ছিল তাঁর প্রাণশক্তি। দিনভর সমস্ত সমস্যা সামলে রাতের নিভৃতে বসতেন কলম নিয়ে। তখন আর তিনি পত্রিকার মালিক সম্পাদক নন; তখন তিনি জীবন-শিল্পী প্রেমচন্দ। তাঁর মধ্যে জেগে উঠত নিপীড়িত মানুষের হাহাকার, পরাধীনতার জ্বালা।

বস্তুতঃ কর্মব্যস্তময় জীবনের এই সময়টাই ছিল প্রেমচন্দের সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের উল্লেখযোগ্য পর্ব।

প্রতিজ্ঞা, নির্মলা, কায়কল্প, রঙ্গভূমি—একের পর এক উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে চলল। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কর্মভূমি প্রকাশিত হল ১৯৩১-৩২ খ্রিঃ। তাঁর এই উপন্যাসে বিধৃত সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

প্রতিটি রচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে লাগল প্রেমচন্দের খ্যাতি যশ। তিনি সমস্ত কিছুই গ্রহণ করলেন অতি স্বাভাবিকভাবে।

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে। আর তা হল জাতীয় আন্দোলনে জয় লাভ—ভারতবর্ষের মুক্তি।

প্রথম জীবনে উর্দুতে সাহিত্য রচনা শুরু করলেও পরে হিন্দীকেই করেছিলেন তিনি তাঁর সাহিত্য রচনার মাধ্যম।

দেশের বৃহত্তম মানুষের কাছে নিজের রচনা পৌঁছে দেবার তাগিদেই তিনি পরিবর্তন করেছিলেন ভাষার মাধ্যম।

কর্মভূমি উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমচন্দ হয়ে উঠলেন হিন্দী সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক।

নির্যাতিত মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণা সুখ-দুঃখের কথার বস্তুনিষ্ঠ রূপকার ছিলেন প্রেমচন্দ। তাঁর রচনায় ছিল সাম্যবাদের আদর্শ। কিন্তু তিনি নিজেকে কখনো সাম্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন নি। যদিও পরবর্তীকালে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রগতিশীল লেখক সংঘের সঙ্গে।

এই সংঘের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে তিনি বলেছিলেন, "যিনি দলিত, অবহেলিত, শোষিত মানুষের পক্ষে সাহিত্য রচনা করেন, তিনিই সমাজের সৌন্দর্য চেতনা ও ন্যায়বোধের প্রকাশ ঘটান।"

প্রেমচন্দের এই বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে। জীবনরসে সিক্ত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি হল, পিসনহারীর কুঁয়া, সতরঞ্জ কি খিলাড়ি, কফন, সদ্‌গতি, নিমকের দারোগা প্রভৃতি।

প্রেমচন্দের প্রতিভা হিন্দী ছোটগল্পকে উন্নীত করেছে বিশ্বমানে।

বাস্তবজীবনে নিতান্ত বেহিসেবী মানুষ প্রেমচন্দকে দুটি পত্রিকা চালাতে গিয়ে প্রচুর দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়তে হল। ফলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এই সময়ে নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনেই সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার একটি চাকরি নিলেন তিনি। তবে চুক্তি করলেন একবছরের জন্য, বম্বে হল তাঁর কর্মস্থল।

নতুন কাজে নতুন জায়গায় এসে সম্মান অর্থ সবই পেলেন প্রেমচন্দ। কিন্তু এখানকার পরিবেশের কৃত্রিমতা আর অনাবশ্যক আড়ম্বর তাঁর মানসিক পীড়ার সৃষ্টি করল।

তাছাড়া, সিনেমা শিল্পের অন্দর মহলের যে পরিচয় তিনি পেলেন তাও ছিল তাঁর চিন্তা ও আদর্শের পরিপন্থী।

এ সময়ে একটি চিঠিতে তাঁর এই মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন,"চলচ্চিত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ যারা করেন তাদের কাছে এটি ব্যবসা ছাড়া কিছু নয়। শিল্প, জনরুচি বা সংস্কার নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না। এরা শুধু শোষণ করে আর জনগণের অনুভূতিকে নষ্ট করে।"

আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন,"আমাকে বম্বে ছেড়ে আগের জায়গায়

ফিরে যেতে হবে। আমার শুধু মনে হচ্ছে আমি জীবনটাকে নষ্ট করছি।"

এক বছরের চুক্তি শেষ করেই বম্বের সিনেমা জগতের শৃঙ্খল কেটে বেরিয়ে এলেন প্রেমচন্দ। সামনে টাকা ও অর্থের জোরালো প্রলোভন ছিল। কিন্তু সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে তিনি ১৯৩৫ খ্রিঃ ৪ঠা এপ্রিল বোম্বে ত্যাগ করে ফিরে এলেন নিজের গ্রামে।

এতদিনে মানসিক স্বস্তি ফিরে পেলেন তিনি। গো-দান উপন্যাসের প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল। এবারে গ্রামের বাড়িতে বসে শুরু করলেন লেখা।

প্রেমচন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গো-দান। এই উপন্যাসে তিনি চিত্রিত করেছেন এক দরিদ্র সৎ কৃষকের চরম কষ্ট সংগ্রামের রক্তক্ষরা কাহিনী। তারই পাশাপাশি আছে গ্রামীণ সমাজে ধনী মহাজন জোতদারদের নির্মম শোষণের বাস্তব চিত্র।

প্রেমচন্দের প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে গো-দান উপন্যাসে। বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষের প্রতি মমতা সহানুভূতি এবং পরধনপুষ্ট ধনীক সম্প্রদায়ের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা—প্রেমচন্দের মহতী প্রতিভার স্পর্শে গো-দান উপন্যাস হয়ে উঠেছে সর্বজনীন, সর্বকালিক।

১৯৩৬ খ্রিঃ গো-দান প্রকাশের পরে তিনি মঙ্গলসূত্র রচনায় বসেন। প্রেমচন্দের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস এটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তার আগেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রেমচন্দকে। ভোগ করতে হয়েছে অসম্ভব মানসিক চাপ। তাই ক্রমশই শরীর পড়ছিল ভেঙ্গে।

১৯৩৬ খ্রিঃ নবগঠিত ভারতীয় প্রগতিবাদী লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলন বসে লক্ষ্ণৌ শহরে। প্রেমচন্দ নির্বাচিত হয়েছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি। তরুণ লেখকদের উদ্যমকে উৎসাহিত করবার জন্য অসুস্থ শরীর নিয়েই সম্মেলনে উপস্থিত হলেন প্রেমচন্দ।

সেই সম্মেলনে দেশের তরুণদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বললেন, "সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা হওয়া উচিত মহৎ আদর্শ। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের কল্যাণ।"

হিন্দী ও উর্দু—দুই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করেছেন প্রেমচন্দ। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এই দুই ভাষার সুসমঞ্জস ঐক্য ও মিলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন।

কিন্তু যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সহ তিনি শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হয়েছিলেন তা তাঁর কাছে ছিল এক চরম আঘাত। কেউই চায় না মিলন, বিরোধই কাম্য সকলের—এই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা।

জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে চতুর্দিকে সমাজের অবক্ষয় দেখে বেদনাহত হয়েছিলেন মুন্সী প্রেমচন্দ। তাই স্বগত উক্তির স্বরে যেন সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন,"............ চারদিকে জন্তু-জানোয়ার আছে বলেই আমাদের সশস্ত্র হতে হবে, আমাদের ছিঁড়ে খেতে দেওয়া মহত্ত্ব নয়, বোকামি।"

শরীর অশক্ত হয়ে পড়েছিল। তবু সাহিত্য রচনার বিরাম ছিল না। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের লেখা ছোটগল্প কফন, কেবল ভারতীয় সাহিত্যের নয়, বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প।

সমগ্র জীবন দুটি সত্তা বহন করেছেন কথাশিল্পী প্রেমচন্দ। তার একটি হল, সাম্যবাদের প্রতি সমর্থন। অপরটি ধনতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা। তাঁর সমস্ত রচনাতেই ঘুরে ফিরে এই দুই সুরই বারবার বহু বিচিত্র ধারায় উচ্চারিত হয়েছে।

১৯৩৬ খ্রিঃ জুন মাসের শেষ দিক থেকে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগের পর ৮ই অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। সহজ সরল জীবনের মতোই মৃত্যুকেও সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় সাহিত্যের এই কালজয়ী প্রতিভা।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

রাহুল সাংকৃত্যায়ন—এক আশ্চর্য বিচিত্র জীবনের নাম। এক বহুমুখী চলমান সৃজনশীলতার নাম।

পরিব্রাজক জীবনের চলা-পথ তাঁকে নিয়ে গেছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। পথকেই তিনি করেছিলেন ঘর। আর এই পথ চলার জীবনেই সৃষ্টি করেছেন বহু বিচিত্র সাহিত্য সম্ভার।

এক বিস্ময়কর অনন্য মনীষা নিয়ে জন্মেছিলেন রাহুল। রাহুলের প্রকৃত নাম কেদারনাথ পাণ্ডে। জন্ম ১৮৯৩ খ্রিঃ ৯ই এপ্রিল উত্তরপ্রদেশে আজমগড় জেলায় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর বাবার নাম গোবর্ধন পাণ্ডে। মা কুলবন্তী।

পাঁচ বছর বয়সে রাহুলকে পাঠানো হয় গ্রামের মাদ্রাসায়। সেখানে তিনি উর্দুভাষা শিক্ষা করেন।

মাদ্রাসার পাঠ শেষ হলে তাঁর পড়া শুরু হয় প্রাথমিক স্কুলে।

এখানে স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই সেকালের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী রাহুলের বিয়ে হয় এবং বৌ থাকত তার বাপের বাড়ি। বৌয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার সুযোগ ছিল না।

রাহুল জন্মেছিলেন অদ্ভুত এক ভবঘুরে মন নিয়ে। ঘরে কিছুতেই মন বসতে চাইত না। বয়স ৯ বছর শেষ হতে না হতেই একদিন ঘর ছেড়ে পালালেন তিনি। সোজা গিয়ে উঠলেন বেনারসে এক সাধুর ডেরায়।

কিন্তু সেখানেও বেশি দিন মন টিকল না। ঘরের ছেলে আবার ফিরে এলেন ঘরে।

পরিবারটি ব্রাহ্মণ হলেও তাদের প্রধান কাজ ছিল চাষবাস। রাহুলদের জমি-জমা ছিল। এবারে ছেলেকে ঘরে বাঁধবার জন্য কেদারনাথ ঘরগৃহস্থালীর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন তাঁর কাঁধে। কিন্তু বাইরের মুক্ত আকাশের স্বাদ যে পেয়েছে, ঘরের খাঁচায় তার মন টিকবে কতদিন? রাহুল আবার ঘর ছেড়ে পালালেন। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর।

এবারে আর কোন সাধুর ডেরায় নয়, সোজা চলে এলেন কলকাতায়। সম্পূর্ণ অচেনা এই শহরে থাকার বা খাওয়া-পরার কোন সংস্থান তাঁর ছিল না।

কাজের চেষ্টা করে হতাশ হলেন। নিরুপায় হয়ে আবার ফিরে গেলেন গ্রামের বাড়িতে।

কিন্তু ষোল বছর বয়সে মহানগরী কলকাতা আবার তাঁকে ঘর থেকে ছাড়িয়ে আনল। এবারে তাঁকে একটা কাজ জুটিয়ে দিল এক দেশওয়ালী ভাই।

কাজটিও চমৎকার। এক খৈনির দোকানে খৈনি বিক্রি করার কাজ। কিন্তু কাজে ঢুকতে না ঢুকতেই ঘটালেন বিপত্তি।

একদিন পরখ করতে গিয়ে খানিকটা খৈনি মুখে পুরে গিলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। শেষে তাকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করাতে হয়।

এরপরে খেয়াল হল সন্ন্যাসী হবেন। অমনি ভিড়ে গেলেন এক সাধুর দলে। আর তাদের সঙ্গে থেকে যা রপ্ত হল তা হল গাজা, সিদ্ধি ইত্যাদির নেশা।

পড়শোনার প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকেই ছিল রাহুলের। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য পাঠের আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল তাঁর। সেই আকর্ষণই তাঁকে টেনে নিয়ে যেত সাধুসন্ন্যাসীদের ডেরায়।

কিন্তু সাধুর দলে মিশে তিনি অনুভব করলেন, তাদের সাধুর বেশ একটা খোলস ছাড়া কিছু নয়। ধর্মীয় চেতনা বা শিক্ষার লেশমাত্র তাদের মধ্যে নেই।

রাহুলের কিশোর বয়সের এই অভিজ্ঞতাই গড়ে তুলেছিল তাঁর প্রতিবাদী ও যুক্তিবাদী মানসিক গঠন। উত্তরকালে তিনি হয়েছিলেন সমস্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা।

ধর্মান্ধ হিন্দুদের বিরুদ্ধে, কপট ধর্মাচারী, আচার-সর্বস্ব ধর্মবাদী—এই সকলের বিরুদ্ধেই।

সাধুর দলে মিশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পৌঁছলেন হরিদ্বার। এখান থেকে

হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলো—বদ্রীনাথ, কেদারনাথ ও যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী পরিভ্রমণ করলেন।

এইভাবে মাত্র সতেরো বছর বয়সেই হিমালয় দর্শন সম্পূর্ণ করলেন।

হিমালয় থেকে ফিরে তিনি উপস্থিত হলেন বারাণসী। সেই সময়ে বারাণসী ছিল সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

বলাবাহুল্য, স্থান মাহাত্ম্যেই যেন রাহুলের মধ্যে জেগে উঠল জ্ঞানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই শুরু করলেন সংস্কৃত শিক্ষা। জন্মসূত্রেই তিনি লাভ করেছিলেন আসাধারণ মেধা।

ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করলেন এবং পড়তে লাগলেন নানান শাস্ত্রগ্রন্থ।

রাহুল সংস্কৃত শাস্ত্র পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মুক্ত উদার চিন্তা-ভাবনা এই উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষকদের পছন্দ হয়নি, পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

বারাণসী অবস্থানকালেই তিনি একটি স্কুলে ইংরাজি ও অঙ্ক শিক্ষা করলেন। কিন্তু ভেতরের ভবঘুরে মানুষটি কতদিন নিশ্চুপ থাকতে পারে? চিরজীবনের মতো স্কুলের পাট চুকিয়ে এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে পুরোপুরি সাধু হয়ে গেলেন। দীক্ষার পর তাঁর নাম হল রামউদার দাস।

এরপর একবছর ধরে ভারতের নানাপ্রান্তে ঘুরে বেড়ালেন। লাভ করলেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণকালে তিনি তামিল ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন।

রাহুল তাঁর এই ভারত-পরিক্রমা কালেই ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রকৃত রূপ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন।

তিনি দেখেছিলেন, ধর্মের নামে যুক্তি-চিন্তা হারিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ কী নিদারুণ অজ্ঞতায় ডুবে আছে।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি উপস্থিত হলেন অযোধ্যায়। এখানে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজের সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হন। এখানেও মন্দিরে মন্দিরে ধর্মের নামে ভন্ডামি দেখে তাঁর যুক্তিবাদী মন বিদ্রোহ করে উঠল।

এক জনসভায় তাঁর মনের ক্ষোভ তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করলেন। তাঁর এই প্রতিবাদে পুরোহিত সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে রাহুল সংকল্প নিলেন আর মুখে নয়, এবার থেকে লিখেই তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করবেন, ধর্মের মুখোশধারীদের মুখোশ খুলে দেবেন।

এই সময় থেকেই রাহুলের জীবন এক নতুন পথে মোড় নিতে থাকে। তাঁর অন্তস্থিত প্রতিবাদী মানুষটির ঘটে জাগরণ।

সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর রাহুলের বৃদ্ধ বাবা সাধ্যসাধনা করেছেন তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। সংসারে ছিল তাঁর তরুণী স্ত্রী। বাবার অনুরোধে রাহুল মাত্র একবারই ১৯১৫খ্রিঃ বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়েছিল। কিন্তু গৃহজীবনে বাঁধা পড়েননি রাহুল। আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে।

অযোধ্যায় আর্যসমাজের কার্যকলাপ তাঁকে সাময়িকভাবে হলেও আকৃষ্ট করেছিল। এই সময়েই তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের খবরাখবরের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হয়েছিলেন।

আর্য সমাজের যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার প্রভাবে আসার পরে রাহুল হিন্দুধর্মের সমস্ত কুসংস্কার ও নিরর্থক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। সূত্রপাত হল তাঁর লেখকজীবনের।

মুসাফির ও ভাস্কর নামে দুটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশিত হত মিরাট থেকে। রাহুল এই পত্রিকা দুটিতে লিখতে শুরু করলেন।

এই সময়ে তিনি কিছুদিন আর্য সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রগুলি ঘুরে বেড়ান।

কিন্তু সংঘগুলির কাজকর্ম ও কর্মীদের চিন্তাভাবনা তাঁকে হতাশ করেছিল। তাই পথই আবার হল তাঁর সঙ্গী।

রাহুল এলেন বারাণসী, সেখান থেকে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সারনাথে। সারনাথ ভ্রমণ এবং বুদ্ধদেবের জীবন ও দর্শন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে রাহুল বৌদ্ধধর্মমতে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব মহানির্বাণ লাভ করেছিলেন গোরখপুরে কুশী নদীর তীরে। সারনাথের পরে রাহুল দর্শন করেন গোরখপুব।

সেখান থেকে গেলেন নেপালের লুম্বিনী আর কপিলাবস্তুতে। বস্তুতঃ বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধভাবধারা রাহুলকে এতটাই আকৃষ্ট করেছিল যে অন্তর্নিহিত প্রেরণাতেই তিনি বৌদ্ধতীর্থগুলি ঘুরে ঘুরে দর্শন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রিঃ ১৩ই এপ্রিল ঘটে যায় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড। ফলে ইংরাজের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে গোটা দেশ জুড়ে জনজাগরণের বিস্ফোরণ ঘটে। ভবঘুরে রাহুলও এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

১৯২১খ্রিঃ গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত জুড়ে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। রাহুল এবারে জনজীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না।

গেরুয়া বেশধারী সন্ন্যাসী যোগ দিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। এই সময়ে তিনি কংগ্রেসের হয়ে বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করেন।

জনজাগরণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রচারের কাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। গ্রামে গ্রামে দীন-দুঃখী মানুষের সেবায় অকুণ্ঠ সহযোগিতা জুগিয়েছেন।

ফলে অল্প দিনের মধ্যেই স্বদেশীকর্মী হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল এবং তিনি গ্রেপ্তার হলেন ১৯২২ খ্রিঃ ৩১শে জানুয়ারি।

ছয় মাসের কারাদন্ডের আদেশ হল রাহুলের। তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বক্সার জেলে। সেই সময়ে এখানেই রাখা হত রাজনৈতিক বন্দিদের।

আজন্ম জ্ঞানপিপাসু রাহুল কারাবাসের দিনগুলিতেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। জেলে বসেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় কোরানের অনুবাদ করলেন, লিখলেন ব্রজবুলি ভাষায় বেশ কিছু কবিতা।

রাহুল জেল থেকে বিভিন্ন খবর গোপনে বাইরে পাচার করে দিতেন। সেসব খবর ছাপা হত মাদারল্যান্ড নামে একটি পত্রিকায়। এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন মাযহারুল হক।

গোপন পথে জেলের বাইরে থেকে রাহুলের কাছেও আসত নানান বইপত্র ও সংবাদপত্র। এই সময়েই একদিন তাঁর হাতে পৌঁছায় রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা ট্রটস্কির লেখা বলশেভিজম অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রেভল্যুশন।

ইতিপূর্বেই সংবাদপত্র মাধ্যমে রাশিয়ার বিপ্লব ও সাম্যবাদ সম্পর্কে রাহুল জানতে পেরেছিলেন। ট্রটস্কির বইটি পড়বার পর তিনি সাম্যবাদের বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর রাহুলকে দেওয়া হল জেলা কংগ্রেসের দায়িত্ব। বস্তুতঃ এই সময়ে কংগ্রেসের কাজকর্ম করলেও রাহুল ক্রমেই সাম্যবাদের আদর্শেব প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন।

১৯২৩ খ্রিঃ পশুপতিনাথ দর্শনের জন্য তিনি নেপাল গেলেন। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে আসেন এবং দেড় মাস তাঁদের সঙ্গে থেকে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানতে পারেন।

দেশে ফিরে আসতেই তিনি আবার বন্দি হলেন। এবারে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাঁকিপুর জেলে।

কারাকক্ষে এবারে তাঁর সঙ্গী ছিল পালি ভাষায় লেখা একটি ধর্মগ্রন্থ মজঝিম নিকায়। এই সময়ে তিনি জেলে বসে চারটি ইংরাজি উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ করেন। এছাড়া গ্রহমন্ডলীর একটি মানচিত্রও তৈরি করেছিলেন।

বাঁকিপুর জেল থেকে কিছুদিন পরে রাহুলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাজারিবাগ জেলে। এখানে বসেই তিনি ফার্সী ও আবেস্তা ভাষার চর্চা করেন।

রাহুলের ছিল অদম্য জ্ঞানপিপাসা। তাই নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের মধ্যেই তিনি কখনো আবদ্ধ থাকতেন না। যখন যেই বিষয়ের বই হাতে পেতেন তার মধ্যেই ডুবে যেতেন। দু'বছর পরে রাহুল যখন জেল থেকে ছাড়া পেলেন তখন কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে।

নরমপন্থী ও মধ্যমপন্থী, দলের মধ্যে এই দুই গোষ্ঠীর বিভাজন ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছিল। গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীরা ছিলেন নরমপন্থী দলে। আর মতিলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, চিত্তরঞ্জন দাশ—এই নেতৃবৃন্দ ছিলেন মধ্যপন্থী।

দেশের নেতাদের মধ্যে এই বিরোধ দেখে রাহুল রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেললেন। তিনি সব ছেড়েছুড়ে আবার নেমে পড়লেন পথে। এবারে গেলেন কাশ্মীর। সেখান থেকে লাদাখ ও তিব্বতের পশ্চিম প্রান্ত ঘুরে ফিরে আসেন।

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন রাহুলকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই ভ্রমণ-পর্ব শেষ করে তিনি কলকাতায় এসে মহাবোধি সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাহুলের অনুরাগ দেখে মহাবোধি সোসাইটি তাঁকে শ্রীলঙ্কায় যাবার ব্যবস্থা করে দিল। সেই সময় বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল শ্রীলঙ্কা।

১৯২৭খ্রিঃ ১৬ই মে থেকে শ্রীলঙ্কার বিদ্যালংকার জ্ঞানপীঠে দীর্ঘ উনিশ মাস রাহুল বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করেন।

এই সময়ে তিনি সিংহলী ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করেন।

শ্রীলঙ্কায় অবস্থান কালেই তিব্বতে সংরক্ষিত বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন পুঁথি বিষয়ে রাহুল অবগত হন।

১২০২খ্রিঃ বখতিয়ার খলজির ভারত আক্রমণকালে তালপাতায় লেখা বহু প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি নিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুরা নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই মূল্যবান সম্পদ সেখানকার লামাদের তত্ত্বাবধানেই রক্ষিত ছিল। রাহুল সংকল্প করলেন তিব্বতে গিয়ে এই পুঁথি উদ্ধার করবেন।

সেই সময়ে ইংরাজ সরকার কোন ভারতীয়কেই তিব্বতে যাবার অনুমতি দিত না। তাছাড়া পথও ছিল দুর্গম, বিপদসঙ্কুল। কিন্তু কোন বাধাই রাহুলকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারল না।

ভারত থেকে তিব্বতে যাবার পথ নেপালের মধ্য দিয়ে। তাই রাহুল প্রথমে

গেলেন নেপালে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে গোপনে তিনি উপস্থিত হলেন নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে।

এখান থেকে ভিড়ে গেলেন কিছু তিব্বতি ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তারা তিব্বতের চাল আর সবজির বিনিময়ে নেপাল থেকে লবন নিয়ে তিব্বতে ফিরছিল।

রাহুল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে উপস্থিত হলেন নেপাল সীমান্তে। এই সময় তিনি নিজের পরিচয় দিলেন রং লামা নামে একজন বিখ্যাত লামার শিষ্য হিসেবে।

পথে একজন বৌদ্ধভিক্ষুকে সঙ্গী হিসেবে পেলেন রাহুল। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পাহাড়ি পথ কখনো পায়ে হেঁটে কখনো ঘোড়ার পিঠে চেপে পাড়ি দিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন নারথাং বৌদ্ধ গুম্ফায়।

এখানে তিনি বহু প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পেলেন।

অবশেষে সেখান থেকে নৌকাপথে ও পায়ে হেঁটে এসে পৌঁছলেন তিব্বতের রাজধানী লাসায়।

ধর্ম সাহু নামে লাসার এক ব্যক্তির সঙ্গে রাহুলের পরিচয় হয়েছিল নেপালে। লাসায় পৌঁছে তিনি তার বাড়িতেই আশ্রয় পেলেন।

তিব্বতীরা বিদেশীদের পছন্দ করত না। তাই রাহুলকে এখানে দলাইলামার শিষ্য বলে পরিচয় দিতে হয়েছিল এবং এই সূত্রে বহু প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পান। তাঁর ইচ্ছা ছিল বছর তিনেক তিব্বতে থেকে সেসব পুঁথি নিয়ে গবেষণা করবেন। কিন্তু আর্থিক কাবণে এক বছর তিনমাস পরেই তাঁকে তিব্বত থেকে ভারতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

দেশে ফেরার সময় রাহুল বহু দুর্লভ পুঁথি, প্রাচীন চিত্রকলা, পট প্রভৃতি নগদ অর্থে কিনে নিয়েছিলেন। তারপর সমস্ত সংগ্রহ ১৮টি টাট্টুঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ১৯৩০ খ্রিঃ ২৪শে এপ্রিল লাসা থেকে রওনা হয়ে ৩৯ দিন পরে এসে পৌছলেন কালিম্পং।

রাহুল যে সমস্ত পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল বৌদ্ধশাস্ত্র, ধর্মদর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা, ভূগোল, জীবনী, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রাচীন যুগের সমাজ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য।

সংগৃহীত সমস্ত দ্রব্যই রাহুল পাটনা মিউজিয়মকে উপহার দিয়েছিলেন।

রাহুল এর পরেও ১৯৩৪ খ্রিঃ থেকে ১৯৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত আরও তিনবার তিব্বতে গিয়েছিলেন এবং প্রতিবারেই অজস্র পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

রাহুলের জীবন ছিল নিত্য পরিবর্তনশীল। নিরন্তর তিনি যেমন স্থান পরিবর্তন করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তেমনি তাঁর মনও সময় থেকে সময়ান্তরে বিচরণ করেছে নানান বিষয়ে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন মেনে তিনি বহুবার নিজের নামেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

কেদারনাথ পাণ্ডে নামের মানুষটিই যখন হিন্দু ধর্মসংঘের সঙ্গে যুক্ত হলেন, নতুন নাম নিলেন রামউদার দাস।

কিছুদিন পরেই আবার ঘটল নামের পরিবর্তন। হলেন রামউধার সিং। তারপর যখন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন বুদ্ধপুত্রের নামে নিজের নামকরণ করলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। নামের এই বিচিত্র পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছিলেন জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনে।

বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল দুটি প্রধান শাখা। হীনযান ও মহাযান। নেপাল ও তিব্বত থেকে রাহুল সংগ্রহ করেছিলেন মহাযান শাখার পুঁথি। আবার হীনযান তত্ত্বের সূত্রাদি আয়ত্ত করার জন্য তিনি গিয়েছেন শ্রীলঙ্কায়।

দুটি সম্প্রদায়ের মূলগত তত্ত্বের সন্ধান করার জন্য রাহুলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাঁকে শিখতে হয়েছিল সংস্কৃত, পালি, সিংহলী ও তিব্বতি ভাষা।

ধর্ম ও দর্শনের প্রতিটি বিষয় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তাই এক সময়ে দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রয়াসে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি।

জন্ম-পরিব্রাজক রাহুলের পদযাত্রা কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৩২ খ্রিঃ তিনি সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছিলেন ইউরোপে। ভ্রমণ করেন ফ্রান্স ও জার্মানী। পরে জাপান কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া হয়ে উপস্থিত হন মস্কোয়।

যখন যে দেশে তিনি গেছেন, সেখানকার দার্শনিক পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়েছেন সকলেই।

প্রসিদ্ধ রুশ দার্শনিক, বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্চেরবটসকী তাঁর স্মৃতিকথায় মন্তব্য করেছেন, 'বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে যথাযথ অধ্যাপনা করতে পারেন পৃথিবীতে এমন মানুষ একজনই আছেন। তিনি হলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন'।

অথচ আশ্চর্য এই যে মহাপণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ এই মানুষটির ছিল না প্রথাগত কোন শিক্ষা। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টা ও উদ্যম সহায়ে তিনি অধিগত করেছিলেন সমস্ত বিদ্যা। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও সুগভীর মননের পরিচয় রয়েছে তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থের মধ্যে।

রাহুল মস্কো থেকে বাকু হয়ে যান ইরানে। সেখানকার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে ফিরে আসেন ভারতবর্ষে।

১৯৩৭ খ্রিঃ সোভিয়েত আকাদেমির আমন্ত্রণে রাহুল দ্বিতীয়বার রাশিয়ায়

যান। সেই সময়ে আকাদেমির ভারতীয়-তিব্বত বিভাগের উদ্যোগে সংস্কৃত-তিব্বতি ভাষাকোষ সংকলনের কাজ চলছিল। সেই কাজে ব্রতী ছিলেন আকাদেমির অন্যতম কর্মী মিসেস লোলা। তাঁর সম্পূর্ণ নাম ছিল এলেনা ন্যার্ভারিটোভনা কোজেরেবস্কায়া।

এখানেই লোলার সঙ্গে পরিচয় হয় রাহুলের। তিনি তাঁকে শেখাতেন সংস্কৃত আর নিজে লোলার কাছে শিখতেন রুশ ভাষা।

এই সূত্রেই দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল ঘনিষ্ঠতা এবং অল্পদিনের মধ্যেই দুজন দুজনকে ভালবেসে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

বিবাহের তিন মাস পরেই রাহুল ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। লোলা থেকে যান লেনিনগ্রাদে।

কয়েক মাস পরেই রাহুল ও লোলার প্রথম পুত্র ইগোর জন্ম হয়। দেশে বসেই পুত্রের জন্মের সংবাদ পান তিনি।

দীর্ঘ সাত বছর পর ১৯৪৫ খ্রিঃ রাহুল তৃতীয়বার রাশিয়া গেলে পত্নী ও পুত্রের সঙ্গে মিলিত হন। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে এক বছর ছিলেন তিনি। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকারী অনুমতি না পাওয়ায় স্ত্রী-পুত্রকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসতে পারেননি।

রুশ দেশে অবস্থানকালে রাহুল সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। চিন্তাজগতে মার্কসীয় প্রবল প্রভাব নিয়ে ভারতে ফিরে এসে তিনি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কৃষক আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। ফলে এই সময়ে তাঁকে বন্দী অবস্থায় মাস কয়েক জেল খাটতে হয়।

কিন্তু সেখানেই শেষ হল না রাহুলের বন্দিজীবন। প্রথমবার মুক্তিলাভের পর কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার অপরাধে পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং এই দফায় তাঁর কারাবাস হয় দীর্ঘ আড়াই বছর।

কারাগারে বসে রাহুল রচনা করলেন তাঁর দুটি বিখ্যাত বই—ভোলগা থেকে গঙ্গা ও দর্শন দিগ্‌দর্শন।

১৯৪২ খ্রিঃ ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার আন্দোলনে উত্তাল, রাহুল জেল থেকে ছাড়া পেলেন। সেই সময় তাঁর বয়স পঞ্চাশ। এই সময়ে তিনি দিন কতকের জন্য গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে ছেড়ে আসা গ্রামে ততদিনে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে। তবে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই দেখা হওয়ায় আনন্দ পেলেন।

অবহেলায় পরিত্যাগ করে যাওয়া নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও এসময়ে সাক্ষাৎ হয় রাহুলের। কিন্তু তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করবার কোন উপায় ছিল না তাঁর।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে যখন দেশবাসী অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করে, গ্রেপ্তার বরণ করে দেশমুক্তির সোপান রচনা করছে, রাহুলের অন্তরে তার কোন ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয় না।

কেননা দেখা গেল, স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করে তিনি পাড়ি জমালেন রাশিয়ায়। সেখানে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৪৮ খ্রিঃ রাহুল ফিরে এলেন ভারতে। ততদিনে তাঁর শরীব ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। এই সময়টা তিনি নিজের লেখালিখি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

রাহুলের ঘটনাবহুল অস্থির জীবনের শেষপর্বে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল। কমলা পেরিয়ার নামে এক বিদুষী নেপালী মহিলাকে বিবাহ করলেন তিনি। কমলা ছিলেন স্বামীঅনুগতা সুগৃহিণী। স্বামীর নানাকাজে নানাভাবে সাহায্যও করতেন তিনি।

এই নতুন সংসারে রাহুলের এক কন্যা জয়া ও এক পুত্র জেতার জন্ম হয়। স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে এতদিনে এক পরিপূর্ণ সংসারলাভ করলেন রাহুল।

এরপর তিনি কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলেন চীনে। সেখান থেকে ফিরে শ্রীলঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করেন। দেশে ফিরে আসেন ১৯৪৮ খ্রিঃ।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থা নিয়েই ফিরেছিলেন রাহুল। ক্রমশই শরীর অসাড় হয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে স্মৃতি হারিয়ে যেতে আরম্ভ করল, কথাও হল রুদ্ধ। ডাক্তাররা জানালেন, এ হল দুরারোগ্য অ্যামনেসিয়া রোগ। যা মানুষকে নির্বাক বোধহীন করে ফেলে।

চিকিৎসার জন্য রাশিয়া নিয়ে যাওয়া হল রাহুলকে। এই সময়ে স্ত্রী লোলা এসেছিলেন তাঁকে দেখতে। রাহুল কোন কথা বলতে পারেননি, কেবল তাকিয়ে দেখেছেন স্ত্রীকে, চোখ ছিল অশ্রুপূর্ণ।

চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় রাহুলকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল দার্জিলিং। সেখানেই ১৯৪৮ খ্রিঃ ১৪ এপ্রিল তাঁর বিচিত্র জীবনের অবসান ঘটে।

জীবনের পর্বে পর্বে ঘোরতর অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকেই প্রাজ্ঞ রাহুল সাংকৃত্যায়ন রচনা করেছেন বিশাল বিচিত্র সাহিত্য সম্ভার।

তাঁর সাহিত্যজীবনের বিস্তৃতি ছিল ১৯২৭ খ্রিঃ থেকে ১৯৪৮ খ্রিঃ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে অবিশ্রান্তভাবে তিনি লিখে গেছেন, উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, অনুবাদ। সেই সঙ্গে

আত্মকথা, জীবনীমূলক গ্রন্থ, অভিধান, লোকসাহিত্য সংকলন নিয়ে প্রায় ১২৫ টি গ্রন্থ। এবং তাঁর প্রতিটি রচনাই সুনিপুণ রচনাশৈলীর গুণে সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে।

তাঁর রচনার ভাষা সহজ সরল, প্রাণবন্ত, সহজেই তা পাঠকের মনে রেখাপাত করে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সংজীবিত রচনার মাধ্যমে রাহুল পাঠককে দিয়েছেন জ্ঞান ও সত্যের আলোকের সন্ধান, এক মহত্তর জীবনের দিশা। একারণেই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে রাহুল সাংকৃত্যায়ন এক অবিস্মরণীয় নাম।

অনর দ্য বালজাক

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে বালজাক এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর সৃষ্টির অভিনবত্ব ও বিশালতা তাঁকে এক অনন্য স্রষ্টার গৌরব দান করেছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের সার্থক রূপকার রূপে বাস্তববাদী উপন্যাসের পথিকৃতের ভূমিকায় ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর লেখনী।

দীর্ঘ কুড়ি বছরের পরিশ্রমে একটা গোটা দেশ ও তার সমগ্র জনগোষ্ঠীকে জীবন্তরূপে চিত্রিত করেছেন তিনি। যে অভিনব উপন্যাসমালা তিনি রচনা করেছেন, তাতে বিধৃত হয়েছে কয়েক হাজার চরিত্র, বর্ণনায় ও সৌন্দর্যে যা অতুলনীয়।

উপন্যাসকার বালজাকের জীবন ছিল তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মতোই বিস্ময়কর। এমনই দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি যে মায়ের স্নেহ থেকে ছিলেন চিরবঞ্চিত।

বড় হয়েছিলেন তিনি ঠাকুরমা আর প্রৌঢ় বাবার স্নেহযত্নে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল অনর বালজাক।

আট বছর বয়সে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল বালজাককে। কিন্তু জন্ম-ভাবুক প্রকৃতির এই বালকের পড়াশোনায় কোন আগ্রহ ছিল না। স্কুলের নিয়মবদ্ধ জীবন তাঁর কাছে কোনদিনই সুখকর ঠেকত না।

তাই স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁর অভিভাবকদের স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এ ছেলের কোনদিনই পড়াশুনা হবে না। চোদ্দ বছর বয়সেই স্কুলজীবনের ইতি পড়েছিল তাঁর।

এরপর কিশোর বালজাককে যে স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল সেখানে নিয়মের কড়াকড়ি ততটা ছিল না। তবুও পড়াশুনায় বিশেষ উন্নতি দেখাতে

পারেননি তিনি। তবে দেখা গেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

তাঁর সাফল্য সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। স্কুলের পাট চুকলে বালজাককে ভর্তি করে দেওয়া হল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ক্লাসে। তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল আইন পাশ করে বালজাক আইনজ্ঞ হবেন। তাই পড়াশুনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এক আইনজ্ঞের অফিসে তাঁর কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই একটা বিষয়ে অনুরাগী ছিলেন বালজাক। তা হল সাহিত্য। ফলে আইনের পড়াশুনায় স্বাভাবিকভাবেই কোন আকর্ষণ বোধ করলেন না তিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই আইন পড়া ও শিক্ষানবিসীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন সাহিত্য রচনাই হবে তাঁর জীবনের উপজীব্য।

ছেলের লেখক হবার সঙ্কল্প জানতে পেরে তাঁর বাবা-মা উভয়েই হতাশ হলেন। বালজাকের পিতা ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান। কৃষিকাজ পরিত্যাগ করে সারাজীবন অর্থ বিত্তের সাধনায় লেগে থেকে জীবনে সফল হয়েছিলেন। তাই অর্থকেই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন।

স্বভাবতঃই পুত্রের লেখক হবার সঙ্কল্পকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। সাহিত্য রচনা করে যে জীবন চলে না, মনের মত রোজগার করা যায় না, একথা ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বালজাক কিছুতেই তাঁর সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন না।

বাবামায়ের অনুনয়-বিনয়, তিরস্কার—সবকিছুই ব্যর্থ হল।

শেষ পর্যন্ত পিতা তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন তাঁর একমাত্র সন্তানকে, এক বছর সে নিয়মিত মাসোহারা পাবে—আর এই এক বছরের মধ্যে তাকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু ব্যর্থ হলে আবার আইনের পাঠ নিতে হবে।

বাবার শর্তে সম্মত হলেন বালজাক। বাবার দেওয়া সামান্য মাসোহারা সম্বল করে তিনি পাড়ি দিলেন প্যারিসে। ভাড়া নিলেন একটা ছোট্ট ঘর। এখানেই শুরু হল তাঁর সাহিত্য রচনার জীবন।

প্রথমে শুরু করলেন কাব্য-নাটক লেখা। দিনরাত লেখার মধ্যে ডুবে থাকেন।

এইভাবে কেটে গেল একটি বছর। বাবা চিঠি দিয়ে জানতে চাইলেন, ছেলের সাহিত্যচর্চা কতদূর এগুলো।

কাব্য নাটকের একটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন বালজাক। তুলে দিলেন বাবার হাতে।

গ্রামের এক প্রবীণ লোক একসময়ে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ছেলের পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে দেখিয়ে মতামত জানতে চাইলেন বালজাকের বাবা।

তিনি পাণ্ডুলিপিটি পড়ে মন্তব্য করলেন, লেখা তেমন উৎরায়নি বটে তবে চেষ্টা করলে যে বালজাক ভবিষ্যতে ভাল লিখতে পারবেন, সে প্রমাণ তার লেখায় রয়েছে।

প্রাক্তন সম্পাদকের মতামত শুনে সম্ভবতঃ কিছুটা আশান্বিত হলেন বাবা। তিনি জানালেন, আরো তিনমাস মাসোহারা চালাবেন। কিন্তু এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে না পারলে সাহিত্যের মুখ চেয়ে আর কানাকড়িও খরচ করতে তিনি রাজি নন।

আরও তিনমাস বাড়তি সময় পেয়ে আশাহত বালজাক কিছুটা ভরসা পেলেন। ভাবলেন এই সময়ের মধ্যে, নিশ্চয় ভাল কিছু তিনি লিখতে পারবেন।

প্যারিসের সেই ছোট্ট ঘরে ফিরে এসে এবারে আর কাব্য-নাটক নয়, উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন বালজাক।

আবার সেই অমানুষিক পরিশ্রম। দিন নেই রাত নেই। খাওয়া-দাওয়ার প্রতিও কোন লক্ষ্য নেই। এক আসনে বসে পাতার পর পাতা লিখে চলেন।

লেখাব পর নিজেই আবার পড়েন। কিন্তু হতাশ হন, যা লিখতে চাইছেন, তা লিখতে পারেননি। সমস্ত লেখা বাতিল করে দিয়ে আবার নতুন করে লেখা শুরু করেন।

তিনমাস সময় যেন হাওয়ার বেগে উড়ে গেল। বাবা চিঠি দিয়ে জানালেন, মাসোহারার টাকা আর পাঠানো হবে না।

সামান্য যে টাকা তিনি মাসে মাসে পেতেন, তাতে প্যারিসের মতো শহরে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে হতো তাঁকে। সেই টাকাও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চোখে অন্ধকার দেখলেন বালজাক। নিজের খরচ চালাবার মতো কোন সংস্থানই যে তাঁর নেই।

কিন্তু ফিরে গিয়ে আইনের ক্লাশে ভর্তি হতেও চরম অনীহা। কী করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না বালজাক।

এই সময়ে আকস্মিক ভাবেই এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কাছেই বাঁচার পথের সন্ধান পেয়ে গেলেন তিনি।

বন্ধুটির ছিল পুস্তক প্রকাশনার একটি ছোটখাট ব্যবসা। হাল্কা ধরনের রোমান্টিক উপন্যাস ছাপতেন তিনি। বালজাককে বুদ্ধি দিলেন, আমাকে উপন্যাস লিখে দাও, তোমার টাকার অভাব ঘুচবে। তবে যা লিখবে তাতে লেখক হিসেবে ছাপা হবে আমার নাম।

বালজাক যেন অকূলে কূল পেলেন। বন্ধুর এই উদ্ভট প্রস্তাবেই রাজি হয়ে গেলেন।

এবারে বালজাক ফরমায়েসি চটকদার রোমান্টিক উপন্যাস লিখতে বসে গেলেন। পরিশ্রমে তাঁর ক্লান্তি নেই। টানা কলম চালিয়ে দেড় মাসে শেষ করলেন প্রথম উপন্যাস।

যথাসময়ে কিছু টাকাও হাতে এসে গেল। নিশ্চিন্ত হলেন বালজাক। আইনের কচকচি থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল ভেবে খুশিও হলেন।

এইভাবে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে পরপর চব্বিশটি উপন্যাস লেখেন বালজাক। এর প্রায় সব কটিতেই লেখক হিসেবে নাম ছিল প্রকাশক বন্ধুর। কয়েকটিতে ছাপা হয়েছিল ছদ্মনাম।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের শিক্ষানবিসী জীবনের লেখা এই উপন্যাসগুলির একটিও পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি। বালজাক নিজেও জানতেন এগুলোর কোন স্থায়ী মূল্য থাকবে না, তাই কোন বইই সংরক্ষণের চেষ্টা করেননি।

যাই হোক, ততদিনে বইপুস্তকের জগতে লেখক হিসেবে বালজাকের কিছুটা খাতির বেড়েছিল। সেই সুবাদে সামান্য অর্থার্জনও হচ্ছিল। যদিও পরিশ্রমের তুলনায় তা ছিল নগণ্য।

বালজাকের সমস্ত পরিশ্রমই এভাবে যখন অপচয় হয়ে চলেছে সেই সময়ে দৈবযোগাযোগের মতোই একটা সুযোগ এসে গেল। তাঁর এক বন্ধুর মা দয়াপরবশ হয়ে কিছু টাকা দিতে চাইলেন যাতে নিজের লেখা উপন্যাস তিনি নিজেই ছাপতে পারেন।

বালজাক আশান্বিত হয়ে আরো কিছু ধারকর্জ জোগাড় করে শেষ পর্যন্ত একটা ছোট ছাপাখানা কিনে ফেললেন। লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয়ে চলল বই। শুরু হল প্রকাশন ব্যবসা।

কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকলে ব্যবসা চলে কী করে? ফলে যা হবার তাই হল। কিছুদিনের মধ্যেই মোটা দেনার বোঝা কাঁধে চাপল তাঁর। ফলে শুরু হলো পাওনাদারদের তাগাদা।

কিন্তু লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েছেন বালজাক। একবার স্বীকৃতি পেয়ে গেলে আর অর্থের অভাব থাকবে না। তাই ঋণের বোঝাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

দুরন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে ডুবে থাকলেন লেখার মধ্যে। প্রেস ও ব্যবসা দেখাশোনা করতে লাগল অন্য লোক।

মাদাম বার্নি নামে এক বিধবা ছিলেন বালজাকের প্রতিবেশী। নটি সন্তানের জননী তিনি। তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতেন বালজাক। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত তাঁর স্নেহবুভুক্ষু মন মাদাম বার্নির কাছ থেকেই প্রথম লাভ করেছিল

ভালবাসার স্বাদ। উদ্বেল হয়ে উঠলেন বালজাক। প্রিয়তমা প্রেয়সীরূপে তিনি পেতে চাইলেন মাদাম বার্নিকে।

এই অবৈধ ভালবাসা স্বীকার করতে পারলেন না মাদাম। তিনি তাঁকে অনেক বোঝালেন। নীতি ও সমাজের প্রশ্ন তুলে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু বালজাকের ভালবাসা হয়ে উঠেছিল দুর্নিবার। তাঁর ব্যথাভরা তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে মাদামের ভালাবাসা ছিল একখন্ড মরূদ্যানের মতো নির্ভরতার স্থল। তাই মাদামের সব প্রতিরোধই ভেসে গেল, বালজাকের ভালবাসার বন্ধনে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ধরা দিতে হল।

কথাশিল্পী বালজাকের জীবনে মাদাম বার্নির ভালবাসা হয়ে উঠেছিল মহৎ প্রেরণার উৎস। তিনি তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছেন প্রতিনিয়ত, অনুপ্রাণিত করেছেন। আগ্রহের সঙ্গে তাঁর পান্ডুলিপি পড়ে পরামর্শ দিয়েছেন।

তাঁর জীবনে মাদামের প্রভাব ও ঋণের কথা পরবর্তী জীবনে বালজাক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন।

একদিকে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা, অন্যদিকে ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধমান ঋণের চাপ ও পাওনাদারের তাগিদ—এই পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন বালজাক। এমন অনেকদিন হয়েছে পাওনাদারের ভয়ে তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ছাপাখানা বিক্রি করে দিয়ে কিছু ধার দেনা মেটাতে হল।

ব্যবসা করে যে ভাগ্য ফেরানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না বহু অর্থ, সময় ও সম্মানের মূল্যে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারলেন বালজাক। তাঁকে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে সাহিত্য সাধনার পথেই তা পেতে হবে।

কিন্তু ব্যবসার বিড়ম্বনা তখনো অবশিষ্ট ছিল। পাওনাদারের উৎপাতে নিরুপদ্রবে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হল না বালজাকের। তাঁর নামে আদালতে নালিশ হল এবং যথারীতি গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হল।

বেশি দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই নিরুপায় বালজাককে শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে ব্রিটানিতে পালিয়ে যেতে হল। তাঁর নামে তখন সাত-সাতটা পরোয়ানা।

সেখানেও থাকতে হচ্ছিল আড়ালে আবডালে গা-ঢেকে, যাতে কেউ তাঁকে চিনতে না পারে।

ভাগ্যক্রমে এই সময় দেখা হয়ে গেল এক বন্ধুর সঙ্গে। নিজের বিপদের সব কথা বন্ধুকে জানালেন তিনি। সদয় হলেন বন্ধুটি। তাঁর বাড়িতেই দোতলার একটি ঘরে আশ্রয় পেলেন বালজাক।

বন্ধু জানালেন, এখানে তোমার কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্তে নিজের সাধনায় ডুব দাও। সাহিত্যের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর।

বালজাকের জীবনে এই বন্ধুর সাহায্য, পরামর্শ ও উৎসাহের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো এই ছত্রছায়া লাভ না করলে বালজাকের জীবনে বিপর্যয় ছিল অনিবার্য।

বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে বিভ্রান্ত জীবনে সুস্থির হয়ে সাহিত্য রচনা তাঁর পক্ষে কোনদিনই হয়তো সম্ভব হত না।

প্রবল উৎসাহে এবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লিখতে বসলেন বালজাক। সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁকে তাঁর আসনটি নির্দিষ্ট করে নিতেই হবে।

কঠিন বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত বালজাক ততদিনে লাভ করেছেন জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ দৃষ্টি।

অভিজ্ঞতায় পুষ্ট, সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, জীবনবোধ। তাই এবারে প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে যে লেখা তিনি লিখতে শুরু করলেন তা ছিল জীবন-রসে সম্পৃক্ত।

পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, জীবন সম্পর্কে পরিণত বোধ আর অক্লান্ত অমানুষিক পরিশ্রম—এই ত্রিধারার সম্মিলিত পরিণতি ছিল বালজাকের এই পর্যয়ের সাহিত্যজীবন।

এখানে তিনি প্রতিদিন রাত আটটায় ঘুমোতে যেতেন। রাত বারোটায় তাঁকে জাগিয়ে দেওয়া হত। সেই সময় থেকে ভোর না হওয়া পর্যন্ত অবিশ্রান্ত লিখে যেতেন তিনি।

সকালে কিছু সময় ঘুমিয়ে নিয়ে আবার বসে যেতেন লিখতে। সমস্ত দিনে আর লেখা ছেড়ে উঠতেন না।

এইভাবে ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের শেষে তিনি শেষ করলেন তাঁর হিউমেন কমেডি সিরিজের প্রথম উপন্যাস The lost of the Chouaris। ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত বালজাকের এই উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রিঃ।

বস্তুতঃ স্যার ওয়াল্টার স্কটকে অনুসরণ করে লেখা হলেও এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ছিল তার মৌলিকত্ব, বর্ণনা ও সৌন্দর্য।

এই গ্রন্থেই বালজাক সর্বপ্রথম নিজের নাম অনর বালজাক ব্যবহার করলেন।

একই বছরে প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস The Physiology of marriage।

এই উপন্যাসে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন নারীপুরুষের বিবাহ ও তাদের সম্পর্কের বিষয়।

এরপর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর উপন্যাস ও বড় গল্প। The wild ass's skin, A passion in the desert প্রকাশিত হয় ১৮৩০ খ্রিঃ। পরের বছরেই প্রকাশিত হয় The unknown Masterpiece.

উল্লেখযোগ্য যে A passion in the desert গল্পটি বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দশটি গল্পের মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকৃত।

ইতিমধ্যে বালজাক তাঁর নামের আগে দ্য কথাটি ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নামের আগে মর্যাদাসূচক দ্য কথাটি যুক্ত করতেন। বালজাকও তাই নিজের কৌলিন্য বোঝাবার জন্য লিখতেন অনর দ্য বালজাক।

তাঁর প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস ততদিনে তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন।

খ্যাতির সঙ্গে প্রত্যাশিত অর্থোর্জনও হতে লাগল। কিন্তু সেই অর্থ রক্ষা করবার কোন দায় বোধ করতেন না বালজাক।

বিলাস-ব্যসনে উড়িয়ে দিতেন। এসবের পেছনে কাজ করত তাঁর আভিজাত্য প্রকাশের মনোভাব।

নিজের লেখা নিয়ে যতক্ষণ মগ্ন থাকতেন তিনি, ততক্ষণ থাকতেন এক মানুষ। লেখা ছাড়া তখন অন্য কিছু তাঁর মাথায় থাকত না। কোন লেখা মনোমতো না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা মাজাঘষা করে যেতেন। এই নিয়ে এমনই ব্যস্ত থাকতেন যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও খেয়াল থাকত না। লেখার ঘরে একজন বন্দীর মতো জীবনযাপন করতেন।

কিন্তু লেখা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি হয়ে যেতেন অন্য মানুষ। বিলাস আর আমোদপ্রমোদে গা ভাসিয়ে দিতেন। বন্ধুবান্ধবদের ডেকে ভোজ খাওয়াতেন।

এই আড়ম্বরপূর্ণ জীবন বজায় রাখতে গিয়ে লিখে তিনি যা রোজগার করতেন, তার চেয়ে অনেক বেশিই খরচ হয়ে যেত। ফলে বাধ্য হয়ে ধার করতে হত।

আর ধার-কর্জের ব্যাপারেও বালজাক ছিলেন শাহেন শা। একজনের ধার শোধ করার জন্য অন্য একজনের কাছে ধার করতেন। ফলে পাওনাদারের ভয়ে সর্বক্ষণ তাঁকে থাকতে হত তটস্থ।

অনেক সময় লুকিয়ে পর্যন্ত থাকতে হত। পাওনাদারের বিড়ম্বনা এড়াতে মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করতেন না তিনি।

একবার তো কিছুদিনের জন্য হাজত বাসও করতে হয়েছিল। অথচ তাঁর সমসাময়িক সমস্ত লেখকের মধ্যে তাঁর আয় ছিল সবচেয়ে বেশি।

যত দিন যাচ্ছিল, ততই বালজাকের লেখার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নিজের চিন্তাভাবনা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আরও মুন্সীয়ানার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারছিলেন। চরিত্র চিত্রণে, বর্ণনায়, সজীবতায় ও সৌন্দর্যে প্রতিটি রচনাই হয়ে উঠছিল অনবদ্য।

বালজাকের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক ও বিশাল। এই অভিজ্ঞতার আলোকেই বিচ্ছুরিত হত তাঁর রচনা।

এই সময় এক অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তিনি। প্যারিসের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জীবন, তাদের বিভিন্নমুখী সমস্যা, অনুভব উপলব্ধি, যা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ্য করেছেন, তাকে উপজীব্য করে ধারাবাহিক উপন্যাসমালা রচনার কাজে হাত দিলেন।

ইটালির মহাকবি দান্তের ডিভাইন কমেডি নামের অনুকরণে তাঁর উপন্যাসের সিরিজের নামকরণও স্থির করলেন—হিউম্যান কমেডি।

এই সিরিজে ১৩৮ খানি উপন্যাসের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি বছরের চেষ্টায় ১৩০টির মতো উপন্যাস সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। আর এই বিশাল সৃষ্টির অন্ততঃ অর্ধেক উপন্যাস উৎকর্ষতার বিচারে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পাবার যোগ্য।

বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন বালজাক। সাহিত্যের আসরে আমৃত্যু তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের আসন অপরিবর্তিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য প্রতিভার এই উত্তরণের পশ্চাৎপটে অবশ্যই ছিল কঠোর নিষ্ঠা, শ্রম ও সাধনা।

হিউম্যান কমেডি উপন্যাসমালার মধ্যে কয়েক হাজার চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর যাদুকরী লেখনীর স্পর্শে প্রতিটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে জীবন্ত। বালজাক নিজের জীবনে চলার পথে, বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন তাদেরই প্রতিচ্ছায়া তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর সাহিত্যে।

তবে সমাজের আলোকিত অংশের তুলনায় অন্ধকারের মানুষেরাই তাঁর সাহিত্যে বেশি স্থান পেয়েছে। তাদের প্রতি তাঁর মমত্ব কোথাও প্রচ্ছন্ন থাকেনি। গ্রাম ও শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব চিত্ররূপ উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। কিন্তু বালজাকের লেখকসত্তা ছিল সত্য ও সুন্দরের পূজারী। তাই অন্যায়কে কোথাও সমর্থন করেননি। সত্য আর ন্যায়ের সৌন্দর্যে মন্ডিত হয়েছে তাঁর হিউম্যান কমেডি।

বালজাক সম্পর্কে জার্মান লেখক স্টিফেন ডুইগ যথার্থই বলেছেন, মনুষ্য চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিধাতার পরেই যে নামটি করতে হয় তা হল, অনর দ্য বালজাক।

বস্তুতঃ বালজাকের সৃষ্টির বিশালত্বের এর চেয়ে বড় ও যথার্থ স্বীকৃতি আর কিছু হতে পারে না।

হিউম্যান কমেডির জনপ্রিয়তা বালজাককে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা এনে দিল। তিনি পেলেন যশ ও অর্থ।

মাদাম বার্নির মৃত্যু বালজাককে উতলা করে তুলেছিল। তাঁর স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয়কে স্নেহ-ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর শূন্যতা পূরণ করবার জন্য একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন বোধ করতে লাগলেন তিনি।

পাঠকদের কাছ থেকে প্রতিদিনই কিছু চিঠি পেতেন বালজাক। প্রধানতঃ মেয়েরাই বেশি চিঠি লিখত।

একদিন একটি চিঠির ভাষার গভীরতা আকর্ষণ করল বালজাককে। গতানুগতিক স্তুতি বা প্রশংসার বাইরেও লেখিকার নিজস্ব কিছু বক্তব্য ছিল তাঁর সাহিত্যে সৃষ্ট নায়িকা চরিত্র সম্পর্কে।

কিন্তু চিঠিতে কোন নাম ঠিকানা ছিল না তাই তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, অপরিচিত এই পাঠিকার কাছ থেকে আবার যদি কোন চিঠি আসে।

এলও একদিন। পত্র লেখিকা বালজাকের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নিজের পরিচয়ও জানালেন।

তাঁর নাম ইভলিনা হসেকা। পোল্যাণ্ডের এক কাউন্টের স্ত্রী। স্বামী অসুস্থ বলে নিঃসঙ্গ। তাই সঙ্গী করে নিয়েছেন দেশ-বিদেশের লেখকদের ভাল ভাল বই। সেই সূত্রেই বালজাককে তাঁর পত্র লেখা।

টানা এক বছর চলল তাঁদের পত্র বিনিময়। চিঠিতেই পরস্পরের প্রতি গড়ে উঠল প্রেম। তারপর একদিন দেখা হল দুজনে।

কিন্তু স্বপ্নের লেখকের চেহারা দেখে হতাশ হলেন সুন্দরী হসেকা। কিন্তু তাঁর আবেগ হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তাই বালজাককে ত্যাগ করতে পারলেন না।

হসেকার স্বামী রয়েছেন। তবুও বালজাক চাইলেন তাঁকে বিয়ে করতে। বুদ্ধিমতি হসেকা সম্মত হতে পারলেন না। তাহলে স্বামীর বিত্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হবে তাঁকে।

বালজাক বুঝতে পারলেন তাঁকে অনেক অর্থ উপার্জন করতে হবে। হসেকাকে পেতে হলে। লেখা থেকে আর্থিক চাহিদা মিটবার নয়।

রাতারাতি অর্থবান হবার আশায় বালজাক সার্ডিয়ার রুপোর খনিতে রুপো তোলার কাজ শুরু করলেন। কিন্তু তাতে পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া গেল না।

অধিকন্তু কঠোর পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। তবুও তিনি হ্সেকাকে পাবার আশা ত্যাগ করতে পারেন না। এভাবে কেটে গেল দশ বছর।

একদিন শুনলেন হ্সেকার স্বামী মারা গিয়েছেন। শুনে আশান্বিত হয়ে উঠলেন বালজাক। ভাবলেন এবারে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হবে।

কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে হ্সেকা কোন আগ্রহ দেখালেন না। কিন্তু স্ত্রীর মতোই বাস করতে লাগলেন বালজাকের সঙ্গে। দুজনে মিলে দেশভ্রমণেও যান। কিন্তু গভীর মনোবেদনায় জর্জরিত হন বালজাক। এত কিছুর পরেও হ্সেকাকে স্ত্রী হিসেবে পেলেন না।

শৃঙ্খলাহীন জীবনের অপচয় বালজাকের শরীর ও মনকে ক্রমশই পঙ্গু করে তুলতে লাগল। তিনি বুঝতে পারছিলেন জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে।

১৮৪৮ খ্রিঃ হ্সেকার এক জন্মদিনে তার বাড়িতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন বালজাক। মাস কয়েক বিছানায় পড়ে থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু দেহের শক্তি ফিরে পেলেন না আগের মতো।

দীর্ঘ ১৮ বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে হ্সেকা বালজাকের বেদনা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের মেয়াদ যে ফুরিয়ে এসেছে তাও জানতেন। কিন্তু স্বামীর বিশাল সম্পত্তির অধিকার ত্যাগ করতেও পারছিলেন না তিনি। তবুও শেষপর্যন্ত বালজাককে বিবাহ করতে রাজি হলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তও স্বার্থমুক্ত ছিল না। অবশিষ্ট জীবন ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ১৮৫০ খ্রিঃ ১৪ মার্চ বালজাককে বিয়ে করলেন হ্সেকা।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে উৎফুল্ল উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন বালজাক। হ্নিমুন সেরে এসে সস্ত্রীক বাস করবেন বলে স্ত্রীর জন্য প্রাসাদের মতো বাড়ি মির্মাণ করলেন তিনি।

কিন্তু গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হ্নিমুন অসমাপ্ত রেখেই নতুন বাড়িতে ফিরে আসতে হল বালজাককে। শয্যা নিলেন। সেই ছিল তাঁর শেষ শয্যা। অনেক আশাই অপূর্ণ থেকে গেল তাঁর।

১৮৫৩ খ্রিঃ ১৭ই আগস্ট জীবনের অন্তিম মুহূর্তে স্নেহময়ী জননীর কথা চিন্তা করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বালজাক।

মিগেল দ্য সার্ভেন্টিস

পঞ্চাশ বছরের এক প্রৌঢ়, তার নাম কুইক্সাডা। সংসারে নিজের বলতে আছে কেবল এক বোন। তাই ঝাড়া হাত-পা। কুইক্সাডার দিন কাটে প্রাচীন নাইটদের বীরত্বের কাহিনী পড়ে।

একদিন সে ঠিক করল, নাইটদের মতোই সে দেশ ভ্রমণে বেরবে। তাই সবার আগে নাম পাল্টে একটা গালভরা নাম নিল ডন কুইক্সোড।

বাড়িতে ছিল একটা বুড়ো ঘোড়া আর কিছু মরচে ধরা পুরনো সৈনিকের পোশাক, বর্ম, বর্শা ইত্যাদি।

সবকিছু জড়ো করে তাপ্পি-তাপ্পা দিয়ে বিচিত্র সাজসজ্জা করে বুড়ো ঘোড়ার পিঠে চেপে একদিন গভীর রাতে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। নিজেকে একজন পুরোদস্তুর নাইট ভেবে সে খুবই আনন্দ পাচ্ছিল।

সারারাত সে পথ চলল। সকাল হলে তার বিচিত্র সাজসজ্জা দেখে লোকজন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। অনেকে ভূত ভেবে ভয়ে পালিয়ে গেল।

সে বইতে পড়েছিল, যেখানে সেখানে বিশ্রাম করা নাইটরা নিরাপদ মনে করত না। তাই সে-ও কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে দিনভর পথ চলল।

এক চাষী শুয়োর চরাচ্ছিল। সন্ধ্যা হলে সে তার শুয়োরগুলোকে জড়ো করবার জন্য শিঙা বাজাতে আরম্ভ করল।

শিঙার শব্দ শুনে ডন কুইক্সোডের মনে হল, আশপাশে নিশ্চয়ই কোন দুর্গ আছে। সেখানকার প্রহরী শিঙা বাজাচ্ছে।

সামনেই পড়ল একটা সরাইখানা। সেটাকে দুর্গ ভেবে সে ঘোড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

গ্রামের দু'টি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে। তাদের দেখে ডন কুইক্সোড ভাবল, মেয়েদের সম্মান জানানো উচিত। কেননা সে বইতে পড়েছিল নাইটরা সব মেয়েদের সম্মান জানায়।

সে ঘোড়া থেকে নেমে মেয়েদের সামনে গিয়ে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, বলুন আপনাদের জন্য আমি কি করতে পারি। কেউ কি আপনাদের মনোকষ্টের কারণ ঘটিয়েছে?

বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত ডন কুইক্সোডের নাটকীয় কথাবার্তা এবং ভাবভঙ্গি দেখে মেয়েরা হাসি সামলাতে পারে না।

সরাইওয়ালা ভাবল লোকটার নিশ্চয় মাথায় গন্ডগোল আছে। তাই তাকে না ঘাঁটিয়ে সে যেমন বলল, তেমনই ব্যবহার করল।

রাত হলে সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ডন কুইক্সোড জেগে রইল। সে বর্শা হাতে সরাইখানা পাহারা দিতে লাগল।

কাছেই একটা কুয়ো ছিল। তার পাশের পথ দিয়ে একদল ফেরিওয়ালা যাচ্ছিল। তাদের একজন ঘোড়ার জন্য জল নিতে এসেছিল কুয়োয়। তাকে দেখে কুইক্সোডের মনে হল এ নিশ্চয়ই দৈত্য। কোনও মতলব নিয়ে এসেছে। কেননা সে বইতে পড়েছে রাতেই আনাগোনা করে দৈত্যদানোর দল। আর সামনে পড়ে গেলে নাইটরা সবিক্রমে তাদের ঘায়েল করে।

কুইক্সোড চুপি চুপি পেছন থেকে লোকটার মাথায় হাঁকড়ালো বর্শার ডান্ডার বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

খানিক পরেই আর একজন ফেরিওয়ালা ঘোড়াকে খাওয়াবার জন্য জল নিতে এলো।

তাকেও দৈত্য ভেবে কুইক্সোড বর্শার খোঁচা মারল। সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওয়ালা চিৎকার জুড়ে দিল। সেই চিৎকার শুনে তার সঙ্গী অন্য ফেরিওয়ালারা ছুটে এলো।

কুইক্সোড ভাবল দুর্গ দখল করার জন্য শত্রু সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সে বর্শা বাগিয়ে তাদের তাড়া করল।

আচমকা আক্রান্ত হয়ে ফেরিওয়ালারাও কুইক্সোডকে লক্ষ্য করে পাথরের টুকরো ছুঁড়তে লাগল।

গোলমাল শুনে ছুটে এলো সরাইওয়ালা। সে দেখল ঢিলের ঘায়ে তার সরাইখানা ভেঙ্গেচুরে তছনচ হবে। তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে শুঝিয়ে দু'পক্ষকে শান্ত করল।

পরদিন সকালে আবার তার ঘোড়ায় চেপে কুইক্সোড চলতে লাগল। সেই পথে যাচ্ছিল একদল বণিক। সে এগিয়ে গিয়ে তাদের পথ অবরোধ করল।

বইতে সে পড়েছিল, প্রাচীনকালে প্রত্যেক নাইটের একজন করে প্রিয় নারী থাকত। কুইক্সোডের তেমন কেউ ছিল না।

তাই সে ভেবে চিন্তে তার গ্রামেরই এক চাষীর মেয়ে ডালসিনিয়াকেই নিজের প্রিয়তম নারী বলে সাব্যস্ত করেছিল।

এখন সে সওদাগরদের বলল, তোমরা স্বীকার করো ডালসিনিয়াই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নারী, না হলে আমার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও।

তার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি আর কথা শুনে মজা পেয়ে সওদাগররা হাসি-মস্করা শুরু করল। অমনি কুইক্সোড তার বর্শা তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বেচারা হাড় জিরজিরে বুড়ো ঘোড়া, কয়েক পা গিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ল। আর তার শরীরের তলায় চাপা পড়ল কুইক্সোড। অনেক চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারল না।

এই কান্ড দেখে সওদাগররা হেসে গড়িয়ে পড়ল। তাদের হাসতে দেখে কুইক্সোড রেগে গালাগাল দিতে শুরু করল। এতে আরও মজা পেয়ে সওদাগররা হাসতে লাগল।

তাদের এক বদরাগী চাকর কিন্তু সহ্য করতে পারল না। সে ছুটে গিয়ে কুইক্সোডকে কিল ঘুসি মেরে আধমরা করে ফেলল।

সেই পথ দিয়ে তখন যাচ্ছিল কুইক্সোডের গ্রামের এক লোক। সে ধরাধরি করে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিল। কিছুদিন বিছানায় পড়ে থেকে কুইক্সোড বোনের সেবা যত্নে একরকম সুস্থ হয়ে উঠল।

কিছুদিন ভালভাবেই কাটল। কিন্তু নাইটের ভূত তখনো তার ঘাড়ে চেপে ছিল। তাই আবার বেরিয়ে পড়বে বলে ঠিক করল।

কুইক্সোড বইতে পড়েছিল নাইটদের সঙ্গে অনুচর থাকত। সে অনুচর পাবে কোথায়? গ্রামের একজন চাষী, তার নাম সাংকো পাঞ্জা। কুইক্সোড তাকে বলল, তুমি আমার অনুচর হয়ে সঙ্গে চলো, তোমাকে আমি একটা দ্বীপের শাসনকর্তা করে দেব।

খুশি হয়ে সাংকো তার সঙ্গ নিল। শুরু হলো তাদের দুজনের অভিযান। সে কাহিনী যেমন মজার তেমনি বেদনার। একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে ঘোর কাটতে থাকে কুইক্সোডের।

একসময় সে উপলব্ধি করতে পারে, এতকাল কল্পনার জগতেই বিচরণ করেছে, বাস্তবের সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধ নেই। কুইক্সোডের শেষ পর্যন্ত সব আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থেকে যায়। আর এই বেদনা নিয়েই এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এই স্বপ্নবিলাসী মানুষটি।

এই কৌতুক-করুণ কাহিনীর রচয়িতা হলেন সার্ভেন্টিস। এমন প্রতীকী রচনা বিশ্ব সাহিত্যের ভান্ডারে খুব কমই আছে। তাই তাঁর ডন কুইক্সোড গ্রন্থটিকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে স্বীকার করা হয়। কয়েক শতাব্দী অতিক্রম করে আজও এই কাহিনীর সমাদর বিন্দুমাত্র কমেনি।

হতাশার বেদনায় দীর্ণ, আজীবন ভাগ্য বিড়ম্বিত সার্ভেন্টিস ডন কুইক্সোড চরিত্র চিত্রণ করেছিলেন যেন নিজেরই জীবনের আদলে। তাঁর জীবন যেন এক বিপদ-করুণ আলেখ্য।

তাঁর সম্পূর্ণ নাম মিগেল দ্য সার্ভেন্টিস। জন্মেছিলেন ১৫৪৭ খ্রিঃ স্পেনের এক দরিদ্র পরিবারে। তিনি ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ সন্তান।

ছেলেবেলা থেকেই সার্ভেটিস ছিলেন কল্পনাবিলাসী। সব সময় নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়েই মগ্ন থাকতেন। তবে চারণকবিদের মুখে অতীত যোদ্ধাদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন।

বীরগাথা শুনতে শুনতে স্বপ্ন দেখতেন, তিনি একদিন বীর নাইটদের মতো অভিযানে বার হবেন।

স্পেন যখন ইহুদি মুরদের কবলমুক্ত হয়ে শক্তিশালী সমৃদ্ধ রাষ্ট্র রূপে গড়ে উঠেছে, স্পেনের গৌরব ঘোষিত হচ্ছে দিকে দিকে, ইতিহাসের সেই গৌরবময় যুগে জন্ম সার্ভেন্টিসের।

ছেলেবেলায় বয়স্কদের মুখে তিনি গল্প শুনতেন, স্পেনের রানী ইসাবেলার বদান্যতায় কী করে কলম্বাস আবিষ্কার করেছেন আমেরিকা মহাদেশ।

রোমাঞ্চিত হতেন যখন শুনতেন, কী অপরিসীম বীরত্বে স্পেনের সেনাবাহিনী আফ্রিকার উপকূলের বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে স্পেন রাষ্ট্রের সীমা বর্ধিত করেছে।

স্বদেশের গৌরবে গৌরবান্বিত উদ্দীপিত বালক সার্ভেন্টিস স্বপ্ন দেখতেন, তিনি নিজেও একদিন দেশে দেশে বিস্তৃত করবেন স্পেনের অধিকার।

সার্ভেন্টিসের বাবা রোদ্রিগো পেশায় ছিলেন ডাক্তার। কিন্তু আয়-রোজগার তেমন হত না। তাই কায়ক্লেশে চলত তাঁর সংসার।

সংসারের অভাব অনটন সত্ত্বেও রোদ্রিগো গ্রামের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন পুত্রকে। কিন্তু সেখানে বেশিদিন পড়াশুনা করার সুযোগ পেলেন না সার্ভেন্টিস।

রোজগারপাতি বাড়াবার উদ্দেশ্যে রোদ্রিগো সপরিবারে উঠে গেলেন অন্য এক শহরে।

কিন্তু মানুষটির ভাগ্য ছিল প্রতিকূল। স্থান পরিবর্তন করেও আর্থিক সমস্যার সুরাহা করতে পারলেন না। আশায় আশায় কিছুকাল এক শহর থেকে আরেক শহরে কেবল ঘুরে বেড়ালেন। শেষ পর্যন্ত মাদ্রিদ শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন।

এই দেশভ্রমণ ভাগ্যের বিরূপতায় ঘটলেও সার্ভেন্টিসের জীবনে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল।

তিনি স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলেন।

মাদ্রিদ ছিল স্পেনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল। তিনি যখন এখানে এলেন তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর।

সাহিত্যপাঠে সার্ভেন্টিসের আগ্রহ ছিল বরাবর। হাতের কাছে যে বই পেতেন আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন।

কবিতা লেখার হাতেখড়িও হয়েছিল কিশোর বয়সেই। এই সূত্রেই পরিচয় হল মাদ্রিদের কয়েকজন তরুণ কবির সঙ্গে।

একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো সার্ভেন্টিসকে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কবিত্বশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁর প্রতি আগ্রহান্বিত হলেন।

তিনি তাঁকে সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দিতেন, পরামর্শ দিতেন। রচনার ভুল ত্রুটি সংশোধন করে দিতেন।

এই সময়ে স্পেনের যুবরাজ কার্লো হঠাৎ মারা গেলেন। সমস্ত দেশ হল শোকাহত। একটি শোকগাথা রচনা করলেন সার্ভেন্টিস। কবিতাটি খুবই প্রশংসিত হল।

এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্থির করলেন সাহিত্য রচনাই হবে তাঁর জীবনের পথ।

কিন্তু অভাবের সংসারে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে নামতে হল। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নগণ্য।

ছোটভাই সৈন্যবিভাগে নাম লিখিয়েছিল। কিন্তু সৈনিকের কাজ সার্ভেন্টিসের পছন্দ ছিল না।

তিনি ভাবতে লাগলেন, কোনওভাবে রাজঅনুগ্রহ লাভ করতে পারলে নিশ্চিন্তে সাহিত্য সাধনা করতে পারবেন।

ততদিনে কবি হিসেবে তিনি সামান্য পরিচিতি লাভ করেছেন।

সেই সময় ইটালিতে নতুন পোপ হলেন জুলিয়া অ্যাকোয়াভাইভা। তিনি ছিলেন শিল্পসাহিত্যেব অনুরাগী। তাই দেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের তাঁর দরবারে যোগদানের জন্য আহ্বান জানালেন।

সার্ভেন্টিস যেন অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো দেখতে পেলেন। একদিন ইউবোপের শ্রেষ্ঠ কবি হবেন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে একদিন তিনি উপস্থিত হলেন পোপের দরবারে।

কিন্তু পোপের দরবারের পরিবেশ দেখে হতাশ হলেন সার্ভেন্টিস। অনুপ্রাণিত হবার মতো সাহিত্য-সংস্কৃতির কোন চর্চা সেখানে নেই।

আছে কেবল তোষামোদ আর চাটুকারিতা। গুণী ও গুণের কথা কেউ মাথায়ও রাখে না।

হতাশ হয়ে পোপের দরবার ত্যাগ করলেন সার্ভেন্টিস। কিন্তু রোজগারের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা তো না করলেই নয়। বাধ্য হয়ে তিনি নাম লেখালেন সেনাবাহিনীতে।

সেই সময় তুর্কীদের সঙ্গে স্পেনের আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনায় সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা হচ্ছিল।

এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন স্পেনের রাজকুমার ডন জুয়ান। তাঁর বাহিনীতে যোগ দিলেন সার্ভেন্টিস।

অনতি বিলম্বেই দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু করল। সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন সার্ভেন্টিস।

ডন জুয়ানের নেতৃত্বে স্পেনের সৈন্যবাহিনী মরণপণ যুদ্ধ করে ধ্বংস করল তুর্কীদের।

সার্ভেন্টিস গুরুতর আহত হলেন এই যুদ্ধে। ফলে তাঁর বাঁ হাতটি চিরতরে অকেজো হয়ে গেল।

তাঁর বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ ডন জুয়ান স্পেনের রাজদরবারে একটি চিঠি লিখে দিলেন যাতে তিনি একটি ভাল চাকরি পান।

সার্ভেন্টিসের ছোট ভাইও সেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সার্ভেন্টিস জাহাজে চড়ে রওনা হলেন স্পেনের পথে।

কিন্তু ভাগ্য ছিল বিরূপ। ইটালি থেকে স্পেনের সমুদ্র পথে কয়েকটি তুর্কী জাহাজের আক্রমণে বিধ্বস্ত হল স্পেনের সেনাদল।

শক্তিশালী তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে যে কয়জন স্পেনের সৈন্য রক্ষা পেল তারা বন্দি হল। বন্দিদের মধ্যে ছিলেন সার্ভেন্টিস ও তাঁর ভাই।

বন্দিদের নিয়ে আসা হল তুর্কী অধিকৃত আলজিয়ার্সে। সেখানে তাদের বন্দি করে রাখা হল একটি ছোট্ট আলো-বাতাসহীন কুঠুরিতে। খাবার দেওয়া হত খুবই সামান্য।

সার্ভেন্টিস বুঝতে পারলেন পালাতে না পারলে এই বন্দিকূপে থেকে তাঁদের মরতে হবে। কিন্তু পালাবার কোন পথই ছিল না।

কিছুদিনের মধ্যেই বন্দিদের বিভিন্ন তুর্কী নেতাদের বাড়িতে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হল।

ফলে অন্ধকূপ থেকে বাইরে আসার সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু সকলকেই বাধ্য করা হল হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে।

ছোট্ট শহর আলজিয়ার্স। সমুদ্র-ঘেরা শহরের চারদিক উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। ওখান থেকে পালাবার কোন পথ নেই।

কিন্তু সার্ভেন্টিস ভাবতে থাকেন, যেমন করে হোক, অতি শীঘ্র এই বন্দিদশা থেকে মুক্ত হতে হবে।

কেবল নিজে মুক্তি পেলেই চলবে না। স্পেনের যেসব অধিবাসী এখানে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করছে, তাদেরও মুক্ত করতে হবে।

বন্দিদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে স্পেনে আত্মীয়-পরিজনের কাছে

খবর পাঠিয়ে মুক্তিপণের ব্যবস্থা করে স্পেনে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দেবার সামর্থ্য বেশির ভাগ মানুষেরই ছিল না। তাই সার্ভেন্টিস মুক্তি পাবার বিকল্প পথের সন্ধান করতে লাগলেন।

সার্ভেন্টিসের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মালিক তাঁকে শহরে ঘোরাফেরা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সার্ভেন্টিস এই সুযোগটাকে কাজে লাগাবেন মনস্থ করলেন।

আলজিয়ার্সের অদূরেই ওরান নামে একটি ছোট শহর ছিল। সেই শহরটি ছিল স্পেনের সেনাবাহিনীর দখলে। কিন্তু দুই শহরের মাঝখানে ছিল দুর্ভেদ্য বিপদ-সঙ্কুল্য অরণ্য।

ওরানে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে পথের বিপদের সম্ভাবনাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করলেন সার্ভেন্টিস। তাঁর মনে হল ক্রীতদাসের ঘৃণ্য জীবন থেকে বন্যজন্তুর হাতে মৃত্যু বরং অনেক সম্মানেব।

কথা বলে কয়েকজন সঙ্গীও জুটিয়ে নিলেন তিনি। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থের লোভ দেখিয়ে একজন মূরকেও রাজি করা হলো।

একদিন রাতের অন্ধকারে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে সার্ভেন্টিস সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

আলজিয়ার্সের সীমা অতিক্রম করে ওরানে পৌঁছবার পথ দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। দুর্ভাগ্য ছিল সার্ভেন্টিসের নিত্যসঙ্গী। তাই জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল তাদের পথপ্রদর্শক। ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগোতে সঙ্গীরা কেউই রাজি হল না।

সার্ভেন্টিস দেখলেন, জঙ্গলের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে ঘোরাঘুরি করলে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে। বরং বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে কোনও এক সময় পালাবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

বাধ্য হয়ে সকলে মিলে ফিরে এলেন আলজিয়ার্সে এবং যথারীতি সামান্য শাস্তিও ভোগ করতে হল।

বাড়ির দৈন্যদশার কথা জানতেন সার্ভেন্টিস। তাঁদের সহায়-সম্বলহীন দুঃখিনী মা সেখানে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করছিলেন। তবুও মুক্তিপণের অর্থের কথা জানিয়ে তিনি স্পেনে মার কাছে চিঠি লিখলেন।

ক্ষীণ একটা আশা ছিল সার্ভেন্টিসের মনে, যদি কোনও ভাবে মা টাকা সংগ্রহ করতে পারেন।

সার্ভেন্টিস গোপনে ডন জুয়ানের কাছেও চিঠি লিখেছিলেন।

ছেলের চিঠি পেয়ে বিধবা মা অস্থির হয়ে নানা জনের কাছে চেয়ে চিন্তে যা সংগ্রহ করতে পারলেন পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু ডন জুয়ানের কাছ থেকে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। অবশ্য ডন জুয়ান সেই সময় নিজেই অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে ছিলেন।

মায়ের পাঠানো যৎসামান্য অর্থে ছোট ভাইয়ের মুক্তির ব্যবস্থা করে সার্ভেন্টিস তাকে স্পেনে পাঠিয়ে দিলেন।

যাওয়ার আগে ভাইকে তিনি বলে দিলেন, স্পেনে তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে গোপনে জাহাজ পাঠিয়ে দিতে। তিনি সেই জাহাজে করে স্পেনে পালিয়ে যেতে পারবেন।

স্পেনে গিয়ে ছোট ভাই সার্ভেন্টিসের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তারপর তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতায় জাহাজ পাঠিয়ে দিল আলজিয়ার্স অভিমুখে।

গোপনে এই খবর পেয়ে সার্ভেন্টিস তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সঙ্কেত স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ এসে নোঙর করল সমুদ্রে, তীর থেকে খানিকটা দূরে। তারপর সকলকে জাহাজে নিয়ে আসার জন্য গোপনে নৌকো নামিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য সার্ভেন্টিসকে অনুসরণ করত পায়ে পায়ে। তাই নৌকো চেপে স্পেনের জাহাজে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের পক্ষে।

একদল জেলে বন্দিদের পালাতে দেখে চিৎকার করতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো প্রহরীরা। ফলে পালাবার সুযোগ হাতের নাগালে এসেও ভাগ্যদোষে ফস্কে গেল।

তাঁদের না নিয়েই জাহাজ ফিরে গেল স্পেনে। আবার কারাগারে বন্দী হতে হল সার্ভেন্টিসকে।

অকথ্য অত্যাচারেও মনোবল হারালেন না তিনি। কিছুদিন পরেই আবার পালাবার পথ খুঁজলেন।

নিজেদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে গোপনে পত্র পাঠালেন ওরানের শাসনকর্তার কাছে।

এক বিশ্বস্ত মূরের হাতে পাঠানো হয়েছিল চিঠিটি। দুর্ভাগ্যক্রমে পথে তুর্কী প্রহরীর হাতে ধরা পড়ল সে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সার্ভেন্টিসের নাম সে প্রকাশ করেনি।

সার্ভেন্টিস পালাবার চেষ্টা আরও কয়েকবার করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়ে মুক্তির আশা ছেড়ে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো জুয়ান গিল নামে এক দয়ালু পাদ্রী এসে বন্দিদের মুক্ত করে নিয়ে যান। নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে তিনি মুক্তিপণের টাকা মিটিয়েছিলেন।

ফাদারের মহানুভবতায় দশ বছর পরে কারগারের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে মাতৃভূমি স্পেনে ফিরে এলেন সার্ভেন্টিস।

স্পেনের হয়ে যুদ্ধে গিয়ে অশেষ দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল তাঁকে। এই স্বার্থত্যাগের জন্য রাজসরকারের কাছ থেকে সামান্যতম মর্যাদাও দেখানো হয়নি তাঁকে।

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটতে লাগল। এই দুঃসময়ে এককালের সঙ্গী বন্ধুরা কেউই মুখ ফিরে তাকায় নি। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন অর্থ মানুষের মনুষ্যত্বকে হরণ করে।

বিত্তবান মানুষ নিজের মাকেও প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করে না। জীবনের এই নির্মম অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁর ডন কুইক্সোড বইতে পরে সবিস্তারে লিখেছেন।

নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে কয়েকমাস ধরে চেষ্টা করেও কোনও চাকরি জোটাতে পারলেন না সার্ভেন্টিস। নিঃসঙ্গ দিনগুলো ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। কি করবেন ভাবছেন।

এক সময় মনে পড়ল, লেখার হাতটা ভালই ছিল। এবার আবার কলম ধরলে কেমন হয়।

নতুন লেখার ভাবনা নিয়ে বসেও গেলেন একদিন। গদ্য পদ্য যা লিখতেন এসময়, পরিচিত কবি নাট্যকারদের তা পড়ে শোনাতেন।

তাঁদের নিন্দা প্রশংসায় কখনও হতাশ হতেন, কখনও হতেন উল্লসিত তবে সংকল্পচ্যুত হননি।

এভাবেই এক বছরের চেষ্টায় গদ্য-পদ্যে লেখা লা গ্যালাটিয়া শেষ করলেন। এই বই প্রকাশিত হল ১৫৮৪ খ্রিঃ। কিন্তু কোনওরকম সাড়া জাগাতে পারল না।

এই সময় ক্যাটালিনা নামে এক তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হন সার্ভেন্টিস। তাঁর ছোটবোনের শ্বশুরবাড়ির গ্রামের জমিদার তিনি।

ভাগ্যের এমনই রসিকতা যে সহায় সম্বলহীন সার্ভেন্টিসকেই পছন্দ করে বিয়ে করে ফেললেন ক্যাটালিনা।

এই অসম বিবাহের ফলে সাময়িকভাবে অর্থকষ্ট দূর হল সার্ভেন্টিসের। কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হল না এই বিবাহবন্ধন।

দুজনের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অচিরেই দুজনকে দূরে সরিয়ে দিল। সার্ভেন্টিস ফিরে এলেন মাদ্রিদে।

আবার দারিদ্র্য ও হতাশার অনিশ্চিত জীবন। কিন্তু মনের বল হারালেন না সার্ভেন্টিস।

সেই সময় নির্মম নিয়তির আকস্মিক একঝলক হাসির মতোই যেন এক নাট্য প্রতিযোগিতায় সার্ভেন্টিসের নাটক প্রথম স্থান পেয়ে গেল।

স্পেনের কয়েকটি নাট্যমঞ্চের তরফে সর্বসাধারণের জন্য এই প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল। সার্ভেন্টিস স্বদেশের বীরদের সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছিলেন নাটকটি।

অভাবনীয় ছিল এই সাফল্য। উৎসাহিত হয়ে নাটক রচনায় ঝুঁকলেন সার্ভেন্টিস। মঞ্চস্থ হতে লাগল তাঁর নাটক। লেখক হিসাবে খ্যাতি পেলেন। কিন্তু জনগণের মনোরঞ্জন করতে পারলেন না।

তাঁর নাটকের নীতিপ্রধান গল্প সেইকালের আমোদপ্রিয় জনগণকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হল।

নাটক লেখায় ইস্তফা দিয়ে এই সময় বেঁচে থাকার জন্য একটা চাকরি নিলেন। নৌবাহিনীর কাজ, গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কেনার চাকরি। মাইনে মনমতো না হলেও অনেকটাই স্বস্তি পেলেন সার্ভেন্টিস।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাড়া করেই ফিরছিল তাঁকে। জীবনে শান্তি স্বস্তি কোনও দিনই স্থায়ী হয়নি তাঁর।

নতুন এই চাকরিতেও কিছুদিন পরেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, তিনি কম দামে কেনা বাড়তি শস্য বেশি দামে বাজারে বিক্রি করছেন।

স্পেনের অন্ধকার কারাগারে কয়েকমাস কাটাতে হল সার্ভেন্টিসকে। তবে অচিরেই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে তিনি মুক্তি পেলেন।

এরপর এক বন্ধুর যোগাযোগে খাজনা আদায়ের কাজ নিলেন। এই কাজে তাঁকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে হত।

এই সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ও চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয় তাঁর। পরবর্তীকালে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা তিনি রূপায়িত করেছেন।

ভাগ্যের বিরূপতায় এখানেও হিসাব গরমিলের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হল। ভাগ্যে জুটল কারাবাস।

এই দফায় কারাকক্ষের নির্জতায় বসে সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকে নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে লিখতে বসলেন। বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ডনকুইক্সোড রচনার সূত্রপাত হল এভাবে।

এই রচনা সম্পূর্ণ করতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল তাঁর। হাস্যরস আর কৌতুক মিশিয়ে বিচিত্র এক চরিত্রকে নিয়ে শ্লেষাত্মক কিন্তু বেদনাঘন কাহিনী রচনা করেছেন সার্ভেন্টিস।

এই সরস রচনা কেবল তাঁর সমকালের মানুষেরই মন জয় করেনি। শত শত বছর পরে আজও সব মানুষের কাছেই সমাদৃত।

সার্ভেন্টিসের ডনকুইক্সোড সব যুগের সব কালের শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যসৃষ্টি। এই রচনায় তিনি দুর্ভাগ্য লাঞ্ছিত যে রূপক চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন সে যেন তাঁরই আশাহত জীবনের প্রতিরূপ।

বিশ্বসাহিত্যের বহু মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির মতো ডনকুইক্সেডের আত্মপ্রকাশও নির্বিঘ্ন ছিল না।

কোন প্রকাশকই বইটি প্রথমে ছাপাতে রাজি হয়নি। অনেক ঘোরাঘুরির পর দয়াপরবশ এক প্রকাশক যদিও বা বই প্রকাশে রাজি হলেন, লেখকের ভাগ্যে জুটল নামমাত্র অর্থ।

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইনজিনিয়াস ডন কুইক্সোড দ্য লা মাঞ্চা নামে ১৬০৫ খ্রিঃ সার্ভেন্টিসের বই ছাপা হয়ে বেরল।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ে গেল। হু হু করে বিক্রি হতে লাগল বই। তবে লেখক হিসেবে আর এক পয়সাও জোটেনি সার্ভেন্টিসের কপালে, যা পেয়েছিলেন প্রথমেই।

এমন একটা পাঠকসমাদৃত বই লিখেও দারিদ্র্য ঘুচল না হতভাগ্য লেখকের। উপেক্ষিত হলেন তিনি সরকার থেকেও।

এমনই দুর্ভাগ্য যে, সার্ভেন্টিসের এই মহান সৃষ্টিকে তাঁর দেশের মানুষও উপেক্ষা করেছে।

এই পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ার মুখেও সার্ভেন্টিস তাঁর লেখা বন্ধ করেননি।

ডনকুইক্সোডের পর লিখেছেন এগজেমপ্লারি টেলস, জার্নি টু পার্নাসাস, পার্সাইলস অ্যান্ড সিগিসমুণ্ডা। কিন্তু এসব কোন রচনাতেই তাঁর প্রতিভার বিশেষ পরিচয় ছিল না।

উপর্যুপরি ভাগ্যের বিপর্যয়ে সার্ভেন্টিসের শরীর মন দুইই ভেঙ্গে পড়েছিল। চরম দরিদ্র দশার মধ্যে ছোট বোন মারা গেলেন। তাঁকে সমাহিত করার জন্য ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয় তাঁকে।

সেই সময়েই ভাগ্যের চক্রান্তে আবার কারাবন্দি হতে হয় তাঁকে।

তাঁর কাছে এসে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল ছুরিকাহত এক যুবক। সার্ভেন্টিস তাকে ঘরে নিয়ে সেবা শুশ্রূষা করেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুবকটি মারা গেল। খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হলেন সার্ভেন্টিস। কয়েকমাস পরে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় ছাড়া পান।

আজীবন দুর্ভাগ্যের শিকার সার্ভেন্টিস জীবনের অন্তিম লগ্নে অসুস্থ অবস্থায়

লেখেন ডনকুইক্সোডের দ্বিতীয় পর্ব। সেটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর একবছর আগে ১৬১৫ খ্রিঃ।

তাঁর নিজের দেশের মানুষ জীবিতকালে সার্ভেন্টিসকে মর্যাদা দেয়নি। কিন্তু বিদেশের মানুষ একজন মহান সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে তাঁর প্রতিভাকে পরম শ্রদ্ধায় বরণ করে নিয়েছিল।

একবার ডনকুইক্সোড পড়ে ফ্রান্সের রাজদূত এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য মাদ্রিদে দরিদ্র সার্ভেন্টিসের বাড়িতে উপস্থিত হন।

তাঁর দরিদ্রদশা দেখে অভিভূত রাজদূত বলেন, এমন মহান সৃষ্টির জন্যই ঈশ্বর আপনাকে এরূপ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রেখেছেন। আপনার দারিদ্র্য বিশ্বের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে।

ডনকুইক্সোডের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের কিছুদিন পরে ১৬১৬ খ্রিঃ ২৩ এপ্রিল একজন অতি সাধারণ মানুষের মতোই অবজ্ঞাত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সার্ভেন্টিস।

জীবনযুদ্ধে হতমান প্রতিভাবান এই মানুষটিকে মহাকাল কিন্তু অবহেলা করতে পারেনি। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন সার্ভেন্টিস।

ক্যাপ্টেন জেমস কুক

দুঃসাহসিক অভিযান ও আবিষ্কারের ইতিহাসে ক্যাপ্টেন জেমস কুক একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম। তিনি ছিলেন অ্যান্টার্কটিক অভিযানেব উদ্যোক্তা-নায়ক এবং নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া—এই দুই ভূখণ্ডকে আবিষ্কার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

জেমস কুকের জন্ম ক্লীভল্যান্ডে ১৭২৮ খ্রিঃ ২৮শে অক্টোবর। অতি সাধারণ এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। ছেলেবেলায় তাঁর গ্রামেরই একটা খামারে কাজ করতেন।

বছর বারো বয়সেই কুককে শিক্ষানবিসীর জন্য পাঠানো হয়েছিল একটি মনোহারি দোকানে।

এখানে দোকান ঝাঁট দেওয়া থেকে আরশোলা মারা পর্যন্ত যেসব কাজ তাঁকে করতে হতো, তার মধ্যে কোন আকর্ষণ খুঁজে পেতেন না তিনি।

তাই সুযোগ পেলেই দোকানের মালিকের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হতেন বন্দরে নাবিকদের আড্ডায়।

সেখানে তাদের মুখে দুঃসাহসিক সব সমুদ্র অভিযানের কাহিনী, জলদস্যুদের রোমহর্ষক গল্প, নতুন নতুন দেশ ও মানুষজনের গল্প শোনো যেত। কুক্ অবাক হয়ে সেসব কাহিনী-গল্প শুনতেন।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ডাকাবুকো স্বভাবের। সাহস আর তেজের দরকার এমন সব কাজের দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক।

সমুদ্রচর মানুষদের মুখে সমুদ্রের গল্প শুনে শুনে একদিন কিশোর কুক মনস্থির করে ফেললেন, তিনিও নাবিক হবেন। দেশ-বিদেশ পাড়ি দেবেন, দেখবেন নতুন নতুন মানুষজন।

অজ্ঞাত স্বপ্নময় জগতের নিঃশব্দ হাতছানিতে সাড়া দিতে দেরি হল না তাঁর। একদিন দু-চারখানা দরকারি জিনিস এবং দোকানের তহবিল থেকে একখানা শিলিং চুরি করে হুইটবিতে হাজির হলেন।

তারপর ওয়াকার নামের এক কয়লার জাহাজে শিক্ষানবিসের কাজ নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লেন।

সেই যে বেরুলেন তারপর থেকে বিভিন্ন জাহাজে নাবিকের জীবনেই কাটিয়ে দিলেন টানা পনেরোটা বছর। ঘুরে বেড়ালেন নরওয়ে এবং বাল্টিক সাগরের বন্দরে বন্দরে।

সাত্তাশ বছর বয়সে সাধারণ নাবিকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কাজ থেকে তাঁর পদোন্নতি হল সারেঙের সম্মানজনক পদে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উপকূলবাহী জাহাজের চাকরি ছেড়ে তিনি যোগ দিলেন রয়্যাল নেভিতে।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কষ্টসাধ্য একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে। কানাডায় গিয়ে সেন্ট লরেন্স দ্বীপ জরিপের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

এই কাজে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি ছিল। যে কোন মুহূর্তে ভারতীয় ও ফরাসী টহলদারী জাহাজের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সব জেনেশুনেই সানন্দে কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তিনি।

এই কাজে থাকার সময়েই কুক কুইবেক থেকে সমুদ্রাভিমুখী নদীর একটা নক্সা তৈরি করলেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই নক্সা ব্রিটিশ নৌবহরের যথেষ্ট উপকারে এসেছিল।

১৭৬২ খ্রিঃ কুক এলেন নিউফাউন্ডল্যান্ড-এর উপকূলে। এখানেও কয়েকটি মানচিত্রের কাজ করে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করলেন।

নিউফাউন্ডল্যান্ড ও ল্যাব্রাডার উপকূলভাগ জরিপের কাজ সম্পূর্ণ হলে একজন দক্ষ মানচিত্রকার হিসেবে কুক নৌসেনাপতির দপ্তর এবং রয়্যাল সোসাইটির প্রশংসা অর্জন করলেন।

এতকাল তিনি ছিলেন একজন দক্ষ নাবিক। ১৭৬৬ খ্রিঃ পর থেকে একজন জরিপ বিশেষজ্ঞ এবং গণিত বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল।

অল্প সময়ের মধ্যেই কুকের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। রাষ্ট্রীয় নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক বিশেষজ্ঞরা তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও গণিত প্রতিভাকে দক্ষিণ সাগর অভিযানের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার মনস্থ করলেন।

বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে কিশোর বয়স থেকেই গভীর আগ্রহ বোধ করতেন কুক।

জরিপের কাজে এসে সখ করে নানা বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে গবেষণার অভ্যাসকে আরও দুরস্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৭৬৬ খ্রিঃ আগস্ট মাসের সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে তিনি যে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

তাই সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁকে দক্ষিণ সাগর অভিযানের সঙ্গে পাঠানো হল।

এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ছিল টেরা অস্ট্রেলিস ভূভাগকে ব্রিটিশ অধিকারে আনা। ইতিপূর্বে বহু নাবিক ও ভৌগোলিক একই উদ্দেশ্যে দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান করেছিলেন।

কুকের ওপরে তাঁর ওপরওয়ালাদের নির্দেশ ছিল, টেরা অস্ট্রেলিস নামের মহাদেশের প্রকৃতই কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা তা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তার সন্ধান পাওয়া গেলে অবস্থান ও বিস্তৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে।

দক্ষিণ সাগরের অভিযান ছিল বিপদসঙ্কুল। সবকিছু অবহেলা করেই বিগত দুই শতাব্দী ধরে বিভিন্ন অভিযাত্রী ছুটে এসেছেন পৃথিবীর এই প্রান্তে। লোকমুখে প্রচারিত ছিল দক্ষিণাঞ্চলের এই মহাদেশে পথেঘাটে পড়ে থাকে তাল তাল সোনা রুপো।

বস্তুতঃ এই বিপুল সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যেই সকল বিপদ বাধা তুচ্ছ করে অভিযানের পর অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা।

এই ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগী ছিল স্প্যানিশ, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ নাবিকেরা। কিন্তু কেউই সফল হতে পারেনি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছিল মধ্য-প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলের বিস্তৃত পাথুরে উপকূলে।

সেইকালে যারা মানচিত্র প্রস্তুত করতেন, নাবিকদের কাছে শোনা নানান অদ্ভুত গল্প থেকে তাঁদের ধারণা হয়েছিল, দক্ষিণ অঞ্চলের প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই ছিল কল্পিত মহাদেশ টেরা অস্ট্রেলিসের এক একটি অংশ।

অবশ্য ১৬০৫ খ্রিঃ এক স্প্যানিস নাবিক, দ্য টোরেস, প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, নিউ গায়না, ওই কল্পিত মহাদেশের অংশ নয়।

তিনি সেখানে যে প্রণালীগুলো আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলোর নামকরণ নিজের নামেই করেছিলেন।

কিন্তু ওই স্প্যানিস নাবিকের আবিষ্কার এক শতাব্দী পর্যন্ত অজানাই থেকে গিয়েছিল। ফলে একটি দ্বীপ হিসেবে নিউ গায়নার আবিষ্কারক হিসেবে উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ের নামে এক অভিযাত্রীর নামই সকলে জানত।

ব্রিটিশ সরকারও সেই কারণে দক্ষিণের মহাদেশটি আবিষ্কারের দায়িত্ব ড্যাম্পিয়েরকেই অর্পণ করেছিল।

কিন্তু ড্যাম্পিয়ের প্রকৃতই অকর্মণ্য। তাই তার অভিযানের ফলাফল প্রকৃত উদ্দেশ্যের ওপরে কোন আলোকপাতই করতে পারেনি।

ড্যাম্পিয়েরের জাহাজ, যে অংশ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া নামে পরিচিত, তার পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছিল। ফলে তাঁর রিপোর্টে ড্যাম্পিয়ের জানিয়েছিল, এখানকার উপকূলভাগ নিতান্তই আকর্ষণহীন এবং এখানে বাস করে একদল অসভ্য বন্য লোক।

১৬৪২ খ্রিঃ ট্যসম্যান নামে এক ওলন্দাজ কল্পিত মহাদেশটির সন্ধানে বাটাভিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পথ ধরে যাত্রা শুরু করেছিল।

এই অভিযানে সে তাসমানিয়া এবং নিউজিল্যান্ড অঞ্চল দুটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল।

এর ফলে এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে নিউ গায়না ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তরের উপকূল অংশগুলি ওই মহাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় উপদ্বীপ নয়।

এত কিছুর পরেও কিন্তু ট্যসম্যানের অভিযান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার চারপাশ ঘিরে ঘুরপাক খেয়েও ভূখন্ডটির প্রকৃত অবস্থান সনাক্ত করতে পারেনি।

দক্ষিণ সাগরে অভিযানের দায়িত্ব পেয়ে লেফট্যানেন্ট কুক তাঁর পূর্বসূরীদের অভিযানের ইতিহাস খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন, যদি সঠিক কোন পথের হদিশ পাওয়া যায়।

কিন্তু সেসব থেকে তিনি কোন সাহায্য পেলেন না।

অবশেষে ১৭৬৮ খ্রিঃ ২৫শে আগস্ট ত্রিশজনের একটি দল নিয়ে অভিযানে রওনা হলেন।

তাঁর দলে ছিল একদল বিজ্ঞানী এবং স্বনামধন্য স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস। তিনশো সত্তর টন ওজনের যে জাহাজে দলটি যাত্রা করেছিল তার নাম ছিল এপ্‌ডিভার। অভিযানের মেয়াদ ছিল তিন বছর।

এই সময়ের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে কল্পিত মহাদেশের নির্ভুল অবস্থান নিরূপণ করতে হবে।

কুক তাঁর জাহাজ নিয়ে তাহিতি পৌঁছলেন ১৭৬৯ খ্রিঃ বসন্তকালে। সেখানে জুন মাসের ৩ তারিখ শুক্র গ্রহের গমন পথের সন্ধান পেলেন।

বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ নিয়ে যখন ব্যস্ত ছিলেন, সেই অবসরে কিছু নাবিক জাহাজের গুদাম ঘর থেকে বড় আকারের বেশ কিছু পেরেক সরিয়ে ফেলেছিল।

এই পেরেকগুলি চুরি করা হয়েছিল দ্বীপবাসীদের কাছে অস্ত্র হিসেবে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে।

সৌভাগ্যক্রমে দুর্বৃত্তদের একজন কুকের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল সাতটা পেরেক।

শৃঙ্খলাপরায়ণ কুকের নির্দেশে ওই নাবিককে চুরির অপরাধের শাস্তি হিসেবে কুড়ি ঘা বেত মারা হল।

তাহিতি থেকে কুক যাত্রা করলেন অজানা মহাদেশের উদ্দেশ্যে। দক্ষিণদিক দিয়ে যাত্রা করে সোসাইটি আইল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে এক সময় তিনি এসে পৌঁছলেন নিউজিল্যান্ডে।

কিন্তু সমগ্র উপকূলভাগ জুড়ে তীরে অবতরণ করার উপযুক্ত কোন জায়গা তাঁরা পেলেন না। ফলে ছ'সপ্তাহ ধরে জাহাজেই আবদ্ধ থাকতে হল।

শেষ পর্যন্ত একটা দিক সুগম করে তাঁরা তীরে নেমে এলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা দেখলেন সর্বাঙ্গে উলকি আঁকা ভীষণাকৃতির স্থানীয় মানুষ দলে দলে তাঁদের দিকে ছুটে আসছে।

স্থানীয় লোকদের সকলেই ছিল মাওলি যোদ্ধা। কুক বন্ধুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত করে এবং উপহার সামগ্রি প্রদান করে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেন।

কিন্তু সাময়িকভাবে জঙ্গলের আদিম মানবেরা অভিযাত্রীদের কোনও ক্ষতি না করলেও দ্বীপের অভ্যন্তরে গিয়ে তাঁদের অনুসন্ধানের কাজে আপত্তি প্রকাশ করল। কুকও তাদের অসন্তোষের কোন কারণ ঘটালেন না।

এরপর সেখান থেকে জলপথে তিনি উত্তর ও দক্ষিণের দ্বীপগুলোকে প্রদক্ষিণ করে চললেন। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ করলেন তাদের জরিপের কাজ।

দ্বীপ মধ্যবর্তী প্রণালীগুলোর ওপরেই কুকের বিশেষ মনোযোগ ছিল। যাতে সেগুলো সম্পর্কে তথ্যের কোন ত্রুটি না থাকে। এই প্রণালীগুলো বর্তমানে তাঁরই নামে পরিচিত।

এক সময় কুক পদার্পণ করলেন কুইন সারটল্‌স গ্রাউন্ড নামে জঙ্গলাকীর্ণ

দ্বীপে। কিছুটা জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে মাটিতে পুঁতলেন একটা বিশাল মাস্তুল।

মাস্তুলের মাথায় ওড়ানো হলো ইউনিয়ন জ্যাক।

সঙ্গীসাথীদের জয়ধ্বনির মধ্যে কুক ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিয়ে ঘোষণা করলেন, মহামান্য সম্রাট তৃতীয় জর্জের নামে এই দ্বীপ অঞ্চলের অধিকার নেওয়া হল।

এরপর নিউজিল্যান্ড পরিত্যাগ করে আবার সমুদ্রে ভাসল এনডিভার। নব্বই দিন টানা চলার পরে অদূরে স্থলভাগের চিহ্ন অভিযাত্রীদের নজরে এলো।

বস্তুতঃ এইভাবেই মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া সর্বপ্রথম বাইরের জগতের মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। অবশ্য তখন এই দ্বীপ মহাদেশ নিউ হল্যান্ড নামে পরিচিত ছিল।

কুক সেই অজ্ঞাত ভূ-খন্ডের পূর্ব উপকূল ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন। এই সময় তিনি ওই অঞ্চলের একটা সামুদ্রিক মানচিত্রও তৈরি করে ফেললেন।

এই নতুন মহাদেশে যে স্থানে কুক প্রথম পদার্পণ করেছিলেন তার নামকরণ করেছিলেন নিউ সাউথ ওয়েলস। সেখান থেকে সরাসরি অগ্রসর হয়ে তিনি পৌঁছলেন ট্রাইবিউলেশন অন্তরীপে।

এখানে আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় খুবই বিপন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। মূল ভূখন্ড থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এক ডুবো পাহাড়ে আটকে গেল এনডিভার জাহাজ। অনেক চেষ্টা করেও যখন জাহাজকে নাড়ানো গেল না তখন বাধ্য হয়ে তিনি নাবিকদের নির্দেশ দিলেন অনাবশ্যক এবং বাড়তি জিনিস জাহাজ থেকে জলে ফেলে দেবার জন্য।

সকলের সমবেত অমানুষিক চেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত জলযানটিকে মুক্ত করে সেযাত্রা সদলবলে রক্ষা পেলেন।

যে উদ্দেশ্যে কুককে দক্ষিণ সমুদ্রে পাঠানো হয়েছিল, অপরিসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সাহসিকতার বলে সেই কাজ সফল করেন তিনি।

নতুন মহাদেশ অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান ও পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহের পরে কুক তাঁর দলবল নিয়ে সেখানকার মাটিতে একটি ছোটখাটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

সেখানে রাজা তৃতীয় জর্জের নামে সমগ্র পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন এবং প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে ইউনিয়ান জ্যাক উত্তোলন করলেন। জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানিয়ে বন্দুক থেকে তিনবার গুলি ছোঁড়া হয়, জাহাজের গোলন্দাজরাও ছোঁড়ে তিন রাউন্ড গুলি।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল একবিন্দু রক্তপাত

ছাড়াই বিশাল এক মহাদেশ সামান্য এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

ইতিপূর্বে টোরেট এবং ড্যাম্পিয়রের যে সমস্ত প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন, কুক সেই পথ ধরে নিউ গায়নার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে স্বদেশের পথে রওনা হলেন।

দক্ষিণ সাগরের তথাকথিত বিখ্যাত ভূখন্ড সম্পর্কে তাঁর প্রথম অভিযানে কুক যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন তা হল, অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাব্য অবস্থান নির্ণয়।

কিন্তু তার সম্পূর্ণ সীমানা নির্ধারণ এবং অন্যান্য সব সমস্যাই অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল।

তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ অবিলম্বেই কুক উন্নীত হলেন কমান্ডার পদে। তারপর দ্বিতীয় দফায় তিনি অভিযানে রওনা হলেন প্লাইমাউথ থেকে ১৭৭২ খ্রিঃ ১৩ জুলাই।

এবারে এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল পৌরাণিক মহাদেশ নামে পরিচিত এক ভূখন্ডের সন্ধান করা। তাঁর সঙ্গে ছিল রেজলিউশন ও অ্যাডভেঞ্চার নামে দুটি জাহাজ এবং একশো তিরানব্বই জন নাবিক।

কুক এগিয়ে চললেন উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে। সেখান থেকে তাঁর জাহাজ মোড় নিল দক্ষিণ-পূর্ব পথ ধরে অ্যান্টার্কটিক সার্কল-এর দিকে।

পথের বাধা কিছু এবারেও কম ছিল না তাঁর। বড় বড় বরফের চাঁইয়ের দ্বারা তাঁর গতি বিঘ্নিত হয়েছে বারবার। কিন্তু তাতে তিনি উদ্যম হারালেন না। পূর্বাপর সমান উৎসাহে ওঠা-নামা করে নিষ্ঠাভরে কাজ করে গেলেন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে।

সমুদ্রে ডুবো পাহাড়ও ভাসমান বরফের চাঁই কোনও কিছুই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

কিন্তু বিপদ একসময় ঠিক উপস্থিত হল। তবে অন্য পথে। অ্যান্টার্কটিকের বিপজ্জনক কুয়াশার আস্তরণ একসময়ে অভিযাত্রীদের রেজলিউশন ও অ্যাডভেঞ্চার নামের জাহাজ দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

রেজলিউশন জাহাজটিকে নিয়ে কুক অতি কষ্টে চৌদ্দ হাজার মাইল জলপথ পরিভ্রমণ করে একসময় এসে পৌঁছলেন ডাস্কি বে বন্দরে।

জাহাজের মেরামতিও দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই রেজলিউশনকে সেখানে রেখে তিনি বেরলেন দ্বিতীয় জাহাজটির সন্ধানে।

কুইন সারলটস সাউন্ড নামে এক উষ্ণ দ্বীপে এসে অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান পেলেন তিনি।

এই ভূখন্ডের মানুষ ছিল বর্বর উপজাতির লোক। শ্বেতকায় মানুষ তারা আগে কখনও দেখেনি।

কিন্তু একখন্ড অলিভ গাছের ডাল হাতে নিয়ে কুক নির্বিঘ্নে তাদের মধ্যে নেমে তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন।

নতুন এই ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে কুক বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সমুদ্রের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দ্বীপ।

সবুজ গাছপালায় ঘেরা প্রতিটি দ্বীপেই রয়েছে মানুষের বসতি। তাদের আচরণ ও জীবনযাত্রা বড়ই অদ্ভুত।

তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে চলতে গিয়ে বহুবার তাঁকে সম্মুখীন হতে হয়েছে জীবন সংশয়কর পরিস্থিতির।

কিন্তু প্রবল মনোবল ও বুদ্ধিবলের সহায়তায় প্রতিবারেই তিনি বিপদ অতিক্রম করে নিজেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বিপদ বাধাকে তুচ্ছ করে অজানা সব বিস্ময়ঘেরা পথ অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে একসময় তিনি নিউ জেব্রাইডিস দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করলেন এবং মার্সিসাস এবং টংগা দ্বীপের অবস্থান নির্ণয় করলেন।

একে একে তিনি নিউ ক্যালেডোনিয়া, নরফোক এবং পাইনস দ্বীপ আবিষ্কার সম্পূর্ণ করে দক্ষিণ আটলান্টিকের পথ ধরে উত্তমাশা অন্তরীপ এবং আফ্রিকার উপকূল ছুঁয়ে ফিরে এলেন প্লাইমাউথে।

সময়টা ছিল ১৭৭৫ খ্রিঃ ২৫ জুলাই।

কুক-এর তিন বছরব্যাপী দ্বিতীয় অভিযান নানা দিক থেকেই ছিল উল্লেখযোগ্য। এই সময়কালে সর্বমোট ষাট হাজার মাইল জলপথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় জাহাজের একটি মাত্র লোক ব্যাধিতে আক্রন্ত হয়ে মারা গিয়েছিল।

কুক-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য এটাই যে সেকালের জাহাজী জীবনে মারাত্মক স্কার্ভিরোগের ব্যাপক প্রকোপ সত্ত্বেও তিনি তাঁর সহযাত্রীদের নিরাপদ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মাত্র কয়েক বছর আগেই কানাডায় ফরাসীদের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযানে কুক অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

সেই সময়ে আটলান্টিকের বুকেই দুরন্ত স্কার্ভির আক্রমণে তাঁদের বহরের প্রায় অর্ধেক লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

সেই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় সমুদ্র অভিযানে জাহাজের লোকজনকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করেছিল।

সেবার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, লবনজারিত শুওরের মাংস ও বিস্কুট থেকে রোগটি জাহাজে ছড়িয়েছিল। সমুদ্রে দুষ্প্রাপ্য কাঁচা সবজি ও ফল রোগের সফল

প্রতিষেধকের কাজ করেছিল।

সেই অভিজ্ঞতা থেকে রোগটির অন্যতম প্রতিষেধক হিসাবে কুক নিজের উদ্ভাবিত একটি মিশ্র খাদ্য ব্যবহার করে যথেষ্ট সুফল পেয়েছিলেন।

গাজরের নির্যাস, লবণ সিক্ত কুচো বাঁধাকপি, স্কার্ভিঘাস ও লেবুর সিরাপের সঙ্গে নানান সব্জীর ঝোল মিশিয়ে তিনি একটি বহনযোগ্য মিশ্রণ খাদ্য হিসেবে চালু করেছিলেন।

অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে অবশ্য পালনীয় স্বাস্থ্যসচেতক কয়েকটি নিয়মও তিনি জাহাজে চালু করেছিলেন যার ফলে নাবিকদের চিরাচরিত অভ্যাসের মধ্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

তিনি বাধ্যতামূলক নিয়ম করেছিলেন, প্রত্যেককে তার বাসস্থান ও বিছানাপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, জাহাজ বন্দরে থাকাকালীন নিয়মিত স্নান করতে হবে।

স্বাস্থ্য সচেতক এই নির্দেশিকার ছাপানো কাগজ পরে যখন তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে বিলি করেন, তাঁরা তাঁর সাফল্যকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান। তিনি লাভ করেন কেপলি মেডেল পুরস্কার।

স্কার্ভির আক্রমণ প্রতিরোধের পন্থা উদ্ভাবনের কৃতিত্ব ছাড়াও স্কট-এর দ্বিতীয় অভিযানের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি সঠিক ভৌগোলিক ধারণা পাওয়া গিয়েছিল।

তাঁর অঙ্কিত মানচিত্র বর্তমান সময়েও প্রায় একই রয়ে গেছে। আধুনিক মানচিত্রকারেরা তাঁর মানচিত্রই অনুসরণ করছেন। মেরু অভিযাত্রীদের কাছেও তাঁর অ্যান্টার্কটিকার বরফ অঞ্চলের রূপরেখা ও পরিসংখ্যান গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

রয়্যাল সোসাইটি কুক-এর কাজের স্বীকৃতি জানিয়েছিল তাঁকে তাদের সদস্যপদে মনোনীত করে। তাছাড়া তিনি পেয়েছিলেন গ্রীনউইচ হাসপাতালের সম্মানীয় ক্যাপ্টেন পদ।

দ্বিতীয় অভিযানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কুক তৃতীয় একটি অভিযানের পরিকল্পনা নেন এবং সেটিই ছিল তাঁর শেষ সমুদ্র অভিযান।

উত্তর-পশ্চিমে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যে সমুদ্র পথটি যুগ যুগ ধরে দুঃসাহসিক নাবিক ও অভিযাত্রীদের আকর্ষণ করেছে, সেই পথ জানা ও প্রশান্ত মহাসাগরের অজানা দ্বীপ অবিষ্কার করা, এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্কট তাঁর তৃতীয় অভিযান শুরু করলেন।

এই যাত্রায় কুক তাঁর যাত্রা শুরু করলেন পশ্চিম দিক থেকে অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর থেকে।

১৭৭৬ খ্রিঃ ২৫ জুন রেজলিউশন ও ডিসকভারি নামের জাহাজ দুটি অভিযাত্রীদের নিয়ে জলে ভাসল।

নোর থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ ছুঁয়ে তিনি প্রথমে গেলেন তাসমানিয়ায়। তারপর নিউজিল্যান্ড, টংগা দ্বীপপুঞ্জ এবং তাহিতি প্রভৃতি তাঁর পূর্বে আবিষ্কৃত স্থানগুলো পার হয়ে উত্তরদিকে যাত্রা করলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ববৃহৎ দ্বীপমালা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন ১৫৫৫ খ্রিঃ একজন স্প্যানিশ অভিযাত্রী।

কিন্তু এই আবিষ্কারের সংবাদ স্পেন দীর্ঘকাল সযত্নে গোপন রেখেছিল। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা বিস্মরণের অতলে হারিয়ে গিয়েছিল।

কুক এই যাত্রায় এই দ্বীপগুলোর পুনরাবিষ্কারের সৌজন্যে গৌরবের অধিকারী হলেন এবং নামকরণ করলেন তার বন্ধু তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক প্রধান লর্ড স্যান্ডউইচের নামে—স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ।

উত্তর থেকে পশ্চিম উপকূল বরাবর এগিয়ে স্কট পৌঁছলেন আমেরিকার ওরেগন নামক স্থানে। সেখান থেকে উপকূল ধরে জাহাজ ঘোরালেন উত্তরের হিম অঞ্চলের অভিমুখে।

বিপজ্জনক সমুদ্রপথ পাড়ি দেবার সময়ও কুক তাঁর প্রকৃত দুঃসাহসিক কাজটি বিস্মৃত হননি।

সর্তকতার সঙ্গে তিনি উপকূলরেখা পরীক্ষা ও জরীপ করেছেন, ওই অঞ্চলের মানচিত্র অঙ্কন করেছেন।

জাহাজ অগ্রসর হচ্ছিল বেরিং প্রণালীর ভেতর দিয়ে। কিন্তু অক্ষাংশের সত্তর ডিগ্রি কোণ বরাবর পৌঁছে বাধা পেলেন নিরেট বরফের দেয়ালে। বাধ্য হয়েই কুককে পেছনে ফিরতে হল।

এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রী জাহাজ নিয়ে পিছু হটার সময়েও কামচাটকা ও অ্যালুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যথাসম্ভব সমীক্ষা চালিয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করলেন, জরীপ করে মানচিত্র তৈরি করলেন।

একসময়ে তাঁর জাহাজ এসে ভিড়ল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। সময়টা ছিল ১৭৭৯ খ্রিঃ জানুয়ারী মাস। দুটি জাহাজের নোঙর ফেলা হল কীলাকেকুয়া উপসাগরে।

দিন পনের নাবিকরা তীরভূমিতে বিশ্রাম ও আনন্দ উপভোগ করল। এই সুযোগে ইতিহাসের এক দুঃখজনক বিয়োগান্ত ঘটনা সংঘটিত হল।

সেই অঞ্চলের আদিবাসিন্দাদের সঙ্গে কুকের সহযাত্রীদের আকস্মিক ভাবে সংঘর্ষ উপস্থিত হল।

জাহাজ থেকে সাঁড়াশি চুরি গিয়েছিল। চুরির অপরাধে ধরা পড়ল এক আদিবাসী। শাস্তি হিসাবে তাকে বেত্রাঘাত করা হল।

সেখানকার আদিবাসীরা স্বভাবগতভাবেই ছিল চোর। শাস্তি পেয়েও তাই তারা দমল না।

সেই রাতেই আরো কতগুলি সাঁড়াশী চুরি গেল। অনেক অনুসন্ধানেও এবারে অপরাধী ধরা পড়ল না।

কুক তখন তীরে নেমে গিয়ে আদিবাসীদের জানালেন, চুরি রোধ করার জন্য জামিন হিসাবে উপজাতি রাজাকে বন্দী করা হবে।

ওদিকে কুকের সহযাত্রী নাবিকরা তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও স্থানীয় অধিবাসীদের ভয় দেখাবার জন্য বন্দুক চালাল।

তাতে ক্ষিপ্ত জনতা মারমুখী হয়ে উঠলে কুককে তীরে ফেলে রেখেই তার সঙ্গীরা জাহাজে পালিয়ে গেল।

আদিবাসীরা তখন তাঁকে ঘিরে ধরে নির্মম ভাবে অস্ত্রাঘাত করে হত্যা করল। আদিবাসীদের ক্রোধ তাতেও প্রশমিত হল না। তারা কুকের দেহে আগুন ধরিয়ে দিল।

জাহাজের দায়িত্বশীল অফিসারদের ভীরুতা ও কর্তব্যহীনতার ফলে মানব সভ্যতার এক দুঃসাহসিক আবিষ্কারকের জীবনের শোচনীয় পরিণতি ঘটল।

কুকের দেহাবশেষ থেকে কয়েকখানি হাড় মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। কয়েকদিন পর সেগুলোই সমাহিত করা হল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কন অভিযাত্রী-আবিষ্কারক কুকের অবিস্মরণীয় অবদান।

অদম্য মনোবল ও একাগ্র নিষ্ঠার বলে তিনি সকল প্রকার প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজের লক্ষ্য সাধন করেছেন।

তাঁর জীবন ছিল কঠিন নিয়ম ও শৃঙ্খলায় বাঁধা। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সহযাত্রীদের স্বভাবকেও নিয়মানুবর্তিতার অধীনে আনতে পেরেছিলেন তিনি।

কুক ছিলেন নির্ভীক, উদ্যমশীল ও সদাহাস্যময় এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সবসময়ই নিজেকে কোনও না কোনও কাজে ব্যাপৃত রাখতেন, প্রতিটি কাজ করতেন সময় মেপে, নিষ্ঠাভরে।

অজানা দ্বীপের আদিবাসীদের প্রতি তাঁর মানবিক ব্যবহার কখনও ক্ষুণ্ণ হত না। সর্বত্রই তিনি পেয়েছেন স্থানীয় জনতার আন্তরিক সংবর্ধনা। একজন সফল অভিযাত্রী ও তথ্যনিষ্ঠ অবিষ্কারক হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী

বর্তমান ভারতবর্ষের সামাজিক সংস্কার ও প্রগতিশীল ধার্মিক চিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের প্রভাবে পরাধীন ভারতবর্ষের সমাজজীবনে যখন নেমে আসে অবক্ষয় ও অচেতনার ধস, সেই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন দয়ানন্দ।

তৎকালীন হিন্দুসমাজকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বৈদিক সনাতনী পথে পরিচালিত করার জন্য তিনি দেশব্যাপী এক অভূতপূর্ব শুদ্ধি আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন।

১৮২৪ খ্রিঃ গুজরাটের মর্ভি শহরে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন দয়ানন্দ। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল মুলশঙ্কর।

কৌলিক প্রথা অনুসারে মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর শাস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হয়। অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই ছাত্র হিসেবে সর্বক্ষেত্রেই তিনি সাফল্য ও গৌরবের অধিকারী হয়েছেন।

তাঁদের পরিবার ছিল শিবের উপাসক। তাই ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে শিবের পূজা ও আরাধনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্তিপূজা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করতে থাকেন।

মাত্র নয় বছর বয়স থেকেই তাঁর পরিবারে এমন কয়েকটি শোকাবহ ঘটনা ঘটতে থাকে যে তার প্রভাবে দয়ানন্দের মন অন্তর্মুখীন হয়ে পড়ে। জীবনের অস্থায়িত্ব ও প্রকৃতির প্রবাহমানতা বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হন।

দয়ানন্দের যখন নয় বছর বয়স তখন তাঁর প্রিয় ঠাকুরদা মারা যান। দু'বছরের ছোট বয়সের স্নেহের বোনটিকে হারান ষোল-সতের বছর বয়সে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান তাঁর কাকা।

পরিবারের আপনজনের পরপর মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনের চরম সত্য তাঁর উপলব্ধি হয়। মৃত্যুই যে মানবজীবনের অনিবার্য পরিণতি এবং প্রতিটি জীবনই মৃত্যুর অধীন এ সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হন।

তিনি আরও উপলব্ধি করলেন সংসারে স্থায়ী বা নিত্য বলতে কোন পদার্থই নেই। সবকিছুই বিনাশশীল।

বাস্তবের রূঢ় আঘাতে এইভাবে অতি অল্প বয়সেই মুলশঙ্কর জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে ওঠেন। সংসারের সকল কিছুর প্রতিই তিনি আকর্ষণ হারাতে থাকেন।

মুলশঙ্করের মানসিকতার এই পরিবর্তন তাঁর বাবা-মায়ের দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁরা তাঁকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করার সঙ্কল্প করেন। তাঁর জন্য একটি যোগ্য পাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন।

বালক মুলশঙ্কর এতে বিচলিত হয়ে পড়েন। ততদিনে তিনি নিজের জীবনের পথ স্থির করে নিয়েছেন।

বাবা-মাকে নানাভাবে বুঝিয়ে এবং জ্ঞানার্জনের আগ্রহ জানিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে সক্ষম হন।

কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর বাবা তাঁকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। ফলে বাধ্য হয়ে গৃহত্যাগ করে তিনি পথে নামলেন।

নানা স্থান পরিভ্রমণের পর লালা ভকত নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেন মুলশঙ্কর। দীক্ষান্তে তাঁর নতুন নামকরণ হয় শুদ্ধচৈতন্য।

সন্ন্যাসজীবনে তিনি বহু জ্ঞানী সাধু ও পন্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

তাঁর জ্ঞান, সন্ন্যাস জীবনের নিষ্ঠা, মানবিকতা এবং চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পূর্ণনন্দ সরস্বতী নামে এক বিশিষ্ট মহাত্মা তাঁর নতুন নামকরণ করেন স্বামী দয়ানন্দ।

পরবর্তীকালে এই নামেই তিনি দেশের সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেন।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন স্বামী দয়ানন্দ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর যোগসাধনা। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন বেদই হলো হিন্দু ধর্ম-দর্শনের মূল এবং বেদ-নির্দিষ্ট ধর্মীয় পথে মূর্তিপূজার কোন স্থান নেই। কেননা, বেদে এক ঈশ্বর এবং তাঁর অবিনশ্বরতার কথাই বলা হয়েছে।

তারপর দয়ানন্দ বেদনির্দিষ্ট একেশ্বরবাদ প্রচার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মের সংস্কারের কাজকেই জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেন।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতীয় সমাজ-জীবনের ভিত্তিস্বরূপ যে ধর্মীয় আদর্শ তার সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই মানুষ নানাপ্রকার কুসংস্কারের কবলিত হয়েছে।

আর মানুষের এই অজ্ঞতা দূর করতে হলে তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে ধর্মের স্বরূপ।

এই উপলব্ধির পরবর্তী পর্যায়েই আরম্ভ হল তাঁর পরিব্রাজক জীবন। ভারতের নানা প্রান্তে পরিভ্রমণকালে বৃহত্তর ভারতের জনজীবনকে আরও নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ পেলেন তিনি।

এইসময় ভারতের ছোটবড় প্রায় প্রতিটি শহরেই উপস্থিত হয়ে তিনি প্রকৃত

হিন্দুধর্মের স্বরূপটি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন। বেদের একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে এইসময় তাঁকে তৎকালীন বিশিষ্ট বহু পন্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে হয়েছিল।

পরিব্রাজনকালে কলকাতায়ও এসেছিলেন দয়ানন্দ। ব্রাহ্মসমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে তিনি খুবই আনন্দিত হন।

ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ ছিল বেদনির্দিষ্ট একেশ্বরবাদ এবং ব্রাহ্মরা মূর্তিপূজা স্বীকার করতেন না। আদর্শের অভিন্নতা হেতু দয়ানন্দ ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে খুবই আগ্রহান্বিত বোধ করেন এবং ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মসংস্কারের কাজ যৌথভাবে করার সঙ্কল্প করেন।

অবশ্য তাঁর এই সঙ্কল্প নানাকারণে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

অনেকটা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের ফলেই দয়ানন্দ তাঁর আন্দোলনকে একটি সংহত রূপ দেবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খ্রিঃ বর্তমান মুম্বইতে আর্যসমাজ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

বেদভিত্তিক আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও একটি আলাদা ধর্মমত হিসেবে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু আর্যসমাজ ছিল হিন্দু ধর্মেরই একটি সহযোগী সংস্থা।

আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকদের বলা হত আর্যসমাজী। তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ বৈদান্তিক।

তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষের সমাজ ও হিন্দুধর্মকে কুসংস্কার মুক্ত করা এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা।

স্বামী দয়ানন্দের আর্যসমাজের আদর্শে তৎকালীন সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সেইকালে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের অপপ্রচারের ফলে হিন্দু ধর্মকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করে বহু হিন্দু স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছিলেন।

খ্রিস্টানদের এই অপচেষ্টা রোধ করার জন্য স্বামী দয়ানন্দ নানা যুক্তি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের উৎকর্ষতা প্রমাণ করেন।

ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং ভিন্নধর্মীকে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দয়ানন্দ শুদ্ধিআন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর এই আন্দোলনের ফলে একদিকে যেমন তিনি হিন্দুসমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন তেমনি বহু অহিন্দুকেও ধর্মান্তরিত করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী করেছিলেন।

চিন্তা, আদর্শ ও কর্মসূত্রে দয়ানন্দ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সার্থক উত্তরসূরী।

ভারতে বহুপ্রচলিত বর্ণভেদ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহপ্রথা, মূর্তিপূজা, পুরোহিততন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুসমাজের তৎকালীন সকলপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় ও নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

দয়ানন্দ ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পূজারী। তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যনিষ্ঠাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। প্রচার করতেন সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, মিথ্যা কখনোই জয়লাভ করতে পারে না।

ভারতে নারীমুক্তি আন্দোলনেরও অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন দয়ানন্দ। নারী ও পুরুষের সমান সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালে বহু যুবক দেশসেবার ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম অগ্রগণ্য প্রচারক ছিলেন দয়ানন্দ। এইক্ষেত্রে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে।

পরাধীন ভারতের অন্ধকারময় অধ্যায়ে আলোর পথিকরূপেই আবির্ভাব হয়েছিল দয়ানন্দের।

তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা, ও প্রতিভার দ্যুতি বহুক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত হয়ে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রয়েছে স্বামী দয়ানন্দের। ইংরাজী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন তিনি। তেমনি ভারতের অতীত গৌরবের ঐতিহ্যের কথাও সগর্বে প্রচার করতেন।

স্বামী দয়ানন্দ চেয়েছিলেন, আধুনিক ইংরাজি শিক্ষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের সমন্বয়ে একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন শহরে তিনি অনেক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত সেইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্রতী রয়েছে।

দয়ানন্দের প্রগতিপন্থী চিন্তাভাবনা ও কর্মপ্রচেষ্টা দেশের ধর্মান্ধ গোঁড়া সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের স্বার্থহানির কারণ হয়ে উঠেছিল। হিন্দুসমাজের এই রক্ষণশীল স্বার্থান্ধ অংশটি দয়ানন্দের উদার মানবিকতা, অকৃত্রিম জাতীয় হিতৈষণা ও দূরদৃষ্টিকে ভালভাবে নিতে পারেনি।

ফলে সংকীর্ণবাদী একশ্রেণীর মানুষ তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

রামগড় এবং প্রয়াগে দয়ানন্দের প্রাণনাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ উভয় ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

পরিব্রাজনকালে বৈদিক ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দয়ানন্দ রাজস্থানের যোধপুর, উদয়পুর, প্রভৃতি রাজ্যের মহারাণার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন।

সকল রাজ্যের মহারাণাই দয়ানন্দর পান্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন এবং তাঁর বৈদিকধর্ম প্রচার এবং পারোপকারের আদর্শ রূপায়নের জন্য মুক্তহস্তে সাহায্যের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। অবিলম্বেই উদয়পুরের রাণার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় পরোপকারিণী সভা।

এইভাবে দিনে দিনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দয়ানন্দের প্রভাব বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে স্বার্থান্বেষী রক্ষণশীলপন্থীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নানাভাবেই তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৮৮৩ খ্রিঃ খাদ্যে বিষপ্রয়োগের ফলে আজীবন সত্যনিষ্ঠ স্বামী দয়ানন্দের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

ওয়াল্টার হুইটম্যান

মূলতঃ তিনি ছিলেন কবি। প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর অবদান নগণ্য ছিল না। সমগ্র কৃতিত্বের বিচারে হুইটম্যান ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

কেবল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক এবং নবজাগরণের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব।

আমেরিকার নবজাগরণের প্রবক্তারূপে স্বীকৃত এমার্সন এবং থরোর সঙ্গেই নাম করা হয় হুইটম্যানের।

বস্তুতঃ ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের অন্যতম মনীষীপুরুষ রূপে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন তিনি।

বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদরূপে স্বীকৃত কবি হুইটম্যানের কাব্যগ্রন্থ লিভস অব গ্রাস।

তিনি ছিলেন র‍্যাডিকালপন্থী এবং তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে এই মতবাদই তিনি প্রচার করেছেন।

১৮১৯ খ্রিঃ ৩১শে মে লং আইল্যান্ডের ওয়েস্ট হিলে এক দরিদ্র ছুতোর মিস্ত্রীর পরিবারে জন্মেছিলেন ওয়াল্টার হুইটম্যান। দুটি বংশধারার রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

পিতা ছিলেন খাঁটি ইংরাজ। মা ছিলেন হল্যান্ডের মেয়ে। পিতা ও মাতা উভয়ের বংশধারারই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

আয়-রোজগার বাড়াবার উদ্দেশ্যে হুইটম্যানের পিতা ১৮২৩ খ্রিঃ লং আইল্যান্ড ছেড়ে চলে আসেন ব্রুকলিনে। এখানেই তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

জীবনযুদ্ধে অসফল পিতার সন্তান হিসেবে শৈশব জীবন থেকেই হুইটম্যানকে দারিদ্র্য ও নানাবিধ কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। পিতার সান্নিধ্য বিশেষ পাননি তিনি।

মায়ের স্নেহ-ছায়াতে থেকেই বড় হয়ে উঠেছেন। তাই মা-ই ছিলেন তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন।

প্রাথমিক স্কুলের পড়া শেষ করেই হুইটম্যানকে ছাপার কাজের শিক্ষানবিসী করতে হয়। মাত্র ১১ বছর বয়সেই, ১৮৩৫ খ্রিঃ জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে পাড়ি দিতে হয় নিউইয়র্ক শহরে।

কিন্তু অপরিচিত পরিবেশে কেবলমাত্র ছাপার কাজ অবলম্বন করে টিকে থাকা খুবই কষ্টকর হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

একবছর পরেই পেশা বদল করে গ্রহণ করলেন শিক্ষকতার কাজ। ব্রুকলিন শহরেই জীবনের প্রথম অধ্যায়টি কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর।

শহরের বিচিত্র পরিবেশ তাঁর শৈশব জীবনকে খুবই প্রভাবিত করেছিল তাই ব্রুকলিন শহরের প্রতি বরাবরই তিনি আকর্ষণ বোধ করতেন।

এই শহরের জীবনের স্মৃতি, প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য বারবার তিনি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে স্মরণ করেছেন।

প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ না পেলেও জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন হুইটম্যান।

তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত মানুষ। বিভিন্ন সময়ে লব্ধ অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর জীবন-পথের পাথেয়।

জ্ঞানার্জনের প্রতি গভীর আগ্রহ তাঁর ছিল বরাবর। তাই সুযোগ পেলেই বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহ করে পড়তেন।

এভাবেই বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। দিনে দিনে সেই পরিচয় গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।

১৮৩৮ খ্রিঃ। এখন কুড়ি বছরের যুবক তিনি। এই সময়ে হুইটম্যানের জীবন নতুন পথে মোড় নিল। শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে নিজের সম্পাদনায় একটা পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিলেন।

প্রস্তুতি হিসেবে, প্রথমেই কিনলেন একটা প্রেস। তারপর একদিন সেই প্রেস থেকে ছাপা হয়ে লং আইল্যান্ডার নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ লাভ করল।

ছাপার কাজ ছেলেবেলাতেই তিনি রপ্ত করে নিয়েছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্মও একাই করতে লাগলেন তিনি।

প্রবল উৎসাহ নিয়ে লং আইল্যান্ডার প্রকাশ করলেও সেই উৎসাহ বেশি দিন বজায় রাখা সম্ভব হল না।

নতুন পত্রিকা আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারল না। ফলে কোনওরকমে বছরখানেক টিকে থাকল কাগজটি। তারপর প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। ছোট্ট প্রেসটিও বিক্রি করে দিলেন তিনি।

লং আইল্যান্ডার মাত্র এক বছর পরমায়ু পেলেও হুইটম্যানের জীবনে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

সাংবাদিকতার জীবনে আকর্ষণ তাঁকে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে সাহায্য করল।

তিনি নিউইয়র্কের একটি দৈনিক পত্রিকা আরোরা এবং একটি সান্ধ্য পত্রিকায় সম্পাদকের চাকরি নিলেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে দুই বছর এই দায়িত্ব পালন করলেন।

সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার কাজে এতটাই সাফল্য পেয়েছিলেন হুইটম্যান যে এক সময়ে দৈনিক সাপ্তাহিক মিলিয়ে ছয় ছয়টি কাগজের সম্পাদনা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

শৈশবের ব্রুকলিন শহর যেন নিঃশব্দে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। অন্তরে সেই আহ্বান যেন শুনতে পেতেন হুইটম্যান। তাই নিউইয়র্ক ছেড়ে ১৮৪৫ খ্রিঃ ফিরে এলেন ব্রুকলিনে।

স্থানীয় কাগজ লং আইল্যান্ড স্টার-এ নিয়মিত লিখতে শুরু করলেন। মাত্র এক বছর সময়ের মধ্যেই বিচক্ষণ সাংবাদিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

এই খ্যাতি এক অভাবিত পুরস্কার নিয়ে এলো হুইটম্যানের জীবনে। এলো বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বান।

ব্রুকলিনের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ব্রুকলিন ডেইলি ঈগল-এর সম্পাদকের চাকরি পেলেন তিনি। সেই সময়ে তাঁর বয়স মাত্র ২৭ বছর।

সম্পাদকের কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও দৈনিক পত্রিকায় কেবল সংবাদ নিয়েই পড়ে থাকেননি তিনি। পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করতেন নিয়মিত।

দু বছর ব্রুকলিন ডেইলি ঈগল-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হুইটম্যান। এই সময়ের মধ্যে গদ্য ও পদ্য সাহিত্যেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করলেন তিনি।

নিয়মিত লিখতে আরম্ভ করলেন গল্প ও কবিতা। ফলে বৃহত্তর পাঠকমহলে বাড়তে লাগল তাঁর পরিচিতি।

অদ্ভুত এক জীবন ছিল হুইটম্যানের। প্রকৃতির রূপ বদলের মতোই এই প্রতিভাধর মানুষটির ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনে ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটেছে।

সাংবাদিকতা দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, সেই কাজ ছেড়ে মৌলিক রচনা ধরেছেন।

পাশাপাশি কখনো খুলে বসেছেন ছাপাখানা, কিংবা মনিহারি দোকান। আবার করেছেন বাড়ি বানাবার কাজ, সম্পত্তি বেচাকেনার ব্যবসা।

মূলতঃ শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত শহর ব্রুকলিন, লং আইল্যান্ড এবং নিউইয়র্ক ছিল তাঁর সাহিত্যের পটভূমি।

তিনি তাঁর সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করেছেন জন্মভূমি ও কর্মভূমির পরিসর থেকে। শহরের মানুষ পথঘাট-মাঠ, ফুলটন ফেরিঘাট—এসবের মধ্যেই তাঁর স্মৃতিমেদুর মন ঘোরাফেরা করত।

সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনা-ঘেরা জীবনের আবেদনই তাঁর কাছে ছিল সমধিক।

কাজের অবসরে প্রায়ই তিনি নাটক দেখতে যেতেন। বেশি উপভোগ করতেন শেক্সপীয়রের নাটক।

নাটক-প্রীতির আকর্ষণেই সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতিও তাঁর আগ্রহ জেগেছিল। পরবর্তীকালে এই গীতি-নাট্যের প্রভাব তাঁর সাহিত্যেও পড়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, গীতিনাট্যের প্রেরণা ও প্রভাবেই আমার লিভস অব গ্রাস কাব্যগ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছিল।

হুইটম্যানের লিভস অব গ্রাস কাব্যগ্রন্থটি বিশ্বসাহিত্য অঙ্গনে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে।

শৈশব ও কৈশোরে পড়াশুনার সুযোগ পাননি হুইটম্যান। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই অভাব পূরণ করেছিলেন তিনি।

কর্মব্যস্ত জীবনের অবসরটুকু তিনি ব্যয় করতেন হোমার, শেক্সপীয়র, কোলরিজ, ডিকেন্স ওয়াল্টার স্কটের লেখা পড়ে।

প্রচুর পড়াশোনা করেছেন তিনি। এ কারণে প্রথম দিকের রচনার ভাব ভাষা ও আঙ্গিকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার সুযোগ হত না তাঁর। তাই শিল্পের বিচারে তাঁর গোড়ার দিকের লেখাগুলো ছিল দুর্বলতর।

চাকরি জীবনে সর্বদাই সৃষ্টির একটা অস্থিরতা বোধ করতেন হুইটম্যান। যা করছেন তাতে মন ভরতো না। আরও বড় কিছু, মহৎ কিছু করার জন্য নিরন্তর মন ছটফট করত।

ব্রুকলিনের একটি সাপ্তাহিক কাগজ ফ্রিম্যান-এর সম্পাদকের কাজ করার সময়ে অন্তস্থিত এই অস্থিরতা অনেক বেড়ে গেল।

সময়টা ১৮৪৯ খ্রিঃ। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে মনের তাড়নায় সেই চাকরি ছেড়ে দিলেন হুইটম্যান। অশান্ত মন খানিকটা শান্ত হল কবিতা রচনায় নিমগ্ন হয়ে। এই সময়েই কবিতা রচনার পুরনো আঙ্গিক বাতিল করে দিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন।

তাঁর এই নতুন ভাবনা-চিন্তার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ১৮৫৫ খ্রিঃ প্রকাশিত হল লিভস অব গ্রাস কাব্যগ্রন্থটি।

বিচিত্র এক চমক নিয়েই আবির্ভাব হল বইটির। লেখক প্রকাশকের নাম ঠিকানা বিহীন বইয়ের মলাটে দেওয়া ছিল কেবল লেখকের একটি ছবি।

এই ছবি দেখেই পাঠকরা বুঝতে পারলেন লিভস অব গ্রাসের লেখক হুইটম্যান। এইভাবে পাঠকমহলে অভূতপূর্ব চমক সৃষ্টি করেই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছিল।

প্রথম গ্রন্থের অভিনব আঙ্গিকে রচিত কবিতাগুলি পাঠকদের কাছে হুইটম্যানের এক নতুন পরিচয় তুলে ধরল। চিন্তায় মননে তিনি ছিলেন অনেক বেশি পরিণত, ধীরস্থির ও উদারহৃদয়।

যে মানসিক অস্থিরতা ইতিপূর্বে তাঁর লেখাগুলোতে ধরা পড়ত, এই কাব্যগ্রন্থে তার আভাস কোথাও নেই। এক আত্মমগ্ন ধ্যানস্থ কবি হিসেবেই তাঁকে পাওয়া গেল এই গ্রন্থে।

আমেরিকার ইতিহাসের এক সন্ধিলগ্নে প্রকাশিত হয়েছিল লিভস অব গ্রাস। সেই সময় আমেরিকার জনজীবনে গণতন্ত্রের আদর্শ সবেমাত্র আলো ফেলতে শুরু করেছে।

সেই আলোককে হুইটম্যান তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে জনমানসের গভীরে পৌঁছে দিতে চাইলেন।

তাঁর কাব্য রচনায় হাতিয়ার হয়ে উঠল রাজনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয়তা, ও জনজীবনের অটুট ঐক্য।

নতুন যুগের নতুন আলোকচ্ছটাকে এইভাবে লেখার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে এক আশ্চর্য মানবিক-বিপ্লবের পথ রচনা করতে লাগলেন হুইটম্যান। তিনি হলেন নবজাগ্রত আমেরিকার নতুন জীবনের ভাষ্যকার দিশারী-কবি।

পরের বছরেই ১৮৫৬ খ্রিঃ প্রকাশিত হল লিভস অব গ্রাস গ্রন্থের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

এই সংস্করণে সংযোজিত হল আরো নতুন কিছু কবিতা। তার মধ্যে ছিল কবির অমর সৃষ্টি ক্রসিং ব্রুকলিন ফেরি কবিতাটি।

সেইকালে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল একটা অদ্ভুত রীতি। কবি সাহিত্যিকরা নিজেরাই নিজেদের বই-এর সমালোচনা করতে পারতেন। তবে তাঁরা এই সমালোচনা করতেন ছদ্মনামে।

হুইটম্যানও তাঁর কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা নিজেই লিখলেন। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হল অন্যদের সমালোচনাও।

নিজের কথা বলতে গিয়ে হুইটম্যান নিজেকে জনগণের কবি বলে চিহ্নিত করলেন।

যৌনতা ও শরীরী সৌন্দর্যকে স্বীকার করে প্রচার করলেন নতুন রীতি পদ্ধতিতে রচিত তাঁর অনন্ত সম্ভাবনাময় কবিতা।

লেখকদের স্বরচিত নিজস্ব বইয়ের সমালোচনা পাঠকমহলে যথেষ্ট কৌতুকের খোরাক যোগাত। তাঁদের কৌতূহলী করে তুলত।

হুইটম্যান কিন্তু তাঁর সমালোচনাতে মজার খোরাক রাখেননি। তাতে অন্য মাত্রা যোগ করেছিলেন।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, স্বাধীনতার পূজারী বলে আমেরিকার জনগণ তাঁকে জানতে চিনতে পারুক, সেইভাবে স্বীকৃতি দিক।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর তাঁর সমালোচনাগুলি যথার্থই ছিল প্রতিভার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

ইতিপূর্বে কোন কবির লেখাতেই এই ভাবনার প্রকাশ ঘটেনি। ফলে জনমনের আরো গভীরে স্থান করে নিতে পারলেন হুইটম্যান।

আবার চাকরি নিলেন কবি। এবারে ব্রুকলিন টাইমস পত্রিকায়। ১৮৫৭ খ্রিঃ থেকে ১৮৫৯ খ্রিঃ এই কয় বছর সম্পাদনার কাজে যুক্ত রইলেন।

কিন্তু চাকরি ছাড়লেন আবার সেই অন্তস্থিত অস্থিরতার ধাক্কায়। অদ্ভুত একটা জীবনবোধ এইসময় তাঁকে এতটাই অস্থির করে তুলল যে কোন কিছুর সঙ্গেই নিজেকে জড়িত রাখতে পারলেন না।

পালছেঁড়া নৌকোর মতো দিক-দিশাহারা অবস্থা হল তাঁর। জীবন কাটতে লাগল ভবঘুরের মতন।

১৮৬০ খ্রিঃ প্রকাশিত হল লিভস অব গ্রাস-এর তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণেও সংযোজিত হল এমন কিছু নতুন কবিতা, যার মধ্যে ধরা ছিল কবির জীবনের জীবনযন্ত্রণার কথা।

হুইটম্যানের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটিই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল খ্যাতির শীর্ষে। তাই যুগান্তকারী এই গ্রন্থটির সংশোধন ও সংযোজনের কাজে প্রায় সমগ্র জীবনকালটাই ব্যাপৃত থেকেছেন।

এই গ্রন্থের সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বই বিক্রির টাকা থেকে কবির আর্থিক অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি।

কেবল লেখা নিয়ে থেকে ফল এই হয়েছিল যে অনেকদিনই তাঁকে কাটাতে হয়েছে অনাহারে। ফলে বাধ্য হয়েই আবার ফিরে যেতে হয়েছে সাংবাদিকতার পুরনো কাজে।

এইভাবে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল তাঁর মন।

বিতৃষ্ণা থেকে দ্রোহ ভাব আর সেই ভাবই তাঁর নির্ভীক নীতিনিষ্ঠ কলম থেকে জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লেখা হয়ে প্রকাশিত হল।

এরপর থেকে, ব্রুকলিন টাইমস পত্রিকায় সম্পাদক পদে থাকার সময় থেকে, সমাজের দুর্নীতি, অবিচার ও নীচতার বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত কলম চালনা করতে লাগলেন। তাঁর প্রতিটি লেখাই হয়ে উঠতে লাগল বিস্ফোরক।

সাময়িক সামাজিক প্রয়োজনে লিখিত হলেও এই লেখাগুলির সর্বজনীন আবেদন ছিল অনস্বীকার্য।

সমকালীন আমেরিকান সাংবাদিকতার ইতিহাসে হুইটম্যানের এই সময়কার রচনাগুলি দিকচিহ্ন স্বরূপ হয়ে আছে।

হুইটম্যানের কবিখ্যাতি যখন মধ্যগগনে, সেই সময় ১৮৬১ খ্রিঃ আরম্ভ হল গৃহযুদ্ধ।

এই যুদ্ধে তাঁর ভাই আহত হলেন। তাঁকে দেখার জন্য তিনি ছুটে গেলেন ফেড্রিক্সবার্গের সেনা ছাউনিতে। সেই সূত্রে সেনাদের সঙ্গেই কাটালেন কিছুকাল। এই সময়ে ওয়াশিংটনে একটি চাকরিও নিলেন।

যুদ্ধে আহত ও মৃতপ্রায় সৈনিকদের প্রতি সমবেদনায় হুইটম্যান বারবার ছুটে যেতেন তাদের কাছে। রোজগারের সামান্য অর্থ থেকেই অসুস্থ সৈনিকদের জন্য কিনে নিয়ে যেতেন উপহার।

১৮৬৫ খ্রিঃ সৈন্যবিভাগে কেরানির চাকরি পেলেন হুইটম্যান। কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যেই চাকরি থেকে হলেন বরখাস্ত। তাঁর অপরাধ তিনি কবিতা লেখেন।

লিভস অব গ্রাস-এর কবিতাগুলি পড়ে তাঁর ওপরওয়ালার পছন্দ হল না। তিনি ঠিক করলেন, কবিকে চাকরিতে রাখা ঠিক হবে না। যথারীতি বরখাস্ত হলেন হুইটম্যান।

সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময়েই এক বন্ধুর চেষ্টায় অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে নতুন চাকরি পেয়ে গেলেন তিনি। তারপর ওয়াশিংটনেই থেকে যান ১৮৭৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।

১৮৬৫ খ্রিঃ ঘটল আমেরিকার ইতিহাসের সেই চরমতম দুর্ঘটনাটি। আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন মানবতার সেবক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন। এই ঘটনায় তীব্র মানসিক আঘাত পেলেন হুইটম্যান।

গভীর শোকে অভিভূত, মর্মাহত কবি এই সময় লিখলেন তিনটি হৃদয়-বিদারক কবিতা।

পরবর্তীকালে এই কবিতাগুলি সংযোজিত হয়েছিল লিভস অব গ্রাসের চতুর্থ সংস্করণে।

জীবনের পথ ছিল বন্ধুর। তাই অকালেই শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল তাঁর। ১৮৭৩ খ্রিঃ মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। প্রাণে বেঁচে গেলেন কবি।

কিন্তু পঙ্গু হয়ে পড়লেন পক্ষাঘাতে। বাধ্য হয়ে ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে এলেন নিউ জার্সিতে, ছোট ভাইয়ের বাড়িতে। সেখানে তাঁর মা তখনো বেঁচে। কিন্তু তাঁর অবস্থাও মৃতপ্রায়।

শয্যাশায়ী মা মারা গেলেন কিছুদিন পরেই। নীরবে রোগশয্যায় শুয়ে কবি সইলেন মাতৃশোকের বেদনা।

নিউ জার্সির বাড়িতেই জীবনের শেষ অধ্যায় কাটিয়েছেন হুইটম্যান। কবিতা লেখায় ক্ষান্তি ছিল না তাঁর। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে পর্যন্ত কবিতা নিয়েই মগ্ন থেকেছেন।

অবশেষে এগিয়ে এলো ১৮৯২ খ্রিঃ ২৬ শে মার্চ দিনটি। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে হাতে পেলেন তাঁর লিভস অব গ্রাস কাব্যগ্রন্থের সদ্য প্রকাশিত নবম সংস্করণটি।

সে বইটি হাতে নিয়েই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেন কবি হুইটম্যান।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক ছিলেন মৌর্যবংশের নরপতি। এই মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

অশোক ছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। চন্দ্রগুপ্তের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি প্রস্ফুটিত অবস্থায় প্রকাশ লাভ করেছিল সম্রাট অশোকের মধ্যে।

অশোক কেবল রাজ্যশাসনই করতেন না, প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন প্রজাপালক মহান নরপতি।

প্রজাদের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখরূপে গ্রহণ করে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের যে অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন উদাহরণ নেই।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মহান সম্রাট অশোকের পিতা সম্রাট বিন্দুসারের পিতা। চন্দ্রগুপ্তের জীবনের প্রথমাংশ সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু জানা যায় না। তাঁর সম্পর্কে হিন্দু এবং বৌদ্ধ দুটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

হিন্দু কিংবদন্তি অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মগধের রাজা ধননন্দের শূদ্রাণী পত্নী মুরার পুত্র। মাতার নামানুসারে তিনি তাঁর বংশের নামকরণ করেছিলেন মৌর্যবংশ।

বৌদ্ধ কিংবদন্তি অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ক্ষত্রিয়। হিমালয়ের পাদদেশে পিপ্পলিবন নামক স্থানের মোরিয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের সন্তান।

পিতার মৃত্যুর পর যুবা বয়সে রাজনৈতিক কারণে তিনি মাতার সঙ্গে মগধে চলে এসে থাকবেন।

সেই সময় মগধে নন্দরাজা রাজত্ব করছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যাচারী বিলাসী ও প্রজাপীড়ক। ফলে রাজ্যজুড়ে প্রজাদের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল ধূমায়িত।

উচ্চাভিলাষী চন্দ্রগুপ্ত এই সুযোগ গ্রহণ করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। অবশ্য এই কাজে তাঁব সহায় ও সাহায্যকারী ছিলেন কূটবুদ্ধিব্রাহ্মণ চাণক্য।

বৌদ্ধমতে, চন্দ্রগুপ্তের মোরিয় বংশ থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম হয়েছিল মৌর্যবংশ। হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই দুই মতে চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে এইটুকুই যা পার্থক্য। পরবর্তী ইতিহাস নিয়ে আর কোনও দ্বিমত নেই।

দিগ্বিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজান্ডার পুরুর রাজ্য পাঞ্জাব অধিকার করার পর ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ইতস্ততঃ করছিলেন।

মহারাজ পুরুর বীরত্ব তাঁকে কেবল মুগ্ধই করেনি তাঁর মনের গভীরে ভীতিরও সঞ্চার করেছিল। এরকম আর কিছু বীরের সঙ্গে যদি তাঁকে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় তাহলে যে রণক্লান্ত গ্রীক বাহিনীকে পর্যদস্ত হতে হবে এ সম্পর্কে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না।

এছাড়া আরো কিছু কারণেও তাঁর সৈন্যরা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সাহস পাচ্ছিল না।

মগধরাজ ধননন্দের বিপুল সামরিক ক্ষমতার সংবাদ তাঁদের অজানা ছিল না। তাই দীর্ঘ অভিযানের ক্লান্তি কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়ই তাদের অনুভূত হচ্ছিল। ফলে দেশে ফিরে যাবার জন্য তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের বিপুল ধনসম্পদের সন্ধান জানতেন আলেকজান্ডার। তাই ভারতবর্ষের দুয়ারে পৌঁছেও ফিরে যেতে রাজি ছিলেন না তিনি। নানাভাবে বুঝিয়ে সৈন্যদের স্বমতে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ঠিক এই সময়ে মগধরাজ ধননন্দের বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষোভ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। নন্দরাজের উচ্ছেদই ছিল তাদের কাম্য।

উচ্চকাঙ্ক্ষী বীর যুবক চন্দ্রগুপ্ত এই সুযোগটিকেই কাজে লাগাতে চাইলেন। তিনি সাহায্যের প্রয়োজনে এবং যুদ্ধবিদ্যার বিভিন্ন কলাকৌশল আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপস্থিত হলেন।

সাহায্যপ্রার্থী চন্দ্রগুপ্তের নির্ভীক ও উদ্ধত আচরণে সন্তুষ্ট হতে.পারলেন না ম্যাসিডনীয় বীর আলেকজান্ডার। তিনি এই বিদেশী যুবককে বন্দী করে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করলেন।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন বীর ও বুদ্ধিমান। অচিরেই গ্রীক শিবির থেকে তিনি পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

চন্দ্রগুপ্তের জীবনের এই ঘটনা ভারতের ইতিহাসে শুভ পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

চাণক্য ছিলেন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের শক্তির মিলন ঘটায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক মহৎ রাজবংশের অভ্যুদয় সম্ভব হয়ে ওঠে।

গ্রীক শিবির থেকে পালিয়ে আসার পর দৈবক্রমেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয় চাণক্যের। তক্ষশিলার এই বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ কূটনীতি ও রাজনীতিতে ছিলেন অভিজ্ঞ ও বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন।

নন্দবংশের প্রতি তিনি ছিলেন রুষ্ট। এর পেছনের ইতিহাস সোমদেবের 'বৃহৎকথা' থেকে জানা যায়।

নন্দরাজার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সনাতন। কোনও কারণে নন্দরাজা সনাতনের ওপর বিরক্ত হয়ে তাঁকে সপরিবারে বন্দী করেন।

সনাতনের স্থান হয় একটি বদ্ধ ঘরে। সেখান থেকে কোনওক্রমে তিনি একাকী পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।

ঘটনাচক্রে এই সময় চাণক্যের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় হয় এবং তিনি উপলব্ধি করতে পারেন চাণক্যের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিই পারেন তাঁকে রাজরোষ থেকে উদ্ধার করতে।

তাঁর অনুরোধে চাণক্য রাজপ্রাসাদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে তিনি চরমভাবে অপমানিত হন। রাজসভার মধ্যে নন্দরাজা তাঁকে মাথার শিখা টেনে বিতাড়িত করেন।

এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই মুহূর্তেই চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংসের শপথ নেন।

কিন্তু বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় সমৃদ্ধ হলেও চাণক্য ছিলেন শক্তিহীন। তাই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তিনি শক্তিমান মাধ্যমের অন্বেষণ করতে থাকেন।

সেই সন্ধিক্ষণেই গ্রীকশিবির থেকে পলাতক চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। উভয়ের এই যোগাযোগ যেন ছিল দৈব নির্দিষ্ট।

কেন না এই সম্মিলনের ফল তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছিল। পরিণামে বৃহৎ ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কল্যাণরাষ্ট্র।

চন্দ্রগুপ্ত যে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই তৃতীয় পুরুষ ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক। তিনি ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন বীর এবং উচ্চাভিলাষী। ব্রাহ্মণ চাণক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটার পর তিনি উৎসাহিত হন এবং নন্দরাজের সিংহাসন অধিকারের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।

চাণক্যের কাছ থেকে চন্দ্রগুপ্ত এই সময় লাভ করলেন রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রশিক্ষণ। তক্ষশিলার সুযোগ্য ছাত্র হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন বিদ্যায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল। সেই শিক্ষার বলে তিনি অনুগত চন্দ্রগুপ্তকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে তুলতে লাগলেন।

চাণক্যের পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত পাহাড়ি উপজাতিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে অবিলম্বে এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুললেন। তারপর সেই বিপুল বাহিনী নিয়ে একদিন আক্রমণ করলেন মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র।

উভয়পক্ষ লিপ্ত হয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধে। নন্দরাজ ধননন্দ যুদ্ধে পরাজিত হন এবং চন্দ্রগুপ্ত অধিকার করেন মগধের সিংহাসন।

বহুযুগ আগে থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বৈদিক যুগ থেকেই আর্যরা এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এই প্রচেষ্টা সর্বার্থে সার্থকতা লাভ করতে পারেনি।

মগধের সিংহাসনের অধিকার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রগুপ্ত এই বিষয়ে উদ্যোগী হলেন।

প্রথমেই তিনি নজর দিলেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। সেই অঞ্চল দখল করে ছিল আলেকজান্ডারের গ্রীক বাহিনী।

ইতিমধ্যে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছে এবং ভারতে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাজনীতির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলেন। গ্রীক অধিকৃত অঞ্চল যত অশান্ত হয়ে পড়ছিল ততই তিনি আশান্বিত হয়ে উঠছিলেন।

গ্রীক অঞ্চলে প্রজা বিদ্রোহে গ্রীক শাসক নিহত হলেন। এই সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক অঞ্চল আক্রমণ করলেন এবং গ্রীক বাহিনীকে পরাস্ত করে সেখানে মৌর্যশাসন বিস্তার করলেন।

এরপর চন্দ্রগুপ্তের মৌর্যবাহিনী দাক্ষিণাত্যের মহীশূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখন্ড অধিকার করে নেয়।

আলেকজান্ডারের পর ব্যাবিলনের অধিকার লাভ করেছিলেন তাঁর প্রাক্তন সেনাপতি সেলুকাস। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন।

মৌর্য ও গ্রীক উভয় বাহিনী মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেলুকাস পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তিনি কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও মাকরান প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করলেন এবং নিজ কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ দেন।

চন্দ্রগুপ্তও মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ পাঁচশত হস্তী সেলুকাসকে উপহার দেন। পরবর্তীকালে সেলুকাস মেগাস্থিনিস নামে এক গ্রীক দূতকে পাটলিপুত্রের রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন।

মেগাস্থিনিস কিছুকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করেছিলেন। সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র সম্পর্কে মেগাস্থিনিস বলেছেন, এই নগর ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। প্রাকারবেষ্টিত নগরীর দৈর্ঘ্য ছিল দশ মাইল আর প্রস্থ ছিল দু মাইল। প্রাকারের ওপরে ছিল ৫৭২টি গম্বুজ এবং চতুষ্পার্শ্বে তোরণ ছিল ৬৪টি।

আপন শৌর্য ও বীর্য বলে চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সুশাসক।

প্রজাদের সুখ-সুবিধার প্রতি চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সর্বদা সজাগ। প্রজা প্রতিপালনই ছিল তাঁর আদর্শ। সাম্রাজ্যরক্ষার সর্বক্ষেত্রেই আদর্শ নরপতি হিসেবে তিনি মহত্ত্ব ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

প্রাচীন ভারতে চন্দ্রগুপ্তের মতো এতবড় সাম্রাজ্য ইতিপূর্বে কেউ গঠন করতে পারেননি।

চন্দ্রগুপ্তের সমস্ত সাফল্যের মূলে ছিল চাণক্যের কূটনীতি ও বিচক্ষণতা। তাঁর সফল কূটনীতি রক্ষাকবচের মতো সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করেছে চন্দ্রগুপ্তকে।

চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাক্ষস। তিনি নানাভাবেই চন্দ্রগুপ্তের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তার সমস্ত কূটকৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন চাণক্য।

চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে রাক্ষস যেসব গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন এবং নিজের গোপন উদ্দেশ্য অকপটে তাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন পরে প্রমাণ হয়ে যায় তারা সকলেই ছিল চাণক্যের গুপ্তচর।

আশাহত ক্ষুব্ধ রাক্ষসকে শেষ পর্যন্ত এই বলে খেদোক্তি করতে হয়—শত্রু আমার অন্তঃপুর পর্যন্ত অধিকার করেছে।

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী চাণক্য ছিলেন মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। অসাধারণ কূটনৈতিক বিচক্ষণতার বলে তিনি মৌর্যসাম্রাজ্য ও সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী চন্দ্রগুপ্ত জীবনের শেষদিকে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জৈনগুরু ভদ্রবাহুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। জৈন ধর্মের অহিংসার ব্রত চন্দ্রগুপ্তকে আকৃষ্ট করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে জৈনগুরু ভদ্রবাহু ছিলেন বঙ্গসন্তান। তৎকালীন বঙ্গদেশের পৌন্ড্রবর্ধন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তিনি। বর্তমান মালদহেরেই প্রাচীন নাম ছিল পৌন্ড্রবর্ধন।

একদিন রাজসভার দৈবজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, রাজ্যের অমঙ্গল আসন্ন। তাঁরা সম্রাটকে জানালেন, উত্তর ভারত অবিলম্বে দুর্ভিক্ষের কবলিত হবে এবং এই সঙ্কটকালের বিস্তৃতি বারো বছর। প্রকৃতির এই রোষ কোনভাবেই নিবারণ করা সম্ভব হবে না।

দৈবজ্ঞদের এই বক্তব্য শুনে স্বভাবতঃই প্রজানুরঞ্জক চন্দ্রগুপ্ত বিচলিত হলেন। আসন্ন দুর্ভিক্ষের কবল থেকে প্রজাদের রক্ষা করার উপায় তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

যথাসময়ে দৈবজ্ঞদের গণনাকে নির্ভুল প্রমাণ করে রাজ্যে দেখা দিল নিদারুণ খরা ও অজন্মা।

সামান্য ফসল যা উৎপন্ন হল তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। ব্যাপক এলাকার জনগণের অনটন মোকাবেলা করার মতো কোন পথ ছিল না।

এই অজন্মা চলল বছরের পর বছর। ফলে রাজভান্ডার হলো নিঃশেষিত। মানসিকভাবে পীড়িত চন্দ্রগুপ্ত পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনের জন্য উর্বর জমির সন্ধান করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর রাজ্যের মহীশূর অঞ্চলকেই অসহায় প্রজাদের পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট করলেন।

ঠিক এই সময়েই রাজগুরু ভদ্রবাহু পরলোক গমন করলেন। গুরুর আকস্মিক মৃত্যুতে চন্দ্রগুপ্ত মর্মাহত হলেন।

প্রজাদের অসহায়তার জন্য মানসিকভাবে পীড়িত বোধ করছিলেন তিনি। এবারে হয়ে পড়লেন অসহায়। এই অবস্থায় মানসিক স্থৈর্যরক্ষা করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল।

ফলে ক্রমেই রাজকার্যের প্রতি আকর্ষণ হারাতে লাগলেন তিনি। প্রজাদের দুঃখে এই সময় এতটাই কাতর হয়ে পড়েছিলেন চন্দ্রগুপ্ত যে আহার গ্রহণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন। শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে নর্মদা নদীর তীরে শ্রবণ বেলগোলা নামক স্থানে অনশন ব্রত আরম্ভ করলেন এবং এইভাবেই ছেদ পড়ল তাঁর জীবনের। মৃত্যুকালে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বয়স ছিল ষাট বছর।

সেলুকাসের সঙ্গে সন্ধি ও বৈবাহিক সম্বন্ধ হবার ফলে গ্রীক ও হিন্দু—এই দুই প্রাচীন সুসভ্য জাতি পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করেছিল। ফলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সম্ভব হয়েছিল। পর্যটক ও বিদ্যানুরাগীদের যাতায়াতের ফলে গ্রীক ও ভারতের মধ্যে যে ঐতিহ্যগত ঐক্য স্থাপিত হল তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

দুই সুসভ্য জাতির শিল্প, সাহিত্য, জ্যোতিষ ইত্যাদি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আদান প্রদানের ফলে উভয় জাতিই যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে।

ভারতের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল তাই বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের ত্যাগব্রতী নরপতিগণের ঐতিহ্যধারারই সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। ঐশ্বর্য ভোগ ও রাজ্যশাসন অপেক্ষা রাজ্যের নিরাপত্তা, বিধান, রাজ্য ও প্রজাপালনই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।

আর ভারতীয় জীবন ধারার এই সুমহান আদর্শই চন্দ্রগুপ্তের সুশৃঙ্খল রাজত্ব ও অসামান্য সাফল্যের ইতিহাস রচনা করেছিল।

জীবের দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের। তাই একদিনেই তিনি সমস্ত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পরিত্যাগ করে ভিক্ষু সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের জীবনচর্যা ও তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনা জগতবাসীর দৃষ্টান্তস্থল হয়ে আছে।

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তর উত্তরপুরুষ সম্রাট অশোক উত্তরধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন তাঁর পিতামহের অহিংসাবৃত্তি, লোকহিতৈষণা ও প্রজাবাৎসল্য। এই দুর্লভ গুণাবলী তাঁকে পৃথিবীর দুর্লভ গৌরবের অধিকারী করেছিল।

আলাউদ্দিন খাঁ

অধ্যবসায়, ধৈর্য, সাধনা আর নিষ্ঠা থাকলে একজন মানুষ যে যেকোনও ক্ষেত্রেই সাফল্যের চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করতে পারে—পৃথিবীর বহু মনীষীর জীবনে এই সত্য বারবার প্রমাণ হয়েছে।

অতি সাধারণ দীনহীন অবস্থা থেকে কোন মানুষ যখন কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ গৌরবের অধিকারী হন, তাঁর সাফল্যটাই তখন বড় হয়ে ওঠে সকলের চোখে। কিন্তু সেই গৌরব অর্জনের পথে তাঁকে যে কৃচ্ছ্রতা, ত্যাগ, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের কঠোর পরীক্ষা দিতে হয়, তার সন্ধান রাখে কজন?

অথচ সেই সফল সার্থক মানুষটির আসল পরিচয় বিধৃত থাকে পেছনে ফেলে আসা তাঁর জীবন-সংগ্রামের মধ্যেই।

তাই হলো জীবনের ইতিহাস। এই ইতিহাসই একটি জীবনকে অমরত্বে উত্তীর্ণ করে, চিহ্নিত করে আদর্শ পুরুষরূপে।

এমনি এক ইতিহাস-পুরুষ হলেন সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। তাঁর জীবন ও সাধনার আদর্শ মানুষের চিরকালের প্রেরণার উৎস-স্বরূপ।

ঈশ্বরের অনুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় অধ্যাত্মমার্গের সাধকরা ঘরবাড়ি, আত্মীয়-পরিজন, সুখ-ভোগ, ধন-ঐশ্বর্য, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে পাহাড়ে কন্দরে কঠিন সাধনায় মগ্ন হন। কখনো দেশে দেশে, পথে পথে ঘুরে বেড়ান, সাধু-সন্তের সঙ্গ করেন, শত শীত-গ্রীষ্ম, অনিদ্রা-অনাহারের যাতনা তাঁরা ভোগ করেন।

তারপর ভবিষ্যতে তাঁরাই একদিন অভিষ্ট লাভ করে মহাসাধক মহাপুরুষ হয়ে ওঠেন।

যাঁরা সঙ্গীতের সাধনা করেন, তাঁদের জীবনও এই ঈশ্বর পাগল সাধকদেরই মতো ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতার জীবন। সংসারের সবকিছু ত্যাগ করে গুরুর কৃপা লাভ করতে না পারলে সঙ্গীত জগতে প্রবেশের অধিকার লাভ করা যায় না। বহু লাঞ্ছনা, অপমান, অবহেলার কণ্টকে আকীর্ণ এই পথ।

সম্পূর্ণভাবে গুরুমুখী সুর সাধনার পথ আর ধর্ম সাধনার পথ তাই অভিন্ন বলেই সিদ্ধান্ত করা হয়।

সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বর উপলব্ধিও সম্ভব। সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জীবনই তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম ১৮৬২ খ্রিঃ, ৮ই সেপ্টেম্বর, ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার শিবপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সদু খাঁ।

সামান্য এক চাষী পরিবার হলেও আলাউদ্দিনের পরিবার গীতবাদ্যের চর্চার জন্য সুপরিচিত ছিল।

সদু খাঁ নিজে তানসেন বংশীয় ওস্তাদ কাশিম আলি খাঁর কাছে সেতারে তালিম পেয়েছিলেন। উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।

উত্তরাধিকার সূত্রেই পিতার সঙ্গীত প্রতিভা লাভ করেছিলেন আলাউদ্দিন। পাঁচবছর বয়সেই পিতার কাছে সেতারে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। দাদার কাছে তবলার ঠেকাও রপ্ত করেছেন।

সেই ছেলেবেলাতেই যাত্রার সঙ্গীত, জারী, সারি, বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন ও পীরের পাঁচালি জাতীয় ধর্মসঙ্গীতের মাধ্যমে সুরের জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

গ্রামের পাঠশালায় আলাউদ্দিনকে পড়াশুনা শেখার জন্য ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু পড়াশুনার চাইতে সুরের প্রতিই তিনি বেশি আকর্ষণ বোধ করতেন। পীরের দরগায় বা সাধু-বৈরাগীর আখড়ায় গান শুনে তন্ময় হয়ে থাকতেন। সেতারের সুর তাঁকে পৃথিবীর সবকিছু ভুলিয়ে দিত।

ছেলের অন্তরের টান কোন দিকে বুঝতে পেরে দূরদর্শী সদু খাঁ আর পড়াশুনার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করলেন না। স্কুল ছাড়িয়ে নিজেই ছেলেকে সেতারে তালিম দিতে লাগলেন।

কিন্তু মা চাইতেন আলাউদ্দিন লেখাপড়া শিখে বড় মানুষ হোক। তাই কঠোর শাসনে রেখে পড়াশুনার দিকে তাঁর মন ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু সুরের জগতের সন্ধান যে পেয়েছে, শুষ্ক পুঁথিগত বিদ্যার আকর্ষণে সে কি কখনো বাঁধা পড়ে।

সুরের আকর্ষণেই আলাউদ্দিন একদিন সকলের অজ্ঞাতে বরিশালের 'নাগ-দত্ত সিং' যাত্রাদলের সঙ্গে ঘরের মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন কলকাতায়।

অজানা অচেনা জায়গা। হাতের পয়সাকড়িও শেষ হয়ে গেছে। সঙ্গের পুঁটলিতে বাড়তি কয়েকটা জামাকাপড় ছিল। তা-ও চুরি হয়ে গেছে। কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, কি খাবেন, কিছুই জানা নেই।

এই অবস্থায় রাতের আশ্রয় হল ফুটপাথ। খিদে মেটালেন ভিক্ষে করে।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। উত্তর কলকাতার এক ধনীর বাড়ির লঙ্গরখানায় ভিখিরিদের একবেলা খাবার দেওয়া হত।

সন্ধান পেয়ে আলাউদ্দিন দুপুরের খাবারটা লঙ্গরখানায় খেতেন। রাতে ক্ষুধা মেটাতেন গঙ্গার জল দিয়ে।

কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে হতো না তাঁর। মনে আশা ছিল, বাজনা বাজানো শিখবেন, উপযুক্ত গুরু নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন।

একদিন সেই স্বপ্ন তাঁর সার্থক হল। পাথুরিয়াঘাটার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আলাউদ্দিনের গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁরই যোগাযোগে তখনকার দিনের খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী ধ্রুপদ গায়ক গোপাল ভট্টাচার্য (নুলো গোপাল) আলাউদ্দিনকে গানের তালিম দিতে স্বীকৃত হলেন।

তাঁর কাছেই গলা সাধার সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও তবলা বাজানোও শিখতে লাগলেন আলাউদ্দিন।

এই সময়ও ভরসা সেই লঙ্গরখানার একবেলা খাওয়া। বাকি বেলায় গঙ্গাজল। কিন্তু তাতে কী! মনে তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ। উপযুক্ত গুরু পেয়েছেন। শিখতেও পারছেন মন-প্রাণ ঢেলে।

এইভাবে কেটে গেল ৭টি বছর। সঙ্গীতগুরু গোপালচন্দ্রের মৃত্যু হল। সেই সময় মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গীত পরিচালক হাবু দত্তের সংস্পর্শে এলেন আলাউদ্দিন।

হাবু দত্তের পোশাকী নাম ছিল অমৃতলাল দত্ত। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা। তাঁর নিজের একটি ভাল অর্কেস্ট্রা দলও ছিল। সেই দল নাট্যকার গিরিশ ঘোষের থিয়েটারে গান ও নাচের সঙ্গে বাজাত।

আলাউদ্দিনের স্থান হয়ে গেল অর্কেস্ট্রা দলে। তবলা বাদকের কাজ। রাতে দলের সঙ্গে তবলা ও পাখোয়াজ বাজাতেন তিনি। আর দিনের বেলাটা ডুবে থাকতেন নিজের রেওয়াজ নিয়ে।

কিশোর আলাউদ্দিনের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে হাবু দত্ত তাঁর জন্য সামান্য মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে তাঁকে আর তখন লঙ্গরখানায় যেতে হত না।

মন উৎসাহে ভরপুর। গান-বাজনার জগতে এসে মিশেছেন, রেওয়াজও করতে পারছেন মনের মতো। এই সময়েই তিনি বেহালা ও বংশীবাদন সহ আরও কতগুলো যন্ত্র শিখে নিলেন।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের রূপকার নাট্যকার অভিনেতা গিরিশ ঘোষ থিয়েটারে আলাউদ্দিনের নাম বদলে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে ডাকতেন প্রসন্ন বিশ্বাস নামে।

নতুন কিছু শেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। যখনই যা ভাল লেগেছে, তাই শিখে নিয়েছেন অনায়াসে। আয়ত্ত করার দক্ষতা ছিল তাঁর জন্মগত।

থিয়েটারে থাকার সুবাদে বিচিত্র রকমের থিয়েটারি গানও কিছু আলাউদ্দিন রপ্ত করেছিলেন।

হাবু দত্তের দলে তিন বছর ছিলেন আলাউদ্দিন। এই সময়ের মধ্যে মেছোবাজারের হাজারী ওস্তাদের কাছে সানাইয়েরও তালিম নিয়েছেন।

সেই সময়ে কলকাতায় ইডেন উদ্যানে বিলিতি ব্যান্ড বাজনা বাজত। সেই বাজনা শুনে আলাউদ্দিনেরও ইচ্ছে হল ইংরাজি বাজনা শিখবেন।

ফোর্ট উইলিয়মের ব্যান্ডে বেহালা বাজাতেন লবো সাহেব। অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলেন আলাউদ্দিন। অল্পদিনের মধ্যেই শিখে নিলেন খাঁটি বিলিতি কায়দায় বেহালা বাজানো।

ইতিমধ্যে বাড়ি ছেড়ে আসার পর ৯ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কী করে খবর পেয়ে এতদিন পরে একদিন বড় ভাই বংশীবাদক আফতাবউদ্দিন কলকাতা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছোট ভাইকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

ঘর ছেড়ে আবার যাতে পালাতে না পারেন সেইজন্য উপযুক্ত বন্ধনরজ্জুরই ব্যবস্থা করেছিলেন আলাউদ্দিনের অভিভাবকেরা।

রাতারাতি তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের কনের নাম মদনমঞ্জরী। সবে নয় বছরের বালিকা।

সঙ্গীত-পাগল আলাউদ্দিনের মন পড়েছিল কলকাতার সঙ্গীতের জগতে। তাই বিয়ের রাতেই ঘুমন্ত নববধূর যৌতুকের টাকার পুঁটলি হাতিয়ে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে ঘর ছেড়ে সোজা কলকাতায় চলে এলেন। এসেই একটি বেহালা ও একটি ক্ল্যারিওনেট কিনে ফেললেন।

এই সময়েই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায় ময়মনসিংহের জমিদার মুক্তাগাছার রাজার সঙ্গে। রাজা জগৎকিশোর তরুণ শিল্পীকে নিয়ে আসেন তাঁর দরবারে।

সেই সময় আহমদ আলি নামে একজন প্রসিদ্ধ সরোদিয়া জমিদারের দরবারে ছিলেন। আলাউদ্দিনের মনে ইতিমধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তিনি সঙ্গীত পারদর্শী হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু জমিদারের দরবারে আহমদ আলি খাঁর তোড়ি রাগিণীর আলাপ শুনে তাঁর সেই অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল।

সুরের ঝঙ্কার তাঁর মনের গভীরে এমন আলোড়ন তুলল যে চোখের জল সামলাতে পারলেন না তিনি। উপলব্ধি করতে পারলেন তাঁর এতদিনের সাধনা শিক্ষা এই সঙ্গীতের তুলনায় অতীব তুচ্ছ।

আলাউদ্দিনের চোখের সামনে সবকিছু মিথ্যে হয়ে গেল। কেবল রইলেন ওস্তাদ আহমদ আলি খাঁ। তাঁর পা জড়িয়ে ধরে আলাউদ্দিন বারবার কাতর স্বরে অনুরোধ জানাতে লাগলেন তাঁকে শিষ্য করে নেবার জন্য।

আলাউদ্দিনের আগ্রহ ও আকুলতা দেখে মুগ্ধ হলেন সদাশয় জমিদার। তিনি নিজেই আহমদ আলিকে অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত সম্মত হলেন তিনি

আলাউদ্দিনকে শেখাতে এবং সেই দিনই তাঁর কাছে নাড়া বেঁধে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন আলাউদ্দিন।

জমিদার জগৎকিশোর তাঁর একটি সরোদ সেদিন আলাউদ্দিনকে উপহার দিয়েছিলেন।

আহমদ আলি নতুন চেলাকে নিয়ে রামগড়ে নিজ গৃহে ফেরেন। এখানে আলাউদ্দিনের শুরু হল নতুন জীবন। সকাল-সন্ধ্যা তাঁকে গুরুর সেবাযত্ন আর তাঁর ঘরের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত।

গৃহভৃত্যের মতো রান্না থেকে ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজের দায়িত্বই যথাসময়ে পালন করতে হত আলাউদ্দিনকে। সেই সঙ্গে ছিল আহমদ আলির নিজস্ব ফাইফরমাস।

এইসব কিছুর ফাঁকেই নিভৃতে চলছিল আলাউদ্দিনের সরোদ সাধনার শিক্ষা। গুরু নিজ হাতে তাঁকে যা শেখাতেন তাতে মন ভরত না। তবু, নিরাশ হননি তিনি।

শিষ্যরূপে তিনি যে দয়ালু গুরুর পায়ে ঠাঁই পেয়েছেন তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

আহমদ আলি যখন নিজে রাগ রাগিণীর আলাপ করতেন আলাউদ্দিন তা তন্ময় হয়ে শুনতেন।

পরে নিজে গোপনে তা অভ্যাস করতেন। একবার যা তিনি শুনতেন তা তাঁর স্মৃতিতে গেঁথে যেত। ফলে এভাবেই আহমদ আলির নিজস্ব ঘরানার কাজ রপ্ত করে নিয়েছিলেন তিনি।

একদিন শিষ্যের সরোদ বাজনা শুনে আহমদ আলি চমৎকৃত হলেন। নিজ বংশের জিনিস অন্যের করায়ত্ত হচ্ছে দেখে তিনি তাঁকে জানালেন, তাঁর আর শেখাবার মতো কিছু নেই। পরামর্শ দিলেন, বিখ্যাত বীণকার উজির খাঁর কাছে শেখার চেষ্টা করতে।

চার বছর রায়গড়ে থাকার পর আহমদ আলির কাছ থেকে বিদায় নিলেন আলাউদ্দিন। কিন্তু যাবেন কোথায়?

নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে দৈবক্রমেই এই সময়ে এক নাইটক্লাবে ব্যান্ড-মাস্টারের চাকরি পেয়ে যান। কিন্তু চাকরিতে মন নেই তাঁর। কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য স্বীকার করতে হয়েছে।

বিখ্যাত বীণকার উজির খাঁ রয়েছেন তাঁর সমস্ত মন জুড়ে। তাঁর কাছে যে আর্জি নিয়ে উপস্থিত হবেন, সেই উপায় নেই। খাঁ সাহেবের বাড়ির দেউরিতে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র প্রহরী।

ভেবে ভেবে উপায় বার করলেন আলাউদ্দিন। একদিন রামপুরের নবাববাহাদুর যখন তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, আলাউদ্দিন হঠাৎ সেই গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নবাবের হুকুমে আটক করা হল তাঁকে, বেয়াদবির শাস্তি পেতে হবে।

আলাউদ্দিন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি নবাবসাহেবকে নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্যের কথা লিখে জানালেন।

আলাউদ্দিনের সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ নবাববাহাদুরকে মুগ্ধ করল। তিনি তাঁকে প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। নবাবের আদেশে আলাউদ্দিন তাঁকে বেহালা বাজিয়ে শোনালেন।

নবাব ছিলেন সমঝদার ও গুণগ্রাহী। তিনি তরুণ শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হলেন এবং ওস্তাদ উজির খাঁকে ডেকে আলাউদ্দিনের শিক্ষার ভার দিলেন।

সেই রাতেই নাড়া বেঁধে আলাউদ্দিন উজির খাঁর শিষ্য তালিকাভুক্ত হলেন।

ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী উজির খাঁ ছিলেন সঙ্গীতগুরু তানসেনের বংশধর। নবাবের অনুরোধে তিনি আলাউদ্দিনকে বীণা এবং সরোদ বাজনা শেখাতে রাজি হয়েছিলেন।

নাড়া বাঁধার সময় তিনি নবাগত শিষ্যকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, "বিদ্যা কুপাত্রে দেব না, কুসঙ্গে যাব না, বিদ্যা ভাঙ্গিয়ে ভিক্ষা করব না, বাঈজী বারাঙ্গনাদের সঙ্গীত শেখাব না।"

নবাবসাহেব আলাউদ্দিন খাঁকে একদিন বলেছিলেন, সঙ্গীতবিদ্যা অর্থের বিনিময়ে উজির খাঁর কাছ থেকে কেউ লাভ করতে পারে না, কেবল তাঁর সেবা করেই তা লাভ করা সম্ভব।

এই উপদেশ মেনে আলাউদ্দিন তাঁর সঙ্গীতগুরুর খেদমতে যত্নবান হলেন। গৃহভৃত্যের মতোই তিনি উজির খাঁর সমস্ত আদেশ নির্দেশ পালন করতেন।

গোড়ার দিকে উজির খাঁ তাঁর পরিবারের বিদ্যা নবাগত শিষ্যটিকে দিতে গড়িমসি করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজহাতে আলাউদ্দিনকে শিক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভারতের বহু গুণী শিল্পী সেই সময় রামপুরের নবাবের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উজির খাঁর সুযোগ্য শিষ্য মহম্মদ হুসেন খাঁ। তরুণ আলাউদ্দিনের একাগ্রতা দেখে তিনি তাঁকে বীণাবাদন শেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু স্বয়ং উজির খাঁ তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেন না।

নবাব বাহাদুরের নিজস্ব একটি কনসার্ট দল ছিল। বিখ্যাত সব গুণী শিল্পী এই দলে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বেহালা বাজাবার জন্য আলাউদ্দিনের

প্রায়ই ডাক পড়ত। এইভাবেই তিনি আড়াই বছর পর উজির খাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।

অবশ্য উজির খাঁর জীবনের একটি বিয়োগান্ত ঘটনার প্রভাবও তাঁর মনোভাব পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল।

জ্যেষ্ঠপুত্র পিয়ার খাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন উজির খাঁ। পুত্রকে তিনি উপযুক্ত শিক্ষায় দক্ষ করে তুলেছিলেন।

হঠাৎ একদিনের অসুস্থতায় এই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের মৃত্যু হলে উজির খাঁর মনে হল, আলাউদ্দিনের প্রতি সুবিচার করেননি বলেই উপরওয়ালা তাঁকে পুত্রশোকের শাস্তি দিলেন।

তারপর থেকে তিনি আলাউদ্দিনের প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাঁকে প্রকৃত পাঠ দিতে লাগলেন।

দীর্ঘ বারো বছর গুরুর পদপ্রান্তে বসে সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করলেন আলাউদ্দিন। অতি কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁকে অর্জন করতে হয়েছিল গুরুর প্রসন্নতা ও আশীর্বাদ।

বারো বছর শিক্ষা গ্রহণের পর উজির খাঁ জানালেন আলাউদ্দিনের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, এখন তিনি স্বাধীনভাবে সঙ্গীতচর্চা করতে পারেন।

সব মিলিয়ে দীর্ঘ আঠারো বছর রামপুরে অবস্থানের পর আলাউদ্দিন ফিরে এলেন কলকাতায়।

দীর্ঘ সাধনার জীবনে আলাউদ্দিন সেতার, বাঁশী, বীণা, শানাই, বেহালা, সুরবাহার, সুরশৃঙ্গার, ক্ল্যারিওনেট, ফিডেন কর্নেট, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদনে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। অবশ্য সরোদিয়া হিসেবেই তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন।

কণ্ঠসঙ্গীতের মধ্যে ধ্রুপদ, ধামার, হোলী ও আলাপ শিখেছিলেন। আবার তার-যন্ত্রের বাইরে ঢোল, খোল, তবলা, পাখোয়াজ বাজনাতেও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

কলকাতায় আসার পর মধ্যপ্রদেশের মাইহারের রাজা ব্রজনাথ-সিং-এর সঙ্গে আলাউদ্দিনের যোগাযোগ হয়। রাজা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

আলাউদ্দিন কোন প্রকার গুরুদক্ষিণা নিতে রাজি হননি। সারাজীবন অশেষ কষ্ট স্বীকার করে তিনি সঙ্গীতবিদ্যা অর্জন করেছিলেন।

তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন সত্যিকার শিক্ষার্থীকে তিনি কোন দক্ষিণা ছাড়াই শেখাবেন।

শেষ পর্যন্ত রাজা আলাউদ্দিনকে তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার করে দেন। এই পদেই তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন।

এতদিনে স্ত্রীকে দেশ থেকে নিয়ে এসে সংসার পাতার অবসর পেলেন আলাউদ্দিন। মাইহারেই প্রথম তিনি তাঁর সংসার জীবন আরম্ভ করেছিলেন।

কিছুদিন পরেই রামপুর থেকে ডাক এল। গুরু উজির খাঁ তাঁকে জানালেন পুত্র পিয়ার খাঁর মৃত্যু হওয়ায় পুত্রপ্রতিম আলাউদ্দিনকেই পরিবারের সব বিদ্যা দিয়ে যেতে চান। আলাউদ্দিন তাই গুরুর কাছেই রয়ে গেলেন।

উজির খাঁর মৃত্যু হলে, তিন বছর পর তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। সঙ্গে নিয়ে এলেন সেনী ঘরানার দুর্লভ সঙ্গীতধারা।

মাইহারে আলাউদ্দিন উদ্ভাবন করলেন নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র—মনোহরা, কাষ্ঠতরঙ্গ, চন্দ্রসারং প্রভৃতি। ব্যবস্থা করলেন নিরক্ষর দরিদ্র লোকদের সঙ্গীত শিক্ষা দেবার।

ঢেঁড়া পিটিয়ে অনাথ, অন্ধ, নাম-পরিচয়হীন একশত জনকে সংগ্রহ করলেন সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য। এদের নিয়েই তিনি গঠন করলেন ভারতবিখ্যাত মাইহার ব্যান্ড। এছাড়াও বহু ছাত্রকে তিনি শিক্ষা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আলাউদ্দিনের সৃজনশীল প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতিটি ধারাই। তাঁর দক্ষতা এমনই অসাধারণ ছিল যে, তিনি বাঁ হাতে বাজাতে পারতেন যে যন্ত্র, তা ডান হাতেও বাজাতেন। উজির খাঁর কাছে শিক্ষনবিসীর সময় থেকেই তিনি তারের যন্ত্র বাজাতেন বাঁহাতে আর চামড়ার বাদ্য বাজাতেন ডান হাতে।

গৌরীপুরের জমিদার বীরেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর আমন্ত্রণে আলাউদ্দিন কিছুদিন গৌরীপুরে বাস করেছিলেন। বীরেন্দ্রকিশোরকে তিনি শিখিয়েছিলেন সুরবাহার।

তাঁরই আগ্রহে পন্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমেও কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন শিল্পী। শ্রী অরবিন্দ তাঁর বাজনা শুনে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমেও ঈশ্বরানুভূতি লাভ সম্ভব। আর আলাউদ্দিনকে মনে করতেন সেই ধারারই বিশিষ্ট সাধক।

১৯৩৫ খ্রিঃ বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত আলমোড়া কালচারাল সেন্টার-এর সঙ্গীত পরিচালক রূপে আলাউদ্দিন ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর একক বাদ্য সর্বত্রই পাশ্চাত্যের শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কিছুকালের জন্য তিনি ভিজিটিং প্রফেসরের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময় তাঁর সাধকরূপটি প্রত্যক্ষ করে অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন।

বিশিষ্ট সঙ্গীত-সাধক শান্তিদেব ঘোষ একদিনের বিবরণ এভাবে দিয়েছেন—"বাংলাদেশের বাউলদের মনের মানুষের জন্য বিরহ-বেদনার যেমন শান্তি নেই, তেমনি ওস্তাদের সঙ্গীতের জন্য বিরহবেদনাও কোনও দিন মিটবে না।

একদিন আলাউদ্দিন খাঁকে অনুরোধ করা হল সকালে ভৈরবীর আলাপ শোনাবার জন্য। তিনি আনন্দের সঙ্গে রাজি হলেন। উঠেছিলেন শান্তিনিকেতনের পান্থশালা গৃহে। শোনাবার আগে বললেন যে, এটি তাঁর বড় প্রিয় রাগিণী আর বড় গম্ভীর রাগিণী। ঠুংরীর সঙ্গে জড়িত। তবে সে সুর তাঁর নিজের মনের ঠিক সুরে না বেজে ওঠা পর্যন্ত তা শুনে শ্রোতারা সকলে আনন্দ পাবে কিনা তিনি বলতে পারেন না। সবসময় তা বাজতে চায় না বলেই তাঁর মনে দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু সেদিন সকালে সবাই অবাক! তানপুরায় সুর বাজছে। নাতিকে (আলি আকবরের পুত্র ধ্যানেশ) সঙ্গে নিয়ে বসলেন। আলাপে ভৈরবী-রাগিণীর রূপটি যেই মূর্তি ধরে উঠেছে ওস্তাদ তখনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। অল্পক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন সেই আলাপ। শ্রোতারা নিঃশব্দে বসে। সকলেরই মনে এক শিহরণ। অপূর্ব এক বেদনার জাল রচনা করে চলেছে ওস্তাদের দুই হাত।"

ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়েছেন সঙ্গীতাচার্য আলাউদ্দিনের শিষ্যরা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাঁর পুত্র আলি আকবর, কন্যা অন্নপূর্ণা এবং জামাতা রবিশঙ্কর।

এছাড়া বেনু-বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ, সঙ্গীত পরিচালক তিমিরবরণ ও তাঁর পুত্র ইন্দ্রনীল, সেতার শিল্পী নিখিল বন্দোপাধ্যায়, বেহালা শিল্পী শিশিরকণা, শরণরাণী ও রবীন ঘোষ প্রমুখ এবং আলাউদ্দিনের দুই ভ্রাতা বংশীবাদক আকতারউদ্দীন খাঁ ও সুরবাহারবাদক আয়েত আলী খাঁ।

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আলাউদ্দিন। তুলনারহিত ছিল তাঁর শিক্ষণপ্রতিভা। সৃজনশীল এই শিল্পীকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানিয়েছে তাঁর দেশবাসী।

১৯৫২ খ্রিঃ হিন্দুস্থানী যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য তাঁকে দেওয়া হয় সঙ্গীত আকাদেমী পুরস্কার। ১৯৫৪ খ্রিঃ নির্বাচিত হন আকাদেমীর ফেলো। ১৯৫৮ খ্রিঃ রাষ্ট্রীয় পদ্ম-ভূষণ এবং ১৯৫৪ খ্রিঃ বিশ্বভারতী কর্তৃক দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয় তাঁকে।

শেষ জীবনে আলাউদ্দিন বেরিলীর পীরসাহেবের প্রভাবে যোগ, প্রাণায়াম ও ধ্যান শেখেন। মাইহারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সারদেশ্বরী মঠ। সেখানে তিনি দেবী ভারতীর নিত্য সেবা পূজা ধ্যান করতেন।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস

সাধারণ এক তন্তুবায়ের ছেলে ক্রিস্টোফার কলম্বাস কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে লাভ করেছিলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নাবিকের সম্মান। পৃথিবীর ভৌগোলিক ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে তাঁর অভিযান কাহিনী।

কলম্বাসের জন্ম সময় ও তারিখ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। তবে অনুমান করা হয় ১৪৫১ খ্রিঃ আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে কোন একদিন জন্ম হয়েছিল তাঁর।

সাধারণ এক তাঁতী পরিবারে জন্মেছিলেন কলম্বাস। কাপড়ের ব্যবসার সূত্রে পরিবারটি ছিল যথেষ্ট সচ্ছল। তাই সুখের মধ্যেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন তিনি।

ছেলেবেলাতেই তিনি ব্যবসায়ীদের মুখে সোনার দেশ ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট পোশাক, বিভিন্ন মশলা ও বিপুল ধনসম্পদের কথা জানতে পেরেছিলেন। তাই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, তিনিও একদিন ভারতবর্ষে গিয়ে জাহাজ বোঝাই করে সোনা-রুপো, হীরে মণিমানিক্য নিয়ে আসবেন।

ছেলেবেলা থেকে এই স্বপ্নই হয়ে উঠেছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, এককথায় ভাবনা-কল্পনার চালিকাশক্তি।

জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও লাতিন ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি কিশোর বয়স থেকেই বাবাকে ব্যবসার কাজে নিয়মিত সাহায্য করতেন কলম্বাস। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল ভূগোল।

দেশ-বিদেশের বিবরণ পড়ে তাঁর স্বপ্নচারী মন অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দে উতলা হয়ে উঠত।

কলম্বাস নিজে যে আত্মকাহিনী রচনা করেছেন তা থেকেও তাঁর কিশোর বয়স সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বস্তুতঃ তাঁর জীবনের প্রথমার্ধ, আটাশ বছরের আগে পর্যন্ত অনেক বিষয়ই অজানা থেকে গেছে।

যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায়, তাঁর বাবা ব্যবসায়ে সর্বস্বান্ত হলে তাঁদের পরিবার অভাব অনটনের কবলিত হয়। তখন বাধ্য হয়েই কলম্বাসকে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় নামতে হয়।

বাবার এক বন্ধুর কাছে মানচিত্র তৈরি করতে শিখেছিলেন তিনি। এই সময়ে ছোট ছোট মানচিত্র তৈরি করে পথে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন।

অনুমান করা হয়, এই সময়েই কোনও জাহাজে চাকরি নিয়ে তিনি সমুদ্র অভিযানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

জীবনের প্রয়োজনেই কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাই সমস্ত রকম

প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর ভাগ্য ছিল নিতান্তই বিরূপ।

সেই সময়ে কলম্বাসের ভাই বাস করতেন লিসবন শহরে। জীবিকার্জনের আশায় ভাইয়ের কাছে এসেই উঠলেন কলম্বাস শেষ পর্যন্ত। তখন তিনি আটাশ বছরের যুবা।

ভাইয়ের চেষ্টায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লিসবনে একটা কাজও পেয়ে গেলেন কলম্বাস। প্রায়ই তিনি যেতেন গীর্জায়। সেখানেই একদিন আলাপ হল ফেলিপা মোইস দ্য পেরেস্ত্রেল্লো নামে এক তরুণীর সঙ্গে।

ফেলিপার বাবা বার্থোলোমিউ ছিলেন সম্রাট হেনরির নৌবাহিনীর পদস্থ অফিসার।

ফেলিপার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই কলম্বাসের জীবনের পটপরিবর্তনের সূত্রপাত হল। কিছুদিনের মধ্যেই দুই তরুণ-তরুণীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হল এবং ফেলিপা ও কলম্বাস বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

বিবাহের পর শ্বশুর গৃহেই থিতু হলেন কলম্বাস। এই সময় পরিবারের লাইব্রেরীতে বসে তিনি পড়তেন দেশ-বিদেশের ভ্রমণ-কাহিনী।

তাছাড়া শ্বশুরের কাছে শুনতে পেতেন তাঁর জীবনের সমুদ্র অভিযানের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী।

ভবিষ্যৎ অভিযাত্রী কলম্বাসের মানসিক প্রস্তুতি এইভাবে পরিপুষ্ট হতে লাগল।

একদিন তাঁর হাতে পড়ল মার্কো পোলোর চীন ভ্রমণের বৃত্তান্ত। সেই কাহিনী পড়ে প্রাচ্যদেশে অভিযানের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠল তাঁর মনে।

প্রাচ্যদেশে পথেঘাটে ছড়িয়ে থাকে সোনা-রুপো, হীরে। অফুরন্ত সম্পদ সেখানে। ইচ্ছে করলেই সেসব জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে আসা যায়। প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে তখন এমন ধারণাই গড়ে উঠেছিল লোকের মনে।

শৈশবেই এই জনশ্রুতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কলম্বাস। মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়ার পর অভিযানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁর মনে জেগে উঠল তীব্র স্বর্ণতৃষ্ণা।

এবারে তাঁর ভাবনার মোড় ফিরল নতুন দিকে। মনের অভিলাষ পূর্ণ করতে হলে দরকার কয়েকটি জাহাজের, কী করে সংগ্রহ করা যায় সেসব?

তাহলে প্রাচ্য দেশের সুগন্ধি মশলা আর তাল তাল সোনা নিয়ে আসার কোন বাধাই থাকে না।

ভাগ্যক্রমে এই সময় কলম্বাসের পরিচয় হয় এক বৃদ্ধ নাবিকের সঙ্গে। সেই নাবিক এক বাণিজ্য-জাহাজে করে পাড়ি দিয়েছিল দূর দেশে। ঝড়ে পথ হারিয়ে

জাহাজ গিয়ে পড়েছিল এক অজানা দেশে।

জনপ্রাণীহীন মরুময় সে দেশ। জল নেই, খাদ্য নেই—ধূ ধূ করছে চারদিক। সেই দেশে থাকতে সাহস পায়নি তারা। তাই সেখান থেকে আবার দেশের পথ ধরল। শেষ পর্যন্ত যখন জাহাজ বন্দরে ভিড়ল, তখন জাহাজের অধিকাংশ লোকই প্রাণ হারিয়েছে। ভাগ্যক্রমেই প্রাণ বেঁচে গিয়েছিল সেই বৃদ্ধ নাবিকের।

কলম্বাস এই অভিযান-কাহিনী শুনে আশান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হল সেই অজানা দেশই সোনায় মোড়া প্রাচ্য দেশ।

সেই যুগের বিখ্যাত ভূগোলবিদ ছিলেন প্যাগোলো টোসকানেলি। স্বপ্নের প্রাচ্যভূমি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য কলম্বাস চিঠি লিখলেন প্যাগোলোর কাছে।

চিঠির উত্তরে তিনি কলম্বাসকে উৎসাহিত করে লিখলেন, তিনি যে দেশের স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে সত্যি সত্যিই পথে ঘাটে ছড়িয়ে থাকে সোনা রুপো, হীরা, মণি, মাণিক্য।

সেই সোনার দেশে যাবার পথের একটি নক্সা তিনি তৈরি করেছেন। এই নক্সার সাহায্যে কলম্বাস স্বচ্ছন্দে পৌছে যেতে পারবেন প্রাচ্য ভূখন্ডে।

চিঠির সঙ্গে প্যাগোলোর পাঠানো নক্সাটি পেয়ে কলম্বাসের মনের সঙ্কল্প এবারে সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হল। তিনি যাত্রার তোড়জোড় আরম্ভ করলেন।

কিন্তু কলম্বাসের চিন্তা ভাবনার সমর্থনে এগিয়ে এলো না একটি লোকও। সকলেই ব্যাপারটিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিল। এমন কি অনেক ক্ষেত্রেই তিনি হয়ে উঠলেন উপহাসের পাত্র।

কলম্বাস ছিলেন উদ্যমী পুরুষ। তাই এত সহজে হতাশ হলেন না। তিনি সরাসরি পর্তুগালের সম্রাট জনের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করলেন।

সম্রাট সব শুনলেন। কিন্তু কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন কলম্বাস।

কিন্তু হাতপা-গুটিয়ে বসে থাকলেন না। কিছুদিন পরেই তাঁর অভিযানে সাহায্য প্রার্থনা করে আবেদন জানালেন স্পেনের সম্রাট ফার্দিনান্দ এবং রানী ইসাবেলার কাছে।

ততদিনে ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছিল কলম্বাসের। সম্রাট ফার্দিনান্দ তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করলেও রানী ইসাবেলার সহযোগিতার আশ্বাস পেলেন তিনি।

এই সময়ে আকস্মিক বিপর্যয় নেমে এলো কলম্বাসের জীবনে। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে ভুগে অল্প দিনের মধ্যেই মারা গেলেন তাঁর স্ত্রী ফিলিপা। ফলে সাময়িক ভাবে কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখতে হল তাঁর পরিকল্পিত অভিযানের

প্রস্তুতি। স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় কলম্বাসের পেছুটান বলতে কিছুই রইল না। তিনি তাই পূর্ণউদ্যমে তাঁর স্বপ্নকে সফল করার কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন।

অভিযানের জন্য প্রয়োজন ছিল অর্থ, জাহাজ ও নাবিক। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার মতো দেশের প্রতিটি সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে আবেদন জানাতে লাগলেন তিনি।

সাহায্যের বিনিময়ে অফুরন্ত হীরে-জহরৎ দেবারও প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর। সেই সঙ্গে দাবি ছিল, যে দেশ তিনি আবিষ্কার করবেন, তাঁকে করতে হবে সেই দেশের ভাইসরয় আর দিতে হবে রাজস্বের একটা অংশ। দুঃখের বিষয়, সব জায়গাতেই প্রত্যাখ্যাত হলেন তিনি।

এই সময়টা খুবই সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল তাঁর। অর্থের অভাবে প্রতিদিন নিয়মিত খাবারদাবারও জুটত না। অভাব-অনটনের সঙ্গে জুটেছিল হতাশার বেদনা। তাই প্রাচ্যদেশে অভিযানের পরিকল্পনা রূপায়নের আর কোন পথই ছিল না।

তবু দুর্মর আশায় ভর করে তিনি স্থির করলেন পর্তুগাল ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করবেন।

ঘটনাচক্রে এই সময়ে ফাদার পিরেজের সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রানী ইসাবেলা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

কলম্বাসের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে ফাদার পিরেজ তাঁকে সাহায্যের জন্য রানী ইসাবেলাকে অনুরোধ করলেন।

কলম্বাসের অভিযানকে কেন্দ্র করে ফাদারেরও নিজস্ব একটি পরিকল্পনা জন্ম নিয়েছিল। অজানা দেশের বহু মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে অক্ষয় পুণ্য অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি।

এই সময় আরো কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলম্বাসের সহায়তায় এগিয়ে এলেন। তারপর একদিন সম্রাটের দরবার থেকেও এলো আহ্বান।

কলম্বাসের কাছ থেকে তাঁর সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি পরিষ্কারভাবে জেনে নিলেন কৌতূহলী সম্রাট। তারপর ১৮৯২ খ্রিঃ ১৭ই এপ্রিল উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

স্থির হল কলম্বাসের আবিষ্কৃত নতুন দেশের শাসনভার দেওয়া হবে তাঁকে সেই সঙ্গে তিনি পাবেন অর্জিত সম্পদের এক দশমাংশ।

এতদিনে স্বপ্ন সফল করার পথ নিষ্কন্টক হল। সৌভাগ্যের উদয় হল কলম্বাসের জীবনে।

সম্রাটের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে অল্প দিনের মধ্যেই তিনটি

জাহাজ নির্মাণ করালেন তিনি। জাহাজগুলোর নাম দেওয়া হল সান্তামারিয়া, পিটা ও নিনা।

জাহাজ তৈরির কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও নাবিক সংগ্রহের কাজটি সহজসাধ্য ছিল না।

অজানা অচেনা পথে পাড়ি দিতে হবে, কোনও দিন ফিরে আসা সম্ভব হবে কিনা সেই বিষয়টি ছিল অনিশ্চিত। তাই জীবনের ঝুঁকি নিতে সহজে কেউ রাজি হতে চাইল না।

ইতিমধ্যে আরো কিছু বিশিষ্ট লোকের সাহায্য লাভ করলেন কলম্বাস। তাঁদেরই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৮৪জন নাবিকও সংগ্রহ করা সম্ভব হল।

এবারে নিশ্চিন্ত হলেন কলম্বাস। ১৮৯২ খ্রিঃ ৩ আগস্ট নবনির্মিত তিনটি জাহাজে করে প্রয়োজনীয় রসদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে অজানা সমুদ্রের পথে ভেসে পড়লেন।

অফুরন্ত জলের রাজত্বে দিনের পর দিন কাটতে লাগল। জল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না কোন দিকে। স্থলভূমির সন্ধানে ক্রমেই অধীর অশান্ত হয়ে উঠতে থাকে নাবিকেরা।

কলম্বাস তাদেব দেন সান্ত্বনা, শোনান উৎসাহের কথা, কিন্তু তাতেও কাজ হয় না। ধৈর্য হারিয়ে ফেলে নাবিকরা।

শেষ পর্যন্ত একদিন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে—ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে জাহাজ দেশে।

এমনি সময়ে সকলের চোখ পড়ে সমুদ্রের জলে, ভেসে চলেছে একটি সবুজপাতার গাছের ডাল। বোঝা যায় নিকটেই রয়েছে স্থলভূমি।

কলম্বাস বিক্ষুব্ধ নাবিকদের কাছে একটি মাত্র দিন চেয়ে নেন। সেই দিনটি ছিল ১২ই অক্টোবর।

অবশেষে সহর্ষে লাফিয়ে উঠল নাবিকের দল। রোডারিগো নামে একজন নাবিক সর্বপ্রথম দিগন্তে দেখতে পেলেন স্থলের চিহ্ন।

১২ অক্টোবর দিনে বাহমা দ্বীপপুঞ্জের এক অজানা দ্বীপের মাটিতে পা রাখলেন কলম্বাস। তাঁর সঙ্গে জাহাজ থেকে নামলেন ক্যাপ্টেন মার্টিন আর ক্যাপ্টেন ভিসেন্ট। সকলেরই হাতে স্পেনের রাজকীয় সবুজ পতাকা।

সেই পতাকা মাটিতে পুঁতে কলম্বাস ঘোষণা করলেন. এতদিনে আমি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করলাম।

প্রকৃতপক্ষে সেই দিন কলম্বাস যে দেশটি আবিষ্কার করেছিলেন, তা ভারতবর্ষ নয়, ছিল আমেরিকার একটি অংশ।

কলম্বাস যে দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন তিনি তার নাম দিয়েছিলেন সান-সালভেদর। বর্তমানে নামকরণ হয়েছে ওয়েস্টলিং আইল্যান্ড।

৩ আগস্ট দিনটি আজও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বাস দিবস রূপে পালিত হয়ে থাকে।

কলম্বাসের ধারণা ছিল তিনি প্রাচ্যভূমি অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে এসে পৌঁচেছেন। যদিও তাঁর এই ধারণা ছিল ভ্রান্ত।

তবে এই আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনিই ইউরোপের মানুষের কাছে এক অজানা পৃথিবীর দ্বার প্রথম উন্মোচিত করেছিলেন।

অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণ থাকলেও স্বর্ণসন্ধানই মূল উদ্দেশ্য। তাই নতুন ভূমিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই চর্তুদিকে চলল অনুসন্ধান। কিন্তু মার্কো পোলোর বর্ণনার কোন মিলই পাওয়া গেল না কোনও দিকে। সোনাদানার বা হীরে মণির চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

ঘুরতে ঘুরতে অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল একদল আদিবাসী মানুষের। তবে তাদের কথার একবর্ণও কলম্বাস বা তাঁর দলের কেউ বুঝতে পারলেন না।

এসত্ত্বেও দমলেন না তিনি। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, মার্কো পোলো বর্ণিত সোনার দেশ কিপাংগু শহরেই পৌঁচেছেন তিনি। অবিলম্বেই অফুরন্ত সোনার ভান্ডারের সন্ধান পাবেন।

সান সালভেদরের পর কলম্বাস গেলেন কিউবা এবং হিস্পানিওয়ালা দ্বীপে। সাময়িক শিবির স্থাপন করলেন শেষোক্ত দ্বীপে। সেখানে ৪২ জন নাবিকের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। তারপর অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে স্বদেশের পথে পাড়ি জমালেন।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আরো লোকজন নিয়ে এসে এখানে ব্যাপকভাবে সোনার সন্ধান করবেন। যাবার সময় নতুন দেশে পৌঁছবার প্রমাণ হিসেবে সঙ্গে নিয়ে গেলেন স্থানীয় কিছু আদিবাসীকে।

অফুরন্ত সোনাদানা মণি-মাণিক্য সঙ্গে নিয়ে দেশে ফেরার কথা ছিল কলম্বাসের। কিন্তু তিনি ফিরেছিলেন শূন্য হাতে। তবুও নতুন দেশ আবিষ্কারের সুবাদে দেশে অভূতপূর্ব সংম্বর্ধনা লাভ করলেন তিনি।

কলম্বাসের সম্মানে রাজা রানী বিশেষ ভোজের আয়োজন করলেন।

কলম্বাসকে আশীর্বাদ জানালেন স্বয়ং পোপ। তিনি ঘোষণা করলেন কলম্বাসের আবিষ্কৃত নতুন দেশ স্পেনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তারপর সম্রাট নিজেই নতুন এক অভিযানের আয়োজন করলেন। প্রস্তুত হল সুসজ্জিত নৌবহর, সংগৃহীত হল অসংখ্য লোকজন।

অবশেষে ১৪৯৩ খ্রিঃ ২৪ শে সেপ্টেম্বর কলম্বাসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় সমুদ্র অভিযানের যাত্রা শুরু হল।

এবারে আর পথের অনিশ্চয়তা নেই। চেনা পথে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর তিনি এসে পৌঁছলেন হিস্পানিওয়ালা দ্বীপে।

সেখানে তখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল অভাবিত দৃশ্য। যে ৪২ জন নাবিক তিনি আস্তানায় রেখে গিয়েছিলেন তাদের অর্ধেক মারা গিয়েছিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অবশিষ্ট প্রাণ হারিয়েছিল স্থানীয় আদিবাসীদের হাতে।

স্থানীয় আদিবাসীদের মন জয় করার জন্য ইউরোপীয়রা এমন ভান করেছিল যে বলিষ্ঠকায় সরল মানুষগুলো তাদের দেবদূত হিসাবে সম্মান ও আনুগত্য দেখিয়েছিল।

কিন্তু সাদা মানুষরা অল্পদিন পরেই জোর করে আদিবাসীদের নিজেদের দাসে পরিণত করতে লাগল। মেয়েদের হীন লালসা চরিতার্থ করার জন্য নির্যাতন করতে লাগল।

এসব কারণে স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল স্থানীয় আদিবাসীরা। একরাতে আক্রমণ চালিয়ে তারা নির্বিচারে হত্যা করল শ্বেত দেবতাদের। আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করল তাদের ডেরা।

দেখেশুনে সংযত হলেন কলম্বাস। তিনি আদিবাসীদের মন যুগিয়ে থেকে নানা দিকে ধনসম্পদের সন্ধান করতে লাগলেন।

এযাত্রায় নতুন কয়েকটি দ্বীপের সন্ধান পাওয়া ছাড়া আর কিছুই পেলেন না তিনি। অগত্যা নিজমূর্তি ধরলেন। আদিবাসীদের দাস হিসাবে বন্দী করে জাহাজ বোঝাই করে দেশে পাঠালেন।

ইউরোপের দেশগুলিতে দাস প্রথার প্রচলন থাকলেও দাসদের নিয়ে ব্যবসায়ের প্রচলন সেভাবে তখনও হয়নি।

তাই কলম্বাসের এই কাজের প্রচন্ড সমালোচনা হল। ইসাবেলা নিজেও পছন্দ করেননি কলম্বাসের এ কাজ।

এই সংবাদ জানতে পেরে কলম্বাস অবিলম্বে দেশে ফিরে যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন। আড়াই বছর পরে ১৪৯৬ খ্রিঃ বছরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি স্পেনে ফিরে এলেন। দেশে এবার তাঁর জন্য কোনও সম্বর্ধনার আয়োজন ছিল না।

রাতারাতি অবস্থার এমন অবনতি ঘটতে দেখেও মনোবল হারালেন না কলম্বাস। তাঁর বিশ্বাস ছিল, নবাবিষ্কৃত ভূখন্ড থেকে অফুরন্ত ধনসম্পদ তিনি আহরণ করতে পারবেন।

সেই বিশ্বাসেই অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নতুন অভিযানের জন্য সম্রাটের

সম্মতি আদায় করলেন। তারপর ১৪৯৮ সালের ৩০ মে তৃতীয় অভিযানে যাত্রা করলেন। এবারে নিজের পুত্র ও ভাইকেও সঙ্গী হিসাবে নিয়েছেন।

হিস্‌পানিওয়ালায় পা দিয়েই কিন্তু স্থানীয় মানুষের বিদ্রোহের মুখে পড়তে হল কলম্বাসকে। নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করলেন তিনি।

এই সংবাদ স্পেনে পৌঁছলে সম্রাট ফ্রান্সিসকো দ্য বোবদিলা নামে একজন রাজকর্মচারীর অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন কলম্বাসের কাজের তদন্ত করতে।

বোবদিলা ইসাবেলা দ্বীপে পৌঁছে প্রথমে কলম্বাসের পুত্র ও ভাইকে বন্দী করলেন।

হিস্‌পানিওলা দ্বীপে কলম্বাস তখন সর্বময় ক্ষমতায় আসীন। তথাপি বোবদিলার কাজে তিনি কোনও প্রকার বাধার সৃষ্টি করলেন না। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের সম্মান দেখিয়ে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন। বন্দী করে তাঁকে নিয়ে আসা হল স্পেনে।

কলম্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল, তাঁর নির্বুদ্ধিতার জন্য সম্রাটের প্রভূত পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটেছে। সোনা ও মূল্যবান মশলা আবিষ্কারের নামে তিনি সম্পদহীন দেশ আবিষ্কার করেছেন।

রানী ইসাবেলা কলম্বাসের প্রতি বরাবরই ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। এবারেও তাঁরই অনুগ্রহে কলম্বাস কারামুক্ত হলেন।

এই ঘটনা কলম্বাসের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। সম্রাট ও রানীর কাছ থেকে যে সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন তা ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেননি। একজন সফল অভিযাত্রী হিসেবে সমগ্র ইউরোপে যে সুখ্যাতি তিনি লাভ করেছিলেন, তারও মর্যাদা রক্ষা করতে পারেননি। ব্যর্থতা মানুষকে হতাশ নিষ্ক্রিয় করে দেয়। কিন্তু কলম্বাস ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। অজেয় ছিল তাঁর মনোবল। তিনি কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না। অদম্য সাহসে ভর করে চতুর্থ অভিযানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন।

ততদিনে শরীর তাঁর অনেকটাই কর্মক্ষমতা হারিয়েছে। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। তবুও গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে উপস্থিত হলেন মহামান্য সম্রাটের দরবারে। চতুর্থবারের জন্য সমুদ্রযাত্রার আবেদন জানালেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হল না। তবে, সম্রাট জানালেন, হিস্‌পানিওলাতে এদফায় যাওয়া চলবে না।

কলম্বাসের জাহাজ সমুদ্রে ভাসল। চতুর্থবারের অভিযান। সময়টা ১৫০২ খ্রিঃ ১৯শে মে।

কলম্বাস চলেছিলেন পশ্চিম দিকে। মাঝ পথে পড়লেন প্রবল ঝড়ের মুখে। বিধ্বস্ত জাহাজ নিয়ে আশ্রয় নিলেন এক অজানা দ্বীপে।

নাবিকদের অধিকাংশ জলে ভেসে গিয়েছিল। রসদের ভাঁড়ারেও ছোবল পড়েছিল ঝড়ের। তবুও অপরাজেয় কলম্বাসের মনোবল অটুট। তিনি বিশ্বাস করতেন, কাজই মানুষের জীবন।

যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে প্রাণ থাকবে, অভীষ্ট পূরণের জন্য কাজ তাকে করে যেতে হবে। সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন কলম্বাস। সেখান থেকে ফিরে যান জামাইকা দ্বীপে। কঠোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল। নতুন দেশের অজানা রোগে সঙ্গীদের অনেকেই মারা গেল।

সেই অবস্থাতেই দু বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েও নিরাশ হলেন কলম্বাস। শূন্য হাতেই ফিরে এলেন দেশে।

মনের শান্তি হারিয়ে অশক্ত দেহে এরপর আরও দু বছর বেঁচেছিলেন কলম্বাস। শেষ জীবনে রাজানুগ্রহ থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি।

সেদিন নগদ সম্পদ তিনি সম্রাটের হাতে তুলে দিতে পারেননি। তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্বও কেউ অনুধাবন করতে পারেননি। তাই লোকচক্ষুর অগোচরে ভ্যালাডোলিড শহরের এক সামান্য কুটিরে একজন নগণ্য মানুষের মতো কলম্বাসকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছিল। সময়টা ছিল ১৫০৩ খ্রিঃ।

জিওফ্রি চসার

কবি কৃত্তিবাস যেই অর্থে আমাদের আধুনিক বাংলা কাব্যের আদি কবি, জিওফ্রি চসারও তেমনি আধুনিক ইংরাজি কাব্যের আদি কবি। গবেষকদের মতে তিনি হলেন আধুনিক ইংরাজি কাব্যের প্রথম কবি।

ক্যান্টারবেরি টেলস নামক অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থের জন্যই তিনি একজন মহৎ কবি বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

ইউরোপের মধ্যযুগের কবি চসারের জীবন বৃত্তান্ত এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গবেষকদের অক্লান্ত চেষ্টায় কবির জীবনের একটা রেখাচিত্র মাত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের মতো ইউরোপের মধ্যযুগের কোন কোন কবিও তাঁদের নিজ নিজ রচনার মধ্যেই সঙ্কেতের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় উল্লেখ করে গেছেন।

সেই পরিচয়ের সূত্রেই তাঁদের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে পরবর্তীকালে। উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা।

প্রাচীন নথিপত্র ঘেঁটে চসারের উল্লেখ পাওয়া গেছে। কবি নিজেও কবিতার ভনিতায় পরিচয়ের উল্লেখ করেছেন। সমস্ত কিছু মিলিয়ে গবেষকরা যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা থেকে জানা যায় ১৩৪০ খ্রিঃ লণ্ডনে কবি চসারের জন্ম। অবশ্য জন্মের সঠিক তারিখটি এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

তবে সাল সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে দ্বিমত নেই। বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের কাজ এখনও চলছে।

কবির পারিবারিক পরিচয়, বাবা-মার নাম বা তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি বিষয় এখনও অজানা। তবে প্রাচীন কাগজপত্র থেকে তাঁর কর্মজীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

এ পর্যন্ত যে সকল তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে জানা যায়, কবি চসার যে পরিবারে জন্মেছিলেন সেই পরিবারের পেশা ছিল সুরা ব্যবসা। তাঁর পিতাও ছিলেন একজন সুরা ব্যবসায়ী। তাঁদের আবাস ছিল টেমস স্ট্রীটে। পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ক্ষীণস্রোতা ওয়াল ব্রুক।

চসারের পৈতৃক ব্যবসার সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে তাঁর পার্ডনার টেলস রচনার মধ্যে। কবি নিজে এই ব্যবসায় বিশেষ পছন্দ করতেন না। তার আভাসও রয়েছে সেখানে।

চসার নিজে কখনও পৈতৃক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হননি।

রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র ছিলেন ডিউক অব ক্লারেন্স। চসার মাত্র সতেরো বছর বয়সেই ডিউকপত্নী এলিজবেথের গৃহে পরিচারকের কাজ গ্রহণ করেন।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের এই বালক ভৃত্য ছিলেন বুদ্ধিতে ও কৌতূহলে অন্যদের থেকে অলাদা। তাই সেই সময়ের রাজনৈতিক, সামরিক ও অসামরিক অবস্থার বিষয়ে তিনি রীতিমতো ওয়াকিবহাল থাকতেন।

রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকালেই ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের শতবর্ষের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই দিক থেকে বলা যায় চসার ছিলেন রাজকীয় সামরিক তৎপরতার সাক্ষী এবং মাত্র উনিশ বছর বয়সেই উর্দি খুলে রেখে তাঁকেও গায়ে চাপাতে হয়েছিল সামরিক পোশাক।

দেশের রাজার সামরিক বিজয়ের আনন্দের আস্বাদ চসার পেয়েছিলেন বাল্য বয়সেই। তাঁর যখন মাত্র ছয় বছর বয়স সেই সময়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাস্ত করেছিল ইংলণ্ড। এই যুদ্ধজয়ের আনন্দে মেতে উঠেছিল গোটা দেশ। সেই স্মৃতি বালক চসারের স্মরণে ছিল।

তার পরে ১৩৫৬ খ্রিঃ পয়টারের যুদ্ধেও ফরাসীরা হয়েছিল শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত। চসার তখনও ডিউকের প্রাসাদে পরিচারকের কাজ গ্রহণ করেননি। সেই যুদ্ধজয়ের স্মৃতিও চসারের মনে ছায়া ফেলেছিল। এবং স্বভাবতই তিনি কিশোর বয়সেই যুদ্ধের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

চসারের যখন ১৯ বছর বয়স, সদ্য যুবক তিনি, ১৩৫৯ খ্রিঃ তৃতীয় এডওয়ার্ড আবার ফরাসী আক্রমণ করলেন। চসারও সামরিক পোশাক গায়ে চাপিয়ে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এই যুদ্ধে সামিল হলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী সৈন্যদের হাতে বন্দী হলেন চসার। তবে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হবার আগেই মুক্তি পেলেন তিনি। তাঁর মুক্তিপণ ১৬ পাউণ্ড রাজতহবিল থেকেই দেওয়া হয়েছিল।

মুক্তি পাবার পর চসার কোথায় গিয়েছিলেন, কি করেছেন, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

আবার তাঁকে পাওয়া যায় ১৩৬৭ খ্রিঃ। তিনি তখন রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছেন পরিচারক হিসেবে।

যুদ্ধবন্দী হবার সুবাদে চসার রাজানুগ্রহ লাভ করেছিলেন। তাঁকে আজীবন ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছিল। ফলে আর্থিক দিক থেকে অনেকটাই নিশ্চয়তা ফিরে পেয়েছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় দফায় রাজ পরিবারে কাজে যোগ দেবার পর চসারকে দেওয়া হয়েছিল শয্যা রচনার কাজ। সেই সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজও করতে হত।

প্রাপ্ত কিছু নথিপত্র থেকে গবেষকরা অনুমান করেছেন, প্রাসাদের এই কাজ থেকে পরে চসারকে রাজার চতুর্থ পুত্র জন অব গণ্ট-এর আবাসে বদলি করা হয়েছিল।

কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততার ফাঁকে যে কবির কাব্যচর্চার অভ্যাসও অব্যাহত ছিল তা অনুমান করা যায়। কেনা না ১৩৬৯ খ্রিঃ রচিত তাঁর কবিতার মধ্যে তিনি কর্মজীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

চসার ডিউকপত্নী ব্লাঁচের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন দ্য বুক অব দ্য ডাচেস এবং এই রচনার সুত্রেই তাঁর প্রতি ওপরওয়ালাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

অচিরেই রাজপরিবারের ভৃত্যের কাজ থেকে অব্যাহতি পান তিনি। তাঁকে নিযুক্ত করা হতে থাকে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কাজে।

এই ভাবেই একদিন ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। চসার হয়ে উঠলেন রাজপুরুষদের কাছের মানুষ।

দূতাবাসের কাজে চসার ১৩৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত জেনোয়া পিসা এবং ফ্লোরেন্স ভ্রমণ করেন।

কবি ও কূটনীতিক হিসেবে ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি। ১৩৭৭ খ্রিঃ সিংহাসনে আরোহণ করে দ্বিতীয় রিচার্ড চসারের চাকুরি স্থায়ী করেন। তাঁর ভাতাও বহাল থাকে । পরের বছরেই তাঁকে দূতাবাসের দায়িত্ব দিয়ে ইটালিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই ইটালি ভ্রমণ চসারের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। বলা যায় তাঁর কবি জীবনের পরিপুষ্টি ঘটেছিল ইটালির মাটিতে।

নতুন কর্মক্ষেত্রে গিয়ে চসার মহাকবি দান্তে, বোকাচিও ও পেত্রার্কের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের কাব্য তঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

ইতিমধ্যে মহাকবি দান্তে পরলোকগমন করেছিলেন। কিন্তু বোকাচিও ও পেত্রার্কের সঙ্গে যে চসারের সাক্ষাত হয়েছিল এ বিষয়ে গবেষকরা একরকম নিশ্চিত।

তাঁদের ধারণা, যুগন্ধর এই তিন কবি হয় ফ্লোরেন্স অথবা লোম্বার্তিতে মিলিত হয়েছিলেন।

একদিক থেকে চসার ছিলেন ভাগ্যবান কবি। সাধারণত কবিরা আর্থিক অনটনের শিকার হয়ে থাকেন।

চসারকে কখনও অর্থনৈতিক কষ্টে পড়তে হয়নি। রাজানুগ্রহে বারবারই তিনি ছিলেন ভাগ্যবানদের দলে।

আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়ায় উপযুক্ত বয়সেই যে চসার সংসারী হয়েছিলেন তা অনুমান করা যায়। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রেম ভালোবাসার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।

কেবল তাঁর স্ত্রী ফিলিপ্পার কথাই আমরা জানতে পারি। তাঁদের সংসারযাত্রা যে সচ্ছল ছিল এমন অনুমান করার বাধা নেই।

জন অব গন্ট-এর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন চসার। রাজার বদান্যতায় প্রতিদিন রাজভাণ্ডার থেকে চসারকে এক ভাণ্ড মদ সরবরাহ করা হত। এই সময়ে তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী এতটাই সুপ্রসন্ন ছিলেন যে রাজাদেশে একসময় তিনি লণ্ডন বন্দরের কমট্রোলার অব কাস্টমের দায়িত্বপূর্ণ পদটিও লাভ করলেন।

চসার ও তাঁর স্ত্রী ফিলিপ্পার কাজে রাজা খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের জন্য ১০ পাউণ্ড করে আজীবন ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন।

লণ্ডন বন্দরের কাজে যোগ দেবার কিছুদিন পরেই আরো একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কমট্রোলার অব পেটি কাস্টমের কাজও তাঁকে করতে হত।

লণ্ডন থেকে চসার গ্রীনউইচ চলে আসেন ১৩৮৫ খ্রিঃ। এখানে পুরসভার ব্যবস্থাপনায় অল্ডগেটের কাছে একটি বড় বসত বাড়ি তাঁকে দান করা হয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই বাড়িতেই তিনি বাস করেন।

তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি ওয়েস্ট মিনিস্টারে সেন্ট মেরী চ্যাপেলের কাছে একটি বাড়ি খরিদ করেছিলেন।

যাই হোক, একসময় চসার হলেন শায়ারের নাইট। পার্লামেন্টের দেওয়া এই সম্মান কিন্তু চসারের জীবনে শুভসূচক হল না। অচিরেই শুরু হল তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়।

জন অব গন্ট গিয়েছিলেন স্পেনে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন ডিউক অব গ্লসেস্টার। তিনি রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে একটি রিজেন্সী নিয়োগ করেন।

চসার ছিলেন জন অব গন্টের প্রিয়পাত্র এবং অনুগ্রহভাজন। তাই রিজেন্সীর হুকুমে চসারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

এতকাল সম্মানের পাশাপাশি অর্থও অর্জন করেছেন চসার। কিন্তু চিরন্তন কবিপ্রকৃতির স্বভাব বশে খরচের ব্যাপারে তিনি ছিলেন লাগামছাড়া। সঞ্চয়ের অভ্যাস কোন কালেই রপ্ত করতে পারেননি। ফলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে খুবই দৈন্য দশায় পড়লেন তিনি।

তারপরেই এলো দ্বিতীয় আঘাত। ১৩৮৭ খ্রিঃ স্ত্রী ফিলিপ্পার হল অকাল মৃত্যু। শোক দুঃখ-দৈন্যের পীড়নে বিপর্যস্ত অবস্থা চসারের। আশ্চর্য যে, জীবনের এই চরম বিপর্যয়ের পর্যায়েই চসার রচনা করলেন তাঁর অবিস্মরণীয় কাব্য ক্যানটারবেরি টেলস।

দুঃখের মধ্যে দিয়েই প্রস্ফুটিত হয় মহৎ সৃষ্টি—এই আপ্তবাক্য কবি চসারের জীবনেও সত্য হতে দেখা গেল। ক্যান্টারবেরি টেলস তাঁর বিড়ম্বিত জীবনের স্মরণীয় কীর্তি।

সুখ ও দুঃখের দোলায় আন্দোলিত জীবনের অনুভূতির মধ্যে দিয়েই চসার রচনা করেছেন তাঁর সাহিত্য।

ভাগ্যের বিড়ম্বনাতেই দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল চসারের জীবন।

টানা দুই বছর এই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হল তাঁকে। সুদিন আবার ফিরে এলো ১৩৮৯ খ্রিঃ দ্বিতীয় রিচার্ড সিংহাসন পুনর্দখল করার পরে।

ক্ষমতা করায়ত্ত করার পরেই রিজেন্সীকে বরখাস্ত করলেন দ্বিতীয় রিচার্ড। চসার ওয়েস্টমিনিস্টারে রাজদরবারে নিযুক্ত হলেন কেরানীর কাজে। কিছুদিনের মধ্যেই আগের চাইতেও বেশি সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পেলেন তিনি।

উলউইচ ও গ্রীনউইচের মধ্যে টেমস নদীর তীর সংস্কারের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। চসার নিযুক্ত হলেন এই কমিশনের সম্মানীয় সদস্য পদে।

রাজভাণ্ডার থেকে বার্ষিক কুড়ি পাউন্ড ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছিল চসারকে। তা সত্ত্বেও ১৩৯৪ খ্রিঃ দ্বিতীয়বার চরম অর্থসঙ্কটে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে দেনার দায়ে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল।

১৩৯৯ খ্রিঃ চতুর্থ হেনরী সিংহাসনে আরোহণ করলে নিজেই আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে চসার নির্ধারিত ভাতা বৃদ্ধির আবেদন জানালেন। রাজা চতুর্থ হেনরী কবির জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থাই করলেন।

তিনি তাঁর বার্ষিক ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করলেন। সেই সঙ্গে ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দের স্থগিত বার্ষিক ভাতা কুড়ি পাউন্ড অনুদান হিসাবে পুনঃপ্রদানের নির্দেশও দিলেন।

অচিরেই আর্থিক সঙ্কট দূর হল। আবার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলেন কবি। কিন্তু ততদিনে তাঁর আয়ুর মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছিল।

ক্যান্টারবেরি টেলস-এর অমর স্রষ্টা ১৪০০ খ্রিঃ ২৫শে অক্টোবর পরলোক গমন করলেন।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অবশ্য চসারের মৃত্যুর সাল তারিখ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তা সত্ত্বেও ১৪০০ খ্রিঃ ২৫ শে অক্টোবর তারিখটিকে সাধারণভাবে তাঁর মৃত্যুর সময় বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

ইংরাজি সাহিত্যের আদি কবি চসারকে সমাহিত করা হয় ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে। তাঁর সমাধিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে এখনকার পোয়েটস কর্নার।

পদ্য রচনার পাশাপাশি গদ্যও রচনা করেছেন চসার। মুদ্রণ ব্যবস্থা ছিল না বলে সেকালে তাঁর রচনার প্রচারও সেভাবে সম্ভব হয়নি।

মৃত্যুর পর সত্তর বছরেরও বেশি সময় তাঁর গদ্য পদ্য রচনাগুলি হাতে লিখেই প্রচার করা হয়েছে। ১৪৭৮ খ্রিঃ প্রথম ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত ক্যান্টারবেরি টেলস প্রকাশিত হয়।

তাঁর রচনাবলীর ওপরে গবেষণা করে বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্তে পৌচেছেন সেই হিসেবে ১৩৫৯ খ্রিঃ থেকে ১৩৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত চসার ফরাসী কাব্য রীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

এই সময়ে কিছু ফরাসী কবিতার অনুবাদের সঙ্গে রচনা করেছিলেন দ্য বুক অব দ্য ড্যাচেস।

ফরাসী সাহিত্যের লে রোমান দ্য লা রোজ নামের মধ্যযুগীয় প্রেমকাব্য থেকে প্রেমভিত্তিক কিছু কবিতা চসার অনুবাদ করেছিলেন।

দ্য হাউস অব ফেম সহ আরো কিছু অষ্টপদী কবিতাও একই সময়ে রচনা করেছেন চসার।

কূটনৈতিকের চাকরি নিয়ে চসার যখন ইতালি ভ্রমণ করেন, তার অনেক আগেই মহাকবি দান্তে গত হয়েছিলেন। তাঁর রচনার সঙ্গে চসারের যেমন পরিচয় হয়েছিল তেমনি বোকাচিও এবং পেত্রার্কের রচনা পাঠ করে তিনি পেয়েছিলেন অনুপ্রেরণা।

শেষোক্ত দুই কবির সঙ্গে চসারের সাক্ষাতও হয়েছিল। এই সাহচর্যের ফলে স্বভাবতঃই ইতালীয় সাহিত্য বিশেষ করে প্রেমসঙ্গীত ও শিল্পের প্রতি তিনি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে১৩৭২ খ্রিঃ পর থেকে ১৩৮৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে চসারের রচনা হয়েছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও অধিকতর পরিণত। দ্য হাউস অব ফেম এই সময়েরই রচনা।

কল্পনার রঙীন জগতে পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াত স্বভাব কবি চসারের মন। পাখির জীবন নিয়েই তিনি রচনা করেছেন দ্য এসেমব্লী অব ফাউলস।

দ্য লিজেন্ড অব গুড ওমেন কবির অসমাপ্ত কাব্য। এটি লেখায় হাত দিয়েছিলেন তিনি রানীর অনুরোধে। কিন্তু তিনি এটি অসমাপ্ত রেখেছিলেন কী কারণে তা আমরা জানতে পারি না।

কবিজীবনের শেষ চোদ্দ বছরের রচনাই ছিল সম্পূর্ণ পরিণত এবং বাস্তবমুখী। বাস্তব জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁর মনোজগতে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই সময়ের রচনায়।

ফিওদর মিখাইলভিচ দস্তয়ভস্কি

আপন সৃষ্টির মহিমায় স্রষ্টা লাভ করেন অবিনশ্বর কীর্তি, তাঁর কীর্তিগাথা রচিত হয় সৃষ্টিকে অবলম্বন করেই যুগ যুগ ধরে। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ফিওদর মিখাইলভিচ দস্তয়ভস্কি এমনি এক গৌরবোজ্জ্বল নাম। কালোত্তীর্ণ সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে অমরত্ব লাভ করেছেন তিনি।

সৃষ্ট সাহিত্যের মতোই বহুবিচিত্র দস্তয়ভস্কির জীবন। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর জীবনের আবর্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে মহত্ত্বর উপলব্ধিতে। তাঁর জীবন কেটেছে দুঃখ-যন্ত্রণা আর পাপের পঙ্কিলতার মধ্যে। তাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে যেমন রয়েছে ধ্বংসের আহ্বান, তেমনি আছে জীবনেরও জয়গান।

স্রষ্টা হিসেবে এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। মানুষের বেদনাময় জীবনের ছবি, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, দুঃখের মধ্য দিয়ে অপার পবিত্রতায় উত্তরণ, দস্তয়ভস্কির সৃষ্ট সাহিত্যকে কালজয়ী করেছে।

১৮২১ খ্রিঃ ৩০ অক্টোবর দস্তয়ভস্কির জন্ম। তাঁর পিতা মিখায়েল অন্দ্রেভিচ দস্তয়ভস্কি ছিলেন মস্কোর এক হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁকে প্রতিপালন করতে হত একটি বিরাট সংসার।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই সংসারের সদস্য সংখ্যা ছিল চোদ্দ জন। ফলে সংসারের চাপে চব্বিশ ঘন্টা ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে।

কখনও এমন হত যে, তিনি তাঁর মানসিক সংযম হারিয়ে ফেলতেন। ক্ষিপ্ত হয়ে সংসারের লোকজনকে গালিগালাজ ও নির্যাতন করতেন। পিতার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার বালক দস্তয়ভস্কির মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত।

মস্কোর বাইরে টুলা জেলায় ডরাভয়ইতে প্রতিবছর গ্রীষ্মের সময় ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন মিখায়েল দস্তয়ভস্কি। এখানে গ্রাম পরিবেশে ছোটখাট একটা সম্পত্তি ছিল তাঁর।

বাবার ছোট্ট কোয়ার্টারের বদ্ধজীবনের বাইরে টুলার গ্রাম্য পরিবেশে এসে শিশু দস্তয়ভস্কির মন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলত। তিনি গাছপালা, ঝিল, প্রান্তর, পাখিদের কিচিরমিচির এসবের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন।

সবচেয়ে আনন্দের যা তা হল, এখানে থাকত না পিতার কঠোর শাসন।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হলেই আবার সকলকে ফিরে আসতে হত মস্কোর কোয়ার্টরের সঙ্কীর্ণ জীবনে।

এখানে জীবন ছিল রুটিনে বাঁধা। সকালেই যেতে হত স্কুলে। স্কুল থেকে ফিরে এসে বাড়ির বাইরে যাওয়া বা সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা ছিল বারণ। তাই শাসনের গন্ডিতে আবদ্ধ থেকে হাঁপিয়ে উঠতেন দস্তয়ভস্কি।

১৮৩৪ থেকে '৩৭ খ্রিঃ পর্যন্ত চেরনাক-এর আবাসিক ইস্কুলে পড়াশুনো শেষ করে বাড়ি ফিরে আসার এক বছরের মধ্যেই তাঁর মা মারা যান।

দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন তিনি। ছেলেমেয়েরা মায়ের কাছে যেতে পারত না। অথচ মায়ের একটু স্পর্শ পাবার জন্য বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠত দস্তয়ভস্কির। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মায়ের মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে দুচোখ জলে ভরে উঠত তাঁর বেদনায়।

মায়ের চরিত্রের কোমলতা ও ভালবাসা দস্তয়েভস্কির কোমল মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাবের ফলেই তিনি লাভ করেছিলেন মানুষের প্রতি ভালবাসা।

তেমনি পরবর্তী জীবনে তাঁর মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা ও লাম্পট্য প্রকাশ পেয়েছে তা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন পিতার কাছ থেকে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর মিখায়েলের জীবনের সুর কেটে গেল। শহরের জীবন, চাকরিবাকরি তাঁর আর ভাল লাগল না। শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে তিনি পরিবারের সকলকে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে গ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

এখানে আসার পরেই দস্তয়ভস্কি ও তাঁর দাদা মাইকেলকে ভর্তি করে দেওয়া হল মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমিতে।

গ্রামের সম্পত্তি চাষবাস ইত্যাদি দেখাশোনা করার জন্য মিখায়েলের শতাধিক ভূমিদাস ও ক্রীতদাস ছিল। তাদের প্রতি তিনি করতেন অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার। কারণে অকারণে তাদের তিনি নির্যাতন করতেন।

কেবল তাই নয়, সুযোগ মতো গ্রামের মেয়েদেরও তিনি ধরে নিয়ে আসতেন নিজের শয়নকক্ষে। মিখায়েলের অত্যাচারে অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের লোকেদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠল।

একদিন খুন হলেন তিনি। তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া গেলেও পুলিশ ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়েছিল। তাঁর প্রজারা টাকা দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর দস্তয়ভস্কির মনোজগতে এক বিরাট বিপর্যয় নেমে এলো। এটা সত্যকথা যে বাল্য বয়স থেকেই পিতার প্রতি তাঁর মন ছিল বিরূপ। পিতার আর্থিক কৃপণতার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমিতে খুবই অর্থকষ্টে কাটাতে হত তাঁকে ।

এই সকল কারণে মনের অবচেতনে তিনি কামনা করতেন পিতার মৃত্যু হলেই এই নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

এই অবস্থায় পিতার নিহত হবার ঘটনা তাঁর মনকে অপরাধবোধে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তাঁর মনে হতে লাগল, পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী তিনিই।

এই মানসিকতা থেকে ক্রমেই তাঁর মধ্যে দেখা দিল বিকার। তিনি মৃগীরোগগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

পরবর্তীকালে শোক বা মৃত্যুর কারণ জনিত আঘাত, উত্তেজনা, ইত্যাদির সংস্পর্শে এলেই তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যেতেন। এই অসুস্থ মানসিক বিকার তাঁকে আমৃত্যু বহন করতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমি থেকে পাস করে সামরিক বিভাগে ডিজাইনারের চাকরি নিলেন দস্তয়ভস্কি।

এই কাজে সারা দিন তাঁকে নক্সা আঁকা, মাপজোক, অঙ্ক কষা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হতো। ফলে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি প্রায়ই জুয়ার টেবিলে বসতে আরম্ভ করলেন।

ক্রমে আসক্তি বাড়ল। ফল হল, অফিসের সারা মাসের খাটুনির সম্বলটুকু দুচার দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেত।

জুয়ার নেশার সঙ্গে সঙ্গে আমোদ ফুর্তির বিলাসিতাও অনিবার্য ভাবেই আঁকড়ে ধরল যুবক দস্তয়ভস্কিকে। ফলে টাকার চাহিদা দিন দিন বাড়তেই থাকে।

জমিদারি থেকে যে টাকাকড়ি আসত, তার সমস্তই উড়ে যেতে লাগল আমোদ ফুর্তির পেছনে।

আর্থিক চাহিদা সংকুলান করার উদ্দেশ্যে এই সময় দস্তয়ভস্কি স্থির করলেন ফরাসী, জার্মান সাহিত্য অনুবাদ করবেন।

দাদা মাইকেলকেও টেনে নিলেন এই পরিকল্পনার মধ্যে। দুজনে মিলে ফরাসী সাহিত্যিক বালজাকের উপন্যাস অনুবাদের কাজ শুরু করলেন।

লেখাটি ১৮৪৪ খ্রিঃ একটি রাশিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হল এবং তাতে কিছু অর্থাগমও হল।

এই ভাবে অনুবাদ কর্মের মাধ্যমেই দস্তয়ভস্কির সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হল বলা চলে।

ক্রমে সাহিত্য জীবনের আকর্ষণ তাঁর কাছে দুর্নিবার হয়ে উঠল। ফলে চাকরি জীবনের বন্ধন কাটাতে হল। জীবিকা হিসেবে সাহিত্যকেই পুরোপুরি অবলম্বন করলেন এবার থেকে।

লেখার ব্যাপারে বরাবরই তিনি ছিলেন অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। পছন্দ না হলে পাতার পর পাতা লেখা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে লিখতে বসতেন।

লেখার উৎকর্ষ সাধনের এই চেষ্টাই হল নিষ্ঠা। দস্তয়ভস্কির লেখার প্রতি নিষ্ঠা এমন ছিল যে, পাওনাদারের ঘন ঘন তাগিদ সত্ত্বেও, এমনকি জেলে পাঠাবার হুমকি সত্ত্বেও লেখা সম্পূর্ণ করেও পছন্দ না হওয়ায় সমস্ত পাণ্ডুলিপিই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

অথচ প্রকাশকের হাতে লেখা পৌঁছনো মাত্রই অর্থপ্রাপ্তি ছিল নিশ্চিত।

অনুবাদ সাহিত্য দিয়ে লেখালিখি শুরু হলেও ১৮৪৪ খ্রিঃ বছর শেষ হবার আগেই দস্তয়ভস্কি একটি মৌলিক উপন্যাস রচনার কাজ শেষ করলেন। উপন্যাসটির নাম দিয়েছিলেন Poor Folk।

এই সময়ে একই বাড়িতে বাস করতেন দস্তয়ভস্কির ইনজিনিয়ারিং একাডেমির বন্ধু গ্রিগরভিচ। তিনি একদিন বন্ধুর পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে গেলেন উদিয়মান কবি সম্পাদক নেক্রাসভের কাছে।

দুজনে মিলে রাত জেগে উপন্যাসটি পড়লেন। রাত শেষ হল মুগ্ধতা আর বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে।

দিন শুরুর প্রথম লগ্নেই দুই বন্ধু দস্তয়ভস্কিকে ঘুম থেকে তুলে অভিভূত স্বরে বলে উঠলেন, তোমার রচনা আমাদের মুগ্ধ করেছে। তুমি হবে আগামী দিনের মহৎ স্রষ্টা।

মুগ্ধ নেক্রাসভ উপন্যাসের পান্ডুলিপিটি নিয়ে গেলেন সেযুগের রাশিয়ান সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক বেলিনস্কির কাছে। নতুন লেখকের রচনা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেন তিনি। মুগ্ধ কণ্ঠে অভিনন্দন জানালেন লেখককে।

বললেন, রাশিয়ান সাহিত্যে বাস্তবতার প্রবক্তা রূপে আবির্ভাব হল সম্ভাবনাময় এক প্রতিভার। আমি এক নতুন গোগোলের আর্বিভাব প্রত্যক্ষ করছি।

প্রথম উপন্যাস পুওর ফোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেন দস্তয়ভস্কি। দ্বিতীয় উপন্যাস দি ডবল প্রকাশিত হলে তিনি লাভ করলেন সুখ্যাতি।

তাঁর রচনার মরমী আবেদন সহজেই পাঠক মনকে আকৃষ্ট করল। মানুষের বেদনাময় জীবনের বাস্তব শিল্পরূপ রূপায়নে দস্তয়ভস্কির দক্ষতা স্বীকৃতি পেল সাহিত্যিক মহলে।

সময়টা ছিল জারের শাসনকাল। অত্যাচারী জার প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী সংগঠন।

এমনি একটি সংগঠনের সঙ্গে এক বন্ধুর মাধ্যমে জীবনের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতেই যুক্ত হয়ে পড়লেন দস্তয়ভস্কি।

সংগঠনটির নিয়মিত অধিবেশন বসত প্রটাসভস্কি নামে এক তরুণ সরকারী অফিসারের বাড়িতে।

প্রতি শুক্রবারে সন্ধ্যায় সদস্যরা সেখানে জড়ো হতেন। এদের মধ্যে ছিলেন যেমন সরকারী কর্মচারী, তেমনি ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি।

সকলেরই লক্ষ্য অত্যাচারী শাসকের কবল থেকে দেশবাশীকে রক্ষা করা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, অভাব, অত্যাচার, অসাম্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চলত আলোচনা।

আগামী দিনের অত্যাচাব নিপীড়নমুক্ত এক সুখী সমৃদ্ধ রাশিয়া গঠনের স্বপ্ন ভেসে বেড়াত প্রতিটি প্রতিবাদী তরুণের চোখে।

দস্তয়ভস্কি একপাশে চুপচাপ বসে থেকে সকলের বক্তব্য শুনতেন। আলোচনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করতেন।

সভার কাজকর্ম সাধারণ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। গঠনমূলক কোন কর্মপ্রস্তুতির আয়োজন ছিল না।

ইতিমধ্যে জারের গুপ্তচরদের নজর পড়ল এই গুপ্তসভার প্রতি। সদস্যদের বিরুদ্ধে যথারীতি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের রিপোর্ট তৈরি হল।

এক রাতে পুলিসের হামলা হল দস্তয়ভস্কির ঘরে। ১৮৪৯ খিঃ ১৩ এপ্রিল, নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছাড়াই তিনি গ্রেপ্তার হলেন।

আলোবাতাসহীন এক ছোট্ট কুঠুরিতে শুরু হল বন্দিজীবন। সেখানে তাঁর মতোই আরো অনেককে অটকে রাখা হয়েছিল।

সমস্ত দিনে সামান্য সময়ের জন্য মাত্র কয়েক দফায় কুঠুরির বাইরে আসার সুযোগ পেতেন বন্দীরা।

কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি ছিল না। দেওয়া হত না পড়ার জন্য কোন বই বা পত্র পত্রিকা।

জেলের এই বদ্ধ জীবনে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতেন দস্তয়ভস্কি। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধেই তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল। শাস্তি পাবার মতো কোন অপরাধ তিনি করেননি।

এমনকি জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হননি। তথাপি জীবনে নেমে এলো অন্ধকার। এই অন্ধকারময় বদ্ধ জীবনের পরিণতি কী তা তিনি জনেন না। বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগের দুঃসহ যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে থাকে তাঁর মন।

এই অবস্থাতেই তিনি লিখলেন নিজের জীবনের ছায়ায় A Little Hero নামে একটি ছোট গল্প।

চার মাস আটক থাকার পর শুরু হল বন্দীদের বিচারপর্ব। নানা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পর বিচারে বন্দীদের দেওয়া হল মৃত্যুদন্ড।

কিন্তু সম্রাট নিকোলাস দয়া পরায়ন হয়ে মৃত্যুদন্ডাদেশ রোধ করে সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিলেন।

দস্তয়ভস্কির জন্য ঘোষিত হল সাইবেরিয়ায় চার বছর নির্বাসন তারপর চার বছর সৈনিক হিসাবে কাজ করার আদেশ।

বিচারের প্রহসন শেষ হল ১৮৪৯ খ্রিঃ ২২শে ডিসেম্বর। নতুন বছরের শুরুতেই পায়ে আট পাউন্ড ওজনের লোহার বেড়ি পরিয়ে তাঁকে চালান করা হল সাইবেরিয়ার নির্বাসন শিবিরে।

দেশের যত খুনী বদমাশদের সঙ্গে নরকতুল্য পরিবেশে শুরু হল দস্তয়ভস্কির নির্বাসন জীবন।

ছোট্ট কুঠুরিতে শীতের দিনে ভোগ করতে হত হিমেল হাওয়ার কনকনে ঠান্ডা। পা ফেটে বেরুত রক্ত। গ্রীষ্মের দিনে সেদ্ধ হতে হত বিনা আগুনে।

নির্বাসন জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার এখানেই শেষ ছিল না। দিনের বেলা খাটতে হত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। সেই খাটুনির পরিশ্রম সইতে না পেরে দস্তয়ভস্কি প্রায়ই জ্ঞান হারাতেন।

তার জন্য প্রহরীর চাবুক পড়ত পিঠে। খুনী কয়েদিরা ছুঁড়ে দিত বিদ্রূপ। এই পরিবেশে থেকে তাঁর পুরনো মৃগী রোগের প্রকোপ আরো বেড়ে যেতে লাগল।

নির্বাসন জীবনের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা সারা জীবনে ভুলতে পারেননি দস্তয়ভস্কি। এই অভিজ্ঞতা নিয়েই পরবর্তী জীবনে লিখেছিলেন House of the Dead উপন্যাস।

১৮৫০ খ্রিঃ থেকে ১৮৫৪ খ্রিঃ দীর্ঘ চার বছর সাইবেরিয়ার বন্দিনিবাসে কাটিয়ে শাস্তির প্রথম পর্যায় থেকে মুক্ত হলেন দস্তয়ভস্কি।

এবারে শুরু হবে চার বছরের সৈনিক জীবন। এ-ও বন্দিজীবন তবে এবারে কিছুটা স্বাধীনতা ছিল।

তাঁকে পাঠানো হল সেমিপলতিনস্ক শহরের সেনা ছাউনিতে। সামরিক জীবনের নিয়মবদ্ধ কুচকাওয়াজ গোড়ার দিকে দস্তয়ভস্কির অনভ্যস্ত অসুস্থ শরীরকে কিছুটা দুর্বল করে ফেললেও অসম্ভব মানসিক শক্তির বলে তিনি সামলেও উঠলেন। কেবল তাই নয়, নিজের কর্মদক্ষতা দেখিয়ে উঁচু পদে স্থান পেলেন।

সহসা ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টিপাত ঘটল দস্তয়ভস্কির প্রতি। শহরের সেনা নায়কের বাড়িতে তাঁর তলব পড়ল।

ভদ্রলোক শুনেছিলেন, তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে একজন শিক্ষিত লোক আছে। তাই খোঁজ খবর নিয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন দস্তয়ভস্কিকে । দুজনের পরিচয় হল এবং সেইদিন থেকে দস্তয়ভস্কিকে সেই অফিসারের বাড়ি গিয়ে তাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে হত।

এই সময়েই তিনি পরিচিত হন আলেকজান্ডার ইসায়েভ নামের এক সরকারী কর্মচারীর সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে। মারিয়া ভিমিট্রিয়েভনা তাঁর নাম। অকর্মন্য অসুস্থ মদ্যপ স্বামী-সম্পর্কে এক পুত্র সন্তানের জননী মারিয়া ছিলেন অবহেলিতা। প্রথম পরিচয়েই তিনি আকৃষ্ট হন দস্তয়ভস্কির প্রতি।

দুজনেরই জীবন দুঃখময়। তাই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগে না। দস্তয়ভস্কির দুঃখময় নির্বাসিত জীবনে মারিয়ার প্রেম দেখা দিল এক আনন্দময় নতুন জীবনের আহ্বান হয়ে।

মারিয়া ছিলেন বহুচারিণী। দস্তয়ভস্কিকে পাশে রেখেই আলেকজান্ডার ওয়ানগেল নামে এক তরুণ আইনজীবীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করলেন।

তবে এই নতুন সম্পর্ক গাঢ়তর হয়ে ওঠার আগেই মারিয়ার স্বামী বদলি হয়ে গেলেন দূরের এক শহরে।

মারিয়া দূরে চলে যেতে মানসিক বিপর্যয়ে ভুগলেন কিছুদিন দস্তয়ভস্কি।

কয়েকমাস পরে মারিয়ার অসুস্থ স্বামী মারা গেলেন। দস্তয়ভস্কি ওয়ানগেলের কাছ থেকে ধার করে টাকা পাঠাতে লাগলেন মারিয়াকে। এভাবে বছরখানেক কাটল।

একদিন দস্তয়ভস্কি গেলেন মারিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন এক স্কুল শিক্ষকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। দেখেশুনে মুষড়ে পড়লেন দস্তয়ভস্কি। কিন্তু পিছু হটলেন না।

জীবনে প্রথম প্রেমের স্বাদ পেয়েছেন তিনি মারিয়ার কাছ থেকে। বহু সাধ্য সাধনায় মারিয়ার মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে দুজনে বিয়ে করলেন ১৮৫৭ খ্রিঃ।

বিয়ের দু বছরের মাথায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হল। দস্তয়ভস্কি সামরিক বিভাগের চাকরি ছেড়ে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে চলে এলেন ছোট্ট টিভর শহরে। অদূরেই মস্কো শহর।

এতদিন ছিলেন একা। এবার দস্তয়ভস্কির কাঁধে সংসারের চাপ। অর্থের সংস্থানের জন্য আবার কলম নিয়ে বসলেন। নির্বাসিত জীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লিখলেন The House of the Dead.

সাহিত্যের জগতে অখ্যাত লেখকের লেখা প্রকাশের ঝুঁকি নিতে চাইল না কোন প্রকাশক। ভাই মাইকেলের সঙ্গে পরামর্শ করে দুজনে মিলে প্রকাশ করলেন Time নামে একটি পত্রিকা। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হতে লাগল লেখাটি।

সাইবেরিয়ার নির্মম বন্দিজীবনের ওপর ইতিপূর্বে কোনও লেখকই তেমনভাবে আলোকপাত করেননি।

দস্তয়ভস্কির লেখায় ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার মূর্ত ছবি। তাই এই লেখা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে সাড়া তুলল। লেখার জনপ্রিয়তা লেখকের জীবনে আনল খ্যাতি, অর্থ।

গৃহিণী হিসেবে মারিয়া ছিলেন চরম অমিতব্যয়ী ও বিশৃঙ্খল। বিলাস-ব্যসনেই টান বেশি। ফলে স্ত্রীর চাহিদা মতো অর্থের জোগান দিতে ব্যর্থ হলেন দস্তয়ভস্কি। সংসারে দেখা দিল অশান্তি, মনোমালিন্য। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মারিয়া ক্রমশই বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠতে লাগলেন।

মানসিক বিষাদ ভুলে থাকার জন্য দস্তয়ভস্কি বেশি করে মনোযোগ দিলেন লেখায়। এই সময়ে পলিনা নামে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক সুন্দরী তরুণীর প্রতি

আকৃষ্ট হলেন দস্তয়ভস্কি। দুজনে স্থির করলেন, ফ্রান্সে গিয়ে এক সঙ্গে থাকবেন।

প্রকাশকের কাছ ৩০০০ রুবল ধার করলেন দস্তয়ভস্কি। বিনিময়ে শর্ত থাকল, একবছরের মধ্যে একটি উপন্যাস লিখে দেবেন এবং তাঁর রচনাবলী প্রকাশক প্রকাশ করবেন তিন খণ্ডে।

ধারের টাকা সম্বল করে পলিনাকে নিয়ে ফ্রান্সে গেলেন দস্তয়ভস্কি। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই অন্য পুরুষে আসক্ত হলেন পলিনা। পরিত্যক্ত হলেন দস্তয়ভস্কি।

হাতে যৎসামান্য অর্থ তখন অবশিষ্ট। তাই সম্বল করে জুয়ার আসরে যাতায়াত শুরু করলেন তিনি। তাঁর এই জুয়াড়ি জীবনের অভিজ্ঞতা পরে তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও চিত্রায়িত হয়েছে।

স্ত্রী মারিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসা ও সেবা যত্নের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন দস্তয়ভস্কি। সবই ব্যর্থ হয়। তিনি মারা গেলেন ১৮৬৪ খ্রিঃ গোড়ার দিকে।

মাস তিনেক পরেই মারা গেলেন দস্তয়ভস্কির জীবনের অন্যতম অবলম্বন বড়ভাই মাইকেল। তাঁর মৃত্যুতে মনের দিক থেকে অসহায় হয়ে পড়লেন তিনি। এই মানসিক অবস্থাতেই তিনি লিখলেন Crime and Punishment উপন্যাস।

এই উপন্যাসে তিনি জগতের মানুষের সামনে উচ্চারণ করেছেন দুঃখজয়ী মানবাত্মার স্তুতি। নিজের জীবনের দুঃখের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের চরম সত্য-উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন দস্তয়ভস্তি। তাঁর Crime and Panishment বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম।

এই উপন্যাস লেখা শেষ হবার আগেই প্রকাশককে নতুন উপন্যাস দেবার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে এল।

দু'মাস মাত্র আর সময় হাতে। দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত এক বন্ধুর পরামর্শে অ্যানা নামের এক তরুণী স্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত করলেন লেখার কাজে সাহায্য করার জন্য।

বছর কুড়ি বয়সের অ্যানাকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৬৬ খ্রিঃ ৪ অক্টোবর একটি নতুন লেখা শুরু করলেন। পড়ার ঘরে মুখোমুখি বসে তিনি বলে যান, সঙ্গে সঙ্গে তা খাতায় টুকে নেন অ্যানা।

এভাবে এক মাসের মধ্যেই দস্তয়ভস্কি লেখা শেষ করলেন তাঁর নতুন উপন্যাস—এক জুয়াড়ির গল্প।

প্রকাশকের ঘরে উপন্যাস জমা দেবার শেষ তারিখ ছিল ১নভেম্বর। কিন্তু

নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল প্রকাশকের ঘর বন্ধ। দস্তয়ভস্কি তাঁর পাণ্ডুলিপি থানায় জমা দিয়ে আসেন।

তরুণী অ্যানা ছিলেন মমতাময়ী। সাংসারিক জ্ঞানহীন, অস্থির চরিত্র দস্তয়ভস্কির জীবনের অসহায়তা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তাই লেখার কাজের সঙ্গে সংসারের জরুরী কাজকর্মও তিনি যত্নের সঙ্গে করে দিতেন।

এর আগে মারিয়া, পলিনা এসেছিল দস্তয়ভস্কির জীবনে। কিন্তু তাঁরা তাঁকে সংসারের সুখ দিতে পারেননি।

অ্যানাকে কাছে থেকে দেখে তাঁর মনে হল, এই মেয়ে তাঁর অপূর্ণ জীবনে পূর্ণতা আনতে পারবে।

একদিন নিজেই বিবাহের প্রস্তাব করলেন অ্যানার কাছে। তাঁর তখন বয়স পঁয়তাল্লিশ। তবুও অ্যানা সানন্দে সম্মতি জানাল।

দস্তয়ভস্কির পরিবারের লোকজন, বড়ভাই মাইকেলের বিধবা, পালিতপুত্র নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে এ বিয়েতে বিরোধিতা করল। সব কিছু অগ্রাহ্য করে দস্তয়ভস্কি অ্যানাকে বিয়ে করলেন।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বুদ্ধিমতী অ্যানা উপলব্ধি করতে পারলেন তাঁদের দুজনকে ঘিরে পড়ছে হিংসা আর বিদ্বেষের বিষ নিঃশ্বাস। দস্তয়ভস্কি তখন রিক্তহস্ত। তবুও নিজের চেষ্টায়, ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে তিনি স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। ঘুরতে লাগলেন ইউরোপের দেশে দেশে।

প্রকাশকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে টাকা পান দস্তয়ভস্কি। তার বেশিরভাগটাই তিনি উড়িয়ে আসেন জুয়ার টেবিলে। সংসার খরচ চালাতে চোখে অন্ধকার দেখেন অ্যানা।

এই সময় এমনও দিন গেছে, খাবার কেনার জন্য দস্তয়ভস্কিকে গায়ের পোশাক বন্ধক দিতে হয়েছে। অবস্থা সামাল দিতে নতুন উপন্যাস দেবার কড়ারে প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা ধার করেন। ধার শোধ করতে লেখা নিয়ে বসেন।

এইভাবে জন্ম নিল The Ediot উপন্যাস। প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সরল ও পবিত্র এক বাস্তববুদ্ধিশূন্য মানুষের করুণ পরিণতি হল এই কাহিনীর উপজীব্য।

উপন্যাস শেষ করে এক দেশ থেকে আর এক দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দস্তয়ভস্কি। যাযাবর জীবনের সঙ্গী হয়ে রইল নিত্য দারিদ্র্য। এই অবস্থাতেই লিখলেন The Eternal Husband ও The Possessed।

এভাবে ঘুরে ঘুরে চার বছর গত হল। দস্তয়ভস্কির মন স্থির নেই। এর মধ্যে

একটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছে তিন মাস বয়সে। দ্বিতীয় সন্তান দেড় বছরের মেয়ে অ্যানার কোলে।

এই অবস্থায় সে আবার সন্তান সম্ভবা। দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে দস্তয়ভস্কির মন।

কিন্তু হাতে টাকা নেই। শেষ সম্বলটুকু নিয়ে একদিন বসলেন জুয়ার টেবিলে। সর্বস্বান্ত হলেন। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন দস্তয়ভস্কি। এই সঙ্কট সময়ে এক সহৃদয় বন্ধু অর্থ সাহায্য করলেন। দীর্ঘ চার বছর পরে স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে পিটসবার্গের বাড়িতে ফিরে এলেন তিনি। সময়টা ১৮৭১ খ্রিঃ।

একমাস পরেই সংসারে এল পুত্র সন্তান। বুদ্ধিমতি অ্যানা হাতে সামান্য টাকা থাকতে থাকতেই সচেতন হলেন। বিশৃঙ্খল স্বভাবের অস্থিরচিত্ত স্বামীর ওপরে আর ভরসা করলেন না। পাওনাদারের উৎপাত বন্ধ করলেন ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করে।

প্রকাশকরা খুব সামান্য অর্থই দিত। অ্যানা তাই দস্তয়ভস্কির সমস্ত বই প্রকাশের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় ও যত্নে অল্প দিনের মধ্যেই সংসারের দৈন্যদশা ঘুচল।

জীবনে সুখ শান্তির প্রত্যাশায় শেষ যৌবনে তরুণী অ্যানাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিলেন দস্তয়ভস্কি। তাঁর সে আশা অপূর্ণ রাখেননি অ্যানা। তিনি তাঁর দেহ মন উজাড় করে দিয়েছিলেন দস্তয়ভস্কিকে। তাই জীবনের প্রৌঢ় বেলায় তৃপ্তি আর সুখের আস্বাদ পেলেন দস্তয়ভস্কি।

দুঃখ দুর্দশার ভার কিছুটা শিথিল হতে দস্তয়ভস্কি মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করলেন। তুর্গেনিভ তলস্তয়ের সাহিত্যকীর্তি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল। দীর্ঘ চার বছরের নিবিষ্ট সাধনায় তিনি রচনা করলেন, The Brothers Karamasov উপন্যাস।

এক মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে দস্তয়ভস্কি গ্রথিত করেছেন এই উপন্যাসের দীর্ঘ কাহিনী। বৈশিষ্ট্যে ও গভীরতায় জীবন্ত রূপ পেয়েছে প্রতিটি চরিত্র। এই উপন্যাস তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি।

রাশিয়ার সাহিত্যে স্বমহীমায় ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান হলেন দস্তয়ভস্কি। বিশ্বমানবের আত্মীক বন্ধনে বিশ্বাসী, মানবতার একনিষ্ঠ প্রচারক দস্তয়ভস্কিকে রাশিয়ার মানুষ শ্রদ্ধা ভালবাসায় অভিষিক্ত করল। তিনি হয়ে উঠলেন জাতির প্রবক্তা।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল তাঁর। ক্রমে এগিয়ে এল ১৮৮১ খ্রিঃ ২৮ জানুয়ারী।

শয্যাশায়ী দস্তয়ভস্কি। সাইবেরিয়ার নির্বাসনে যাবার সময় এক মহিলা তাঁকে

একটি বাইবেল উপহার দিয়েছিলেন। সযত্নে রক্ষিত আছে সে বই। অ্যানাকে ডেকে চেয়ে নিলেন বাইবেলটি। পড়তে পড়তে একসময় বলে উঠলেন, "সময় হয়েছে, এবার আমায় যেতে হবে।"

দিনটা কাটল। সন্ধ্যায় বিদায় নিলেন জীবনপথের চির পথিক দস্তয়ভস্কি।

হেরোডোটাস

ইউরোপের কাব্য-ইতিহাসে হোমার যেমন প্রথম মহাকবি, তেমনি গদ্যরচনার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তিত্ব হলেন হেরোডোটাস। তাঁর মহান সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে পরবর্তী লেখকদের। শ্রেষ্ঠ রচনার একটা মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন হেরোডোটাস।

গদ্য সাহিত্যের যেমন তেমনি হেরোডোটাসকে বলা হয় ইতিহাসেরও জনক। ইউরোপের ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল তাঁরই হাতে।

প্রাচীন ঘটনাবলী ফিরছিল লোকের মুখে মুখে। সেই সব কাহিনী যাতে মহাকালের গর্ভে চিরতরে হারিয়ে না যায় সেই কারণে সেসব সংগ্রহ করে হেরোডোটাস রচনা করেছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ।

গ্রীক আর বর্বর জাতিগুলির মধ্যে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যুদ্ধের কারণ নির্ধারণ করেছিল যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সমস্তই দীর্ঘ গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি গ্রন্থবদ্ধ করেছেন।

বিগতকালের বিলীয়মান ঘটনাবলী সযত্নে সংগ্রহ করে সাজিয়ে যিনি রচনা করেছিলেন ইতিহাস, সেই ইতিহাস-পুরুষ হেরোডোটাসের নিজের জীবনকাহিনী কিন্তু হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। মহাকালের কী বিচিত্র পরিহাস।

হেরোডোটাসের জন্ম সাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের নিষ্পত্তি হয়নি আজও। কারোর মতে সময়টা ৪৮৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। কেউ বলেন ৪৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ।

তবে জন্মস্থান নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। হেরোডোটাস জন্মেছিলেন এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাবিয়ার প্রসিদ্ধ নগরী হেলিকারনাসসে। রানী আর্টেমিসিয়া তখন রাজত্ব করতেন সেখানে।

শৌর্য ও বীরত্বের জন্য রানী আর্টেমিসিয়া সেইকালে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি সালামিসের বিখ্যাত জলযুদ্ধে জেরেক্সের জন্য লড়াই করে বিজয়িনী হয়েছিলেন।

হেরোডোটাসের যখন যুবা বয়স সেই সময় হেলিকারনাসাস নগরের শাসন ভার ছিল রানীর নাতি কুখ্যাত লিগডামিসের ওপর। প্রজানিপীড়নের জন্য এই শাসক অর্জন করেছিলেন কুখ্যাতি। সেই সময় এই দেশের অধিপতি ছিলেন পারস্যের মহান রাজা আর্টাক্সেরক্স।

অত্যাচারী লিগডামিসের উৎপীড়নে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল প্রজা সাধারণ। পারস্য অধিপতির অধীনতা মুক্ত হয়ে, অত্যাচারী শাসককে দলিত করে গ্রীক নগরের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল এক গোপন বিপ্লবী দল। সেই দলের প্রধান নেতা ছিলেন হেরোডোটাসের কাকা পানিয়াসিস। তিনি সুখ্যাত হয়েছিলেন মহাকাব্য রচনা করেও।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করে বিপ্লবীদলের কর্মোদ্যোগ বন্ধ করতে উদ্যোগী হলেন লিগডামিস। পানিয়াসিসকে অবিলম্বে বন্দী করলেন তিনি এবং তাঁকে দিলেন মৃত্যুদন্ড।

এই ঘটনার ফলে অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন হেরোডোটাস। ফলে তাঁকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হল। তিনি আশ্রয় নিলেন সামোসে।

নির্বাসনের দিনগুলো খুব সুখকর ছিল না তাঁর। তবু দীর্ঘ সাত বছর তাঁকে সেখানেই থাকতে হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি শিখে নিলেন আইওনিয়া প্রদেশের ভাষা। পরবর্তীকালে এই ভাষাতেই তিনি লিখেছেন তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ।

মহাকালের ইতিহাসে হেরোডোটাসের স্বেচ্ছা-নির্বাসনের ঘটনাটি হয়তো কোন গুরুত্বই পেত না কোন দিন যদি না তিনি ইতিহাস রচনার কাজে হাত দিতেন। আর নির্বাসনে না এলে ইতিহাস রচনার প্রেরণাও তাঁর মধ্যে কোন দিন জাগত না।

সেই কারণে অত্যাচারী লিগডামিসের সঙ্গে হেরোডোটাসের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও তাঁর নির্বাসিত জীবন মানবজাতির ইতিহাসে বিশেষ দিকচিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

সামোসে আসার পর নিষ্ক্রিয় বসে থাকেননি হেরোডোটাস। উদ্যমী পুরুষ ছিলেন তিনি। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল জন্মগত।

তাই কোন নির্দিষ্ট কাজে এক জায়গায় আবদ্ধ থাকেননি তিনি। কর্মান্তরের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছেন স্থানান্তরে।

এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরেছেন, সেখানকার জনজীবনের সঙ্গে মিশেছেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়েছেন।

এই পর্যটক জীবনেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের প্রতি। যত্নের সঙ্গে সেসব তিনি সংগ্রহ করেছেন, গ্রথিত করেছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে।

গোটা গ্রীক সাম্রাজ্যই পরিভ্রমণ করেছিলেন তিনি। মিশরের প্রাচুর্য ও সম্পদ, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার বৈচিত্র্য তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল।

হেরোডোটাস এথেন্সও পরিভ্রমণ করেছিলেন। শোনা যায়, পেরিক্লিসের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

এখানেই ৪৪৬ খ্রিঃ পূঃ এথেন্সের নগর সমাজে তিনি প্রথম তাঁর ইতিহাস পড়ে শোনান এবং পুরস্কার হিসেবে তাঁকে দেওয়া হয় দশটি মুদ্রা।

প্রচলিত পুরাতন কাহিনীগুলো যা তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বিবৃত করেছিলেন, সবই সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন মানুষদের কাছ থেকে। প্রতিটি কাহিনীই তিনি যুক্তি দিয়ে বিচার করে যথার্থতা নিরূপণ করতেন। সতর্কভাবে বিচারবিশ্লেষণ না করে কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতেন না তিনি। তাঁর এই ইতিহাস চর্চা ছিল গভীর গবেষণার নামান্তর।

বস্তুতঃ গবেষণা ও সত্যাসত্য নিরূপণ এই দুটি বিষয়কে বোঝাবার জন্যই হেরোডোটাসের সময়ে গ্রীক ভাষায় একটি শব্দ প্রচলিত হয়েছিল। তা হল ইস্টরি। এই ইস্টরি শব্দ থেকেই গবেষণালব্ধ পুরাকাহিনী বা ইতিহাসের ইংরাজি প্রতিশব্দ তৈরি হয়েছে হিস্টরি।

হেরোডোটাসের গ্রন্থে প্রধানত স্থান পেয়েছে প্রাচীন গ্রীসের গৌরব গাথাগুলি। গ্রীকদের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কীর্তি-কাহিনীও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রীক এবং পারস্য সম্রাটদের বিভিন্ন সময়ের সংঘর্ষের ইতিবৃত্তের নির্ভরযোগ্য বিবরণ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ থেকেই পাওয়া যায়।

বলাবাহুল্য এই সব ঘটনার উৎস যে রাজনীতি বা অর্থনৈতিক চাহিদা, তা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

বৃহৎ ঘটনা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিবরণের পাশাপাশি ছোটখাট চরিত্র বা ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক দিকগুলিও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ফলে পুরাকাহিনীগুলির সঙ্গে সমাজ ও জনজীবনের চিত্রও নির্ভরযোগ্য ভাবে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

হেরোডোটাসের ইতিহাস গ্রন্থ নটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডের নামকরণ হয়েছে নয়জন দেবীর নামে।

অবশ্য হেরোডোটাস নিজে তাঁর রচনার এই বিভাগীকরণ বা নামকরণ করে যাননি। কাজটি করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনিই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন।

সামোসে সাত-আট বছর ছিলেন হেরোডোটাস। অত্যাচারী লিগডামিসের পতন হলে তিনি আবার হেলিকারনাসাসে ফিরে আসেন। হেলিকারনাসাস তখন নতুন শাসক গোষ্ঠীর অধীন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের সঙ্গেও তিনি মানিয়ে চলতে পারেননি। ফলে তাঁকে আবার দেশ ছাড়তে হল। তিনি এলেন এথেন্সে।

সেই সময় এথেন্স মহানগরী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে স্বীকৃত। বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ এখানে। হেরোডোটাস পাকাপাকিভাবে এথেন্সেই বসবাস শুরু করলেন।

বিখ্যাত নাট্যকার সোফিক্লিসের সঙ্গে এখানেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাঁর। সম্ভবতঃ পেরিক্লিসের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

সমকালীন পণ্ডিতদের সমক্ষে এথেন্সেই হেরোডোটাস প্রথম তাঁর ইতিহাস পাঠ করেন। শোনা যায়, অলিম্পিক ক্রীড়ার সময় তাঁর গ্রন্থ পড়ে শোনানো হয়েছিল।

ইতিহাসের নেশায় হেরোডোটাস এবারে পুরোপুরি পর্যটকের জীবন গ্রহণ করেন। এথেন্সকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। যেখানেই গেছেন সেখানেই সন্ধান করেছেন ইতিহাসের নানা তথ্য, উপাদান। শুনেছেন, জেনেছেন, বিচার-বিশ্লেষণের পরে সেসব লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেকালে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ বা পর্যটন ব্যবস্থা মোটেই নিরাপদ ছিল না। দস্যু-তস্করের ভয় ছিল সর্বত্র।

তাছাড়া পথ ছিল দুর্গম। এই সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন তিনি তাঁর উত্তরপুরুষদের কথা ভেবে।

মিশরের দক্ষিণাঞ্চলেও পরিভ্রমণ করেছেন তিনি। পারস্যের আবাদান অঞ্চলে লুসা এবং একবাটানা নগরেও গেছেন তিনি ব্যাবিলন হয়ে।

ক্রিমিয়া এবং বর্তমান জর্জিয়া অঞ্চল ছাড়াও সমগ্র সিরিয়া উপকূল অঞ্চল তিনি জলপথে পরিভ্রমণ করেন। লিবিয়া. এপিরাস, থেসালি, অ্যাটিকা, পিলোপনিজ— গ্রীসের সমস্ত প্রান্তেই ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি।

কেবল ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য হেরোডোটাসই প্রথম এমন ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন। সংগৃহীত প্রতিটি বিবরণ বা তথ্য তিনি বিভিন্ন ভাবে যাচাই করার পর লিপিবদ্ধ করেন। এবিষয়ে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ।

তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, একটি মাত্র তথ্য যাচাই করার জন্যই তাঁকে যেতে হয়েছিল সুদূর টাইরেতে।

ইতালির দক্ষিণ প্রান্তে ৪৪৪ খ্রিঃ-পূর্বাব্দে এথেন্স নতুন উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পত্তন হয়েছিল নতুন নগর থুরির। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসবাস করেছেন সেখানে।

এথেন্সের সুবিখ্যাত বাগ্মী লাইসিয়াস এখানে ছিলেন। হেরোডোটাসও বসবাস করেছেন এই নগরে।

তিনি এথেন্সে এসেছিলেন ৪৩২ খ্রিঃ-পূর্বাব্দে। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের কাজ

শেষ হবার আগেই অবশ্য ৪২৬ খ্রিঃ পূর্বাব্দ থেকে ৪১৫ খ্রিঃ পূর্বাব্দ কোন সময়ের মধ্যে তিনি মারা যান।

কাজ অসমাপ্ত রেখে বিদায় নিয়েও হেরোডোটাস কর্মকৃতির যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন পরবর্তীকালে সেই পথেই আবর্তিত হয়েছে ইতিহাস রচনার গতিপথ।

হেরোডোটাসের জীবন ও কর্মকৃতিত্বের বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক গিলবার্ট বলেছেন, দেশ ছেড়ে কথকতার বৃত্তি নিয়ে পুরোপুরি পর্যটকের জীবন যাপন করেছেন তিনি। চারণদের কবিতার ভাষার বদলে গদ্য ভাষাকে আশ্রয় করে তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে মানুষকে শুনিয়েছেন নতুন নতুন স্থান, সংস্কৃতি ও জনজীবনের নানা কাহিনী। তাঁর ভাষা ও কথন ভঙ্গী ছিল এমনই মনোহারিণী যে কেউ তা না শুনে পারত না।

গ্রীস ও পারস্যের মধ্যের সংগ্রামের কাহিনী শোনাতে গিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন মানুষের সত্যকার পরিচয়।

যেমন মন্দ দিকের আলোচনা করেছেন, তেমনি একজন মানুষের চরিত্রের ভাল দিকগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ তিনি করেছেন।

আলোচনা বা সমালোচনা যাই তিনি করেছেন, সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে হৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শ। নিছকই সমালোচনায় বিদ্ধ করেননি তিনি কাউকে।

হেরোডোটাসের ইতিহাস হল বিচিত্র বিষয়ের সমাহার। আধুনিক ইতিহাসের সংজ্ঞা মেনে তাঁর গ্রন্থবদ্ধ বিষয় নিছকই ইতিহাস মাত্র নয়। তাঁর গ্রন্থে যেমন রয়েছে বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ, তেমনি রয়েছে পুরাকাহিনী, লোককথা, গীতিকাহিনী, বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা এবং প্রচলিত জনশ্রুতি সহ নতুন নতুন গল্প।

বৈজ্ঞানিক গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে প্রতিটি বিষয়ের সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন হেরোডোটাস এবং নিঃসন্দেহ হবার পর লিপিবদ্ধ করেছেন।

তথাপি, বহু বিষয়ের পাশাপাশি সমাবেশ হেতু অনেক সময় তাদের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অভিযোগ তোলা হয়েছে অতিরঞ্জনের।

হেরোডোটাসের সংগৃহীত তথ্যের ছিল দুটি ধারা। প্রথমটি হল তিনি নিজের চোখে দেখে, গবেষণার ভিত্তিতে যা লিপিবদ্ধ করেছেন।

অপরটি হল, জনশ্রুতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে মিশর সম্পর্কে কিংবদন্তিগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় তাঁর লেখার এই বিভাজন সম্পর্কে স্পষ্ট উক্তি করেছেন।

হেরোডোটাস উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, জনরব থেকে যা কিছু তিনি

লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখানে তাঁর নিজস্ব কোন মতামত নেই, উল্লিখিত সব বিষয়েই যে তাঁর বিশ্বাস রয়েছে, এমন ভাবাও ঠিক হবে না।

বস্তুতঃ প্রকৃত ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই হেরোডোটাস সমস্ত বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

তবে একটা বিষয়ে তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে তাঁর রচনার সর্বত্র। যখনই ভালো কিছু ঘটেছে, তাকেই তিনি দেবীকৃপা বলে বর্ণনা করেছেন।

এই সূত্রে অনেক সমালোচক এই বলেও হেরোডোটাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উচ্চারণ করেছেন যে, নানা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তিনি নীতিকথা প্রচার করতে চেয়েছেন।

তবে এটা অস্বীকার করা চলে না যে, কোন কোন কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যই তিনি সচেতন ভাবে নীতিকথার অবতারণা করেছেন। কোন ধর্মীয় তত্ত্ব বা নীতিবাণী প্রচারের কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

হেরোডোটাসের পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। কুমিরের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায় কোন একটি জিনিসকে কত গভীরভাবে তিনি লক্ষ্য করতেন।

তিনি লিখেছেন ‘‘শীতকালের চার মাস কুমিরকে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখা যায় না। এদের পা চারটি কিন্তু এরা উভচর। ডিম পাড়ে জমিতে এবং সেখানেই ডিমে তা দেয়। দিনের বেশীর ভাগ সময় এরা থাকে ডাঙায়। কিন্তু রাত কাটায় জলের মধ্যে। কারণ হল, রাতে বাতাস বা শিশিরের চেয়ে জল অনেক গরম।

আমাদের পরিচিত সমস্ত কিছুরই জন্মের সময় আকৃতি থাকে ছোট্ট, তারপর তারা ধীরে ধীরে পূর্ণ অকৃতি লাভ করে। কুমিবেব বেলাও একই ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় তাদের ডিমগুলি থাকে হাঁসের ডিমের চেয়ে সামান্য বড়। সেই ডিমের আকারের বাচ্চাই তা থেকে বের হয়। তারপর ধীরে ধীরে তারা পূর্ণ আকৃতি লাভ করে।

তাদের চোখ শুয়োরের মতো, দাঁত বড় বড়। মুখমণ্ডল শরীরের তুলনায় লম্বা। প্রাণীদের মধ্যে কুমিরই একমাত্র ব্যতিক্রম যার কোন জিভ থাকে না এবং তাদের নিচের চোয়ালও নাড়তে পারে না।

তবে নিচের চোয়ালটা স্বচ্ছন্দেই এরা নিচে নিয়ে আসতে পারে যা অন্য প্রাণীরা পারে না। জলে যখন থাকে কুমিরেরা প্রায় অন্ধের মতোই কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু ডাঙায় তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত ধারাল। দিন রাতের বেশির ভাগ সময়টা জলে থাকে বলে তাদের মুখে বাসা নেয় জোঁকের দল।

সবরকম পাখি ও জন্তুই এই প্রাণীটিকে এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত। তবে কাদাখোঁচা জাতীয় পাখিদের সঙ্গে কুমিরের ভাব গলায় গলায়। তীরভূমিতে কুমির যখন হাঁ করে থাকে, তখন এই পাখিগুলো নির্ভয়ে তাদের মুখে ঢুকে জোঁকগুলোকে খেয়ে নেয়।

এই উপকারের জন্য কুমির তাদের ওপর এমন খুশি থাকে যে কখনও তাদের ক্ষতি করে না।''

প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের বিবরণ এভাবেই বর্ণনা করেছেন হেরোডোটাস। সেখানে কোন বিষয়ে সন্দেহমূলক কোন উক্তি নেই।

কিন্তু যেসব ঘটনা বা বিষয় জনশ্রুতি থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন, যার বিষয়ে তাঁর নিজেরই সন্দেহ রয়েছে, সেসব বিবরণে তিনি পরোক্ষ উক্তি ব্যবহার করেছেন।

ফিনিক্স পাখি সম্পর্কে তাঁর বিবরণটি এরকম ঃ এক রকম পাখির কথা শুনেছি, তাদের নাম ফিনিক্স। এই পাখি আমি কখনও দেখিনি, তবে ছবিতে দেখেছি। সূর্য উপাসকরা বলেন, এই পাখিদের নাকি পাঁচশো বছরে একবার দেখা যায়। এদের পূর্বপুরুষ মারা গেলে তবেই এরা আসে। ফিনিক্স পাখি ছবিতে যেমন দেখেছি, যদি এরা সত্য সত্য তেমনই হয় তাহলে বলা চলে এদের ডানা সোনালি আর লালে মেশানো। আকৃতি অনেকটা আমাদের ঈগলের মতো। এই পাখি সম্পর্কে এদের কাছ থেকে যেসব তথ্য আমি শুনেছি, সেগুলো সবই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তারা বলে, পাখিগুলো আসে আরব থেকে।

সূর্য উপাসকরা তাদের মৃত পিতার শরীর সূর্যমন্দিরে নিয়ে আসে। তাতে গাছের আঠা বেশ করে মাখিয়ে তারপর সমাহিত করে। তারা বলে ফিনিক্স পাখি বয়ে নিয়ে আসে একটা বিরাট আঠার বল। তাতে একটা গর্ত করে তার মধ্যে মৃতদেহটা ঢুকিয়ে দেয়। তারপর আরও আঠা দিয়ে গর্তটা বন্ধ করে দেয়। পরে সেই আঠার বলটি বয়ে নিয়ে যায় মিশরে। সমস্ত কাজটাই করে নাকি সেই ফিনিক্স পাখি।

জন বানিয়ান

ইংরাজি ভাষায় বাইবেলের পরেই এখনো পর্যন্ত বিক্রি সংখ্যার দিক থেকে যে বইটির নাম করা হয় তা হল পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস। বইটির সম্পূর্ণ নাম অবশ্য বেশ দীর্ঘ—দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস ফ্রম দিস ওয়ালর্ড টু দ্যাট হুইচ ইজ টু কাম ডেলিভার আন্ডার দ্য সিমিলিচুড অব দ্য ড্রিম।

সহজ সরল সরস ভাষায় লেখা এটি একটি রূপক কাহিনী মাত্র। কাহিনীর মূল বিষয় খ্রিস্টানদের জীবনযাত্রা।

১৬৭৮ খ্রিঃ প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বই সর্বশ্রেণীর ও সমাজের মানুষের দ্বারা বিপুল ভাবে সমাদৃত হয়। লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হতে থাকে। সমস্ত খ্রিস্টানের কাছেই ছোট বইটি হয়ে ওঠে যেন দ্বিতীয় বাইবেল স্বরূপ।

পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলেও পাঠকদের চাহিদার চাপে লেখককে বইটির দ্বিতীয় খণ্ডও লিখে ফেলতে হল।

এরপর অতিক্রান্ত হল তিন শো বছরেরও বেশি সময়। কিন্তু বইটির সমাদর আজও পর্যন্ত একই রকম রয়ে গেছে। বিক্রি সংখার দিক থেকে বাইবেলের পরেই এই বইটির স্থান।

এই বিস্ময়কর বইটির লেখকের নাম জন বানিয়ান। বেডফোর্ডের কাছে এলস্টোতে এক অতি সাধারণ পরিবারে ১৬২৮ খ্রিঃ তাঁর জন্ম।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস। সেই চমক অব্যাহত রইল বছরের পর বছর—দশকের পর দশক।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে এই চমকপ্রদ বইটি একশ বছর ধরে সাহিত্য জগতের অভিভাবক মহলের দৃষ্টির বাইরেই রয়ে গিয়েছিল।

অথচ উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলের স্বীকৃতির ওপরেই কোন বইয়ের সাহিত্যিক মূল্য ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

সাধারণ পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলেও শিক্ষিত মহল বইটি সম্পর্কে কোন রকম আগ্রহ বোধ করেননি।

দীর্ঘ একশত বছর এভাবেই অতিবাহিত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বইটি সম্পর্কে শিক্ষিত মহলে আগ্রহ সঞ্চার হল।

সাধারণতঃ কোন বইয়ের গুণাগুণ নির্ণয় করেন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক—সাধারণ পাঠকদের মতামত কখনোই আমল পায় না। প্রায়শই দেখা যায় সাধারণ পাঠকের মতামতকে তোয়াক্কা না করেই বুদ্ধিজীবী মহলের মন্তব্যের ফলে একটি বই স্থান পেয়ে যায় সাহিত্যের ইতিহাসে।

চিরাচরিত এই রেওয়াজ রীতিমত পাল্টে দিল দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস বইটি। একশো বছর পরে হলেও শেষ পর্যন্ত সাধারণ পাঠকশ্রেণীর মতামতকে মূল্য দিতে হল শিক্ষিত মহলকে।

বিক্রির ইতিহাসের মতোই সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাবার বিষয়েও রীতিমত চমকপ্রদ ইতিহাস সৃষ্টি করে যথাযোগ্য মর্যাদা আদায় করে নিল দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস। সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা।

জন বানিয়ান নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে অতি সাধারণ ও অখ্যাত

পরিবারের সন্তান বলে বর্ণনা করেছেন। আসলে কিন্তু তাঁদের পরিবার ছিল ওই এলাকায় বিশেষ পরিচিত ও প্রাচীন।

জনের বাবা টমাস বানিয়ান ছিলেন একজন কর্মকার। এলস্টোতে পেতলের বাসনকোসন মেরামত ও ঝালাইয়ের একটি কামারশালা ছিল তাঁর।

বয়স একটু বাড়লে জন তাঁর বাবার পেশাই গ্রহণ করলেন। তিনি নিজেকে পেতলের বাসন সারানোর মিস্ত্রী বলেই পরিচয় দিতেন।

বাবার সঙ্গে কাজে বেরনোর আগে পর্যন্ত বাড়িতে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন জন। কিন্তু যখন ঝালাইওয়ালার পেশা গ্রহণ করলেন, ততদিনে সবকিছু গুলে খাওয়া শেষ। একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন লেখাপড়া।

জনের মা মারা গেলেন ১৬৪৪ খ্রিঃ। তখন তাঁর বয়র মাত্র ষোল বছর। মায়ের মৃত্যুর পর দুমাসের মধ্যেই তাঁর বাবা আবার বিবাহ করলেন। এই ঘটনায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল তাঁর মন। তিনি সৈন্য বিভাগে নাম লিখিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেলেন।

সৈন্য বিভাগের কাজে ছ বছর ছিলেন জন। এই সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রীতিমতো অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে। একবার নেহাৎ ভাগ্যজোরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

একটি সামরিক অভিযানে শেষমুহূর্তে জনের বদলে যে সৈনিকটি যোগ দিয়েছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

উনিশ বছর বয়সে যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন জন। আকস্মিক ভাবেই সংসার পাতলেন পিতৃ-মাতৃহীন এক ধর্মপ্রাণা তরুণীকে বিয়ে করে।

হতদরিদ্র এই দম্পতির সংসারে আসবাব তো দূরের কথা গৃহস্থালীর সামান্য থালা বা চামচও ছিল না। বলতে গেলে একেবারে শূন্য থেকেই সংসারযাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁরা।

জনের স্ত্রী ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। স্বামীর ঘরে আসার সময় তিনি দুখানি ধর্মগ্রন্থ সঙ্গে করে এনেছিলেন।

ধর্মগ্রন্থগুলির নাম, দ্য প্রেইল ম্যানস পাথওয়ে টু হেভেন ও দ্য প্রাকটিস অব পাইরিটি। সংসারে সম্পত্তি বলতে ছিল কেবল ওই দুখানি বই।

জন ছিলেন প্রাণবন্ত টগবগে যুবক। নাচ গান হৈহুল্লোড় করে ফুর্তিতে সময় কাটাতেই পছন্দ করতেন। তবে কখনো কুসঙ্গের প্রভাবে পড়ে কোন বদ কাজের সঙ্গে যুক্ত হননি।

খারাপ ধরনের শপথ করা ছাড়া তাঁর জীবনে বিশেষ কোন দোষ ছিল না কথায় কথায় যখন তখন যা-তা ভাষায় তিনি শপথ করে বসতেন। এই ব্যাপারটা একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর।

সৈন্য বিভাগে থাকার সময় লেখাপড়ার ব্যাপারটা খানিক ঝালিয়ে নিতে পেরেছিলেন। স্ত্রীর আনা বই দুখানা পড়ে তিনি প্রভাবিত হলেন। তাঁর নিজেকে একজন অপরাধী, পাপী বলে মনে হতে লাগল।

এই সময়ের একদিনের একটি ঘটনা তাঁর জীবনের ধারা আমূল পাল্টে দিল।

কয়েকজন মহিলা এক জায়গায় বসে ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। বানিয়ান সেখান দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করলেন কী গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে মহিলারা কথা বলছেন।

এই ঘটনাটি বানিয়ানকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করল। তাঁর মনেও ঈশ্বর প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন জেগে উঠল। দীর্ঘ চার বছর তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়ের আন্দোলন চলল এবং একদিন নিজের মধ্যেই সব প্রশ্নের সমাধান পেয়ে গেলেন তিনি। গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠল তাঁর মন।

এই সময়ের মনের আকুলতা, আবেগ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে একখানি বইও তিনি লিখেছিলেন। বইটির নাম দিয়েছিলেন গ্রেস অ্যাবার্ডনডিং টু দ্য চীফ অব সিনারস।

বানিয়ান প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিলেন ১৬৫৩ খ্রিঃ। দুবছর পরে তিনি চলে এলেন বেডফোর্ডে।

দুর্ভাগ্যই যেন তাঁকে এখানে টেনে নিয়ে এলো। কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। স্ত্রীর শোকে নিজেও কিছুদিন অসুস্থ হয়ে রইলেন।

১৬৫৫ খিঃ বেডফোর্ডের সেন্ট জন চার্চের অন্যতম যাজক নিযুক্ত হলেন জন। পুরোপুরি ভাবেই অধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিলেন তিনি।

এককালের ঝালাইওয়ালা ও সৈনিক জন বানিয়ানকে এর পরে দেখা গেল ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায়। এই কাজে অসামান্য সফলতা অর্জন করলেন তিনি।

আগে কখনো জনসমক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস ছিল না বানিয়ানের। তাই নিজেও তিনি জানতেন না যে বক্তৃতা দেবার সহজাত দক্ষতা তাঁর রয়েছে। ধর্মপ্রচারের কাজে নেমে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করলেন। তাঁর প্রচার সভায় লোকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনত।

কিন্তু এককালে যারা তঁকে জানত খারাপ শপথ করা বাচাল ফুর্তিবাজ বলে তাঁরা সভায় কৌতূহল নিয়ে ভিড় বাড়াত তাঁর ধর্ম প্রচারক চেহারা দেখার জন্য।

কেউ কেউ তাঁকে টিটকিরিও দিত। কিন্তু সব অবস্থাতেই অবিচলিত থাকতেন বানিয়ান।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধর্মকথা প্রচার করতেন বানিয়ান। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলে শুনতো তাঁর কথা।

সহজ সরল কথার মধ্য দিয়ে তিনি লোকের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে পারতেন। আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হত তাদের হৃদয়।

একজন সামান্য ঝালাইওয়ালা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে মানুষের আত্মার সংস্কারক—এই ব্যাপারটা রক্ষণশীল যাজক সম্প্রদায় সহজ ভাবে মেনে নিতে পারল না।

বানিয়ানের জনপ্রীতিও তাদের গাত্রদাহের কারণ হয়ে উঠল। তাঁকে অপদস্থ করবার জন্য তারা নানা অভিযোগ তুলতে লাগল। এমন সব অভিযোগ যার কোন ভিত্তি ছিল না।

কৌশলে প্রচার করা হতে লাগল, বানিয়ান একজন ডাইনি। কেউ বলে বেড়াত লাগল, ধর্মান্ধ পাদ্রীটা ডাকাত ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়াও নানা মিথ্যা কুৎসা রটনা করা হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত এই অপপ্রচার এবং বিরুদ্ধাচরণ বানিয়ানকে মামলায় পর্যন্ত জড়িয়ে ফেলেছিল। ১৬৫৮ খ্রিঃ তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা উঠেছিল। তার ফলাফল কিছু অবশ্য জানা যায়নি।

এই সময় থেকেই বানিয়ান একের পর এক বই লিখতে থাকেন। ১৬৫৬ খ্রিঃ প্রকাশিত হল সাম গসপেল ট্রুয়স ওপেন্ড।

বাইবেলের ওপরে অসাধারণ দখল ছিল তাঁর। বাইবেলের নীতিবাক্য ও পাপ-পুণ্য বিষয়ে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে লাগল।

১৬৫৩ খ্রিঃ প্রথমা স্ত্রী গত হয়েছিলেন। ছ বছর পরে ১৬৫৯ খ্রিঃ দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন।

তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম এলিজাবেথ। তিনিই দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন বানিয়ানের প্রথম পক্ষের চারটি সন্তানের।

বিবাহের কিছুকাল পর থেকেই বানিয়ানের জীবনে নেমে এলো বিপর্যয়। দ্বিতীয় চার্লসের ক্ষমতা লাভের পর থেকেই, গির্জাগুলির অধিকার সরকারের হাতে চলে গেল।

ফলে বানিয়ানের পক্ষে স্বাধীন ভাবে ধর্মপ্রচার করা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠল। তবু তিনি প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন।

১৬৬০ খ্রিঃ ১২ই নভেম্বর, বেডফোর্ডের এক বাড়িতে ধর্মসভায় বানিয়ান যখন বক্তৃতা করছিলেন সেই সময় রাজাদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

বানিয়ান আগেই জেনেছিলেন, তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছে। তবুও ভীত হননি তিনি। কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাননি।

বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হলে বানিয়ানকে। বলা হল আর কখনও ধর্মপ্রচার করবেন না এই মর্মে মুচলেকা লিখে দিতে। কিন্তু এই প্রস্তাব বানিয়ান প্রত্যাখ্যান করলেন।

মুচলেকা দিলে হয়তো অল্পতেই ছাড়া পেয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু বানিয়ান কিছুমাত্র নরম মনোভাব দেখালেন না।

১৬৬১ খ্রিঃ গোড়ার দিকে সুরু হল বানিয়ানের বিচার। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি সরকারী আদেশ অমান্য করে সভা ডেকে বক্তৃতা করে রাজভক্ত প্রজাদের সম্রাটের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছেন। আরও ছিল, তিনি কোন গির্জায় প্রার্থনাসভায় যোগ দেন না। অন্যান্য ধর্মাচরণেও অংশ নেন না। সকল অর্থেই তিনি একজন ধর্মদ্রোহী।

বানিয়ান তাঁর বিরুদ্ধে আনা মিথ্যা অভিযোগগুলির কোন প্রতিবাদ করলেন না। উপরন্তু সব অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন এবং দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তথাকথিত অপরাধগুলি তিনি আবার করবেন। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মপ্রচারের কাজ থেকেও তিনি বিরত হবেন না।

একতরফা বিচারে বিচারক তাঁর রায়ে ঘোষণা করলেন, প্রথম দফায় বানিয়ানকে তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। তিন মাস পরে নিজস্ব ধর্মপ্রচার ছেড়ে তাঁকে গির্জার ধর্মসভায় যোগ দিতে হবে। যদি তিনি তা না করেন, তবে তাঁকে রাজত্ব থেকে বহিষ্কার করা হবে।

এরপরেও যদি তিনি রাজার কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি না নিয়ে আবার ফিরে আসেন, তাহলে সেই অপরাধে তাঁকে দেওয়া হবে মৃত্যুদন্ড।

বানিয়ান তিনমাস কারাদন্ড ভোগ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত বদল করতে রাজি হলেন না।

এর কিছুদিন পরেই রাজা চার্লসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের ক্ষমা প্রার্থনার অবেদন জানাবার সুযোগ দেওয়া হল। বানিয়ান কিন্তু এরকম কোন আবেদনই জানালেন না।

ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী লন্ডনে হাউস অব লর্ডসে উপস্থিত হয়ে স্বামীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন।

তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গেই শোনা হল এবং তাঁকে বিষয়টি আদালতে উপস্থিত করতে পরামর্শ দেওয়া হল।

বানিয়ানের স্ত্রী যথারীতি আদালতে বিচারকের কাছে তাঁর স্বামীর ন্যায় বিচারের প্রার্থনা জানালেন। পর পর তিনবার আবেদন জানাবার পর বিচারক

সভার সদস্য ম্যাথিও হেল তাঁকে জানালেন যে তাঁর স্বামী যে বিবৃতি দিয়েছে তাকে তার শাস্তি ভোগের ইচ্ছা বলেই আদালত ধরে নিয়েছে।

এক্ষেত্রে তাঁকে মুক্তি পেতে হলে রাজার কাছে ভ্রান্তি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

বলাবাহুল্য, বানিয়ান এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না এবং তাঁকে এরপর বারো বছর কারাদন্ড ভোগ করতে হল।

কারাবাসের প্রথম দিকে বানিয়ানকে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মসভাতে যোগ দিতে দেওয়া হত। পরে সেই সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

বানিয়ানকে যে জেলখানাতে রাখা হয়েছিল, সেখানে প্রায়ই নন-কনফরমিস্টদের এনে রাখা হত। বানিয়ান তাদের নিয়েই জেলখানার ভেতরে ধর্মসভা বসাতেন।

জেলের ব্যবস্থাপত্র ভালই ছিল। সংসারের খরচ নির্বাহের জন্য জেলে বসেই তিনি ফিতে তৈরি করতেন এবং সেগুলো ফেরিওয়ালাদের কাছে বিক্রি করতেন। জেলে বসে লেখাপড়ারও সুযোগ পেতেন তিনি।

বাইবেল ও বুক অব মার্টারস বই দুটি সঙ্গেই ছিল। কাগজ কলম সংগ্রহ করে একসময় লেখাও শুরু করলেন। জেলে বসেই তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ গ্রেস অ্যাবাউনডিং।

জেলের জীবনে যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে বানিয়ানকে। স্ত্রী পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার যন্ত্রণা তাঁর হৃদয়কে দগ্ধ করত। এই সময়ের মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, শরীর থেকে মাংস টেনে ছিঁড়ে নেওয়ার মতো যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হত।

তাঁর একটি সন্তান ছিল অন্ধ। সেই হতভাগ্য সন্তানটির কথা ভেবে বেদনায় তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হত। ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষটি পরিবারের সকলকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করতেন।

দীর্ঘ বারো বছর কারাবাসের পরে দ্বিতীয় চার্লসের আদেশে ১৬৭২ খ্রিঃ নন-কনফরমিস্টদের মুক্তি দেওয়া হল। সেই সঙ্গে বানিয়ানও মুক্তি পেলেন।

ইতিমধ্যে বেজকার্ডের সেন্ট জন গির্জাটির অধিকার তার আসল মালিকরা ফিরে পেয়েছিলেন। তাই সেখানে ফিরে যাবার পথ ছিল না। বানিয়ান তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে খামার বাড়িতেই ধর্মসভা বসাতে লাগলেন।

তিনি অবশ্য একজায়গায় আবদ্ধ থাকলেন না। আবার আগের মতো ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করলেন। এই সময়ে তাঁকে সকলে বিশপ বটি বানিয়ান বলে সম্বোধন করত।

ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে এই সময়টা ছিল খুবই গোলযোগপূর্ণ। একমাত্র চার্চ অব ইংলন্ডের অনুমোদিত ধর্মাচরণ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচার ছিল নিষিদ্ধ।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেও বানিয়ান তাঁর নিজমতের ধর্মপ্রচারের কাজ অব্যাহত রাখলেন।

তিনি ওয়াগন চালকের ছদ্মবেশে, হাতে একটি ছপটি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

বাইবেলের বাণী প্রচারই ছিল বানিয়ানের ধ্যানজ্ঞান। এজন্য তিনি যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করতেন না।

লোকের মধ্যে সত্যকার ধর্মভাব জাগিয়ে তোলার কাজকে তিনি তাঁর ধর্মাচরণের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতেন।

লেখার কাজেও বিরাম ছিল না তাঁর। ১৬৭৮ খ্রিঃ প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস। এই একটি মাত্র গ্রন্থের জন্যই তিনি বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন।

তবে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই প্রসঙ্গে নাম করা যায় দ্য লাইফ অ্যান্ড ডেথ অব মিঃ ব্যাডম্যান এবং দ্য হোলি ওয়ার-এর।

দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেসের দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হল ১৬৮০ খ্রিঃ। এই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি দ্বিতীয় বাইবেল রূপে খ্যাতি লাভ করে।

ধর্মপ্রচারের ব্যস্ততার মধ্যেও অত্যন্ত দ্রুত লিখতে পারতেন বানিয়ান। এই লেখার কাজ তাঁর অব্যাহত ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

জনগণের মনে ধর্মীয় চেতনা জাগাবার উদ্দেশ্যে বাইবেলের বাণী প্রচার করেই জীবন অতিবাহিত করেছেন বানিয়ান।

লন্ডনের সাউথ ওয়ার্কের গির্জায় গিয়ে প্রায়ই তিনি বক্তৃতা দিতেন। তাঁর ভাষণ শুনবার জন্য শত শত ধর্মপ্রাণ মানুষ সেখানে জড়ো হতেন। একবার এক শীতের ভোরবেলায় প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যেও বারশো লোক নিবিষ্টভাবে তাঁর ধর্মীয় ভাষণ শুনেছিলেন।

জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে সম্মান খ্যাতি সবই লাভ করেছেন বানিয়ান। ১৮৮৮ খ্রিঃ তিনি লন্ডনের লর্ড মেয়রের সহকারী পদ লাভ করেছিলেন। সারাজীবন কঠোব দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটাবার পর এই সুখ সম্মান যেন ঈশ্বরের দেওয়া পুরস্কার।

কিন্তু তাঁর জীবনের মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছিল। ১৬৮৮ খ্রিঃ এক পরিবারে পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন ঘটাবার জন্য তাঁকে লণ্ডন থেকে রিডিং যেতে হয়েছিল। সেদিন প্রচন্ড বৃষ্টি মাথায় করেই কর্তব্য পালন করে এসেছিলেন। কিন্তু ফিরে এসে জ্বরে পড়লেন। ৩১শে আগস্ট প্রিয় বন্ধু জন স্টাডউইকের স্নো হিলের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে বানিয়ান ছিলেন সৎ, বিনয়ী, সরল ও নিরহঙ্কারী। মৃদুস্বরে কথা বলতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না। তিনি কখনো নিজের প্রশংসা করতেন না, কিংবা নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করতেন না।

দেবপ্রতিম এই মানুষটির যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করেছেন পরবর্তীকালের মানুষ। মানুষের ইতিহাসে পিলগ্রিমস প্রোগেস-এর লেখক বানিয়ান লাভ করেছেন অমরত্বের দুর্লভ সম্মান।

আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন

বিগত শতাব্দীর অন্যতম স্বাধীনচেতা নির্ভীক প্রতিবাদী লেখকআলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী তীব্র প্রতিবাদে ঝলসে উঠেছিল। লৌহমানব যোসেফ স্তালিনের কাজকর্মের তীব্র বিরোধিতা করে তিনি রাষ্ট্রনায়কের বিষনজরে পড়েছিলেন। স্বদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁর লেখা।

এমনকি পরোক্ষভাবে তাঁর মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাঁকে তথাকথিত শ্রমশিবিরে পাঠিয়ে।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

রাশিয়ার অন্য এক প্রতিবাদী লেখক পাস্তারনাককে তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য সুইডিশ একাদেমি ১৯৫৮ খ্রিঃ নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

এই সংবাদ জানতে পেরে লেখক মন্তব্য করেছিলেন, আমি অভিভূত এবং গর্বিত।

কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চাপে পড়ে কিছুদিন পরেই তাঁকে বলতে হয়েছিল উল্টো কথা। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন বলতে, নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

মাত্র বারো বছর পরেই, ১৯৫৮ খ্রিঃ সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হল, অন্য এক রুশ লেখক সলঝেনিৎসিনের নামে। কিন্তু এবারে আর পাস্তেরনাকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল না।

বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল রাষ্ট্রীয় শাসক গোষ্ঠীর সকল প্রকার প্রতিরোধ উপেক্ষা করে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর লেখার প্রচার বন্ধ করার জন্য রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিলম্ব করল না।

সোভিয়েত রাশিয়ায় সলঝেনিৎসিনের লেখা বই পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল। প্রতিবাদী এই লেখককে চূড়ান্ত নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাসের পট সতত পরিবর্তনশীল। এক সময় রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। কমিউনিস্ট অপশাসনের কবল মুক্ত বর্তমান রাশিয়ায় তাঁর রচনা ঘরে ঘরে পঠিত হয়। বিপুলভাবে সমাদৃত তাঁর সাহিত্যকর্ম।

ককেসাসের ফিসলোভদক্স অঞ্চলে ১৯১৮ খ্রিঃ ১১ ডিসেম্বর জন্ম হয়েছিল সলঝেনিৎসিনের।

বিশ্ব ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সন্ধিলগ্ন তখন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। আর আগের বছরেই ঘটেছে মহান অক্টোবর বিপ্লবের অভ্যুদয়।

সলঝেনিৎসিনের বাবা ছিলেন সামরিক অফিসার। তাঁর জন্মের মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাই মায়ের স্নেহছায়াতেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন।

প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন মায়ের কাছেই। বাল্য বয়সেই পড়াশোনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ প্রকাশ পায়। সুযোগ পেলেই পছন্দমতো বই নিয়ে বসে পড়তেন।

সলঝেনিৎসিনের পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধির সহায়তা করেছিলেন তাঁর এক পিসিমা; ইরিনা শেচারবাক। তিনি স্নেহ ও মমতার সঙ্গে পিতৃহারা ভাইপোটির সবরকম কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করতেন। বস্তুতঃ ইরিনা হয়ে উঠেছিলেন শিশু সলঝেনিৎসিনের একান্ত সঙ্গী। তাঁর শিশুমনটি উপযুক্ত শিক্ষায় ও সাহচর্যে তিনিই গঠন করে দিয়েছিলেন।

বই পড়ার অভ্যাসের প্রভাব সলঝেনিৎসিনের মনে এমনই গভীর হয়েছিল যে মাত্র নয় বছর বয়সেই তিনি জীবনের পথ স্থির করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই পরে লিখেছেন, খুব ছোট বয়স থেকেই তাঁর লিখতে ইচ্ছে হত। এই ভাবেই লেখা ও লেখক সম্পর্কে তাঁর ধারণা তৈরি হয়েছিল এবং তিনি সঙ্কল্প নিয়েছিলেন বড় হয়ে তাঁকে লেখক হতে হবে।

পিসিমা ইরিনার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটিতে ছিল অসংখ্য বই। দিনের বেশির ভাগ সময়টা তাঁর সেখানেই কেটে যেত। এখানেই তিনি পরিচিত হন দস্তয়ভস্কি, পুশকিন, তুর্গেনিভ ও গোগোলের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে।

মাত্র দশ বছর বয়সেই তিনি পড়ে শেষ করেছিলেন রুশ সাহিত্যের দিকপাল লেখক তলস্তয়ের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস ওয়র অ্যান্ড পিস। এই ভাবেই পুষ্টি লাভ করেছিল তাঁর লেখকসত্তা।

ছাত্র অবস্থাতেই কমিউনিস্ট ভাবধারায় আকৃষ্ট হন সলঝেনিৎসিন। কমিউনিস্ট যুব সংগঠন কোম সোমল-এর সদস্য হয়েছিলেন তিনি ১৯৩৬ খ্রিঃ। সেই সময়

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং লেনিন-পন্থী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত। কার্ল মার্কসের রচনা সর্বক্ষণের সঙ্গী।

রোস্তভ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী দিনগুলোতেই প্রেম এলো সলঝেনিৎসিনের জীবনে। এই প্রেমের পরিণতিতে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন নাটালা রেশেতোবাস্কার সঙ্গে। নাটালা ছিলেন অধ্যাপিকা এবং একজন রসায়নবিদ।

রোস্তভ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই সলঝেনিৎসিন কার্ল মার্কস ও লেনিনের মতবাদ নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। এই সময়েই তিনি মনেপ্রাণে বর্জন করেছিলেন স্তালিনকে। লেনিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অবিচল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর ১৯৪১ খ্রিঃ দক্ষিণ রাশিয়ার একটি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি পড়াতেন গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা।

কিন্তু বেশিদিন স্কুলের কাজ করতে পারেননি তিনি। ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। জার্মানি আক্রমণ করেছে সোভিয়েত রাশিয়া। স্কুলের কাজ ছেড়ে সলঝেনিৎসিন নাম লেখালেন সৈন্য বিভাগে।

পরের বছরেই, ১৯৪২ খ্রিঃ সামরিক বিভাগে উচ্চপদ লাভ করলেন তিনি। হলেন কমান্ডার। পরে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত হয়েছিলেন।

১৯৪৫ খ্রিঃ ঘটল ভাগ্য বিপর্যয়। আকস্মিক ভাবে গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না সলঝেনিৎসিন। কেননা গ্রেপ্তারের কারণ ছিল তাঁর অজানা।

এক বন্ধুকে ব্যক্তিগত একটি চিঠিতে তিনি একসময় তাঁর স্তালিন-বিরোধী মতবাদের কথা জানিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই চিঠিটি পড়ে যায় গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্টদের হাতে এবং তার পরিণতিতেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, সলঝেনিৎসিন লেনিনের মতাদর্শ রূপায়নের জন্য নতুন একটি দল গড়ার ষড়যন্ত্র করছেন।

যথারীতি একতরফা বিচারের প্রহসন অনুষ্ঠিত হল। অভিযুক্তের কোন বক্তব্যই শোনা হল না। বিচারে তাঁকে দেওয়া হল আট বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড।

সলঝেনিৎসিনকে প্রথমে পাঠানো হল শ্রম শিবিরে। কিছুদিন পরে সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল মস্কোর পেনাল সায়েন্টিফিক রিসার্চ ইনসটিটিউটে। তখনকার মারফিনো কারাগারে তাঁকে কাজে নিযুক্ত করা হল।

১৯৪৭ খ্রিঃ সলঝেনিৎসিন গণিতজ্ঞ হিসাবে কমিউনিকেশন রিসার্চের কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু এখানকার পরিবেশ অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। তিনি প্রকাশ্যেই তাঁর ওপরওলা অফিসারদের সমালোচনা করতে লাগলেন।

পরবর্তীকালে এই মরফিনো কারাগারের পটভূমিতেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস দ্য ফার্স্ট সার্কেল।

এবারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগে ১৯৫০ খ্রিঃ সলঝেনিৎ-সিনকে স্থানান্তরিত করা হল কাজাকস্তানের একটি শ্রম শিবিরে। তাঁকে নিযুক্ত করা হল মজুরের কাজে।

এই ক্যাম্পগুলিকে বলা হত হার্ড লেবার ক্যাম্প। বন্দীদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কাজে এখানে নিযুক্ত করা হত।

কারাবাসের দুঃসহ দিনগুলিতে সলঝেনিৎসিন তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘোচাতেন লেখার কাজে বসে। প্রকাশ্যে কিছু লেখা ছিল বারণ। ছেঁড়া টুকরো ফেলে দেওয়া কাগজ গোপনে সংগ্রহ করে তিনি তাতে প্রথমে তাঁর লেখার খসড়া করতেন।

কিন্তু সেসব লেখা প্রহরীদের চোখে পড়লে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা তাই সব খসড়া স্মৃতিতে ধরে রাখতেন আর-লেখা কাগজগুলো ফেলতেন নষ্ট করে।

পরবর্তীকালে এই হার্ড লেবার ক্যাম্পের স্মৃতি নিয়েই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অব ইভানদেনিসোভিচ।

১৯৫৩ খ্রিঃ ৫ই মার্চ স্তালিন মারা গেলেন। আর ঘটনাচক্রে সেই দিনটিই ছিল সলঝেনিৎসিনের দীর্ঘ আট বছরের বন্দী জীবনের মুক্তি পাবার দিন।

জেল থেকে বেরুবার পর একটি সমবায় সংস্থায় চাকরি নিলেন তিনি। কিন্তু জানতেন তাঁর গতিবিধির ওপরে সরকারি গোয়েন্দাদের নজর রয়েছে। তাই এই সময়ে লেখার কাজ যেটুকু করতেন সবই গোপনে। বাইরের কেউই তা জানতে পেত না।

চাকরির পাশাপাশি নিয়মিত লেখার কাজ করে গেছেন তিনি। আবার উপার্জন বাড়াবার জন্য বাইরে ছাত্র পড়াবার কাজও নিতে হয়েছিল তাঁকে। সব মিলিয়ে এই সময় তাঁকে করতে হয়েছে কঠোর পরিশ্রম।

ইতিমধ্যে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী নাটাল্যা রেশেতোবাস্কার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার বিবাহ করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি।

পাত্রীর যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য তিনি দুটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এই সময় যে সকল পাত্রীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই বিষয় দুটি তুলে ধরেছিলেন।

সলঝেনিৎসিন চাইতেন যাঁকে তিনি বিয়ে করবেন, পাণ্ডুলিপি তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ থাকতে হবে এবং সেই পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি যাদের বিবাহের প্রস্তাব দিতেন তাদের এই দুটি বিষয়ের পাশাপাশি আন্তন চেকভের দ্য ডার্লিং বইটি পড়তে দিতেন। যাতে গল্পের মর্মার্থ থেকে তারা তাঁর উদ্দেশ্য ও মনোভাব পরিষ্কার বুঝতে পারে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে মহিলারা সলঝেনিৎসিনকে বিবাহে আগ্রহী হয়েছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হননি। এমনকি চেকভের গল্পের প্রভাবও তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি।

দীর্ঘ আট বছর কারাদন্ডকালের কঠোর জীবনের যন্ত্রণা সইতে হয়েছিল সলঝেনিৎসিনকে। তথাপি দেশের কমিউনিস্ট শাসকদের কড়া নজর ছিল তাঁর ওপরে।

১৯৫৪ খ্রিঃ তাঁকে আবার বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠানো হল। এবারে দক্ষিণে কাজাকস্তানের কোকটেরেক ক্যাম্প।

ইতিপূর্বে হার্ডলেবার ক্যাম্পে বন্দী থাকার সময়েই তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হন।

কোকটেরেক ক্যাম্পে আসার পর পুনরায় রোগাক্রান্ত হলেন তিনি। চিকিৎসার জন্য তাঁকে পাঠানো হল তাসখন্দ হাসপাতালে এবং সৌভাগ্যবশতঃ রোগমুক্ত হলেন তিনি।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটেছে পরিবর্তন। স্তালিনের পরে সোভিয়েত রাশিয়ার শাসন ক্ষমতায় এলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ। রাজনৈতিক পরিবেশে এল কিছুটা সুস্থিরতা। স্তালিন-বিরোধী মতাদর্শ দানা বাঁধার সুযোগ পেল।

এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সলঝেনিৎসিনেরও ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটল। তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়া হল এবং তিনি মুক্তি পেলেন।

এই সময়েই তাঁর সঙ্গে ফের যোগাযোগ হল বিবাহ বিচ্ছিন্না স্ত্রীর সঙ্গে। যে বন্ধন একদিন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই আবার পুনর্যোজিত হল। দুজনে আবদ্ধ হলেন অটুট বন্ধনে।

ছেড়ে যাওয়া স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে যেন নতুন জীবন লাভ করলেন সলঝেনিৎসিন। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন মস্কোর অদূরে রেজানে নামক স্থানে। সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন তাঁরা।

সংসার জীবনে পুনঃপ্রবেশ করে আবার পুরনো পেশাতেই ফিরে এলেন সলঝেনিৎসিন। গ্রহণ করলেন শিক্ষকতার জীবন। তার পাশাপাশি চলল তাঁর লেখার কাজ।

লেখার কাজটা চলত গোপনে। একমাত্র স্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় কেউ তাঁর পান্ডুলিপি দেখার সুযোগ পেত না। তিনিই টাইপ করতেন তাঁর যাবতীয় লেখা।

দিনে দিনে জমে উঠছিল পান্ডুলিপি। সেসবের দিকে তাকিয়ে হতাশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন সলঝেনিৎসিন।

ভাবতেন, এসব লেখা তাঁর কোন দিনই প্রকাশের সুযোগ পাবে না। কেননা সোভিয়েত রাশিয়ায় লেখকদের স্বাধীনতা অস্তমিত।

১৯২২ খ্রিঃ সোভিয়েত রাশিয়ায় ২২ তম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বাতাবরণ তৈরি হল।

ফলে কিছুটা আশান্বিত হলেন সলঝেনিৎসিন। তাঁর রচনা প্রকাশের সম্ভাবনার পথ দেখতে পেলেন।

এই সময়েই তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অব ইভান-দিনেসোভিচ প্রকাশের জন্য নাভিমির মাসিক পত্রিকায় পাঠালেন।

এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আলেকজান্ডার টাভডোস্কি। সলঝেনিৎসিনের উপন্যাসটি পড়ে তিনি চমকিত হলেন। প্রকাশের আগে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তিনি পান্ডুলিপিটি পাঠালেন স্বয়ং ক্রুশ্চেভের কাছে।

অবিলম্বে অনুমোদনও পাওয়া গেল এবং ১৯২২ খ্রিঃ সেই লেখা প্রকাশিত হল নাভিমির মাসিক পত্রে।

প্রথম উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক হিসেবে দেশে প্রতিষ্ঠা পেলেন সলঝেনিৎসিন। রাইটার্স ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হলেন তিনি। কেবল তাই নয় রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের অভিযোগে যাঁকে একদিন দেওয়া হয়েছিল দীর্ঘকারাবাসের দন্ড, শ্রমশিবিরে তাঁকে দিয়ে করান হয়েছে মজুরের কাজ, সেই মানুষকেই কেবল একটি উপন্যাসের বক্তব্যের সুবাদে ভাষণ দিতে আহ্বান জানানো হল সোভিয়েত সুপ্রিম মিলিটারি ট্রাইবুনালে।

বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে এক বছরের মধ্যেই উপন্যাসটি পৌঁছে গেল ইউরোপের নানা দেশের মানুষের হাতে। এই ভাবেই শুরু হল লেখক সলঝেনিৎসিনের অগ্রযাত্রা।

উপন্যাসের পরেই নাভিমির কাগজে প্রকাশিত হল দুটি গল্প। সমালোচকরা এবারেও প্রশংসায় মুখর হলেন। তাঁর তুলনা করা হল তুর্গেনিভ এবং চেকভের সঙ্গে। সলঝেনিৎসিনের নাম পৌঁছে গেল খ্যাতির শীর্ষে।

১৯২২ খ্রিঃ লেনিন পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করা হল। যদিও এই পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়নি।

খ্যাতি ও যশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছিল লেখার চাহিদা। ফলে দুই দিকে তাল রাখা, লেখা এবং চাকরি, তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত

চাকরি ছেড়ে লেখাকেই একমাত্র জীবিকা হিসেবে বেছে নিলেন তিনি। বই বিক্রি বাবদ প্রকাশকদের দেওয়া টাকাই হল তাঁর একমাত্র উপার্জন।

দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিল ১৯২২ খ্রিঃ। সেই সময় তিনি তাঁর দ্য ফার্স্ট সার্কল উপন্যাস রচনার কাজে ব্যস্ত। ক্রুশ্চেভ হলেন ক্ষমতাচ্যুত। স্তালিন-বিরোধী প্রচারের জন্য তাঁকে অপসারিত করে ক্ষমতায় এলেন লিওনাদ ব্রেজনেভ।

রাজনৈতিক পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে সলঝেনিৎসিনের ভাগ্যেও নেমে এলো দুর্ভাগ্যের অশুভ ছায়া। কর্তৃপক্ষের বিষনজর পড়ল তাঁর ওপর। ব্রেজনেভ ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যেই ১৯২২ খ্রিঃ পুলিস দ্য ফার্স্ট সার্কেল উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সহ অন্য কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করল। একজন লেখকের জীবনে এই ঘটনা চরম দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী।

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি পুলিস। সলঝেনিৎসিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাড়িতেও পুলিশি হামলা হল। সেখানে খোঁজা হল, সলঝেনিৎসিনের কাগজপত্র।

দ্য ফার্স্ট সার্কল-এর পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেবার জন্য তিনি চিঠি লিখলেন ব্রেজনেভকে। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। অগত্যা বাধ্য হয়েই তিনি প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের পথ বেছে নিলেন। ব্রেজনেভ সরকারের হুমকির কাছে মাথা নত করলেন না তিনি। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল তাঁর সরকারি নীতির সমালোচনা।

১৯২২ খ্রিঃ তিনি চিঠি লিখে ঘটনাটি সোভিয়েত রাইটার্স কংগ্রেসের নজরে আনলেন।

এতদিনে স্বাধীনতাকামী প্রতিবাদী লেখক হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর খ্যাতির কথা বিবেচনা করেই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে চরম কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস পায়নি।

সলঝেনিৎসিনের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টায় সোবিয়েত কর্তৃপক্ষের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে নানাভাবে তাঁকে হেনস্থা করতে লাগল।

১৯২২ খ্রিঃ সলঝেনিৎসিনের উপন্যাস দ্য ক্যানসার ওয়ার্ড নাভিমির পত্রিকায় প্রকাশের অনুমোদন পেয়েছিল। কিন্তু তা ছাপা হল না।

কিন্তু পশ্চিমে সলঝিনিৎসিনের লেখার চাহিদা দিন দিনই বাড়ছিল। ১৯২২ খ্রিঃ তাঁর দ্য ক্যানসার ওয়ার্ড এবং দ্য ফার্স্ট সার্কেল উপন্যাস দুটি রাশিয়ার বাইরে থেকে প্রকাশিত হল।

রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে গেল। সাহিত্য সমালোচকরা মন্তব্য করলেন, এ দুটি উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে এক মূল্যবান সংযোজন।

সলঝেনিৎসিনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি যত বাড়তে লাগল, সোবিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে ততই তিনি অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগলেন। ১৯৩৯ খ্রিঃ তাঁকে রাশিয়ার রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করা হল।

সেই সঙ্গে নাভিমির পত্রিকার সম্পাদকের চাকরিটিও কেড়ে নেওয়া হল। নিয়মিত চলতে লাগল ভীতি প্রদর্শন।

সমস্ত ভয় বাধা উপেক্ষা করে সলঝিনিৎসিন নিজের মতাদর্শে অটল রইলেন। সরকারের সঙ্গে কোনও রকম আপোশ করলেন না।

পরের বছরেই যেন বোমা ফাটল সোবিয়েত কর্তৃপক্ষের মুখের ওপরে। সুইডিশ একাডেমি সলঝেনিৎসিনকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

এই সময় পৃথিবীর দেশে দেশে যখন সলঝেনিৎসিনের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, প্রশংসা চলতে লাগল, গোটা সোবিয়েত রাশিয়া তাঁর সম্পর্কে একেবারেই নীরব হয়ে রইল।

সরকারি পত্রিকা প্রাভদায় মন্তব্য করা হল, তিনি সোবিয়েত জনগণের স্বার্থ-বিরোধী লেখক। সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা কে. জি. বি লেখকের বাড়ি তল্লাসির নামে নতুন লেখার পাণ্ডুলিপি হাতড়ে বেড়াল।

তাঁর কারাবাসের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস দ্য গুলাগ অ্যার্কিপেগালো-এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হল ১৯৩৩ খ্রিঃ। এই উপন্যাস সোবিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সলঝেনিৎসিনের বিরোধ আরও বাড়িয়ে তুলল।

কে. জি. বি. এই উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে আবার তাঁর বাড়ি তল্লাশি করল।

সলঝেনিৎসিনের এক ব্যক্তিগত সচিব এলিনাবেতা ভোরোনায়াসকায়াকে গ্রেপ্তার করা হল। তার বাড়ি থেকে পুলিশ হস্তগত করল সলঝেনিৎসিনের একটি পাণ্ডুলিপি। এই ঘটনার পর এলিনাবেতা আত্মহত্যা করলেন।

তাঁর মৃত্যুতে নিদারুণ আঘাত পেলেন সলঝেনিৎসিন। তিনি রাতারাতি প্রকাশককে উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ড প্রকাশের নির্দেশ দিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে সলঝেনিৎসিন তাঁর আত্মজীবনীমূলক দ্য ওক অ্যান্ড দা কাফ গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ করলেন যে, তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে সোবিয়েত নেতাদের যে সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে তা থেকে তাঁরা আগামী পঞ্চাশ বছরেও মুক্ত হতে পারবেন না।

সলঝেনিৎসিনকে কোনও ভাবেই দমন করতে না পেরে সোবিয়েত নেতারা মরিয়া হয়ে তাঁর সরাসরি নিন্দাবাদ প্রচার করতে লাগল। প্রাভদা কাগজে তাঁকে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করল। সোবিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে বহিষ্কার করল।

এরপর বিদ্রোহী লেখক সলঝেনিৎসিন স্বদেশ পরিত্যাগ করে প্রথমে গেলেন পশ্চিম জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে। সেখান থেকে সুইজারল্যান্ড হয়ে চলে এলেন আমেরিকায়। নিউইয়র্ক হল তাঁর স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা।

স্বদেশ সলঝেনিৎসিনকে পরিত্যাগ করলেও তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, একদিন প্রবাস থেকে দেশের মাটিতে ফিরতে পারবেন।

দীর্ঘ দুই যুগের পরে তাঁর এই আন্তরিক বিশ্বাস সত্য হয়েছিল। ১৯৩৯ খ্রিঃ রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিল এবং তাঁকে দেশে ফেরার আমন্ত্রণ জানাল।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটেছে রাশিয়ায়, ভেঙ্গে গেছে সোবিয়েত ইউনিয়ন। দেশে নতুন পালা বদলের মধ্যে সলঝেনিৎসিনও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও তিন পুত্রকে নিয়ে ফিরে এসেছেন নিজভূমে

ইউরিপিডিস

প্রথাবিরোধী নাটক রচনা করে গ্রিসে আলোড়ন তুলে একই সময়ে কুড়িয়েছেন নিন্দা ও প্রশংসা, আর কালের বিচারে লাভ করেছেন চিরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান—এই হলেন ইউরিপিডিস।

যেসময়ে গ্রীক নাটকের নায়কদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন দেব-দেবীরা, ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়ে তাঁরা প্রার্থনা করতেন দেবতাদের করুণা, দয়া, তাঁদের নিজেদের চেষ্টায় থাকত না সংকট উত্তরণের প্রয়াস, সেই সামাজিক পরিমন্ডলে ইউরিপিডিসের নাটকের চরিত্ররা ব্যবহার করেছে সাধারণ মানুষেরই মত। রক্তমাংসের মানুষের মতোই দেবতাদের করুণার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে তারা নিজেদের চেষ্টাতেই মুখোমুখি হয়েছে যাবতীয় সংকটের।

এথেন্সের চিরাচরিত ঐতিহ্যকে ভঙ্গ করে তাঁর নাটকের চরিত্রদের মানুষেরই মতো উপস্থাপন করে দেশের মানুষের মনে নতুন ভাবনা নতুন চেতনার সঞ্চার করেছিলেন তিনি।

ট্রোজান আর গ্রীকদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল তার পটভূমিতে ইউরিপিডিস রচনা করেছিলেন তাঁর টেলিফাস নাটকটি।

দুই পক্ষে চলছে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। নিহত হচ্ছে উভয় পক্ষের দেশপ্রেমী বীরগণ। এমনি এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে গ্রীক সেনানায়ক একিলিসের বর্শার আঘাতে আহত হলেন মিশিয়ার রাজা টেলিকাস। তিনি যুদ্ধ করছিলেন ট্রোজান পক্ষের হয়ে।

চিকিৎসকদের চেষ্টা চলল ক্ষত ভাল করে তোলার। কিন্তু কোন ওষুধেই কাজ দিচ্ছে না।

এমনি সময়ে দৈবজ্ঞরা ঘোষণা করল, অ্যাকিলিসের যে বর্শার আঘাতে টেলিকাসের ক্ষতের সৃষ্টি, সেই বর্শার স্পর্শেই কেবল নিরাময় হতে পারে এই ক্ষত।

ক্ষতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছেন টেলিকাস। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। শত্রুপক্ষের সেনা নায়কের কাছে তিনি পৌঁছবেন কি করে? যদি বা কোন ক্রমে পৌঁছতে পারেন, অ্যাকিলিস কি তাঁর ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করতে রাজি হবেন?

অনেক চিন্তাভাবনা করে শেষ পর্যন্ত অসম্ভবকেই সম্ভব করে তোলার সংকল্প নিলেন রাজা টেলিকাস। গায়ে ছেঁড়া পোশাক চাপিয়ে তিনি ছদ্মবেশ নিলেন। সাজলেন একজন খঞ্জ ভিক্ষুক।

যুদ্ধে আহত হওয়ায় এমনিতেই তাঁকে চলতে হচ্ছিল খুঁড়িয়ে। ফলে ভিক্ষুকের পোশাকের সঙ্গে হাঁটাচলার এই ত্রুটি নিখুঁত মানিয়ে গেল। বাড়তি অভিনয় আর তাঁকে করতে হল না।

খোঁড়া ভিক্ষুকের বেশেই একসময় তিনি পৌঁছলেন গ্রীক সেনানায়কদের এক সমাবেশে। সেখানে কিছু বক্তব্য রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি।

কিন্তু একজন ভিক্ষুকের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করলেন না সেনানায়করা। তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করলেন, আঘাতও করলেন তাঁকে। সেই অবস্থাতেও টেলিকাস চিৎকার করে তাঁর কথা শোনাতে চান।

সেই সময় অ্যাগামেমননের স্ত্রী ক্লিওমেনস্ত্রার অনুরোধে গ্রীক সেনানায়করা রাজি হলেন টেলিকাসের বক্তব্য শুনতে। তাঁকে থাকতে দেওয়া হল তাদের সমাবেশে।

সুযোগ পেয়ে আপন বুদ্ধিবলে সেই সুযোগ কাজে লাগালেন টেলিকাস। তিনি এক সুযোগে ক্লিওমেনস্ত্রার শিশুপুত্র ওবেসটেসকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে প্রকাশ করলেন নিজের সত্য পরিচয়।

ঘোষণা করেন, অ্যাকিলিস যদি তার বর্শা দিয়ে তাকে নিরাময় করে দেন তবেই এই শিশুকে মুক্ত করে দেবেন। নচেৎ সকলের চোখের সামনেই শিশুর মাথা গুঁড়িয়ে দেবেন তিনি।

অগত্যা টেলিকাসের হাতে বন্দী শিশুকে মুক্ত করার জন্য অ্যাকিলিস এসে তার বর্শা ছুঁইয়ে ক্ষত নিরাময় করে দেন।

দৈবের অনুগ্রহ প্রার্থনা নেই, নেই কোন অনুনয় বিনয়, আছে বীরের মনোবল, বুদ্ধির নির্ভরতা।

এখানেই এথেন্সের নাটক রচনার চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ইউরিপিডিস। দেবতার মহিমা নয় মানুষের মানবিক গুণকেই বড় করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তিনি। মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে উপস্থাপন করেছেন।

এই বৈপ্লবিক উদ্যোগের ফল হল মিশ্র। নাটকের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব একদিকে যেমন মুগ্ধ করল জনতাকে তেমনি পাশাপাশি দেবতার মহিমা ক্ষুণ্ণ করায় ঐতিহ্য-বিরোধী প্রয়াসের জন্য জনমনে ক্ষোভও দেখা দিল।

টেলিকাস নাটকের ১৭ বছর আগে ইউরিপিডিস প্রথম নাটক ডটারস অব পেলিয়াস জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছিলেন। তখনও ঘটেছিল একই প্রতিক্রিয়া। বিস্ময় ও মুগ্ধতার সঙ্গে ক্ষোভ।

তরুণ নাট্যকার সেই নাটকেই চরম দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন দেবতার বদলে মানুষকে নাটকের চরিত্র হিসাবে বেছে নিয়ে। তবে তার উপস্থাপনা ছিল এমনই সুগঠিত ও বলিষ্ঠ যে তাঁকে জনতা চিহ্নিত করেছিল প্রথা-বিরোধী নাট্যকার রূপে। তাঁরা একরকম মেনেই নিয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু এবারে ঘটল বিস্ফোরণ। তার একমাত্র কারণ হল, নাট্যকার নাট্যমঞ্চে হাজির করেছেন এক ভিক্ষুককে। তাঁরা নাট্যকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল।

কিন্তু নাটকের সমর্থনেও দাঁড়িয়ে গেল একদল মানুষ। তারা এই পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানাল।

তাঁরা সোচ্চারে ঘোষণা করলেন, অপ্রিয় বিষয় ও সমস্যাকে নাট্যমঞ্চে উপস্থিত করে ইউরিপিডিস মানুষকেই সম্মান দিয়েছেন, মানুষকে ভাবতে বাধ্য করেছেন। এর ফলে মানুষ বাস্তবের মুখোমুখি হবার সাহস পাবে।

বিরুদ্ধপক্ষের অপকৌশলের অভাব কোন কালেই হয় না। ইউরিপিডিসের ভাগ্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। তারা রটনা করে দিল, তিনি ধর্মদ্রোহী, তাঁর ভাবনায় রয়েছে নারী বিদ্বেষ।

এখানেই তারা ক্ষান্ত হল না, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কালিমা লেপন করতেও ইতস্তত করল না। একজন মানুষকে যতভাবে সমাজের চোখে হেয় করা অপদস্থ করা সম্ভব তার কোনওটাই তারা বাকি রাখল না।

সমালোচকদের অপপ্রচার ও কুৎসা ক্রমে এমন তীব্র হয়ে উঠল যে নবীন নাট্যকারকে এথেন্স ত্যাগ করে যেতে হল। অন্য ভাবে বলতে হয় স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হলেন তিনি।

অথচ, পরবর্তীকালে এই অভিশপ্ত নাট্যকারকেই গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি রচয়িতার সম্মান জানিয়েছে এই এথেন্স। তাঁর নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছে সবচেয়ে

বেশি। তাঁর সেই খ্যাতি ও সম্মান মহাকাল আজও সমমর্যাদায় বহন করে চলেছে। ইউরিপিডিসের সমাদর ও শ্রেষ্ঠত্ব আজও অম্লান।

ট্রাজেডি রচনার ক্ষেত্রে গ্রীসে যে কজন নাট্যকার শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করেছেন তাঁরা হলেন অ্যাসকেইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস।

এই তিনজনের মধ্যে প্রথাবিরোধী নাট্যকার রূপে স্বীকৃত ইউরিপিডিস। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন আধুনিক চিন্তাধারার মানুষ। তাঁর মনন ও আন্তরসংবেগ হৃদয়কে স্পর্শ না করে পারে না। তাঁর রচনার এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে দিয়েছে কালজয়ী খ্যাতি ও অমরত্ব।

ইউরিপিডিসের ব্যাক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি। তাঁর সময়কালে বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচার ও কুৎসা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তাঁর সম্পর্কে সত্য যেটুকু, তাকে আড়াল করে মিথ্যা হয়েছে প্রকট। এভাবেই বিকৃত হয়ে পড়েছে তাঁর জীবন-কাহিনী। তার মধ্যে থেকেই জ্ঞানান্বেষী পন্ডিতবর্গ কঠোর শ্রম স্বীকার করে যথাসম্ভব সত্যকে উদ্ধার করে এনেছেন।

খ্রিস্টের জন্মের ৪৮০ অব্দ পূর্বে এথেন্সে জন্ম হয়েছে নাট্যকার ইউরিপিডিসের।

সময়টা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে সেই বছরেই স্যালামিসের নৌযুদ্ধে গ্রীকবাহিনী পারস্য সম্রাট জেরাক্সসের নৌবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল।

পুরাকাহিনী থেকে আরও জানা যায়, বিখ্যাত নাট্যকার অ্যাসকেইলাস সেই স্যালামিসের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইউরিপিডিসের বাবার নাম মেনসারডিস। তাঁর পরিবার ছিল সম্ভ্রান্ত এবং সচ্ছল। উত্তরাধিকার সূত্রেই ফ্রায়ার অ্যাপোলো মন্দিরের সম্মানজনক কাজ লাভ করেছিলেন তিনি। ইউরিপিডিসের মা-ও ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

এই সত্য তথ্যকে আড়াল করে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রচারিত কুৎসাই স্থান পেয়েছিল জনমনে।

তারা প্রচার করেছিল, ইউরিপিডিস ছিলেন এক হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাঁর বাবা ছিলেন ভবঘুরে ও দেউলিয়া। তাঁর মা ছিলেন নষ্ট চরিত্রের মহিলা। বাজারে সবজি বিক্রি করতেন তিনি।

এই থেকেই বোঝা যায় প্রথাবিরোধী বাস্তবধর্মী নাটক রচনা করে তৎকালীন সমাজে কতটা বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, স্বচ্ছ চিন্তা ও আধুনিক মননের মানুষ ইউরিপিডিসকে।

যুগে যুগে এভাবেই অন্ধকারভেদী আলোক রশ্মিকে ঘন মেঘের বাধা উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।

প্রথম জীবনে একজন ক্রীড়াবিদ এবং শিল্পী হিসেবেই পরিচিত হয়েছিলেন ইউরিপিডিস। কিন্তু বছর পঁচিশ বয়স হতেই তিনি সবকিছু ছেড়ে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

তাঁর প্রথম নাটক দি ডটারস অব পোলিয়াস মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এথেন্সের বুদ্ধিজীবীমহল অনুধাবন করেন, গ্রীসের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন সম্ভাবনার আবির্ভাব ঘটেছে।

চিরাচরিত নাটকের ধারা বর্জন করে বাস্তবমুখী বৈপ্লবীক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এভাবেই জনমনে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্থান করে নিয়েছিলেন ইউরিপিডিস।

ইউরিপিডিস তাঁর জীবনকালেই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান লাভ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি নাটকের জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন মাত্র পাঁচবার। অথচ ৮০টিরও বেশি নাটক তিনি রচনা করেছেন।

সমকালে তাঁর আধুনিক চিন্তাভাবনা আশানুরূপ মর্যাদা না পেলেও উত্তরকাল তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছে শ্রেষ্ঠ গ্রীক ট্রাজেডি রচয়িতা হিসেবে।

ইউরিপিডিসের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার বাস্তবতার প্রকাশ। তাঁর কাব্যপ্রতিভার মিশ্রণ নাটকগুলিকে করে তুলেছিল উপভোগ্য। নিপুণ শিল্পীর মতো তিনি গ্রথিত করেছিলেন প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্ত। সর্বোপরি প্রতিটি নাটকেই তিনি মানুষকে উপস্থিত করেছেন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে। দেবতার করুণাপ্রার্থী অক্ষম অসহায় জীব রূপে নয়।

এই অভিনব উপস্থাপনায় সাধারণ মানুষ অতিভূত প্রশংসামুখর হলেও সমাজের রক্ষণশীল মানুষ তাঁর প্রয়াসকে ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কেবল প্রথা বিরোধী চিন্তাভাবনার জন্যই নয়, তারা ক্ষুব্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে তুলেছিল আরও একটি অভিযোগ।

ইউরিপিডিস তাঁর নাটকে নারীচরিত্রগুলির মধ্যদিয়ে প্রচার করেছেন নারী বিদ্বেষ। তিনি অঙ্কন করেছেন কুটিল কুশ্রী চরিত্রের নারী। তারা লিপ্ত হয়েছে ষড়যন্ত্রে, হিংস্র জলসায় ঘটিয়েছে রক্তপাত; হৃদয়হীন প্রতিশোধপরায়ণতার মধ্য দিয়ে ঘটিয়েছে নারীত্বের বিকৃতি ও অবমাননা।

কিন্তু ইউরিপিডিসের প্রতি তাদের এই অভিযোগ যে যথাযথ তা কিন্তু নয়। আসলে রক্ষনশীল সমাজ তাঁর নারীচরিত্র অঙ্কনের গূঢ় উদ্দেশ্যই অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গভীর চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ইউরিপিডিস অঙ্কন করেছিলেন তাঁর নাটকের নারীচরিত্রগুলি।

তাঁর নায়িকাদের মধ্যে অ্যালসেসটিস জীবন উৎসর্গ করেছিল তার স্বামীর জন্য। উচ্চ আদর্শের জন্য আপন কৌমার্যকে বলি দিয়েছিল ইফিজেনিয়া।

মিথ্যাভাষিণী ও রক্তলোলুপ নারীচরিত্রও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন বাস্তবতার আলোকেই। ক্লায়েডা এবং মিডিয়ার মতো মহিলার চরিত্র তিনি এমন ভাবে উপস্থাপন করেছেন যে বিদ্বেষ নয় তাদের প্রতি সহানুভূতিতে আমাদের মন হয়ে পড়ে দ্রবিভূত।

যেভাবেই তিনি চিত্রিত করে থাকুন না কেন, ইউরিপিডিসের নারী চরিত্রগুলি কখনওই তাঁর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি।

সমভাবে দেখা যায় তাঁর সহানুভূতি অধিক ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চেয়ে ক্রীতদাস ও কৃষক সাধারণের প্রতিই।

তাদের দুর্দশাক্লিষ্ট, দুঃখময় জীবনকে তুলে ধরে তিনি নাটকগুলিকে প্রতিবাদী ও অর্থবহ করে তুলেছিলেন।

সাধারণ মানুষকে নাটকের চরিত্র হিসেবে তুলে ধরায় ইউরিপিডিসের ট্রাজেডি থেকেই মানুষ নতুন করে ভাবনার প্রেরণা পেল।

ইতিপূর্বে হোমার বা আকিলার্স তাঁদের নাটকে যেসব বীরচরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতারা। ইউরিপিডিসের নাট্যপ্রভাবে এই দেবতা এবং বীরচরিত্রদের সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিল। এতদিন যা তারা করার কথা চিন্তাও করেনি এবারে তারা তাই করতে শিখল। চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ।

দেবতারা তাদের স্বার্থোদ্ধার ও খেয়াল খুশি চরিতার্থ করার জন্য বীরপুরুষদের জীবনকে বিড়ম্বিত করেছে, জনমানসে এই জিজ্ঞাসা গভীর রেখাপাত করল।

ইউরিপিডিস ভালবাসতেন মানুষকে। ন্যায় ও সত্যের প্রতি ছিল তাঁর আনুগত্য। সাধারণের জীবন যারা দুঃখ দুর্দশায় ভারাক্রান্ত করে তোলে সেই হৃদয়হীন, নীতিহীন জননেতাদের তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। তাদের ভ্রান্ত এবং স্বার্থ বুদ্ধির ফলেই মানুষের জীবনে নেমে আসে দুর্বিপাক ও যুদ্ধ। এই বক্তব্য তিনি তুলে ধরেছেন স্পার্টার ভয়াবহ যুদ্ধের কাহিনীর মধ্যে তাঁর ট্রোজান উওমেন এবং সাপলিয়ান্টস নাটকে।

যৌবনে নাটক রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন ইউরিপিডিস। সৃষ্টির তাগিদে তিনি জনজীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। স্যালামিসে নিজস্ব জমিদারির

নির্জন পরিবেশে বসবাস করতেন। অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সঙ্গে মিশতেন না।

তবে এথেন্সের নাগরিক হিসেবে নিজের কর্তব্য তিনি ভুলে যাননি। এক সময় সেনাদলে কাজ করেছেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অকাতরে অর্থ দান করেছেন। একবার ম্যাগনেশিয়ার কন্সালের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

যাই হোক বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারে বিরক্ত বিব্রত ইউরিপিডিসকে একসময় তাঁর স্বভূমি এথেন্স ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ম্যাসিডনের রাজা আরকিলাসের দরবারে। সেই সময় তাঁর বয়স বাহাত্তর। সময়টা ৪৮০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। তাঁর ওরেসটিস নাটক মঞ্চস্থ হবার পরে পরেই চিরতরে এথেন্স ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল তাঁকে।

ম্যাসিডনরাজ পরম সমাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁকে। তাঁর জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাদির কোন ত্রুটি রাখেননি তিনি।

জীবনের শেষ দেড়টা বছর ইউরিপিডিস এখানে কাটিয়েছিলেন পরম শান্তি ও আরামের মধ্যে দিয়ে। এখানে তিনি আন্তরিক সাহচর্য পেয়েছিলেন তাঁর পুরনো দুই বন্ধুর।

একজন নাট্যকার অ্যাগাথন। দ্বিতীয়জন সঙ্গীতকার টিমথিউস। তাঁরা দুজনেই ম্যাসিডনের রাজদরবার অলঙ্কৃত করতেন। নতুন পরিবেশে এসে যেন নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি।

ম্যাসিডনিয়ায় এসে ব্যাকাস ও ইফিজনিয়া ইন অলিস নামে দুটি নাটক লেখায় হাত দিয়েছিলেন ইউরিপিডিস। কিন্তু পরমায়ু কুলিয়ে ওঠেনি। নাটক দুটি অসমাপ্ত রেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে।

তবে এই অসমাপ্ত নাটকের মধ্যেই তিনি রেখে গেছেন শেষ জীবনের শান্তি ও তৃপ্তির ছবি।

মৃত্যুকালে ইউরিপিডিসের দুই ছেলে বর্তমান ছিলেন। তাঁদের একজন গ্রহণ করেছিলেন বাবার পেশা এবং একে একে বাবার নাটকগুলি তিনি মঞ্চস্থ করেন।

সব মিলিয়ে ৮০টিরও বেশি নাটক রচনা করেছিলেন ইউরিপিডিস। তার মধ্যে সন্ধান পাওয়া গেছে মাত্র আঠারোখানি নাটকের। এবং এই নাটকগুলির বিচারেই তিনি লাভ করেছেন চিরকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান।

শ্রীনিবাস রামানুজন

পৃথিবী বিখ্যাত গণিতবিদ ই.টি.বেল তাঁর বিখ্যাত বই Men of Mathematics গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসেবে যাঁকে সম্মান জানিয়েছেন সেই শ্রীনিবাস রামানুজনের জীবনকাহিনী বড় বিচিত্র। অবিশ্বাস্য গল্প-কাহিনীর যেন এক নায়ক তিনি।

দক্ষিণ ভারতের এডোর শহরে মামার বাড়িতে ১৮৮৭ খ্রিঃ রামানুজনের জন্ম। তাঁদের নিজের বাড়ি ছিল কুম্ভকোনমে।

তাঁর বাবা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ছিলেন এক কাপড়ের দোকানের সাধারণ কর্মচারী। অভাব অনটনের সংসার। লোকসংখ্যাও কম নয়। বাবা মা ও তিন ভাইবোনের সঙ্গে ঠাকুর্দা ঠাকুমা মিলিয়ে মোট সাতজন।

বাবার চাকরির সামান্য মাইনেতে এতগুলি মানুষের কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদনটুকু কুলিয়ে উঠত। তাই ছেলের পড়াশুনার বাড়তি খরচ মেটাবার জন্য শ্রীনিবাস চোখে অন্ধকার দেখতেন।

হত দরিদ্র সংসারে নিত্য অনটনই হয়ে উঠেছিল বালক রামানুজনের অনুপ্রেরণা। বাবার খরচের বোঝা লাঘব করবার জন্য প্রাণপণ খেটে পড়াশুনা করে স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষায় বসলেন।

পরিশ্রমের ফলও পেলেন হাতে হাতে। বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ফলে স্কুলের বেতন অর্ধেক হয়ে গেল।

সহজাত প্রতিভার টানে শিশুবয়স থেকেই গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। সংখ্যা নানা ভাবে সাজিয়ে প্রশ্ন তৈরি করাটা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল প্রিয় খেলা। প্রশ্ন তৈরি করতেন আবার নিজেই সেই প্রশ্নের সমাধান বার করতেন। অঙ্ক নিয়ে তাঁর এই খেলা তাঁর সহপাঠীদের কাছে ছিল বিষম বিস্ময়ের ব্যাপার।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অংক বিষয়ে তাঁর নিপুণতা বাড়তে থাকে। সহপাঠীদের মধ্যে তো বটেই গোটা স্কুলেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অঙ্কের সেরা ছাত্র। ওপরের ক্লাশের ছেলেরা প্রায়ই তাঁর কাছে এসে অঙ্ক শিখত। তাঁর এমনই মেধা ছিল যে বইয়ের উদাহরণ একবার দেখেই তিনি সমস্ত অঙ্ক ঠিক ঠিক কষে ফেলতে পারতেন।

স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই একবার রামানুজনের হাতে আসে একটি অংকের বই। A synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics বইটি ছিল কলেজের ছেলেদের পাঠ্য। কজন

কলেজের ছাত্র তাঁদের বাড়িতে ভাড়া থাকত। এক ইংরাজ গণিতবিদের লেখা বইটি তিনি তাদের কাছেই পেয়েছিলেন।

বইটিতে কয়েক হাজার জটিল গণিতের প্রশ্ন দেওয়া ছিল। দুচারটি সমস্যার সাহায্য-সূত্র ছাড়া কোন সমাধান বইটিতে ছিল না।

আগ্রহ নিয়ে বইটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে তিনি দেখলেন, বইয়ের বেশির ভাগ অঙ্কই তাঁর অজানা। নিয়ম পদ্ধতিও কোথাও দেওয়া নেই। স্বভাবতঃই তিনি বইটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং ডুবে গেলেন সমস্যাগুলির মধ্যে।

অচেনা-অজানা অঙ্ক নিয়েই কেটে যেতে লাগল সময়। মাথা খাটিয়ে নিজেই বার করলেন সমাধান-সূত্র এবং প্রতিটি সূত্রই ছিল নির্ভুল। এখানে বলবার বিষয় এই যে, এই সব অঙ্কের সব সমাধান ইতিপূর্বে ইউরোপীয় গণিতজ্ঞেরা উদ্ভাবন করেছিলেন। সামান্য একজন স্কুলপড়ুয়া রামানুজন সেই সব সূত্র উদ্ভাবন করে ফেললেন।

এভাবেই দিনে দিনে গণিতের মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে উঠলেন কিশোর রামানুজন।

পনেরো বছর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্তি হলেন কুম্ভকোনমের কলেজে।

সেই সময়ের ইন্টারমেডিয়েট ক্লাশে তাঁর পাঠ্যবিষয় ছিল অঙ্ক, সাহিত্য, ইতিহাস, শরীরবিদ্যা ও সংস্কৃত ভাষা।

কলেজে ভর্তি হবার পর প্রিয় বিষয় অঙ্ক নিয়েই মেতে রইলেন রামানুজন। অন্য বিষয়গুলোর পাতা উল্টে দেখারও সময় পান না তিনি। ফল হল, প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না।

ম্যাট্রিকে ভাল ফল করার জন্য বৃত্তি পেয়েছিলেন। আর কলেজের প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় পাশ করতে না পারায় সেই বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল।

দরিদ্র ছেলের এই ক্ষতি বড় সামান্য নয়। রামানুজন এতে এতটাই হতাশ হয়ে পড়লেন যে, কয়েক মাস কলেজে যাবার মতো মনোবল রইল না। ক্রমাগত অনুপস্থিতির জন্য বছরের শেষ পরীক্ষাতে বসার অনুমতিও পেলেন না।

তিনি এর পর চলে এলেন মাদ্রাজে। টিউশানি জোগাড় করলেন। এক কলেজে ভর্তি হলেন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। সামান্য টিউশানির টাকা কটিই সম্বল, তা দিয়ে পড়াশুনা ও খাওয়া খরচ চালাতে হত। বেশির ভাগ দিনই কাটত উপবাসে। শরীর ভেঙ্গে পড়ল অল্প দিনেই। ফল হল অসুস্থতার জন্য দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে পারলেন না।

কেবল মাত্র ছেলে পড়ানোর টাকা সম্বল করে মাদ্রাজে পড়াশুনা চালানো

যাবে না বুঝতে পেরে এরপরে তিনি আবার বাড়িতে ফিরে এলেন। আগের কলেজ থেকেই প্রাইভেটে পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পরীক্ষায় পাস করতে পারলেন না।

কলেজের পরীক্ষায় পাস করতে পারলেন না বটে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। রামানুজনের ধ্যানজ্ঞান ছিল অঙ্ক নিয়ে। দিনরাত সারাক্ষণই অঙ্ক কষছেন।

এদিকে সংসারের অবস্থা টলমল। ছেলে পাস করতে পারলে আয়-রোজগারের পথ হত। তা না হওয়ায় বাবা-মাও হতাশ হয়ে পড়লেন। ছেলের দিনরাত অঙ্ক নিয়ে পড়ে থাকা তাঁদের কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল।

এই সময় সংসারের চাপে রামানুজন আবার ছাত্র পড়ানো শুরু করলেন। কিন্তু তাতেও মন বসাতে পারলেন না। সারাক্ষণ অঙ্কের সব জটিল সমস্যা মাথায় ঘোরে আর তাই নিয়েই অন্যমনা হয়ে থাকেন।

এর মধ্যেই সেই কালের সামাজিক রীতি মেনে বাবা-মা ও পরিজনদের চাপে পড়ে তাঁকে বিয়ে করতে হল। তখন সবে তিনি ২২ বছরে পা দিয়েছেন। স্ত্রীর বয়স মাত্র নয়। তাঁর নাম জানকী।

অভাবের সংসারে এবারে আরও একজন সদস্য বাড়ল। স্বভাবতঃই সাংসারিক খরচ-খরচার ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন রামানুজন। চাকরির সন্ধানে চলে গেলেন মাদ্রাজে। পরিচিত একজনের আশ্রয়ে থেকে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই সময়ে একদিন দেখা হয়ে গেল স্কুলের বন্ধু রাজা গোপালাচারীর সঙ্গে। তিনিই বন্ধুকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন গণিত সোসাইটির সম্পাদক রামচন্দ্র রাও-এর কাছে।

প্রথম সাক্ষাতেই বিচক্ষণ রামচন্দ্র রাও রামানুজনের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে গেলেন। তিনি নানা ভাবে তাঁকে সাহায্যের চেষ্টা করতে লাগলেন। মাসিক পাঁচশ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থাও করলেন তাঁর জন্য।

অকূলে কূল পেলেন রামানুজন। রামচন্দ্র রাওকে তিনি আঁকড়ে রইলেন এবং তাঁরই উৎসাহে অঙ্ক বিষয়ে লেখালিখিও শুরু করলেন।

১৯১১ খ্রিঃ গোড়ার দিকেই ইন্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রথমে তাঁর কয়েকটি ছোট্ট লেখা প্রকাশিত হল। কয়েক মাস পরেই প্রকাশিত হল প্রথম প্রবন্ধ Some Properties of Bernoulli's numbers'।

এর কিছু দিন পরেই রামচন্দ্র রাওয়ের যোগাযোগে পোর্টট্রাস্টের অফিসে একটি কেরানীর চাকরি জুটে গেল তাঁর। ২৫ টাকা মাইনের প্রথম চাকরিটি রামানুজন পেলেন তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে।

এবারে আর অন্যের অনুগ্রহ নয়, পরিশ্রমের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হল। অনেকটাই দুর্ভাবনা মুক্ত হলেন তিনি।

কিছুদিনের মধ্যেই একটা বাড়ি ভাড়া করে বাড়ি থেকে মা ঠাকুমা আর স্ত্রী জানকীকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। মাইনের সামান্য টাকা দিয়েই সকলের ভরণপোষণ চলতে লাগল।

এদিকে রামানুজনের নিজের খরচও কিছু কম নয়। অঙ্ক কষার জন্য প্রতি মাসে কিনতে হয় প্রায় চার রিম করে কাগজ। সেই খরচ কমাবার জন্য কিনলেন শ্লেট। তাতেই অঙ্ক কষেন আবার মুছে ফেলেন। শুধু ফলটা টুকে রাখেন কাগজে।

অনবরত শ্লেটে হাত ঘষে ঘষে হাতের চামড়া ক্ষয়ে যেতে লাগল। তখন অফিস থেকে ফেলে দেওয়া বাতিল কাগজ কুড়িয়ে এনে তাতেই অঙ্ক করতে লাগলেন।

সেই সময় তিনি এমন কঠিন কঠিন অঙ্ক কষতেন যে তা বোঝার মতো মানুষ এদেশে কেউ ছিল না। তিনি নিজেই ছিলেন নিজের শিক্ষক নির্দেশক।

এই সময় থেকেই মাঝে মাঝে তাঁর লেখা ইন্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হতে থাকে। এর বেশি স্বীকৃতি তিনি দেশের মানুষের কাছে থেকে সেই সময় পাননি।

নতুন নতুন ফর্মূলা উদ্ভাবন করেছিলেন রামানুজন। দেশবিদেশের গুণী মানুষদের নজরে আনার জন্য তিনি এবারে বিদেশের গণিতজ্ঞদের কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর উদ্ভাবিত ফর্মূলার বিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে চাইতেন।

কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিবিহীন, পরিচয়হীন মানুষের গুণের মূল্য দেবার লোক চিরকালই পৃথিবীতে নগণ্য। কাজেই তাঁর কোন চিঠিরই উত্তর কারো কাছ থেকে আসত না। হতাশ হলেও ভেঙ্গে পড়েননি রামানুজন। তাঁর চিঠিচাপাটি চলতেই লাগল।

কথায় আছে যে সয় সে রয়। ধৈর্যই উন্নতির সোপান। ধৈর্যের ফল পেতেও বিলম্ব হল না।

কয়েক পাতা ফর্মূলা সহ একটি চিঠি রামানুজন পাঠিয়েছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক মিঃ জি এইচ হার্ডির কাছে। হার্ডি নিজেও ছিলেন দেশ-বিদেশ খ্যাত বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ। বয়সে নিতান্তই তরুণ।

প্রমাণ ছাড়া ফর্মূলাগুলো পেয়ে প্রথমে তিনি অবজ্ঞা ভরেই সেগুলো সরিয়ে রেখেছিলেন। পরে কৌতূহলবশতঃ নিজের সহকারী মিঃ লিটলউডকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন ফর্মূলা প্রমাণ করতে।

অবিলম্বেই চমৎকৃত হলেন দুই গণিতবিশেষজ্ঞ। অজ্ঞাত পরিচয় এক কালো মানুষের পাঠানো প্রতিটি ফর্মূলাই নির্ভুল প্রমাণিত হল। কেবল তাই নয়, তাঁরা লক্ষ্য করলেন অঙ্ক নিয়ে ইতিপূর্বে ইউরোপের গণিতজ্ঞরাও এমন সঠিক ও উন্নত পর্যায়ের কাজ করতে পারেননি।

গুণগ্রাহী হার্ডি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি জানালেন তরুণ গণিতবিশেষজ্ঞ রামানুজনকে। একজন সাধারণ পরিবারের ডিগ্রিহীন হিন্দু তরুণের অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হার্ডি তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হিসেবে ঘোষণা করতে দ্বিধা করলেন না।

এই সূত্রে দেশ-বিদেশে ভারতীয় গণিতজ্ঞ রামানুজনের নাম ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হল না।

পৃথিবীর মানুষের সামনে অধ্যাপক হার্ডিই উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে রামানুজনকে স্বীকৃতিসহ উপস্থিত করেছিলেন। এ কাজ যদি সেদিন তিনি না করতেন তাহলে হয়তো চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যেত গণিত-ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। নীরব এই জ্ঞানতাপসকে কেউই জানতে চিনতে পারত না।

রামানুজন সম্পর্কে অধ্যাপক হার্ডি বলেছিলেন, দরিদ্র এক হিন্দু তরুণ তাঁর অসাধারণ মেধা নিয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পন্ডিতদের সম্মুখীন হয়েছেন।

এর পর থেকে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ চলল রামানুজনের। রামানুজন তাঁকে লিখে পাঠান নতুন নতুন ফর্মূলা।

আর হার্ডি করেন সেগুলোর মূল্যায়ন এবং তাঁরই যোগাযোগে সেসব প্রকাশিত হয় ইংলন্ডের বিখ্যাত পত্রপত্রিকায়।

নিদারুণ আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে থেকেও রামানুজন নিয়মিত তাঁর গবেষণার কাজ করে চলেছিলেন।

তাঁর অসুবিধার কথা উপলব্ধি করে কিছুদিনের মধ্যেই হার্ডি তাঁর কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন ভারতের শিক্ষা বিভাগে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও এই বিষয়ে যোগাযোগ করলেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বতঃপ্রবৃত্ত ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার জন্য রামানুজনকে দুবছরের জন্য মাসিক পঁচাত্তর টাকার বৃত্তি মঞ্জুর করলেন।

সহায় সম্বলহীন তরুণ গবেষকের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ছিল অপরিহার্য। তাই এই অভাবিত সহযোগিতা রামানুজনের কাছে হল ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি যথাসময়েই হার্ডিকে জানিয়ে দিলেন, এতদিনে তিনি আর্থিক দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হয়েছেন। এবারে ভারমুক্ত মনে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

রামানুজনের ব্যাপারে আরো একটি গুরুতর বিষয়েরও দায়িত্ব অবিলম্বে নিজের হাতে তুলে নিলেন অধ্যাপক হার্ডি।

তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আধুনিক গণিতের প্রথাগত নিয়ম-পদ্ধতি বিষয়ে রামানুজন সম্পূর্ণই অজ্ঞ। প্রথাগত শিক্ষা না পাওয়ার জন্য তাঁর নিজস্ব তথ্য প্রমাণ সঠিক পদ্ধতিতে বিদগ্ধ মহলে উপস্থাপন করতে পারবেন না।

আধুনিক গণিতের রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তাঁর উপযুক্ত শিক্ষণ প্রয়োজন।

অধ্যাপক হার্ডি তাঁর সমকক্ষ কয়েকজন পন্ডিতের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে রামানুজনকে চিঠি লিখে জানালেন ইংলন্ডে আসার জন্য। তাহলে নিজেই তাঁর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন।

চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলেও তাঁদের সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে রামানুজন দুর্ভাবনাগ্রস্ত হলেন।

সেই কালে দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজ ছিল নানা কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামিতে বিশ্বাসী। জাতপাতের নানা বিধি-নিষেধের গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল সামাজিক ব্যবস্থা। সাগর পার হয়ে বিদেশ যাওয়ার অর্থই ছিল চিরদিনের মতো জাত খোয়ানো।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান রামানুজন। তাঁর পক্ষে সামাজিক এই বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করা ছিল অসম্ভব। তাঁর বিদেশ যাত্রার বিষয়ে পরিবারের কারোরই সম্মতি পেলেন না তিনি।

কোন কিছু গোপন না করে অধ্যাপক হার্ডিকে চিঠি লিখে তিনি সব কথা জানালেন।

কয়েক মাস পরেই অধ্যাপক হার্ডির বন্ধু এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক মিঃ নেভিল এলেন ভারতবর্ষে। মাদ্রাজে পৌঁছে তিনি দেখা করলেন রামানুজনের সঙ্গে এবং বোঝালেন প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্যই তাঁর ইংলন্ডে যাওয়া প্রয়োজন।

গণিতশাস্ত্রে উৎসর্গীকৃত প্রাণ রামানুজনের পক্ষে এবারে আর পারিবারিক ও সামাজিক বাধার কথা চিন্তা করে নতুন জগতের আহ্বানকে অস্বীকার করা সম্ভব হল না। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও তাঁকে ইংলন্ড যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সরিয়ে রেখে তিনি মাকে তাঁর দুঃখের কথা জানালেন। এত বড় সুযোগ হেলায় হারালে তাঁর এতদিনের সাধনা সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রামানুজনের মা ছিলেন অতি সাধারণ এক মহিলা। আজন্ম তিনি মানুষ হয়েছেন পারিবারিক ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের মধ্যে। লেখাপড়াও জানতেন না। প্রতিভাধর সন্তানের জটিল গণিতের তত্ত্ব, তার গুরুত্ব বিষয়ে অনুধাবন করাও ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন মা। তাই সন্তানের বুকের ব্যথা উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হল না।

সামাজিক সমস্ত বাধানিষেধকে উপেক্ষা করে তিনি রামানুজনকে বিদেশযাত্রার অনুমতি দিলেন। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি পরিবারের লোকজনদের জানিয়ে দিলেন, স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়েছেন, রামানুজন বিদেশ গেলে সকলের কল্যাণ হবে।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক নেভিলের ব্যবস্থাপনায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় রামানুজনের বিদেশ যাত্রার প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করল। কেবল তাই নয় তাঁর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার্ষিক ২৫০ পাউন্ড বৃত্তিরও ব্যবস্থা হল।

তরুণ রামানুজন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৯১৪ খ্রিঃ ১৭ মার্চ ইংলন্ড রওনা হলেন।

ইউরোপের মাটিতে যখন বেজে উঠেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা, রামানুজন সেই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে উপস্থিত হলেন ইংলন্ডে। বহু বিজ্ঞানীই এই সময় প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের কাজে জড়িয়ে পড়েছেন।

অধ্যাপক রাসেল ও অধ্যাপক হার্ডিসহ আরও মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন বিধ্বংসী যুদ্ধের বিপক্ষে। রামানুজন নিজেও ঘৃণা করতেন যুদ্ধকে। তাঁরা নিয়োজিত রইলেন নিজের কাজ নিয়েই।

অধ্যাপক হার্ডি নিজেই রামানুজনের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বাইরের জগতের কোন বিশৃঙ্খলাই যাতে তাঁর মনকে স্পর্শ করতে না পারে সেভাবেই তিনি দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো আগলে রাখতেন ভিন দেশী প্রতিভাধর তরুণটিকে।

গণিতের তত্ত্বের সমস্যা নিয়েই ডুবে রইলেন রামানুজন। এই সময়ে এমনও দিন গেছে, যখন তিনি আট থেকে দশটি দুরূহ ফর্মূলা উদ্ভাবন করতেন। তাঁর পারদর্শিতা দেখে বিস্মিত হতেন অধ্যাপক হার্ডি।

১৯১৪ খ্রিঃ থেকে ১৯১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত রামানুজন কেমব্রিজে ছিলেন। সামান্য এই কয়েক বছরের মধ্যে তিনি যে কাজ করেছিলেন, সারাজীবনে একজন গণিতজ্ঞ তার অর্ধেকও করতে পারে না।

দেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে এসে পড়েছিলেন রামানুজন। সাগর

পার হয়ে এলেও আজন্ম পালিত প্রাত্যহিক জীবনের অভ্যাস ও আচার-ব্যবহার ত্যাগ করতে পারেননি।

ইংলন্ডের কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও তিনি নিয়মিত পূজাপাঠ করতেন, উপবাস করতেন। খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচারও মেনে চলতেন। অনেক কিছুই তিনি খেতেন না। ফলে ক্রমেই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদের জীবন আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন হার্ডি। তিনি বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি লিখলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ইতিমধ্যে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন রামানুজন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে। মাদ্রাজের পণ্ডিতমহলও উচ্ছ্বসিত স্বদেশের বিজ্ঞানীর গৌরবে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে রামানুজনের জন্য বাৎসরিক ২৫০ পাউন্ডের বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিল।

দুঃখের মধ্যে মানুষ হয়েছেন রামানুজন। তাই দুঃখীর দুঃখ তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন। সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করেও তাঁর জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার তাঁর সরল সৎজীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বদান্যতার কথা জানতে পেরে তিনি কর্তৃপক্ষকে লিখলেন, ‘‘আমার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ আপনারা মঞ্জুর করেছেন। উদ্বৃত্ত অর্থ গরীব-দুঃখী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যয়িত হতে পারে।’’

বিদেশের মাটিতে আরো সম্মান অবশিষ্ট ছিল। দেশে ফেরার কয়েকমাস আগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজ তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করল। রামানুজনের আগে অপর কোনও ভারতীয় এই দুর্লভ সম্মান পাননি।

যথাসময়ে জাহাজে চেপে স্বদেশের পথে রওনা হলেন রামানুজন। ১৯১৯ খ্রিঃ মার্চের শেষদিকে বোম্বাই এসে পৌঁছলেন।

দেশের বড় বড় ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই দিনে কঠিন যক্ষ্মা রোগ ছিল দুরারোগ্য ব্যাধি। তাই চিকিৎসায় কোন ফল দেখা গেল না।

দিনে দিনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললেন দেশের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই অবস্থাতেও রামানুজন গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু কাজ সম্পূর্ণ করেছেন, যা মানুষ সারাজীবনের চেষ্টাতেও করে উঠতে পারে না।

একদিন যে মানুষটি দেশে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি, তাঁর জন্য এবারে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই পদে যোগ দেবার অবস্থায় তিনি আর তখন ছিলেন না।

শোনা যায় আজন্ম ঈশ্বরবিশ্বাসী রামানুজন জীবনের অন্তিম লগ্নে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। এর পেছনে তাঁর ইউরোপের শিক্ষার প্রভাব কতকটা দায়ী বলে মনে করেন অনেকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলাও তাঁর মনে ঈশ্বর সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকতে পারে।

অবশেষে এগিয়ে এল ১৯২০ খ্রিঃ ২৬ এপ্রিল। এই দিনে জীবনের সমস্ত হিসাব নিকাশ চুকিয়ে অমরলোকে যাত্রা করলেন মহান গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজন।

মাত্র ৩২ বছরের স্বল্প পরিসর জীবনে প্রথাগত শিক্ষা না পেয়েও ভারতের এই গণিতবিদ যে অত্যাশ্চর্য অবদান রেখে গেছেন, তা তাঁকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে।

সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হওয়ার উপযুক্ত প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন রামানুজন। কিন্তু পরিবার ও দেশের দুঃখজনক পরিবেশ ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এই হতভাগ্য দেশে এমনি কত প্রতিভা যে অকালে অজ্ঞাতে ঝরে যায়, কে তার হিসাব রাখে।

রামানুজন যে সব ফর্মূলা উদ্ভাবন করেছিলেন, তার অধিকাংশেরই কোনও প্রমাণ তিনি রেখে যাননি। তবুও তাঁর সমস্ত ফর্মূলা সংগ্রহ করে দুইখণ্ডে প্রকাশ করা হয় তাঁর মৃত্যুর ৩৭ বছর পরে।

আধুনিক গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের বিস্ময় জাগছে, যখন তাঁরা দেখেন তাঁদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বহু আগেই রামানুজনের গোচরে এসেছে।

পাই-এর মান 1.75 কোটি ঘর দশমিক পর্যন্ত নির্ণয় করার জন্য একটি কম্পিউটার আলাগোরিজম লেখেন বিখ্যাত গণিতবিদ উইলিয়ম গোসপার ১৯৪৫ খ্রিঃ। পরে যখন তিনি দেখলেন এই কাজটি অনেকদিন আগেই রামানুজন করে রেখেছেন, তখন অপরিসীম শ্রদ্ধায় বলে ওঠেন, 'যিনি আমাদের সাধনার সুফল কবরের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে কেড়ে নেন, তাঁকে ভালবাসা বড় কঠিন।'

বস্তুতঃ শ্রীনিবাস রামানুজন বিশ্বের এক বিস্ময়কর গণিত প্রতিভা।

ইবনসিনা

আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ইবনসিনার সম্পূর্ণ নাম আবু আলী আল হুসেন আবদুল্লা ইবনসিনা। তিনি জন্মেছিলেন পারস্যের বিখ্যাত বুখারা শহরের অনতিদূরে আফশানা নামক স্থানে। সময়টা ৯৮০ খ্রিঃ।

বহুমুখী অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন ইবনসিনা। মাত্র দশ বছর বয়সেই আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সমগ্র কোরান তিনি অধিগত করেছিলেন।

তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন।

সেই সময়ে আরব ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। বিশেষ করে আলেকজেন্দ্রিয়া নগর প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান চর্চার জন্য। গ্রীক ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মনীষীদের সমাবেশ হয়েছিল সেখানে।

দিগ্বিজয়ের কালে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের উপস্থিতির ফলে গ্রীক সভ্যতার আলোক লাভ করেছিল আরব। তার ফল স্বরূপ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এথেন্সের পরেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল আলেকজান্দ্রিয়া।

গ্রিসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস, সক্লেপিয়াস, টলেমি প্রমুখ আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁদের প্রথম জীবনের গবেষণাও শুরু হয়েছিল সেখানে।

জোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টলেমির মতামত অনুসরণ করেই আরবের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেই সময় প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন।

ইবনসিনাও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই টলেমির তথ্যাদির সঙ্গে পরিচিত হলেন।

জ্ঞানসন্ধানী ইবনসিনা কেবল গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন না। এর পাশাপাশি গণিত, ইসলামী দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ব্যবহার তত্ত্ব ও গ্রীক চিকিৎসা-বিদ্যারও চর্চা করলেন।

গ্রীক সভ্যতার উৎকৃষ্ট সব বিষয়ই আরবী ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। সেই অনুবাদের মাধ্যমেই বিশাল পশ্চিমী জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

আরবী ভাষায় গ্রীকচিকিৎসা শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি চর্চার সময়েই ইবনসিনা এক নতুন অনুভূতির প্রেরণা লাভ করলেন। মানব সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেন তিনি। স্থির করলেন জীবনে এমন পথই বেছে নেবেন যাতে বিজ্ঞান সাধনা এবং মানব সেবা দুটি কাজই সমান ভাবে করা হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানকেই বেছে নিলেন তিনি।

সন্ধানী পথিকের পথের সন্ধান পেতেও বিলম্ব হয় না। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি অধিগত করেছিলেন ইবনসিনা। তারপর তিনি শুরু করলেন চিকিৎসক জীবন।

সেই সময়ে সামানিদ শহরের শাসনকর্তা ছিলেন নও-বিন-মনসুর। তাঁর অধীনেই চিকিৎসকের চাকরি নিলেন ইবনসিনা। অল্পদিনের মধ্যেই দক্ষ চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। রোগীর ভিড়ও বাড়তে লাগল। ক্রমে দেশের বাইরেও পরিব্যাপ্ত হল তাঁর সুখ্যাতি।

যশ খ্যাতির সমান্তরালে মর্যাদাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। এই সময়ে জনসেবার বৃহত্তর ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে একটার পর একটা চাকরি তাঁকে ছাড়তে হয়েছে।

একসময়ে আহ্বান এলো হামাদানের আমীরের প্রাসাদ থেকে। আমীর সামসুদ জাওলা অসুস্থ। তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব পেলেন তিনি।

ইবনসিনার সুচিকিৎসায় দুরারোগ্য অম্লশূলের যন্ত্রণা থেকে চিরতরে নিরাময় লাভ করলেন আমীর।

দরবারে চিকিৎসা করতে করতেই তিনি হয়ে উঠলেন আমীরের বিশ্বাসভাজন বন্ধু। এই সূত্র ধরেই গুরুতর এক দায়িত্বও চাপল তাঁর কাঁধে। কৃতজ্ঞতার পুরস্কার হিসাবে আমীর তাঁকে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন।

প্রধান মন্ত্রীর কাজ রাজনীতি ও রাজ্যের প্রজার মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে। এ এমনই এক দায়িত্ব যে সময় মতো নাওয়া খাওয়ার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে মানব সেবার দায়িত্বের সঙ্গে এভাবে ইবনসিনাকে দেশ সেবার কর্তব্যও সম্পাদন করে চলতে হচ্ছিল।

সহজাত বিচক্ষণতার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসামান্য। ফলে সাফল্যের সঙ্গেই উভয় দায়িত্ব পালন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাঁকে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, এই দুই কাজের পাশাপাশি তিনি নিজের গবেষণার কাজও সমানভাবে চালিয়ে গেছেন।

দিনভর কাজকর্ম ও চিকিৎসার কাজের পরে রাতে যেটুকু অবসর মিলত, সেই সময়টা তিনি ব্যয় করতেন নিজের পড়াশুনা ও গবেষণার কাজে। ফলে প্রতিদিন রাতে ঠিকভাবে বিশ্রাম নেওয়াও তাঁর হয়ে উঠত না।

তিনি সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নানা রোগের নিদান আবিষ্কার করে ভবিষ্যৎকালের মানব সেবার কাজটিও সম্পূর্ণ করে যাবেন।

এই সঙ্কল্প সিদ্ধির অভিপ্রায়ে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিশ্রাম বিসর্জন দিয়েছিলেন মানবসেবাব্রতী ইবনসিনা।

মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অতি অল্প বয়সেই শরীর ভেঙ্গে পড়ল তাঁর। মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে ১০৩৭ খ্রিঃ অকালে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ইবনসিনা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বলা চলে তিনি ছিলেন দুর্লভ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

সমকালীন আরব বিজ্ঞানীরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন আশ-শেখুর-রাইস। যার অর্থ, পরম পন্ডিত। বস্তুতঃ; এই অভিধা ছিল তাঁর বহুমুখী প্রতিভারই স্বীকৃতি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হবার পর মাত্র একুশ বছর বয়স থেকেই তিনি এ বিষয়ে বই লেখা শুরু করেন।

কর্মময় সংক্ষিপ্ত জীবনের অবশিষ্টকালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র বিষয় নিয়েই তিনি বই লিখে গেছেন।

বিভিন্ন বিষয়েই পান্ডিত্য অর্জন করার ফলে ইবনসিনা লাভ করেছিলেন সংস্কারমুক্ত সাংস্কৃতিক চেতনা।

বৈজ্ঞানিক মনের যুক্তিসচেতন এই পন্ডিত লোকশিক্ষার প্রয়োজনে ধর্ম সম্পর্কে নিজস্ব মতামত লিখে রেখে গেছেন। ধর্ম সম্পর্কে মনীষী অ্যারিস্টটলের তত্ত্বকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি।

কেবল তাই নয় যুক্তি বিচারের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মেরও আধুনিক ব্যাখ্যা করেছেন ইবনসিনা। বিজ্ঞানের ভাষাতেই তিনি মানব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ, বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন।

যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তি-বিচারের জন্য ইবনসিনাকে অ্যারিস্টটলের সঙ্গে তুলনা করেছেন সমকালীন পন্ডিতবর্গ।

তাঁকে বলা হত অল-মুআল্লিমুথ-থানি। অর্থাৎ দ্বিতীয় অ্যারিস্টটল বা অ্যারিস্টটলের পরের শিক্ষক।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি ও তথ্যাদির অবদানের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় গৌরবের অধিকারী হয়েছেন গ্যালেন, হিপোক্রেটিস ও সুশ্রুত।

চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনসিনার অবদান ছিল তাঁদেরই সমতুল্য। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর সাধনা। এবং সেই সাধনার ফসল তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষকের মতোই বিতরণ করে গেছেন।

তিনি ছিলেন প্রতিভাবান শিক্ষকও। তৎকালীন বিজ্ঞানী ও ছাত্রমহল তাঁর বিষয় উপস্থাপনের সুনিপুণ ভঙ্গীটি অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।

জ্ঞানতাপস ইবনসিনার অন্যতম স্মরণীয় অবদান হল বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। তিনি গ্রীক চিকিৎসা, হিন্দু

চিকিৎসা ও মুসলমান চিকিৎসা অধিগত করেছিলেন এবং এই সবের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

এই ত্রিমুখীন স্রোতের সমন্বয়েই সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞান। তাঁর রচিত চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ এই কারণেই ইউরোপে সমাদৃত হয়েছে এবং নতুন দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে।

তাঁর কোয়ানাম ফিল-তিব নামের গ্রন্থটি ইউরোপের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ইবনসিনার মৃত্যুর পরে দ্বাদশ শতকে এই বইটি প্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন বিজ্ঞানী গেরার্ড। তিনি এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম দেন Canon Avicennae Libri Quincue। পরে গ্রন্থটি হিব্রু ভাষাতেও অনূদিত হয়।

ইবনসিনার কোয়ানাম-ফিল-তিব গ্রন্থটি গেরার্ডকৃত ল্যাটিন অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪৭৩ খ্রিঃ ইতালির মিলান শহর থেকে। এই ভাবে গ্রন্থটি ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কোয়ানাম-ফিল-তিব তথা ক্যানোন অভিসিন্নাই লিব্রি কুইনকু চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষপ্রতিম গ্রন্থ। চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে বহু বিচিত্র বিষয়ের তিনি এই গ্রন্থে অবতারণা করেছেন। এতে তিনি বিভিন্ন রোগের নানা ওষুধ ও ওষুধের উপাদান সম্পর্কেও বিস্তৃত ভাবে লিখেছেন। লিখেছেন স্নায়ুবৈকল্য রোগ ও তার চিকিৎসার কথা।

ইবনসিনা তাঁর গ্রন্থে বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন চোখের বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে। সম্ভবতঃ প্রাচ্যে চক্ষুরোগের প্রকোপ প্রতীচ্যের তুলনায় অধিক বলেই তিনি শরীরের বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের মধ্যে চোখের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

চক্ষুরোগ ও তার চিকিৎসা অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম Ophthalmology বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করেছেন ইবনসিনা। চোখের নানা সূক্ষ্ম অংশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজের সম্পর্কেই বিস্তৃত ভাবে গবেষণা করেছিলেন তিনি।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জ্ঞানতাপস ইবনসিনা নানা বিষয় নিয়ে বই লিখে গেছেন একশোরও বেশি। কেবল কোরানের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই তিনি লিখেছেন ছটি বই।

এই বইগুলির নাম হিকমৎ-আল-আলাই, কিতাব-আল-নজত, কিতাব-আল-শিফা, ফি-আ-লাক-রসাদিয়াত, উ-আল-তৌবিহাত এবং কিতাব-আল-ইসতারাৎ।

ভূতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। পর্বতের জন্ম রহস্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা তাঁর কাছ থেকেই বিশ্বের বিজ্ঞানীরা প্রথম লাভ করেন। বিশ্বমানব-ইতিহাসের জ্ঞানসাধকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে ইবনসিনা এক উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক।

খনা

খনার বচনের সঙ্গে বঙ্গবাসী মাত্রেরই কম বেশি পরিচয় বর্তমান। বিশেষতঃ জ্যোতিষ ও কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে এই বচনগুলি আজও বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

খনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর সম্পর্কে কিংবন্তি মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এই কিংবদন্তি অনুসরণ করে আমাদের ফিরে যেতে হয় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্তযুগে।

সংস্কৃত গ্রন্থ বৃহজ্জাতক থেকে জানা যায় অবন্তী রাজ্যে (উজ্জয়িনী) এক বিরল প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন বরাহাচার্য। জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য দেশে বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছিল।

কিংবদন্তি বলে, বরাহাচার্য তাঁর সদ্যোজাত পুত্রসন্তানের পরমায়ু গণনা করে হতাশ হন। তিনি জানতে পারেন পুত্রের আয়ু মাত্র এক বৎসর।

বরাহাচার্য একটি তাম্রপাত্রে শুইয়ে শিশুপুত্র মিহিরকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন।

ভাগ্যক্রমে বরাহাচার্যের গণনা ভুল ছিল। সন্তানটি ছিল শতায়ু। সে সিংহলদ্বীপে যন্ত্রীদেবী নামে এক জ্যোতিষী রমনীর কাছে আশ্রয় পায়। তার নাম হয় মিহির।

সিংহলে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করে দেশে ফেরার পথে অটনাচার্যের কন্যা খনা দেবীর সঙ্গে মিহিরের বিবাহ হয়।

খনাও ছিলেন জ্যোতিষী ও কৃষিপন্ডিত। আবহাওয়া বিদ্যাও তাঁর অধিগত ছিল।

এরপর মিহির উজ্জয়িনীর রাজসভায় স্থান পান। কিন্তু খনার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরের জ্যোতিষের এক বিতর্কের মাধ্যমে সম্পর্ক ক্রমশই বিষিয়ে উঠতে থাকে। খনা বারবার শ্বশুরকে গণনায় পরাস্ত করেন।

খনার অসাধারণ জ্যোতিষগণনা সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, আকাশের নক্ষত্র গুণবার বিষয়ে খনা শ্বশুরকে পরাস্ত করেন। বরাহাচার্য ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন।

প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে তিনি ক্রোধে ও ঈর্ষায় কৌশলে বাজি ধরিয়ে ছলনা দ্বারা খনাকে পরাস্ত করেন। ফলে তাঁর জিভ কাটা যায়।

এরপর মিহির খনাকে নিয়ে উজ্জয়িনী থেকে বঙ্গদেশে চলে আসেন। এখানে তাঁরা আশ্রয় পান বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত বেড়াচাঁপার রাজা চন্দ্রকেতুর কাছে। এর পর থেকে মিহির বা বরাহ মিহির ও খনা এখানেই বাস করতে থাকেন।

বেড়াচাঁপায় খনা-মিহিরের স্মৃতি বিজড়িত ঢিবি রয়েছে। পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই ঢিবির অভ্যন্তরে ও আশপাশে খুঁজে পাওয়া গেছে জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রাশিচক্র সহ নানা পুরা-সম্পদ।

উল্লেখ্য যে খনা-মিহিরের নামাঙ্কিত স্মৃতিস্থান বেড়াচাঁপা ব্যতীত উভয় বাংলার অন্য কোথাও দেখা যায় না।

খনা সম্পর্কে কিংবদন্তি যাই থাক না কেন, তাঁর নামাঙ্কিত বচনগুলি যুগ যুগ ধরে কৃষিপ্রধান বাংলার মানুষ অভ্রান্ত বলে মেনে আসছেন এবং আজও অনেকে মেনে চলেন।

তবে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, গৃহীদের নানাবিধ সমস্যা বিশেষতঃ কৃষিকাজ বিষয়ে উপদেশমূলক প্রবচন বঙ্গদেশে খনার বচন নামে প্রচলিত থাকলেও কিংবদন্তি খ্যাত খনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। খনার বচনগুলির ভাষা থেকে জানা যায় এগুলির বয়স মাত্র চারশ বছর।

আবার অনেকের অনুমান খনা কোন মহিলা নন। একজন বাঙালী পুরুষ এবং পেশায় ছিলেন কৃষিবিজ্ঞানী। খ্রিস্টীয় ছয় শতকে তিনি জীবিত ছিলেন। তবে বরাহমিহির বা বরাহাচার্য নামের কারো সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

কৃষিপ্রসার নামে একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে খনার বচনগুলি বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যায়।

সেসকল বচন থেকে জানা যায় কৃষিবিজ্ঞান তথা সমকালীন কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে খনার গভীর জ্ঞান ছিল।

খনার বচনগুলিতে চারটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন—

(১) আবহাওয়া

(২) শস্যাদির যত্ন ও কৃষিপণ্য

(৩) কৃষিতত্ত্ব ও কৃষিবিষয়ক সংস্কার।

(৪) ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি।

প্রচলিত কিছু খনার বচন হল—

মাঘ মাসে বর্ষে দেবা।
রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা।।

—মাঘ মাসে বৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত ফসল ফলে। তাই দেশের রাজাকে আর প্রজাদের জন্য চিন্তা করতে হয় না।

যদি বরে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।।

—মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হলে রাজা ধন্য হন এবং তাঁর দেশ পুণ্যভূমি বলে গণ্য হয় অর্থাৎ দেশের কৃষিসম্পদ বাড়ে। মাঘ শেষের বৃষ্টি রবি শস্যের পক্ষে উপকারী।

যদি বরে ফাগুনে।
চিনা কাওন দ্বিগুণে।।

—ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হলে চিনা ধান ও কাঙনি ধান দ্বিগুণ ফলে।

চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি।
চাষার ক্ষেত্রে শুভ দৃষ্টি।।

—চৈত্র মাসে বৃষ্টি হলে চাষের সুবিধা হয়, কৃষকের ওপর ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি পড়ে অর্থাৎ কৃষক ক্ষেতের কাজ ভাল ভাবে করতে পারে। এই সময় গ্রীষ্মকালের ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করতে হয়।

মাঘের আধা ফাগুনের বাদা।
চৈতের কানি বৈশাখের ফেণী।।

—মাঘ মাসের শেষ ভাগে, ফাল্গুন মাসের মাঝে, চৈত্রে কণা কণা এবং বৈশাখে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হলে শস্যের ফলন যথেষ্ট হয়ে থাকে।

দিনে জল রাতে তারা।
এই দেখবে দুঃখের ধারা।।

—বর্ষার সময় যদি দিনের বেলা বৃষ্টি হয় এবং রাতের বেলা আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে দেশে দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয় অর্থাৎ রোদ না পেয়ে ফসলের ক্ষতি হয়।

পুবেতে উঠিল কাঁড়।
ডাঙা ডোবা একাকার।।

—পুবদিকে রামধনু উঠলে বৃষ্টি হবে এবং ডাঙা ও ডোবা জলে ভরে যাবে।

পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা।
পুবের ধনু বর্ষে ধারা।।

—পশ্চিম দিকে রামধনু উঠলে খরা অর্থাৎ অনাবৃষ্টি হয়। পুবদিকে রামধনু উঠলে বৃষ্টি হয়।

ভাদুরে মেঘে বিপরীত বায়।
সেদিন বর্ষা কে ঘুচায়।।

—ভাদ্রমাসে যেদিন আকাশে মেঘ থাকে এবং বাতাস বিপরীত দিক থেকে বয় সেইদিন নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে।

বছরের প্রথম ঈষাণে বয়।
হবেই বর্ষা খনা কয়।।

—বছরের প্রথম দিকে যদি ঈষাণ কোণ অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে বাতাস বয় তাহলে সে বছর অতিরিক্ত বর্ষা হবে নিশ্চিত।

শনির সাত মঙ্গলের তিন।
আর সব দিন দিন।।

—শনিবার বৃষ্টি আরম্ভ হলে সেই বৃষ্টি সাত দিন ধরে চলবে। মঙ্গলবারে আরম্ভ হলে তিন দিন থাকে এবং অন্যান্য বারে বৃষ্টি আরম্ভ হলে একদিন করে বৃষ্টি হয়।

আমে বান।
তেঁতুলে ধান।।

—যে বছর আম প্রচুর পরিমাণে ফলে থাকে সে বছর বান হয়। তেঁতুল প্রচুর পরিমাণে ফললে ধানও প্রচুর পরিমাণে ফলে থাকে।

খনা বলে শুন কৃষকগণ।
হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন।।
শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা।
পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা।।
মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরুপণ।
পূর্বদিক হতে কর হল চালন।।
তাহলে তোর সমস্ত আশয়।
হইবে সফল নাহিক সংশয়।।

—কৃষি একটি শুভ কাজ। সুতরাং হাল নিয়ে মাঠে যাবার সময় শুভক্ষণেই যাওয়া উচিত। পথে কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ অথবা অশুভ আলোচনা করা উচিত নয়। অর্থাৎ কৃষি কাজ শুরুর সময়ে মন পরিষ্কার থাকা দরকাব। ক্ষেতে পুব দিক থেকে লাঙ্গল দেওয়া আরম্ভ করা উচিত। এই সকল নিয়ম পালন করলে কৃষিকাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন হবে এবং তাতে সফলতা লাভ হবে।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি।।
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ঘরে হা ভাত।।

—কৃষিকাজের জন্য অপর লোক নিযুক্ত করতে হবে, তবে তার সঙ্গে নিজেকেও খাটতে হবে। তবেই প্রচুর লাভ হবে। যিনি নিজে খাটেন না, কেবল

ছাতা মাথায় দিয়ে কাজের লোকের কাজ তদারক করেন তার অর্ধেক লাভ হয়। আর যিনি তাও করেন না, ঘরে বসে খোঁজখবর নেন তার ঘরে চিরকাল অন্নকষ্ট থাকে অর্থাৎ তার ভাগ্যে ফসল জোটে না।

হাত বিশেক করি ফাঁক।
আম-কাঁঠাল পুঁতে রাখ।।
গাছগাছালি ঘন সবে না।
ফল তাতে ফলবে না।।

—কুড়ি হাত অন্তর অন্তর আম কাঁঠালের গাছ পুঁততে হয়। এর থেকে ঘন পুঁতলে গাছে ফলন কম হয়।

সিংহ মীন বর্জে।
কলা খাবে আজ্যে।।

—আজ্য অর্থাৎ ঘৃত। ভাদ্র ও চৈত্র মাস বাদ দিয়ে সকল মাসেই ঘি দিয়ে কলা খাবে। কারণ এটি অতিশয় পুষ্টিকর।

থোড় তিরিশে ফুলে বিশে
ঘোড়ামুখো তের।
এই বুঝে শ্বশুর ঠাকুর
কেনা বেচা কর।।

—ধানের থোড় বেরুবার একমাস পরে, ফুল বেরুবার কুড়িদিন পরে এবং শীষগুলো ঘোড়ার মুখের মতো নত হয়ে পড়বার তের দিন পরে ধান কাটবার উপযুক্ত হয়। খনা তাই শ্বশুরকে বলছেন, এই হিসাব করে ধানের কেনা বেচা করুন।

জমি চাষের ব্যাপারে খনার বচন থেকে জানা যায়, মুলো ফলাবার জন্য মাটিতে অন্ততঃ দশবার লাঙ্গল দিতে হবে। তুলোর জন্য দিতে হবে পাঁচবার। ধানের জন্য আড়াইবার আর পাট চাষ করবার জন্য জমি চষারই দরকার হয় না।

মুলোর জন্য জমিকে চাষ দিয়ে করতে হবে তুলোর মতো নরম। আখের ফলনের জন্য চাই ধুলোর মতো চষা মাটি।

যদি পুবদিক থেকে লাঙ্গল চালান শুরু কর, তাহলে জেনো তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। যদি পূর্ণিমা বা অমাবস্যা দিনে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া শুরু কর, তাহলে জনবে, সারাজীবন তোমাকে হা-হুতাশ করে কাটাতে হবে। তোমার বলদগুলো বাত রোগে আক্রান্ত হবে।

আর সৌভাগ্যলক্ষ্মী তোমাকে ত্যাগ করবেন। খনার এই বচনকে যে অগ্রাহ্য করে সে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে।

তারপর আরো আছে—

পানের চাষ করবে শ্রাবণে। তাহলে এত পান হবে যে রাবণ দশমুখে চিবিয়েও তা শেষ করতে পারবে না।

কলার চাষ করতে হলে জমিতে একহাত পরিমাণ গর্ত খুঁড়বে। গর্তগুলো হবে আট হাত অন্তর এবং সমান্তরাল। তারপর গর্তগুলোতে কলাগাছের চারা রোপন করবে।

কলা গাছের চারা রোপন করবার পর কচিপাতা কখনও কাটবে না, তাহলে বৃদ্ধি বন্ধ হতে পারে। দেখবে এই কলা বিক্রি করেই তোমার ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়ে যাবে।

চারা গাছ যদি দিনে রোদ আর সন্ধ্যাবেলায় জল পায় তাহলে ফুরফুরিয়ে বাড়তে পারে। ধানগাছ রোদেই ফলে আর রাতে ফলে জলে। তবে পানগাছ বাড়ে ছায়াতেই।

হিপোক্রেটিস

প্রাচীন গ্রীকদের সভ্যতা নতুন প্রাণ পেয়েছিল খ্রিস্টের জন্মের চার আর পাঁচ শতক পূর্বে। রেনেসাঁ তথা নবজাগরণের স্রোত সেসময় বয়ে গিয়েছিল সারা গ্রীস দেশে। সেই সময়ে এমন সব ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁদের অবদান মানুষের মন ও চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই সময়ে দর্শন শাস্ত্রের অঙ্গন আলোকিত হয়েছে সক্রেটিস, সফোক্লিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মনীষার আলোকে।

বিশ্বের নাট্যসাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন অ্যাসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিদিস প্রমুখ।

বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছিল হিপোক্রেটিস, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, পিথাগোরাসের প্রতিভার অবিস্মরণীয় অবদানে।

যুক্তি ও মুক্ত বুদ্ধির আলো নিয়ে এই সময়েই সংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসাশাস্ত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন হিপোক্রেটিস। তৈরি হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের মহৎ সম্ভাবনা। তাই তাঁকে বলা হয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক।

২৫০০ বছর আগেকার গ্রীস দেশে চিকিৎসা শাস্ত্র ছিল নানা অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারে আচ্ছন্ন—অনেকটাই তার ভূত প্রেত জড়ি বুটির প্রভাবে আচ্ছন্ন। চিকিৎসাবিদ্যা ছিল গুপ্তবিদ্যা।

অ্যাপলো ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসার দেবতা। দেশের বিভিন্ন স্থানে অ্যাপলোদেবের মন্দিরে লোকে অসুখ-বিসুখের আরোগ্য কামনায় হত্যা দিত। পুজো ও শূকর ইত্যাদি উৎসর্গ করত। পুরোহিতদের তারা মনে করত দেবতার প্রতিনিধি। তাই রোগগ্রস্তের চিকিৎসা করত পুরোহিতরাই।

এইভাবে পুরোহিতদের মধ্যেই চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। তারা দেবতার নামে নিজেদের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান প্রয়োগ করে রোগীর চিকিৎসা করত।

এমনি এক পুরোহিত চিকিৎসকের পুত্র ছিলেন হিপোক্রেটিস। তাঁর জন্ম হয়েছিল খ্রিঃ পূর্ব ৪৬০ অব্দে।

আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার তথ্যাদি যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে জানা যায়, হিপোক্রেটিসের জন্মস্থান ঈজিয়ান সাগরের কসদ্বীপ। এই দ্বীপেরই অ্যাপলো মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন তাঁর বাবা।

হিপোক্রেটিস ছিলেন সহজাত মেধার অধিকারী। অল্প বয়সেই পিতার কাছ থেকে সমস্ত গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করেন।

সেইকালে এথেন্স ছিল সমগ্র গ্রীসের শিক্ষা-সংস্কৃতির পাঠশালা। বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদ মনীষীদের সমাগম ছিল সেখানে। চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গভীরতর পড়াশুনা শেখার জন্য হিপোক্রেটিস এলেন এথেন্সে।

সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ডেমোক্রেটিসের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি। অঙ্ক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, দর্শন ও কলা বিষয়ে পড়াশুনা করে জ্ঞানের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়।

এথেন্সে যেসব পন্ডিত চিকিৎসক ছিলেন, এ ছাড়া দেশবিদেশ থেকে যেসব জ্ঞানী গুণী মানুষ সেখানে আসতেন, তাঁদের কাছে নানাভাবে শিক্ষা অর্জন করেছেন তিনি।

প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসাবিদ্যা ছিল ভুল-ক্রুটিতে ভরা, মিথ্যাচার ও প্রতারণায় মোড়া বিদ্যা। মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসই বাঁচিয়ে রেখেছিল এই গুপ্ত বিদ্যাকে।

হিপোক্রেটিস নিজেও ছিলেন পুরোহিত চিকিৎসকের পুত্র। নিজের জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর মননের বলে তিনি প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যার সমস্ত দোষ-ক্রুটি উপলব্ধি করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, এই অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাব্যবস্থাকে প্রকৃত সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠা করবেন।

অবিলম্বেই তিনি রুগীর চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। নিজের একটি চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করলেন।

সেই সময়ের প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী রোগের উপসর্গ দেখে রুগীকে ওষুধ দেওয়া হত। কেবল রোগটাই হত চিকিৎসকদের লক্ষ্য।

হিপোক্রেটিসের চিকিৎসা-ভাবনা ছিল প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। তিনি রোগের বিষয়ে সবিশেষ মাথা না ঘামিয়ে রুগীর চিকিৎসায় মনোনিবেশ করলেন।

তিনি বলেছেন, একজন চিকিৎসকের উচিত রুগীর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা। রুগীর প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা, পরিবারের অন্যান্যদের বিশেষ করে পিতা-মাতার রোগের ইতিহাস, রুগীর পরিবেশ, কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চিকিৎসা প্রণালী নির্ধারণ করতে হবে।

এই আদর্শ মেনে রুগীর চিকিৎসা করে অল্প দিনের মধ্যেই চিকিৎসক হিসেবে হিপোক্রেটিস বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। রুগীর ভিড় বাড়তে লাগল তাঁর চিকিৎসালয়ে।

একজন তরুণ চিকিৎসকের এই অভাবিত জনপ্রিয়তা দেখে দেশের প্রবীণ চিকিৎসকরা স্বভাবতই ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লেন। তাঁরা হিপোক্রেটিসের চিকিৎসাপদ্ধতির সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন।

চিকিৎসাবিদ্যার নামে পুরোহিত সম্প্রদায় যেসব ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে আসছিল হিপোক্রেটিস ক্রমেই জনসাধারণের মধ্যে সেসব প্রকাশ করে দিতে লাগলেন।

এবারে প্রমাদ গুণলেন পুরোহিত আর চিকিৎসকের দল। দীর্ঘদিনের প্রতিপত্তি হারাবার ভয়ে তাঁরা হিপোক্রেটিসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তাঁর নামে তারা অপপ্রচার শুরু করলেন।

আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে হিপোক্রেটিস সতর্ক হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এথেন্সে থাকা নিরাপদ হবে না। মিথ্যাচারী পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁর জীবনের ওপর আঘাত হানতেও ইতস্ততঃ করবে না। তিনি অবিলম্বে এথেন্স ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন।

সেই যুগে মানুষের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা চিকিৎসকদের ছিল না। তাই শবব্যবচ্ছেদ ছিল নিষিদ্ধ, ধর্মবিরুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতেই হিপোক্রেটিস মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে বহু ক্ষেত্রে নির্ভুল ধারণা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন।

হাড় ভেঙ্গে গেলে বা সরে গেলে তিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন ব্যান্ডেজ বাঁধার। ভাঙ্গা হাড় জুড়বার জন্য তিনি সেই স্থানে এক টুকরো কাঠ রেখে তার ওপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন।

প্রাচীন গ্রীসে শরীর চর্চাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। সুস্থ সবল দেহে বেঁচে থাকার জন্য শরীর গঠনের ওপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হত। তাই গ্রীসের সর্বত্র গড়ে উঠেছিল ব্যায়ামচর্চার আখড়া। বসতো খেলাধুলোর আসর।

এই সকল স্থানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটত। পেশী সংক্রান্ত গোলযোগে খেলোয়াড়রা অসুস্থ হয়ে পড়ত।

হিপোক্রেটিস নিয়মিত এই সব ক্ষেত্র পরিদর্শন করতেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিকিৎসার বিধান দিতেন। এই ভাবে আধুনিক শল্যচিকিৎসার সূত্রপাত সেই যুগে হিপোক্রেটিস করেছিলেন।

সমকালীন প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার গণ্ডী ভেঙ্গে তিনি হিউমেরাল বা মানবদেহ নির্গত বিভিন্ন ধরনের রস সংক্রান্ত চিকিৎসারও প্রবর্তন করেছিলেন।

তিনি এই হিউমের বা দেহ নিঃসৃত রসকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তাঁর মতে এই রসই নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মানসিক আচার ব্যবহার, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত। এই রসের বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে মানবদেহের স্বাভাবিকতারও পরিবর্তন ঘটে থাকে।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী গ্যালেন। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে তিনিই দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গ্যালেন হিপোক্রেটিসের হিউমেরাল মতবাদকে গ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য পরবর্তীকালে এই মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণ হয়েছিল। মানবের দেহ ও মনকে হিউমের বা দেহনিঃসৃত রস নিয়ন্ত্রণ করে এই মতবাদ অগ্রাহ্য হয়েছিল।

কিন্তু অতি আধুনিক কালে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি নির্গত রস, দেহ কোষের তরল পদার্থ, রস ইত্যাদির মানবদেহকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আধুনিক কালে মানব দেহের স্বাভাবিক তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিকে অসুস্থতা বলে নির্ণয় করা হয়ে থাকে এবং সেই ভাবেই চিকিৎসা করা হয়।

রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে মানবদেহের তাপমাত্রার গুরুত্ব হিপোক্রেটিসই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান হল, মানবদেহের ফোঁড়া, আব, পচন ইত্যাদির কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়। গভীর অনুশীলনের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অপরিচ্ছন্ন ও দূষিত দ্রব্য ব্যবহারের ফলেই এই সব রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। তাই তিনি পরিষ্কার জল, পরিচ্ছন্ন পোশাক ও নিরোগ খাদ্যাদি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অন দি স্যাক্রেড ডিসিস নামে একটি গ্রন্থে হিপোক্রেটিস অন্যান্য রোগের

সঙ্গে মৃগীরোগ বিষয়েও আলোচনা করেছেন। এই রোগটি সম্পর্কে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

বর্তমানকালেও বহু মানুষের ধারণা অপদেবতা কিংবা শয়তানের প্রভাবেই মানুষ মৃগীরোগগ্রস্ত হয়। হিপোক্রেটিস সেই যুগেই লিখেছেন, অপদেবতার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অন্য দশটি রোগের মতোই মৃগীরোগ সুনির্দিষ্ট কারণের ফলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে হিপোক্রেটিস বই লিখেছেন সাতাশিটি। পরবর্তীকালে তাঁর এই বইগুলি চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চিকিৎসা গবেষণাকে করেছে বিজ্ঞানমুখী।

হিপোক্রেটিসের চিকিৎসক জীবন ছিল মহৎ আদর্শ প্রণোদিত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সর্বমানবের সেবা করা। তাই মহৎ আচরণকেই তিনি সবার ওপরে স্থান দিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন, প্রত্যেক চিকিৎসকেরই উচিত চিকিৎসা শিক্ষা করার পাশাপাশি ব্যবহারিক দিকগুলোর বিষয়েও ওয়াকিবহাল হওয়া। তাহলেই চিকিৎসকের পূর্ণতা সম্ভব হবে।

সেই যুগে চিকিৎসাক্ষেত্রে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন হিপোক্রেটিস। জীবদ্দশাতেই তিনি অ্যাপলোদেবের অবতার বলে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন।

তিনি বলেছেন, রোগ চিকিৎসার জন্য চাই স্থির বুদ্ধি ও ধীর মস্তিষ্ক। শত ব্যস্ততার মধ্যেও স্থির বুদ্ধি প্রয়োগ করে রোগ নির্ণয় করতে হবে।

সেই কালের চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে নানা উপদেশ নির্দেশ দিয়ে তিনি যে বই লিখেছেন তার বহু নির্দেশ প্রবচনরূপে বর্তমানেও প্রচলিত। তাঁর সমস্ত রচনাই জীবনব্যাপী গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোয় সমৃদ্ধ।

আলেকজান্দ্রিয়ার একটি গ্রন্থাগারে হিপোক্রটিসের রচনাগুলি সংরক্ষিত হয়েছিল। তাঁর অনুগামীদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই গ্রন্থাগার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন বই সেখানে সংগৃহীত হয়েছে।

হিপোক্রেটিস বলতেন, সকল বিদ্যার মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ। এই বিদ্যাকে মানুষের সেবার কাজে নিয়োজিত করাই প্রকৃত চিকিৎসকের কর্তব্য।

কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকার থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে সর্বপ্রথম যুক্তি ও সত্যের আলোকে নিয়ে এসেছিলেন হিপোক্রেটিস। তাই তিনি সর্বকালের চিকিৎসকদের প্রণম্য পুরুষ।

যে সব ছাত্র তাঁর কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করতে আসত, তাদের শিক্ষা

শেষ হলে, তারা যাতে মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয় সেইজন্য তিনি তাদের দিয়ে শপথ করাতেন। একে বলা হত হিপোক্রেটিসের শপথ।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্ররা পৃথিবীর বহু দেশে আজও পর্যন্ত সেই পবিত্র শপথ উচ্চারণ করেন---এই পেশাকে আমি আমার জীবনের মতোই পবিত্র সুন্দর ও নির্মল করে রাখব।

এই মহান মানবহিতৈষী বিজ্ঞানী দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। খ্রিস্টজন্মের ৩৭০ বছর আগে নব্বই বছর বয়সে হিপোক্রেটিসের জীবনাবসান হয়।

পিথাগোরাস

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে গ্রীকরা। গ্রীক সভ্যতার বিজ্ঞানের সুবর্ণকাল বলে ধরা হয় খ্রিঃ পূর্ব ৭৭৬ অব্দ থেকে ১০০ অব্দ পর্যন্ত।

সুদীর্ঘ ৬৭৬ বছরে সেখানে আবির্ভূত হয়েছেন পিথাগোরাস, অলকমন, ডেমোক্রেটিস, হিপোক্রেটিস, থিওফ্রেসটাস, হেরোফিলাস, অ্যারিস্টটল, আর্কিমিডিস, ইউক্লিড ও হিপারকাসের মতো মহান বিজ্ঞান প্রতিভা।

এঁদের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে সবার প্রথমে জন্মেছিলেন পিথাগোরাস। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সময় থেকেই গ্রীকবিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়।

পিথাগোরাস ছিলেন একাধারে গণিতজ্ঞ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। গণিতশাস্ত্রের আদিপুরুষ রূপে তিনি ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছেন।

পিথাগোরাসের গবেষণা ছিল বিভিন্নমুখী। যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি শব্দ বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন। তাছাড়া সংখ্যাবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, শরীরবিদ্যা, সৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ।

খ্রিস্টের জন্মের ৫৮০ শতকে গ্রীসদেশের ক্রোটোনা দ্বীপের সামস নগরে পিথাগোরাসের জন্ম। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়েছিল বাবা-মায়ের কাছেই। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। সেই টানেই সামস শহরে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি এক গ্রীক বণিকের জাহাজে চড়ে আসেন মিশরে।

সেই সময়ে প্রাচীন মিশরও ছিল গ্রীসের মতোই বিদ্যাচর্চার অন্যতম পীঠভূমি। দেশ-বিদেশের মনীষীদের সমাগমে মুখর ছিল মিশরের জ্ঞানচর্চা। পিথাগোরাস এখানে বিভিন্ন অধ্যাপকের কাছে বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করলেন। শিখলেন ব্যাবিলনের ক্যালডিয় ভাষা।

শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি পুনরায় ফিরে এলেন স্বভূমি ক্রোটোনায়। এখানেই করেছেন তিনি নানা বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

গণিত বিজ্ঞানের অবদানের জন্যই পিথাগোরাসের প্রসিদ্ধি সর্বাধিক। সেই মূল বিষয়ে যাবার আগে তাঁর অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়েও কিছু বলা প্রয়োজন।

শব্দ বিজ্ঞানের গবেষণা তিনি শুরু করেছিলেন অনেকটা আকস্মিকভাবেই। একদিন সামস শহরের পথ ধরে তিনি হাঁটছিলেন। এক কামারশালার পাশ দিয়ে যাবার সময় হাতুড়ির ঘায়ের শব্দ কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি খেয়াল করলেন, হাতুড়ির পর পর আটটি ঘায়ের মধ্যে তৃতীয় ও পঞ্চম ঘায়ের শব্দ হুবহু একই রকম। কিন্তু চতুর্থ ঘায়ের শব্দটি একটু আলাদা রকমের।

কৌতূহলী হয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন কামারশালায়। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন শব্দের মিল বা অমিলের কারণ হল নানা ওজনের হাতুড়ি। বিভিন্ন ওজনের হাতুড়ি যখন নেহাইয়ের ওপরে পড়ছে, তা থেকে নির্গত হচ্ছে এক এক ধরনের শব্দ।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। তারপর তৈরি করলেন একই ধাতুর সমান দৈর্ঘ্যের চারটি তার। প্রত্যেকটিই আবার সমান পুরু। এরপর চারটি তারকে এমন ভাবে চারটি বিভিন্ন ওজনের ধাতুর সাহায্যে টান টান করে টানলেন যা কামারশালায় দেখে আসা চারটি হাতুড়ির ওজনের সমান। এবারে চারটি তারের গায়ে আঙুল স্পর্শ করতেই শব্দ উঠল নানান রকম। তিনি লক্ষ্য করলেন তারের শব্দে কামারশালার শব্দেরই অনুরূপ ঝংকার উঠছে।

এরপর নানা ওজনের ধাতুর সাহায্যে নানা ভাবে টান করে তৈরি করে ফেললেন একটি বাদ্যযন্ত্র। তাঁর মৃত্যুর পরে এই যন্ত্র বাজানো হত সামস দ্বীপের জুনোদেবের মন্দিরে।

পিথাগোরাস জানিয়েছিলেন, নানা ওজনের হাতুড়ি ইথার তরঙ্গে আঘাত করে তৈরি করে স্বরসঙ্গতি। আঘাতের বেগ বা পরিমাণ ও ইথার তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ওপরেই নির্ভব করে স্বরটি কেমন হবে।

পিথাগোরাসের এই ধারণার ওপরেই গড়ে ওঠে গোলকপুঞ্জের স্বরসঙ্গতির সূত্র বা হারমনি অব দ্য স্ফিয়াবস।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর পর্যবেক্ষণের সূত্রে পিথাগোরাস ম্যালেরিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধানটি জানিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, জলা জংলাই হলো ম্যালেরিয়ার উৎস। এই সব পরিষ্কার করলে ম্যালেরিয়াও নির্মূল হবে।

পিথাগোরাসের সংখ্যাবিজ্ঞানের গবেষণাটিও ছিল মূল্যবান। মিশরে অবস্থান কালে তিনি ক্যালডিয় বা ব্যাবিলনের ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। এই ক্যালডিয় সংখ্যা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি প্রচার করেছিলেন, বিশ্বের সকল বস্তুকেই সংখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সংখ্যা দিয়ে তিনি রোগবিশেষের সংকটকাল পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারতেন।

এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে পিথাগোরাস ব্যাখ্যা করতেন এই ভাবে—সমস্ত সংখ্যার আদি ১, তাই এই সংখ্যাটি অনাদি ঈশ্বরের প্রতীক এবং তাই পবিত্র সংখ্যা। ২ সংখ্যা নারীর প্রতীক। পুরুষের প্রতীক ৩ সংখ্যাটি। নারী ও পুরুষের মিলিত সংখ্য ২+৩=৫ হল বিবাহের সংখ্যা। ৪ কে তিনি ধরতেন ন্যায়ের প্রতীক বলে এবং ১০ ছিল যাদু সংখ্যা। এই সব সংখ্যার গণনার সাহায্যে তিনি নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন।

পৃথিবীর আকার সম্পর্কে পিথাগোরাসই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন চরম সত্য কথা। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর আকার গোল আর এই পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুই আবর্তিত হচ্ছে। পরবর্তীকালে কোপার্নিকাস তাঁর রচনায় পিথাগোরাসের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।

ইউক্লিডকে জ্যামিতির জনক বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে পিথাগোরাসই জ্যামিতির চর্চা শুরু করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর মনে প্রথম চিন্তার উদয় হয়েছিল মিশরে বসবাসকালে।

পিরামিডের গঠনকৌশল দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ জ্যামিতিক নিয়ম মেনে পাথরের পর পাথর সাজিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল পিরামিডগুলি।

পিরামিডের গঠনকৌশল দেখেই পিথাগোরাসের মনে জ্যামিতি বিষয়ে চিন্তা ভাবনার উদয় হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তিনি জ্যামিতির জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

ইউক্লিডের জন্মের দুশ বছর আগেই প্রচারিত হয়েছে পিথাগোরাসের বিখ্যাত উপপাদ্যটি—সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ ওই ত্রিভুজের অপর দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গের যোগফলের সমান।

এ বিষয়ে অবশ্য পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদও রয়েছে। অনেকের মতে পিথাগোরাস এই উপপাদ্যটি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে।

দেশভ্রমণে বেরিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন পিথাগোরাস। প্রাচীন ভারতবর্ষও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে কোনও প্রাচীন সভ্যতার মতোই অগ্রসর ছিল।

পিথাগোরাসের জন্মের অন্ততঃ একশ বছর আগেই ভারতবর্ষে পন্ডিত বৌধায়ন জ্যামিতি সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিলেন।

পন্ডিতদের ধারণা, বৌধায়নের কোন সূত্র থেকেই পিথাগোরাস তাঁর

উপপাদ্যটির সূত্র লাভ করেছিলেন। তবে সূত্র যাই হোক না কেন উপপাদ্যটি ছিল পিথাগোরাসের সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা।

জ্যামিতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অবদান না থাকলেও পিথাগোরাসই আধুনিক জ্যামিতিবিদ্যার পথটি প্রদর্শন করেছিলেন।

মিশর থেকে সামসে ফিরে এলেও পিথাগোরাস বেশিদিন এখানে বাস করতে পারেননি। সেই সময়ে সামসের রাজা ছিলেন অত্যাচারী পলিক্রেটিস। এই স্বেচ্ছাচারী রাজার রাজত্ব ছেড়ে তিনি পাকাপাকি ভাবে ক্রোটোনায় গিয়ে বাস করতে থাকেন।

বিভিন্ন বিষয়েই বিশেষ করে ধর্ম দর্শন ও সঙ্গীত ও বিজ্ঞান বিষয়ে পিথাগোরাসের পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাই অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে শিক্ষালাভের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগল।

পিথাগোরাস বিশেষ কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের নির্বাচন করতেন। তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার যারা পেত তাদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হত। নিয়মগুলি পিথাগোরাস নিজেও মেনে চলতেন।

তিনি এবং তাঁর শিষ্যবর্গ সম্পূর্ণ নিরামিষাশী না হলেও পশুমাংস ও ডিম খেতেন না। কেবল দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা মাংস খেতেন। তাঁরা মনে করতেন মানুষের মতোই সমস্ত পশুপাখিও পৃথিবীর সন্তান। তাই তাদের মাংস খাওয়া অন্যায়।

পিথাগোরাস অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। সর্বদা সাদা পোশাক তিনি পরতেন। নিজেকে তিনি জ্ঞানভিক্ষু বলেই মনে করতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানই মানুষকে প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে। তাই অর্থের জন্য না, জ্ঞান অর্জনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করা কর্তব্য।

পিথাগোরাস শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, সঙ্গীত, দর্শন, ও জ্যোর্তিবিদ্যা। পাঁচ বছর তাঁর কাছে শিক্ষালাভের পর শিষ্যরা অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষার অধিকার লাভ করত।

তাঁর জীবনকালের মধ্যেই পিথাগোরাসের শিষ্যদের নিয়ে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তারা প্রত্যেকে জ্ঞানচর্চা ও ধর্মীয় জীবনের মধ্যেই নিজেদের নিয়োজিত রাখত।

প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মতোই পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন আত্মা অমর। মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে পুনরায় জন্ম নেয়।

গ্রীসের মানুষ তাঁর জীবিতকালেই পিথাগোরাসকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল। পিথাগোরাসের শিষ্য ও অনুগামীরা প্রধানত জ্ঞানচর্চারই অনুরক্ত

ছিল। কিন্তু এক সময় দেখা গেল তাদের মধ্যে অনেকেরই চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে রাজনীতি।

এদিকে দেশের লোকের মধ্যে পিথাগোরাসের প্রভাবও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফলে দেশের রাজশক্তি বিচলিত বোধ করল।

ইতিমধ্যে কিছু ঈর্ষাকাতর বুদ্ধিজীবীও পিথাগোরাসের জনপ্রিয়তা ও সম্মানহানির উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার শুরু করেছিল। তারা সুযোগ বুঝে রাজশক্তির সঙ্গে যোগ দিল।

অল্পবুদ্ধি কিছু লোক মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। রাজার অনুচরদের উসকানিতে তারা উত্তেজিত হয়ে একদিন সদলবলে পিথাগোরাসের আবাসে চড়াও হল।

ক্ষিপ্ত জনতাকে বাধা দিতে গিয়ে পিথাগোরাসের অনেক শিষ্যই জখম হল, অনেকে মারা পড়ল।

আহত শিষ্যদের অনুরোধে পিথাগোরাস তাঁর শিক্ষালয় ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না।

বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। তিনি চেষ্টা করলে অনায়াসেই তাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ সামনে এক কলাই ক্ষেত পড়ায় দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন।

জীবনবাদী পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির রাজ্যে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সকলেই জীবন্ত প্রাণী। ক্ষেত পার হতে গেলে তাঁর পায়ের চাপে জীবন্ত কলাই গাছ প্রাণ হারাবে। এমন কাজ তিনি কী করে করবেন?

তাই চিন্তা করে তিনি আর কলাইয়ের ক্ষেতে পা দিলেন না, নিজের জীবন বিপন্ন করে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। এই সুযোগে রাজার অনুচররা এসে তাঁকে হত্যা করল।

পিথাগোরাসের মৃত্যু সম্পর্কে আরও একটি বিবরণ কোন কোন পন্ডিতের রচনা থেকে জানা যায়।

শেষ বয়সে তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় একদিন সকালবেলা এক পাহাড়ে উঠে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এই ভাবেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

জেমস রবার্ট ওপেনহাইমার

আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৫ খ্রিঃ ১৬ই জুলাই। এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঞ্চলের বিস্তীর্ণ মরুভূমির জিরো হিল অঞ্চলে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল মানব ইতিহাসের প্রথম পরমাণু বোমাটির। আর এই চমকপ্রদ কর্মকান্ডের প্রধান হোতা ছিলেন ডঃ জেমস রবার্ট ওপেনহাইমার।

এই বোমার বিস্ফোরণের তীব্রতা ছিল অতি ভয়াবহ। বিস্ফোরণ স্থলে ছিল একটি একশো ফুট লম্বা টাওয়ার। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই টাওয়ার। তার নিচে যে বালির স্তূপ ছিল, প্রচন্ড উত্তাপে সেই বালি (সিলিকন) কাচে (সিলিকেট) রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বিস্ফোরণের এক মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে জীবনের কোন চিহ্ন ছিল না। নিউ মেক্সিকো থেকে চারশো পঞ্চাশ মাইল দূরের রাজ্য টেক্সাস থেকেও বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া গিয়েছিল।

ওপেনহাইমার ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত পরমাণু বিজ্ঞানী। তিনি নিজেই বলেছিলেন, পরমাণু শক্তি কোন দিনই হয়তো সঠিক ভাবে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না।

কেন না, এই অতুলনীয় শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে স্বার্থান্বেষী মানুষ হয়ে উঠবে প্রভুত্বপরায়ণ। ক্ষমতার দম্ভ আর আস্ফালন তাকে করে তুলবে আগ্রাসী। মানবকল্যাণ পদে পদে হবে লাঞ্ছিত।

বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার পরমাণু শক্তি সম্পর্কে শেষ কথা বলেছিলেন কিনা, সেই মীমাংসা এখনো হয়নি।

জে. রবার্ট ওপেনহাইমারের জন্ম নিউইয়র্ক শহরে ১৯০৪ খ্রিঃ ২২শে এপ্রিল এক ইহুদি পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। তাই ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছিলেন প্রাচুর্যের মধ্যে এবং যথাসময়েই তাঁর লেখাপড়া শেখারও উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছিল।

অসাধারণ কৌতূহল আর পর্যবেক্ষণ প্রবণতা নিয়েই জন্মেছিলেন ওপেনহাইমার। যখনই যা কিছু তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করত, তার সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে জেনে তবে তিনি স্বস্তি পেতেন। এই ভাবে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু সত্তার।

যখন মাত্র সাত বছর বয়স, সেই সময়েই বিচিত্র আকার-আকৃতির পাথরের রীতিমত এক সংগ্রহশালা তিনি গড়ে ফেলেছিলেন পড়ার ঘরে। কেবল পাথর নিয়েই নয়, নানা ধরনের কীটপতঙ্গ খুঁজে বেডানোও তাঁর নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

জীবাণু পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র ওই বয়সেই কিনে ফেলেছিলেন তিনি।

কেবল বিজ্ঞানের বিষয়ই যে তাঁকে আকর্ষণ করত তাই নয়। শিল্পের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। ভাল আঁকতে ও গাইতে পারতেন তিনি। ভাষা শিক্ষার প্রতিও ছিল গভীর আগ্রহ। বলা চলে বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন ওপেনহাইমার।

বিচক্ষণ বাবা-মা ছেলের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে শহরের সবচেয়ে নামজাদা ও সেরা স্কুল এথিক্যাল কালচারে তাঁকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর লেখা পড়ার পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। কাজেই দুটো দিকেই সমান মনোযোগ ছিল তাঁর।

বছর বারো বয়সে বিজ্ঞানের একটি শাখা রসায়নের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন তিনি। নতুন কিছু আবিষ্কারের ঝোঁক চাপল ঘাড়ে। রাতদিন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই ডুবে থাকেন।

ছেলের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বাবা-মা তাঁর জন্য একটি ছোটখাট রসায়নাগারও তৈরি করে দিলেন। কেবল তাই নয়, রসায়নের নিয়ম প্রকরণ ভালভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য তাঁর জন্য উপযুক্ত শিক্ষকেরও ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা।

সেই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষায় মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যেই রসায়নের একজন পাকা পর্যবেক্ষক হয়ে উঠলেন ওপেনহাইমার।

পড়াশুনো, গবেষণা তার সঙ্গে ছবি আঁকা এবং সঙ্গীত শিক্ষার মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে উঠতে লাগলেন ভবিষ্যতের পরমাণুবিজ্ঞানী।

খেলাধুলোয় বিশেষ আগ্রহ তাঁর কোনকালেই ছিল না। তাই বাড়ির বাইরে বড় একটা বেরুতেন না—বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও মেলামেশার সুযোগ হত না। নিজের মনে পছন্দমতো কাজ নিয়ে একা থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

ছেলের এই অন্তর্মুখীনতা ভাল লাগত না বাবা-মায়ের। তাই ছেলেকে বাইরের জগতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বাবা তাঁকে একটা ডিঙ্গি নৌকো কিনে দিয়েছিলেন। সেই নৌকো চেপে নদীতে ঘুরে বেড়াতেন কিশোর ওপেনহাইমার। বেরুতেন একা, কখনো সঙ্গে থাকতেন বাবা-মা।

নিজের ডিঙি নৌকোর একটা নামও দিয়েছিলেন ওপেনহাইমার। সেই সময় তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন রাসায়নিক ট্রাইমিথিলিন ক্লোরাইড নিয়ে। তাই ওই রাসায়নিকের নামেই ডিঙিটির তিনি নামকরণ করেছিলেন ট্রাইমিথি।

যথাসময়ে এথিক্যাল কালচার স্কুল থেকে শেষ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে স্নাতক হলেন ওপেনহাইমার।

প্রতিভাবান ছেলের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর বাবার। ছেলেকে নানা দেশের সঙ্গে পরিচিত করাতে এবারে তিনি তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ সফরে।

তাঁরা প্রথমে এলেন ইতালির রাজধানী রোমে। সেখান থেকে গেলেন গ্রিসে। পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান পুরোহিত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, গ্যালিলিও, সক্রেটিস, প্লুটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ আবির্ভূত হয়েছিলেন এসকল দেশে। গ্রীস ইতালিকে তাই বলা হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থভূমি।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে ওপেনহাইমার ঘুরে ঘুরে দেখেন দুই দেশের ঐশ্বর্য।

এভাবে ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে এক সময়ে তাঁরা ফিরে এলেন নিউইয়র্কে।

বিভিন্ন দেশের ভাষা আগেই রপ্ত করেছিলেন ওপেনহাইমার। এবারে ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষার শ্রেষ্ঠ বই পত্র সংগ্রহ করে তার মধ্যে ডুব দেন তিনি।

সেই সময় মাত্র উনিশ বছর বয়েস ওপেনহাইমারের, নিজের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে একদিন স্থির সিদ্ধান্ত নেন। উচ্চ শিক্ষা নেবার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হন। রসায়নের সঙ্গে অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যাও শিখতে থাকেন।

অসাধারণ মেধাবী ওপেনহাইমার ক্লাসের চার বছরের পাঠ তিন বছরেই সম্পূর্ণ করলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়ে স্নাতক হলেন।

ইংলন্ডে ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরির খ্যাতি তখন তুঙ্গে। জগদ্বিখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিসের নামে প্রতিষ্ঠিত এই ল্যাবটির তত্ত্বাবধান করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণার অত্যাধুনিক সব রকম সুযোগ সুবিধাই এখানে পাওয়া যায়।

ওপেনহাইমার ১৯২৬ খ্রিঃ ক্যাভেন্ডিসে গবেষণার সংকল্প নিয়ে ইংলন্ডে চলে এলেন।

রসায়ন বিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধাপুরুষ লর্ড রাদারফোর্ড তখন ক্যাভেন্ডিসে কাজ করছেন। পরমাণু বিজ্ঞানে বিস্ময়কর আবিষ্কারের জন্য তাঁর খ্যাতি জগৎ জুড়ে। তিনি তখনও নিরলস গবেষণা করে চলেছেন পরমাণুর বিভিন্ন গঠনের রহস্য নিয়ে।

গবেষণার সূত্রেই ওপেনহাইমার লর্ড রাদারফোর্ডের সংস্পর্শে এলেন। তাঁর কাছেই পরমাণু পদার্থবিদ্যার শিক্ষা নিলেন তিনি। নতুন এক জীবনের দরজা যেন খুলে গেল তাঁর সামনে।

কেম্‌ব্রিজের ক্যাভেন্ডিসে আরও এক প্রতিভাধর পদার্থবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ পেলেন ওপেনহাইমার। তিনি হলেন বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ন। পরমাণু পদার্থবিদ্যায়

গভীর আগ্রহের পরিচয় পেয়ে বার্ন ওপেনহাইমারকে পরামর্শ দিলেন জার্মানির গাটিনগেন শহরে যাওয়ার জন্য।

সেই সময়ে এই শহরে গবেষণারত ছিলেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক পদার্থবিদগণ। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার সাহায্যে তাঁরা নতুন নতুন আবিষ্কার করে সমৃদ্ধ করে চলেছেন বিশ্ববিজ্ঞানকে।

নতুন পরিবেশে এসে গবেষণার কাজে যুক্ত হলেন ওপেনহাইমার। এখানেই তিনি জার্মানির কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদের সংস্পর্শে আসেন। গবেষণায় তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা চমৎকৃত করে সকলকে।

গাটিনগেনে বিভিন্ন জনের সঙ্গে কাজ করলেও ওপেনহাইমারের যোগাযোগ বেশি ছিল অধ্যাপক বার্নের সঙ্গে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপরে তত্ত্বীয় গবেষণা করে দুজনে মিলে সম্পূর্ণ করলেন এক গবেষণাপত্র।

এই গবেষণাপত্রে তাঁরা অণুর ওপরে শক্তির প্রতিক্রিয়াকে যথাযথ ব্যাখ্যা করলেন।

এই গবেষণাপত্রের সুবাদেই পি. এইচ. ডি ডিগ্রি পেলেন ওপেনহাইমার।

এর পরে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপরে আরও কাজ করার উদ্দেশ্যে তিনি চলে এলেন সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে। কিছুদিন এখানে কাজ করার পর এলেন হল্যান্ডের লিডেন শহরে।

এই ভাবে কেটে গেল দুটি বছর। ১৯২৮ খ্রিঃ ওপেনহাইমার ফিরে এলেন স্বদেশে। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এখন তাঁর সারা মন জুড়ে বসেছে। কাজের সূত্রে ইতিমধ্যেই তত্ত্বীয় পদার্থবিদ হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিতি লাভ করেছে তাঁর নাম। এবারে নতুন কাজে হাত দেন ওপেনহাইমার।

সেই সময় ইউরোপ ও আমেরিকার তাবড় বিজ্ঞানীরা পরমাণু বিদারণের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা উদ্ভাবনের চেষ্টায় কাজ করে চলেছেন। তরুণ ওপেনহাইমারও এই কাজে হাত লাগালেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন বিদীর্ণ পরমাণু থেকে উদ্ভূত শক্তি দিয়ে মানব সভ্যতার প্রভূত উন্নতি সম্ভব হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে গেলেন ওপেনহাইমার। পাশাপাশি আরও একটি কাজ নিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অব টেকনলজিতে অধ্যাপনা।

এভাবে জীবনের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর বিয়ে করে সংসারজীবন শুরু করলেন। সুন্দরী পত্নীকে নিয়ে, গান আনন্দ, নৌকাবিহার, কখনো ছবি আঁকা, এসবের মধ্য দিয়ে তর-তর করে বয়ে চলতে থাকে জীবন-তরীখানি।

সফল অধ্যাপক হিসেবে অল্পদিনের মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেন ওপেনহাইমার। গবেষণার সূত্রে ইতিমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ফলে তত্ত্বীয় পদার্থ বিদ্যায় শিক্ষালাভের জন্য দেশবিদেশ থেকে শিক্ষার্থীদের ভিড় বাড়তে লাগল তাঁর ক্লাসে।

পদার্থবিদ্যার তত্ত্বীয় গবেষণাগুলির মাধ্যমে নতুন কিছু আবিষ্কার সম্ভব করতে না পারলেও ওপেনহাইমারের ব্যাখ্যা থেকে পদার্থবিজ্ঞানীরা যে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সেই সময়ে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে কাজ করছিলেন পদার্থবিদ কার্লভি অ্যান্ডারসন এবং পদার্থবিদ ডির‍্যাক কাজ করছিলেন পরমাণুর গঠন ও তার ভেতরের বিভিন্ন উপ-কণা নিয়ে।

এই দুই বিজ্ঞানীকে তাঁদের গবেষণার উৎসটির সন্ধান জানিয়েছিল ওপেনহাইমারের গবেষণা। পরবর্তীকালে কার্লভি এন্ডারসন এবং ডির‍্যাক উভয়েই নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

মেলবা ফিলিপস নামে এক পদার্থবিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করে সম্মিলিত ভাবে একটি গবেষণায় তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার এক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন ওপেনহাইমার। তাঁদের এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে ওপেনহাইমার-ফিলিপস এফেক্ট নামে পরিচিত হয়।

ইতিমধ্যে ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে ঝড় তুলেছেন জার্মানীর নাৎসি নেতা এডলফ হিটলার। গোটা পৃথিবীকে নিজের অধিকারে আনার স্বপ্নে মশগুল হয়ে তিনি গঠন করেছেন দুর্ধর্ষ নাৎসি বাহিনী। এই বাহিনীর পদভরে কেঁপে উঠেছে সমগ্র ইউরোপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে বিশ্বের আকাশ।

১৯৪১ খ্রিঃ ৭ই ডিসেম্বর জাপান ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্কিন নৌবাহিনীর বন্দরদুর্গ পার্ল হারবারে। এই আকস্মিক আক্রমণে স্বভাবতঃই বিভ্রান্ত দিশাহারা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সেই সময় প্রেসিডেন্টের আসনে সমাসীন রুজভেল্ট। অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন তাঁর সামনে।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে মার্কিন বিজ্ঞানী মহল প্রেসিডেন্টকে ভবিষ্যতের এক সর্বনাশা সম্ভাবনার কথা জানালেন।

পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা আইনস্টাইন তখন আমেরিকায়। তিনিও রয়েছেন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে।

এক বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁরা জানালেন, জার্মান ও ইতালির পদার্থ বিজ্ঞানীরা এক ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী পরমাণু বোমা প্রস্তুত করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের চেষ্টা সফল হলে গোটা বিশ্বের বুকে ত্রাস সৃষ্টি হবে।

এই ঘটনার পরে রুজভেল্টের তৎপরতায় অবিলম্বে দেশের দুঁদে বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত হল পরমাণুবোমা তৈরির পরিকল্পনা।

১৯৪২ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্টের আহ্বানে এই প্রকল্পের পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল পদার্থ বিজ্ঞান ও পরমাণুগবেষণার কুশলী বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারকে।

ইতিমধ্যে আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞানের চর্চায় বিশ্বের নানা প্রান্তের বিজ্ঞানীরা একের পর এক রহস্য উন্মোচন করে এক মহাশক্তির সম্ভাবনার ইশারা লাভ করেছেন।

১৮৯৭ খ্রিঃ জে. জে. টমসন নামে এক ইংরাজ পদার্থ বিজ্ঞানীর গবেষণায় জানা গেছে, পদার্থের সূক্ষ্মতম কণা পরমাণুকে ভেঙ্গে পাওয়া যায় এক ধরনের অতিসূক্ষ্ম ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধানবাহী কণা। এই কণার নাম ইলেকট্রন।

পদার্থ বিজ্ঞানী টমসনের এই আবিষ্কারের পর থেকেই পরমাণুর রহস্য অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের পদার্থ বিজ্ঞানীরা।

ডেন পদার্থবিজ্ঞানী নীলস বোর ১৯১৪ খ্রিঃ পরমাণু নিয়ে গবেষণাকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর গবেষণায় ধরা পড়ে পরমাণুর ভেতরের শক্তি রহস্য। সেখানে ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধানযুক্ত পরমাণুর নিউক্লিয়াস ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন শক্তিস্তরে বিভিন্ন সংখ্যার ইলেকট্রন।

বোরের আবিষ্কারের সূত্র ধরে বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড তুলে ধরেছেন পরমাণুর ক্ষমতার এক অজানা রহস্য।

তিনি দেখিয়ে দিলেন, পরমাণুর ভেতরের যে ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধানযুক্ত নিউক্লিয়াস রয়েছে, তা আসলে ঋণ বিদ্যুৎকণা প্রোটন ও প্রশম কণা নিউট্রনের আবাসস্থল।

কোনও এক পরমাণুর নিউক্লিয়াসে এই কণারা থাকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় এবং প্রচন্ড এক বলের আকর্ষণ এই কণাগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে।

প্রচণ্ড শক্তি কবলিত নিউক্লিয়াসের কণাগুলোকে যদি পৃথক করা সম্ভব হয় তবে উৎপন্ন হবে অপ্রতিরোধ্য ভয়ঙ্কর শক্তি।

ইতালিয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি। ১৯৩৪ খ্রিঃ পরমাণু সম্পর্কে গবেষণাকে তিনি এগিয়ে দেন আরও এক ধাপ।

পূর্বেই জানা গিয়েছিল, যে কোনও প্রাকৃতিক মৌলের মধ্যে সবচেয়ে হালকা মৌল হল হাইড্রোজেন। আর সব চেয়ে ভারী মৌলটি ইউরেনিয়াম। এই মৌলগুলোর পারমাণবিক ওজনও জানতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ফের্মির পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, ইউরেনিয়াম মৌলের ওপরে দ্রুতগতিসম্পন্ন এক ঝাঁক নিউট্রন ফেলতে না ফেলতেই দুয়ে মিলে এক নতুন মৌলে রূপান্তরিত হয়। ফের্মি অবশ্য এই নতুন মৌলটির সঠিক পরিচয় ধরতে পারলেন না।

ফের্মির গবেষণার ফল বিশ্বের পরমাণু বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করে তুলে। শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

জার্মান বিজ্ঞানী লিজ মিট্নার ও অটো ফ্রিৎখ পরীক্ষা করে দেখালেন, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গলে দুটি অপেক্ষাকৃত হাল্কা তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের উদ্ভব হয়। এদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরেনিয়ামের ভেতর থেকে নির্গত হতে থাকে অপরিমেয় শক্তি-স্রোত। বিজ্ঞানীরা শক্তি উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার নাম দিলেন নিউক্লিয়ার ফিশান বা পারমাণবিক বিস্ফোরণ।

বাইরের জগতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ধ্বংস ক্ষমতা যে কত ব্যাপক সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। তাই শত্রুপক্ষের প্রস্তুতির সংবাদ জানার পর রুজভেল্ট দেশের বিজ্ঞানীদের একত্রিত করে পরমাণুশক্তি আহরণের তোড়জোড় আরম্ভ করলেন।

যাকে বলে যুদ্ধকালীন তৎপরতা। পরমাণুবোমা তৈরির কাজটিও এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। তা সম্পন্ন করতে হবে শত্রুপক্ষ প্রস্তুত হবার আগেই।

স্থান নির্বাচন হল লোকালয় থেকে বহু দূরে—নিউ মেক্সিকোর মরু অঞ্চলের এক শহর লস আলামাসে।

সেখানে জড় হতে লাগল প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি। একে একে দেশের ও আমেরিকায় আশ্রয় নেওয়া ভিনদেশী প্রতিভাবান কুশলী বিজ্ঞানীরাও চলে এলেন অকুস্থলে। তাঁদের সকলের নেতৃত্বে রইলেন ওপেনহাইমার। তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন বিজ্ঞানীরা। সামরিক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ঘিরে রাখল এই সঙ্গুপ্ত স্থানটিকে। বাইরের কাকপক্ষীও যেন এই মহাশক্তি-মন্থন-সংবাদ জানতে না পারে।

পরমাণু বোমা তৈরির এই মার্কিন প্রকল্পে দেশীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জার্মানত্যাগী বিজ্ঞানী মিট্নার ও অটো ফ্রিৎখ। ইতালিত্যাগী বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি, ডেন বিজ্ঞানী নীলস বোর এবং হাঙ্গেরীত্যাগী বিজ্ঞানী জিলার্ড ও টেলার।

সমবেত বিজ্ঞানীদের নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন ওপেনহাইমার। কর্মব্যস্ততার চূড়ান্ত অবস্থা তাঁর। দিনরাত ঘুরে কাজ দেখছেন, সমস্যা নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড বসবার উপায় নেই। কাজের মধ্যেই সামান্য স্যান্ডউইচ খেয়ে দিন কাটে। তিনচার ঘণ্টার হাল্কা ঘুমের সময়টুকুও সবসময় পাওয়া যায় না।

এই বিপুল কর্মযজ্ঞের বিপুল খরচখরচা জোগাচ্ছে মার্কিন সরকার। তাই প্রয়োজনীয় সবকিছুই সময় মতো পাওয়া যাচ্ছে হাতের কাছে।

ভাবলে স্বপ্নের মতো মনে হয়, আমেরিকার এই পরমাণু বোমা পরিকল্পনায় সর্বমোট ব্যয় হয়েছিল ২০০০,০০০,০০০,০০০—দুই বিলিয়ন ডলার। কাজ করেছিলেন পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি কুশলী কর্মী-বিজ্ঞানী।

তেনেশি সহরের ওয়াকরিজ পর্বতের শিখরে তৈরি হতে লাগল পরমাণু বোমা তৈরির প্রধান উপকরণ ইউরেনিয়াম। এই মৌলেব কণার আঘাতেই ঘটবে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ।

প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন ছয় পাউণ্ডের ইউরেনিয়াম--২৩৫। কাজের মাঝখানেই বিজ্ঞানীরা পেয়ে গেলেন ইউরেনিয়ামের চাইতেও কার্যকরী অন্য এক মৌল। দেখা গেল ইউরেনিয়াম থেকেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় পাওয়া সম্ভব হচ্ছে এই নতুন কৃত্রিম কণা।

বিজ্ঞানীরা এবারে উঠে পড়ে লাগলেন এই কৃত্রিম কণা সংগ্রহের কাজে। এই কাজের নেতৃত্ব দিলেন পরমাণু বিজ্ঞানের অন্যতম কৃতী বিজ্ঞানী গ্লেন থিওডোর সীবর্গ। তিনিই এই কৃত্রিম কণার নামকরণ করেছেন প্লুটোনিয়াম। মোট নটি কৃত্রিম কণার আবিষ্কর্তা এই বিজ্ঞানী।

এইভাবে একসময় ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে ও কর্মকুশলতায় সর্বপ্রথম তৈরি হল বিশ্বের ভয়ঙ্করতম মারণাস্ত্র পারমাণবিক বোমা। মানুষের হাতে পৃথিবী তার সম্ভাব্য ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল এক ধাপ।

মানব সমাজের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন ওপেনহাইমার। তাই দেখা গেল বোমার পরীক্ষামূলক বিদারণের পরে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন তিনি।

প্রাণোচ্ছল হাসিখুশি মানুষটি যিনি বন্ধুদের সঙ্গে গানে আড্ডায় মেতে থাকতেন, রাতারাতি সেই মানুষটি হয়ে গেলেন এক বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি।

জাপানের নাগাসাকি হিরোসিমায় আমেরিকার পরমাণু বোমার সর্বনাশা ছোবল সংখ্যাহীন মানুষের প্রাণহানি ঘটাল। বেদানার্ত যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুমূর্ষু মানুষের আর্তনাদ ওপেনহাইমারের বুকে আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগল।

অশান্ত বিচলিত বিজ্ঞানী ছুটে গেলেন রাষ্ট্রপতির কাছে। ততদিনে রাষ্ট্রপতির পদে এসেছেন দুঁদে রাজনীতিক আইজেনহাওয়ার।

ওপেনহাইমার বললেন, পরমাণু বোমা তৈরির কলাকৌশল সরকারের হাতে এসেছে। কিন্তু তাকে ব্যবহারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যে কোনও মার্কিন নাগরিকের জানার অধিকার আছে। পরমাণু শক্তিকে এর পরে কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা সরকারকে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। কেননা এর যথেচ্ছ ব্যবহার বিশ্বের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক।

বিবেচক আইজেনহাওয়ার বিজ্ঞানীর উদ্বেগের কারণ অনুধাবন করতে

পারলেন। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার বিষয়টিও মাথায় রেখেই তিনি আশ্বস্ত করলেন ওপেনহাইমারকে। বিশ্বমানবতার প্রশ্নে আইজেনহাওয়ারের অধীন সরকার পরমাণু শক্তি সংগ্রহের বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট সংযত হলেন।

বিবেক-দহনে ক্লিষ্ট ওপেনহাইমারের চেষ্টাতেই একসময় মানবকল্যাণের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণুশক্তির ব্যবহারে উদ্যোগী হয়।

বিজ্ঞানসাধনার পুরোধাপুরুষ মানবতাবাদী ওপেনহাইমার ছিলেন সুন্দরের সাধক। মানুষের পৃথিবীকে আরও সুন্দব করার স্বপ্নেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন বিজ্ঞানসাধনায়। তাই বরাবর পৃথিবীর মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন পরমাণু মারণাস্ত্র সম্পর্কে—মানুষের হীন বুদ্ধি যেন গ্রাস না করে জগতের মঙ্গল প্রচেষ্টাকে।

পরমাণু বোমার কুশলী শিল্পী-কারিগর ওপেনহাইমারকে ১৯৩৯ খ্রিঃ মার্কিন সরকার সম্মানিত করে এনরিকো ফের্মি পুরস্কারে। রাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনেডি নিজে এই পুরস্কার তুলে দেন ওপেনহাইমারের হাতে।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ছিলেন প্রিন্সটন শহরের ইনসটিটিউট ফর অ্যাডভ্যান্স স্টাডি সেন্টারের সর্বময় অধিকর্তা। তাঁর পরে ১৯৪৭ খ্রিঃ এই পদে বৃত হলেন ওপেনহাইমার। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বহন করে গেছেন তিনি।

১৯৪৭ খ্রিঃ তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

রাজচন্দ্র বসু

ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র রাজচন্দ্র বসু সারা পৃথিবীকে চমৎকৃত করেছিলেন গণিত ও পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ শহরে ১৯০১ খ্রিঃ ১৯শে জুন জন্ম হয় রাজচন্দ্রের। তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসক। পুত্রের জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁকে কর্মসূত্রে চলে আসতে হয় রোটাক শহরে। রাজচন্দ্রের ছেলেবেলা এখানেই অতিবাহিত হয়।

স্বচ্ছল পরিবারের প্রথম সন্তান রাজচন্দ্র। তাই শৈশবকালটা ভালভাবেই কেটেছিল তাঁর।

পড়াশুনায় গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। ছিল অসাধারণ মেধা। তাই স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

পড়াশুনার বিষয়ের মধ্যে অঙ্কের প্রতিই সবচেয়ে ঝোঁক রাজচন্দ্রের। তাই বলে অন্য বিষয়ে যে পিছিয়ে ছিলেন তা নয়। ক্লাসের সব পরীক্ষাতেই সব বিষয়ে সব সেরা নম্বর থাকে তাঁর।

ভবিষ্যতে এই ছেলেই যে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে এ বিষয়ে শিক্ষকমশাইদের কারো সংশয় ছিল না।

একবার স্কুলের পরীক্ষায় সব বিষয়ে ক্লাসে সর্বোচ্চ নম্বর থাকলেও ভূগোলে হলেন দ্বিতীয়। মর্মাহত হন রাজচন্দ্র। চিন্তিত হন রাজচন্দ্রের পিতা। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি দিনকতক রোগী দেখা বন্ধ করলেন। ছেলেকে নিয়ে বসলেন ভূগোল শেখাতে।

গল্পে গল্পে দিন কয়েকের মধ্যেই ভূগোলের গোটা বইটির সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন ছেলের। সেবার বার্ষিক পরীক্ষায় দেখা গেল রাজচন্দ্র ভূগোলে প্রথম স্থানটি ফিরে পেয়েছেন।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করলেন রাজচন্দ্র। যথানিয়মে বৃত্তি লাভ করলেন। ভর্তি হলেন বি. এ. ক্লাসে।

ছেলেবেলা থেকে অঙ্কের সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল বেশি। সেই বিশুদ্ধ অঙ্ক নিয়ে চলল কলেজের পাঠও। অঙ্কে চমকপ্রদ নম্বর পেয়ে বি. এ. পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন।

এই সময়টা বাস্তবের কঠোর আঘাতে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে রাজচন্দ্রকে। প্রবল মনোবল আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে সমানে মুখোমুখি লড়াই করে গেছেন তিনি।

বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হবার আগেই আকস্মিক রোগ ভোগে কিছুদিনের ব্যবধানে বাবা মা দুজনেই গত হয়েছিলেন। নাবালক একটি ভাই ও দুটি বোনের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব এর পর থেকে বহন করতে হয়েছে তাঁকেই। সংসারের বড় সন্তান যে তিনি।

পিতা সঞ্চয় যা রেখে গিয়েছিলেন অল্পদিনেই তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। একদিকে ছোট ভাইবোনদের দায়িত্ব অন্যদিকে নিজের কলেজের পড়াশুনা। কাজেই বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে প্রাইভেট টিউশান। ভাইবোনদের যাতে কোনদিকে অসুবিধা না হয় সেদিকে সদা সতর্ক নজর।

নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে কেবল কলেজের পড়াটা ঠিক রেখেছেন। আর বাকি সময়টা কাটিয়েছেন ছাত্র পড়িয়ে।

এভাবেই কোনমতে তিনি বড় করে তুলেছেন ভাইবোনদের। নিজে পাস করলেন বি. এ. পরীক্ষা।

১৯২৫ খ্রিঃ বি. এ. পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে রাজচন্দ্র চলে এলেন দিল্লিতে। সেখানে নাম লেখালেন এম. এ. ক্লাসে।

এখানে বিশুদ্ধ গণিত পড়াবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। অথচ বিশুদ্ধ গণিতই তাঁর প্রিয় বিষয়—প্রাণবায়ুর মতোই। অগত্যা ফলিত গণিতের ক্লাসই করতে লাগলেন।

মনে অতৃপ্তি। ভবিষ্যতের স্বপ্নও তিনি দেখতেন বিশুদ্ধ গণিত নিয়েই। তবুও পরীক্ষায় বরাবরের মত ভাল ফলই করলেন। কিন্তু মনে শান্তি নেই—বিশুদ্ধ গণিতের উচ্চতর পাঠ নিতে পারছেন না বলে।

আকস্মিক ভাবেই এসময়ে ইচ্ছাপূরণের একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন তিনি।

দিল্লিতে রাজচন্দ্র অঙ্ক শেখাতেন বিশিষ্ট ধনী শেঠ কেদারনাথ গোয়েঙ্কার ভাইকে। একদিন কেদারনাথ ডেকে পাঠালেন রাজচন্দ্রকে। দেখা করতেই তিনি জানালেন, রাজচন্দ্র যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ গণিতে এম. এ. পড়াতে চান তাহলে তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন।

কেদারনাথের এই প্রস্তাবে যেন হাতে চাঁদ পেলেন রাজচন্দ্র। মনস্থির করতে দ্বিধা হল না। কদিন পরেই তিনি কেদারনাথের সঙ্গে কলকাতা চলে এলেন। বিশুদ্ধ গণিতের উচ্চশিক্ষায় আকাঙ্ক্ষা ছিল রাজচন্দ্রের। এবারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হল সেই পর্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার পাশাপাশি কলকাতায় প্রথমে কিছুকাল প্রাইভেট টিউশনও করতে হয়েছিল রাজচন্দ্রকে। ভাইবোনদের জন্য বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হত সেই টিউশনের উপার্জন থেকে।

সৌভাগ্যবশতঃ আর্থিক দুর্ভাবনার অনেকটাই লাঘব হল আকস্মিক একটা সুযোগ পেয়ে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-গবেষক শ্যামদাস মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় হল রাজচন্দ্রের। তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে গণিত বিজ্ঞানী শ্যামদাস মুগ্ধ হলেন। আর্থিক অনটনের পাকে পড়ে এমন প্রতিভার যাতে অপচয় না হয়, সেই জন্য তিনি রাজচন্দ্রকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। একটি ঘর ছেড়ে দিলেন তাঁর থাকার জন্য। নিজের ছিল অঙ্কের এক বিশাল লাইব্রেরী। রাজচন্দ্রকে অনুমতি দিলেন সেই লাইব্রেরী ব্যবহারের।

শ্যামদাসের সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে রাজচন্দ্রের জীবনের মোড় পরিবর্তিত হয়। তিনি নিজের বিশুদ্ধ গণিতের গবেষণায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান।

১৯২৭ খ্রিঃ বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণী পেয়ে এম. এ পাস করলেন রাজচন্দ্র। এভাবে পড়াশুনার একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। তিনি চাকরির সন্ধানে উঠে পড়ে লাগলেন।

কিন্তু কলকাতা শহরে চষে ফেলেও একটা সামান্য কেবানির চাকরিও জোটাতে পারলেন না তিনি। যেখানেই যান সেখানেই শুনতে হয়, তিনি চাকরির পদের তুলনায় অতিরিক্ত যোগ্য।

অগত্যা সেই টিউশনির একঘেয়ে জীবনেই বহাল থাকতে হয়। নিজের এবং পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন উপেক্ষা তো করতে পারেন না।

সমস্ত দিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই। পৃথিবীর বিশিষ্ট গণিতবিদদের অবদান তাঁর মন জুড়ে রয়েছে। সারাক্ষণ একই কথা কেবল মনে উদয় হয়, তিনিও কি বিশুদ্ধ গণিতে কোন অবদান রেখে যেতে পারেন না?

এসব কথা যত ভাবেন ততই আরও গভীর হয় তাঁর গবেষণা। এই সময় রাজচন্দ্র জ্যামিতি নিয়েই চিন্তা ভাবনা করেছেন বেশি।

এই ভাবেই যেতে থাকে সময়। একসময় কলকাতার আশুতোষ কলেজে অঙ্কের অধ্যাপকের কাজও জুটে যায়। কিন্তু খুব বেশি দিন সেখানে কাজ করতে হয়নি।

ততদিনে সৌভাগ্যলক্ষ্মী মুখ তুলে তাকিয়েছেন। তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান বিশুদ্ধগণিতের গবেষণার সব চেয়ে বড় সুযোগ পেয়ে যান তিনি।

সেই সময় সবে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউট। ভুবন বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খুঁজে খুঁজে তিনি সেখানে নিয়ে আসছেন প্রতিভাবান পরিসংখ্যান বিজ্ঞানীদের। তাঁর তত্ত্বাবধানেই ঘটছে তাঁদের প্রতিষ্ঠা এবং নবপ্রতিষ্ঠিত পরিসংখ্যান ভবনের সমৃদ্ধি।

একসময়ে তাঁর নজর পড়ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত রাজচন্দ্রের প্রতি। গুণগ্রাহী প্রশান্তচন্দ্র সাদরে তাঁকে আহ্বান জানালেন।

অন্য যে কেউ প্রশান্তচন্দ্রের আহ্বানে ইতস্ততঃ না করে পরিসংখ্যান ভবনের চাকরিতে যোগ দিত, তাতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু রাজচন্দ্র তা পারলেন না। অথচ এমন একটি চাকরি পাওয়ার অর্থ তাঁর কাছে তখন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো।

রাজচন্দ্রের ইতস্ততঃ করার কারণ হল, তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ গণিত ও জ্যামিতি-গবেষক। পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োজন থাকলেও জ্যামিতির

সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া পরিসংখ্যানের কোন পাঠই তাঁর ছিল না। বলতে গেলে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এই সাত-পাঁচ ভেবে তিনি পিছিয়ে ছিলেন। মহলানবিশ জানতে পেরে রাজচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়ে বলেন তাঁর ভয় অমূলক। পরিসংখ্যানের প্রাথমিক ধারণা যেটুকু দরকার তিনিই তাঁকে শেখাবেন।

আশ্বস্ত হয়ে রাজচন্দ্র এবারে মুক্ত মন নিয়ে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউটের কাজে যোগদান করলেন।

এখানে ঢুকে এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন রাজচন্দ্র। পরিসংখ্যানের বইপত্র যত নাড়াচাড়া করেন ততই তার মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকেন। প্রশান্তচন্দ্রের ক্লাস করে তাঁর আগ্রহ ও মনোযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে চলতে থাকে পড়াশুনা, প্রশান্তচন্দ্রের ক্লাস করা আর অন্য দিকে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেন নিজে। আপ্রাণ চেষ্টায় পরিসংখ্যানের সমস্ত বিষয়ই তাদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অধ্যাপক হিসাবেও ছাত্রমহলে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৪০ খ্রিঃ ভারতীয় পরিসংখ্যান ভবনের কাজ ছেড়ে রাজচন্দ্র যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে এতদিনে চালু হয়েছে পরিসংখ্যানের নতুন বিভাগ। রাজচন্দ্র হলেন সেই নতুন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হল। নতুন ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে দেশের সর্বস্তরেই তৎপরতা শুরু হল। বিজ্ঞানীরা যখন উন্নয়নমূলক নতুন নতুন প্রকল্প রচনায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন সেই সময় আকস্মিকভাবেই দেশ ত্যাগ করলেন রাজচন্দ্র।

১৯৪৭ খ্রিঃ তখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ বছর, রাজচন্দ্র পাড়ি জমালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

তাঁর এই দেশত্যাগকে অনেকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করলেও প্রকৃত সত্য হল, বিশুদ্ধ গণিতের গবেষণায় তিনি এমনই বিভোর হয়ে পড়েছিলেন যে গবেষণার বৃহত্তর সুযোগের সন্ধানে তাঁকে আমেরিকা যাত্রা করতে হয়েছিল।

যেই সুযোগ দেশে ছিল না, অদূর ভবিষ্যতে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল সুদূর পরাহত, তার সন্ধানেই জ্ঞানভিক্ষু রাজচন্দ্রকে বাধ্য হয়েই দেশ ছেড়ে যেতে হয়েছিল।

প্রার্থিত সুযোগ তিনি পেয়েওছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরিসংখ্যান বিভাগে প্রধান অধ্যাপকের পদে তাঁকে নিয়োগ করা হল।

এখানে একান্ত এবং বৃহত্তর সুযোগ সুবিধার মধ্যে তাঁর গণিতের গবেষণা

অল্প সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গেল। পৃথিবীর তাবড় গণিতবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তাঁর প্রতি।

নর্থ ক্যারোলিনায় কিছুকাল চাকরি করার পর রাজচন্দ্র চলে এলেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে। একসময়ে তিনি পরিদর্শক প্রধান অধ্যাপক রূপে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও কাজ করেছেন।

১৯৭৬ খ্রিঃ গণিত গবেষণায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি তিনি পান আমেরিকা থেকেই। তিনি মার্কিন বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন।

বিশ্বগণিতের ইতিহাসে রাজচন্দ্রের দুটি জগৎ বিখ্যাত আবিষ্কার হল (১) গত শতকের সুখ্যাত সুইস গণিতবিজ্ঞানী লিওনার্ড ইউলারের গাণিতিক কনজেকচার বা অনুমানের ভুল সংশোধন এবং (২) টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত।

এছাড়া জ্যামিতির ক্ষেত্রেও তাঁর বহুমাত্রিক জ্যামিতির তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই তত্ত্ব বোস-ব্লাৎকে তত্ত্ব নামে বিখ্যাত।

বিখ্যাত সুইস গণিতবিদ লিওনার্ড ইউলার একটি বর্গ নিয়ে গাণিতিক অনুমান নির্মাণ করেছিলেন। তাকে বলা হত ইউলারের ম্যাজিক বর্গ। এই বর্গের লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি দুদিকেই ঘরের সংখ্যা সমান। এই ঘরগুলোতে ল্যাটিন, গ্রিক বা যে কোনও ভাষার অক্ষর যদি মাত্র একবার করে বসানো যায় তাহলে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি দুদিক থেকেই তা সমান হবে। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যদি ইউলারের নিয়ম অনুযায়ী বর্গের ঘরগুলোতে সাজানো যায় তবে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি উভয়দিকেই সংখ্যার মোট যোগফল দাঁড়ায় ১৫।

এই বর্গ যদি ৩×৩ শ্রেণীতে সাজানো যায় তাহলে সম্ভাব্য ঘর সংখ্যা হয় (৩) ৩×৩=(৩)৯=১৯৬৮৩। বর্গটি তৈরি করার সময় ইউলার গ্রিক ও ল্যাটিন অক্ষর বসিয়েছিলেন। এই কারণে এই বর্গটির নাম হয় গ্রিক-ল্যাটিন বর্গ। একসময়ে ইউলারকে দেওয়া হয়েছিল একটি সমস্যা—বিভিন্ন পদের ছত্রিশ জন সামরিক অফিসার নিয়ে ছয়টি বিভিন্ন রেজিমেন্টে বর্গাকারে সাজাতে হবে।

ইউলার কিছুতেই এই সমস্যার জট খুলতে না পারলেও তিনি বলেন এই ধরনের বর্গ তৈরি করতে হলে সংখ্যাগুলো হওয়া দরকার বিজোড় নয়তো দ্বি-জোড়। আর জোড় সংখ্যাটি এমন হতে হবে যা সব সময়েই ৪ সংখ্যাটি দ্বারা বিভাজ্য হবে। অর্থাৎ সংখ্যাগুলো হতে হবে ৪, ৮, ১২, ১৬ .... ইত্যাদি।

ইউলার জানান "I do not hesitate to conclude that it is impossible to produce any complete Graceatain square of 6×6=36 cells and the same impossibility extinds to the cases of squares of 10, 14 and in general to all single even number of rows and columns."

রাজচন্দ্র ও তাঁর দুই ছাত্র শ্রীখণ্ডি ও পার্কার ইউলারের এই গাণিতিক অনুমানটিকে ভুল প্রমাণ করেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রুপ থিয়োরি বা বিন্যাসতত্ত্ব ব্যবহার করে প্রমাণ করেন ২×২ ধরনের বর্গ কখনো তৈরি হয় না। তথাকথিত জাদু বর্গ তৈরি শুরু হয় ৩ সংখ্যা থেকে এবং সেক্ষেত্রে ৩×৩ হারে এই বর্গ ৩৬২৮৮২ ভাবে তৈরি করা সম্ভব হবে।

রাজচন্দ্রের কৃতিত্ব কেবল এখানেই নয়। ইউলারের জাদুবর্গকে তিনি বৃহত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগের পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেন এবং তাঁর দ্বারা জাদুবর্গের সংশোধিত রূপটি ফলিত জীববিজ্ঞান তথা জেনেটিক্সে, কৃষিবিজ্ঞানে, চিকিৎসাবিদ্যায়, জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার নানা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে থাকে।

রাজচন্দ্রের অপর বিশ্বখ্যাত গবেষণাটি টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত।

ইতালির আবিষ্কারক মার্কনির আবিষ্কার সংবাদ প্রেরণের টেলিব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করেছিলেন এম. এফ. বি মর্স নামে এক বিজ্ঞানী। মর্স প্রবর্তিত Morse code বা সঙ্কেত পদ্ধতি আধুনিক টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাতে নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে ডট (.) বা ড্যাশ (—) চিহ্ন দুটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায়শই এই দুটি চিহ্ন নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ড্যাশ (—) আর ডট (.) পাল্টাপাল্টি হয়ে গিয়ে তারবার্তায় গোলমাল ঘটিয়ে দেয়। দেখা যায় সাধারণতঃ তারবার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রতি সেকেণ্ডে ডট (.) বা ড্যাশ (—)-এর ব্যবহার হয় ১৫০০ থেকে ২০০০ বার। কিন্তু প্রতি এক লক্ষ ড্যাশ (—) বা ডট (.) একই হারে বিভ্রাট সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রতি মিনিটে একটি করে।

রাজচন্দ্র বসু তাঁর পরিকল্পিত জ্যামিতি ও বিন্যাসতত্ত্বের সাহায্যে এমন এক পদ্ধতি গড়েন যার ফলে টেলিযোগাযোগের সঙ্কেত পদ্ধতিগত কোনও বিভ্রাটই আর রইল না।

তবে কেবল একটি বিভ্রাট ঘটবে ৩০০ বছর পরে।

রাজচন্দ্রকৃত মর্স-কোড-সংশোধন ম্যাসাচুসেটস ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির লিঙ্কন ল্যাবরেটরিতে সর্বপ্রথম কাজে লাগান হয় এবং অসাধারণ সাফল্য পাওয়া যায়।

টেলিযোগাযোগের সঙ্কেত পদ্ধতির মর্স কোড-এর বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করে রাজচন্দ্র জগৎ জোড়া পরিচিতি লাভ করেন।

জ্যামিতির ওপর গবেষণায় রাজচন্দ্র সুখ্যাত হন। তাঁর মাল্টি-ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি বা বহুমাত্রিক জ্যামিতিক তত্ত্বটি বোস-ব্লাৎকে তত্ত্ব নামে পরিচিত এবং গণিতবিজ্ঞানীদের নবতর সত্যসন্ধানের সহায়ক।

রাজচন্দ্রের গণিত গবেষণার স্বীকৃতি জানিয়ে ১৯৪৭ খ্রিঃ মার্কিন বিজ্ঞান একাডেমী তাঁকে মাননীয় সদস্য পদে নির্বাচিত করেন।

প্রাচীন ভারতের আর্যভট্টের কাল থেকে ভারতীয় গণিত গবেষণার যে ধারা প্রবহমান রাজচন্দ্রের মনীষা তার বিস্ময়কর আধুনিক রূপ বিশ্ববাসীর দরবারে উপস্থাপন করে স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

জেমস স্যাডউইক

বর্তমান পারমাণবিক যুগের প্রবর্তন হয়েছিল যে কয়জন জগৎ বিখ্যাত মনীষী বিজ্ঞানীর গবেষণার আলোকে তাঁদের মধ্যে জেমস স্যাডউইকের অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। তাঁর আবিষ্কৃত নিউট্রন কণা মানুষকে দিয়েছে অফুরন্ত শক্তি-ভান্ডারের সন্ধান। পরমাণু গবেষণার ইতিহাসে ঘটিয়েছে পট পরিবর্তন।

প্রাচীন ভারতীয় মনীষী-বিজ্ঞানী কণাদ পদার্থের সূক্ষ্মতম ও অবিভাজ্য যে কণিকার নাম দিয়েছিলেন পরমাণু, প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী ডেমোক্রিটাস তারই নাম দিয়েছিলেন অ্যাটোমস।

পরবর্তীকালে, আঠারো শতকে ইংরাজ বিজ্ঞানী জন ডালটন ডেমোক্রিটাসের অ্যাটোমসকে, অ্যাটম শব্দে রূপান্তরিত করেন।

এভাবেই যুগের সোপান বেয়ে বিশ্ববিজ্ঞান ইতিহাসে পরমাণু ভাবনার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে।

বিজ্ঞানী ডালটনও স্বীকার করেছিলেন, অ্যাটমই হল পদার্থের সূক্ষ্মতম এবং সর্বশেষ অবিভাজ্য অংশ। এই সূক্ষ্মতম কণায় পদার্থের সমগ্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে।

এই অবিভাজ্য কণার সূত্র ধরেই পরমাণু সংক্রান্ত বিজ্ঞান গবেষণা ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে।

এরপর উনিশ শতকের শেষ পাদে জার্মান বিজ্ঞানী রন্টজেনের এক্স-রশ্মি আবিষ্কারের সূত্র ধরে বিজ্ঞানী জে. জে. টমসন পরমাণুর মধ্যে আবিষ্কার করলেন ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা ইলেকট্রনকে।

উদঘাটিত হল এক মহাসত্য, পরমাণু অবিভাজ্য নয়, তার মধ্যে রয়েছে ধন-বিদ্যুৎগর্ভরূপী কেন্দ্রক। আর এই কেন্দ্রককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে ইলেকট্রন-কণা।

জানা গেল, যে কোনও বিদ্যুৎ বিহীন স্বাভাবিক পারমাণবিক স্তরেই রয়েছে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন কণা।

এর পরেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিল, এই ইলেকট্রন ও প্রোটন নামের পারমাণবিক কণা ছাড়াও পরমাণুর মধ্যে অপর কোন কণার অস্তিত্ব সম্ভব কিনা?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানালেন পদার্থবিজ্ঞানী জেমস স্যাডউইক। বিজ্ঞানের এই নীরব সাধক সাধারণ এক ল্যাবরেটরিতে বসে পরমাণুর মধ্যে আবিষ্কার করলেন তৃতীয় একটি পারমাণবিক কণা। যার নাম দেওয়া হল নিউট্রন।

পরমাণু গবেষণার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে ইংলন্ডের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। মহাবিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতেই প্রথম পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আবিষ্কার করেছিলেন। পরে তাঁরই সুযোগ্য প্রতিভাবান ছাত্র মোসেলে গবেষণায় প্রমাণ করেন, রাসায়নিক মৌলের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ পারমাণবিক সংখ্যার ওপরে নির্ভরশীল। আর এই পারমাণবিক সংখ্যা হল প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত ধনাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত কণা বা প্রোটনের সংখ্যা।

এই ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৯০৯ খ্রিঃ স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন স্যাডউইক। আর তাঁর শিক্ষক ছিলেন রাদারফোর্ড। তখন স্যাডউইকের বয়স মাত্র আঠারো।

রাদারফোর্ডের ক্লাস করতে করতেই বিজ্ঞানী হবার স্বপ্নে বিভোর হন তিনি। সেই স্বপ্নের তাড়নায় ১৯১০ খ্রিঃ পদার্থবিদ্যার স্নাতক শ্রেণীর পড়া শেষ করেই রাদারফোর্ডের ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজে যুক্ত হলেন।

আর এই জগতবিখ্যাত ল্যাবরেটরিতে গবেষণার ফলেই নতুন করে লেখা হল পরমাণু গবেষণার ইতিহাস।

বিজ্ঞানী জেমস স্যাডউইকের জন্ম ১৮৯১ খ্রিঃ ২০শে অক্টোবর ইংলন্ডের বিখ্যাত শিল্প শহর ম্যাঞ্চেস্টারে। তাঁর বাবার নাম জে. জে. স্যাডউইক।

তাঁর পড়াশুনার শুরু স্থানীয় স্কুলে এবং এখানকার হাইস্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন ম্যাঞ্চেস্টারের ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেই তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন স্বয়ং রাদারফোর্ডকে।

স্নাতক হবার পর তাঁরই সহকারী হিসেবে যোগ দিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে।

১৯১১ খ্রিঃ তিনি যখন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভ করলেন, ততদিনে পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে দুটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে গেছে।

তার একটি হল, রাদারফোর্ডের পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব বিশ্ববিজ্ঞানের দরবারে উপস্থাপন। দ্বিতীয়টি হল, রাদারফোর্ডেরই ছাত্র ও সহকর্মী পদার্থবিজ্ঞানী নীলস বোর রাদারফোর্ডের পরমাণু তত্ত্ব ও প্লাঙ্কের সূত্র অনুসরণ করে পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তর ও ইলেকট্রনের বিন্যাসকে মডেলের সাহায্যে বিশ্ববিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষক দুজনের নামই সমান মর্যাদায় উচ্চারিত হয়ে চলেছে।

উৎসাহিত স্যাডউইক সেই সময়ই তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ পথটি স্থির করে ফেললেন। তিনি সংকল্প করলেন, পরমাণুর গবেষণাতেই নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

১৯১৩ খ্রিঃ। সেই সময় জার্মানীর বিখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী হানস গাইগার গবেষণা করছিলেন কার্লটেনবার্গ শহরে ফিজিকালিক টেকনিক রাইকসানসল্ট ল্যাবরেটরিতে।

সৌভাগ্যবশতঃ স্যাডউইক এই বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়ে গেলেন।

ঈর্ষণীয় এই সুযোগের সদব্যবহার করতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করলেন না স্যাডউইক। অবিলম্বে তিনি ল্যাবরেটরির কাজে যোগদান করলেন।

ঠিক সেই সময়েই ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ দুর্যোগের ঘনকালো মেঘে ঘোলাটে হয়ে ওঠে।

স্যাডউইক কাজে যোগ দেবার কিছু দিনের মধ্যেই জার্মানীর কাইজার বাহিনী ইউরোপের নানা দেশের সঙ্গে বিধ্বংসী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় রক্তক্ষয়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

স্যাডউইক জাতিতে খাঁটি ইংরাজ। জার্মানীর কাছে তিনি শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি। কাজেই ল্যাবরেটরি থেকে তাঁর আবাস পরিবর্তিত হল কুখ্যাত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

স্যাডউইকের সমস্ত অন্তর জুড়ে তখন পরমাণুর চিন্তার অনুরণন। তাই দুঃসহ অন্তরীণ অবস্থাতেও ক্যাম্পে বসে চলতে থাকে তাঁর পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার কাজ।

ভয়াবহ কনসেন্ট্রেশন শিবিরে কাটাতে হল চারটি বছর। ১৯১৮ খ্রিঃ জার্মানীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হল। ভার্সাইয়ের চুক্তির ফলে জার্মানী হয়ে পড়ল কোণঠাসা। তাই যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা হয়ে দাঁড়াল ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির মতো।

অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে স্যাডউইক স্বদেশেই ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন। ১৯১৯ খ্রিঃ ইংলন্ডে ফিরে এলেন।

স্বয়ং রাদারফোর্ড সেই সময় পুরনো ম্যাঞ্চেস্টার ল্যাবে বসেই পরমাণু গবেষণার নতুন যুগের সূচনা করেছেন। কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক মৌল তৈরি করেছেন।

তিনি প্রমাণ করেছেন, তীব্রগতি আলফা কণাকে যদি নাইট্রোজেন পরমাণুর ওপর প্রয়োগ করা যায় তাহলে নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে গঠিত হয় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিউক্লিয়াস।

স্যাডউইক ইংলন্ডে পৌঁছানোর কিছুকাল আগেই রাদারফোর্ড বিখ্যাত ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরির প্রায়োগিক পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

স্যাডউইক ফিরে এসেছেন জানতে পেরে তিনি তড়িঘড়ি ডেকে পাঠিয়ে ক্যাভেন্ডিসে বহাল করলেন তাঁকে।

এখানে কর্মরত অবস্থাতেই দু'বছরের মাথায় ১৯২১ খ্রিঃ ডক্টরেট হলেন স্যাডউইক। তখন সবে তিনি তেইশ বছরে পা দিয়েছেন।

একই বছরে কেমব্রিজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনার কাজ শুরু করলেন। এখানে দু'বছর কাজ করবার পরেই ১৯২৩ খ্রিঃ ডাক এলো ক্যাভেন্ডিস থেকে। সেখানে তেজস্ক্রিয় গবেষণা বিভাগের সহ-অধিকর্তার পদে যোগ দিলেন স্যাডউইক।

যাকে বলে ট্রান্সমিউটেশন অব এলিমেন্টস অর্থাৎ রাসায়নিক মৌলের অবস্থান্তর প্রাপ্তি রাদারফোর্ড তা সম্পন্ন করেছিলেন আলফা কণার আঘাতে এক মৌলের পরমাণুকে অন্য মৌলের পরমাণুতে রূপদান করে।

প্রাক্তন প্রিয় ছাত্র স্যাডউইককে সহকারী রূপে পাওয়ায় তাঁর এই কাজে গতি বৃদ্ধি হল।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ও পরমাণুর গঠনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানার উদ্দেশ্যেই রাদারফোর্ড ক্রমাগত এই পরীক্ষা চালিয়ে চলেছিলেন। এই সময়েই আকস্মিক একটি ঘটনার ফলে স্যাডউইকের গবেষণা অভাবিতভাবে নতুন মাত্রা পেয়ে গেল।

বাল্টিমোরের হাওয়ার্ড কেলি হাসপাতাল থেকে স্যাডউইকের নামে এক ছোট্ট টিউবে কিছু পরিমাণ রেডিয়াম এসে পৌঁছল। আর এই রেডিয়ামের সাহায্যেই তিনি তড়িৎ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ভোল্টেজের আলফা কণা তৈরি করে ফেললেন। তারপর ওই আলফা কণাকে বেরিলিয়াম ইত্যাদি হালকা রাসায়নিক মৌলের ওপর আঘাত করে প্রচন্ড শক্তি স্ফূরিত রশ্মির নিঃসরণ ঘটাতে সক্ষম

হলেন। কিন্তু ওই রশ্মি গামা রশ্মি কিনা সেই সংশয়ে আন্দোলিত হতে লাগল তাঁর মন। কারণ আলফা কণার আঘাতে বেরিলিয়াম কণার শরীর থেকে যে রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা বিশেষ পদার্থ দ্বারা শোষিত হচ্ছে। অথচ গামা রশ্মি কখনও কোনও পদার্থ দ্বারা শোষিত হতে পারে না।

স্যাডউইক পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে চললেন। একসময় রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হয়। তিনি বুঝতে পারলেন, ওটা নামেই রশ্মি; আসলে তা হল অজানা কণার স্রোত।

তিনি আরও লক্ষ্য করলেন ওই কণার পারমাণবিক ভর প্রোটনের অনুরূপ। আবার ওই কণাটির কোনও তড়িৎলক্ষণও নেই—সম্পূর্ণভাবে তড়িৎহীন। তাই এই কণা গাইগার কাউন্টারে কোন বিক্ষেপ ঘটাচ্ছে না। তড়িৎ নিরপেক্ষ বা নিউট্রাল বলে এই কণাটির নাম রাখা হল নিউট্রন।

এই ভাবেই স্যাডউইকের হাতে তৃতীয় পারমাণবিক কণা আবিষ্কৃত হল। সময়টা ১৯৩২ খ্রিঃ।

আর এই আবিষ্কারের সূত্রেই স্যাডউইককে ১৯৩৫ খ্রিঃ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হল।

পরমাণু গবেষণায় নিউট্রনের আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নিউট্রন ছাড়াও পরমাণুর যে অপর দুই পারমাণবিক কণা ইলেকট্রন ও প্রোটন; তাদের রয়েছে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎ প্রকাশ। কিন্তু নিউট্রনের তা নেই।

ফলে পারমাণবিক গবেষণায় নিউট্রনের সম্ভাবনা আরও বেশি ব্যাপক। সোজা কথায়, নিউট্রনকে দিয়ে অতি সহজেই পরমাণুর নিউক্লিয়াস অঞ্চলকে সরাসরি আঘাত করা চলে।

এই ভাবেই মানুষের পরমাণু শক্তি সাধনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল নিউট্রন আবিষ্কারের মাধ্যমে। পরমাণু বোমা তৈরির প্রথম সোপানটি তৈরি হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে পরমাণুবিজ্ঞানীরা পরমাণু সংক্রান্ত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতেন যেমন, পারমাণবিক ভর, পারমাণবিক ওজনের দশমিক হিসাব ইত্যাদি, নিউট্রন সব জটিল সমস্যার সমাধান করে দিল।

দেখতে দেখতে স্যাডউইকের গবেষণা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তার ওপর নোবেল প্রাপ্তি তাঁকে দিল জগৎজোড়া খ্যাতি।

রাদারফোর্ড প্রিয় ছাত্রের এই কৃতিত্বে পরিতৃপ্ত হলেন। তাঁর হাতেই যে তৈরি হয়েছিল স্যাডউইকের ভবিষ্যৎ।

স্যাডউইকের নোবেল প্রাপ্তির দুবছর পরেই ১৯৩৭ খ্রিঃ রাদারফোর্ডের মৃত্যু হল। স্যাডউইক তারপর কেমব্রিজ থেকে চলে এলেন লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। যোগ দিলেন লায়ন জনস অধ্যাপক পদে।

কয়েকটি বছর নির্বিঘ্নেই কাটল। ক্রমে উপস্থিত হল সর্বনাশা ১৯৪১ খ্রিঃ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদদাপে কেঁপে উঠল ইউরোপের আকাশ বাতাস। নাৎসি জার্মানীর বিমান ঘন ঘন হানা দিতে শুরু করল ইংলন্ডের আকাশে। মৃত্যুর আশঙ্কায় কম্পমান সমস্ত মানুষ।

এই সময়েই ব্রিটিশ সরকার গোপনে পরমাণু বোমা নির্মাণের সংকল্প নিল। শুরু হয়ে গেল বিজ্ঞানীদের মধ্যে জোর তৎপরতা।

ব্রিটেন এই সময় পরমাণু বোমা তৈরির যে প্রকল্পটি গ্রহণ করে তা টিউব অ্যালয় নামে পরিচিত।

স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকার প্রকল্প রূপায়ণের কাজে সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন স্যাডউইককে। টিউব অ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল তাঁর হাতে।

এর দুবছরের মধ্যেই ১৯৪৩ খ্রিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও কানাডার মধ্যে পরমাণু বোমা সংক্রান্ত এক গোপন চুক্তি সম্পন্ন হল। গঠিত হল ত্রিপক্ষীয় পরমাণু বোমা প্রকল্প। এই প্রকল্পে স্যাডউইক হলেন ব্রিটেনের পরমাণু বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা।

১৯৩২ খ্রিঃ স্যাডউইক নিউট্রন কণা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কার মানুষের পরমাণু শক্তিসাধনায় নতুন জোয়ার আনবে এবং তার সমস্ত কিছু সংহত ও ব্যয়িত হবে মানবকল্যাণে, সেদিন এই ভাবনাই ছিল বিজ্ঞানী স্যাডউইকের সাধনার পরম তৃপ্তি ও প্রাপ্তি।

কিন্তু অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস, নিউট্রন আবিষ্কারের মাত্র তেরো বছর পরেই ১৯৪৫ খ্রিঃ এই নিউট্রনকে নিয়েই তৈরি হয়ে গেল বিধ্বংসী পরমাণু বোমা। এবং অনতিবিলম্বেই তা নিক্ষিপ্ত হল জার্মানীর জনবহুল দুই শহর হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হলেও পরমাণু বোমা তৈরির চূড়ান্ত কাজ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে নিউ মেক্সিকো রাজ্যের লস আলামাস অঞ্চলে জগদ্বিখ্যাত মার্কিন পরমাণুবিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমারের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমা। ১৯৪৫ খ্রিঃ মাঝামাঝি পর্যন্ত টানা চার বছরে সম্পূর্ণ হয়েছিল কাজটি।

১৯৪৫ খ্রিঃ ৬ আগস্ট হিরোসিমায় ফেলা হল লিটল বয় নামের পরমাণু বোমাটি। দুদিন পরেই ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে ফেলা হয় দ্বিতীয় বোমাটি। তার নাম দেওয়া হয়েছিল ফ্যাট ম্যান।

লক্ষ মানুষের মরণ-আর্তনাদে বিদীর্ণ হল আকাশ বাতাস। প্রবল আতঙ্কে

শিহরিত হল বিশ্বমানবের অন্তরসত্তা। পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে ঘৃণা ও ধিক্কার উচ্চারিত হল আমেরিকার এই পৈশাচিক আচরণের বিরুদ্ধে।

আর লিভারপুলের এক নির্জন ঘরে অসহনীয় বেদনায় বিদীর্ণ হতে থাকে স্যাডউইকের হৃদয়। তাঁর মানবকল্যাণমুখী আবিষ্কারের এমন ভয়াবহ পরিণাম যে তাঁকেই প্রত্যক্ষ করতে হবে অসহায় দর্শকের মতো এমন চিন্তা ছিল তাঁর স্বপ্নেরও অতীত। চিরদিনের মতো তাঁর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল।

এরপর যতদিন বেঁচে ছিলেন স্যাডউইক, কেউ তাঁর মুখে হাসির মৃদু রেখাও দেখতে পায়নি। স্বাভাবিক মানুষের মতোই অতন্দ্রসাধক বিজ্ঞানীর অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতার মধ্যেই দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে তাঁর—কিন্তু জীবনের মূল সুর হয়ে গিয়েছিল বেসুরো। এতবড় ধ্বংসকাণ্ডের জন্য, লক্ষ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য বিবেকের কাঠগড়ায় তিনি নিজেকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেছিলেন।

নিউট্রন আবিষ্কার বিজ্ঞানী স্যাডউইক-এর অপরিসীম মানসিক বেদনা ও হতাশার কারণ হয়ে উঠলেও বাইরের জগৎ তাঁকে এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য দু'হাত ভরে সম্মান জানাতে কার্পণ্য করল না।

নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হল তাঁকে। তিনি হলেন নিরাপত্তা পরিষদের বিজ্ঞান উপদেষ্টা, ব্রিটেনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরমাণু শক্তি কমিশনের মনোনীত প্রতিনিধি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা ডিগ্রি ছাড়াও তিনি পেলেন রয়াল সোসাইটির কপলে পদক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিট পদক, ফিলাডেলফিয়ার ফ্রাঙ্কলিন ইনসটিটিউটের ফ্রাঙ্কলিন পদক। তাঁকে করা হল আমেরিকার ফিজিক্যাল সোসাইটির মাননীয় সদস্য।

সর্বোপরি ১৯৫৭ খ্রিঃ ব্রিটিশ সরকার স্যাডউইককে পরমাণু শক্তি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেন।

নিউট্রন আবিষ্কারের মাধ্যমে রাসায়নিক মৌলকে স্থানান্তর করণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে পরমাণু শক্তির গোড়াপত্তন করেছিলেন স্যাডউইক। তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ে বহু গবেষণা নিবন্ধ ছাড়াও বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ নামে একটি বিখ্যাত বইও তিনি লেখেন। তিরাশি বছরের একটি সফল জীবন লাভ করেও জীবনের অন্তিম লগ্নে বিবেকের কাছে নিজেকে একজন অপরাধী বলেই তিনি মনে করতেন।

আগামীদিনে পরমাণু বোমায় মানব জাতির ভয়াবহ পরিণামের আতঙ্ক চোখে নিয়েই ১৯৭৪ খ্রিঃ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন বিজ্ঞানী স্যাডউইক।

জন বার্ডন স্যান্ডার্সন হলডেন

কথায় কথায় অনায়াস উচ্চারণে আজকাল আমাদের মুখে চলে আসে জিন কথাটি। অথচ খুব বেশিদিন হয়নি মানুষ এই জিন বস্তুটির সন্ধান পেয়েছে।

যে জটিল রাসায়নিক পদার্থটি বংশগতির ধারক ও বাহক, আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন জিন। এককথায় একে বলে ডি. এন. এ (DNA) বা ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড।

এটি এমন এক রাসায়নিক অম্ল যার রয়েছে জীবনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতা।

উনিশ শতকে এক চেক খ্রিস্টান সন্ন্যাসী দীর্ঘ আটবছর ধরে মটর গাছের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে লব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিলেন ব্রুনের সোসাইটির বিজ্ঞানী সমাবেশে।

কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার গুরুত্ব সেদিন কোন বিজ্ঞান সাধকই অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁরা সেই সন্ন্যাসীকে উপহাস করেছিলেন।

নিরাশ সন্ন্যাসী লজ্জা গোপন করে সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর উপাসনালয়ে। আজ বিশ্ববিজ্ঞান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর নাম। তিনি হলেন গ্রেগর যোহান মেন্ডেল।

১৯০০ খ্রিঃ তিন অখ্যাত বিজ্ঞানী পৃথকভাবে পরীক্ষা করে মেন্ডেলের মটর গাছের বংশগতির বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ করলেন। সারা পৃথিবীর জীবতাত্ত্বিকরা পেল জেনেটিক্স গবেষণার পথ।

বংশগতির ধারক ও বাহক জিন-কে কেন্দ্র করে বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে উন্মোচিত হল এক নতুন অধ্যায়।

এর পর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। উন্মোচিত হল জিন সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও তথ্য। জানা গেল জিনের রাসায়নিক পরিচয় ও জীবনের সঙ্গে সজীব কোষের জৈবরাসায়নিক ক্রিয়াকর্মের নানা বিস্ময়কর বিবরণ।

ওয়াটসন নামে এক জীবাণুতাত্ত্বিক ও জীব-পদার্থবিদ ক্রিক, দুজনে মিলে আবিষ্কার করলেন, জিনের চেহারাটি হল পাকানো নারকেল দড়ির মতো। এই আকার নিয়েই একটা জিন আর একটা জিনকে জড়িয়ে থাকে। কেবল এই আবিষ্কারের জন্যই এই দুই বিজ্ঞানী চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেলেন। তাঁদের তৈরি জিনের মডেলটি আধুনিক জীববিজ্ঞানে ওয়াটসন-ক্রেক মডেল মামে পরিচিত।

পরবর্তীকালে এই মডেলের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা ধাপে ধাপে এগিয়ে ল্যাবরেটরিতে নকল জিন পর্যন্ত গড়ে ফেলতে সক্ষম হলেন।

জিনকে নিয়ে এই সমস্ত কিছু কান্ড ঘটাবার অনেক আগে, যখন বিজ্ঞানীরা জিনের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছেন, তখন যিনি জিনের তত্ত্ব সাবলীলভাবে তুলে ধরেছিল, যাঁকে বলা হয় তত্ত্বীয় জেনেটিক্সের আদিপুরুষ, সেই বিজ্ঞান তাপসের নাম জন বার্ডন স্যান্ডার্সন হলডেন। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি জে. বি. এস নামেই সমধিক পরিচিত।

বিজ্ঞানী হলডেন ছিলেন বহুমুখী-প্রতিভাধর এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। নিউম্যান নামে এক বিজ্ঞানী তাঁর আশ্চর্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "He did everything, except putting his head on a rail road track".

বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখাতেই হলডেনের ছিল সাবলীল বিচরণ। পদার্থবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যা, পরিসংখ্যানবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা, মহাজাগতিক বিদ্যা—সমস্ত বিষয়েই তিনি গবেষণা করেছেন।

হলডেনের জন্ম হয় ব্রিটেনের অক্সফোর্ডে ১৮৯২-এর ৫ই নভেম্বর। তাঁর বাবার নাম জন স্কট হলডেন। তিনি ছিলেন তৎকালের এক প্রখ্যাত শরীরবিজ্ঞানী।

বিজ্ঞানী পিতার পুত্র যে বিজ্ঞানীই হবেন তার কোন মানে নেই। কিন্তু তবু বলতে হয়, বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ হলডেন বাল্যকালেই পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে।

প্রকৃতির রাজ্যে নানা জিনিসের প্রতি আগ্রহ জাগাবার জন্য তাঁর বাবা তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন নানা জায়গায়। শোনাতেন দেশবিদেশের বিজ্ঞানীদের রোমাঞ্চকর জীবনকাহিনী।

একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিল তাঁদের বাড়িতে। বিজ্ঞান ছাড়াও নানা বিষয়ের উল্লেখযোগ্য বই ছিল সেখানে। বালক হলডেন সেখানে বই মুখে গুঁজে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন।

সবচেয়ে আনন্দ পেতেন তিনি বিজ্ঞান বিষয়ের বই পড়ে। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সহজাত।

বাবার নিজস্ব ল্যাবরেটরিটি ছিল বাড়ির পাশেই। আধুনিক সব ব্যবস্থাই ছিল সেখানে। বাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন তিনি। সাগ্রহে হাতের কাছে মোতায়েন থাকতেন যদি এটা সেটা লাগিয়ে দেবার কাজে বাবাকে সাহায্য করতে পারেন।

এভাবেই বালক বয়সেই বিজ্ঞানী বাবার পাশে থেকে থেকে হাতে-কলমে

বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজে বহুবার উল্লেখ করেছেন, তাঁর বহু বিচিত্র বিষয়ের গবেষণার প্রেরণাটি তিনি লাভ করেছিলেন শৈশবে বাবার ল্যাবরেটরি থেকেই।

বাবা যে কেবল তাঁকে হাতে ধরে বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশ পথটি চিনিয়ে দিয়েছিলেন তাই নয়। চরিত্রগঠনের শিক্ষাও জে. বি. এস হলডেন লাভ করেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে।

সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে আপসহীন দৃঢ়তা অবলম্বন করে সহজ সরল ভাবে চলার শিক্ষা বাবাই দিয়েছিলেন তাঁকে। এভাবে একটি পরিপূর্ণ মানুষের সত্তা নিয়েই শিশু বয়স থেকে বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

পড়াশুনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও বাবার সাহচর্যে হলডেনের অন্তস্থিত ভাবুক মনটি ক্রমেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সময় পেলেই তিনি জীবনের নানা জটিল দিক নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে বসে যেতেন।

মনের মধ্যে অহরহ ঘোরাফেরা করত বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, মানুষের সভ্যতা, জীবনের উৎস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর ইতিহাস। বিস্ময়-মুগ্ধ হয়ে তিনি ভাবতেন সমস্ত কথা।

ছেলেবেলা থেকে একটা অদ্ভুত প্রবণতা দেখা গিয়েছিল হলডেনের মধ্যে। কাউকে নকল করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর।

যাকে দেখতেন তাঁকেই নকল করার চেষ্টা করতেন। এই কান্ডটা একরকম অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

রাস্তায় দিনরাত ঘোরাঘুরি করছে কত কুকুর। তাদের মুখের গড়ন কত বিচিত্র ধরনের। কারো মুখ ছুঁচলো, কারো চৌকো, কারও কান লম্বা, কারো ঝুলে পড়া, কারো চোখে দুষ্টুমি—সবকিছু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেন বালক হলডেন।

পরে ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পথে দেখা কুকুরদের মুখের চেহারা নিজের মুখে ফুটিয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন।

এই অভ্যাসটিই পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে অন্য রূপ নিয়েছিল। বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্রমাগত নিজের শরীরের ওপরে ঘটাবার দুঃসাহস তাঁর মধ্যে দেখা গেছে।

বিজ্ঞানের প্রতি এতটাই আগ্রহ বেড়ে উঠেছিল তাঁর যে বিভিন্ন ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের বই পড়বার জন্য তিনি আগ্রহ নিয়ে নানা ভাষা শিক্ষা করলেন।

বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে গণিতের প্রতিই বেশি টান ছিল হলডেনের। ফলে অল্প বয়সেই গণিতে অসম্ভব পোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯০৯ খ্রিঃ মাত্র

ষোল বছর বয়সেই তিনি গণিতের জন্য রাসেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

গণিত প্রতিভার এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই হলডেনের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনাটি আভাসিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কিশোর হলডেন সকলকে বিস্মিত করলেন স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর উচ্চশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে।

তিনি ভর্তি হলেন বিজ্ঞান বিভাগে নয়, কলা বিভাগে। বিজ্ঞানে আবাল্য উৎসাহী মানুষটির এই মানসিক পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

যথাসময়ে সসম্মানে বি. এ. পাস করলেন। সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল। ব্রিটেনের সেনাবাহিনীতে নাম লেখালেন হলডেন। সেখানে এমন এক কাজের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হল যা ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক। নির্ভীকতা, বীরত্ব ও প্রচন্ড উপস্থিত বুদ্ধি থাকলে তবেই কেবল এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

সেনাবাহিনীতে হলডেনের কাজ ছিল, গভীর রাতে শত্রুপক্ষের শিবিরে ঢুকে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা।

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেশের স্বার্থে এই দুঃসাহসিক কাজটি করতে আনন্দ পেতেন হলডেন। এই সময়ে গোপনে শত্রুশিবিরে একাধিক ধ্বংসকাণ্ডও ঘটিয়েছেন হলডেন। শত্রুর বেড়াজাল থেকে প্রচন্ড উপস্থিত বুদ্ধির জোরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছেন।

তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বে অন্যান্য সৈনিকরা মুগ্ধ হয়ে যেত। এই ভাবে সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। গুণমুগ্ধ ব্রিটিশ সৈনিকরা তাঁর নাম দিয়েছিল রোম্বো।

১৯১৮ খ্রিঃ যুদ্ধ শেষ হলে হলডেন আবার ফিরে আসেন অক্সফোর্ডে। বাবার ল্যাবরেটরিতে শারীরবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।

হঠাৎ করে শারীরবিদ্যা কেন? শৈশবে বাবার সঙ্গে থেকে গবেষণার কাজটি রপ্ত করে নিয়েছিলেন তিনি। বাবার সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল শারীরবিদ্যা সংক্রান্ত। ফলে এই বিদ্যাতেই তিনি হাত পাকিয়েছিলেন। তাই সুযোগ যখন এলো তখন শরীরের নানা জৈবিক ক্রিয়াকলাপ নিয়েই তিনি বসে গেলেন ল্যাবরেটরির টেবিলে।

এভাবে কাটল কয়েকটা বছর। ১৯২২ খ্রিঃ চাকরির সুযোগ পেয়ে গেলেন। রিডার হিসেবে যোগ দিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়ন বিভাগে। এই ভাবেই সূত্রপাত হল কর্মজীবনের।

জীববিজ্ঞানে সবে চালু হয়েছে শারীরবিদ্যা নামে একটি নতুন শাখা।

জীবরসায়ন তারই অন্তর্ভুক্ত। শরীরের সজীব কোষে প্রতিনিয়ত যেসব জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে চলেছে তা পর্যবেক্ষণ করাই হল জীবরসায়নের কাজ। এই নতুন বিষয়ে উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে শুরু করলেন তিনি অধ্যাপনার কাজ।

অধ্যাপনার পাশাপাশি নানা আধুনিক বিষয়ের গবেষণার কাজও সমান্তরাল ভাবে করে চললেন হলডেন।

ভিটামিন আবিষ্কার করে জীবরসায়নবিদ ফ্রেডেরিক গাইল্যান্ড হপকিন্স বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে চলতে লাগল হলডেনের গবেষণা।

এই ভাবে অতিক্রান্ত হল তিন বছর। নিজের গবেষণার সূত্র ধরেই ১৯২৫ খ্রিঃ হলডেন আকৃষ্ট হন সমস্ত প্রজননবিদ্যা বা জেনেটিক্সের প্রতি। শুরু করেন হেরিডিটি অ্যান্ড ভেরিয়েশন বা বংশগতি ও পরিবর্তন নিয়ে গভীর গবেষণা। প্রধানতঃ তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয় গণিতের সাহায্যেই এই নতুন গবেষণা এগিয়ে নিয়ে চলতে থাকেন।

বিশ্ববিজ্ঞানে ডারউইনই সর্বপ্রথম জৈব অভিব্যক্তি নিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা নেচারাল সিলেকশানের মাধ্যমেই উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে উদ্ভূত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি থেকে সৃষ্টির বৈচিত্র্য রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ডারউইনের প্রজাতির উৎস সম্পর্কীয় তত্ত্বের মূল কথাই হল, সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট। সবল বা যোগ্যতমই টিকে থাকে জীবনসংগ্রামে।

যোগ্যতম সম্পর্কে বললেও ডারউইন সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট অর্থাৎ যোগ্যতম প্রজাতির আগমন সম্পর্কে নীরবই থেকেছেন। অভিব্যক্তির প্রকৃত রূপ যে নানা প্রজাতির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সেই সত্য ধরা পড়েছে বহু পরে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের মূল কথাই হল সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট। অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকে যোগ্যতম। কিন্তু যোগ্যতমের প্রজাতি সম্পর্কে ডারউইন পরিষ্কার কোনও ধারণা দিয়ে যেতে পারেন নি। তাই এক হিসাবে ডারউইনের তত্ত্ব ছিল অসম্পূর্ণ এবং স্বভাবতই জীববিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারেননি।

ডারউইনের অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করেছিলেন বিজ্ঞানী হলডেন। অবশ্য তাঁর আগে অপর দুই বিজ্ঞানী রোলান্ড ফিশার এবং স্যামুয়েল রাইট জৈব অভিব্যক্তির জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণায় মেতেছিলেন। কিন্তু তাঁরাও সেভাবে স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত এ বিষয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। হলডেনের হাতেই বলা যায় তত্ত্বীয় জেনেটিক্সের সূত্রপাত হয় সাফল্যজনকভাবে।

বংশগতির ধারাকে বহন করে যে কণা বা অণু তাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন জিন। এই জিনের রাসায়নিক গঠন এমনই জটিল ও সূক্ষ্ম যে তা শক্তিশালী আলট্রামাইক্রোস্কোপের সাহায্য ছাড়া নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেক সজীব কোষের নিউক্লিয়াসেই এরা থাকে মুক্তোর মালার চেহারা নিয়ে। তাকে ঘিরে থাকে এক ধরনের ক্ষারীয় প্রোটিনের আবরণ। এই আবরণ সমেত জিনই হল ক্রোমোজম।

কোষ বিভাজন ক্রিয়ায় ওই বংশগতির একক ক্রোমোজোম সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সন্তানের প্রতিজোড়া ক্রোমোজোমের একটি মায়ের অন্যটি বাবার। দুটিরই বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। একটির রং সাদা, অন্যটির হলুদ।

দুয়ের মিলন ঘটালেন হলডেন। তাদের যে সন্তান হল তার গায়ের রং হল হালকা হলুদ। এই বিষয়টি হলডেন বুঝিয়ে দিলেন গণিতের ভাষায়।

জিনের এই ধারা যদি বিঘ্নিত না হয়, স্বাভাবিক পরিবেশে নিয়মিত থাকে, তাহলে অভিব্যক্তি বা বিবর্তন ঘটে না।

যখন কোনও কারণে পরিবেশের বদল ঘটে, জিনের ওপরে বিরুদ্ধ চাপ বশতঃ তখনই বিবর্তনের পথ হয় প্রশস্ত।

জিনের ওপরে কোন অবস্থায় বিরুদ্ধ চাপ পড়ে তা বোঝাতে গিয়ে হলডেন চারটি কারণ নির্দেশ করেছেন। সেগুলো হল—

(১) জিনের মূল গঠনের আকস্মিক পরিবর্তন। হলডেন বলেছেন, এই পরিবর্তন ঘটে প্রতি পঞ্চাশ হাজার মানুষে একটি। এর ফলে সন্তানের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা বাবা বা মা কারোর মধ্যেই থাকে না।

(২) বহমান বংশগতিতে যখন বহিরাগত কোনও জিন ঢুকে পড়ে। যেমন অসবর্ণ মিলন।

(৩) এই অসবর্ণ মিলন ছাড়া অন্য একটি কারণেও বংশধারায় বিবর্তন ঘটে থাকে। তা হল নির্বাচনের চাপ। এর ফলে জিনের স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক কমবেশি হয়ে পড়ে।

জিনের নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক বিঘ্নিত হলে ঘটে অকাল মৃত্যু; কেউ হয় দীর্ঘায়ু, কারো স্বভাবে ছেলেমানুষী ভাব থেকেই যায়। সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে সময়ের তারতম্য ঘটতে দেখা যায়।

(৪) জিনের অংশগ্রহণের তারতম্যের ফলে কম্পাঙ্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিবর্তন ঘটায়।

বিবর্তনে এই কারণগুলিকে হলডেন গাণিতিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটান। এ বিষয় নিয়েই তিনি পরে লেখেন তিনটি বই—দ্য কজেস অব এভোলিউশান, নিউ পাথস ইন জেনেটিক্স, দ্য বায়োকেমেস্ট্রি অব জেনেটিক্স।

হলডেন তাঁর এই তত্ত্বীয় পদ্ধতির সাহায্যে জিন-ঘটিত রোগের সম্পর্কেও ইঙ্গিত করেছেন।

পরবর্তীকালের জীববিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে হলডেনের তত্ত্ব অভ্রান্ত—অভিব্যক্তির প্রকৃত সংঘটক হল প্রাকৃতিক নির্বাচন।

হলডেনের গবেষণায় আরও ধরা পড়েছে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি নানান চাপের ফলেও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে পরিবর্তন ফুটে উঠতে পারে। যার সঙ্গে বাবা-মায়ের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নজরে পড়ে।

১৯৩২ খ্রিঃ পর্যন্ত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলেন হলডেন। এরপর যোগ দেন লন্ডনের জেনেটিক্যাল সোসাইটির সভাপতি পদে। একই বছরে অসাধারণ প্রজননবিদ্যার গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেন।

১৯৩৭ খ্রিঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমেস্ট্রি বা গাণিতিক জীববিদ্যা নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়। জেনেটিক্যাল সোসাইটির সভাপতির পদ ত্যাগ করে হলডেন যোগ দেন এই নতুন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে। এই পদে কাজ করেন একটানা কুড়ি বছর।

লণ্ডনের জীববিজ্ঞানীদের উদ্যোগে ১৯৪০ খ্রিঃ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে পৃথিবীর প্রথম প্রজনন বিদ্যা সংক্রান্ত পত্রিকা জার্নাল অব জেনেটিক্স। হলডেন হলেন এই জার্নালের প্রধান সম্পাদক।

কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হয় ব্রিটেনের সাম্যবাদী পত্রিকা ডেইলি ওয়ার্কার। হলডেন হলেন এই পত্রিকার সম্পাদকীয় সমিতির প্রধান। ১৯৪৯ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন।

নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানকর্মী হয়েও রাজনীতির সঙ্গে ঘোরতর যোগাযোগ ছিল হলডেনের। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও স্পষ্টবাদী। অন্যায়কে বরদাস্ত করতেন না কখনও। এই প্রতিবাদী ভাবটি ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই নানাক্ষেত্রেই শত্রু তৈরি হয়েছিল। দেশের মানুষের দূষিত স্বভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে একসময় ইংলণ্ড ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু ভারতের সরকারী কর্মীদের অসাধুতাও ইংলণ্ডের মানুষগুলোর চাইতে কোনও অংশে কম ছিল না। প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেননি তিনি। ফলে যতদিন ভারতে ছিলেন, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করেই থাকতে হয়েছিল তাঁকে।

তাঁর সমসময়ে ইংলণ্ডে সবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। এই আন্দোলনের আদর্শই জীবনে গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানী হলডেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল কথাকে সামনে রেখে তিনি রচনা করেন বংশগতি সম্পর্কিত

একটি বই হেরিডিটি অ্যাণ্ড পলিটিকস। রাজনীতিকেন্দ্রিক হলেও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রেও বইটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এই বইয়ের এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"For more than a thousand years the Mohammedans in western Asia have practised polygamy, whils the Christians and Jews have not. Of course, only the richer Mahammedans could afford a harem. We should, therefore, expect that the Mohammedans would on the whole be superior to the Jews and Christians in intellectual qualities or at any rate in those analities which make for the acquisition of wealth .... That is notoriously not the case. And because it is not the case, it is to be presumed that there is some fallacy in the arguments...."

জিনের গঠন নিয়ে হলডেন নানা ভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন সারাজীবন ধরে। রহস্য উদ্‌ঘাটনে গাণিতিক পদ্ধতিকে তিনি প্রয়োগ করতেন উৎসাহের সঙ্গে। এনজাইম বা উৎসেচকের গঠনশৈলী নিয়েও বংশগতির নানা দিকনির্দেশ করেছেন তিনি।

ঈস্ট বা খামির ভেতর থেকে প্রোটিন অনুঘটক বার করা হয়েছিল। এজন্য একে নাম দেওয়া হয় এনজাইম। ল্যাটিন ভাষায় এন মানে ভেতরে আর জাইম হল ঈস্ট বা খামি। এই এনজাইম থেকে তৈরি হয় শরীরের নানা প্রয়োজনীয় পদার্থ।

হলডেন পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, এনজাইম দেহকোষের মধ্যের নানা জৈব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে নানা বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

কোষের নিউক্লিয়াসে থাকে ক্রোমোজোম বা জিন। তার দ্বারাই সেখানে উৎপাদিত হয় নানা প্রয়োজনীয় এনজাইম। এই জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই জৈব পদার্থগুলো কোষকে সজীব করে রাখে।

জিন স্বভাবতঃই তৈরি করে তার চেহারার অনুরূপ একটি সঙ্গী। এরা আবার পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের কার্জ করে। এভাবেই চলে তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।

হলডেন একদিকে নিষ্ঠাবান সার্থক বিজ্ঞানী। অপরদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক।

রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাতের ফলে ১৯৪০ খ্রিঃ প্রথমা স্ত্রী চার্লটের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল তাঁর। সংসার ভাঙ্গল, তবুও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রব ত্যাগ করলেন না।

আদর্শনিষ্ঠ দৃঢ়চেতা মানুষটির জীবন আগাগোড়াই ছিল সংঘাতময়। রাজনৈতিক দলও একসময় অসহ্য ঠেকল তাঁর কাছে।

দেখলেন, দলে ঢুকেছে বেনো জল। দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা নিরুচ্চারে প্রশ্রয় পাচ্ছে। প্রতিবাদ না করে থাকতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করলেন কমিউনিস্ট পার্টি। ত্যাগ করেন স্বদেশ। ১৯৫৬ খ্রিঃ তিনি চলে এলেন ভারতে।

ব্যক্তিগত জীবনে হলডেন ছিলেন নিরহংকারী। এমন প্রতিভাধর গুণী মানুষটি অবাধে সকলের সঙ্গে মিশতেন। মজ্জায় ছিল সমাজসেবার প্রেরণা। তার টানেই ভিড়েছিলেন সর্বহারার পার্টিতে।

কৈশোরে খনিশ্রমিক ও মৎস্যজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। এই দুঃখী অভাবী মানুষগুলোর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ সহানুভূতি ও মমতা।

এই সহজ সহানুভূতিশীল স্বভাবের গুণে মানুষের ভালবাসাও পেয়েছেন তিনি। পেয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটেন যখন বিধ্বস্ত হয়েছে মুহুর্মুহু জাপানী বোমার আক্রমণে, মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে কাতারে কাতারে সেই সময় হলডেন নিমগ্ন ছিলেন জিন সংক্রান্ত গবেষণায়। কিন্তু মানবতার পূজারী সেদিন মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে স্থির থাকতে পারেননি।

গবেষণার টেবিল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন বিপন্ন মানুষের সেবাকার্যে। একই সময়ে সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্রুটি নিয়ে প্রশাসনের চাঁচাছোলা সমালোচনা করতেও ছাড়েননি।

এই মানুষই আবার বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ গড়ে তোলার জন্য একের পর এক বই লিখেছেন। এমনকি শিশুদের জন্যও। তাঁকে বলা হয় ব্রিটেনের মানুষের বিজ্ঞানচেতনা সৃষ্টির পথিকৃৎ।

তাঁর লেখার কলমটি ছিল যেমন সাবলীল তেমনি দুরূহ বিষয় প্রাঞ্জল করে তোলার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। বক্তা হিসাবেও সুখ্যাতি ছিল তাঁর। ক্লাসে পাঠদানের বিষয় ছাত্রছাত্রীদের সামনে জলের মতো পরিষ্কার করে তুলে ধরার অসামান্য দক্ষতা ছিল তাঁর।

বিজ্ঞান সম্পর্কে ছিল তাঁর জাগ্রত কৌতূহল। বিজ্ঞানের বহু বিষয় নিয়েই গবেষণা করেছেন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত হয়েছিলেন জিন সংক্রান্ত গবেষণায়।

শারীরবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, পরিসংখ্যান, মহাজাগতিক বিদ্যা, অজীব যোনিবিদ্যা—ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ফলে সকল ক্ষেত্রেই রেখেছেন উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বাক্ষর। জীবরসায়নেও তাঁর অবদান কিছু কম নয়।

১৯৫৭ খ্রিঃ গোড়ায় ভারতে আসার পর এখানকার আবহাওয়া ও মানুষের

সঙ্গে পরিচয় ঘটবার পর ভারতকেই করে নেন তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি। এখানে এসেও বসেছেন জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে। ভারতের নানা প্রান্তে জল-জঙ্গল অরণ্যে ঘুরেছেন দীর্ঘদিন, সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর জীবনেতিহাস।

ভারতের চিরন্তন আদর্শের বাণী এই আবহাওয়ায় এসে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন হলডেন। পড়েছেন ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস। বেদ, উপনিষদ, গীতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন। বুদ্ধের আদর্শকে জীবনের ধ্রুব করে নিয়েছিলেন। বলেছেন, এই হিংসার পৃথিবীকে একমাত্র অহিংসাই পারে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে।

কলকাতার বরানগরের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউটে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার কাজ করেছেন বিজ্ঞানী হলডেন। সেখান থেকে ভুবনেশ্বরে গিয়ে গ্রহণ করেন জেনেটিক্স অ্যান্ড বায়োকেমেস্ট্রি ল্যাবরেটরির সর্বময় কর্তৃত্ব।

১৯৪৭ খ্রিঃ ১লা ডিসেম্বর দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ভারতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বিজ্ঞান তাপস জে. বি. এস হলডেন।

পিয়ের লাপলাস

বিশ্ব-গণিত ইতিহাসে এক দ্যুতিময় প্রতিভার নাম পিয়ের লাপলাস। সম্পূর্ণভাবে লিখতে গেলে তাঁর নাম দাঁড়ায় এরকম, মার্কুইস পিয়ের সাইমন দে লাপলাস।

১৭৪৯ খ্রিঃ ২৮শে মার্চ নর্মাণ্ডির বিমঁত নামের ছোট্ট শহরে অতি সাধারণ এক পরিবারে অঙ্কবিজ্ঞানী লাপলাসের জন্ম।

সামান্য কিছু জমির আয়েই প্রতিপালিত হত তাঁদের পরিবারটি। ফলে নিত্য অভাব ছিল বাঁধা নিয়মের মধ্যে। তাই ছেলেবেলায় লাপলাসের লেখাপড়া বাধার মধ্য দিয়েই এগিয়েছিল।

অসাধারণ মেধা এবং অঙ্কের প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর সহজাত। গরীব ছেলেটির পড়াশুনা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্য সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সহৃদয় আত্মীয়স্বজনেরা। তাঁরাই ভার নেন লাপলাসের লেখাপড়ার।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে কায়েন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাপলাস স্নাতক হন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিমঁতের সামরিক স্কুলে শিক্ষকতার কাজও পেয়ে যান।

স্কুলে লাপলাস ছাত্রদের পড়াতেন অঙ্ক ও বিজ্ঞান। ছেলেদের পড়ানোর পাশাপাশি গবেষণার কাজও শুরু করেন। স্বপ্ন দেখেন বড় বিজ্ঞানী হওয়ার।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুযোগ্য শিক্ষক হিসেবে বিমঁত শহরে লাপলাসের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা মুগ্ধ হয় তাঁর অতি কঠিন বিষয়ও অতি সরল সহজবোধ্য ভাবে বোঝাবার কায়দায়।

সামরিক বিদ্যালয়ে বেশি দিন কাজ করতে পারেননি লাপলাস। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে এক সময় নিয়ে এল প্যারিসে। সেইকালে প্যারিস ছিল ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পাদপীঠ। গণিতের সুখ্যাত পন্ডিত দ্য আলেমবাৎ বাস করতেন সেখানে।

১৭৬৭ খ্রিঃ লাপলাস গণিতের উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে প্যারিসে এলেন আলেমবাতের সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

এখানে বলবিদ্যার কিছু গাণিতিক সূত্রের মধ্যস্থতায় অতি নাটকীয়ভাবে আলেমবাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল উত্তরকালের বিশ্বগণিতের অন্যতম মনীষীর। লাপলাস পেলেন গভীরতর গবেষণার সুযোগ।

প্রথম সাফল্যই লাপলাসকে বিজ্ঞানীমহলে পরিচিত করে তুলল। তাঁর এই কাজটি ছিল সৌরবলবিদ্যার গাণিতিক প্রয়োগ।

সেই সময়ে নিউটন সহ অন্যান্য পদার্থ বিজ্ঞানীরা কক্ষ থেকে নক্ষত্রদের চ্যুতির কারণ অনুসন্ধানের কাজে হিমসিম খাচ্ছিলেন। অঙ্ক নির্দেশিত সৌরপথ থেকে বৃহস্পতি বা শনি এই দুই গ্রহ কখনো খানিকটা এগিয়ে আবার কখনো বেশ খানিকটা পিছিয়ে থাকে।

পদার্থ বিজ্ঞানীরা এই রহস্যময় বিষয়টির কোন ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না। সৌরজগতের এমনি নানা রহস্যেরই কূলকিনারা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য লাপলাস দাঁড় করালেন এক তত্ত্ব। বলাবাহুল্য, গাণিতিক পথেই তিনি তা করলেন।

তিনি দেখালেন, সৌরপথে নক্ষত্রদের এই চ্যুতি বা অপসরণ কোন নতুন ঘটনা নয়। যুগ যুগ ধরে একই অবস্থা চলছে। নক্ষত্ররা ঘুরে ফিরে নিজেরাই নিজেদের ভারসাম্য ঠিক রেখে চলেছে। এই বিচ্যুতি কখনোই মহাশূন্যে কোন বিপর্যয়ের কারণ ঘটাবে না।

লাপলাসের এই তত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত করল।

এরপরে তিনি নতুন গবেষণা আরম্ভ করলেন মহাবিশ্ব ও মহাপ্রকৃতির মৌলশক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে।

এই সময়েই বিভিন্ন সৌর ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে একের পর এক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন লাপলাস।

তাঁর আলোচিত বিষয়গুলো ছিল—নদীর জলেব জোয়ার ভাঁটা, মহাকর্ষ বল, প্রক্ষিপ্ত বস্তুর গতি, শনিমন্ডলের গঠন ও আবর্তন প্রভৃতি।

এই সময়েই তিনি আবর্তনশীল তরলের ভরের সাম্য অবস্থার ওপরে এক নতুন তত্ত্ব দাঁড় করালেন।

লাপলাসের নিবিড় গবেষণার কাজ চলছিল প্যারিসের বিজ্ঞান আকাদেমিতে। এখানে তিনি রসায়ন বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিঁয়ারের সঙ্গেও কাজ করেছেন। তাঁদের দুজনের মিলিত গবেষণার দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ ও দহনের ওপরে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য আহৃত হয়।

আধুনিক থার্মোডাইনামিক্স বা তাপীয় গতিবিদ্যা বিষয়ের লাপলাসই প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন। আইসক্যালোমিটার নামে একটি নতুন যন্ত্র তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন।

বরফের তাপ পরিমাপক এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

এই সময়ে নানা বিষয়ের ওপরে পর পর গবেষণা করতে থাকেন লাপলাস। অবিচ্ছিন্ন গতিযুক্ত কোনও ভৌত পদার্থের কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভবকে গণনা করার জন্য তিনি যে সমীকরণ তৈরি করেন, তাঁর নামেই সেই সমীকরণের নামকরণ করা হয়।

কেবল অভিকর্ষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর উদ্ভাবিত সমীকরণটি বর্তমানে তড়িৎবিজ্ঞান, উদগতিবিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের নানা শাখাতেও ব্যবহার করা হয়।

কান্ট নামে এক বিজ্ঞানী নির্ণয় করেছিলেন, মহাকাশের নীহারীকাপুঞ্জ অথবা সদাআবর্তনশীল গ্যাসের মধ্য থেকেই এই মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর মতে প্রথম অবস্থায় এই গ্যাস ছিল প্রচন্ড উত্তপ্ত।

সময়ের গতির সঙ্গে গ্যাস উত্তাপ হারিয়ে যখন শীতলতা প্রাপ্ত হতে থাকে তখনই তার কেন্দ্রের পাথর ও নানান গলিত ধাতব গ্যাসীয় মন্ডল থেকে বাইরে ছিটকে পড়ে। কোটি কোটি বছর ধরে ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধে। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে সৌর জগতের গ্রহ নক্ষত্রদের।

লাপলাস কান্টের এই মতকে সমর্থন করেন এবং নিজ গবেষণা দ্বারা পুষ্ট করে তোলেন।

মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদের চূড়ান্ত মীমাংসা আজও পর্যন্ত হয়নি। বিশ্বের নানা প্রান্তেই বিষয়টি নিয়ে চলেছে গভীর

গবেষণা। এই গবেষণার একমাত্র প্রমাণসূত্র হিসেবে কান্ট ও লাপলাসের ব্যাখ্যাকেই স্বীকার করা হয়ে থাকে।

১৭৯৯ খ্রিঃ থেকে ১৮২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে লাপলাসের জ্যোর্তিবিজ্ঞানের নানা গবেষণা ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদেমির নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই লেখাগুলোই একত্রিত করে পরে তিনি পাঁচটি সুবৃহৎ খন্ডে প্রকাশ করেন। গ্রন্থের নামকরণ করেন Mecanique Celestic বা জ্যোতির্বলবিদ্যা।

গ্রন্থের বিভিন্ন খন্ডে লাপলাস বিধৃত করেছেন জ্যোতির্বলবিদ্যার ধারাবাহিক ইতিহাস সহ বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সৌরবিজ্ঞান ও বলবিদ্যার নানা সমস্যার সমাধান।

পদার্থবিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে লাপলাস তাঁর বইতে ব্যবহার করেছেন সহজ সরল ভাষা। ফলে তাঁর গ্রন্থ লাভ করেছিল অসাধারণ জনপ্রিয়তা।

উৎসাহিত হয়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের ব্যাখ্যা করে দ্বিতীয় একটি বই প্রকাশ করেন।

১৮১২ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় লাপলাসের তৃতীয় গ্রন্থ থিওরি অ্যানালিটিক দেস প্রবাবিলিটিস। এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্রের সম্ভাবনার বিষয় নিযে আলোচনা করেছেন।

বিজ্ঞানী হিসাবে বহু মহৎ আবিষ্কারেরই জনক ছিলেন লাপলাস। তাঁর নানা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তরুণ বিজ্ঞানীদের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন প্রচুর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এইসব বিজ্ঞানীদের কারো প্রতিই সামান্যতম কৃতজ্ঞতাও তিনি তাঁর গ্রন্থে কোথাও করেননি। সার্থক গবেষণাগুলির সূত্র বা উৎস সম্পর্কেও তিনি কোন আভাস রাখেননি।

ব্যক্তি হিসেবে বিচার করলে এই মনীষী সম্পর্কে একটি অপ্রিয় মন্তব্য করতে হয়, লাপলাস ছিলেন চূড়ান্ত সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর মানুষ। নিজের কাজের সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য তিনি সমকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক তন্ত্রের সমর্থন করে গেছেন বরাবর।

ফরাসী বিপ্লবের কালে দেশে ঘন ঘন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। যখন যে নায়ক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন লাপলাস নির্বিচারে তারই সমর্থন করে গেছেন। এ ব্যাপারে কোনরকম রাখঢাক ছিল না তাঁর।

১৭৯২ খ্রিঃ ফরাসী বিপ্লব কালে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন সম্রাট ষোড়শ লুই ও রানী আঁতোয়ানেৎ। রাজতন্ত্রের বদলে দেশে প্রতিষ্ঠিত হল বিপ্লবী সরকার। আর এই সরকারেরই অধীন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন লাপলাস।

এই সময়ে বিপ্লবীদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে নানা সুযোগ সুবিধা ও পদোন্নতি আদায় করেছিলেন তিনি।

এর পরেই নেপোলিয়নের যখন উত্থান ঘটল, সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার পূজারী লাপলাস রাতারাতি হয়ে গেলেন রাজতন্ত্রের একান্ত অনুগত। তাঁর চাটুকারিতা কতদূর পৌঁছেছিল বোঝা যায়, যখন দেখি তিনি তাঁর একটি গবেষণা গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন নেপোলিয়নের নামে।

নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের রাজাসনের দখল নেয় বুর্বোঁ বংশের রাজারা। লাপলাসের নেপোলিয়ন ভক্তিও সঙ্গে সঙ্গে উবে গেল। তিনি শুরু করলেন নেপোলিয়নের সমালোচনা এবং তোষামোদ শুরু করলেন বুর্বোঁ বংশের রাজাদের। এই অন্ধ রাজভক্তিরই পরিণাম তাঁর মার্কুইস উপাধি লাভ।

এই ভাবেই নিজের ব্যক্তিত্বকে বারবার খর্ব করেছেন লাপলাস। নিজের সুযোগ সুবিধা লাভই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন এক আদর্শহীন বিজ্ঞানী। অপরদিকে নিজের মনীষাকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন বিজ্ঞানের সেবায় যা মানববিজ্ঞানের ইতিহাসকে করেছে উজ্জীবিত। একই সত্তার এই দ্বৈতরূপ আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

অক্লান্ত নিষ্ঠায় নিজেকে বিজ্ঞানসাধনায় নিয়োজিত রেখেছিলেন লাপলাস। শেষ জীবনে তিনি বসবাস করেছেন আর্তুল শহরে। দেশবিদেশের বিজ্ঞানীরা এখানেই আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজে সাহায্য সহযোগিতা করতে তিনি কখনো কার্পণ্য করেননি। এতেই বোঝা যায় বিজ্ঞান সাধনার প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ ছিল কত গভীর।

দীর্ঘ জীবনকাল পেয়েছিলেন লাপলাস। আটাত্তর বছর বয়সে ১৮২৭ খ্রিঃ আর্কুল শহরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ফিলিপ এডোয়ার্ড অ্যান্টন ভন লেনার্ড

বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানমনীষী লেনার্ড। পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে তাঁর নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

হাঙ্গেরির প্রেসবার্গ রাজ্যের মফস্‌সল শহর পজসোনিতে ১৮৬২ খ্রিঃ ৭ জুন এক সাধারণ পরিবারে লেনার্ডের জন্ম।

অসাধারণ মেধা আর কৌতূহলের অধিকারী লেনার্ডের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ

হয়েছিল প্রকৃতির পাঠশালায়। নিজের চারপাশে যা দেখতেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন।

প্রকৃতি রাজ্যের বৈচিত্র্যের পরিচয় লাভ করতে গিয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর কিছু জানার আগ্রহটি তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এভাবেই বড় হয়ে উঠতে থাকেন তিনি।

একসময় পজসোনির স্কুলের গন্ডি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন তিনি। উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন রাজধানী শহর বুদাপেস্টে। এখানে বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হন এবং যথাসময়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

এবারে চলতে থাকে কর্মজীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি। ঘুরতে ঘুরতে তরুণ লেনার্ড উপস্থিত হলেন ভিয়েনা শহরে। এখান থেকে আবার বুদাপেস্টে। এখানে সান্নিধ্য লাভ করলেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী বুনসেনের।

সেই সময়ে এই সব্যসাচী বিজ্ঞানী পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন নিয়ে গবেষণায় মগ্ন। কিছুদিন তাঁর সঙ্গে সহকারীর কাজ করলেন লেনার্ড। তাঁর মনেও অঙ্কুরিত হল গবেষণার বীজ।

বুনসেনের পরামর্শে লেনার্ড উপস্থিত হলেন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতির সন্ধান নিলেন স্বনামখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী হেলমজের কাছে।

ভিয়েনা থেকে লেনার্ড এলেন জার্মানিতে। এখানেও স্থায়ী হতে পারলেন না। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কলিনবার্গের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন পদার্থবিদ্যার গবেষণা করে চলে গেলেন হাইডেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকেই ১৮৮৬ খ্রিঃ ডঃ কুইনিকের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে লেনার্ড পি-এইচ ডি হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর।

এরপর নতুনতর গবেষণার কাজে হাইডেনবার্গেই কাটিয়ে দিলেন টানা ছয়টি বছর। এতদিনে তাঁর মনে জমে উঠেছে ক্রুকসের মোক্ষণ নলের ক্যাথোড রশ্মি সম্পর্কে অপার কৌতূহল।

একপ্রকার বায়ুশূন্য নলে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করার পর দেখা যায় একধরনের রশ্মি তীব্রভাবে নলের ক্যাথোড বা ঋণাত্মক বিদ্যুৎদ্বার থেকে বেরিয়ে আসে, তাই হল ক্যাথোড রশ্মি।

এই রহস্যময় রশ্মির প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এটি কি সত্যিই কোন অসাধারণ রশ্মি না আলোকেরই ভিন্নরূপ এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে বিতর্ক।

এই প্রশ্নও অনেকে তুলেছেন, এই রশ্মি সম্পূর্ণরূপেই কি নল-আশ্রয়ী, না বাইরের আবহাওয়াতেও তা বর্তমান?

বাইরের জগতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যখন ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে এমনি আলোড়ন তুলেছে, ঠিক সেই সময়েই হাইডেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে লেনার্ড স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন ক্যাথোড রশ্মি সম্পর্কে।

এ সময়ের অবস্থা জানিয়ে একসময়ে লেনার্ড নিজেই বলেছেন যে আটের দশকে, ছাত্রজীবনে তিনি নতুন কিছু একটা করার তীব্র তাগিদ অনুভব করতেন। কিন্তু ক্রুকশের কাজ নিয়ে তাঁর কোন আগ্রহই সেই সময়ে ছিল না। কেন না, তিনি লক্ষ্য করেছেন, যেসকল গবেষক-বিজ্ঞানী ক্রুকশের নল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, হতাশা ছাড়া তাঁদের গবেষণার নিট ফল কিছু লাভ হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো সেই রহস্যময় অন্ধকারের আকর্ষণেই তিনি ক্রুকশের মোক্ষণ নল নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন।

হাইডেনবার্গে ডঃ কুইনিনের সহকারী হিসেবে গবেষণা করছিলেন সেসময়ে লেনার্ড। গবেষণায় থাকাকালীনই হঠাৎই বলতে গেলে আলোর সন্ধান পেয়ে গেলেন তিনি।

ক্রুকশের প্রায় বায়ুহীন পরিবেশকে আরও হালকা করবার উদ্দেশ্যে লেনার্ড তৈরি করলেন পারদ বায়ুকল। ক্যাথোড রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণায় এটিই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।

যেই সময়ে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা নিজেদের ভাবনাচিন্তাকে গন্ডিবদ্ধ করে রেখেছিলেন ক্যাথোড রশ্মির নলের বাইরে অবস্থানের সম্ভাবনার চুলচেরা বিচার নিয়ে, সেইসময় লেনার্ড ভাবলেন অন্য কথা। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন রহস্যময় রশ্মিটিকে মোক্ষণ নলের বাইরে অর্থাৎ খোলা বাতাসে কোনভাবে আনা সম্ভব কিনা, সেই পন্থা নিয়ে।

এই উদ্দেশ্যে পারদ বায়ুকলের সাহায্যে তিনি ক্রুকশের নলকে প্রায় বায়ুহীন করে ফেললেন। তারপর নলে পাঠালেন বিদ্যুৎপ্রবাহ। উপস্থিত করলেন ক্যাথোড রশ্মির পরিক্রমণ পথে ধাতব বাধাকেও। কিন্তু রশ্মি বাইরে এল না।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন লেনার্ড। আবার নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। সিলিকার স্ফটিক নিয়ে কাজ করার কথা মনে হল তাঁর। কারণ সিলিকার স্ফটিক বা কোয়ার্জের ভেতর দিয়ে পরিচিত সব বিকিরণই সহজভাবে যাতায়াত করতে পারে।

নতুন বুদ্ধি মাথায় খেলতেই নতুনভাবে প্রস্তুতি নিলেন লেনার্ড। মোক্ষণ নল গড়ে তার ঋণ বিদ্যুৎদ্বারের ঠিক ওপরে একখন্ড কোয়ার্জ পাত বসিয়ে দিলেন। পাতটি ছিল ২.৪ মি.মি পুরু। অধীর আগ্রহ নিয়ে এবারে তিনি এই নতুন নলে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালেন।

না, এই উপায়ও কোন ফল প্রসব করল না। নল একই রকম দীপ্তিহীন রইল।

নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়লেন না লেনার্ড। আবার বসলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে।

এভাবে কাটল ১৮৯২ খ্রিঃ পর্যন্ত টানা ছয় বছর। সেই সময় অভাবিত একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন অপ্রত্যাশিত ভাবে। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ হার্ৎজ তখন একজন যোগ্য সহযোগীর সন্ধান করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়তেই লেনার্ড যথারীতি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

হার্ৎজ নিজেও ছিলেন ক্যাথোড রশ্মি সম্পর্কে আগ্রহী। লেনার্ডের পরীক্ষার গতি-প্রকৃতিও তাঁর অজানা ছিল না। কাজেই তাঁর সহযোগীর কাজে লেনার্ডকেই সাগ্রহে বহাল করলেন হার্ৎজ।

এবারে ক্যাথোড রশ্মির রহস্য উদ্ঘাটনে দুজনেই কোমর বেঁধে গবেষণায় নামলেন।

হার্ৎজ তাঁর গবেষণায় লক্ষ্য করলেন, খুব পাতলা ধাতব পাতও ক্যাথোড রশ্মিকে যাতায়াতের পথ করে দেয়। ব্যাপারটা নজরে আসার পরেই তিনি সোনা, রূপা ও অ্যালুমিনিয়ম দিয়ে তিনটি খুব পাতলা সছিদ্র পাত তৈরি করলেন। এই পাতগুলি পৃথকভাবে ক্রুকশের নলে ব্যবহার করার ফলে দেখা গেল, ক্যাথোড রশ্মি অতি সহজেই ওই সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রম করে যাচ্ছে। কেবল তাই নয় ওই ধাতুর নিশ্ছিদ্র অংশটিও তার গতিপথে কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

এই পরীক্ষা নিয়েই হার্ৎজ ও লেনার্ড কাজে ডুবে রইলেন বন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

একদিন, তখন সবে সন্ধ্যা উৎরেছে, হার্ৎজ সছিদ্র অ্যালুমিনিয়াম পাত মোক্ষণ নলের বিদ্যুৎদ্বার নিয়ে ক্যাথোড রশ্মির প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করছিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে লেনার্ড তা দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, সছিদ্র পাতলা ধাতুর পাতের ওপরে কিছু ক্ষারীয় ফসফরাস চূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখা যেতে পারে ক্যাথোড রশ্মি নল থেকে বাইরে আসে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে তাই করলেন এবং সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন ঈপ্সিত সাফল্য।

এই সাফল্যের বিষয়ে তিনি পরে লিখেছেন "Lo and behold, the grains (of phosphor) glowed brightly there as well ! Thus not only had the cathode rays passed out the interior of the discharge tube to which they had been hitherto confined, in addition—and nobody could have predicdted this—they could

pass through air of normal density. It thus became clear that a vast new field of investigation had opened up in front of me, a field that not only embraced hitherto unseen-phenomena but also gave promise of a break through into the unknown, Cathode rays, which had hitherto stubbornly eluded explanation, had yielded their secret and, more important, now for the first time tests of maximum purity could be carried out.''

ক্যাথোড রশ্মিকে নলের বাইরে আনার চিন্তা মাথায় নিয়ে একের পর এক পরীক্ষার পর এভাবেই বৈজ্ঞানিক সাফল্য পেয়েছিলেন লেনার্ড।

এই কাজের সূত্রেই ইউরোপের বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়ল লেনার্ডের নাম। তাঁর এই পরীক্ষার সাফল্যের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালে বেকেরেল ও কুরি দম্পতি তাঁদের তেজস্ক্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্য পেয়েছিলেন লেনার্ডের এই পরীক্ষার সাফল্যের পথ ধরেই।

এই একটি মাত্র গবেষণার সাফল্যের সুবাদেই লেনার্ড ১৮৯৪ খ্রিঃ ব্রেসলু বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে গেলেন।

ব্রেসলু বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির দুবছরের মাথায়ই, ১৮৯৬ খ্রিঃ আহ্বান এল হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছাত্র ও গবেষক জীবনের একটা বড় অংশ এককালে তাঁর কেটেছিল সেই শিক্ষায়তনেই। লেনার্ড তাই সাড়া না দিয়ে পারলেন না।

অবিলম্বেই তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন তাত্ত্বিক পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপকের পদে।

সেখানে কাজ করার পরেই তিনি যোগ দিলেন বিশ্ববিখ্যাত কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবারে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক পদ।

চাকরির সঙ্গে এখানে লেনার্ড পেলেন পদার্থবিদ্যায় গবেষণার উপযোগী পরিবেশও।

পদার্থ বিদ্যার গবেষণার জন্য বিশেষ করে ক্যাথোড রশ্মি সংক্রান্ত কাজের জন্য ১৯০৫ খ্রিঃ লেনার্ডকে দেওয়া হল নোবেল পুরস্কার। তখন তাঁর বয়স ৪৩ বছর। এই ভাবেই বিশ্বখ্যাতি লাভ করলেন তিনি।

কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইলেকট্রনের উৎস সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে গভীর গবেষণা শুরু করলেন লেনার্ড। তিনি লক্ষ্য করলেন কোনও এক গ্যাসের আবহে ইলেকট্রনের স্রোত পাঠালে গ্যাসীয় কণা তড়িৎবাহী হয়ে ওঠে। কেবল তাই নয়, এই অবস্থায় ইলেকট্রনের নিজস্ব শক্তি অপরিবর্তিতই থেকে যায়। আর সেই শক্তি ওই গ্যাসের মধ্যে নিজস্ব শক্তি প্রভাবে গড়ে তোলে তড়িৎবাহী বা আয়নিত গ্যাসীয় অঞ্চল।

লেনার্ড এই সমীক্ষা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের আধুনিক পদার্থবিদদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গেল। পরের বছরেই এক চমকপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশ করে লেনার্ড তুলে ধরলেন যে কোনও পদার্থের পরমাণুর ভেতরকার বিচিত্র চিত্র।

সেই প্রবন্ধে তিনি জানালেন যে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে পরমাণু সম্পর্কে যা অনুমান করতে পেরেছেন, তা হল, পদার্থের অতি ক্ষুদ্র কণার সমবায়ই হল পরমাণু। প্রতিটি কণাই শক্তিসমৃদ্ধ——এগুলোর নাম হতে পারে dynamide। এই ডিনামাইডগুলো প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে এক নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করে।

কিন্তু প্রত্যেকটি কণার মধ্যেই রয়েছে সমসংখ্যার দুই ভিন্ন তড়িৎ-ধর্মিতা। এমন তড়িৎ-শক্তি সমৃদ্ধ পরমাণুগুলোর বাইরের চেহারাটি একেবারেই সাদামাটা।

লেনার্ড আরও লিখেছেন যে, পরমাণুর ভেতরের ১০০,০০০০০০০ ভাগের এক ভাগ বাদে বাকি সম্পূর্ণ অংশই মহাশূন্য।

পরমাণু সম্পর্কে লেনার্ডের এই তত্ত্ব নতুনভাবে আলোকিত করে তুলল আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রকে। সেই আলোক ধরেই পরবর্তীকালে ইলেকট্রনের তত্ত্ব নিরূপণে লরেনৎর্জ সাফল্যের দুয়ারে পৌঁচেছেন।

এর পরেই লেনার্ডের গবেষণা এক নতুন পথে দিক পরিবর্তন করে। তাঁর ধ্যানজ্ঞান নিবিষ্ট হয় বর্ণালী সংক্রান্ত গবেষণায়। তিনি খুঁজে ফিরতে থাকেন বর্ণালীর নানা রেখা, তার প্রকৃতি ও উৎস।

এই গবেষণায় লেনার্ডের সামনে ছিল তাঁর পূর্বসূরী বিজ্ঞানী, রাইডবার্গ, কেসার ও রুঙ্গে-এর গবেষণার প্রদীপ।

পদার্থবিদ্যার এই তিন দিকপাল বিজ্ঞানী বর্ণালী সংক্রান্ত গবেষণায় জানতে পেরেছিলেন যে সত্য তা হল, কোনও ধাতু নির্গত বর্ণালী রেখাগুলিকে দুই বা তারও বেশি শ্রেণীতে সাজানো যায়।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ণালীরেখার সকল শ্রেণীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলির মধ্যে থাকে এক আশ্চর্য গাণিতিক সম্পর্ক।

পূর্বসূরীদের এই প্রদীপ সামনে রেখে লেনার্ড খুঁজে পেয়ে গেলেন এক নতুন পথ। তিনি জানতে পারলেন, বর্ণালীরেখার এক এক শ্রেণীতে রয়েছে পরমাণুর এক এক পরিবর্তিত অবস্থা। আর এই পরিবর্তিত পারমাণবিক অবস্থাই নির্দিষ্ট শ্রেণীর পরিচয় নির্দেশ করে।

লেনার্ড এ-ও জানতে পারলেন, পরিবর্তিত পারমাণবিক অবস্থাগুলি হৃত উলেকট্রনের সংখ্যা ধরে আলাদা আলাদা করা যায়।

আলোকের দূত লেনার্ড তাঁর কৃতিত্বের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁর দেশে

ও বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছে সম্মানজনক ডি. এস-সি উপাধি।

১৯০৫ খ্রিঃ পেয়েছেন পদার্থ বিদ্যার নোবেল। একই বছরে ফ্রাঙ্কলিন পদক। জার্মান রেইখের ঈগল পান ১৯৩৩ খ্রিঃ।

১৯৪৭ খ্রিঃ বিশ্বখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী লেনার্ডের জীবনাবসান ঘটে।

জনাস সল্ক

ভয়ঙ্কর পোলিও রোগের কথা আজ সকলেরই জানা। এই রোগের ভ্যাক্সিন নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু হয় ১৯৫৫ খ্রিঃ। যে মহান বিজ্ঞানীর আবিষ্কার এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তাঁর নাম জনাস সল্ক।

পোলিও রোগের বৈজ্ঞানিক নাম পোলিও মাইয়েলাইটিস বা শিশু পক্ষাঘাত। শিশুদেরই বেশি এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। ভয়ঙ্কর রোগটির লক্ষণ হুবহু ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো। মাথা ধরা, সমস্ত শরীরে প্রচন্ড ব্যাথা, গা-বমি-বমি ভাব সেই সঙ্গে থাকে জ্বর।

এই ভাবে খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই রোগের জীবাণু স্নায়ুর পেশীগুলোকে অকেজো করে ফেলে। ফল পক্ষাঘাত।

কত অমূল্য জীবন যে এই রোগের আক্রমণে অসহায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে তার কোন লেখাজোখা নেই। সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা ৮০ জন শিশুরই এই রোগের সম্ভাবনা থাকে। সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থেকে অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়।

জনাস সল্কের আবিষ্কার পৃথিবীর মানুষকে এই ভয়ঙ্কর রোগের আতঙ্ক থেকে রক্ষা করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটান শহরে এক ইহুদি পরিবারে ১৯১৪ খ্রিঃ জন্মেছিলেন জনাস সল্ক। তাঁর বাবা শহরের কাপড়কলে কাজ করতেন। রোজগার যা হত তাতে সকলের খেয়ে পরে কোন মতে দিন কেটে যেত।

সল্করা ছিলেন তিন ভাই। পড়াশুনায় সকলেই চৌকস। তার মধ্যে জনাস সর্বোত্তম। সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বাবার ছিল সতর্ক নজর। ছেলেবেলা থেকেই বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন জনাস। সমবয়সী অন্য ছেলেরা যখন খেলাধুলো নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন জনাস। খেলাধুলো বিশেষ পছন্দ করতেন না।

শরীরও ছিল শীর্ণ। কিন্তু মেধা ছিল অসাধারণ। একবার যা মন দিয়ে পড়তেন, তা তাঁর মনে গেঁথে যেত।

নিউইয়র্ক শহরের টাউনসেন্ড হ্যারিস হাইস্কুলের খুব নামডাক ছিল। এই স্কুলেই পড়াশুনা করেছিলেন জনাস।

পরীক্ষায় তাঁর ফলাফল হত চমকপ্রদ। স্কুলের ছাত্র শিক্ষক সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। স্কুলের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত বরাবর সবার ওপরে থাকত তাঁর রেজাল্ট।

হ্যারিস স্কুল থেকে সসম্মানে স্নাতক হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জনাস ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। এই কলেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠলেন। তাঁর বেশি ভাল লাগত চিকিৎসা বিজ্ঞান।

সিটি কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি ভর্তি হলেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিভাগে। আর এই সময় থেকেই জীবনের পথটিও ছকা হয়ে যায়। তিনি স্থির করেন ডাক্তারি পাশ করে চিকিৎসা গবেষণাতেই আত্মনিয়োগ করবেন।

সিটি কলেজের পরীক্ষাগুলিতেও অসাধারণ ফল করতে লাগলেন তিনি। সব পরীক্ষাতেই তাঁর স্থান সবার প্রথমে। ফলে সবরকম বৃত্তিই তিনি লাভ করলেন। বৃত্তির টাকাতেই চলতে লাগল তাঁর পড়াশুনা।

মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়েই জনাসের পরিচয় হয় ডঃ মরিস ব্রডির সঙ্গে। ডঃ ব্রডি সেই সময় পোলিও রোগ নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

সেই কলেজে আরও এক যশস্বী গবেষক অধ্যাপক ছিলেন ডঃ ফ্রান্সিস। তিনিও একই সময়ে গবেষণা করছিলেন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ওপর।

জনাসকে কিন্তু আকর্ষণ করল ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ওপরে ডঃ ফ্রান্সিসের কাজ। আশ্চর্য এই যে উত্তরকালে ইনফ্লুয়েঞ্জা নয় পোলিও রোগ নিয়ে গবেষণার ফলেই জনাস বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন।

ডঃ ফ্রান্সিসের কাছেই কাজ শিখতে লাগলেন জনাস। সমকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইনফ্লুয়েঞ্জা বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডঃ ফ্রান্সিস ইতিমধ্যেই বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তাঁর কাছে কাজ শিখে গবেষণার নাড়িনক্ষত্র জানা হয়ে যায় জনাসের। এই শিক্ষাই তাঁকে পরবর্তীকালে গভীরতর গবেষণায় প্রেরণা জুগিয়েছে।

সেই সময়ে ভাইরাস-ঘটিত রোগের প্রতিষেধক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন।

একদল গবেষক, ভাইরাসকে মেরে তা দিয়ে রোগের প্রতিষেধক তৈরি করে রুগীর শরীরে প্রয়োগ করছিলেন। এর ফলে রুগীর দেহে কোনরূপ বিরূপ

প্রতিক্রিয়া ঘটত না। কিন্তু এই ধরনের প্রতিষেধকের মেয়াদ হত খুবই অল্প। মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাকসিন নিতে হত।

দ্বিতীয় ভাগের গবেষকরা চিকিৎসার এই অসুবিধার দিক বিবেচনা করে জ্যান্ত ভাইরাসকেই তাঁরা প্রতিষেধক রূপে রুগীর শরীরে প্রয়োগ করতেন। এতে সুবিধা ছিল।

প্রতিষেধক প্রয়োগের ফলে রুগীর দেহে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হত, তা দীর্ঘস্থায়ী হত। ঘন ঘন ভ্যাকসিন নেবার দরকার হত না। কিন্তু এই পদ্ধতির একটি মারাত্মক কুফলও ছিল।

ভ্যাকসিন প্রয়োগে যদি গোলমাল হত তাহলে রোগ প্রতিরোধের বদলে শরীর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ত।

এই ভাবেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেই সময় চলছিল রোগ প্রতিরোধ শক্তির গবেষণা।

ডঃ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রথম মতের সমর্থক। তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস দিয়ে কালচার বানিয়ে অর্থাৎ জৈব মাধ্যমে তাদের বংশবিস্তার ঘটিয়ে সেই ভাইরাসগুলির ওপর অতি-বেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করে মেরে ফেলতেন। পরে ওই মৃত ভাইরাসকেই প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন হিসাবে ব্যবহার করতেন। এই পথ ধরেই চলছিল তাঁর গবেষণা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই অনুরূপ লক্ষণযুক্ত আরও একটি রোগের প্রতিও দৃষ্টি পড়েছিল গবেষকদের। সেটি হল পোলিও রোগ। সেই সময়ে এই ভয়াবহ রোগটির আক্রমণে লক্ষ লক্ষ শিশু শৈশবেই পঙ্গু হয়ে পড়ছিল। তাই তার প্রতিষেধক আবিষ্কারের কাজে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন কিছু বিজ্ঞানী। ডঃ ব্রাডিও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর থেকেই পোলিও রোগের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কারের জন্য গবেষণায় ডুবে গিয়েছিলেন তিনি।

একই সময়ে আরও একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইরোলজি বিভাগে। তাঁর নাম ডঃ জন ফিলমার।

কিন্তু গবেষণার ফলাফল তাঁরা দুজনে যা লাভ করলেন তার ফল হল দুর্ভাগ্যজনক।

ভাইরাস দিয়ে প্রতিষেধক তৈরি করলেন দুজনেই। সেই প্রতিষেধক প্রয়োগ করা হল কয়েকজনের সুস্থ শরীরে। পরে দেখা গেল, রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলবার বদলে ওই ভ্যাকসিন শরীরে পোলিও রোগ ডেকে আনল। ফল দাঁড়াল সারাজীবনের পঙ্গুত্ব।

এই ঘটনার পরে ডঃ ব্রডি ও ডঃ কিলমার আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন অকেজো হয়ে গেল। অপযশের দায় মাথায় চাপল দুজনের।

আর তাঁদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও হয়ে পড়লেন আতঙ্কগ্রস্ত। ডঃ ব্রডি ও ডঃ কিলমারের গবেষণা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাননি কেউ।

জনাস ডাঃ ফ্রান্সিসের তত্ত্বাবধানে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়েই গবেষণা করছিলেন। এই সময়েই জীবনে একটি ভুল করে বসলেন তিনি। ডুবে ছিলেন ল্যাবরেটরি নিয়ে, তার মধ্যে কাঁধে চাপালেন সংসারের বোঝা। তিনি বিয়ে করে বসলেন। ফলে সংসারের খরচ-খরচার বাড়তি চাপ নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। অর্থের অভাব মেটাবার জন্য বাড়তি রোজগারের উপায় ভাবতে হল তাঁকে।

শেষপর্যন্ত বন্ধুরা পরামর্শ দিল গবেষণার কাজে সময় নষ্ট না করে অর্থ রোজগারের জন্য প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করতে।

জনাস কিন্তু আর্থিক অনটনের মধ্যে থেকেও বন্ধুদের পরামর্শ মেনে নিতে পারলেন না। তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস ও প্রতিষেধক প্রস্তুতির গবেষণাতেই মেতে রইলেন। এই ভাবে কেটে গেল পাঁচটি বছর।

তারপর চলে এলেন পিটসবার্গ মেডিকেল কলেজে। সেখানে তখন সবে ভাইরাস বাহিত রোগের ওপর কাজ করার জন্য গবেষণাগার তৈরি হয়েছে। সেই গবেষণাগারেরই অধিকর্তা হলেন জনাস।

নতুন কর্মস্থলে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করার প্রশস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেও বিলম্ব করলেন না তিনি। ইনফ্লুয়েঞ্জা ছেড়ে গবেষণা শুরু করলেন পোলিও নিয়ে।

ইতিমধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে সাত বছর কাজ করেছিলেন জনাস। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর কাজের ক্ষেত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়। পোলিও নিয়েই স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে। এই চিন্তা থেকেই মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে পিট্সবার্গে চলে এসেছিলেন।

এখানে ইতিমধ্যেই পোলিও রোগের ওপর কাজ করার জন্য একটি বিশেষ টিম তৈরি করার প্রস্তুতি চলছিল। জনাস এসে এই টিমের অধিনায়কের পদটি গ্রহণ করলেন এবং যথারীতি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন।

নিজের ঘরে বসে একের পর এক প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে চললেন। পরীক্ষা চালাচ্ছেন গিনিপিগ আর বানরের ওপরে।

শেষ পর্যন্ত বানরের ওপরে ভাইরাসের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগের পরেই পেয়ে গেলেন ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান।

এই কাজে মার্কিন সরকারেরও অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলেন জনাস।

ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসের সঙ্গে দীর্ঘ সাত বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল জনাসের। কাজেই পোলিওর ভাইরাসদের আলাদা করে চিনে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হল না তাঁর। তিনি জেনে গেলেন পোলিওর ভাইরাস হুবহু ফ্লুর মতো দেখতে হলেও তার ক্রিয়াকর্ম আলাদা।

এই পর্যন্ত অগ্রসর হবার পরেই জনাস হাতে পেয়ে গেলেন পোলিও গবেষণার ওপরে তিন স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানীর সাফল্যের বিবরণ। এই তিন বিজ্ঞানী হলেন এন্ডারস, ওয়ালার এবং রবিনসন।

এই তিন বিজ্ঞানী প্রাণীর শরীরের টিস্যুতে পোলিও ভাইরাসের কালচার তৈরি করে তাদের বংশ বৃদ্ধির উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। আর এই কালচার নিয়ে গবেষণা করে ডাঃ ডেভিড ব্রডিয়ান নামে এক গবেষক আবিষ্কার করেছিলেন পোলিও ভাইরাস তিন রকমের হয়। তিনি তাদের আলাদা করেছিলেন টাইপ-I, টাইপ-II, ও টাইপ-III নামে।

নানান পত্র পত্রিকা ঘেঁটে পোলিও নিয়ে যাঁরা ইতিপূর্বে কাজ করেছেন তাদের বিবরণ সংগ্রহ করতে লাগলেন জনাস। সেসবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন নিজের গবেষণা।

এমনি করেই একসময়ে তিনি পেয়ে গেলেন একটি সংবাদ। ডঃ হোউই নামে এক গবেষক নাকি হপকিন্স গবেষণাগারে কাজ করার সময়ে পোলিও রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তিনি কালচার তৈরি করার জন্য পোলিও ভাইরাসের ওপরে 'রে' প্রয়োগ না করে করেছেন ফরম্যালডিহাইড রাসায়নিক। তার ফলে যে মৃত ভাইরাস পেয়েছেন তা দিয়েই তৈরি করেছেন ভ্যাক্সিন।

ডাঃ হোউই-এর ভ্যাকসিন পূর্বোক্ত তিন টাইপের পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধেই প্রাণীর শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে।

কিন্তু দেখা গেল ডাঃ হোউই-এর ভ্যাকসিনকে নানা কারণে যথোপযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায় নি। তবে তাঁর এই গবেষণার ফলে পোলিও ভ্যাকসিন আবিষ্কারের কাজটি অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে।

মার্কিন সরকার পোলিও রোগ প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। সরকারের তরফ থেকে বিজ্ঞানীদের আশ্বাস দেওয়া হল, খরচের কথা না ভেবে তাঁরা যেন নিশ্চিন্তে গবেষণা করে যান।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা সরকারের সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। জনাসও দিনরাত ভুলে পোলিওকে জব্দ করার উপায় খুঁজতে লাগলেন।

কেবল আমেরিকাতেই নয়, সেই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পোলিও

নিয়ে গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে। তার বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন জার্নালে।

উপস্থিত হল ১৯৫১ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাস। জনাস এতদিনে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। পোলিও রোগের পেছনে রয়েছে টাইপ-I, টাইপ-II, ও টাইপ-III এই তিন ধরনের ভাইরাস।

একটি বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর তিনি কার্যকরী ভ্যাকসিন আবিষ্কারের কাজে মগ্ন হলেন। এমন ভ্যাকসিন তৈরি করতে হবে যা এই তিন ভাইরাসের বিরুদ্ধেই অ্যান্টিবডি তৈরি কববে কিন্তু প্রাণীর শরীরে হবে না কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

এর মধ্যে জানা গেল, ডাঃ সাবিন নামে বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে একদল বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলাফল। ডাঃ সাবিন জানিয়েছেন, ভাইরাসের মৃতদেহ নিয়ে ভ্যাক্সিন তৈরির চেষ্টা নিষ্ফল। যেভাবে গুটি বসন্তের ভ্যাকসিন যেমন মৃত নয় মৃতবৎ ভাইরাস দিয়ে তৈরি হয়েছিল, পোলিও রোগের কার্যকরী ভ্যাকসিনও সেভাবেই তৈরি করতে হবে। এছাড়া অন্য পথ নেই।

জনাস সঙ্ক কিন্তু এই সম্ভাবনার কথা মানতে পারলেন না। তিনি জানালেন, ডাঃ সাবিনের উপদিষ্ট পথে ভ্যাকসিন তৈরি হলে তা শরীরের পক্ষে হবে খুবই মারাত্মক। পোলিও ভ্যাক্সিন তৈরি করতে হবে মৃত ভাইরাস দিয়েই।

ডাঃ ফ্রান্সিসও জনাসের মতামতকে সমর্থন জানালেন। এইভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার ফলাফল নিয়ে দুটি শিবির গড়ে উঠল। এক শিবিরের মাথায় রইলেন ডাঃ সাবিন। অন্য শিবিরের নেতৃত্ব রইল জনাস সঙ্কের হাতে।

মৃত ভাইরাস নিয়ে পোলিও রোগের ভ্যাক্সিন তৈরির সম্ভাবনায় জনাস ছিলেন আশাবাদী। তিনি দেখেছেন, মৃত ভাইরাসের ভ্যাকসিন ব্যবহার করে ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। এই ভ্যাকসিন স্বল্পায়ু হলেও এতে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে না।

জনাস এই পথ ধরেই গবেষণায় ডুবে গেলেন। তিনি স্থির করলেন. পোলিও ভাইরাসের তিন রকম টাইপের এমন একটিকে বেছে নিতে হবে যার মৃতদেহ দিয়ে তৈরি ভ্যাকসিন তিনরকম ভাইরাসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারবে। যদিও সঙ্ক জানতেন সবরকম ভ্যাকসিনেই কিছু না কিছু অসুবিধা থেকেই যায়। সর্বসুবিধাযুক্ত আদর্শ ভ্যাক্সিন তৈরি করা সম্ভব নয়। সব জেনেও তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে ভ্যাক্সিনের গুণাগুণ যাচাই করে চলেন। ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা প্রমাণের পরীক্ষা চালাতে থাকেন একের পর এক বানরের ওপর।

চেষ্টা ও নিষ্ঠার একাগ্রতার ফল ফলতেও দেরি হয় না। একটি কার্যকরী ভ্যাক্সিন অবিলম্বেই তৈরি করতে সক্ষম হলেন সল্ক।

কিন্তু সাফল্যের পেছন পেছনই সন্দেহ জাগে মনে, ভ্যাক্সিনের নির্ধারিত গুণ মানুষের দেহেও বজায় থাকবে তো?

১৯৫৩ খ্রিঃ গোড়ার দিকে জনাস সল্কের পোলিও রোগের ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের সংবাদটি প্রথম প্রকাশিত হল নিউইয়র্কের একটি দৈনিক পত্রিকায়।

খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পিটসবার্গের মেডিকেল কলেজের সামনে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। দলে দলে নরনারী শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ভিড় জমাতে লাগলেন। সকলেই চাইছেন আগাম প্রতিষেধক নিয়ে সন্তানকে ভবিষ্যতে পোলিওর সম্ভাবনা থেকে মুক্ত রাখতে।

ইতিপূর্বে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ১৯১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দের মতো ওই বছরেও দেশে একটা মহামারী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার বদলে এবারে হয়তো পোলিওই হবে সেই মহামারীর উৎস। সেকারণে পোলিও সম্পর্কে আতঙ্কে ভুগছিলেন সন্তানের পিতামাতারা।

ক্রমবর্ধমান ভিড় দেখে প্রমাদ গুণলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের এবং জাতীয় বৃত্তি কমিটির অনুরোধে সল্ককে দূরদর্শনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য দেশবাসীকে জানাতে হল।

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে তিনি জানালেন, যে তাঁর ভ্যাক্সিনটি পোলিও রোগের একটি আদর্শ প্রতিষেধক হিসাবে কার্যকরী হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনো যথেষ্ট পরিমাণ ভ্যাক্সিন তৈরি করে ওঠা সম্ভব হয়নি বলে উপস্থিত অনেক শিশুকেই ফিরে যেতে হবে। তবে তিনি এই বলে সকলকে আশ্বাস দেন যে অবিলম্বে উপযুক্ত পরিমাণ ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা তিনি করবেন।

সল্কের আন্তরিক আশ্বাস, বিনীত মূর্তি ও ব্যক্তিত্ব সেদিন জনগণের মনে এই বিশ্বাস এনে দিয়েছিল যে সল্ক তাঁদের পোলিও আতঙ্ক থেকে নিশ্চিত মুক্তি দিতে সক্ষম হবেন। পোলিও সম্পর্কে তাদের ভয় অনেকটাই প্রশমিত হল।

লোককল্যাণের কাজে পোলিও ভ্যাক্সিন টিকা প্রবর্তনের আগে সল্ক পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিজের শরীরেই প্রথমে টিকা নিলেন। ফলাফলে সন্তুষ্ট হয়ে একই টিকা স্ত্রী ও তিন সন্তানকে দিলেন।

এরপরে আর কোন সংশয় রইল না। ব্যাপকভাবে টিকাদান শুরু করলেন। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন জাতীয় বৃত্তি ব্যবস্থাপকের কর্তা ব্যাসিল ও' কন্নার ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। দেখতে দেখতে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পরে অন্যান্য দেশেও পোলিওর টিকার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

সঙ্কের নতুন এই আবিষ্কারে ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পর্কে বিশ্বের তাবৎ চিকিৎসকদেরও নিশ্চিন্ত করল টিকাদানের প্রসারের গোড়ার দিকের একটি ঘটনা।

বিশ্ববিখ্যাত ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ও সঙ্কের প্রেরণাদাতা ও শিক্ষাগুরু ডাঃ ফ্রান্সিস ১৯৫৪ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে নিজের উদ্যোগ নিয়ে আঠারো লক্ষ শিশুকে পোলিওর টিকা দেওয়ালেন। পোলিও এই শিশুদের একজনের কাছেও ঘেঁষতে পারল না। সঙ্কের আবিষ্কারের সাফল্যের এই সংবাদ রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বজুড়ে উৎসাহ উদ্দীপনার ঢেউ তুলল।

এতদিন পরে মারাত্মক পোলিও রোগের একটি ভ্যাক্সিন পেয়ে বিশ্বের অসংখ্য আর্ত পিতামাতা তাঁদের শিশুর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন হলেন।

সঙ্কের জীবনের এই মহৎ সাফল্য এনে দিয়েছিল তাঁর একাগ্র সাধনা ও নিঃস্বার্থ ত্যাগ। অবশ্য তাঁকে পথ দেখিয়েছিল তাঁর পূর্বসূরী প্রতিভাবান চিকিৎসাবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস, সাবিন, কিলমার, ব্রডি ও বডিয়ান প্রমুখের পোলিও ভ্যাক্সিন সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফলগুলি।

অবশ্য বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান সাধকদের সাধনার ফলাফলের পরম্পরা ধরাবাহিক ধারায় চূড়ান্ত পরিপূর্ণতার রূপ লাভ করে। বিজ্ঞানের ইতিহাসের এটিই চিরন্তন ঐতিহ্য।

পরবর্তী পর্যায়ে সঙ্ক তাঁর ভ্যাক্সিনকে আরও উন্নত মানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আর্ত মানবতার পরম বন্ধু মহান চিকিৎসাবিজ্ঞানী জনাস সঙ্ক ১৯৪৭ খ্রিঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জীবক

মানুষের নীতিবোধ, মানবিকতা ও দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের যদি কোন সার্থক মাধ্যম থেকে থাকে তবে তা হল চিকিৎসাবিদ্যা। মানবসেবার এমন সহজ ও সম্ভাব্য পথ দ্বিতীয় নেই।

প্রাচীন ভারতে যে কজন প্রতিভাধর চিকিৎসা-বিজ্ঞানী নিজেদের কর্মকৃতিত্বের বলে দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে চিরকালের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে জীবক বিশিষ্টতম। তিনি ছিলেন মহান মানবত্রাতা বুদ্ধের সমসাময়িক।

জীবক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব নিজ শিষ্যদের বলতেন, 'জীবককে

তোমরা সামান্য ভেব না। তিনি এক ছদ্মবেশী মহাত্মা। এই জীবনেই পান করেছেন অমরত্বের অমৃত।'

জীবকের নির্লোভ জীবন ও তাঁর কর্মদক্ষতাকে শ্রদ্ধা জানাবার কথা বুদ্ধদেব বারবার বলতেন তাঁর শিষ্যদের।

সমকালীন ভারতের সাধারণ মানুষ থেকে রাজরাজড়া পর্যন্ত সকলেই পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন, মর্যাদা জানিয়েছেন জীবকের অলোকসামান্য চিকিৎসা-প্রতিভাকে।

বুদ্ধের মহাজীবনের আলোয় আলোকিত ছিল জীবকের জীবন ও কর্ম। তাই বৌদ্ধগ্রন্থকারেরা তাঁর জীবনের অনেক চমকপ্রদ তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের অপর কোন বিজ্ঞানীর জীবন সম্পর্কেই এমন স্পষ্ট তথ্যাদি জানা যায় না।

তবে তাঁর জন্ম সালটি নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে রয়েছে মতভেদ। অনুমান করা হয় খ্রিস্টের জন্মের ৫৭০ বছর পূর্বে জীবকের জন্ম হয়েছিল।

বর্তমানে উত্তর ভারতের যে সহরটির নাম রাজগীর, প্রাচীনকালে তার পরিচিতি ছিল রাজগৃহ নামে। এই রাজগৃহ ছিল মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী। সম্রাট বিম্বিসারের রাজত্বকালে এখানেই সলাবতী নামের এক নর্তকীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল জীবকের। বিলাসিনী মা সদ্যজাত শিশুপুত্রকে এক জঙ্গলে ফেলে এসেছিলেন।

কিন্তু মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেও কয়েকজন পথিকের অনুগ্রহে পরিচয়হীন শিশুটির প্রাণরক্ষা হয়েছিল।

জঙ্গল থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে তারা নিয়ে যায় এক চিকিৎসকের কাছে। তাঁর দয়া ও যত্নে শিশুটির জীবন রক্ষা পায়।

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটির সংবাদ পেয়ে যুবরাজ অভয় কৌতূহল বশে এসেছিলেন দেখতে। ফিরে যান তাকে পরম স্নেহে বুকে তুলে নিয়ে। যুবরাজ অভয়ের কাছেই প্রতিপালিত হতে থাকে সেই শিশু। তার নামকরণ তিনি করেন জীবক কুমার ভক্ক।

এই নামের তাৎপর্য হল, মৃত্যুর মুখ থেকে জীবন ফিরে পেয়েছে বলে জীবক। আর রাজকুমার কর্তৃক প্রতিপালিত বলে কুমার ভক্ক।

রাজ পরিবারেই বড় হয়ে ওঠেন জীবক। একসময় নিজের জন্ম ইতিহাসও তাঁর অজ্ঞাত থাকে না। এক চিকিৎসকের চিকিৎসা গুণে তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছিল। তাই তিনি কৈশোরেই সঙ্কল্প নেন, জন্ম নয়, কর্মই হবে তাঁর পরিচয়। চিকিৎসাবিদ্যাই হবে তাঁর জীবনের পথ। মানুষের সেবাতেই নিয়োজিত করবেন জীবন।

সেই কালে তক্ষশীলা ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। সেখানে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কাছে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করবার সঙ্কল্প নিয়ে জীবক একদিন তক্ষশীলায় রওনা হলেন।

কাউকে কিছু না জানিয়ে বহু মাসের পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে তক্ষশীলায় এসে তিনি এক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থকাররা জানিয়েছেন, জীবকের গুরু ছিলেন তৎকালের জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসক। দেশ-বিদেশের শত শত ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করত।

সাত বৎসব চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে রাজগৃহের পথে যাত্রা করেন জীবক।

বর্তমান উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলায় একটি অঞ্চলের নাম ছিল সাকেত। বাড়ি ফেরার পথে সেই সাকেতে পৌছলে, এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে চিকিৎসক হিসেবে জীবকের নাম রাতারাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সাকেত শহরের এক ধনী সওদাগরের স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। দেশ বিদেশের বহু বৈদ্য তাঁর চিকিৎসা করেছেন কিন্তু রুগীর মাথার অসুখ কেউ ভাল করতে পারেন নি। অসুস্থ স্ত্রীর জন্য চরম অশান্তির মধ্যে দিন কাটছিল সেই সওদাগরের।

পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পথের পাশে এক গাছতলায় বসে বিশ্রাম করছিলেন জাতক। ঘটনাচক্রে সেই পথেই যাচ্ছিলেন সেই সওদাগর। দিব্যকান্তি যুবক জীবককে দেখে কৌতূহলী হয়ে তিনি তাঁর পরিচয় জানতে চান। সদ্য চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত করে বাড়ি ফিবে চলেছেন জানতে পেরে, তিনি জীবকে তাঁর দুঃখের কথা জানিয়ে অনুরোধ করেন স্ত্রীর চিকিৎসা করার জন্য।

তখনো পর্যন্ত স্বাধীনভাবে কোনও রুগীর চিকিৎসা করেন নি জীবক। তাই বড় বড় চিকিৎসকরা যে রোগ ভাল করতে ব্যর্থ হয়েছেন সে ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাবার সাহস পেলেন না তিনি। সবিনয়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানালেন সওদাগরকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সওদাগরের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সওদাগরের রোগ-পীড়িত স্ত্রীকে দেখতে যেতে হল।

রুগীকে যথাযথ পরীক্ষা করার পর জীবক বিশেষ কিছু ভেষজ গুঁড়ো করে তার সঙ্গে ঘি মিশিয়ে খলনুড়িতে মেড়ে একটি পাত্রে জ্বাল দিলেন। তারপর তরল পদার্থটিকে অন্য এক পাত্রে নিয়ে সওদাগর-পত্নীকে দিলেন। বললেন চিৎ হয়ে শুয়ে একটু একটু করে তরলটি নাক দিয়ে টেনে নিতে।

সওদাগর-পত্নী অতি কষ্টে অনেক সময় ধরে কাজটি করলেন। তরলটি মুখে

চলে এলো। বিস্বাদ ওষুধ। তবু ওই ভাবেই প্রক্রিয়াটি রুগীকে দিয়ে হাতে ধরে করালেন জীবক।

ঘন্টা দুই পরেই মন্ত্রের মতো কাজ পাওয়া গেল। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় সাত বছর ধরে শয্যাশায়ী যে রুগী তিনি প্রশান্ত হাসি মুখে নিয়ে ধীরে ধীরে শয্যায় উঠে বসলেন। সমস্ত যন্ত্রণা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

তরুণ চিকিৎসক জীবক এইভাবে তাঁর প্রথম চিকিৎসাতেই অসাধারণ সাফল্য পেলেন। লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না।

কৃতজ্ঞ সওদাগর উপযুক্ত মর্যাদায় জীবকের হাতে তুলে দিলেন তখনকার মুদ্রায় ১৬০০ কার্ষাপণ। সেই সঙ্গে উপহার দিলেন এক ক্রীতদাস, এক ক্রীতদাসী ও একটি রথ।

সমস্ত উপহার নিয়ে জীবক ফিরে এলেন রাজগৃহে। তাঁর পালক পিতা যুবরাজ অভয় এতদিন পরে জীবককে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। তারপর তাঁর কৃতিত্বের সংবাদ পেয়ে মুগ্ধ হন। জীবক সওদাগরের দেওয়া যাবতীয় উপহার পিতৃপ্রণামী হিসেবে তুলে দেন অভয়ের হাতে। জীবকের ব্যবহারে অভিভূত হন যুবরাজ।

এর পরেই জীবকের জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। অভয় জীবকের চিকিৎসা গবেষণার জন্য রাজপ্রাসাদের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে দেন। সেখানেই নগরীর রুগীদের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন জীবক। চিকিৎসার পাশাপাশি চলতে থাকে গবেষণার কাজও।

খ্রিঃ পূঃ ৫৪৯ অব্দ। এই সময়ে মহারাজ বিম্বিসার হঠাৎ মলদ্বারের কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। অসহ্য যন্ত্রণা তার সঙ্গে রক্তক্ষরণ। দিন দিনই তাঁর অবস্থা খারাপ হতে লাগল।

খবর পেয়ে ছুটে যান জীবক। রাজার অনুরোধে গ্রহণ করেন তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব।

প্রথমে তিনি রুগীকে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর তাঁর পরীক্ষাগারে গিয়ে নানা ভেষজ মিশিয়ে তৈরি করলেন এক আশ্চর্য মলম।

এই মলম দিনে দুবার করে এক সপ্তাহ ব্যবহার করেই রাজা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আনন্দিত বিম্বিসার দুহাত ভরে নবীন চিকিৎসককে উপহার দিলেন। কেবল তাই নয়, অবিলম্বে জীবককে নিযুক্ত করলেন প্রধান রাজচিকিৎসকের পদে।

এরপরেই ঘটে ভারত ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। মগধ সাম্রাজ্যের মহাপরাক্রান্ত সম্রাট ভগবান বুদ্ধের কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। বৌদ্ধধর্ম হল রাজধর্ম। এই ঘটনায় বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পথ আরও সুগম হল।

সমগ্র ভারত ক্রমেই উত্তাল হয়ে ওঠে বুদ্ধদেবের প্রচারিত মহামন্ত্রে।

অনুপ্রাণিত জীবক শরণ নিলেন বুদ্ধের। মহারাজ বিম্বিসার বুদ্ধদেব ও তাঁর সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের চিকিৎসার ভার অর্পণ করলেন জীবকের হাতে। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের ব্যস্ততা আরও বাড়ল।

সেই সময়ে অবন্তী রাজ্যে রাজত্ব করতেন রাজা কন্দপ্পজোত। হঠাৎ তিনি আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য কমলা রোগে। রাজার সমস্ত শরীরের রং হয়েছে হলুদবর্ণ। সেই সঙ্গে দুর্বলতা। কন্দপ্পজোত দিন দিনই অশক্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। রাজবৈদ্যদের চিকিৎসাতেও কোন ফল দর্শাল না। দূর-দূরান্ত থেকে নামী চিকিৎসকদের আনা হল। কিন্তু রোগ নিরাময়ের কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

শেষ পর্যন্ত অবন্তীরাজ চিঠি পাঠালেন বিম্বিসারের কাছে। রাজচিকিৎসক জীবককে পাঠিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানালেন।

সেই করুণ চিঠি পেয়ে বিম্বিসার জীবককে পাঠিয়ে দিলেন অবন্তী নগরে।

নবীন চিকিৎসক যথারীতি রুগীকে দেখলেন। কিন্তু চিকিৎসার জন্য যে ওষুধের কথা তিনি বিবেচনা করলেন, তা প্রয়োগে আকস্মিক বাধার সম্মুখীন হলেন তিনি। কথাপ্রসঙ্গে জীবক শুনলেন, রাজা কখনো ঘি খান না, এমন কি ঘি নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না। অথচ জীবকের ওষুধ হবে ঘৃতপক্ক।

কিন্তু রুগীর চিকিৎসা তো তাঁকে করতে হবে। ভেবেচিন্তে এক কৌশল অবলম্বন করলেন জীবক। যথাবিধি ওষুধ প্রস্তুত করে রাজার সেবকের হাতে দিয়ে বললেন, কিছুক্ষণ পরেই যেন সেটি রাজাকে খাইয়ে দেওয়া হয়।

ওষুধ হস্তান্তর করে তিনি আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে হাতীতে চড়ে রওনা হলেন রাজগৃহের পথে।

এদিকে অবন্তীরাজ ওষুধ গলায় ঢালার পরেই বুঝতে পারলেন সেটি ঘৃতপক্ক। সব জেনেশুনে জীবক তাঁকে ঘৃতমিশ্রিত ওষুধই খাইয়েছে। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারালেন তিনি। তখনই এক বলশালী ক্রীতদাসকে পাঠালেন জীবককে ধরে আনার জন্য।

এদিকে চলতে চলতে পার্শ্ববর্তী কেশাম্বী নগরে পৌঁছেছেন জীবক। সকালবেলা এক পিপুল গাছের নিচে বসেছেন প্রাতঃরাশ নিয়ে। এমন সময় রাজাদেশ নিয়ে উপস্থিত হল অবন্তীরাজের সেই ক্রীতদাস। তখনই তাঁকে ফিরে যেতে হবে রাজার কাছে। ক্রীতদাস জানালেন, প্রয়োজন হলে জীবককে বেঁধে নিয়ে যেতেও সে পিছপা হবে না।

ধীরভাবে সবকথা শুনলেন জীবক। তিনি হেসে বললেন, প্রাতরাশ শেষ করেই তিনি যাবেন তার সঙ্গে।

এই বলে সাদরে সামান্য আমলকী ফল ক্রীতদাসটিকে দিলেন খাবার জন্য।

আহ্লাদিত হয়ে লোকটি ফল মুখে দেয়। তারপরেই ছুটল পেট। তরল পায়খানা করে করে নেতিয়ে পড়ল তার শরীর।

বেচারা তখন জীবককে কাকুতি মিনতি করে তার প্রাণ বাঁচাবার অনুরোধ জানাতে লাগল।

জীবক তখন লোকটিকে তার পালিয়ে আসার কারণ খুলে জানিয়ে বলেন, তাঁকে মগধে চলে যাবার সুযোগ করে দিলে তিনি তাকে সুস্থ হওয়ার ওষুধ দেবেন।

প্রাণের দায়ে দাসটি জীবকের প্রস্তাবে সম্মত হয়। জীবক তখন তাকে আর এক ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তোলেন।

এরপর জীবক মগধের দিকে রওনা হন। আর দাসটি ফিরে গিয়ে অবন্তীরাজকে জানায় জীবকের সন্ধান পাওয়া গেল না।

জীবক যে অষুধ রেখে গিয়েছিলেন তা খেয়ে অবন্তীরাজ কন্দপ্পজোত অল্পদিনেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। জীবকের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য খুবই অনুতপ্ত হলেন তিনি। জীবককে অবন্তীতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র পাঠালেন। মহারাজ বিম্বিসারই দূতকে বলে পাঠালেন, জীবকের আর অবন্তীতে যাওয়া সম্ভব নয়।

অনুতপ্ত লাঞ্ছিত অবন্তীরাজ শেষ পর্যন্ত দূতের হাত দিয়েই উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্র জীবকের জন্য উপহার পাঠিয়ে দিলেন। সেই রাজকীয় উপহার বুদ্ধের চরণে উৎসর্গ করে ধন্য হলেন জীবক।

জীবকের রোগ চিকিৎসার মধ্যে অস্ত্র-চিকিৎসাও অর্ন্তভুক্ত। প্রয়োজনে তিনি নিজেই রুগীর দেহে অস্ত্রোপচার করতেন। বৌদ্ধগ্রন্থগুলোতে তাঁর অস্ত্র-চিকিৎসার অনেক চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শারীরবিদ্যা সর্ম্পকে গভীর জ্ঞান না থাকলে দক্ষ শল্য চিকিৎসক হওয়া যায় না। জীবক সেই বিদ্যাও অধিগত করেছিলেন।

একবার রাজগৃহের এক বণিকের চিকিৎসা করেছিলেন জীবক। দেশ বিদেশে ঘুরে বহুকাল বাণিজ্য করেছেন সেই বণিক। কিন্তু শেষ বয়সে মস্তিষ্কের দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

অর্থের অভাব নেই। তাই দেশ বিদেশের নামকরা বৈদ্যরা এসে একে একে জড়ো হল বণিকভবনে। কিন্তু তাদের সকলেরই এক অভিমত, বণিকের রোগ দুরারোগ্য। তাকে সুস্থ করে তোলার কোন ওষুধ তাদের জানা নেই।

মৃত্যুর মুখে এসে পৌঁছান বণিক। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজা বিম্বিসারের শরণ নিলেন। অনুরোধ জানালেন রাজবৈদ্য জীবক যেন তাঁর চিকিৎসা করেন। মরতে হলে তাঁর হাতেই তিনি মরতে চান।

বণিকের কাতর অনুরোধে জীবককে বণিকের চিকিৎসার জন্য পাঠালেন বিম্বিসার। জীবক যথারীতি রুগীর পরীক্ষা করে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিলেন।

রুগীও সম্মতি জানালেন। জীবক তাঁকে পুনরায় জানালেন, অস্ত্রোপচারের পর সাত মাস করে তাঁকে ডান বাম ও চিৎ হয়ে মোট একুশ মাস শুয়ে থাকতে হবে। তাহলেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বণিক হাসিমুখে সম্মতি জানিয়ে জীবককে অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন।

সম্ভবতঃ সেই যুগে জীবকই প্রথম মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরূপ ঘটনার কোন নজির পাওয়া যায় না।

বণিকের সম্মতি পাবার পর তার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে জীবক ভেতর থেকে বার করে আনলেন দুটো অতি ক্ষুদ্র কীট। তিনি জানালেন এই কীটের দংশনেই বণিকের পীড়ার উৎপত্তি। কয়েকদিনের মধ্যেই এই কীট মস্তিষ্কের আরও গভীরে ঢুকে বণিকের মৃত্যু ঘটাত।

নিজের হাতেই কাটা ছেঁড়া চামড়া সেলাই করে তাতে নানা ধরনের ভেষজ প্রলেপ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন।

এবারে বিশ্রামের পর্ব। সাত দিন করে ডান, বাম ও পাশে কাত হয়ে ও চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হবে মোট একুশ মাস।

কিন্তু এই নিয়মে একুশ দিন চলার পরেই অস্থির হয়ে উঠলেন বণিক। তিনি জীবককে জানালেন, তাঁর পক্ষে এই নিয়ম পালন করা সম্ভব হবে না।

জীবক তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, তার আর দরকার হবে না, তিনি ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে গেছেন। নিয়ম মতো একুশদিনই বিশ্রাম করার কথা। তা তিনি করেছেন। রুগীর ধৈর্য পরীক্ষার জন্যই তিনি একুশ মাস বিশ্রামের কথা বলেছিলেন।

জীবকের সুচিকিৎসায় বণিক জীবন ফিরে পেলেন। কৃতজ্ঞতারবশে তিনি তাঁর জীবন রক্ষাকারীকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান করতে চাইলেন।

অর্থ বিষয় আশয়ের প্রতি জীবক ছিলেন নির্লোভ। বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের সেবা। তাঁর উপার্জনের সমস্ত অংশই তিনি ব্যয় করতেন আর্ত মানুষের কল্যাণের কাজে। তাই তিনি বণিকের কাছ থেকে মাত্র এক লক্ষ কার্ষাপণ নিয়েছিলেন। আর তাঁর নির্দেশে বণিক রাজাকেও এক লক্ষ কার্ষাপণ প্রণামী দিয়েছিলেন।

জীবকের এই কীর্তির কথা জেতবনে অবস্থানকারী বুদ্ধের কাছেও পৌঁছায়।

তাঁর প্রশংসা করে বুদ্ধ শিষ্যদের ডেকে বললেন, 'নির্লোভ জীবকের বিস্ময়কর চিকিৎসা দেখো। তাঁর লোভশূন্য জীবনকে তোমরা শ্রদ্ধা করতে শেখো।'

জীবকের অত্যাশ্চার্য অস্ত্র-চিকিৎসার আর একটি ঘটনা ঘটে কিছুদিনের মধ্যেই।

নগরের এক ব্যায়ামবিদ নানা কসরৎ দেখিয়ে তার জীবিকা অর্জন করেন। একবার রাজগৃহে ব্যায়ামের কসরৎ দেখানোর সময় হঠাৎ তলপেটে আঘাত পেয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু তলপেটের অসহ্য ব্যথায় তিনি ছটফট করতে থাকেন। খাবার খেতে পারেন না, দিন দিন শরীর শীর্ণ হয়ে পড়ছে।

বৃদ্ধ বৈদ্যরা ব্যায়ামবিদকে পরীক্ষা করে বলেন, কোনও ওষুধে কাজ হবে না। অন্ত্রের নাড়িভুঁড়ি জটপাকিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

খবর পেয়ে রাজা পাঠিয়ে দিলেন জীবককে। তিনি এসে ব্যবস্থা করেন অস্ত্রোপচারের। নির্জন ঘরে সহকারীদের নিয়ে জীবক ব্যায়ামবিদের পেট কেটে বাইরে নিয়ে আসেন অন্ত্রটিকে। তারপর সন্তর্পণে নাড়িভুঁড়ির জট ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে পুনরায় যথাস্থানে বসিয়ে দেন।

পেট সেলাই করে কাটা স্থানে ভেষজ ওষুধ লাগিয়ে জীবক চলে আসেন তাঁর বাড়িতে।

কিছুদিন পরেই জীবক শুনতে পেলেন সেই তরুণ ব্যায়ামবীর আগের চেয়েও দ্বিগুণ তেজে তাঁর ব্যায়ামের কসরৎ দেখাতে শুরু করেছেন। তারপর একদিন কৃতজ্ঞ ব্যায়ামবিদ জীবকের কাছে এসে তাঁর হাতে তুলে দিলেন ১৬০০০০ কার্ষাপণের তোড়া।

অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে খ্রিস্টপূর্ব ৬ শতকের জীবক ছিলেন ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী। মানবদেহের ভেতরকার অন্ধিসন্ধি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও রোগের অভ্রান্ত নিদান ব্যবস্থায় সেযুগে তাঁর তুলনা ছিলেন তিনি নিজেই। অথচ তিনি নির্লোভ জীবনে অতি সাধারণ ভাবেই দিনাতিপাত করতেন।

অর্থ তাঁর কাছে এসেছে স্রোতের মতো। আবার সেই অর্থ তিনি অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন দীন-দুঃখীর সেবায়।

বুদ্ধ ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। যখনই কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, বুদ্ধের কাছে ছুটে এসে তার সমাধান জেনে আশ্বস্ত হয়েছেন।

একবার স্বয়ং বুদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পিত্তরসের গোলযোগ তাঁকে খুবই কষ্ট দিতে লাগল।

খবর গেল জীবকের কাছে। ছুটে এসে তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন মানবত্রাতার চিকিৎসার ভার।

বুদ্ধের শরীরে কয়েকদিন বিশেষ ধরনের চর্বি নিজের হাতে মালিশ করলেন জীবক। এরপর কিছু পদ্মের পাপড়িতে ছড়িয়ে দেন এক ভেষজের গুঁড়ো। বুদ্ধকে টানা কয়েকদিন তা নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

সব ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরে চললেন জীবক। পথে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বুদ্ধকে যে বিরোচক ওষুধ দিয়েছেন, তার ফল তো পাওয়া যাবে না গরম জলে স্নান না করলে। অথচ তাড়াহুড়োয় এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটাই তাঁকে বলে আসা হয়নি। দুর্ভাবনায় কাতর হয়ে পড়েন জীবক।

এদিকে বুদ্ধের নির্মল হৃদয়ে জীবকের মনোবেদনার প্রতিফলন পড়ে। তখন তিনি নিজেই উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের লেখা থেকে জানা যায়, জীবকের চিকিৎসকজীবনে একাধিকবার সুযোগ এসেছে বুদ্ধের মহাজীবনের চিকিৎসা করার। আবার সেই চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে বুদ্ধের জীবনের অলৌকিকতার প্রকাশ।

বুদ্ধের এক স্বার্থপর জ্ঞাতিভাই দেবদত্ত। ঈর্ষান্বিত হয়ে তিনি নিজেও এক ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর অন্তঃসারশূন্য কথার চমক লোকের মন জয় করতে পারে না। দু-একজন যারা তাকে অনুসরণ করেছিল, তারাও কদিন পরে ভুল বুঝতে পেরে বুদ্ধের কাছে ছুটে চলে যান।

নিরুপায় হয়ে ক্রোধান্বিত দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করার সঙ্কল্প করেন।

সুযোগ আসতেও বিলম্ব হয় না। একদিন রাজগৃহ নগরী থেকে দূরে এক পাহাড়ের পাদদেশে মধুকুচি নামক স্থানে একাকী পায়চারি করছেন বুদ্ধ। সবে সকাল হয়েছে। এমন সময় প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদত্ত পাহাড়ের ওপর থেকে বুদ্ধকে লক্ষ্য করে মস্ত এক পাথর গড়িয়ে দেন।

সৌভাগ্যক্রমে গড়িয়ে পড়া পাথরখণ্ডটি বুদ্ধের ক্ষতি করতে পারে না। তাঁর পা ছুঁয়ে নিচে গড়িয়ে যায়। কিন্তু সেই সামান্য আঘাতেই বুদ্ধের পা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। আহত বুদ্ধকে তাঁর শিষ্যরা বয়ে নিয়ে আসেন আম্রবনে।

জীবক তখন সেখানেই অবস্থান করছিলেন। তিনি বুদ্ধের পায়ের ক্ষত ধুয়ে ভেষজের প্রলেপ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেন। সেই সময়েই জরুরী ডাক পেয়ে জীবককে মহানগরী রাজগৃহের বাইরে চলে যেতে হয়। যাবার আগে তিনি বুদ্ধের সেবকদের বলে যান, ফিরে এসেই ব্যাণ্ডেজ খুলবেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে রুগী দেখে তাঁর ফিরতে দেরি হয়ে যায়। তিনি যখন নগরপ্রাকারের দ্বারে পৌঁছান তখন রক্ষীরা সকলে চলে গেছে। অস্থির হয়ে পড়েন জীবক। বুদ্ধের পায়ের ব্যাণ্ডেজ যে খুলে দিতে হবে। না হলে তিনি তো প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাবেন, রাত্রে ঘুমোতে পারবেন না। ক্ষতিকারক কোন প্রতিক্রিয়া হওয়াও অসম্ভব নয়।

এসব ভেবে দিশাহারা জীবক কেবলই ছটফট করতে থাকেন।

ওদিকে অমিতাভ বুদ্ধের চিন্তায় জীবকের কাতরতার প্রতিফলন পড়ে। সে-রাতে তিনি পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলেই ঘুমোতে যান।

চিকিৎসক জীবক নির্বিচারে সব শ্রেণীর মানুষেরই চিকিৎসা করেছেন। ধনী-দরিদ্র, রাজা-রাজড়া, পর্ণকুটিরবাসী সবার জন্যই জীবকের গৃহ ছিল অবারিত-দ্বার। অসংখ্য দীনদুঃখীকে বিনা পারিশ্রমিকেই তিনি রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দান করেছেন।

তাঁর কর্মব্যস্ততার বিরাম ছিল না। কাজের চাপে তবুও কখনও ধৈর্যচ্যুত হতে দেখা যায় নি তাঁকে। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদেরও নিয়মিত চিকিৎসা করেছেন তিনি। জীবকের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন বুদ্ধ নিজেও। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি প্রায়ই শিষ্যদের বলতেন, "জীবককে সামান্য ভেবো না। তিনি এক ছদ্মবেশী মহাত্মা। এই জীবনেই পান করছেন অমরত্বের অমৃত।"

বুদ্ধ আর জীবক—দুজনের জীবন ছিল ওতপ্রোত। প্রতিদিন নিদ্রাভঙ্গের পর বুদ্ধের চরণ বন্দনা সেরে জীবক বসতেন লোক-চিকিৎসায়। আবার দিনের শেষে, সূর্য অস্তমিত হলে জীবক জেতবনে আসতেন বুদ্ধদর্শনে।

রাজগৃহের আম্রবন, যা জেতবন নামে পরিচিত হয়েছিল, সেখানেই ছিল জীবকের নিবাস।

বুদ্ধসঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের আত্মা আলোকিত ছিল বুদ্ধের জ্ঞানালোকে। বহিরঙ্গ জীবনে তাঁদের স্বাস্থ্য অটুট রাখতো জীবকের স্বাস্থ্যরক্ষার অনুশাসন। তাঁর অনুরোধেই বুদ্ধ তাঁর সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের প্রতিদিন হালকা শরীরচর্চার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল মুক্ত স্থানে।

চিকিৎসক জীবকের মহাজীবনের মর্মলোকটি ছিল মানবতার অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত। একাধারে তিনি ছিলেন একজন সফল নির্লোভ আর্তের কাণ্ডারী মহাচিকিৎসক ও একজন সৎ, উদার, বুদ্ধগতপ্রাণ মহান মানুষ। তাই কি রাজদ্বারে কি দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, সর্বত্রই ছিল তাঁর সমান সমাদর। তাঁর মহাজীবনের সংস্পর্শে নিষ্ঠুর নির্দয় বুদ্ধবিদ্বেষী রাজগৃহের রাজপুত্র অজাতশত্রুর হৃদয়েরও পরিবর্তন ঘটেছিল। অনুতাপের অশ্রুবিসর্জন করে তিনি শরণ নিয়েছিলেন তথাগত বুদ্ধের। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ-ধ্বনি অবিরাম উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর মুখে।

ভারতবর্ষের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে জীবক তাঁর জীবন ও কর্মের আলোকে আলোকিত এক আলোকস্তম্ভ স্বরূপ বিরাজমান।

মার্শাল ওয়ারেন নীরেনবার্গ

বংশগতির ধারক ও বাহক হল জিন। বাবা-মায়ের দোষগুণ তাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে প্রবাহিত হয় এই জিনেরই মাধ্যমে। বস্তুত প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের গোপন কথা ধরা থাকে কোষ আশ্রিত একপ্রকার নিওক্লিক অম্লের মধ্যে। এই নিওক্লিক অম্লই হল জিন। আর তার মধ্যে প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের যে গোপন কথা থাকে তারই নাম জেনেটিক কোড।

জীবনের এই গোপন কথা বা জেনেটিক কোডের গঠন হল বহু সংখ্যক রাসায়নিক এককের সংযোগ। এই এককগুলির নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন নিউক্লিওটাইড। এই বস্তুটির নির্দিষ্ট সজ্জার মধ্যেই রয়েছে জীবনের বৈশিষ্ট্যের গোপনকথা। তাই নিউক্লিওটাইডকে সঠিকভাবে জানতে পারলেই জিনের যাবতীয় পরিচয় জানা সম্ভব হয়।

পুত্র কেন পিতার মতো দেখতে হলো, কিংবা কন্যা কেন মায়ের মতো পটলচেরা চোখ পেল, এই সঙ্কেত জানার জন্যই বিজ্ঞানের ইতিহাসে তৈরি হয়েছে জেনেটিক কোড। আর যে অবিস্মরণীয় বিজ্ঞানপ্রতিভা এই অসম্ভব কাজটি সম্ভব করে বিশ্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী পথ রচনা করেছেন তাঁর নাম মার্শাল ওয়ারেন নীরেনবার্গ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সহরে ১৯২৭ খ্রিঃ ১০ই এপ্রিল, এক স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন নীরেনবার্গ। তাঁর বাবার নাম হ্যারি এবং মায়ের নাম মিনার্ভা।

বাড়িতেই প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু হয় নিরেনবার্গের । পরে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় স্কুলে। কিন্তু সেখানে বেশিদিন লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি তাঁব।

১৯৩৯ খ্রিঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে, সেই সময় নীরেনবার্গের পিতা সপরিবারে চলে আসেন ফ্লোরিডার অর্লান্ডো সহরে। সেই সময়ে নীরেনবার্গের বয়স মাত্র ১২ বছর।

নতুন জায়গায় নতুন স্কুলে পাঠ শুরু হয় তাঁর। পড়াশুনায় গভীর আগ্রহ, মেধাও অসাধারণ। ফলে অল্পদিনেই স্কুলে ছাত্র শিক্ষক সকলেরই প্রিয় হয়ে ওঠেন নীরেনবার্গ।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি ছিল সহজাত আকর্ষণ। চারপাশের প্রকৃতি তাঁকে টানে অহরহ। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেই বালক বয়স থেকেই তিনি ভাবতে শুরু করেন।

প্রাণীদের মধ্যে সকলেই একরকম কেন নয়, শারীরিক গঠনে এত বৈচিত্র্য

কেন, উদ্ভিদের মধ্যেই বা কেন এত রকমফের—কী তার রহস্য, এমনি নানা প্রশ্ন নিত্য উদয় হয় তাঁর মনে।

আর নিজের মনেই সেই প্রশ্নের জবাব খোঁজেন বালক নীরেনবার্গ। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্রের প্রতি এই গভীর অনুসন্ধিৎসাই তাঁকে উত্তরকালে জগদ্বিখ্যাত জীববিজ্ঞানীতে রূপান্তরিত করে।

যথাসময়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভর্তি হন নীরেনবার্গ। কলেজ থেকে বেরিয়ে চলে আসেন গেইনসভিল সহরে। ভর্তি হন ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকেই প্রাণীবিদ্যায় স্নাতক হন তিনি ১৯৪৮ খ্রিঃ মাত্র একুশ বছর বয়সে।

স্নাতকোত্তর পড়াও শেষ করলেন ফ্লোরিডাতেই। ১৯৫২ খ্রিঃ স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় থিসিসের জন্য তিনি যে বিষয় বেছে নিয়েছিলেন তা হল ক্যাডিশ ফ্লাই নামে এক ধরনের মাছির পরিবেশগত অবস্থা।

ওই সামান্য গবেষণার সুযোগেই—বিষয় নির্বাচনের মধ্যেই প্রমাণ হয়েছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার।

প্রাণিবিজ্ঞানের সূত্রধরেই নীরেনবার্গ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন নতুন শাখা প্রাণরসায়নের প্রতি। স্থির করেন প্রাণরসায়ন নিয়েই করবেন গবেষণা।

এই উদ্দেশ্যে তিনি চলে আসেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেই শুরু করেন প্রাণরসায়নের ওপরে গবেষণার কাজ।

১৯৫৭ খ্রিঃ মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগ থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি পেলেন নীরেনবার্গ। এই কাজে তাঁর বিষয় ছিল, বিশেষ এক ধরনের টিউমার কী করে কোষে পারমিয়েজ নামে এক জাতীয় জৈব অনুঘটকের সাহায্যে গ্লুকোজ ও অন্যান্য কার্বন চিনি সংবহন করে।

প্রাণরসায়নের এই গবেষণায় নীরেনবার্গের নির্দেশক-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ডঃ জেমস হগ। ডঃ হগ তাঁর এই ছাত্রের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন আগামী দিনের এক সার্থক রসায়ন বিজ্ঞানীকে।

এরপর প্রাণরসায়ন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব হেলথ নামক জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে দুই বছর কাজ করেন।

এই সময় দুই জীববিজ্ঞানী উইট স্টেটেন ও উইলিয়ম জ্যাকোবিও তাঁর সহযোগী হিসাবে ছিলেন।

এই গবেষণার মূল বিষয় ছিল দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ। এই কাজে তিনি আমেরিকার ক্যান্সার সোসাইটির একটি বৃত্তিও পেয়েছিলেন।

নীরেনবার্গের গবেষণার গভীরতা সংস্থার বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করে এবং ১৯৬০ খ্রিঃ তাঁকে সেখানকার মেটাবলিক এনজাইম শাখার গবেষক বিজ্ঞানী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

সেই সময় ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব হেলথের মেটাবলিক এনজাইম অংশের অধিকর্তা ছিলেন ডঃ গর্ডন টম্পকিন্স। পরবর্তী সময়ে টম্পকিন্স নীরেনবার্গের গবেষণার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

নিউক্লিক অম্ল ও প্রোটিনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সেই সময় বিজ্ঞানী মহলে জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। ১৯৫৯ খ্রিঃ নীরেনবার্গ নিউক্লিক অম্ল বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন।

জিনের গঠনের প্রাণরাসায়নিক বিন্যাসের মধ্যেই নিহীত থাকে প্রাণীর যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্কেত। এই সঙ্কেত কিভাবে কোষীয় জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং কিভাবে এই সঙ্কেত কোষের প্রতিটি অংশকে সঞ্চালিত করে এই সব জটিল প্রশ্ন নিয়ে জীববিজ্ঞানীরা হিমসিম খাচ্ছিলেন। তাঁদের গভীর গবেষণার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছিল।

কঠিনতম প্রাণরাসায়নিক এই সমস্যাটির সমাধান করে নীরেনবার্গ অল্পকালের মধ্যেই বিশ্ববিজ্ঞান ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

তাঁর এই সংক্রান্ত প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেন ১৯৫৯ খ্রিঃ আগস্ট মাসে। এই গবেষণার সূত্র ধরেই পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যেই আবিষ্কৃত হল রাইবো নিউক্লিক অম্ল। যা জিনের মধ্যস্থ সংকেত প্রাণরাসায়নিক প্রোটিনে সঞ্চালিত করার মাধ্যম রূপে কাজ করে থাকে।

গোড়া থেকেই এই প্রাণরাসায়নিক গবেষণার কাজে নীরেনবার্গের সঙ্গে যুগ্মভাবে কাজ করছিলেন ডঃ হেনরিক মাথাই। দুই বিজ্ঞানীর একাগ্র চেষ্টায় অনতিবিলম্বেই ল্যাবরেটরির টেস্ট টিউবে নকল আর.এন.এ বা রাইবো নিউক্লিক অম্ল তৈরি সম্ভব হল এবং প্রাণরসায়ন বিজ্ঞানে এর মাধ্যমে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হল।

এরপর নীরেনবার্গ একের পর এক নকল নিউক্লিক অম্ল নিয়ে তেজস্ক্রিয় অ্যামিনো অম্ল ব্যবহার করে জেনেটিক কোড সম্পূর্ণ করলেন। তাঁর এই কাজটি পরে আরও সহজতর করেছিলেন মার্কিন নাগরিক ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা।

পরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আরো এক বিজ্ঞানী, তিনি হলেন জীববিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট হোলি।

জেনেটিক কোড তৈরির যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যই ১৯৫৯ খ্রিঃ নোবেল কমিটি নোবেল পুরস্কারের জন্য নীরেনবার্গের নামের সঙ্গে হরগোবিন্দ খোরানা ও রবার্ট হোলির নামও মনোনীত করেছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই জীবরসায়ন বিজ্ঞানী নীরেনবার্গের নাম নতুন যুগের প্রবর্তক রূপে সর্বত্র ঘোষিত হয়।

মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ১৯৫৯ খ্রিঃ নীরেনবার্গ ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব হেলথ-এর Biochemical Genetics বা প্রাণরাসায়নিক প্রজননের নতুন শাখায় গবেষকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানেই তিনি যুগান্তকারী আবিষ্কারটি করেছিলেন।

এর পরেই একের পর এক আসতে থাকে সম্মান ও পুরস্কার। হার্ভার্ড, শিকাগো, মিশিগান, ইয়েল এবং উইন্ডসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পেলেন সম্মানজনক ডি.এস.সি ডিগ্রি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অ্যাকাডেমির বিজ্ঞান বিভাগ ১৯৫৯ খ্রিঃ নীরেনবার্গকে 'আণবিক জীববিজ্ঞান পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করে। দু'বছরের মধ্যেই ১৯৫৯ খ্রিঃ জৈব রাসায়নিক অনুঘটকের ওপরে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি পেলেন পল লুইস পুরস্কার।

বিজ্ঞান বিষয়ক জাতীয় পদক পেলেন ১৯৫৯ খ্রিঃ। পরের বছর পেলেন গবেষণা সংস্থার পুরস্কার। হিল দে ব্রান্ড পুরস্কার পেলেন ওই একই বছরে।

১৯৫৯ খ্রিঃ পেলেন গর্ডনার মেরিট পুরস্কার এবং ফ্রান্সের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সম্মান। পরের বছর পান ফ্রাঙ্কলিন পদক ও প্রিস্টলি পুরস্কার।

ডঃ খোরানার সঙ্গে যৌথ ভাবে পান মার্কিন বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্যপদ ও লাস্কার পুরস্কার। পরবর্তী পুরস্কারই হল নোবেল।

মনকম্বু সাম্বসিবন স্বামীনাথন

ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানের ভাগ্যবিধাতারূপে যে বিজ্ঞান প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করেছেন তাঁর নাম মনকম্বু সাম্বসিবন স্বামীনাথন বা এম.এস স্বামীনাথন। ১৯২৫ খ্রিঃ ৭ই আগস্ট তামিলনাড়ুর কুম্বাকোনাম সহরে জন্মগ্রহণ করেন স্বামীনাথন। তাঁর প্রথম পড়াশুনাও শুরু হয় এই শহরেই।

ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনায় ছিল গভীর মনোযোগ। নিত্য সঙ্গী ছিল বই। সাহিত্য বিজ্ঞান সব বিষয়েই সমান রুচি। স্কুলে বরাবরই ভাল ফল করে শিক্ষকদের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেছেন।

সসম্মানে স্কুলের গন্ডি পার হয়ে ভর্তি হলেন কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এক কলেজে—বিজ্ঞান বিভাগে। এখান থেকেই স্নাতক হলেন।

এবারে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা। বিষয় নির্বাচন করলেন কৃষিবিজ্ঞান। ভর্তি হলেন কোয়েম্বাটুর কৃষি মহাবিদ্যালয়ে।

এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া স্বামীনাথনের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে সারা দেশ। অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশুভ ছায়াপাত হয়েছে পৃথিবীজুড়ে। তার প্রভাব নবজাগ্রত ভারতের জনজীবনেও।

এই আবহাওয়ার মধ্যেই স্বাধীনতা-উন্মুখ ভারতের ভূমিপুত্র স্বামীনাথন তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ পথটি স্থির করে নেন।

পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার মন্ত্রে জেগে উঠেছে দেশ। দুদিন আগে হোক পরে হোক বিদেশী শাসক বিতাড়িত হবেই। দেশে আসবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। তরুণ স্বামীনাথন বুঝেছিলেন ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটিও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি স্থির করলেন এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ভাবী সৈনিক হিসেবেই তিনি তৈরি করে তুলবেন নিজেকে।

কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক হবার পরে তিনি চলে এলেন দিল্লি। এখানে ভারতীয় কৃষিঅনুসন্ধান সংস্থা থেকে উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। ১৯৪৯ খ্রিঃ লাভ করলেন ডিপ্লোমা।

এরপর মেধাবৃত্তি নিয়ে চলে যান লন্ডনে। ১৯৫২ খ্রিঃ কেমব্রিজ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হলেন।

ডক্টরেট হবার আগে থেকেই অবশ্য চমকপ্রদ গবেষণাপত্রের সূত্রে স্বামীনাথনের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল বিজ্ঞানী মহলে। হল্যান্ডের ওয়াগেনসিনগেন কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনেস্কো ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ফলে উসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজনন বিদ্যা বিভাগে গবেষকের নিয়োগপত্র পেতে বেগ পেতে হল না। এই কাজে যোগ দিলেন ১৯৫৩ খ্রিঃ।

স্বাধীনোত্তর নবভারতের আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছিল বুকে। তাই ১৯৫৪ খ্রিঃ স্বামীনাথন ফিরে এলেন দেশে। চাকরি পেতেও বিলম্ব হল না। কটকে কেন্দ্রীয় চাল গবেষণা কেন্দ্রে যোগ দিলেন।

এখানে কাজ করতে করতেই তিনি ফলনশীল ধান তৈরির বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আরম্ভ করলেন জাপোনিকা ও ইন্ডিকা এই দুই জাতের ধানবীজের সংকরায়ণের গবেষণা।

ফল ফলল অবিলম্বেই। উচ্চফলনশীল বীজ তৈরির সাফল্যের সুবাদে সারাদেশেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

এর পরের ধাপে স্বামীনাথন প্রজননবিদ হিসেবে যোগ দিলেন নতুন দিল্লির

ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে। একই সঙ্গে চলতে লাগল অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ।

অল্পসময়ের মধ্যেই উন্নীত হলেন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদে।

মাত্র ছয় বছর এই পদে কাজ করার পরেই ১৯৫৯ খ্রিঃ হলেন কৃষিগবেষণা সংস্থার অধিকর্তা। ততদিনে তাঁর গবেষণা বিশ্বের বিজ্ঞানীদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ছয় বছর পরে ১৯৫৯ খ্রিঃ স্বামীনাথন পেলেন ভাবত সরকারের অধীন কৃষিমন্ত্রকের সচিব পদ, হলেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের আধিকারিক।

গবেষণার কাজ থেকে সরাসরি প্রশাসনিক পদ। কিন্তু বিভাগীয় কর্মব্যস্ততার মধ্যেই অব্যাহত রাখলেন নিজের গবেষণার কাজও।

ভারতের কৃষি ব্যবস্থার দৈন্য অবস্থার কথা ভালভাবেই অবগত ছিলেন স্বামীনাথন। তাই সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিলেন।

কৃষি গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য ১৯৫৯ খ্রিঃ স্বামীনাথন সম্মানিত হলেন ম্যাগসেসে পুরস্কারে। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষদের সম্মানিত করার জন্য ফিলিপিন্স সরকার এই পুরস্কারের প্রবর্তন করেন।

উনিশশো তিয়াত্তরে তিনি হলেন লন্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য। এরপর বিভিন্ন সময়ে বহু সম্মান বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন স্বামীনাথন।

তিনি পেয়েছেন ভাটনগর পুরস্কার, মেন্ডেল স্মৃতিপুরস্কার, বীরবল সাহানি পদক। এই সঙ্গে দেশ বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে দেওয়া হয়েছে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি।

এই নিরলস কর্মযোগী এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয়িত হচ্ছে দেশের মানুষের সেবায়।

কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে স্বামীনাথনের জগদ্বিখ্যাত অবদানগুলির বিষয়ে অল্পবিস্তর পরিচিতি থাকা প্রয়োজন।

কৃষিপ্রজনন সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল ১৯৪৭ খ্রিঃ ভারতীয় কৃষিগবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা করার সময়ে।

তখনই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আলুর দুটি জাত। গুটি আলু ও গুটিহীন আলু। আমরা সচরাচর যে আলু দেখে থাকি তা সবই গুটি আলু। এদের বৈজ্ঞানকি নাম সোলানাম টিউবারোসাস।

সোলানাম প্রজাতির আলু নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন তিনি। গড়েছেন নানা সংকর প্রজাতি। স্বামীনাথনই সংকর আলুর প্রথম জন্ম দিয়েছেন। এসব

আলুর ফলন দেবার ক্ষমতা চমকপ্রদ। এক প্রজাতির আলুর এমনই গুণ যে তুষারপাতেও এদের কোন ক্ষতি হয় না।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে তিনি চাল, গম ও পাট নিয়ে গবেষণা করে বহু নতুন সংকর উদ্ভিদ তৈরি করেছেন। এদের ফলন দেবার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য। তিনি ভারতীয় চাল ইন্ডিকার সঙ্গে জাপানি চাল জাপানিকার সংকরায়ন ঘটিয়েছেন।

পাটের ক্ষেত্রেও দুটি সাধারণ প্রজাতি নিয়ে অসাধারণ কলম তৈরি করেছেন।

স্বামীনাথনের এই সকল সৃষ্টি আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে ধান, পাট ও গম উৎপাদনের বিপ্লব এনেছে। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

স্বামীনাথনের নারকেল নিয়ে গবেষণার অন্যতম অবদান হল উচ্চ ফলন ক্ষমতার বামনাকৃতি নারকেল গাছ। যা অধুনা কেরালা নারকেল নামে পরিচিত।

মিউটাজেনেসিস তাঁর এক উল্লেখযোগ্য নতুন কাজ। পরোক্ষভাবে বিকিরণ প্রয়োগ করে গম, বার্লি, চাল ইত্যাদির কোষে তিনি এমন পরিবর্তন ঘটিয়েছেন যার ফলে তাদের ফলন দেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ।

গম নিয়ে স্বামীনাথনের কাজ প্রবাদপ্রতিম। ১৯৫৯ খ্রিঃ যখন তিনি ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভিদবিদ্যা শাখার প্রধান সেই সময় থেকেই গম নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন।

মানবতাবাদী বিজ্ঞানী নর্মান বরলগ মেক্সিকোতে এক অসাধারণ সংকর গমবীজ তৈরি করেছিলেন। সেই গমের নাম নরিন। স্বামীনাথন সেই বীজ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন ভারতে। ভারতের মাটিতে সেই বীজ ফলাতে পারলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে জোয়ার আসবে।

স্বামীনাথন ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের তরফে আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়ে মহাবিজ্ঞানী বরলগকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৫৯ খ্রিঃ মাঝামাঝি সময়ে বরলগ এলেন ভারতে। ভারতীয় মাটিতে মেক্সিকোর নরিন গম যে ফলপ্রসূ হবে সে বিষয়ে মতামত দিলেন। তারপরেই মেক্সিকো থেকে আঠারো হাজার টন নরিন গমবীজ আনানো হল।

স্বামীনাথন ভারতে সরাসরি নরিনের চাষ করালেন না। ভারতীয় গমবীজের সঙ্গে নরিনের সংকরায়ন ঘটিয়ে নতুন কয়েকটি সংকর বীজ তৈরি করলেন। নাম দিলেন সোনালিকা ও কল্যাণসোনা।

কিছু সংকরের রূপান্তর ঘটল চমকপ্রদ। লাল গমের রং হল স্বর্ণাভ। এদের নাম দিলেন শরবতী সোনারা, পুসা লর্মা, মালবিকা প্রভৃতি।

সব মাটিতে সব সংকর বীজ সমান ফলন দেয় না। তাই তিনি এক একটি সংকর পাঠালেন ভারতের এক এক অংশে।

মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ি মাটির জন্য পাঠানো হল মালবিকা। এই বীজের জন্য দরকার পর্যাপ্ত জল ও উন্নত সেচ ব্যবস্থা। ভারত সরকারকে তিনি সেবিষয়ে ওয়াকিবহাল করে দিলেন।

গমের মতো উচ্চ ফলনশীল ধানের সংকরও তৈরি করলেন স্বামীনাথন। তার নামগুলো হল এই রকম পুসা-২-২১, সবরমতি ইত্যাদি।

পুসা-২-২১ তামিলনাড়ুতে আশাতীত ফলন দিল। একই রকম ফল পাওয়া গেল হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ, আসামে।

১৯৫৯ খ্রিঃ তিনি ভারতীয় কৃষিমন্ত্রকের ব্যবস্থাপনায় কৃষিক্ষেত্র ও কৃষকদের জন্য এক জাতীয় কার্যক্রম রূপায়িত করলেন। এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা ভারতের সকল প্রান্তের গ্রামে গ্রামে ঘুরে নতুন বীজ জমিতে রোপণের উপযোগিতা চাষীদের বুঝিয়ে দিলেন।

এর ফলে চাষীদের ঘরে ঘরে গেল চাল, গম, জোয়ার, ভুট্টার উচ্চফলনশীল সংকরবীজ। জমিতে ফলল সোনার ফসল।

নতুন উদ্ভাবিত বীজগুলো নিয়ে স্বামীনাথন তাঁর বৈপ্লবিক অভিযান শুরু করেছিলেন দিল্লির জৌন্‌তি গ্রাম থেকে।

স্বামীনাথনের উদ্যোগে গড়ে ওঠে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। কেন্দ্রগুলো ভারতের প্রত্যন্তের গ্রামগুলিতেও নিরক্ষর চাষীদের কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলল।

এইভাবে কৃষিগবেষণা ক্ষেত্রে বিপুল অবদানের মাধ্যমে জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেন স্বামীনাথন।

১৯৫৯ খ্রিঃ সুইডিশ বীজ অ্যাসোশিয়েশন তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে।

তার অনেক আগেই, ১৯৫৯ খ্রিঃ জীববিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ভাটনগর পুরস্কার।

১৯৫৯ খ্রিঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি তাঁকে দেয় মেন্ডেল শতাব্দী পুরস্কার। পরের বছরেই ভারতের উদ্ভিদবিদ্যা মন্ডলী তাঁকে দেন বীরবল সাহানি পদক।

১৯৫৯ খ্রিঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় খেতাব পদ্মশ্রী লাভ করেন স্বামীনাথন, ১৯৫৯ খ্রিঃ হন পদ্মভূষণ।

তিনি সম্মানিক ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি পান ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

আন্তর্জাতিক স্তরেও তাঁর অবদান স্মরণযোগ্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পুষ্টি-সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য তিনি। এছাড়া মেক্সিকোর গম ও ভুট্টা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বোর্ডের সদস্য, হেগের আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিদ্যা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি, ফিলিপিন্সের আন্তর্জাতিক চাল গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক।

স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকফারলন বার্নেট

বিজ্ঞানী লিউয়েন হক নাম রেখেছিলেন অ্যানিমেল কিউল বা পুঁচকে জানোয়ার। বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টির মূলে থাকে তাদেরই কারসাজি। পরে এইসব ক্ষুদে জীবাণু ব্যাকটেরিয়ার কালচার থেকেই তৈরি হল এদের জব্দ করার মোক্ষম দাওয়াই ভ্যাক্সিন বা টিকা।

এরপর থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয় সব জীবাণুই ব্যাকটেরিয়া। এভাবেই চলল উনিশ শতকের শেষ পাদে বিজ্ঞানী আইভানোস্কির নবতম আবিষ্কারের লগ্ন পর্যন্ত।

আইভানোস্কি তামাকের পাতায় এক ধরনের জীবাণু আবিষ্কার করেন যা ব্যাকটেরিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের ধরন অনেকটা আঠালো তরলের মতো।

এইভাবেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের আসরে ব্যাকটেরিয়ার পরে আবির্ভাব হল ভাইরাসের। আবিষ্কারক আইভানোস্কির নামেই জীবাণুটির নাম এখনো পর্যন্ত বহাল রয়েছে। যদিও ভাইরাস সম্পর্কে সাবেকি ধারণার আধুনিক কালে অনেকটাই বদল হয়েছে।

ক্ষুদে হলেও ব্যাকটেরিয়াকে সাধারণ অণুবীক্ষণের সাহায্যেই দৃষ্টিগোচর করা যায়। কিন্তু আলট্রা মাইক্রোস্কোপ বা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ ছাড়া ভাইরাসকে দেখা সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে। তাদের একটি প্রাণীদেহের অনুকূলে কাজ করে। কিন্তু ভাইরাসের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল, ভাইরাস সম্পূর্ণ এক বিষ। ভয়ঙ্কর ধরনের রোগ সৃষ্টির মূলে এদের ক্ষমতা ব্যাকটেরিয়ার চাইতেও বেশি।

স্বাভাবিক ভাবেই এই বিষ-প্রাণীটিকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে শুরু হল ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

১৯১৫ খ্রিঃ এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, নাম টোয়ার্ট, এক ধরনের ভাইরাসের সন্ধান পেলেন যারা ব্যাকটেরিয়া হন্তারক। দল বেঁধে ব্যাকটেরিয়ার পেটে বংশ বিস্তার করে তাদের মেরে ফেলে। এই ধরনের ভাইরাসের নাম দেওয়া হল ব্যাকটেরিয়া-ঘাতক বা ব্যাকটেরিওফাজ।

পরে এই প্রাণীদের স্বভাব-প্রকৃতি বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোকপাত করেন এক ফরাসী বিজ্ঞানী দ্যে হেরেল, ১৯১৭ খ্রিঃ।

প্রাণী ভাইরাসের প্রথম সন্ধান জানান লোফলার নামে জীববিজ্ঞানী, ১৮৯৮ খ্রিঃ। এদের পাওয়া গেছে গরুর পায়ে ও মুখের ঘায়ে।

দু'বছর পরেই ১৯০০ খ্রিঃ ওয়াল্টার রীড নামে এক চিকিৎসাবিজ্ঞানী পীতজ্বরের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভাইরাসের সন্ধান পান। মানুষের রোগের উৎস রূপে ভাইরাসের সন্ধান সেই প্রথম পাওয়া যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এমন অসংখ্য ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছেন।

এরপরেই মানব-বিজ্ঞানের অঙ্গনে নতুন অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভাব হয় জীববিজ্ঞানী স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকফারলন বার্নেটের।

১৮৯৯ খ্রিঃ ৩রা সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের ট্রারালগন শহরে জন্ম হয় বার্নেটের।

ছেলেবেলা থেকেই প্রখর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। তাঁর যাবতীয় কৌতূহল নিহীত ছিল প্রকৃতিরাজ্যের ছোট বড় নানান প্রাণীদের নিয়ে। ক্ষুদে গুবরেপোকা পেলে যেমন তিনি তাকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন, নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করতেন প্রাণীটির চালচলন, হাবভাব স্বভাবপ্রকৃতি, তেমনি আকাশচারী বিচিত্র বর্ণের পাখিদের নিয়েও চলত তাঁর মুগ্ধ অনুসন্ধান।

স্বভাবতঃই স্কুলজীবনে বরাবরই তিনি ছিলেন জীববিজ্ঞানের সেরা ছাত্র। ভবিষ্যতের প্রতিভাবান জীববিজ্ঞানীর লক্ষণ তখনই তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। স্কুলে এবং কলেজে, শিক্ষক অধ্যাপকরা তাঁর প্রতিভায় বিস্মিত হয়েছেন।

জীববিজ্ঞান থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান। কলেজের গন্ডি পার হয়ে বার্নেট মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাশে।

মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৯২৩ খ্রিঃ ডাক্তারি পাশ করলেন বার্নেট।

এই সময়ে রয়াল মেলবোর্ন হাসপাতালে প্যাথোলজিস্টের একটি পদ খালি হয়েছিল। বার্নেট সেখানেই চাকরি নিলেন। এইভাবেই শুরু হল তাঁর কর্মজীবন।

এই হাসপাতালে সেই সময় ভাইরাস নিয়ে চলছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গবেষণার ব্যবস্থাদিও ছিল চমৎকার। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণায় রীতিমত অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন বার্নেট।

মেলবোর্ন হাসপাতালে প্যাথোলজিস্টের পদে তিন বছর কাজ করার পর তিনি চলে এলেন লন্ডনে। তখনকার লিস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল রোগ প্রতিরোধ গবেষণার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ১৯২৬ খ্রিঃ এখানেই বার্নেট স্বাধীনভাবে ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করলেন।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল ঘেঁটে ভাইরাস-বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হলেন বার্নেট। ফলে তাঁর সমস্ত মনোযোগ ভাইরাসেই কেন্দ্রীভূত হল। সিদ্ধান্ত নিলেন, ভাইরাস নিয়ে গবেষণাই হবে তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান।

ততদিনে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টোয়ার্ট ব্যাকটেরিয়া-ঘাতক ব্যাকটেরিওফাজ-এর আবিষ্কার সম্পূর্ণ করেছেন। তার বিস্তারিত শুলুক-সন্ধানও পেয়ে গেছেন ফরাসী বিজ্ঞানী দ্যে হেরেল।

বার্নেটের অনুসন্ধিৎসু মন আকৃষ্ট হল এই বিশেষ শ্রেণীর ভাইরাসটির প্রতি। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রস্তুতি নেন তিনি।

ইতিমধ্যে লিস্টারের কাজের মেয়াদ শেষ হল। বার্নেট ফিরে এলেন অস্ট্রেলিয়ায়। কিছুদিন আনাগোনা করলেন মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপরে যোগ দিলেন স্থানীয় চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র ওয়াল্টার অ্যান্ড এলিজাবেথ হল ইনসটিটিউট অব মেডিকেল রিসার্চে। শুরু হল তাঁর ভাইরাস নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা।

ভাইরাস সম্পর্কে অনেক তথ্যই জীববিজ্ঞানীরা ততদিনে উদ্ঘাটন করেছেন। জানা গেছে, ভাইরাস নানা ভয়াবহ রোগের উৎস। এসব রোগের অনেকগুলোই আবার সংক্রামক। কাজেই বার্নেট অত্যন্ত সতর্ক হয়েই কাজে নামলেন। কেননা, সামান্য অমনোযোগী হলেই হতে হবে ভাইরাসের শিকার।

প্রথমে তিনি কাজ শুরু করলেন সিটাকোসিস নামে একটি রোগ নিয়ে। ল্যাটিন শব্দ সিটাকাস, যার অর্থ টিয়া জাতীয় পাখি, তা থেকেই এসেছে সিটাকোসিস।

অস্ট্রেলিয়ায় এই পাখি Love Bird নামে পরিচিত এবং সচরাচর দৃষ্ট। এদের মধ্যে এক ধরনের জ্বর দেখা যায়, যার আক্রমণে ঝাঁকে ঝাঁকে এদের মৃত্যু ঘটে। তাই রোগটির নাম হল সিটাকোসিস বা টিয়া-জ্বর।

যে ভাইরাসের কারণে এই রোগের উৎপত্তি, মানুষের মধ্যে তাদের আক্রমণ ঘটলে ফল খুবই মারাত্মক হয়। এই ভাইরাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ।

এই সংক্রামক ভাইরাস কেবল যে অস্ট্রেলিয়ার টিয়াদের মধ্যেই থাকে তা নয়। অন্যান্য পাখিদের দ্বারাও এরা বাহিত হয় এবং মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। ওর্নিথো অর্থাৎ পাখি দ্বারা বাহিত বলে সিটাকোসিসের অন্য নাম ওর্নিথোসিস।

এই ভাইরাস নিয়ে কাজ করে সিটাকোসিস রোগ প্রতিরোধের পথ বার করে ফেললেন বার্নেট। তাঁর এই আবিষ্কারের ফল হল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালে তাঁর পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেই শিশু পক্ষাঘাত বা পোলিও মায়েলাইটিস ও হার্পিজের রোগ জীবাণু আবিষ্কার ও পৃথক করা সম্ভব হয় এবং তা থেকেই হয় ভ্যাক্সিন আবিষ্কার।

বার্নেটের আবিষ্কারটি হল এই রকম। সিটাকোসিস ভাইরাসকে পৃথক করে তাজা মুরগির ভ্রূণে ইনজেকশন করে সেখানে তাদের বংশ বিস্তার ঘটানো হয়। কিছুদিন পরে দেখা যাবে মুরগির দেহে ফুটে উঠেছে টিয়া-জ্বরের লক্ষণ। এইভাবে মুরগির ভ্রূণে ভাইরাসটির কালচার তৈরি করার পর কিছু রাসায়নিক প্রয়োগ করলেই দেখা যাবে কালচারের ভাইরাস নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। পরবর্তী কাজ হল ওই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করিয়ে অ্যান্টিবডি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা।

বার্নেটের এই গবেষণার পথ ধরেই পরবর্তীকালে ভাইরাসঘটিত বিভিন্ন ভয়ঙ্কর রোগের ভ্যাক্সিন বা টিকা আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

এই গবেষণার সূত্রেই বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে বার্নেটের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। ভাইরাস বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম পথপ্রদর্শক রূপে চিহ্নিত হন তিনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন অন্তিম লগ্নে, ১৯৫৯ খ্রিঃ ডাঃ বার্নেট এলিজাবেথ হল ইনসটিটিউট অব মেডিকেল রিসার্চ-এর সর্বেসর্বা হলেন। নতুন এই দায়িত্ব লাভের তিন বছরের মাথায়ই বার্নেটের একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে জীবাণু বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।

তাঁর এই প্রবন্ধের বিষয় ছিল লাইসোমেনেসিস। মূল ল্যাটিন শব্দটি হল লাইসোজেনি। কোনও একটা ব্যাকটেরিয়ার জিনের গঠনে যখন ভাইরাসের আকস্মিক উৎপত্তি ঘটে অর্থাৎ ফাজ তৈরি হয়, তখন তা তার আশ্রয়দাত্রী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

এই জৈবরাসায়নিক ঘটনাকেই বলে লাইসোজেনেসিস। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেই তার নিজের ধ্বংসের বীজটিও লুকানো থাকে।

ল্যাবরেটরিতে দেখা গেছে, ব্যাকটেরিয়ার কালচারে ভাইরাসের আকস্মিক জন্ম ও বংশ বিস্তার ঘটতে থাকে। ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক জিনের গঠনের পরিবর্তন ঘটিয়েই কান্ডটি ঘটে।

এই ঘটনাই হল প্রো-ভাইরাস। ভাইরাসের এই আকস্মিক আবির্ভাবই ব্যাকটেরিয়াদের নির্বংশ করে।

বার্নেটের এই আবিষ্কার জীবাণু গবেষণায় এক নতুন পথ নির্দেশ করল।

এরপর বার্নেট তাঁর গবেষণার বিষয় করলেন ইনফ্লুয়েঞ্জা।

সাধারণতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা বলতে আমরা সর্দি জ্বর মাথা ধরা ইত্যাদি উপসর্গের সপ্তাহখানেক ভোগান্তির অসুখ বলেই বুঝে থাকি।

অথচ এই আপাতঃ সাধারণ রোগটিই বহুবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মারাত্মক মহামারি ডেকে এনেছিল।

এই রোগের কবলে পড়ে সারা পৃথিবীর লোক মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়েছিল ১৯১৮-১৯ খ্রিঃ। তাই রোগটিকে নিতান্ত সাধারণ বলে মনে করা চলে না।

বার্নেট তাই এই রোগের বিষয়ে নতুন করে আলোকপাত ঘটাবার উদ্দেশ্যে শুরু করলেন গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

কিছুদিনের চেষ্টাতেই তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসকে সনাক্ত করার কাজটি সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

প্রধানত তিন প্রকারের ভাইরাস থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে থাকে। হুবহু এক রকমের দেখতে হলেও তিন রকম ভাইরাসের পার্থক্য বোঝা যায় তাদের কাজ থেকে।

বার্নেট লক্ষ্য করলেন এসব ভাইরাস রক্তে ঢোকার পরেই রক্ত জমাট বেঁধে ওঠে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় ব্লাড ক্লটিং।

রক্ত জমাট বাঁধার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বার্নেট রক্তের মধ্যে খুঁজে পান এক ধরনের জৈব অনুঘটক বা এনজাইম। এই অনুঘটক ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস ঘটিত আক্রমণকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে।

এ এক অসাধারণ প্রাপ্তি। নবলব্ধ এই এনজাইম নিয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা দমনের রাসায়নিক আবিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন বার্নেট।

সেইকালে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এক মস্ত ধাঁধাঁয় পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না, কোনও এক ঋতুতে যে ভ্যাক্সিন ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ করতে সক্ষম, সেই একই ভ্যাক্সিন পরের ঋতুগুলোতে তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ করতে পারে না।

বার্নেট কয়েক বছরের মধ্যেই এই রহস্য সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করলেন এবং তাঁর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন একটি প্রবন্ধে। ১৯৫৩ খ্রিঃ প্রকাশিত এই গবেষণা নিবন্ধটির তিনি নাম দেন দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। এই প্রবন্ধে তিনি জানান যে, কোনও এক ঋতুতে যে ভাইরাসের আক্রমণে শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দেয়, ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাইরাসের সম্পূর্ণ চেহারা ও ধরন আমূল পাল্টে যায়।

ফলে যে এন্টিবডি ভাইরাসটিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখতো, সেই এন্টিবডিই পরবর্তী ঋতুতে নতুন আকার প্রাপ্ত ভাইরাসকে আর ঠেকাতে অসমর্থ হয়। ফলে পরের ঋতুতে ভ্যাক্সিন নেওয়া সত্ত্বেও শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ ঘটে।

বার্নেটের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধের সমস্যাটির

সমাধান আর অসম্ভব হয় না। বার্নেটও সেই সঙ্গে বিশ্ববিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন মহাবিজ্ঞানী রূপে।

এরপরে সাধনার সাফলের স্বীকৃতি ও সম্মানের পালা।

১৯৫১ খ্রিঃ বার্নেট হলেন নাইট। পরের বছর তাঁকে সম্মান জানান হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সংস্থার অ্যালবার্ট অ্যান্ড মেরি লাস্কার পুরস্কার দিয়ে।

সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি এল আরও কয়েক বছর পরে। ১৯৬০ খ্রিঃ চিকিৎসাশাস্ত্র ও শারীরবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বার্নেট পেলেন নোবেল পুরস্কার।

সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েও বার্নেটের নিরলস সাধনা রইল আগের মতোই অব্যাহত, জীবনযাত্রায় ঘটল না কোনও রূপান্তর। আগাগোড়া অনাড়ম্বর জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন বিজ্ঞানতাপস বার্নেট।

তাঁর পারিবারিক জীবনও ছিল সুখের। এক পুত্র দুই কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর ঘরোয়া জীবনে ছিল শান্তির পরিবেশ।

বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ে সদাব্যস্ত জীবন সত্ত্বেও বাইরের জগতের নানা বিষয় নিয়েও ভাবনা চিন্তা পড়াশুনা করতেন বার্নেট। তার পরিচয় পাওয়া যেত, যখন তিনি কোন সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতেন।

তাঁর বলার ভঙ্গি ও ভাষা ছিল এমনই হৃদয়গ্রাহী যে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তব্য শুনতো।

চিত্রশিল্পেও বার্নেটের হাত ছিল একজন দক্ষ চিত্রকরের মতো। কাজের অবকাশে খোলা প্রকৃতির কোলে বসে তিনি প্রকৃতির মনোরম শোভা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতেন ক্যানভাসে।

সারাজীবনের জীবণুগবেষণার অভিজ্ঞতা নিয়ে বার্নেট ১৯৫৩ খ্রিঃ একটি বই লেখেন। বইয়ের নাম সংক্রামক রোগের প্রাকৃতিক ইতিহাস। জীবাণু গবেষণার ক্ষেত্রে বার্নেটের এই বই এক নিশ্চিত দিগ্‌দর্শন স্বরূপ।

শেষজীবনে বার্নেট কাজ করে গেছেন স্ট্যাফাইলোকক্কাস নিয়ে। রিকেট ঘটিত ভাইরাস নিয়েও তাঁর কাজ উল্লেখের দাবি রাখে। বার্নেটের গবেষণার ফলাফল আগামী দিনের ভাইরাস বিজ্ঞানীদের সামনে আলোকবর্তিকার কাজ করছে।

মহম্মদ জাকারিয়া রাজি

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক বলা হয়েছে হিপোক্রেটিসকে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, যুক্তি ও বিচারের পথে তিনি প্রাচীন চিকিৎসাকে উন্নত করেছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানে। দেখার চোখ আর বিচারের মন—এই ছিল মহান বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিসের সম্পদ।

এই একই সম্পদ নিয়ে তাঁর বহুকাল পরে আরব সভ্যতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এক অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষ। তিনি হলেন মহম্মদ জাকারিয়া রাজেশ বা রাজি। তিনিও খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে সমকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানে সঞ্চারিত করেছিলেন নতুন গতি। ভয়ঙ্কর গুটি বসন্ত নিয়েও সেইকালে তিনি গভীর গবেষণা করেছেন।

নানা রোগ সম্পর্কে তিনি যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কাছে আজো তা হয়ে আছে পরম বিস্ময়।

অথচ এই প্রতিভাধর মানুষটি সম্পর্কে আমরা জানি খুব কমই। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি থেকেই বোঝা যায় কী অসাধারণ মেধা ও আধুনিক মন নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন।

প্রাচীন পারস্যের রাজধানী তেহরানের নিকটবর্তী রাভি নামক শহরে ৮৬০ খ্রিঃ জন্ম হয় রাজেশের। তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও অনুমান কার যায় শিশুবয়স থেকেই গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তিনি বিদ্যাচর্চা করেছিলেন। অতি অল্প বয়সেই বিজ্ঞানের নানা শাখায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

ভবিষ্যৎকালে সমগ্র ইসলাম সভ্যতার চিকিৎসাবিজ্ঞানে যিনি হবেন সূর্যপ্রতিম পুরুষ তার আলোকচ্ছটার আভাস প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কিশোরকালেই।

সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, আলকেমি বা অপরসায়ন এবং চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ।

প্রথম জীবনে রাজেশ চিকিৎসকের চাকরি গ্রহণ করেন রাভির শাসনকর্তার অধীনে। অসামান্য চিকিৎসা-প্রতিভাবলে তিনি সামান্য চিকিৎসক পদ থেকে উন্নীত হন বাগদাদ শহরের সুবিশাল হাসপাতালের অধিকর্তার পদে।

রাজেশের জীবন সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায় না। বাহাত্তর বছর বয়সে ৯৩২ খ্রিঃ তাঁর এন্তেকাল হয়।

দীর্ঘ জীবনের বৃত্তান্ত অজানা থাকলেও তাঁর কর্মকৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বই থেকে। তার মধ্যেই বিধৃত রয়েছে কর্মী রাজেশের সত্যিকার পরিচয়।

তাঁর অপরসায়ন, আধিবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ের বইগুলি বিশ্ববিজ্ঞান ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। তাঁর অসাধারণ বই কিতাব-অল-মনসুরি ইয়া মুলুকি বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম স্তম্ভরূপে বিবেচিত তাঁর আল হাওয়াই বইটি তিনি লিখেছিলেন দীর্ঘ পনেরো বছরের পরিশ্রমে। যদিও নিজের জীবদ্দশায় তিনি সেটি প্রকাশ করেন নি। কি কারণে এই দীর্ঘ পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞান তিনি চেপে রেখেছিলেন তা জানা যায় না।

বিশ্বের বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন আল হাওয়াই মানব চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী বই। এই বইটি পারস্যের চিকিৎসার ইতিহাস নামে অনুবাদ করে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ডাঃ সিরিল এলগুড পৃথিবীর চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অশেষ উপকার সাধন করেছেন।

এই গ্রন্থের এক জায়গায় এলগুড লিখেছেন, Among these works priority in importance and in interest must be given to his (Rhazes). All Hawai continens of this the Complete Arabic text has never been published. In its Latin form it is available in the edition transalated by Faraj Ibn Salem of Farraguth for king Charles of Anjou in 1276, and printed at Brescia in 1486, portions of the original text can be seen in various libraries, One day, perhaps they will be collected, edited and printed. This is highly desirable for the continens must be regarded as most important even than the connon of Avicenna to the history of Arab Medicine. Access to the complete original text is essential for the full history and appreciation of the past that the Arab and Percians played in the progress of Medicine."

রাজেশের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর এক বোন রাজেশের যাবতীয় বইপত্র, গবেষণার কাগজপত্র ও প্রচুর পাণ্ডুলিপি বিক্রি করে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ওই মূল্যবান সম্পদ যোগ্য হাতেই হস্তান্তরিত হয়েছিল। সুলতান রুকন-অল-দৌলার বিদ্যোৎসাহী উজীর ইবন উত আমিদ এগুলো কিনেছিলেন।

আমিদ নিজেও ছিলেন পন্ডিত ব্যক্তি। রাজেশের পান্ডুলিপিগুলির মূল্য অনুধাবন করতে তাঁর দেরি হল না। তিনি রাজেশের সকল ছাত্র এবং রাভি শহরের জ্ঞানী গুণী চিকিৎসক সকলকে একদিন এক সমাবেশে আহ্বান জানালেন।

গুণীজনের সেই সভায় তিনি তাদের হাতে তুলে দিলেন রাজেশের পাণ্ডুলিপিগুলি, তাঁদের অনুরোধ করলেন, তাঁরা যেন পাণ্ডুলিপিগুলি সংস্কার করে একত্র সন্নিবেশিত করেন।

তাই করা হল। সংস্কৃত ও সংকলিত পাণ্ডুলিপির নাম দেওয়া হল কিতাব-উল-হাওয়াই-ফি-তিব। একথার অর্থ হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের পদ্ধতি। এইভাবেই সেদিন তৈরি হয়েছিল আরবী চিকিৎসার মহামূল্যবান দলিল।

আলি আব্বাস নামের এক বিখ্যাত চিকিৎসক রাজির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ''রাজেশ প্রতিটি রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসাপদ্ধতির যে বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলো আমাদের হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের কথা স্মরণে এনে দেয়''।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী রাজেশের বইগুলি থেকে আরবী চিকিৎসার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। মানব-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে আরবীয় অবদান নগণ্য নয়।

রাজেশের বইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, কিতাব মনসুরি, কিতাব-আল-জুদারি-উ-আল-হাশেহ।

বিশালাকার কিতাব মনসুরি দশখন্ডে বিভক্ত। চিকিৎসার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে এতে।

রাজেশ বইটির নামকরণের মধ্য দিয়ে আরব জগতের এক মহাগুণী প্রতিভার প্রতি সম্মান জানিয়েছিলেন।

সিজিস্থানের সামনি শহরে বাস করতেন মহামান্য তাপস মনসুর-ইবন-ইশাখ। তাঁর নামকে স্মরণীয় রাখার জন্যই তিনি মনসুরি নামকরণ করেছিলেন তাঁর বইয়ের। এই বইটি পরে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

রাজেশই সম্ভবত বিশ্বের প্রথম বিজ্ঞানী যিনি গুটি বসন্ত ও হাম নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর আগে ইউরোপে চার্চের তত্ত্বাবধানেই এই রোগগুলির চিকিৎসা হত। কিন্তু সেই চিকিৎসায় ছিল না বিজ্ঞানের ছোঁওয়া।

রাজেশ তাঁব কিতাব-আল-জুদারি-উ-আল-হাশেহ বইতে গুটি বসন্ত ও হাম নিয়ে গবেষণার অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়েছেন।

রোগ রোগী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা ব্যবহারিক দিক নিয়ে রচিত একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছিলেন বিশিষ্ট ইংরাজ গবেষক-বিজ্ঞানী মেযাবহফ। এই বইটি তিনি আরবী থেকে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ কবেছিলেন। এই বইটি থেকে রাজেশের জ্ঞানের গভীরতা ও বিপুল অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সেই সুপ্রাচীন যুগেই মেনিনজাইটিস ও অ্যাপেনডিসাইটিস সম্পর্কে রাজেশ এমন সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরও বিস্ময় উৎপাদন করে।

রাজেশের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানেই। অপরসায়ন ও পদার্থবিদ্যা নিয়েও যে তিনি গবেষণা করেছিলেন তা তার বইগুলি থেকে জানা যায়।

রাজেশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুবাস পারস্য থেকে আরবের অন্যান্য দেশ হয়ে পৌঁছয় ভারতে। আমাদের দেশেও তাঁর বইগুলি অনুবাদ হয়েছে, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসব বই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রাজেশের চিকিৎসা-ভাবনা আধুনিক চিকিৎসা-গবেষণার ক্ষেত্রে আজও দিশারীর ভূমিকা পালন করছে।

অশোক

বর্তমান বিহার রাজ্যের দক্ষিণে পাটনা-গয়া অঞ্চল জুড়ে ছিল প্রাচীন মগধের অবস্থান। মগধ ছিল সুবিশাল মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী। মৌর্য রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন।

গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায়, তৎকালীন মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক, পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে যিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর নাম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনিই বংশের নাম রাখেন মৌর্যবংশ।

দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে। সেই সময়ে মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন ধননন্দ।

আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগের অল্প কিছুদিন পরেই, চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজকে উৎখাত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন রণকুশলী সেনাপতি ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। রাজ্যশাসনের পাশাপাশি তিনি রাজ্য রক্ষারও সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য প্রায় একশত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্তের পরে মগধের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার। তিনি ছিলেন

পিতার মতোই সুশাসক এবং বীর। অসাধারণ বিক্রমের জন্য তাঁকে বলা হত অমিত্রঘাত। তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা সুখী ও সম্পদশালী হয়েছিল।

আঠাশ বছর রাজত্ব করার পরে খ্রিঃ পূর্ব ২৭২ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুষীম ছিলেন রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত, উদ্ধত- স্বভাব ও বিলাসী। আবার দ্বিতীয় পুত্র অশোক ছিলেন বুদ্ধিমান কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

সিংহাসনের অধিকার লাভের জন্য শেষ পর্যন্ত অশোক ভাইকে হত্যা করেন।

এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অশোকের ভ্রাতৃহত্যার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে জানা যায় যে পিতার মৃত্যুর পর অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল চার বছর পরে। তা থেকেই অনেকে অনুমান করেন প্রজাদের অসন্তোষ প্রশমনের জন্যই উপযুক্ত সময়ে অশোকের অভিষেক হয়নি।

বিন্দুসারের তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল তিষ্য। তিনিও ছিলেন বিলাসী ও অত্যাচারী। সিংহাসনের অধিকার নিষ্কন্টক করার জন্য অশোক কনিষ্ঠ ভাইকেও হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার জন্য প্রজারা ছিল ক্ষুব্ধ, কনিষ্ঠকে হত্যা করলে প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। তাই তিনি তিষ্যকে শাসনকর্তা করে তক্ষশিলায় পাঠিয়ে দিলেন।

বিন্দুসারের চতুর্থ পুত্র অশোকের সর্বকনিষ্ঠ ভাইয়ের নাম ছিল বীতশোক। তিনি ছিলেন নিরীহ ও উদাসীন প্রকৃতির। ঐশ্বর্য বা সুখভোগের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না।

সিংহাসনের অধিকার নিয়ে ভাইদের মধ্যে হানাহানি বীতশোককে সংসারের প্রতি অনাসক্ত করে তোলে। তিনি গৃহ ত্যাগ করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গিরি দত্তের কাছে দীক্ষা নেন এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দেন।

অশোক সিংহাসনে বসলেও অনেকেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করল। তিনি বিরোধীদের নির্মমভাবে হত্যা করে নিজেকে অপ্রতিহত করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এই সময় অশোক এমনই নৃশংসতার পরিচয় দেন যে প্রজারা তাঁর নামকরণ করেছিল চন্ডাশোক।

মগধ সাম্রাজ্যের পাশেই ছিল কলিঙ্গ রাজ্য। এই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মগধের রাজাদের কখনওই সুসম্পর্ক ছিল না। তার প্রধান কারণ হল, পাটলিপুত্র থেকে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে পূর্ব উপকূল ধরে যোগাযোগের প্রধান বাধা

ছিল এই রাজ্যটি। তথাপি চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসার কখনওই কলিঙ্গরাজ্য জয় করার কথা ভাবেননি।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় কলিঙ্গ ছিল স্বাধীন শক্তিশালী রাজ্য। রাজ্যের সেনাবাহিনীতে ছিল ষাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারোহী ও সাতশো হাতী।

সিংহাসন লাভের আট বছর পরে অশোকের দৃষ্টি পড়ল প্রতিবেশী রাজ্যটির প্রতি। তিনি স্থির করলেন কলিঙ্গ রাজ্য জয় করে নিজের অধিকারে আনবেন। যথাসময়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অশোক কলিঙ্গ জয়ে অগ্রসর হলেন।

দূতমুখে সংবাদ পেয়ে কলিঙ্গরাজও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যদল মুখোমুখি হল মহানদীর তীরবর্তী অঞ্চলে।

দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনীই ছিল শক্তিশালী। কিন্তু মগধের রণপটু যোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণের কাছে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হল কলিঙ্গের সৈন্যবাহিনী। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে নিহত হলেন স্বয়ং কলিঙ্গরাজ।

আহত আর নিহত সৈন্যদের মৃতদেহ আর রক্তে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধক্ষেত্রের এই বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে অশোকের কঠিন হৃদয় শোকাচ্ছন্ন হল। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছেন তিনি এই চিন্তায় তাঁর হৃদয় অনুতাপে দীর্ণ হতে লাগল। মনের শান্তি হারালেন তিনি। শপথ নিলেন, আর কখনও যুদ্ধ করবেন না।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন। ভগবান বুদ্ধের প্রেম ও করুণার বাণী প্রাচারকেই তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলেন।

অশোক তাঁর সাম্রাজ্যে ঘোষণা করলেন আর যুদ্ধ নয়। ধর্মবিজয়ই হবে তাঁর একমাত্র পথ।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের জীবনযাত্রায়ও আনলেন আমূল পরিবর্তন। রাজকীয় বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করে সরল ও পবিত্র জীবনযাত্রা অবলম্বন করলেন।

তাঁর নির্দেশে রাজবাড়ির রন্ধনশালাতেও পশুপাখি হত্যা বন্ধ হয়ে গেল।

রাজরাজড়াদের প্রিয় ব্যসন হল মৃগয়া। বনে গিয়ে পশু পাখি শিকার করা সম্রাট অশোকেরও ছিল প্রিয় ব্যসন।

সেই মৃগয়া বন্ধ করে দিয়ে তিনি রাজ্যের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে বুদ্ধের উপদেশ প্রচার করতেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি দরিদ্র, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অকাতরে দান করতেন।

যুদ্ধবিগ্রহের তৎপরতা ছিল না। তাই কিছু সংখ্যক রাজকর্মচারীকেও অশোক রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে ধর্মের বাণী প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

প্রতিবেশী রাজাদের কাছে দূত পাঠিয়ে অশোক ঘোষণা করেছিলেন, তিনি সকলের সঙ্গে মৈত্রী আকাঙ্ক্ষী। সকলে যেন নির্ভয়ে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করেন। অশোক তাঁর উত্তরাধিকারীদেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধ না করে তারা যেন প্রেম ও মৈত্রীর দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করে। এই ধর্মবিজয়ই রাজাদের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত বলে অশোক উপদেশ দিতেন।

সম্রাট অশোকের চেষ্টাতেই এভাবে সমগ্র উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করল।

মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটাবার জন্য তিনি কেবল রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারক পাঠিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। নানাস্থানে স্তম্ভ স্থাপন করে, পর্বতের গায়ে, শিলাখন্ডে বুদ্ধের নানা বাণী উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। প্রজারা যাতে এই সকল উপদেশ পালন করে নিজেদের জীবন গঠন করতে পারে তার জন্য তিনি তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করতেন।

ছিলেন চন্ডাশোক, ভগবান বুদ্ধের উপদেশে তিনিই কালে হয়ে উঠলেন ধর্মাশোক। অন্তরে বাইরে চিরতরে হিংসাকে বর্জন করে তিনি হলেন আশ্চর্য ক্ষমাসুন্দর পবিত্র পুরুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ক্রোধ বা শাসন নয়, ক্ষমা ও ভালবাসাই মানুষকে সৎ ও সুন্দর করে তুলতে পারে। অনেক অপরাধীকেই তিনি ক্ষমা করে সৎজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে তাদের সাহায্য করেছিলেন। সমস্ত প্রজাকে তিনি আপন সন্তানের মতো ভালবাসতেন। তাদের সুখ ও কল্যাণের জন্যই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। এমন প্রজাবৎসল নরপতি অশোক ভিন্ন দ্বিতীয় কারোর কথা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

প্রজাদের সকল প্রকাব সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি রাজ্যের প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদাভাবে মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে তিনি এই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এবং প্রজাদের প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ কবতেন।

প্রজাদের দূর দূর অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা ও পথশ্রমের ক্লেশ দূর করবার উদ্দেশ্যে অশোক রাজ্যজুড়ে বহু পথ নির্মাণ করেছেন। এই সমস্ত পথের দুই পাশে ছায়াবৃক্ষ রোপন করিয়েছেন। পথিকদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আট ক্রোশ অন্তর পথের ধারে কূপ খনন করা হয়েছিল।

তিনি সমস্ত রাজ্যে জীবহত্যা, পশু শিকার ইত্যাদি হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য তিনি যেমন চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন, তেমনি পশুদের চিকিৎসারও সুব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর কারুণ্যের এই দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

অপরাধীর বিচারের ক্ষেত্রে অশোক বিচারকদের জন্য যে নির্দেশ জারি করেছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় অপরাধীদের প্রতিও তাঁর করুণার অভাব ছিল না।

সমগ্র রাজত্বকালে তিনি পঁচিশবার কারাগার থেকে বন্দিদের মুক্তিদান করেছিলেন। একটি লিপি থেকে জানা যায়, তিনি বিচারকদের ক্রোধ, ঈর্ষা, ক্ষিপ্রতা, আলস্য ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের দন্ডাজ্ঞা কার্যকর করার আগে তিন দিন সময় দেওয়া হত। এই সময়ে অপরাধীদের তরফে নতুন সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা যেত কিংবা মুক্তিভিক্ষা প্রার্থনা করা যেত।

অপরাধীদের ধর্মাচরণে উৎসাহী করে তোলার জন্য সম্রাট অশোক সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। তারা যাতে সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করে তার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টার ফলে সাধারণ প্রজাদের মধ্যেও ধর্মভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অশোক নিজে ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু অপর সকল ধর্মমতের প্রতিও তিনি ছিলেন সমদৃষ্টি সম্পন্ন। তাঁর রাজ্যে প্রজারা নির্দ্বিধায় স্ব স্ব ধর্ম পালন করতে পারত। বস্তুতঃ যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা অশোকের রাজ্যে বর্তমান ছিল।

একটি শিলালিপিতে তিনি লিখেছিলেন, কখনো অন্যের ধর্মের নিন্দা করা উচিত নয়। ধর্মের মূল সত্য ও সারবস্তু সকলের গ্রহণ করা উচিত।

কলিঙ্গযুদ্ধের পর থেকে অশোক ধর্মাচরণে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের বিষয়ে তাঁর কোন শৈথিল্য ছিল না। সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসনের কাজ তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। প্রয়োজন মতো তিনি তাঁদের উপদেশ ও নির্দেশ দান করতেন।

তাঁর পিতা ও পিতামহ ছিলেন সুদক্ষ শাসক। রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থাই তিনি অনুসরণ করতেন, তবে তৎকালের অনেক কঠোর নিয়মকানুনের পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তিনি নিজেও প্রজাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে অনেক নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। প্রজাদের প্রতি কোথাও কোনভাবে অবিচার করা হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন।

অপর এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর দায়িত্ব ছিল প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখা।

ধর্ম বিষয়ে অশোক যে অনুশাসন প্রচার করেছিলেন, তার মধ্যে কোন প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি স্থান পায়নি। তাঁর ধর্মীয় অনুশাসন সর্বকালের সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ চিরকালের মানুষের জীবনসত্যই তিনি প্রচার করেছিলেন।

অশোকের প্রধান ধর্মীয় অনুশাসনগুলি ছিল ঃ

পাপ পরিহার করবে।

সদা সত্য কথা বলবে।

সাধুস্বভাব অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবে।

যথাসম্ভব পরোপকার করবে।

কারো প্রতি কখনো নির্দয় আচরণ করবে না।

সামর্থ্য অনুসারে দান করবে।

হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ করে পবিত্র জীবন লাভের চেষ্টা করবে।

সামর্থ্য অনুযায়ী সঞ্চয় করবে, মিতব্যয়ী হবে।

মাতা-পিতা, গুরুজন, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি বিনীত ও বাধ্য থাকবে।

জীবনযাত্রায় সংযমী হবার চেষ্টা করবে।

জীবহিংসা ও জীবহত্যা পরিত্যাগ করবে।

এই সমস্ত অনুশাসন পাঠ করে যাতে মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি তা পাহাড়ের গায়ে ও পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ করে রেখেছিলেন।

ভারতেব সকল প্রান্তেই এই অনুশাসনগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই অনুশাসনগুলি উদ্ধার করে পন্ডিতগণ পাঠোদ্ধার করেছেন।

অশোকের কালের একটি অনুশাসন পাওয়া যায় বর্তমান আফগানিস্থানের অন্তর্গত কান্দাহার শহরে। তাতে গ্রিক ভাষায় লেখা ছিল—আমাদের প্রভু প্রিয়দর্শী দশ বছর হল সত্যধর্মের প্রবর্তন করেছেন। এই সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে পাপ কাজ হ্রাস পেয়েছে। এখন সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি ও আনন্দ বিরাজমান।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক কেবল মানুষের মঙ্গলের জন্যই নয়, পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ আদি সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্যও অনুশাসন প্রচার করেছিলেন।

রাজ্যাভিষেকের ছাব্বিশ বছর পরে তিনি তাঁর রাজ্যে যেসব জীব অবধ্য ঘোষণা করেছিলেন সেগুলো হল—হংস, লালবর্ণ চক্রবাক, বাদুড়, শ্বেতকপোত, গৈরাট, শুক, সারিকা, গ্রামকপোত, নন্দিমুখ, ক্ষুদ্র কচ্ছপ, সংকুচ মৎস্য, বেদ বেয়ক, অস্থিহীন মৎস্য, পর্ণ শশক, সজারু, বারোশিঙ্গা হরিণ, ষাঁড়, গন্ডার, আম্রবৃক্ষবাসী পিপীলিকা, গৃহস্থিত পোকামাকড়।

এছাড়া লোকে যা খায় না বা কোন কাজে আসে না এমন সব চতুষ্পদ এবং গর্ভিনী বা দুগ্ধবতী ছাগলী, মেষী ও শূকরী প্রভৃতি।

একটি অনুশাসনে দেবপ্রিয় বলেছেন, "যতদিন আমার পুত্র ও পৌত্রগণ রাজত্ব করবে ও আকাশে চন্দ্র সূর্য উদিত হবে, ততদিন আমার প্রচারিত অনুশাসন স্থায়ী হবে। এই অনুশাসনগুলি অনুসরণ করলে মনুষ্যগণ ইহলোক এবং পরলোকে সুখলাভ করবে।"

অশোকের অনুশাসনগুলি লেখা হত পাহাড়ের গায়ে, পাথরের ফলকে ও স্তম্ভের গায়ে। এই স্তম্ভগুলি তৈরি করা হত একটি মাত্র বিশালাকার পাথর দিয়ে। এই পাথরগুলি নিয়ে আসা হত চুনার থেকে।

পাথর কেটে তৈরি হত স্তম্ভ। তার মাথায় উৎকীর্ণ হত বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি। এই স্তম্ভগুলিকে বলা হয় অশোকস্তম্ভ। স্তম্ভগুলির অপূর্ব কারুকাজ ও শিল্পশৈলী দেখে অশোকের শিল্পরুচি ও শিল্পবিষয়ে অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্রাট অশোক একদিন তাঁর গুরুদেব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে জানতে চাইলেন, গুরুদেব, সর্বশ্রেষ্ঠ দান কি?

উপগুপ্ত বললেন, ধর্মদানই হল সর্বশ্রেষ্ঠ দান। একমাত্র ধর্মের পবিত্র আলোই পারে মানুষের অন্তরকে আলোকিত করতে।

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত সম্রাটকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, মানুষের আত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য তুমি ধর্মদান কর।

গুরুদেবের উপদেশ শিরোধার্য করে অশোক বুদ্ধের সুমহান বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে।

এতেই ক্ষান্ত হননি অশোক। ভারতবর্ষের বাইরেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। এই উদ্দেশ্যে তিনি পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে চারজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে সুদূর সিংহলে প্রেরণ করেছিলেন।

তাঁদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিংহলরাজ তিষ্য বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে সিংহলবাসীদের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে।

সঙ্ঘমিত্রা সিংহলের মেয়েদের মধ্যে বুদ্ধের বাণী প্রচার করে তাঁদেরও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচারের জন্য অশোক তাঁর ধর্ম-দূত প্রেরণ করেছিলেন পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। এমনকি সুদূর মিশর ও গ্রীস দেশে পর্যন্ত। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টাতেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল।

অশোক চেয়েছিলেন ধর্মমত নির্বিশেষে মানুষ অহিংসা ও প্রেমের বাণী তাদের জীবনে মূর্ত করে তুলুক। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও ব্রাহ্মণরা এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারেনি। অশোকের এক রানীও অশোকের বৌদ্ধধর্ম-প্রীতিকে ভালভাবে নিতে পারেননি। তিনি গোপনে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের মাধ্যমে এই সংবাদ জানতে পেরে অশোক মর্মাহত হন। দুঃখে ক্ষোভে তিনি পৌত্র সম্পতিকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে আশ্রয় নিলেন এক বৌদ্ধ বিহারে।

নতুন সম্রাট সম্পতি বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। তাই ধর্মপ্রচারের কাজে এবং প্রজাদের কল্যাণের জন্য অশোকের সময়ে যে অর্থ ব্যয় করা হত তা তিনি অনেক কমিয়ে দিলেন।

সম্পতি ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ফলে অশোকের আমলে যে সকল রাজপুরুষ ও পারিষদবর্গ অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যেও পরিবর্তন সূচীত হল। অনিবার্যভাবে ভোগ-বিলাস বেড়ে গেল।

বছর কয়েক পরে ধর্ম সম্মেলন উপলক্ষে বৌদ্ধবিহারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাগম হল। পূর্বে এই ধর্ম সম্মেলনের ব্যয়ভার বহন করতেন সম্রাট অশোক। তাই তিনি অর্থ প্রার্থনা করে পৌত্র সম্পতির কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রের উত্তরে সম্পতি জানালেন, অর্থ পাঠানো সম্ভব নয়, রাজকোষ শূন্য।

পৌত্রের ব্যবহারে তীব্র বেদনায় ভরে উঠল অশোকের অন্তর। তিনি বুঝতে পারলেন, এতদিনে নিঃস্ব রিক্ত হয়েছেন। পৃথিবী থেকে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এই বেদনা বুকে নিয়েই কিছুদিন পরে পরলোকে গমন করলেন সম্রাট অশোক। সময়টা ছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দ।

উইনস্টোন চার্চিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবিস্মরণীয় নায়ক, ধুরন্ধর রাজনীতিক, কৌশলী সমরবিদ ও বাস্তববাদী লেখক উইনস্টোন চার্চিল ইতিহাসের এক বিস্ময় পুরুষ। এই কীর্তিমান পুরুষ তাঁর অবিস্মরণীয় কর্ম-কৃতিত্বের ধারক ইংরাজ জাতির ইতিহাসকে উজ্জ্বল করেছেন।

সম্পূর্ণ নাম ছিল উইনস্টোন লিওনার্দ স্পেনসার চার্চিল। তবে সংক্ষেপিত উইনস্টোন চার্চিল নামেই বিশ্বময় তাঁর পরিচিতি। এই নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ী

মানুষটির সব চেয়ে বড় পরিচয় ছিল, পরাজয়ে তিনি কখনো ভেঙ্গে পড়তেন না। বরং পরাজয়কেই তিনি তাঁর কূটকৌশল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রসাদে জয়মুখী করে তুলতেন।

উইনস্টোনের রক্তেই ছিল রাজনীতি আর যুদ্ধ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অতুলনীয় সাহিত্য প্রতিভা। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত কীর্তিকাহিনী যদি কোনদিন মানুষ ভুলেও যায়, তাঁর অতুলনীয় সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৮৭৪ খ্রিঃ ৩০শে নভেম্বর ব্রেনহেইম প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন উনস্টোন চার্চিল। তাঁর পিতা লর্ড র‍্যানডলফ চার্চিল ছিলেন ব্রিটেনের বিচক্ষণ রাজনীতিক।

চার্চিল পরিবারের দশম পুরুষ প্রথম চার্চিল ছিলেন ডরমেটের ক্যাভিলিয়র স্কোয়ার। ইংলন্ডের রাজা প্রথম চার্লসের পক্ষে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন।

প্রথম চার্চিলের পুত্র মার্লবরোর ডিউক ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত যোদ্ধা। উইনস্টোনের পিতা সপ্তম ডিউকের পুত্র লর্ড র‍্যানডলফ চার্চিল ছিলেন বিজ্ঞ রাজনীতিক ও দক্ষ যোদ্ধা। তিনি টোরি গণতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতা। স্বাভাবিক ভাবেই উইনস্টোন পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন অসাধারণ সমর প্রতিভা।

উইনস্টোনের মা ছিলেন মার্কিন মহিলা, নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লিওনার্দ জেরোমের কন্যা। উইনস্টোন সাহিত্য প্রতিভা লাভ করেছিলেন তাঁর মাতৃকুলের তরফ থেকে। দুই পরিবারের দুই প্রতিভার মিলন ঘটেছিল উইনস্টোনের মধ্যে।

ছেলেবেলা থেকেই উইনস্টোন ছিলেন চিন্তাশীল। কিন্তু পড়াশুনায় ছিলেন অমনোযোগী।

তাঁর বাইরের প্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতি ছিল বিপরীতধর্মী। পরিণত বয়সেও এই বৈপরীত্য ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পড়াশুনায় অমনোযোগী হলেও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে হ্যারোতেই লেখাপড়া শুরু হয়েছিল তাঁর। কিন্তু জুনিয়র স্কুলের গন্ডি পার হতে পারেন নি তিনি। হ্যারোতে অকৃতকার্য হয়েছিলেন দুবার।

পুত্রের পড়াশুনার এহেন কৃতিত্বে স্বভাবতঃই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন র‍্যানডলফ চার্চিল। কিন্তু পুত্রের সহজাত স্বভাব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হননি তিনি।

ডানপিটে স্বভাবের বালক উইনস্টোন ছোট ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতেই বেশি ভালবাসতেন। এই খেলায় উইস্টোনের পুতুল-সৈন্য-সজ্জার কৌশল ও চাতুর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন বিচক্ষণ র‍্যানডলফ। তাই হ্যারোতে

দুবার অকৃতকার্য হবার পর তিনি ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দিলেন স্যান্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়ে। স্যান্ডহার্স্টে আসার পর উইস্টোনের প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটল। এখানে তিনি সামরিক বিদ্যার সঙ্গে রাজনৈতিক পাঠও গ্রহণ করলেন।

স্যান্ডহার্স্টের শিক্ষা যখন শেষ হল, উইনস্টোনের তখন বয়স কুড়ি বছর। ততদিনে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছেন।

রাজনীতিক পিতার আদর্শ অনুসরণ করে সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যৌবনে পদার্পণ করে উইনস্টোন পিতার প্রতিষ্ঠিত টোরি দলে যোগ দিলেন। কিছুদিন পরেই র‍্যাডলফ পরলোকগমন করলেন।

ইতিমধ্যে উইনস্টোন ৪র্থ হাল্কা অশ্বারোহী বাহিনীতে নিয়োগপত্র পেয়ে গেলেন। কিন্তু এই কাজে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তিনি। সৈনিক হিসাবে বাস্তব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

১৮৯৫ খ্রিঃ গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য উইনস্টোন চলে গেলেন কিউবা। সেখানে স্পেনের সরকারি ফৌজে যোগ দিলেন। কিউবার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রথম সুযোগ এভাবে লাভ করলেন তিনি।

যুদ্ধ-সাংবাদিকের হাতেখড়িও তাঁর হয় প্রথম কিউবাতেই। যুদ্ধের বিবরণ লিখে নিজের খরচেই তিনি নিয়মিত পাঠাতেন ডেইলি গ্রাফিক্স পত্রিকায়।

১৮৯৬ খ্রিঃ দেশে ফিরে এলেন। সেই বছরেই নিজের রেজিমেন্টের সঙ্গে চলে এলেন ভারতে।

ভারতে তখন যুদ্ধাবস্থা না থাকায পোলো খেলা নিয়েই কিছুদিন ব্যস্ত রইলেন উইনস্টোন। তারপরেই এসে গেল যুদ্ধে যাবার সুযোগ।

সীমান্ত প্রদেশে বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাদের দমন করার জন্য ১৮৯৭ খ্রিঃ মালাকান্দা গিরিপথে সৈন্য পাঠানো হল। উইনস্টোন এই অভিযানে স্থান পাবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে পাঠানো হল না।

নিরাশ হলেন না তিনি। ডেইলী টেলিগ্রাফ ও এলাহাবাদ পাইওনীয়ারের পক্ষে সমর প্রতিবেদক হয়ে উইনস্টোন মালাকান্দা অভিযানে অংশ নিলেন।

ফিরে এসে রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি একটি বই লিখলেন। তাঁর এই প্রথম বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাহিত্যিক সম্মান পেলেন। জনপ্রিয় বই থেকে এই সময় প্রচুর অর্থাগমও হয়েছিল তাঁর।

বইটিতে সরকারের সামরিক অব্যবস্থার সমালোচনা ছিল। এর ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষের রোষে পড়তে হল তাঁকে।

১৮৯৮ খ্রিঃ সুদানে গাজীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। তাদের দমনের জন্য একটি অভিযানের আয়োজন করা হল।

এই অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য উইনস্টোন উদগ্রীব হলেন। কিন্তু তিনি মালাকান্দা অভিযানে সামরিক বাহিনীর সমালোচনা করেছিলেন। তাই সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে অভিযানে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না।

উইনস্টোন কিন্তু দমলেন না। তিনি নানা ভাবে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ২১ তম ল্যান্সারে শর্ত সাপেক্ষে যুক্ত হলেন। শর্তটি হল, উইনস্টোনকে নিজের খরচে অভিযানের সঙ্গে যেতে হবে।

সমর প্রতিবেদক হিসেবে যথেষ্টই সুনাম অর্জন করেছিলেন চার্চিল। তাই এবারে মর্নিংপোস্ট পত্রিকা তাঁকে তাদের সমর সাংবাদিক হিসেবে নিয়োগ করল। চার্চিলের অভিলাষ পূর্ণ হল। তিনি মিশরে চলে গেলেন এবং নির্দিষ্ট ল্যান্সারে যোগ দিলেন।

দুই পক্ষের যুদ্ধ হল ওমডারম্যান অঞ্চলে। বিদ্রোহী গাজীদের রণকৌশলে এক সুরক্ষিত নালায় ইংরাজ রেজিমেন্টের প্রায় এক চতুর্থাংশ সৈন্য নিহত হল।

চার্চিল নির্ভীক পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে ছত্রভঙ্গ দলকে সংহত করে ব্রিটিশ রণকৌশলের এক অপূর্ব অধ্যায় রচনা করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ইংলন্ডে ফিরে এসে কলম নিয়ে বসলেন চার্চিল। লিখলেন দু খন্ডে রিভার ওয়ার। পাঠক মহলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করল বইটি। সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থের মালিক হলেন তিনি।

রিভার ওয়ারের সাফল্যে চার্চিল সৈনিক জীবন থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ সেনাবাহিনী থেকে এই সময় তিনি যে মাইনে পেতেন, লেখা থেকে তার চাইতেও বেশি রোজগার করছিলেন। চার্চিল সামরিক বাহিনী ছেড়ে এবারে ফিরে এলেন রাজনৈতিক জীবনে।

১৮৯৯ খ্রিঃ ওল্ডহাম কেন্দ্রের উপনির্বাচনে অবতীর্ণ হলেন চার্চিল। কিন্তু রাজনীতির প্রথম যুদ্ধেই হেরে গেলেন।

সেই বছরেই আরম্ভ হল বুয়র যুদ্ধ। চার্চিল মর্নিংপোস্ট পত্রিকার সমর সাংবাদিক হিসেবে চলে গেলেন বুয়র এলাকায়। সেখানে দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুবাহিনীর হাতে বন্দি হলেন তিনি। তাঁকে পাঠানো হল প্রিটোরিয়ার বন্দিশালায়।

কিন্তু বন্দিশালাতে নিষ্ক্রিয় রইলেন না চার্চিল। জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনা করলেন। পরে একদিন গভীর রাতে পাঁচিল টপকে জেল থেকে বেরিয়ে এলেন।

চার্চিল এর পরে চলে এলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। বুয়র শাসক তাঁকে ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

দক্ষিণ আফ্রিকার হাল্কা অশ্বারোহী বাহিনীতেই এবারে যোগ দিলেন চার্চিল। এই বাহিনী নিয়ে তিনি সবার প্রথমে লেডিস্মিথ-এ পৌঁছলেন।

জোহান্সবার্গ তখনো ছিল বুয়রদের দখলে। চার্চিল গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। তিনি শত্রুবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে জোহান্সবার্গ হয়ে একসময় ইংলন্ডে ফিরে এলেন।

আবার রাজনীতিতে আবির্ভূত হলেন। ওল্ডহাম নির্বাচন কেন্দ্রে উপনির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন চার্চিল। কিন্তু ১৯০১ খ্রিঃ এই পুরনো নির্বাচন কেন্দ্র থেকেই তিনি পার্লামেন্টে নির্বাচিত হলেন। চার্চিলের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

পার্লামেন্টে অনতিকালের মধ্যেই তিনি বাগ্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন। ১৯০৩ খ্রিঃ যোসেফ চেম্বারলিন শুল্ক সংস্কারের সূচনা করেছিলেন। চার্চিল এই সংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করেন।

এরপর নিজের টোরি দলের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি তাঁর বন্ধু লয়েড জর্জের লিবারেল পার্টিতে যোগ দেন।

১৯০৬ খ্রিঃ সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে লিবারেল পার্টি দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করে।

চার্চিল লিবারেল পার্টির প্রার্থী হিসেবে উত্তর-পশ্চিম ম্যানচেস্টার কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি লাভ করলেন উপনিবেশ বিষয়ক উপ-সচিবের দায়িত্ব এবং অবিলম্বে কমনস সভার মাধ্যমে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নেন।

পরবর্তী নির্বাচনে চার্চিল ডান্ডি থেকে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টের সদস্য হন। এই সময়ই তিনি বিয়ে করেন তাঁর পূর্ববর্তী নির্বাচনকেন্দ্র ম্যানচেস্টারের এয়ারলাই কাউন্টীর পৌত্রী নীলনয়না ক্লিমেন্টাই হোজায়াইয়ারকে। তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়েছিল।

ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই চার্চিল লাভ করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা। মাত্র ৩৭ বছর বয়সেই গ্রেট ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন তিনি।

পরবর্তীকালে নৌবাহিনীর দায়িত্ব লাভ করে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর যুগোপোযোগী সংস্কার সাধন করেন।

যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে চার্চিলের সহজাত আকর্ষণ তাঁকে বরাবরই সজাগ রাখত। ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হবার আগেই চার্চিল তার আভাস পেয়েছিলেন।

১৯১৪ খ্রিঃ ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে তিনি মন্ত্রিসভার অগোচরেই যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে সক্রিয় করে তুলেছিলেন। বিশাল নৌ-মহড়াও সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি। এর ফল সমগ্র ইংরাজ জাতির পক্ষেই শুভ হয়েছিল।

যুদ্ধে সাফল্যের পাশাপাশি পরাজয়ও বরণ করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু পরাজয় কখনো তাঁর মনকে মুষড়ে ফেলতে পারেনি। পরাজয়কে বীরের মতোই গ্রহণ করেছেন।

ব্রিটেনের উপকূল রক্ষার জন্য তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, নৌ ও বায়ু পরিষেবা যথেষ্ট জোরদার হয়েছিল। তথাপি ফরাসী চ্যানেলের দিকে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে পারেননি।

তুরস্ক আক্রমণ অসফল হলে নৌবাহিনীর দায়িত্বে থাকা চার্চিল পরাজয়ের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন।

পরিণতিতে ১৯১৫ খ্রিঃ নবগঠিত কোয়ালিশন সরকার চার্চিলকে আব নৌবাহিনীর দায়িত্বে রাখতে চায়নি। চার্চিল পদত্যাগ করে পুনরায় সামরিক বাহিনীতেই ফিরে গিয়েছিলেন।

চার্চিলের বন্ধু ও রাজনৈতিক সহকর্মী লয়েড জর্জ ১৯১৬ খ্রিঃ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চার্চিলের রাজনৈতিক প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। তাই চার্চিলকে মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু টোরি পার্টির সদস্যদের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত জর্জকে সংকল্প ত্যাগ করতে হয়। তবে পরের বছর, ১৯১৭ খ্রিঃ চার্চিল মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

এইভাবেই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে চার্চিলকে। নির্বাচনে দফায় দফায় যেমন পরাজিত হয়েছেন, তেমনি সেই পরাজয়কে জয়মুখী করে তুলতেও বিলম্ব হয়নি তাঁর। নির্বাচনে জয়লাভ করেই পার্লামেন্টে ফিরে এসেছেন।

টোরি পার্টির প্রার্থী হিসেবে ১৯২৪ খ্রিঃ নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি চ্যান্সেলর অব এসচেকারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

১৯২৯ খ্রিঃ নির্বাচনে জয়ী হয়ে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে। সেইকালে চার্চিল নির্দ্বিধায় ম্যাকডোনাল্ডের সমালোচনা করেছিলেন এবং ভারতের স্বায়ত্বশাসনের বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক নিয়ে বলডউইনের সঙ্গে বিতন্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

সেই সময় ইংলন্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। ফলে ১৯৩১ খ্রিঃ নির্বাচিত সরকার গঠন করা সম্ভব হল না, গঠিত হল জাতীয় সরকার। চার্চিল সাময়িকভাবে

রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে নিজের লেখালিখিতে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর রচিত হিস্ট্রি অব দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এবং হিজ লাইফ অব মালবরো পাঠকমহলে বিপুল সমাদর লাভ করে।

লেখক-সাংবাদিক ও রাজনীতিক চার্চিলের আরও একটি পরিচয় হল, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী। তাঁর অঙ্কিত ছবির নিচে তিনি চার্লস মোরিন নাম সই করতেন।

প্যারিসে তাঁর চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী হয়েছিল এবং সেখানে প্রচুর ছবি ভাল দামে বিক্রি হয়েছিল।

সেই রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশে বিচক্ষণ রাজনীতিক চার্চিল ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে বারবার বহিরাক্রমণ সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছিলেন। সময়টা ছিল ১৯৩৮ খ্রিঃ। সামরিক বিশারদ চার্চিলের কথা সেই সময় কর্তৃপক্ষ বিশেষ আমলে আনেননি।

কিন্তু পরবর্তী একবছরের মধ্যেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠল এবং চার্চিলের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হল।

বাধ্য হয়ে ব্রিটেনকে সেই সময় সমর বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। চেম্বারলিন মন্ত্রিসভার রদবদল ঘটালেন এবং নৌবাহিনীর দায়িত্বে চার্চিলকে নিয়ে আসা হল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে প্রথম দিকে কয়েক মাস ব্রিটিশ নৌবাহিনীকেই যুদ্ধ সামাল দিতে হয়েছিল। স্থলবাহিনী জার্মান আক্রমণ প্রতীক্ষায় ফরাসীর ট্রেঞ্চে অবস্থান নিয়েছিল। বিমানবাহিনীও ব্যস্ত ছিল প্রচার পুস্তিকা ছড়ানোর কাজে।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী তার প্রথম ছয় মাসের যুদ্ধে জার্মানীর ইউ বোটকে ডুবিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। চার্চিলের হল জয় জয়কার।

জার্মান বাহিনী ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ করলে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন এমনই বেসামলা হয়ে পড়লেন যে তাঁর নিজের দলের সদস্যদেরই সমালোচনার মুখে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগ করতে হল যখন জার্মান বাহিনী হল্যান্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে বসল। ১৯৪০ খ্রিঃ ১১ই মে তারিখে চার্চিল গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধ জর্জরিত দেশের নিরপত্তা রক্ষার জন্য সেই সময় সমর বিশারদ চার্চিল যে সামরিক কৌশল গ্রহণ করেছিলেন তাতে দেশের অখন্ডতা অক্ষুণ্ণ ছিল। চার্চিল হয়ে উঠেছিলেন দ্বিতীয় মহাসমরের বিজয়ী নায়ক।

মহাযুদ্ধের অবসান হল ১৯৪৫ খ্রিঃ ৮ই মে। কৃতজ্ঞ ইংরাজ জাতি বিজয়ী সমর নায়ককে তাঁদের জাতীয় নায়ক হিসেবে বরণ করে নিল।

যুদ্ধ শেষ হলে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু নির্বাচনে হেরে গেল চার্চিলের পার্টি। ক্ষমতাসীন হল লেবার পার্টি। নেতৃত্বে রইলেন ক্লিমেন্ট এটলী।

চার্চিলের বয়স তখন ৭০ বছর। রাজা ষষ্ঠ জর্জ চার্চিলকে নাইট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতে চাইলেন। কিন্তু তখনো রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর। তাই তিনি নাইট হুড গ্রহণ করে রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি টানতে চাইলেন না।

এর পরও বিরোধী দলের নেতা হিসেবে চার্চিল জাতির সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫১ খ্রিঃ নির্বাচনে চার্চিলের দলই নির্বাচিত হল। দ্বিতীয় বারের মতো ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাজা ষষ্ঠ জর্জ পূর্বে তাঁকে যে সম্মানে ভূষিত করতে চেয়েছিলেন সেই সম্মান তিনি গ্রহণ করলেন ১৯৫৩ খ্রিঃ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের হাত থেকে।

তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিও চার্চিল লাভ করেছিলেন ওই একই বছরে। ১৯৫৩ খ্রিঃ সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল। বিশ্বসাহিত্যে চার্চিলের অবিস্মরণীয় অবদান আ হিস্ট্রি অব ইংলিশ স্পিকিং পিপলস ও ছয়খন্ডে প্রকাশিত দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার।

১৯৫৫ খ্রিঃ আশি বছর বয়সে চার্চিল প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫৯ খ্রিঃ ৯১ বছর বয়সে দুই শতাব্দীর অবিস্মরণীয় পুরুষ উইনস্টোন চার্চিল পরলোক গমন করেন।

মেগাস্থিনিস

গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস নামটি তাঁর ভারত বিবরণের জন্যই আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিপরিচয় তথা জীবন সম্বন্ধে বিশষ কিছু জানা যায় না।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষদিকে মেগাস্থিনিস ভারতে এসেছিলেন গ্রীক শাসক সেলুকাসের মৈত্রীদূত রূপে।

সেলুকাস ছিলেন গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের সেনাপতি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিজয়ের পরেই দেশে ফেরার পথে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বিশাল সাম্রাজ্য সেলুকাস, অ্যান্টিগোনাস, টলেমি প্রভৃতি সেনাপতিগণ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করে নেন।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলসমূহ সেলুকাসের অধিকারভুক্ত ছিল। মগধের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেলুকাসকে যুদ্ধে পরাজিত করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

পরাজিত সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপন করেন। তিনি নিজ কন্যাকে সম্রাটের সঙ্গে বিবাহ দেন। উপঢৌকন হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত লাভ করেন আরও কিছু গ্রীক অধিকৃত অঞ্চল।

সেলুকাস পরে মৈত্রীর দূত রূপে জ্ঞানী ও সরল হৃদয় লেখক মেগাস্থিনিসকে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটালিপুত্রে প্রেরণ করেন।

মেগাস্থিনিস বহুকাল ভারতে ছিলেন। তাঁর ভারত ভ্রমণের যে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন তাই Ta Indica বা ভারত বিবরণ নামে পরিচিত।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, মেগাস্থিনিসের গ্রন্থটি বহু পূর্বেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য লেখকরা ভারত সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন। এই উদ্ধৃতি অংশ সংগৃহীত হয়ে পরবর্তী সময়ে মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ নামে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কখনওই পাওয়া যায় নি।

পাশ্চাত্য লেখকরা কেউই মেগাস্থিনিসের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলে যাননি। যেটুকু জানা যায় তা অতি সামান্য এবং এ পর্যন্ত সেটুকুই প্রচারিত হয়েছে।

বর্তমান খোরাসান এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ নিয়ে সেইকালে গড়ে উঠেছিল আরাকোসিয়া সাম্রাজ্য। সেলুকাস আরাকোসিয়ার শাসনকর্তা সিবিরটায়সের কাছে প্রথমে তাঁর দূত করে পাঠিয়েছিলেন মেগাস্থিনিসকে। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। এরপর ঘটে গেল রাজনৈতিক পালাবদল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিজ অধিকারে নিয়ে আসেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। পরাজিত সেলুকাস মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে আরাকোসিয়া থেকে তাঁর দূত মেগাস্থিনিসকে প্রেরণ করেন মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে।

উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান পন্ডিত সোয়ানবেক জানিয়েছেন মেগাস্থিনিস দীর্ঘকাল ভারতে বসবাস করেছিলেন।

তবে অনেকে মনে করেন, মেগাস্থিনিস দুবার পাটালিপুত্রে এসেছিলেন। যদিও এই মন্তব্যের সপক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ পড়ে তিনি ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন সেবিষয়ে কিছু জানা যায় না। সেলুকাসের নির্দেশ পেয়ে তিনি আরাকোসিয়া থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই পথের বিবরণীতে সিন্ধুনদ থেকে রাজপথে পাটলিপুত্র ও পাটালিপুত্র থেকে গঙ্গার মুখ পর্যন্ত অঞ্চলের অত্যন্ত জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। এরপর

হিমালয় থেকে তাম্রপর্ণী পর্যন্ত যে বিস্তৃত ভূভাগের বিবরণ পাওয়া যায় স্পষ্টতই বোঝা যায় তা তাঁর লোকমুখে শোনা, প্রত্যক্ষ দর্শনের বর্ণনা নয়।

মৈত্রীসূত্রে রাজঅতিথি রূপেই মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে অবস্থান করেছিলেন। সম্ভবতঃ বর্ষাকালেই তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তিনি জানিয়েছেন, ভারতবর্ষে ১১৮ টি জাতির মানুষ বসবাস করে। গুণাগুণ বিচারে তিনি ভারতবাসীদের সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন। এই বিভাগগুলি হল, পন্ডিত ও দার্শনিক, কৃষক, গরু ও মেষপালক, শিল্পী-ইত্যাদি, যোদ্ধা, পর্যবেক্ষক ও মন্ত্রী।

তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের বেশিরভাগ ভূখন্ডই সমভূমি এবং সর্বত্র রয়েছে অগণিত সমৃদ্ধ নগর।

তাঁর এই মন্তব্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মেগাস্থিনিস কেবলমাত্র সমভূমি অঞ্চলেই পরিভ্রমণ করেছিলেন।

তিনি বলেছেন, এখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। ফলে সর্বত্র অপরিমিত ফসল উৎপাদিত হয়। প্রধান ফসল যব ও ধান। বছরে দুবার ফসল তোলা হয়।

শীতকালে যে সব ফসল উৎপাদিত হয় তার মধ্যে প্রধান হল ডাল, গোধূম, তিল ইত্যাদি। কৃষকেরা উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ বা এক ষষ্ঠমাংশ কর হিসাবে রাজভান্ডারে জমা দেয়।

পাটলিপুত্র আসার পথে ভারতের বিপুল অরণ্য সম্পদ, বিচিত্র পশুপাখি দেখে মুগ্ধ হন মেগাস্থিনিস। তাঁর বিবরণে শাল, সেগুন, তাল, বিশাল, বেত ইত্যাদি বৃক্ষের এবং হাতি, বানর, কুকুর, এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণ ও অশ্বের কথা পাওয়া যায়। এছাড়াও বহু পশুপাখি ও মাছের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি।

বঙ্গদেশের বাঘেরও উল্লেখ করেছেন মেগাস্থিনিস। সম্ভবতঃ গঙ্গার উপকূল ধরে তিনি বঙ্গদেশের প্রান্তে এসেছিলেন এবং সেই সময় অরণ্যে বাঘ তাঁর চোখে পড়ে।

ভারতবর্ষের ধাতু সম্পদের সমৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন মেগাস্থিনিস। তিনি লিখেছেন, ভারতবাসীরা খনি থেকে সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু আহরণ করে।

লোহা ও তামা দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হয়। সোনা রূপা দিয়ে অঙ্গাভরণ তৈয়ারী হয়। ভারতের পুরুষ বিশেষ করে মহিলারা অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়।

তিনি আরও লিখেছেন, লোহা টিন ও তামা দিয়ে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরি করা হত।

মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদের সোনা সংগ্রহের যে কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন তা বড় অদ্ভুত। তা থেকে মনে হয় তিনি প্রচলিত লোককথা থেকে এই কাহিনীটি

সংগ্রহ করেছেন, নিজে সোনা সংগ্রহের পদ্ধতিটি প্রত্যক্ষ করেন নি। যা শুনেছিলেন সরলভাবে তাই হুবহু লিপিবদ্ধ করেছেন।

মেগাস্থিনিস লিখেছেন, খনি থেকে সোনা সংগ্রহের কাজটি করে মানুষ নয় বিশালকায় এক জাতীয় পিপীলিকা। এই পিপীলিকাদের আকৃতি শেয়ালের মতো এবং এরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির।

এই পিপীলিকারা খনিমুখে গর্ত করে বাস করে। গর্ত খোঁড়ার সময় এরা যে মাটি স্তূপ করে রাখে এর সঙ্গেই মিশে থাকে সোনা। কৌশলে এই মাটি সংগ্রহ করে সোনা আলাদা করে নিতে হয়।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খনিমুখ থেকে মাটি সংগ্রহ করতে হয়। তা না হলে হিংস্র পিপীলিকাদের আক্রমণে প্রাণ হারাতে হয়।

মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে মেগাস্থিনিস নগরটিকে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিপুত্র নগরের দৈর্ঘ্য ছিল দশ মাইল; প্রস্থ দুই মাইল। কাঠের প্রাচীর দিয়ে সমগ্র নগরটি বেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীরের ওপরে গম্বুজের সংখ্যা ছিল ৫৭২ এবং তোরণ ছিল ৬৪ টি।

নগর বেষ্টনকারী প্রাচীরের গায়ে সারি সারি রন্ধ্র ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটলে এই রন্ধ্রপথে তীর নিক্ষেপ করা হত।

কাষ্ঠ প্রাকার ছাড়াও নগরটিকে সুরক্ষিত করার জন্য পরিখা খনন করা হয়েছিল। সুবিন্যস্ত পয়ঃপ্রণালী পথে নগরের দূষিত জল পরিখায় এসে পড়ত। নগরটি ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত।

ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে মেগাস্থিনিস লিখেছেন, জনগণের প্রধান দুই উপাস্য দেবতা ছিল শিব ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ও শিবের পরিধেয়, বাসস্থান, স্বভাব, ক্ষমতা ও যুদ্ধকৌশল ইত্যাদির সাদৃশ্য দেখে তাঁর মনে হয়েছে তাঁরা একই দেবতা।

ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

ভারতীয় পন্ডিত সমাজকে মেগাস্থিনিস ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন।

মেগাস্থিনিস তাঁর বিবরণে বৌদ্ধ শব্দটি কোথাও ব্যবহার করেন নি। কিন্তু তবুও বৌদ্ধ শ্রমণদের কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর বিবরণে। সেইকালে বৌদ্ধ শ্রমণরাও উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ব্রাহ্মণদের মত ও বিশ্বাসের কথাও উল্লেখ করেছেন মেগাস্থিনিস। ব্রাহ্মণগণ বিশ্বাস করতেন বিশ্বের মূল উপাদান পাঁচটি—ক্ষীতি, অপঃ, তেজ, মরুৎ ও

ব্যোম বা আকাশ। গ্রীকগণ চারটি উপাদনের কথা জানতেন, ব্যোম বা আকাশ যে পঞ্চভূতের একটি তা তাঁরা জানতেন না।

মেগাস্থিনিস জানিয়েছেন, ভারতের পন্ডিতরা মহাকাশ চর্চা করতেন।

ভারতীয়দের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রভূত প্রশংসা করেছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, ভারতীয়রা মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করত না। ব্যক্তিমানুষের গুণকীর্তনকেই তাঁরা স্মৃতি রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় বলে বিশ্বাস করত।

ভারতবাসীদের জীবন ছিল সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। আড়ম্বর বা অতি আহার তাঁরা পছন্দ করত না। দেশে চুরি, ডাকাতি প্রায় ছিলই না। সাধারণ অবস্থায় কেউ মদ্যপান করত না। যজ্ঞাদির সময়েই কেবল মদ্যপান করা হত। সহজ সরল জীবনেই ভারতবাসীরা অভ্যস্থ ও সুখী ছিল।

ভারতীয়দের সৌন্দর্যপ্রিয়তার কথা মেগাস্থিনিস তাঁর বিবরণীতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। নিজেদেরও তাঁরা সুন্দরভাবে সজ্জিত রাখত। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা অলঙ্কার ইত্যাদি ব্যবহার করত।

সত্য ও ধর্মকে ভারতবাসী সকলের ওপরে স্থান দিত। তাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের শিবিরেও বাস করেছেন। বলেছেন, সেখানে চার লক্ষ লোক অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে বাস করত। তাদের শৃঙ্খলাপরায়ণতা তাঁকে বিস্মিত করেছিল।

রাজার রাজ্যশাসন প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। ভোগ বিলাসের জন্য রাজা রাজ্যশাসন করতেন না। তাঁর জীবনও ছিল আড়ম্বরহীন ও বাহুল্যবর্জিত। প্রজাপালন রাজার আদর্শ ছিল।

মেগাস্থিনিস জানিয়েছেন, লিখন পদ্ধতি ভারতবাসীদের জানা ছিল না। স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই তারা যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করত।

তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রত্যেক ভারতবাসীই ছিল স্বাধীন। তারা কাউকে ক্রীতদাস করে রাখত না। অতিথিবৎসল ভারতীয়রা পরদেশীদের সম্মান ও মর্যাদা দিত।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারত সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছিলেন, তাই মেগাস্থিনিস তাঁর বিবরণে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, পথঘাট, বন্যজন্তু, প্রাচীন ইতিহাস, দেবদেবী প্রভৃতি সবকিছু তাঁর ভারত বিবরণ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অনেক বিষয়ে প্রচলিত গল্পকথাকে তিনি সরলভাবে বিশ্বাস

করেছেন ও সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিবহির্ভূত অবিশ্বাস্য কাহিনীর অবতারণা ঘটেছে।

ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এমনই উচ্চ ছিল যে, তিনি মনে করেছিলেন, এখানে সবকিছুই সম্ভব।

এছাড়া ভাষার ব্যবধানের একটা বাধা তো ছিলই। সব বিষয়ই যে তিনি যথাযথ বুঝতে পেরেছিলেন তা নয়, যেমন বুঝতে পেরেছেন, সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

ভারতের কয়েকটি জাতির কথা বলতে গিয়ে মেগাস্থিনিস বলেছেন, কোন কোন জাতির মুখ নেই, কোনটির নাক নেই, কোনটির পা মাকড়সার মতো লিকলিকে। আবার কোন জাতির লোকদের কান এমন বিশাল আকৃতির তাতে স্বচ্ছন্দে শোওয়া চলে।

ভারতের আরো এক জাতির মানুষের কথা তিনি বলেছেন যাদের পায়ের আঙুল পেছন দিকে। এমন বহু উদ্ভট বিবরণ তাঁর লেখায় পাওয়া যায়।

সন্দেহ নেই যে এসব বিবরণ তাঁর সংগ্রহ করা। তিনি যেমন শুনেছেন, বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাই লিপিবদ্ধ করেছেন।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মেগাস্থিনিস যখন ভারতে এসেছিলেন, আর্যদের সঙ্গে বিভিন্ন বর্বর জাতির সংঘর্ষ তখনো শেষ হয় নি। আর্যরা এইসব অসভ্য জাতি সম্বন্ধে নানা অবিশ্বাস্য কাহিনী গড়ে তুলেছিল। সেই সব কাহিনী শুনে মেগাস্থিনিস বিশ্বাস করেছিলেন।

কেবল মেগাস্থিনিসই নন, আলেকজান্ডারের সঙ্গে যাঁরা ভারত অভিযানে এসেছিলেন, তাঁরাও এই সব অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে বিশ্বাস করেছিলেন।

এত সত্ত্বেও, একথা মানতেই হবে যে মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য কিছু কম নয়। তাঁর এই বিবরণ থেকে অতীত ভারতের এক বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায়।

একটি বিশেষ সময়ের চিত্র তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সময়ের ভারতকে জানার মতো দ্বিতীয় কোন উপাদান নেই।

মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমণের আর একটি ঐতিহাসিক দিক হল, তাঁর মাধ্যমেই দুই প্রাচীন সভ্য দেশ ভারত ও গ্রীক সংস্কৃতির মিলন সম্ভব হয়েছিল। এই কারণে এই গ্রীক পরিব্রাজকের ব্যক্তি পরিচয় অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও তাঁর লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতাই তাঁকে আমাদের মধ্যে স্মরণীয় করে রেখেছে।

বিক্রমাদিত্য

বিক্রমে যিনি আদিত্য বা সূর্যতুল্য তিনিই বিক্রমাদিত্য। এই বিক্রমাদিত্য ভারত ইতিহাসের এক বর্ণময় পুরুষ। তাঁকে ঘিরে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। তাই থেকে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে রাজা বিক্রমাদিত্য এবং কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য কি একই ব্যক্তি?

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, বিক্রমাদিত্য নামে এক প্রতাপশালী রাজা খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন। তিনি শক হানাদারদের পরাজিত করে শকারি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বিক্রম সংবত তিনিই প্রচলিত করেছিলেন।

শকারি বিক্রমাদিত্য ছিলেন সুঙ্গ বংশীয় রাজা। মহাকবি কালিদাস তাঁরই নবরত্ন সভা অলঙ্কৃত করতেন। এই ঐতিহাসিক বিক্রমাদিত্য কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য।

কিন্তু মুশকিল হল, সুঙ্গবংশীয় কোন রাজা যে বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এমন কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। অথবা কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য সুঙ্গবংশজাত ছিলেন এমন প্রমাণেরও অভাব।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, গুপ্তবংশের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন কালিদাস। কালিদাসের রচনাবলীতে সেই প্রমাণ রয়েছে। কালক্রমে নানা কাহিনীকারের প্রলেপে তিনিই হয়ে উঠেছেন কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য।

কালিদাসের রচনাবলী থেকে জানা যায় গুপ্তরাজাদের সময়ে অনেক পৌরাণিক সংস্কার সাধিত হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধ মতবাদ প্রচলিত হলে নানা দেবদেবীর সৃষ্টি ও প্রচলন হয়। কালিদাসের রচনাবলীতেও বহু দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি গঙ্গা-যমুনার মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন। এই দুই নদী-দেবীকে দেবতাদের চামরধারিণীরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

এই ধরনের রূপকল্পনা কুশানযুগের শেষে এবং গুপ্ত যুগে হতে দেখা যায়। এছাড়া গুপ্তযুগের শিলালিপিতে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেই ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে কালিদাসের রচনাবলীর ভাষার সঙ্গে।

এই সব প্রমাণ থেকে ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য, যাঁর সভাকবি ছিলেন কালিদাস, তিনি নিশ্চিত ভাবেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ছিল ৩৮০ খ্রিঃ থেকে ৪১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত। তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পিতা সমুদ্রগুপ্ত ভারতে সর্বপ্রথম সার্বভৌম শক্তির প্রবর্তন করেন। তাঁর সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ছিল কিংবদন্তী তুল্য। সেই বিচারে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের মধ্যে তিনি অন্যতম বলে গণ্য হন।

বস্তুতঃ বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ না করলেও তাঁর প্রতাপ বা বিক্রম ছিল অবিসংবাদিত। পরোক্ষভাবে তাঁর সময় থেকেই কিংবদন্তীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি জয় করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধনীতি বদল করেছিলেন। সেখানকার রাজাদের আনুগত্য নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। সিংহলরাজ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এবং পেশোয়ার পর্যন্ত তাঁর প্রতি রাজআনুগত্য বিস্তৃত ছিল।

হিমালয় নর্মদা এবং যমুনা থেকে ব্রহ্মপুত্র সমুদ্রগুপ্তর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট, সুদক্ষ শাসক, সর্ব বিষয়েই উদার নীতি অবলম্বন করতেন তিনি। কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ রূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অন্য এক ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্তর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামগুপ্ত সম্রাট হন। শক রাজার কাছে আকস্মিক পরাজয়ের পরে সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজনে তিনি তাঁর রূপসী রানী ধ্রুবদেবীকে শকরাজার হাতে তুলে দেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই অসম্মানজনক আচরণে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি রামগুপ্তকে হত্যা করে সিংহাসনের অধিকার ছিনিয়ে নেন এবং শকরাজার কবল থেকে ধ্রুবদেবীকে উদ্ধার করে নিজে বিবাহ করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে সিংহাসন অধিকার করার পরেই বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিকই একমত হয়েছেন।

গুপ্তরাজাদের রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বৈবাহিক নীতি এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই বিবাহনীতি অনুসরণ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য আরব সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

তিনি মধ্যভারতের নাগবংশের রাজকন্যা কুবেরনাগকে বিবাহ করেছিলেন।

নিজ কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ দিয়েছিলেন বকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে।

এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কিছুকাল পরেই তিনি শক ক্ষত্রপ সৌরাষ্ট্রের তৃতীয় রুদ্রসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই অভিযানে জামাতা রুদ্রসেন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

শকরাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চিতভাবে শত্রু দমন করলেন। তিনি গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয় করার ফলে তাঁর সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত জলপথে পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেন। ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

শকবংশ উচ্ছেদ করার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকারি উপাধি গ্রহণ করেন এবং বিশাল সাম্রাজ্য নিজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রাখার সুবিধার জন্য উজ্জয়িনীতে স্থাপন করেন দ্বিতীয় রাজধানী।

ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির মূলে ছিল গুপ্ত রাজাদের অনুসৃত বৈবাহিক নীতি।

গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঘটোৎকচের পুত্র ১ম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন বৈশালীর লিচ্ছবি বংশের কন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে।

লিচ্ছবিরা ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী। তাঁদের সাহায্য নিয়েই ১ম চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন এবং পরে প্রতিষ্ঠা করেন গুপ্ত বংশের। সেই থেকেই শুরু হয় গুপ্ত বংশের জয়যাত্রা।

লিচ্ছবি বংশের প্রতি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এতটাই কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলেন যে তাঁর মুদ্রায় নিজের প্রতিকৃতির সঙ্গে কুমারদেবীর প্রতিকৃতিও উৎকীর্ণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়।

সেইকালে এভাবে শ্বশুরকুলকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য কোন প্রাচীন নরপতি মুদ্রার প্রচলন করেন নি।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তর পর থেকে অনুরূপ বৈবাহিক রীতি গুপ্তবংশের সকল নৃপতিই কমবেশি অনুসরণ করেছেন।

সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই রীতি অনুসরণ করে বরাবরই নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করতে পেরেছেন।

ঐতিহাসিকগণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন অসাধারণ বীর ও রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারী। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের ক্ষেত্রে

তাঁর দৃষ্টি সর্বদাই ছিল সজাগ ও তৎপর। বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করার সবরকম যোগ্যতাই তাঁর ছিল। তাঁর সুশাসনে গুপ্তসাম্রাজ্য চরম সমৃদ্ধি ও গৌরব লাভ করেছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালেই বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে সুশাসক, প্রজানুরঞ্জক, সমস্ত ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিদ্যোৎসাহী নরপতি বলে বর্ণনা করেছেন।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের চরিত্রে বিবিধ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতের অদ্বিতীয় বীর। বীরত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিভার সঙ্গে তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীতবিদ্যারও স্ফুরণ ঘটেছিল। তাঁর বীণাবাদনরত ছবি-যুক্ত মুদ্রা পাওয়া গেছে।

সমুদ্রগুপ্তের পঞ্চাশ বছরের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় হয়েছিল। দীর্ঘ সময় যুদ্ধবিগ্রহে ব্যয়িত হলেও তিনি সম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উত্তরধিকার সূত্রেই পিতার গুণাবলীর অধিকারী হয়েছিলেন। স্বীয় বাহুবলে তিনি পৈতৃক রাজ্যের স্থিতি স্থায়ী করেছিলেন। তবে পিতার মতো তাঁকে যুদ্ধবিগ্রহে কালক্ষেপ করতে হয় নি বলে তাঁর রাজত্বে একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তাকে কেন্দ্র করে নানা কিংবদন্তীর উদ্ভব হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী উজ্জয়িনী এ সকল গল্প-কথার উপকরণের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছিল। বস্তুতঃ কিংবদন্তীর গল্প-কথায় বিক্রমাদিত্য ও উজ্জয়িনী প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন মুদ্রাগুলোতেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে নানা ভূমিকায় প্রতিফলিত করা হয়েছে। অশ্বারোহী, শিকারী, বীণবাদনরত কিংবা সিংহদলনকারী রূপে তাঁকে প্রাচীন মুদ্রায় চিত্রিত করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য এই সব চিত্র থেকেই তাঁর নামে প্রচলিত কিংবদন্তীগুলির উপকরণসংগৃহীত হয়েছে।

উজ্জয়িনী এবং বিক্রমাদিত্যকে উপলক্ষ্য করে রচিত হয়েছে বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশ সিংহাসনের আশ্চর্য কাহিনীগুলো।

জনশ্রুতি এই রকম যে, এই কাহিনীমালা রচনা করেছিলেন মহাকবি কালিদাস। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছবার মতো প্রামাণ্য তথ্য এখনো পাওয়া যায় নি। তবে অনুমান হয়, কালিদাস নিজে না লিখলেও প্রাচীন কাহিনীগুলো সংকলন ও সংস্কার করে থাকবেন।

গুপ্তরাজাদের আমলেই ভারতবর্ষ চূড়ান্ত গৌরবের অধিকারী হয়েছিল। সেইকারণে গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। বিশেষ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের লালন ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁর রাজত্বকালে, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি ক্ষেত্রের চরম উৎকর্ষ ঘটেছিল। গুপ্তযুগেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান সম্ভব হয়েছিল।

গুপ্তরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালে পর্বতগাত্রে অজন্তা ইলোরায় হিন্দুপুরাণ ও বৌদ্ধজাতক কাহিনী অবলম্বন করে জগৎবিখ্যাত চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়। হিন্দুপুরাণগুলিরও সংস্কার সাধিত হয়। এভাবেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য কিংবদন্তীর নায়কেব রূপ পরিগ্রহ করতে থাকেন।

বৌদ্ধধর্মে মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও বহুসংখ্যক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হতে থাকে। হিন্দুধর্মের নানা ক্ষেত্রে উন্মাদনা সৃষ্টির প্রেরণার মূলে ছিল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জীবন ও কীর্তিকলাপ। এই আবহ থেকে এবং সমুদ্র গুপ্তের জীবন ও কীর্তিকাহিনী থেকে উপকরণ সংগৃহীত হয়ে সৃষ্টি হল কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য চরিত্র। সমস্ত উপকাহিনীরই নায়ক উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য। এ থেকে অনুমান হয়, উপগল্পগুলো বৌদ্ধজাতকের প্রভাবেও প্রভাবিত ছিল।

জাতক কাহিনীতে বুদ্ধদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছিল। আর গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটলে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য ও মর্মকথা প্রচারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কেননা তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী, বীর এবং জনপ্রিয়।

বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশ পুতুলের গল্পগুলোতে যে বিক্রমাদিত্যকে পাওয়া যায় তিনি হলেন বীর, সাহসী, বুদ্ধিমান এবং কর্মকুশল। দেবদ্বিজে ভক্তি তাঁর অচলা। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি বেতালসিদ্ধ হয়েছেন। শৌর্য, বীর্য, দান ও ত্যাগে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর চরিত্র অতিমানবীয় গুণাবলীতে মন্ডিত। ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণের কথা স্মরণ করে নিজেকে তাঁর সিংহাসনে বসার উপযুক্ত মনে করেন নি।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়েই হিন্দুধর্ম চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সেই সূত্রেই তাঁর কীর্তিবহুল জীবনের সঙ্গে অলৌকিকত্বের মিশেল ঘটেছে।

কিংবদন্তীতে আরো বলা হয়েছে, বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্ন বিরাজ করতেন। এই নবরত্ন হলেন, মহাকবি কালিদাস, বররুচি, অমরসিংহ, ধন্বন্তরি, বরাহমিহির, বেতালভট্ট, শঙ্কু, ক্ষপণক ও ঘটখর্পর।

নবরত্নের সকলেই যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় ছিলেন তেমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্য, তাঁরা

সকলেই গুপ্তযুগের কোন না কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। কিংবদন্তী এঁদের সকলকে বিক্রমাদিত্যের বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতা সম্পাদনের জন্য তাঁর রাজসভার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে একত্রিত করেছে। এবং এই কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য চরিত্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুধর্মের নীতি-মাহাত্ম্য।

ডেভিড লিভিংস্টোন

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক যিনি প্রথম পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি হলেন মহান মানবতাবাদী অভিযাত্রী ডেভিড লিভিংস্টোন।

আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সুগভীর অরণ্যের রাজত্ব। আদিম অসভ্য জাতির বসবাস সেখানে। সভ্য মানুষেরা ক্বচিৎ সেখানে যেত শিকারের সন্ধানে। কখনো বা কোন অভিযাত্রী উপস্থিত হতেন নতুন দেশ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে।

সভ্যতার আলোক বর্জিত আদিম বর্বর জাতি অধ্যুষিত এই অরণ্যরাজ্যে লিভিংস্টোন উপস্থিত হয়েছিলেন ভালবাসা আর আত্মোৎসর্গের অনুপ্রেরণা নিয়ে। অন্ধকারের মানুষদের তিনি দিয়েছিলেন আন্তরিক সেবা-সাহচর্যের সঙ্গে সভ্যতার আলোর সন্ধান।

১৮১৩ খ্রিঃ ১৯শে মার্চ গ্লাসগোর ব্লানটায়ারে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মে-ছিলেন লিভিংস্টোন। তাঁর পিতার ছিল খুচরো চায়ের ব্যবসা।

ব্যবসার পাশাপাশি মিশনারির কাজও করতেন তিনি। ধর্মে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ ও বিশ্বাস।

লিভিংস্টোন বাল্যবয়সেই ঈশ্বর বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন ধর্মপ্রাণ পিতার কাছ থেকে। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিশে ছিল বিজ্ঞান চেতনা।

সাংসারিক প্রয়োজনে মাত্র দশ বছর বয়সেই একটা সুতো কারখানায় কাজ নিতে হয়েছিল ডেভিডকে। কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে হত তাঁকে। কিন্তু পড়াশুনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল এমনই গভীর যে, দৈনিক ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রমের ফাঁকেই নানা বিষয়ের বই পড়তেন।

ডেভিডের সব চেয়ে প্রিয় ছিল ভ্রমণ-কাহিনী। সেসব কাহিনীর মধ্য দিয়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়াত তাঁর মন।

এই সময় এক জার্মান মিশনারীর লেখা একটি বই পড়ে মিশনারী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি এবং সঙ্কল্প করেন মিশনারী জীবনই গ্রহণ করবেন।

যাইহোক, এক ভাই ও বাবার উৎসাহে ২৩ বছর বয়সে ডেভিড গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখানে তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও গ্রীক ভাষা সাহিত্য।

এক বছর পরে তিনি লন্ডনের মিশনারী সোসাইটিতে শিক্ষানবিসি শুরু করেন। কিন্তু ধর্মপ্রচারকের কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। কিছুদিনের মধ্যেই মিশনারী সোসাইটি ছেড়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখার কাজে ভর্তি হলেন।

লন্ডনের বিভিন্ন হাসপাতালে দুবছর শিক্ষানবিসি করার পর তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর চিকিৎসকের চাকরি নিয়ে ১৮৪০ খ্রিঃ শেষদিকে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার পথে যাত্রা করলেন।

দীর্ঘ এই সমুদ্রযাত্রা ডেভিডের ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কাপ্তেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠায় তাঁর কাছ থেকে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করার বিদ্যা তিনি রপ্ত করেছিলেন।

জলপথের যাত্রা শেষ হল দক্ষিণ আফ্রিকার আলগোয়ায়। সেখান থেকে তাঁর কর্মস্থলের দূরত্ব ছিল প্রায় ৭০০ মাইল। তাঁকে যেতে হবে কুরুমান। সেখানেই মিশনারী সংস্থার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

এই দীর্ঘ পথ ছিল বন্ধুর ও জঙ্গলাকীর্ণ। কখনো হেঁটে, কখনো বলদের পিঠে চেপে দুর্গম পথ বহুকষ্টে পাড়ি দিলেন তিনি। পৌঁছালেন কুরুমান এবং এখান থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকার মাটিতে শুরু হল তাঁর কর্মজীবন।

আদিম অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই সময়ে কাজ করতে হতো ডেভিডকে। সঙ্গের লোকজন ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন দূর দূর অঞ্চলে। অরণ্যবাসী মানুষের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে চলত ধর্মের শিক্ষা—ধর্মান্তরকরণ। যেমন পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল এই কাজ, তেমনি ছিল বিপদসঙ্কুল।

শিক্ষার আলো তখনো পৌঁছায়নি এমনি সব অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হতো তাঁকে। কয়েকমাস ধরে চলত তাঁর পরিক্রমা। তারপর ফিরে আসতেন আবার কুরুমানে।

নতুন কিছু জানা বা দেখার প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর সহজাত। তাই কর্মসূত্রে যখনই যেখানে তিনি যেতেন, সেখনকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভূ-প্রকৃতি, জীবজন্তু-গাছপালা প্রভৃতি বিষয় গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ ডায়েরির পাতায় লিপিবদ্ধ করতেন।

কুরুমান মিশনারী সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ডঃ রবার্ট। তাঁর একমাত্র

মেয়ে মেরিও ছিলেন দলের সঙ্গে। সেই নির্বান্ধব জগতে মেরিকে ভালবেসে বিয়ে করলেন ডেভিড।

তারপর সংস্থার কাজে ইস্তফা দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে তিন চলে এলেন কুরুমান থেকে ২০০ কি.মি. দূরে মাবেস্তা নামক স্থানে। এখানে নিজেদের চেষ্টায় গাছের গুঁড়ি দিয়ে জঙ্গলের প্রান্তে একটা বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে লাগলেন। সভ্য সমাজের দুটি মানুষের পক্ষে আফ্রিকার আদিম অরণ্যে বসবাস যে মোটেই সুখপ্রদ এবং নিরাপদ ছিল না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রতিকূল কোন পরিস্থিতিই এই দম্পতিকে হতোদ্যম করতে পারেনি।

অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীর অনাড়ম্বর কঠোর জীবনের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়ে নিলেন মেরি এবং হয়ে উঠলেন লিভিংস্টোনের উপযুক্ত সহধর্মিণী।

বিপদসঙ্কুল পরিবেশ। তার মধ্যে স্ত্রীকে রেখে ছোট ছোট অভিযানে বেরুতে হয় লিভিংস্টোনকে। সঙ্গে লোকজন থাকলেও তিনি দলের পরিচালক।

একদিন এমনি এক অভিযান থেকে বাড়ি ফিরছেন তিনি। সঙ্গীসাথীদের পেছনে রেখে তিনি এগিয়ে চলেছেন। সহসা জঙ্গল থেকে সামনে বেরিয়ে এলো এক সিংহ। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলে গুলি করলেন তিনি।

গুলির আঘাতে সামান্য আহত হল সিংহ। কিন্তু সে না পালিয়ে প্রচন্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল লিভিংস্টোনের ওপরে।

ক্ষিপ্রগতিতে একপাশে সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন তিনি। কিন্তু সিংহের থাবার আঘাতে বাঁ হাতের খানিকটা মাংস ঝুলে পড়ল।

ততক্ষণে পেছনের লোকজন এসে পড়ায় ভয়ে পালিয়ে গেল সিংহ। তখন সকলে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে এলো লিভিংস্টোনকে। কয়েকমাসের সেবাশুশ্রূষায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে বটে বাঁ হাতটি কমজোরি হয়ে গেল চিরদিনের মতো।

মিশনারীর কাজকর্ম এমনই যে বেশি দিন এক জায়গায় বসবাস করা সম্ভব হত না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই মাবেস্তা ত্যাগ করে পশ্চিমে এগিয়ে লিভিংস্টোন এসে আস্তানা নিলেন বোবেঙ্গ নদীর তীরে।

এখানকার অধিবাসীদের চাষবাসই ছিল একমাত্র জীবিকা। তিনি তাদের শেখালেন উন্নত কৃষিপ্রণালী। জল সেচের বিভিন্ন উপায়। এই নতুন পদ্ধতির সুফল পেয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা উৎসাহিত হল।

এই সময়ে ১৮৪৯ খ্রিঃ উত্তরের অনাবিষ্কৃত অঞ্চল খুঁজে বার করার জন্য দুজন ইংরাজ অভিযাত্রীর সঙ্গে লিভিংস্টোন নাগানি নামে হ্রদের সন্ধানে বেরলেন।

কয়েকদিন পথ চলার পর তাঁরা পৌঁছলেন কালাহারি মরুভূমির প্রান্তে। ইতিপূর্বে কোন ইউরোপীয়ই এই ঊষর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি।

পথের সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে লিভিংস্টোন সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে চললেন জনমানবহীন শুষ্ক মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে।

অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত তাঁরা এসে পৌঁছলেন নাগানি হ্রদে। লিভিংস্টোনের প্রথম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার এই হ্রদ।

পরের বছরই স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আবার আফ্রিকার অজানা অঞ্চলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু জঙ্গলের বিষাক্ত মাছির দংশনে ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ায় অভিযান পরিত্যাগ করে বাড়ি ফিরে আসতে হল তাঁকে।

জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যকীয় ওষুধপত্র কিছুই সঙ্গে ছিল না। তার ওপরে ছিল পথকষ্ট। এদিকে ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদেরও শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার।

এমনি নানা সমস্যা বিবেচনা করে তিনি সকলকে নিয়ে চলে এলেন কেপটাউনে। তারপর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জাহাজে করে লন্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

এই সময়ে কেপটাউনে বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার ম্যাকলার-এর সঙ্গে লিভিংস্টোনের আলাপ হয়। ফলে তাঁর কাছ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেলেন তিনি। পরবর্তী জীবনে লিভিংস্টোন এই শিক্ষার সন্তোষজনক ফল লাভ করেছিলেন।

কেপটাউনের কাজ মিটে গেলে আবার কোবেঙ্গের বাড়িতে ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু সেখানে তখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

তিনি দেখলেন কোবেঙ্গের সমস্ত গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, নষ্ট হয়েছে ক্ষেতের ফসল।

সম্প্রদায়গত বিবাদের ফলে বুয়র সম্প্রদায়ের লোকদের আক্রমণে ঘটেছিল এই সর্বনাশা ঘটনা। লিভিংস্টোনের বাড়িটিও অক্ষত ছিল না। মূল্যবান বইপত্র ও প্রয়োজনীয় ওষুধ ইত্যাদি বাড়িতে যা ছিল, লুঠেরারা সবই নষ্ট করে রেখে গিয়েছিল।

বিধ্বস্ত গ্রামটির সর্বস্বান্ত মানুষগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে লিভিংস্টোন তাদের মনে আশার সঞ্চার করবার ত্রুটি করলেন না।

অসীম মনোবল নিয়ে সকলের সহযোগিতায় কয়েক মাসের চেষ্টায় আবার নতুন করে গড়ে তুললেন গ্রাম।

জাম্বেসির পথে প্রথমবারের অভিযান ব্যর্থ হলেও উদ্যম হারাননি লিভিংস্টোন। ১৮৫২ খ্রিঃ তিনি আবার অভিযানে বেরুলেন এবং কষ্টকর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জাম্বেসির উত্তর প্রান্তে পৌঁছলেন।

এখানকার আদিম অরণ্যের পরিবেশ ছিল অতি ভয়ানক। আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় বিশেষ জনবসতি গড়ে ওঠে নি। এখানে একটা নতুন মিশন স্থাপনের ইচ্ছা থাকলেও তা আর হয়ে উঠল না।

এরপরে লিভিংস্টোন নতুন অভিযান করলেন ১৮৫৩ খ্রিঃ ১১ই নভেম্বর। এবারে তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল পশ্চিমের সমুদ্র উপকূলে পৌঁছবার সহজতম পথ খুঁজে বার করা।

২৭ জন আদিবাসী সঙ্গী নিয়ে চলতে চলতে তাঁরা এসে পৌঁছলেন দুর্ধর্ষ এক বন্য উপজাতির এলাকায়। তাদের প্রকৃতি এমনই হিংস্র যে অতি তুচ্ছ কারণেই মানুষ খুন করে।

আদিবাসীরা লিভিংস্টোনের দলকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। এ যাত্রায় দলের সব কটি মানুষকেই মরতে হত। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ লিভিংস্টোনের দলভুক্ত আদিবাসী সর্দারটি, যে ছিল তাঁদের প্রধান পথপ্রদর্শক, তাঁর সাহস ও বুদ্ধিবলে রক্ষা পেলেন লিভিংস্টোন।

পশ্চিম উপকূল অনুসন্ধানের অভিযানে বেরিয়ে এমনি নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি, বন্ধুর দুর্গম পথের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তবু তাঁর গতি কখনো রুদ্ধ হয়নি।

পথ চলতে চলতে কতবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছেন, আবার নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করেছেন।

লিভিংস্টোনের গন্তব্যস্থান ছিল অনিশ্চিত। তার ওপর অসহনীয় পথশ্রম। লিভিংস্টোনের আদিবাসী অনুচরেরা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। কিছু লোক সরাসরি বিদ্রোহ প্রকাশ করে বসল—তারা আর অগ্রসর হতে রাজি নয়।

অসুস্থ শরীর নিয়েই পিস্তল হাতে তাদের রুখে দাঁড়ালেন লিভিংস্টোন। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যারা তার আদেশ অমান্য করবে তাদের তিনি রেহাই দেবেন না। দলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দরকার হলে জীবন দেবেন। তিনি দলের পরিচালক, তাঁর আদেশ মেনেই চলতে হবে সকলকে।

এমনি নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে একসময় তিনি এসে পৌঁছলেন আঙ্গোলায়।

সেখানে পর্তুগীজ সেনাবাহিনীর ছাউনি থেকে পথনির্দেশ পেয়ে ১৮৫৪ খ্রিঃ ৩১শে মে তিনি উপস্থিত হলেন সমুদ্রতীরের সাও পাওলো দ্য লুয়াণ্ডায়। এইভাবেই তিনি সমুদ্র উপকূলে পৌঁছবার সহজতম পথ খুঁজে পেলেন।

ইতিমধ্যে এসে পৌঁছল ইংলণ্ডে ফিরে যাবার আহ্বান। দলের সদস্যরাও

দেশে ফেরার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। তাই সকলকে নিয়ে যেই পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে চললেন।

কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বলদের পিঠে চেপে শেষ পর্যন্ত তিনি সদলবলে এসে পৌঁছলেন লিয়ান্টিতে।

স্থানীয় মানুষজন বীরের সম্মান জানিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল, উৎসবের আয়োজন হল তাঁর সম্মানে।

কিন্তু বেশিদিন ঘরে থাকতে পারলেন না তিনি। আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে। এবারে আবিষ্কার করলেন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত ভিক্টোরিয়া।

এই সময়ে তিনি এমন এক অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিলেন যে মৃত্যু ছিল পদে পদে। নরমাংসভুক উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলে প্রাণ রক্ষার জন্য দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতে হত জঙ্গলে। খাদ্য ছিল গাছের শেকড়, বুনো ফল আর মধু।

একবার তো মরতে মরতে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন। এক জলার মধ্যে গভীর পাঁকে আটকে গিয়ে ক্রমেই তলিয়ে যেতে লাগলেন। চিরদিনের মতোই পাঁকের তলায় সমাধি লাভ করতেন লিভিংস্টোন যদি না ভাগ্যক্রমে এক সঙ্গী তাঁকে উদ্ধার করত।

অজানা পথের ডাকে ঘুরে বেড়ালেও স্ত্রী পুত্র ও স্বদেশের টান অনুভব করতেন তিনি। তাই দীর্ঘ পাঁচ বছর আফ্রিকার আদিম অরণ্যে অতিবাহিত করে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন।

অজানা মহাদেশ আফ্রিকাকে আবিষ্কার করেছেন লিভিংস্টোন। তাই সমগ্র দেশ তাঁকে জানাল বীরের সংবর্ধনা।

রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটি তাঁকে সম্মান জানাল ভিক্টোরিয়া পদক দিয়ে। সাম্মানিক ডিগ্রি প্রদান করল অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।

আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে লিভিংস্টোন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গঠিত হল অভিযাত্রী মিশন।

লিভিংস্টোনকে এই মিশনের প্রধান নিযুক্ত করা হল। স্থির হল, পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকায় অভিযান চালানো হবে।

লন্ডন মিশনারী সোসাইটির সদস্য হিসেবে এতদিন কাজ করেছিলেন লিভিংস্টোন। এবারে সোসাইটি থেকে বিদায় নিয়ে মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

এরপর আবার নিজের কর্মক্ষেত্র আফ্রিকায় ফিরে এলেন তিনি। ভাই জনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন করে যাত্রা করলেন জাম্বেসি অভিযানে।

কিন্তু এবার ভাগ্য ছিল বিরূপ। তাই মাঝ পথেই এই অভিযান পরিত্যক্ত

হল। লন্ডন থেকে খবর এলো তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মেরির মৃত্যু হয়েছে। স্ত্রীকে অন্তর থেকে ভালবাসতেন তিনি। তাই তাঁর মৃত্যুতে বিচ্ছেদ বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। সাময়িকভাবে গৃহবন্দি রইলেন কিছুদিন।

কিন্তু অভিযান থেকে সরে দাঁড়ান নি। নতুন উদ্যমে এগিয়ে গিয়ে পর পর আবিষ্কার করলেন দুটি হ্রদ—নিয়ামা ও বাঙ্গোয়েন। ইউরোপীয়রা এই হ্রদগুলোর সন্ধান জানত না।

এবারে ফেরার পালা। নিয়ামা হ্রদের তীরে বসে তৈরি করলেন ছোট একটি ডিঙি। সেটি নিয়েই ভাসলেন সমুদ্রে। উত্তাল সমুদ্রপথে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রী পাড়ি দিলেন ২৫০০ মাইল পথ।

আফ্রিকার সমুদ্র উপকূল থেকে এসে পৌঁছলেন ইংরাজের বৃহত্তম উপনিবেশ ভারতবর্ষে।

দেশটি ঘুরে দেখার ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই লণ্ডনগামী জাহাজ ধরে লিভিংস্টোন ইংলণ্ড ফিরে গেলেন। সময়টা ১৮৬৪ খ্রিঃ।

ইংলন্ড তাঁর জন্মভূমি। তবুও সেখানে বেশি দিন তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব হল না। তাঁর কর্মভূমি আফ্রিকার আদিম অরণ্য তাঁকে হাতছানি দিচ্ছিল।

জাম্বেসি অভিযানের কাহিনী লেখায় হাত দিয়েছিলেন। লেখা শেষ করে বই প্রকাশের ব্যবস্থা করে আবার ফিরে গেলেন আফ্রিকায়। এবারে লক্ষ নীলনদের উৎসস্থলে পৌঁছনো।

কিছু সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন লিভিংস্টোন। কিন্তু শুরু থেকেই বিঘ্ন উপস্থিত হতে লাগল। পথের কষ্ট সইতে না পেরে কিছু লোক আগেভাগেই পালিয়ে গেল। তারা গিয়ে রটিয়ে দিল, লিভিংস্টোনকে হত্যা করা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হল। রটনা মিথ্যা প্রমাণ হতে বিলম্ব হল না। সকলে চিন্তামুক্ত হল।

লিভিংস্টোন চলেছিলেন উত্তরের পথ ধরে। একসময় এসে পৌঁছালেন বিশাল এক হ্রদের ধারে। হাজার হাজার মাইল জুড়ে শুধু জল আর জল। এটাই ট্যাঙ্গানিকা হ্রদ।

হ্রদের তীরে দিন কতক বিশ্রাম নিলেন। কিন্তু শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। চলতে কষ্ট হচ্ছিল। সবকিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললেন। এই পথে অপরিসীম ধকল সইতে হল। খাওয়ার কষ্ট ছিল প্রধান। তবুও থামেন নি। ক্রমে একেবারেই চলার শক্তি হারিয়ে ফেললেন। এই সময় একদল আরব সেবাযত্ন করে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিল।

আরবরা সেই সময় নিগ্রোদের ধরে নিয়ে ইউরোপের দাস ব্যবসায়ীদের

কাছে বিক্রি করে দিত। এই ঘৃণিত ব্যবসা অত্যন্ত অমানবিক মনে করতেন লিভিংস্টোন। তিনি খুব বেদনা বোধ করতেন এজন্য। যেমন করেই হোক এই পাশবিক ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা করবেন স্থির করেন।

নীলনদের উৎসস্থলে না পৌঁছনো পর্যন্ত তাঁর চলার বিরাম নেই। খুঁড়িয়ে পথ চলছেন। জ্বরে আমাশয়ে ভুগছেন। ক্রমে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল সঙ্গীরা। একদিন এক নিগ্রো ছেলে তাঁর সমস্ত ওষুধপত্র নিয়ে পালিয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত শরীরও বিদ্রোহ করল। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন লিভিংস্টোন।

এই দুঃসময়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো উপস্থিত হলেন এক ইংরাজ অভিযাত্রী। তিনি হলেন মিঃ এইচ. এম. স্টেনলি।

লিভিংস্টোনের সন্ধান নেবার জন্য স্টেনলিকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি তাঁকে আবিষ্কার করলেন আরবদের তাঁবুতে।

বিধ্বস্ত শীর্ণ চেহারা। মুখ ঢাকা দাড়িতে। গায়ের পোশাক জীর্ণ, ছেঁড়া। দুজনের পরিচয় হতে লিভিংস্টোন যেন দেহে নতুন প্রাণ পেলেন।

দুজনে এক তাঁবুতে কাটালেন দিন কতক। সেবা-শুশ্রূষায় অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন লিভিংস্টোন।

বিদায় নেবার আগে স্টেনলি অভিযানের উপযুক্ত কুলি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুর্দম লিভিংস্টোনকে যোগাড় করে দিয়ে গেলেন।

অভিযাত্রার দিনগুলিতে প্রতিদিন নিয়ম করে ডায়েরী লিখতেন লিভিংস্টোন। তা থেকেই জানা যায় তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল। এগিয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি।

১৮৭৩ খ্রিঃ ২৭ এপ্রিলের পর আর ডায়েরি লিখতে পারেননি লিভিংস্টোন। বিছানায় শেষ শয্যা নিয়েছেন তারপর থেকে।

১লা মে ভোরবেলা তাঁর প্রিয় নিগ্রো চাকরটি তাঁবুতে ঢুকে দেখল, বিছানার পাশে প্রার্থনারত অবস্থায় নিশ্চল দেহ পড়ে আছে মনিবের, প্রাণহীন সে দেহ।

রবার্ট ফ্যালকন স্কট

অজানাকে জানার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, অজেয়কে জয় করার দুরন্ত বাসনা যুগে যুগে বহু অসম সাহসী বীর মানুষকে ছুটিয়ে নিয়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। তাঁদের সাধনা ও আত্মত্যাগে বিস্তৃত হয়েছে পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা, সমৃদ্ধ হয়েছে মানুষের জ্ঞানভান্ডার।

এমনি এক সংগ্রামী বীর অভিযাত্রী ছিলেন রবার্ট ফ্যালকন স্কট। অজানার আহ্বানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে তিনি চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ মেরুর বরফাবৃত প্রান্তরে।

অভিযাত্রী স্কটের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৮ খ্রিঃ ৬ই জুন। বাবা অসুস্থ ছিলেন বলে বাড়ির কাজকর্ম তাঁকেই দেখতে হত।

তাঁর এক কাকা কাজ করতেন নৌবাহিনীতে, অন্য তিন কাকা ছিলেন স্থলবাহিনীতে। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও স্বপ্ন দেখতেন বড় হয়ে কাকার মতো জাহাজে চড়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবেন।

সেই স্বপ্ন তাঁর সফল হল যৌবনে পদার্পণ করার পর। নৌবাহিনীতে নাম লেখালেন স্কট। তারপর সাহস তৎপরতা ও যোগ্যতার বলে অল্পদিনের মধ্যেই লাভ করলেন অফিসার পদ।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। মনে করা হত এটিই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। কিন্তু এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল ১৭৭২ খ্রিঃ ক্যাপটেন কুকের পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলে অভিযানের পর। তিনি ফিরে এসে জানিয়েছিলেন, জনপ্রাণীহীন দক্ষিণ অঞ্চলে জমে আছে কেবল বরফ, যেদিকে দৃষ্টি যায় সেদিকেই শুধু বরফ।

তারপর শতাব্দীকালের মধ্যে আর নতুন কোন তথ্য জানা সম্ভব হয়নি দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে।

নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হল ১৮৯৫ খ্রিঃ। এক আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে স্থির হয় গবেষণার জন্য দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করা হবে।

অভিযানের নেতৃত্ব দেবার জন্য একজন উদ্যমী সাহসী ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের প্রয়োজন দেখা দিল।

এই সময়েই রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সভাপতি স্যার ক্লিমেন্টের সঙ্গে আলাপ হয় স্কটের। তখন তিনি ৩২ বছরের যুবা। অভিযান পরিচালনা করবার সমস্ত রকম যোগ্যতাই তাঁর ছিল। তা লক্ষ্য করে স্যার ক্লিমেন্ট তাঁকেই দক্ষিণ মেরু অভিযানের নেতা মনোনীত করলেন।

চির বরফাবৃত দক্ষিণ মেরু অঞ্চল। ইতিপূর্বে দু-একটি অভিযাত্রী দল এই পথে অভিযান করেছিল। কিন্তু কেউই বরফের রাজ্যে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

১৯১০ খ্রিঃ তাঁর দলবল নিয়ে স্কট ডিসকভারি জাহাজে করে যাত্রা করলেন দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে। এই অভিযানে স্কটের সঙ্গে ছিলেন একদল বিজ্ঞানী।

চির বরফাবৃত দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে দীর্ঘ তিন বছর বাস করে ফিরে

এসেছিলেন তাঁরা। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে সংগৃহীত হয়েছিল বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য। জানা গিয়েছিল সেখানকার আবহাওয়া, প্রকৃতি, ভূমি, সমুদ্রস্রোত, প্রাণী, বরফের আকার আকৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের তথ্যাদি।

তিন বছর পর স্কট ইংলন্ডে ফিরে এসে বীরেব সম্মান ও সম্বর্ধনা লাভ করলেন। তাঁকে নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করা হল।

অভূতপূর্ব খ্যাতি সম্মান যশ লাভ করেও তৃপ্ত হল না স্কটের মন। তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন দক্ষিণ মেরু অভিযানের।

কিন্তু মেরু প্রদেশে অভিযান ছিল বিঘ্নসঙ্কুল। প্রধানত দুটি প্রধান বাধাই হয়ে উঠত অভিযাত্রীদের প্রতিবন্ধক।

সমুদ্র জলস্রোতের উষ্ণ অঞ্চল অতিক্রম করলেই শুরু হয় দক্ষিণ সাগরের শীতল জলের স্রোত। পাহাড়ের মত বিরাট বিরাট ভাসমান বরফ খন্ড অবরোধ করে দাঁড়ায় জাহাজের গতিপথ। সামান্য বেসামাল হলেই বরফের চাঁইয়ের ধাক্কায় চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে জাহাজের। ভাসমান সেই বরফের পাহাড় যতক্ষণ সরে না যায় ততক্ষণ জাহাজ নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

এইভাবে মেরুপ্রদেশের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করেই মুখোমুখি হতে হয় অন্য বাধার।

জাহাজ নোঙর করে তীরে পা দিয়েই বরফ। বরফ-ভূমি। সেই বরফ অঞ্চলের বিস্তৃতি দীর্ঘ পাঁচশো মাইল জুড়ে। তার মধ্যে নেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা, খাদ্য বা পানীয়। সেখানে প্রকৃতির নিজস্ব ব্যবস্থা মতোই মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে প্রাচীর রচনা করেছে এক খাড়া পাহাড়। তারই নাম হল The great ice Barrer বা ভুষার প্রাচীর।

দক্ষিণ মেরু অভিযানকালে স্কট বুঝতে পেরেছিলেন এই তুষার-প্রাচীর অতিক্রম করতে না পারলে দক্ষিণ মেরুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাবে না। তাই দুজন সঙ্গী, স্লেজ গাড়ি, এগারটা কুকুর ও তিন মাসের উপযুক্ত খাদ্য নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু দুস্তর বরফের মধ্যে দিয়ে ৩০০ মাইল যাবার পরই তাঁর একজন সঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। খাদ্যও ফুরিয়ে আসছিল। তাই বাধ্য হয়েই তাঁকে ফেরার পথ ধরতে হল।

কিন্তু ফেরার পথে বিপর্যয় ছিল চরম। বারোটা কুকুরের মধ্যে তিনটে গেল আলগা বরফের তলায় হারিয়ে। চারটি মারা পড়ল তুষার ঝড়ে। ফলে যাওয়ার সময় স্লেজে যে গতি ছিল, ক্রমশই সেই গতি কমতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত দুটি মাত্র কুকুর বেঁচে ছিল। খাদ্যও গিয়েছিল ফুরিয়ে। গাড়ি টেনে নিয়ে চলতে হয়েছিল নিজেদেরই।

তারপরে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য দুটো কুকুরকেও হত্যা করতে হল। এই নিদারুণ ঘটনার মর্মান্তিক বিবরণ স্কট তাঁর অভিযান-কাহিনীতে বিবৃত করেছেন।

নেহাৎ ভাগ্যবলেই শেষ পর্যন্ত স্কট তাঁর দুজন সঙ্গীকে নিয়ে জাহাজে করে ইংলন্ডে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ফিরে এসেও স্বস্তি ছিল না তাঁর। বিস্তীর্ণ তুষার-ভূমির মায়াময় নির্জনতা যেন তাঁকে মুহুর্মুহু হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। আবার বেরিয়ে পড়ার জন্য উতলা হয়ে উঠল মন।

কিন্তু যাব বললেই তো আর মেরু অঞ্চলে যাওয়া যায় না। তার জন্য দরকার উপযুক্ত প্রস্তুতির। সেই সম্বল কোথায় তাঁর?

স্কট আশা করেছিলেন সরকারের তরফ থেকেই হয়তো আবার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অভিযানের কথা কোন দিক থেকেই উচ্চারিত হল না।

আকাঙ্ক্ষার অদম্য তাড়নায় ছটফট করতে লাগলেন স্কট। নিজের উদ্দেশ্যের কথা খুলে জানালেন প্রেমিকা ক্যাথলীন ব্রুসীকে।

১৯০৮ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাথলীনের সঙ্গে বিবাহ হয় স্কটের। আর সেই মাসেই তিনি সংবাদপত্র মারফত তাঁর দেশবাসীকে জানালেন, মেরু অভিযানের আকাঙ্ক্ষার কথা।

তিনি আরও জানালেন, ইংলন্ডের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি দক্ষিণ মেরুর বরফ-ভূমিতে স্থাপন করবেন দেশের জাতীয় পতাকা।

এরপরেও কিছু ব্যক্তিগত অভিনন্দন ছাড়া সরকার বা জনগণের তরফ থেকে উৎসাহজনক কোন সাড়া পেলেন না।

এই অভিযানের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। সেই সঙ্গে দরকার কিছু সাহসী কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মদক্ষ মানুষ এবং অজস্র প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসের। এই অভিযানের ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষুদ্র জিনিসই ছিল অত্যন্ত জরুরী। আর এই সমস্ত কিছু সংগ্রহ করার জন্য দরকার ছিল দীর্ঘ অখন্ড অবকাশের।

কোন দিক থেকে সাড়া না পেয়ে স্কট স্থির করলেন তিনি একক চেষ্টাতেই অভিযান সংগঠিত করবেন।

প্রথমেই তিনি নৌবাহিনী থেকে অর্ধেক বেতনে ছয় মাসের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিলেন। তারপর কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন কাজে।

ইংলন্ডের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে তিনি মেরু অভিযান প্রসঙ্গে বক্তৃতা করতে লাগলেন। জনসাধারণের সাহায্যের প্রত্যাশায় নিজের মাথার টুপি পেতে ধরতেন তাঁর বক্তৃতামঞ্চে।

এইভাবে ক্রমে দেশের সাধারণ মানুষ অভিযান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠল। সহানুভূতির সঙ্গেই অনেকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করতে লাগলেন।

উল্লেখযোগ্য যে এই মেরু অভিযানকে কেন্দ্র করে স্কট দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন।

মানুষ যত সচেতন হতে শুরু করল, অর্থ সাহায্য ততই বাড়তে লাগল। ক্রমে কেবল সাধারণ মানুষ নয়, সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরাও এগিয়ে আসতে লাগলেন। ফলে মেরু অভিযানের জন্য দশ হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করতে স্কটের বেশি দিন সময় লাগল না।

এরপর দেশের সরকারের পক্ষে আর উদাসীন থাকা সম্ভব হল না। অবিলম্বে সরকারের তরফ থেকে স্কটের অভিযানের জন্য ২০ হাজার পাউন্ড অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

স্বয়ং রানী জানালেন, দক্ষিণ মেরুতে যে পতাকা স্থাপন করা হবে, সেটি তিনি নিজে হাতে তৈরি করে দেবেন।

এইভাবে অর্থের সমস্যার সমাধান হল। এইবারে অভিযানের জন্য উপযুক্ত লোকের সন্ধান আরম্ভ করলেন স্কট।

আগের অভিযানের সঙ্গীদের মধ্য থেকে বাছাই করে ৩২ জন নাবিককে মনোনীত করলেন।

এই অভিযানে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন ১২ জন বিজ্ঞানী এবং তাঁদের সাহায্যকারী ১৪ জন। সমগ্র অভিযান পরিচালনার জন্য গঠিত হল একটি কমিটি। কমিটির প্রধান হলেন স্কট।

অভিযানের প্রস্তুতি যখন শেষ হল, সেই সময় ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর লরেন্স ওয়েটস নামে এক অফিসারের চিঠি পেলেন স্কট। তিনি অভিযানে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। স্কট তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন।

চিঠি পেয়ে যথাসময়ে ইংলন্ডে উপস্থিত হলেন ওয়েটস এবং স্কট তাঁকে দলের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

দক্ষিণ মেরু অভিযানের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল উপযুক্ত ঘোড়া ও কুকুর। স্কটের আন্তরিক চেষ্টায় যথাসময়ে সেসবও সংগ্রহ হল। এইভাবে অভিযানের সমস্ত আয়োজনই একসময় সম্পূর্ণ হল।

অভিযাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য যে জাহাজটি প্রস্তুত করা হয়েছিল স্কট তার নামকরণ করলেন টেরা নোভা বা নতুন পৃথিবী।

যাত্রার পূর্বক্ষণে স্কটের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হল, তার নাম রাখা হয়েছিল পিটার স্কট। পরবর্তীকালে তাঁর এই পুত্র প্রকৃতিবিদরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এবারে যাত্রার পালা। উচ্ছ্বসিত দেশবাসীর আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করে ১৯১০ খ্রিঃ ১৫ই জুন অভিযাত্রী দলটিকে নিয়ে টেরা নোভা ইংলন্ড থেকে যাত্রা শুরু করল।

মেলবোর্ন বন্দরে পৌঁছে ১২ই অক্টোবর স্কট একটি টেলিগ্রাম হাতে পেলেন। সেই টেলিগ্রাম মারফত নরওয়ে অভিযাত্রী আমুন্ডসেন জানিয়েছিলেন, তিনিও দক্ষিণ মেরু অভিযানে যাত্রা করেছেন।

টেলিগ্রাম পেয়ে হতবুদ্ধি হলেন স্কট। আমুন্ডসেনও যে দক্ষিণ মেরুর পথে অভিযান করেছেন এ তথ্য জানা ছিল না তাঁর। তাই তাঁর আশঙ্কা হল, তাঁর আগে যদি আমুন্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে নরওয়ের পতাকা উত্তোলন করেন তাহলে দক্ষিণ মেরু বিজয়ের যাবতীয় গৌরব তাঁর ভাগ্যেই জুটবে। ব্যর্থ হবে তাঁর সমস্ত উদ্যোগ।

এই আশঙ্কা থেকে যাত্রাপথের নানা বিপদের কথাও তাঁর মনকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলল। কিন্তু প্রচন্ড মানসিক দৃঢ়তা বলে তিনি একদিনের মধ্যেই মন থেকে সংশয়, আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হলেন।

অতঃপর ক্যাপ্টেন স্কটের জাহাজ ১৯১০খ্রিঃ ২৯ নভেম্বর তারিখে নিউজিল্যান্ডের ডুবেডিন বন্দর থেকে তুষারাবৃত মেরুপ্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করল।

মেঘমুক্ত নীল আকাশ আর শান্ত সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল জাহাজ। সম্ভাব্য মরুবিজয়ের উত্তেজনা আর উল্লাসে ভরপুর যাত্রীদেব মন।

দিন দুই নিরাপদেই কাটল। কিন্তু তৃতীয় দিনেই শুরু হল প্রচন্ড ঝড়। উথাল পাথাল হল সমুদ্র। ঢেউয়ের দাপটে ফাটল দেখা দিল জাহাজে। সঙ্গে সঙ্গেই সকলে মিলে হাত লাগাল মেরামতির কাজে।

সব কটি ঘোড়া আর কুকুর বাঁধা ছিল ডেকে। ওয়েটসের ওপর ছিল তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার। সহসা দড়ি ছিঁড়ে ঢেউয়ের মুখে একটি ঘোড়া ভেসে যাবার উপক্রম হল।

নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওয়েটস ঘোড়াটিকে উদ্ধার করলেন। দুদিনের এই ঝড়ে শেষ পর্যন্ত দুটি ঘোড়া তাদের হারাতে হয়েছিল।

ঝড়ের মধ্য দিয়েই অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছিল জাহাজ। ঝড় থেমে গেলে দিনকয়েক নিরাপদেই কাটল। একদিন একটি অ্যালবাট্রস পাখি চোখে পড়ল। সমুদ্রের জল হয়ে উঠল গাঢ় নীল আর সেই জলে ভেসে যেতে দেখা গেল এককোসী প্রাণী প্লাঙ্কটন। মাঝেমাঝে ছোট বরফের টুকরোও দেখতে

পাওয়া গেল। হাওয়াও হয়ে উঠল ভারী আর শীতল। স্কট বুঝতে পারলেন মরু সীমায় প্রবেশ করেছে তাঁদের জাহাজ।

আরও একদিন চলার পর জাহাজের পথ আটকে দিল বরফের ভাসমান বড় বড় খন্ড। আর এগুনো সম্ভব হল না। এই সব বরফ খন্ড সরে না যাওয়া পর্যন্ত একভাবেই থাকতে হবে তাদের। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন স্কট।

এগিয়ে এল বড়দিনের উৎসব। জাহাজেই তা পালিত হল। স্কট সঙ্গীদের উৎসাহ জিইয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

অবশেষে কুড়িদিন সমুদ্রের বুকে আটক থাকার পর ২৯শে ডিসেম্বর আবার জাহাজ গতি পেল।

ক্রমে বছর শেষ হল। নববর্ষের প্রথম সকালেই অভিযাত্রীদের উল্লাসের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিসীমায় ভেসে উঠল মেরু মহাদেশের শ্বেতবর্ণ তটরেখা। জাহাজ এগিয়ে চলল।

ক্রমে দৃশ্যমান হল প্রায় দুশো ফুট উঁচু তুষার-প্রাচীর। লম্বমান সেই প্রাচীরের গায়ে মাটির বুকে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার পেঙ্গুইন পাখি। তাদের বিচিত্র কণ্ঠধ্বনি মুখর করে তুলেছে মেরুপ্রান্তরের মায়াময় নিস্তব্ধতা।

ধীরে ধীরে তীরে এসে নোঙর করল জাহাজ। ডিঙিতে ভেসে মেরুভূমিতে প্রথম পদার্পণ করলেন ক্যাপ্টেন স্কট। সঙ্গীসাথীরা একে একে তীরে জড়ো হলে সকলে মিলে প্রার্থনা করলেন।

মেরুপ্রদেশের অভ্যন্তরে যাবার আগে মূল শিবির স্থাপনের জন্য একটি সুবিধা মত স্থান দরকার যাতে তুষার ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আগের বারে এসে যেখানে কেন্দ্রীয় শিবির স্থাপন করেছিলেন স্কট এবার সেখান থেকে উত্তরে সরে গিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝখানে তাঁবু খাটালেন। এই মূল শিবিরকে বলা হয় Hut point। ধীরে ধীরে জাহাজ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সব নামিয়ে আনা হল।

এরপর শুরু হল মূল অভিযানের প্রস্তুতি। স্কট তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে থেকে মোট এগারো জনকে বেছে নিলেন। অভিযানে তারা হলেন তাঁর সহচর। বাকিরা হাট পয়েন্টেই থেকে যাবে এবং নিজেদের পছন্দমতো কাজকর্ম করবেন।

স্কট খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি স্থির করলেন অভিযান কালে হাট পয়েন্টের সঙ্গে কোন কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও যাতে মূল কাজের কোন বিঘ্ন না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে হাট পয়েন্ট থেকে ২১ মাইল দূরে তিনি একটি নিরাপত্তা শিবির সেফ্‌টি ক্যাম্প গড়ে তুলবেন। এই সেফটি ক্যাম্পেই অভিযানের যাবতীয় জিনিসপত্র রাখা হবে।

এগারো জন সঙ্গী নিয়ে মোট ৮টি ঘোড়া ও ২৬টি কুকুর সহ স্কট রওনা হলেন সেফটি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কুকুর আর ঘোড়ায় টানা স্লেজও রয়েছে দশটি।

চড়াই-উতরাই ভেঙ্গে চলতে হচ্ছে অতি কষ্টে। বরফের ওপরে ঠিকরোচ্ছে সূর্যের আলো। তাতে চোখে লাগছে ধাঁধা।

ঘোড়াগুলো দিশা হারিয়ে ফেলছে। বাধ্য হয়ে রাতের নিরাপদ আলোতেই ২১মাইল পথ পাড়ি দিতে হল।

হাতে হাতে তৈরি হল সেফটি ক্যাম্প। তারপর রসদটা সরিয়ে রাখা হল সেখান থেকে ৬০ কিমি দূরে। একটন খাবার রাখা হল বলে জায়গাটার নাম হল ওয়ান টন ডিপো।

এসমস্ত কাজ শেষ হতে হতেই শীতকাল এসে গেল। শীতের দেশের শীতকাল—সে যেন মৃত্যুরই অপর নাম। তাঁবু ছেড়ে দু'দণ্ড বাইরে আসার উপায় ছিল না।

শীতের করাল থাবা অভিযাত্রীদের ঘায়েল করতে না পারলেও কয়েকটা ঘোড়াকে বাঁচানো সম্ভব হল না।

সহনীয় আবহাওয়া দেখে একদিন সকলে সেফটি ক্যাম্পের দিকে ফিরছেন, অতর্কিতে ঘটে গেল দুর্ঘটনা। বরফের পাতলা আস্তরণ ফেটে গিয়ে একটা স্লেজগাড়ি কুকুরসুদ্ধ চোখের ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা কুকুর গহ্বরের কিনারা আঁকড়ে ধরতে পেরেছিল। সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্লেজগাড়ি ও কুকুরদের টেনে তুলে আনল। কিন্তু দুটো কুকুর গহ্বরের ভেতরেই রয়ে গেল।

স্কট দূরবীন দিয়ে কুকুর দুটিকে দেখতে পেলেন। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট নিচে বরফের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই বুঝতে পারল ওই বরফের গহ্বর থেকে ওদের উদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব।

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও স্কট নিচে নামার জন্য তৈরি হলেন। সামান্য ইতর প্রাণী বলে কুকুরদের তুচ্ছ করলেন না।

তাঁর হৃদয় ছিল উদার, প্রতিটি জীব-জন্তুকেই তিনি ভালবাসতেন। তাঁর এই ভালবাসা সহযাত্রীদেরও অভিভূত করেছিল।

নিজেই দড়ি বেয়ে নিচে নেমে কুকুর দুটিকে উদ্ধার করলেন স্কট।

১৯১১ খ্রিঃ শীতকালটা গত হলে নভেম্বরের শুরুতে শুরু হল দক্ষিণ মেরুর দিকে অভিযাত্রা। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেওয়া হয়েছে ঘোড়ার পিঠে আর কুকুরে টানা স্লেজে।

সামনে সুদীর্ঘ ৯০০ মাইলের বরফাচ্ছন্ন পথ। পাহাড়ের চড়াই-উতরাই। সবুজের চিহ্ন কোথাও নেই, নেই জীবনের অস্তিত্ব।

মাঝে মাঝেই পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে চলমান হিমবাহ। আচমকা ঝাপটা মেরে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে তুষার ঝড়। মরীচিকার হাতছানি করছে দিক্‌ভ্রান্ত।

ফেরার পথের ভাবনাটাও অভিযাত্রীকে সামনে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই করতে হয়। তাই ৬৫ মাইল অন্তর অন্তর খাটিয়ে নিতে হচ্ছে একটা করে তাঁবু। তাতে খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস রেখে যেতে হচ্ছে। ফেরার পথে দিকদিশাহীন ধূ ধূ বরফঘন পাথারে এই তাঁবুগুলোই দিকচিহ্ন হিসাবে পথের দিশা দেখাবে।

পথের দুরন্ত বাধা অতিক্রম করে ইচ্ছা মতো দূরত্ব অতিক্রম করার উপায় নেই। যেদিন আবহাওয়া অনুকূল পেয়েছেন স্কট তাঁর দলবল নিয়ে সর্বোচ্চ কুড়ি মাইল অবধি এগুতে পেরেছেন।

এইভাবে ১৯১২ খ্রিঃ ৩ জানুয়ারী তাঁরা এসে পৌঁছলেন দক্ষিণ মেরুর মালভূমি অঞ্চলে। এখান থেকে দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব মাত্র ১৮৬ মাইল। এখান থেকেই নতুন করে তৈরি করে নিতে হবে নিজেদের।

স্কটের সঙ্গে সহযাত্রী হিসেবে যাঁরা এসেছেন তাঁরা হলেন, ওয়েটস, লাসলী, ক্রীন, সীম্যান, ইভানস, উইলসন আর বেয়ার্স—মোট সাতজন। দলপতি হিসেবে তিনি এঁদের মধ্যে থেকেই চূড়ান্ত পথের সঙ্গী নির্বাচন করলেন। অগ্রযাত্রায় আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দলপতির নিদেশই সকলে মাথা পেতে নিলেন।

সিদ্ধান্ত হল, শেষ ক্যাম্পে লাসলী, ইভানস, আর ক্রীন থেকে যাবেন। অবশিষ্ট চারজন তাঁর অভিযানে সঙ্গী হবেন।

ব্যবস্থা মতো তিনজনকে ক্যাম্পে রেখে সঙ্গীদের নিয়ে স্কট এগিয়ে চললেন। সকলেরই চোখ অশ্রুসজল। অদৃষ্টের নির্দেশ কী এঁদের কেউই জানতে পারছেন না। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রযাত্রীদের স্লেজগুলো তাকিয়ে দেখলেন লাসলীরা।

পরিষ্কার আবহাওয়ায় দু'দিন পথ চলা গেল। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকেই ঝোড়ো বাতাস বইতে আরম্ভ করল। সেই সঙ্গে তুষারপাত।

তার মধ্য দিয়ে স্লেজ নিয়ে এগনো দুষ্কর হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে সকলে নিজস্ব মালপত্র কাঁধে তুলে নিলেন।

কিন্তু তুষার ঝড়ের মার তো এড়াবার পথ নেই। ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল শরীর। ইভানসের ডান হাতে ক্ষত দাঁড়িয়ে গেল। স্কট নিজে সেই হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তার মালগুলোও নিজেরা ভাগাভাগি করে তুলে নিলেন।

পথের বাধা আর পথ চলার ক্লান্তি ক্রমশই তাদের অবসন্ন করে তুলল। সবকিছু অগ্রাহ্য করে প্রাণপণ শক্তিতে দেহটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন অভিযাত্রীরা। আর মাত্র কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিতে পারলেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সকলে। সামনেই কিছু একটা উড়তে দেখা যাচ্ছে! সকলের মনেই উৎকণ্ঠা—আমুণ্ডসেন পৌঁছে যাননি তো?

অশক্ত শরীর নিয়েই ছুটে যান সকলে। দেখলেন একটা ভাঙা স্লেজের ওপরে উড়ছে নরওয়ের পতাকা।

নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়লেন স্কট। দক্ষিণ মেরু পৌঁছেও বিজয়ের প্রথম গৌরব থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন! বেদনায় বুক ভেঙ্গে যেতে লাগল। কিন্তু বিহ্বল হলেন না তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে শক্ত করে নিলেন। দেশবাসীর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তো তাঁরা প্রতিপালন করেছেন। লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন।

সঙ্গীদের নিয়ে তখনই সোল্লাসে রানীর দেওয়া স্বদেশের পাতাকা ইউনিয়ন জ্যাক বাতাসে উড়িয়ে দিলেন। সমস্বরে রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করে অভিবাদন জানালেন বিজয়পতাকাকে।

সকলেই এক টুকরো করে চকোলেট রেখে দিয়েছিলেন। তাই খেয়ে বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন করলেন।

দলে উইলসন ও বেয়ার্স সিগারেট খেতেন না। তবুও উইলসন তিনটি সিগারেট সঙ্গে করে এনেছিলেন। সেই তিনটি তুলে দিলেন ধূমপায়ী স্কট, ওয়েটস ও সীম্যানের হাতে।

কিছু দূরেই শূন্য পড়েছিল আমুণ্ডসেনের পরিত্যক্ত তাঁবু। তাঁর কিছু জিনিসপত্রও ছিল। সেখানে গিয়ে স্কট পেলেন তাঁকে লেখা আমুণ্ডসেনের একটা চিঠি। ১৯১১, ১৫ ডিসেম্বর তারিখে লেখা। তিনি লিখেছেন,—

"আমাদের পর আপনারা এখানে পৌঁছবেন এই বিশ্বাসে এই চিঠি লিখছি। আপনাদের ব্যবহারে লাগতে পারে এমন কিছু জিনিসও রইল। নরওয়ের রাজাকে একটা চিঠি দিলাম। যদি আর আমার দেশে ফেরা না হয় তবে চিঠিটি আমাদের রাজার কাছে আপনি পৌঁছে দেবেন। আপনার পথ নির্বিঘ্ন হোক, এই কামনা জানাই।

ইতি
আমুণ্ডসেন

অজেয়কে জয় করার যে দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্কট যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা সমাধা হয়েছে। এবারে ফিরে যাবার পালা। তিনি আর বিলম্ব করলেন না। চিঠিটি নিয়ে হাট পয়েন্টের পথে রওনা হয়ে পড়লেন।

বরফের ওপর চিহ্ন রেখে এসেছিলেন। সেই চিহ্ন তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দুর্গম পথ বারবারই পা আটকে ধরছে। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় চলার

গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। সোজা হয়ে চলতে না পেরে, মাঝে মাঝেই হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছে।

স্কটের মনে দুর্ভাবনা। দ্রুত এগিয়ে যেতে না পারলে কেউই মৃত্যু এড়াতে পারবেন না। সঙ্গের খাবার আর কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। জ্বালানিও নিঃশেষ হয়ে এসেছে। গরম না করে কোনও খাবারই মুখে তোলা যাবে না।

হঠাৎ পেছনে সন্দেহজনক শব্দ শুনে ফিরে তাকালেন স্কট। দেখলেন ইভানস পড়ে আছেন বরফের ওপর। সংজ্ঞা হারিয়েছেন তিনি।

সেদিন আর এগুনো হল না, সেখানেই তাঁবু ফেলতে হল। সঙ্গীকে ফেলে রেখে যাবেন না কেউ। তাতে মৃত্যু হয় হোক।

তিনদিন পর ইভানস সুস্থ হলেন কিছুটা। অশক্ত শরীর সত্ত্বেও তিনি বললেন, এবার আমি চলতে পারব।

আবার চলতে শুরু করলেন সকলে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই ইভানস জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। ছুটে এলেন সকলে—ইভানসের মাথাটা তুলে ধরতে গিয়ে দেখা গেল, চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

সঙ্গীকে হারিয়ে সকলেরই মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু থেমে থাকবার উপায় নেই। ইভানসকে সমাধিস্থ করে এগিয়ে চললেন আবার।

খাবার রয়েছে যৎসামান্য। দ্রুত এগিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু চলতে পারছিলেন না ওয়েটস। তবুও চলতে লাগলেন পা টেনে টেনে। তাঁর অবস্থা দেখে তাঁবু ফেললেন স্কট। ওয়েটস সঙ্গীদের বিব্রত করতে চাইলেন না। খাবারটাও বাঁচানো দরকার।

১৫ই মার্চ মাঝরাতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লেন ওয়েটস। আর ফিরে এলেন না। সঙ্গীদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করবার জন্য নিজেই দল থেকে সরে গেলেন।

ডিপো বেশি দূরে নয়। মাত্র আঠারো মাইল। কিন্তু দুটো দিন পথ চলার পরেই শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। বাধ্য হয়ে তাঁবুতে আশ্রয় নিতে হল।

সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও একটি কাজ সেই বরফের দেশে প্রতিদিন নিয়মিত করতেন স্কট। ডায়েরি লিখতেন। অভিযানের প্রতিটি ঘটনার নিখুঁত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন।

স্কট কেবল একজন অভিযাত্রী মাত্র ছিলেন না। তাঁর ছিল শিল্পের দৃষ্টি আর একজন দক্ষ সাহিত্যিকের রচনাশৈলী। ডায়েরীর প্রতিটি লেখায় ধরা রয়েছে তাঁর সেই পরিচয়।

সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন দরদী মানুষ। দেশের প্রতিও ছিল তাঁর অপরিসীম ভালবাসা।

ডিপোর কাছাকাছি এসেও ঝড়ের তাণ্ডবে এগারো দিন তাঁবুর মধ্যে আটকে থাকতে হল সকলকে। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই। সেই

অবস্থাতেও স্কট তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন "মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আজ পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে যেতে পারছি, আমার বীর বন্ধুরা জনমানবহীন তুষার প্রান্তরে সীমাহীন কষ্ট দুঃখ সয়েছেন বীরের মতো, এই আমাদের চরম আনন্দ। আমরা প্রমাণ করে গেলাম, ইংলণ্ডের মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে, দেশের গৌরববৃদ্ধির জন্য বীরের মতো মৃত্যু বরণ করতে পারে। ....."

অমিতশক্তি বীরের মৃত্যু নেই। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তাঁরা অর্জন করেন অমরত্ব। এই চিরন্তন সত্যই প্রমাণ করে গেলেন অভিযাত্রী স্কট ও তাঁর সঙ্গীরা।

১৯১২ খ্রিঃ ২৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার সর্বশেষ ডায়েরী লিখেছেন স্কট। তারপর চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁর কলম।

আটমাস পর উদ্ধারকারী দল তাঁবুর মধ্যে তাঁর প্রাণহীন দেহ আবিষ্কার করে। উইলসন শায়িত ছিলেন পাশেই। কিছু দূরে ছিল বেয়ার্সের দেহ।

সেই বরফের প্রান্তরেই মরণজয়ী অভিযাত্রীদের সমাহিত করে ক্রুশ পুঁতে দেওয়া হয়।

যে জায়গা থেকে ওয়েটস বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁবু থেকে, সেখানে স্থাপন করা হয় স্মৃতিচিহ্ন। একজন সত্যিকারের মানুষ যে কাছেই কোথাও ঘুমিয়ে আছেন, সে কথা লেখা রইল তাতে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলার সারস্বত সমাজের অন্যতম পুরোধা পুরুষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম চব্বিশ পরগনার নৈহাটির প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য বংশে ১৮৫৩ খ্রিঃ ৬ ডিসেম্বর। তাঁর পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন পান্ডিত্য ও বিদ্যাচর্চার জন্য এতদঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন।

নিজের বংশ পরিচয় সম্পর্কে হরপ্রসাদ লিখেছেন, "আমার পূর্বপুরুষেরা যশোর জেলা ত্যাগ করিয়া নৈহাটিতে আসিয়া বসতি করেন। সেখানে ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলিয়া অধ্যাপনা শুরু করেন। একশত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের নৈয়ায়িকেরা আমাদের বাড়ির পাঠ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অনেকেই নৈহাটিতে পাঠ স্বীকার করিয়া তথা হইতে উপাধি লইয়া গিয়াছেন।"

নৈহাটিতে সেই সময় অপরাপর টোলের মধ্যে ভট্টাচার্য পরিবারের টোল ছিল শীর্ষ স্থানীয়। বিদ্যাচর্চার এই পরিবেশের মধ্যেই হরপ্রসাদের বাল্যকালের শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

হরপ্রসাদের বড় দাদা নন্দকুমার অল্প বয়সেই ন্যায়শাস্ত্রে সুপন্ডিত হয়েছিলেন। তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যোগাযোগে মুর্শিদাবাদ জেলার পাইকপাড়ার রাজাদের কান্দী স্কুলে হেড পন্ডিতের পদ লাভ করেন।

১৮৬১ খ্রিঃ রামকমলের মৃত্যু হয়। তখন নন্দকুমার নৈহাটি থেকে ছোট ভাইদের নিয়ে কান্দী স্কুলে ভর্তি করে দেন।

এখানে বাংলা ও সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরাজি ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হত। হরপ্রসাদের ইংরাজি শিক্ষা এখানেই শুরু হয়।

স্কুলে হরপ্রাসাদের নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য। যথারীতি এই নামেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই এক ঘটনার মাধ্যমে তাঁর নামের পরিবর্তন ঘটাতে হল।

একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হল হরপ্রসাদ। জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিতে হয়েছিল। তখন শিবের কাছে মানত করলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

হরপ্রসাদ শিবের প্রসাদে নবজীবন লাভ করেছিলেন বলে শরৎনাথ নামের পরিবর্তে তাঁর হরপ্রসাদ নামকরণ হয় এবং পরবর্তীকালে এই নামেই তিনি দেশবিখ্যাত হন।

রামকমলের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই নন্দকুমারও পরলোকে গমন করেন। ফলে পরিবারে অর্থাভাব দেখা দেয়। পরিণতিতে হরপ্রসাদের লেখাপড়াতেও বিঘ্ন ঘটে। তাঁকে কিছুদিন কাঁচড়াপাড়াব টোলে ও পরে নৈহাটির স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করতে হয়।

সেই সময়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে একটি ছাত্রাবাস ছিল। ১৮৬৬ খ্রিঃ সেই ছাত্রাবাসে আশ্রয়লাভ করে হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা শুরু করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন পরেই আশ্রয়চ্যুত হতে হয় তাঁকে, ছাত্রাবাসটি উঠে যায়।

এরপর তিনি বউবাজারে নেবুতলা অঞ্চলে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করেন। বিনিময়ে তাঁকে বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াতে হত।

এই সময় দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করে পড়ালেখা করতে হয়েছে। আশ্রয়দাতার ছেলেমেয়েদের পড়ানো, নিজে হাতে রান্নাবান্না—এত সব করে যেটুকু সময় পাওয়া যেত তার সদ্ব্যবহার করতে ক্রটি করতেন না তিনি।

সংস্কৃত কলেজে সেই সময় রঘুবংশ পড়াতেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। সমগ্র রঘুবংশটি হরপ্রসাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। অসাধারণ মেধা, আগ্রহ ও যত্নের বলে

ক্লাসে বরাবরই ভাল ফল করতেন তিনি। শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে পর পর দুবার ডবল প্রমোশন পেয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় আট টাকা বৃত্তি পান।

নানাপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেই ১৮৭১ খ্রিঃ এন্ট্রাস, ১৮৭৩ খ্রিঃ এফ.এ এবং ১৮৭৬ খ্রিঃ অষ্টম স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ পাস করেন।

১৮৭৭ খ্রিঃ এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সংস্কৃত কলেজ থেকে শাস্ত্রী উপাধি পান।

বি.এ. ক্লাসে পড়াকালীনই হরপ্রসাদ 'ভারত মহিলা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে হোলকার পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

এম-এ পাস করার পর হেয়ার স্কুলে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। এখানে শিক্ষকতা করার সময়েই ১৮৭৮ খ্রিঃ তিনি বিবাহ করেন। তাঁর পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

সেই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তাঁর মাধ্যমে হরপ্রসাদের যোগাযোগ হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রর সঙ্গে।

এশিয়াটিক সোসাইটির সহযোগিতায় রাজেন্দ্রলাল তখন কিছু প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথির তালিকা তৈরির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই পুঁথিগুলি সংগৃহীত হয়েছিল নেপাল রাজদরবার থেকে।

রাজেন্দ্রলাল এই সব পুঁথির ইংরাজিতে অনুবাদ করার দায়িত্ব দিলেন হরপ্রসাদকে। কিছুকাল কাজ করার পর ১৮৭৮ খ্রিঃ হরপ্রসাদ কলকাতা ছেড়ে লখনউ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজে যোগ দেন।

লখনউ যাওয়ার পথে তিনি কার্মাটাড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে রাত্রিবাস করেছিলেন।

এই সময়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ পরে লিখেছেন—"১৮৭৮ খ্রিঃ কার্মাটাড়ে স্টেশনের কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাংলো ছিল। কলকাতায় প্রায় আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হত, সেইজন্য বছরখানেক বিনা বেতনে ছুটি লইয়া লখনউ ক্যানিং কলেজের প্রফেসর রাজকুমার সর্বাধিকারীর একটিনি করতে গিয়েছিলাম। আমরা কার্মাটাড়ে পৌঁছাইয়া আমাদের মালপত্র স্টেশন মাস্টারের জিম্মা করিয়া দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলোয় গেলাম। তিনি আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির খবর লইলেন .... আমি সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি, এম-এ ক্লাসেও পড়াইতে হইবে, বিশেষ হর্ষচরিতখানা পুরা পড়াইতে হইবে—-শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন। বলিলেন, বইটা বড় কঠিন। তবে তিনি আমাকে হর্ষচরিত ও অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন।"

লখনউ থেকে ফিরে ১৮৯৫ খ্রিঃ হরপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর অধ্যাপনাকালেই তাঁর বিশেষ উদ্যোগে ১৮৯৬ খ্রিঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতে এম-এ পড়াবার ব্যবস্থা হয়।

কয়েক বছর চাকরির পর তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আলেকজান্ডার সেভলরে সাহেবের সুপারিশে ১৯০০ খ্রিঃ হরপ্রসাদকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

এখানে কর্মরত অবস্থাতেই ১৮৯৮ খ্রিঃ তিনি সরকারের কাছ থেকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন।

সংস্কৃত কলেজে যোগ্যতা ও সুনামের সঙ্গে আট বছর কাজ করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর এর পরেও হরপ্রসাদকে অন্য কাজে নিযুক্ত করলেন।

ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে। এই সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহ সম্পাদনা ও তালিকা প্রণয়ন এবং পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার কাজও যুক্ত হল।

এই সময় থেকে আমৃত্যুকাল তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১০০ টাকা করে বৃত্তি পেয়েছেন।

এই সোসাইটির কাজের সূত্রেই প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহের জন্য হরপ্রসাদের মধ্যে গভীর আগ্রহ জন্মেছিল।

এক সময়ে কর্মসূত্রে হরপ্রসাদ বেঙ্গল লাইব্রেরির সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। ফলে সেখানে সংরক্ষিত প্রাচীন বাংলা পুঁথি দেখার সুযোগ হয়েছিল। তিনি লিখেছেন. "বেঙ্গল লাইব্রেরিতে আসিয়া দেখিলাম বৈষ্ণবদের অনেক বই ছাপা হইতেছে। শুধু গানের বই নয়, সংকীর্তনের বই নয়, অনেক জীবনচরিত ও ইতিহাসের বইও ছাপা হইতেছে। বাংলা দেশে এত কবি, এত পদ্য ও এত বই ছিল কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

একবার কম্বুলেটোলার লাইব্রেরির বাৎসরিক উৎসবের সময় একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১০০ জন কবির নাম ও তাঁদের জীবনচরিত গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা কবি। সভায় গিয়া দেখি আমি যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যে এত কবি আছে ও তাঁদের জীবনচরিতের ইতিহাস জানিতাম না তেমনি লক্ষ্য করিলাম অধিকাংশ লোকই সেইরূপ।

বাঙ্গালায় এত বই আছে শুনিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। বহু ব্যক্তি সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। অনেকে উক্তি করেন, 'তাহারা একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছে'। এইসকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া ভাবিলাম যদি ছাপা পুঁথির উপর প্রবন্ধেই এত খবর পাওয়া

গেল, হাতের লেখা পুঁথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কি নূতন খবর সংগ্রহ করিতে পারিব আর তাদের বক্তব্য জানিতে পারিব। তাই বাঙ্গালা পুঁথি খোঁজার একটা উৎকট আগ্রহ জন্মাইল''।

অন্তস্থ এই আগ্রহ নিয়েই হরপ্রসাদ ১৮৯৪ খ্রিঃ থেকে পুঁথি সন্ধানের কাজে ব্রতী হন।

১৮৯৭ খ্রিঃ হরপ্রসাদের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

পরবর্তীকালে হরপ্রসাদের পুঁথি অনুসন্ধান ও তার সুফল ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ সাহিত্য পরিষদই প্রথম প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানতে পারি, ''আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযেগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যা ভান্ডারে নিজের বংশগত পান্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য পরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে সতেজ করে রেখেছিলেন।''

হরপ্রসাদের ভারত মহিলা প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। কী করে তিনি প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করেন সে সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে।

১৮৭৩ খ্রিঃ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন কাগজে যখন প্রবন্ধটি ছাপা হয় তখন হরপ্রসাদ বি.এ. ক্লাশের ছাত্র। তিনি লিখেছেন, ''সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা আমার রচনা ভাল বলিয়াছিলেন এবং বাংলার তৎকালীন গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল পুরস্কার স্বরূপ আমার হাতে একখানি চেক তুলিয়া দিলেন আর কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথাও বলিলেন। এরপর আমার মনে এক নূতন ভাবের সৃষ্টি হইল। ভাবিলাম, এই লেখা ছাপাইয়া একজন গ্রন্থকার হওয়া যায়। কিন্তু এই পাওয়া টাকাগুলি বই ছাপিয়া উড়াইয়া দিবার পর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া সাময়িক উত্তেজনা হইতে বিরত হইলাম। অতঃপর শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণের নিকট গেলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম-এ, আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁর এক মাসিক পত্র আর্য্য দর্শনে আমার লেখাটি ছাপাইয়া দিবার জন্য দেখাইলাম। তিনি বেশ গম্ভীরভাবে মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, তুমি আমাদের কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছ। আমার কাগজে ছাপানো উচিত। তবে তুমি যে সকল মন্তব্য করিয়াছ, তাহা বাপু পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারিব না। আমি বলিলাম, আমার তো মহাশয় নিজের কোনও ভিউ

নাই। পুরাণ-পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাহাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি। যাহা হউক তিনি ছাপাইতে রাজি হইলেন না।

অবশেষে একদিন হঠাৎ গোলদিঘীর ধারে বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দেখা। তিনিও তাঁর দাদা বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমাদের বেশ জানিতেন ও স্নেহ করিতেন। তিনি সত্বর তাঁহাদের বাড়িতে যাইতে আদেশ করিলেন। কথা প্রসঙ্গে এই লেখার কথা উঠিতে তিনি বলিলেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে পারি।

আমি বলিলাম, আর্য্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহা লইবে এ আমার বিশ্বাস হয় না। রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, সে ভাবনা আমার, তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটি স্টেশনে অপেক্ষা করিও। সেই সময় আমি পৌঁছিব।

যথাসময়ে নৈহাটি স্টেশন হইতে রেল লাইনের ভিতর দিয়া আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে রাজকৃষ্ণবাবুর সহিত ঢুকিলাম। সেই সময় বঙ্কিমবাবু শ্যামাচরণবাবুর বাড়িতে অন্যান্য ভাইদের সহিত গল্প করিতেছেন। রাজকৃষ্ণবাবুকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। আমিও বসিলাম। এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত। আমার দিকে নজর পড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ছেলেটি কে?

বঙ্কিমচন্দ্র জানিলেন আমি ব্রাহ্মণ। নৈহাটিতে থাকি। সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া এইবার বি. এ. পাশ করিয়াছি। বলিলেন, আমাদের এখানে আস না কেন? আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, সঞ্জীববাবুর ভয়ে। তাঁহারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, আমার ভয়ে? কেন?

'শুনিয়াছি কামিনী ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন।'

হাসির মাত্রা বাড়িয়া গেল। বাবার নাম জানাইতে বঙ্কিমবাবু আশ্চর্য হইলেন। আমার দাদার সমবয়সী বঙ্কিমবাবু। ভাবী ভাব ছিল। দাদার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল।

কথার ফাঁকে রাজকৃষ্ণবাবু বলেন, হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে একটি পুরস্কার পাওয়া রচনা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিবার জন্য। সংস্কৃত কলেজে এক প্রতিযোগিতায় এই পুরস্কার পাইয়াছে। আপনাকে ছাপাইয়া দিতে হইবে।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, বাংলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে যারা সংস্কৃওয়ালা। তারা তো নিশ্চয়ই নদনদী পর্বত কন্দর লিখিয়া বসিবে। শেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'নন্দের ভাই বাংলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হউক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।'

এই চিত্তাকর্ষক ঘটনার পরে হরপ্রসাদের লেখাটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হল এবং এভাবেই উভয় সারস্বত পুরুষের দীর্ঘ সম্পর্কের সূত্রপাত।

এরপর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে হরপ্রসাদ প্রতি মাসে বঙ্গদর্শনের জন্য লেখা পাঠাতেন। বলা চলে এই ভাবে হরপ্রসাদের সাহিত্যজীবন পুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে হরপ্রসাদ সভাপতি হিসেবে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে তিনি নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যরূপে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'তিনি আমার জীবনের Friend, Philosopher and guide ছিলেন।'

বিভিন্ন সময়ে হরপ্রসাদ ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং আজীবন পুঁথি সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এজন্য তাঁকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে, নানা বিদ্যাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়েছে।

পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের জন্য নেপাল তিব্বত প্রভৃতি রাজ্যেও তাঁকে একাধিকবার পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। নেপাল থেকেই ১৯০৭ খ্রিঃ তিনি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিশ্চয় উদ্ধার করেন। এছাড়া সরোহূবজ্র রচিত দোহাকোষ, কাহ্নপাদ রচিত দোহাকোষ ও সংস্কৃতে রচিত ডাকার্ণব—এই কয়খানি গ্রন্থও তিনি সেখানেই পেয়েছিলেন এবং পরে 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে তাঁর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।

ঐতিহাসিক গবেষণা-সংক্রান্ত কাজের জন্য দেশে বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন হরপ্রসাদ। তিনি লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি সদস্য ছিলেন। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠায় গৌরবান্বিত ছিল তাঁর জীবন। ১৯৩১ খ্রিঃ ১৭ নভেম্বর এই গৌরবোজ্জ্বল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদ সম্পর্কে এক জায়গায় উক্তি করেছেন, "অনেক পন্ডিত আছেন তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না। তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতু পিন্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেননি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিলেন। তাই স্থূল পান্ডিত্য নিয়ে বাঁধামত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই। অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশি মার্কস পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।"

গবেষণামূলক তত্ত্বানুসন্ধান ও প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং শাসনতন্ত্র বিষয়েও মননশীল প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন হরপ্রসাদ। তাঁর রচিত ৫২টি নিবন্ধের মধ্যে ঐতিহাসিক নিবন্ধের সংখ্যাই অধিক।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল বাল্মীকির জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, কাঞ্চনমালা (উপন্যাস), বেনের মেয়ে (উপন্যাস), সচিত্র রামায়ণ, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি।

ইংরেজী নিবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Magadhan Literature, Sanskrit Culture in Modern India, Discovery of Living Buddhism in Bengal প্রভৃতি।

এছাড়াও একাধিক গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন।

রাজনারায়ণ বসু

বাঙ্গালীর সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম ও স্বদেশ ভাবনার সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর নাম নানাভাবেই যুক্ত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচর্যাও ছিল আদর্শ স্থানীয়। তাই সেকালে তিনি ঋষি আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন।

১৮২৬ খ্রিঃ ৭ সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে বিখ্যাত বসু পরিবারে রাজনারায়ণের জন্ম। তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ অনুগত এবং কিছুকাল রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছিলেন।

আদি নিবাস কলকাতায় হলেও রাজনারায়ণের প্রপিতামহ শুকদেব বসু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে গৃহ নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন।

ইংরেজরা গোবিন্দপুরে কেল্লা নির্মাণের কাজ শুরু করলে বসু পরিবারকে বোড়ালে উঠে যেতে হয়েছিল। অবশ্য কলকাতার বাসস্থানের বদলে ইংরেজরা তাঁদের বাহির সিমলাতে বসবাসের জমি দিয়েছিল।

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, রামমোহন রায় ছিলেন তার অগ্রণী পুরুষ। রাজনারায়ণের পিতা রামমোহনের সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ধর্ম বিষয়ে উদার ভাব লাভ করেছিলেন।

তাঁদের বোড়ালের বাড়িতে রাজা প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। ফলে সমগ্র পরিবারটিই সংস্কারমুক্ত আধুনিক প্রগতিবাদী চিন্তার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছিল।

এই পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই রাজনারায়ণের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ সম্পন্ন হয়েছিল। বাল্য বয়সেই তিনি সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি ও সাধারণ বাংলা শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ কণ্ঠস্থ করেন।

পিতার সঙ্গে তিনি কলকাতায় আসেন সাত বছর বয়সে এবং স্থানীয় এক পাঠশালায় ভর্তি হন। পরে বউবাজার অঞ্চলের একটি স্কুলে পড়াশুনা করেন।

তৎকালের স্কুল সোসাইটি ইংরাজি শিক্ষাদানের জন্য হেয়ার সাহেবের তত্ত্বাবধানে যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল, পরবর্তী সময়ে হেয়ার সাহেবের নামেই সেই স্কুলের নাম হেয়ার স্কুল হয়েছিল। কিছুদিন স্কুলে পড়াশুনা করে রাজনারায়ণ এই হেয়ার স্কুলে এসে ভর্তি হন।

এই স্কুলে তিনি শিক্ষকরূপে পেয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি ছিলেন ইংরাজি সাহিত্যের শিক্ষক।

রাজনারায়ণ বাল্যবয়স থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল অসাধারণ। এ কারণে স্কুলের পাঠ্য বইয়ের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ের বই তাঁর পাঠসহচর হয়ে উঠেছিল। এইভাবেই একসময় তাঁর হাতে পড়ে Chevalier Ramsay রচিত Travels of Cyrus নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তিনি পাঠ করেছিলেন এবং পরিণামে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি আস্থা হারিয়েছিলেন।

ছাত্র হিসেবে রাজনারায়ণ বরাবরই ছিলেন মেধাবী। তাই সহপাঠী ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই হয়ে উঠেছিলেন প্রিয়পাত্র।

স্কুলের পড়া শেষ করে ১৮৪০ খ্রিঃ তিনি ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে। এই কলেজেরই পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ নাম হয়েছে।

এখানে তিনি সহপাঠী হিসেবে যেসব প্রতিভাশালী তরুণদের পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি করেছেন।

মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর— এঁরা সকলেই ছিলেন রাজনারায়ণের সহপাঠী। কলেজের অধ্যাপকরাও সকলেই ছিলেন কৃতী। ফলে এই পরিবেশে স্বভাবতই তাঁর জ্ঞানস্পৃহা আরও বৃদ্ধি পেল।

তৎকালের হিন্দু কলেজ ছিল নব্য বাংলার প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার পোষক। প্রচলিত রীতিনীতি ভঙ্গ করে স্বেচ্ছাচারী হওয়াটাই প্রগতিশীলতার পরকাষ্ঠা

বলে মনে করত এখানকার ছাত্ররা। এই ছাত্রসমাজই আখ্যায়িত হয়েছে ইয়ং বেঙ্গল নামে।

আর এই ইয়ং বেঙ্গলের প্রাণপুরুষ ছিলেন বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও।

মুক্ত চিন্তা ও যুক্তিবাদের নামে ছাত্রদের মধ্যে এই বিকৃত ক্রিয়াকলাপ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুফল ডেকে আনত তা না বললেও চলে।

রাজনারায়ণও সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন। কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠে নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজন ও মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

মদ্যপানে এতটাই আসক্তি তাঁর বেড়ে গেল যে অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। টানা ছয় মাস তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। ফলে কলেজের পড়া আর এগুলো না।

কলেজে পড়ার সময়েই রাজনারায়ণ বিবাহ করেছিলেন। অস্বাস্থ্যের কারণে কলেজ ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যেই জলে ডুবে অকালে স্ত্রী প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর বিয়োগ ব্যথা সামলে উঠবার আগেই এলো আর এক আঘাত। পিতা নন্দকিশোর বসু পরলোকে গমন করলেন।

পরপর শোকের আঘাতে চেতনা ফিরে এলো তাঁর, স্বভাবের উশৃঙ্খলতা দূর হল। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসও ফিরে পেলেন। তাঁর পিতা ছিলেন রামমোহন রায়ের শিষ্য। তিনিও ১৮৪৬ খ্রিঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

পরের বছরেই, একুশ বছর বয়সে, রাজনারায়ণ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী ছিলেন হিন্দু পরিবারের কন্যা। কিন্তু স্বামী অনুগতা পত্নী বিবাহের পর স্বামীর ধর্মকেই গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা হয়েছিলেন সুখী ও আদর্শ দম্পতি।

রাজনারায়ণ তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক হয়েছিলেন। সন্তানদের সকলকেই তিনি উপযুক্ত শিক্ষায় মানুষ করে তুলেছিলেন। কন্যাপক্ষে তিনি যে দৌহিত্র-দোহিত্রী লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন মনোমোহন, শ্রী অরবিন্দ ও বিপ্লবী বারীন ঘোষ প্রমুখ স্বনামখ্যাত ইতিহাস-পুরুষগণ। এঁদের সকলেই তাঁর স্নেহের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দিয়ে ১৮৪৬ খ্রিঃ থেকে ১৮৪৯ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজনারায়ণ উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের কাজ করেছিলেন।

১৮৪৯ খ্রিঃ তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই কাজ তিনি বেশিদিন করেন নি। ১৮৫১ খ্রিঃ গোড়ার দিকে সংস্কৃত

কলেজের কাজ ছেড়ে মেদিনীপুর সরকারি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য এই স্কুলটির তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। দুইজন শ্বেতাঙ্গর পরিচালনায় চলছিল স্কুলটি। প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে রাজনারায়ণ স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করলেন। প্রচলিত অনেক ব্যবস্থারই পরিবর্তন ঘটালেন তিনি।

গোড়ার দিকে ছাত্রদের শারীরিক শাস্তিদানের পক্ষপাতি ছিলেন রাজনারায়ণ। পরে তিনি উপলব্ধি করেন শারীরিক পীড়নের ফলাফল শুভ ও স্থায়ী হয় না। পরিবর্তে ভালবাসা দ্বারা তাদের হৃদয় জয় করতে পারলে তার ফল হয় অধিক ফলপ্রসূ। তারপর থেকে সেইভাবেই ছাত্রদের পরিচালিত করতেন। ছাত্রদের মানসিক উন্নতি ও জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য তিনি স্কুলে বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া নতুন করে একটি পাঠাগারও স্থাপন করেছিলেন।

তাঁর এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায় ছাত্রদের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁরা যশস্বী ও কৃতী হয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

দীর্ঘ আঠারো বছর মেদিনীপুর স্কুলে শিক্ষকতা করে ১৮৬৮ খ্রিঃ তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনারায়ণের প্রভূত অবদান ছিল। এখানেই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতার ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সহ বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম মেদিনীপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ কলকাতায় যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন রাজনারায়ণ। তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুরেও সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছে গিয়েছিল। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরেও তিনি তাঁর প্রিয় কর্মক্ষেত্র মেদিনীপুরেই থেকে গিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সেখানে তিনি শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন তিনি।

রাজনারায়ণ ছিলেন বিধবা বিবাহের অন্যতমন পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজের পরিবারেই জেঠতুতো ভাই দুর্গাচরণ বসু এবং সহোদর মদনমোহন বসুকে বিধবা কন্যা বিবাহ করান।

এই কাজের জন্য সমাজের অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন তাঁকে হতে

হয়েছিল। মেদিনীপুর ও বোড়াল গ্রামের অনেক লোকই তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিল। এমনকি মায়ের তিরস্কারও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল।

কিন্তু সকল অভিযোগ-অনুযোগ তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে কখনো বিচ্যুত হননি।

রাজনারায়ণ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তিনি মনে করতেন দেশীয় ভাষা চর্চার দ্বারাই দেশের মানুষের ও দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব।

দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার আয়োজন করেন।

রাজনারায়ণের পরিকল্পনায় উদ্দীপিত হয়ে নবগোপালন মিত্র ১৮৭৫ খ্রিঃ হিন্দু মেলার পত্তন করেন। এই মেলার উদ্দেশ্যে ছিল দেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলা।

সেইকালে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেশীয় ভাষার প্রতি অবজ্ঞা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে বাংলা বলতে তাঁরা লজ্জা বোধ করতেন। ইংরাজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিই ছিল তাঁদের যত আকর্ষণ ও পক্ষপাতিত্ব। রাজনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যগণ এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন যে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপে ও চিঠিপত্রাদিতে কখনও কোন ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করবেন না। যদি কেহ ভুল বশতঃও কথা বলার সময় বাংলার সঙ্গে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করে ফেলতেন তাঁকে প্রতিটি ইংরাজি বাক্য বা শব্দের জন্য এক পয়সা করে জরিমানা দিতে হত।

রাজনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত সভার তত্ত্বাবধানে পরে স্থাপিত হয়েছিল ন্যাশনাল স্কুল। সেখানে রসায়ন, সার্ভে, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যায়াম, অশ্বারোহন ও বন্দুক চালনা শেখানো হত।

সুরাপান নিবারণী সভা নামে আরও একটি উল্লেখযোগ্য সভা রাজনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজেই যৌবনে সুরা পানে আসক্ত হয়েছিলেন এবং তার পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন।

হৃদয়ে ধর্মভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে তিনি সমস্ত প্রকার কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সভার মাধ্যমে জনসাধারণকে কুফল সম্পর্কে অবহিত করে মদ্যপান থেকে বিরত করার জন্য তিনি সচেষ্ট হন।

এই সভার প্রচারের ফলে মেদিনীপুরের অনেক লোক চিরতরে মদ্যপান ত্যাগ করেছিল।

সমাজের কাজে অবিরত অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে রাজনারায়ণের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছিল। দৃষ্টিশক্তিও আসছিল ক্ষীণ হয়ে।

কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় কিছুদিন বিশ্রামের জন্য তিনি বোড়ালে যাওয়ার মনস্থ করলেন। কিন্তু বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে জড়িত থাকার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর আর সেখানে যাওয়া হয়ে উঠল না। তিনি প্রথমে গেলেন ভাগলপুরে জ্যেষ্ঠ জামাতা কৃষ্ণধনের বাড়িতে। পরে সেখান থেকে কিছুদিন এলাহাবাদ, লখনউ ও কানপুরে বসবাস করেন।

কানপুরে থাকাকলীনই রাজনারায়ণ সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি প্রসিদ্ধ রামনাথ কবিরাজের চিকিৎসাধীন থেকে রোগপীড়ার উপশম লাভ করেন। এইকালে তিনি দশবছর কলকাতায় অবস্থান করেন।

ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হলে তিনি তার সভ্য হন। গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি সঞ্জীবনী সভারও তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। এই সভাই ছিল বাঙলার বিপ্লবী সংগঠনের অগ্রদূত।

রাজনারায়ণ যখন যেখানে গেছেন, নানা উপলক্ষে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা করে জনসাধরণের হৃদয় জয় করেছেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি বহু পত্রপত্রিকায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তৎকালীন জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সোমপ্রকাশ লিখেছিল, 'হিন্দু সমাজ ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহা রক্ষা করিলেন।'

স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ খ্রিঃ রাজনারায়ণ দেওঘর যান এবং বাড়ি নির্মাণ করে জীবনের অবশিষ্টকাল সেখানেই অতিবাহিত করেন।

এখানে এসেও দেশের কল্যাণ চিন্তায় তিনি মগ্ন থাকতেন। নির্জন বাসের ফলে আধ্যাত্মিক বিষয়েও তিনি উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। এই সময় দেওঘরে তিনি 'দোসরা বৈদ্যনাথ' নামে আখ্যাত হতেন। সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরই শ্রদ্ধা প্রীতি লাভ করেছিলেন তিনি।

উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন রাজনারায়ণ। আত্মচরিত, সেকাল আর একাল, হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত, সায়েন্স অব রিলিজিয়ন, রিলিজিয়ন অব লাভ ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও তিনি ইংরাজিতে ব্রাহ্ম ধর্ম ও আদি ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন।

বাংলার জাতীয় জাগরণের উদ্‌গাতা, বঙ্গ সংস্কৃতির পুরোধা পুরুষ ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু ১৮৯৯ খ্রিঃ ৭৩ বছর বয়সে দেওঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন প্রাণ লাভ করেছিল যে কজন মানবহিতৈষী মনীষীর প্রেরণা ও কর্মোদ্যোগে, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অন্তরে গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস ও মানব সেবার ব্রতকে আদর্শ করে দেশ ও সমাজের কাজে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

১৮৪৭ খ্রিঃ ৩১ জানুয়ারী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম হয়েছিল শিবনাথের। তাঁর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ।

বাল্যবয়সে মাতামহীর স্নেহ ছায়ায় লালিত হয়েছিলেন শিবনাথ। এই মাতামহী সম্পর্কে আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন, 'আমার মাতামহীর ন্যায় ব্রাহ্মণকন্যা বিরল। বলিতে কি তাঁহাকে আমি যখন স্মরণ করি, আমার হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয় এবং একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমাতে যা কিছু ভাল আছে তাহার অনেক অংশ তাঁহাকে দেখিয়া পাইয়াছি।'

শিবনাথের মাতা গোলকমণি ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী ও ধর্মভাবাপন্ন। সেই যুগে মেয়েদের শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না। তাই বিবাহের পূর্বে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা পিতৃগৃহে মায়ের কাছেই হয়েছিল।

পাঁচ বছর বয়সে মজিলপুর গ্রামের পাঠশালায় শিবনাথের স্কুল জীবনের শুরু। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিদিনের সমস্ত পাঠ তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত।

স্কুলের পাঠ শেষ হবার আগেই মাত্র নবছর বয়সেই ঘটনাচক্রে শিবনাথকে শিক্ষকতার কাজ শুরু করতে হয়েছিল। সে এক মজার ঘটনা।

শিবনাথের ছাত্রীটি ছিলেন তাঁর পিতার সম্পর্কিত খুড়ি। বিধবা এই যুবতী তাঁর পাঁচগুণ বয়সে বড়। তাঁকে বর্ণপরিচয় পড়াতেন শিবনাথ।

ভবিষ্যতের শিক্ষক জীবনের হাতেখড়ি তাঁর এভাবেই হয়েছিল বলা চলে।

তাঁর যখন একুশ বছর বয়স, তখনও জুটেছিল এক ছাত্রী। বয়সে তাঁর দিগুণ এই ছাত্রীটি ছিলেন তাঁর বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের ভাগ্নী। তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মী। কথাবার্তা, আলোচনার ফাঁকে তাঁকে তিনি শেখাতেন বাংলা ও ইংরাজী।

গ্রাম্য পরিবেশে শিবনাথের শৈশব ছিল মুক্ত, আনন্দময়। মনের আনন্দে তিনি খোলা মাঠে ঝোপেঝাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। কীট-পতঙ্গ পশু-পাখীর জীবন পর্যবেক্ষণ করতে ভালবাসতেন। সুযোগ পেলেই খাঁচায় ভরে পাখি পুষতেন। দোয়েল, টুনটুনি, বুলবুলি এসব ছোট পাখি খুব ভালবাসতেন তিনি। পিঁপড়ে ফড়িং ইত্যাদি ধরেও পোষার চেষ্টা করেছেন।

মুক্ত প্রকৃতির কোলে ললিত হয়ে শিবনাথের মনটিও হয়ে উঠেছিল উদার। ভবিষ্যতের সংস্কারমুক্ত মনন ও চিন্তার বীজ মুক্ত প্রকৃতিই যেন তাঁর মধ্যে এভাবে উপ্ত করে দিয়েছিল।

গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করে শৈশবে কলকাতায় পড়তে এলেন শিবনাথ। মামার বাড়িতে থেকে ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজে।

সহরের পরিবেশ ছিল কলুষমাখা। মামাবাড়িতে যাদের সঙ্গে তাঁকে থাকতে হত, তাদের অনেকেরই নৈতিক চরিত্র বলে কিছু ছিল না। এদের সঙ্গে একত্র বসবাস করেও তিনি কখনো প্রভাবিত হননি। তিনি তাঁর পড়াশুনা ও নিজের চিন্তা নিয়ে মগ্ন থাকতেন।

এই বাড়ির এক ঘরে থাকতেন এক চিত্রকর। সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে শিল্পী তাঁর ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। শিল্পীর শিল্পকর্ম শিবনাথকে আকর্ষণ করত। স্কুল থেকে ফিরে এসেই তিনি চলে যেতেন চিত্রকরের ঘরে। বসে বসে নিবিষ্ট হয়ে দেখতেন শিল্পীর অঙ্কন কৌশল। কখনও বা তাঁর কোন ছবি নিয়ে চিন্তায় ডুবে যেতেন।

আত্মচরিতে এই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'আমার ছবি দেখার নেশা সেই অবধি অদ্য পর্যন্ত যায় নাই। আমাকে উৎকৃষ্ট ছবির মধ্যে রাখিয়া দিলে বোধ হয় আহার নিদ্রা ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকিতে পারি।'

সেই শৈশবে শিল্প ও শিল্পীর প্রতি যে প্রগাঢ় ভালবাসার জন্ম হয়েছিল শিবনাথের অন্তরে তা অধিক বয়স পর্যন্ত চির জাগরুক ছিল।

১৮৯৯ খ্রিঃ একটি ঘটনা থেকে তাঁর এই মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রখ্যাত শিল্পী শশিকুমার হেস সেই সময় রাজা মাহারাজা ও মনীষীদের প্রতিকৃতি এঁকে দেশে বিদেশে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। একসময় তিনি রবীন্দ্রনাথেরও একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন।

১৮৯৯ খ্রিঃ শশিকুমার লন্ডনে বসবাসকালে আতালি ফ্লাঁমা নামে জনৈকা ফরাসি বিদুষী মহিলার সঙ্গে বাগদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কিন্তু দেশে ফিরে এসে এই বিবাহের ব্যাপারে পরিবার ও সমাজেব বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল। ফলে এই বিবাহ ভেঙ্গে যায় এবং শিল্পী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই পরিস্থিতিতে শশিকুমারের সহযোগিতার জন্য সমাজের গণমান্য অনেকের সঙ্গে এগিয়ে এলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি শশিকুমারের ভাবী বধূ আতালি ফ্লাঁমাকে নিজ গৃহে রেখে ব্রাহ্মসমাজের প্রথা অনুযায়ী বিবাহের বন্দোবস্ত করলেন। সেই বিবাহে সানন্দে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

শশিকুমার ও আতালির বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল বেনেটোলা অঞ্চলের সিটি স্কুলে। বহু মান্যগণ্য ব্যক্তির সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজেরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন বিবাহ সভায়। আচার্য হিসাবে বিবাহের কাজ শিবনাথ সম্পন্ন করেছিলেন ইংরাজি ভাষায়।

১৯০০ খ্রিঃ তৎকালীন এক সংবাদপত্রে এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল, ''An interesting ceremony of marriage was held last evening in the Hall of 45 Beniatolah Lane between Mr. S. K. Hesh, the celebrated painter .... and Mademoiselle Flamant, a French lady, who was come out to this country .... They made each other acquaintance some two years back at Paris and their attachment led to a formal engagement in London.

Mademoiselle Flamant was a guest of Dr. J. C. Bose for several months. More than two months ago she was initiated into Bramoism by Pandit Sivanath Sastri who was now joined them in holy wedlock. The gests was filled with a large crowd of guests with a sprinkling of European visitors. The serrice and sermon were in English.''

শিবনাথ যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হলেন, সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। বঙ্গীয় সমাজে তখন সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ।

শিবনাথ জন্মেছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে সেকালে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার ও অর্থহীন আচার-আচরণ বিষয়ে তাঁর মন ছিল বিরূপ। তাই কলকাতায় আসার পরে সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হল। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে হতে হয়েছিল পিতার বিরাগভাজন।

তবে মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের স্নেহ ও আদর থেকে তাঁকে কখনো বঞ্চিত হতে হয়নি।

নানাভাবে পাঠ্যজীবন বাধাপ্রাপ্ত হলেও এবং নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শিবনাথ পড়াশুনায় বরাবরই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৮৬৬ খ্রিঃ থেকে ১৮৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এন্ট্রান্স ও এফ. এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সংস্কৃতে এম.এ পাস করে তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে ১৮৭৩-৭৪ খ্রিঃ তিনি তাঁর মামা দ্বারকানাথের বিখ্যাত সোমপ্রকাশ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। স্বাস্থ্যের কারণে দ্বারকানাথ সেই সময় কাশীতে অবস্থান করছিলেন।

এরপরে শিক্ষকতার চাকরি নিলেন কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত আশ্রমের মহিলা বিদ্যালয়ে। মাইনে ছিল নামমাত্র—১০ টাকা। এখানে কাজ করার সময়েই তাঁর পরিচয় হয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে। তিনিও তখন যুক্ত হয়েছেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে। এভাবে ক্রমেই ব্রাহ্মদের সংস্পর্শে এসে শিবনাথ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে হরিণাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির কাজে মনোযোগী হলেন।

ছাত্র ও শিক্ষকদের আদর্শ ও নীতিবোধ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন শিবনাথ। তাই সর্বাগ্রে তিনি নজর দিলেন স্কুলের নৈতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার দিকে।

স্কুলের এক মাষ্টারমশায় যাত্রা দলের সং সাজতেন। আদর্শের প্রতি অবিচল শিবনাথ এতে আপত্তি না জানিয়ে পারলেন না।

ফল হল বিপরীত। প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হল তাঁকে। অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়লেন মামলায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মামলায় তিনিই জয়ী হলেন। বিরোধীপক্ষকে আদর্শের কাছে মাথা নত করে হার স্বীকার করতে হল।

১৮৭৪ খ্রিঃ তৎকালীন স্কুল ইন্সপেকটর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশে শিবনাথ প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিয়ে চলে এলেন ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলে। ১৮৭৬ খ্রিঃ পর্যন্ত পুরো দুই বছর তিনি এই স্কুলে কাজ করেন।

শিবনাথের বিবাহ সম্পর্কে এবাবে কিছু বলা যাক। তৎকালীন হিন্দুসমাজ ও কুলপ্রথা অনুসারে ১২-১৩ বছর বয়সেই শিবনাথের বিবাহ হয়েছিল। তখন তিনি কলকাতায় মাতুলালয়ে থেকে পড়াশুনা করতেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম ছিল প্রসন্নময়ী।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিয়ে পাঁচ বছর পরেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রসন্নময়ী ও তাঁর পরিবারের প্রতি বিরূপ হওয়ায় শিবনাথের পিতৃদেব হরানন্দ তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

পরে তিনি পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন বর্ধমানের অভয়চরণ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠাকন্যা বিরাজমোহিনীর সঙ্গে। এই বিয়ে হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রিঃ।

পিতাব পীড়াপীড়িতে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মত হতে হয়েছিল শিবনাথকে। কিন্তু বিয়ের পর অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন তিনি।

ইতিমধ্যে উভয় পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় প্রসন্নময়ী আবার শ্বশুরগৃহে ফিরে আসেন।

দুই স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে বাস করলেও বিরাজমোহিনীর জীবন ছিল স্বামীসুখ বঞ্চিত। শিবনাথ কোনদিনই তাঁর সঙ্গে পতিসুলভ ব্যবহার করেননি। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান এবং নিষ্ঠাবতী যোগিনীর মতোই ছিল তাঁর জীবনযাত্রা।

স্বামীসুখে বঞ্চিত হলেও এই হৃদয়বতী মহিলা সপত্নীর পুত্রকন্যাদের মাতৃস্নেহে লালন পালন করেছেন।

প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হলে তিনি স্বামীর সঙ্গেই নিষ্কামভাবে বসবাস করেন।

বিরাজমোহিনী ছিলেন শিবনাথের আদর্শ সহধর্মিনী। তিনি তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায়ও যোগ দিতেন।

একবার কলকাতায় এলে হরানন্দ শিবনাথকে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতে নিষেধ করেন। কিন্তু শিবনাথ পিতৃআজ্ঞা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারলেন না।

হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাবাদের প্রতিও শিবনাথ বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তিনি পরিবারের বিগ্রহ পূজা করতেন না। এইসকল ব্যাপারে হরানন্দ পুত্রের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হলেন।

শিবনাথ হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথাও মানতেন না। কিছুকাল পরে জাত্যাভিমানের চিহ্ন পৈতাও চিরতরে পরিত্যাগ করে প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

সেইকালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করে দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। শিবনাথ কেশব সেনের নববিধান দলে যোগ দিলেন।

পুত্রের স্বধর্মত্যাগের সংবাদ পেয়ে হরানন্দ পুত্রকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেন। কেবল এখানেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি। পুত্র বাড়িতে এলে তাকে বাধা দেবার জন্য তিনি মাইনে দিয়ে গুন্ডা পুষেছিলেন।

মাতৃঅন্তপ্রাণ শিবনাথ মাকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে লুকিয়ে মজিলপুরে যেতেন।

১৮৬৮ খ্রিঃ শিবনাথের প্রথম সন্তান হেমলতার জন্ম হয়।

কেশবচন্দ্র ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। এই সভার কাজে শিবনাথ ছিলেন তাঁর একান্ত সহযোগী।

হিন্দু মেয়েদের বিবাহের বয়সের প্রশ্নে শিবনাথের ব্যক্তিগত জীবনেই তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করে তিনি এই বিষয়টির সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করলেন। বস্তুতঃ জ্ঞান-বুদ্ধি বিকশিত হবার পূর্বেই সেইকালে কন্যাদের পাত্রস্থ করা হত। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্ভাগ্য বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা হত তাদের চিরসঙ্গী।

মেয়েদের বিবাহের বয়স নিরূপণের বিষয়টি ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের কর্মতালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হল।

এই বিষয়ে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিপ্রায়ে কেশব সেন ভারতে মেয়েদের বিয়ের বয়স কী হওয়া উচিত তা জানার জন্য দেশের বিখ্যাত সকল ডাক্তারকেই চিঠি লেখেন।

এ বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানিয়ে স্বদেশী বিদেশী সকল ডাক্তারই লেখেন, মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৪ থেকে ১৬ ধরা উচিত।

ডাক্তারদের মতামতের ভিত্তিতে আন্দোলন করে কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতা ১৮৭২ খ্রিঃ একটি আইন পাস করান। এই আইন বলে ১৪ বছরই মেয়েদের বিয়ের বয়স বলে ধার্য হয়।

১৮৭৬ খ্রিঃ ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিয়ে শিবনাথ হেয়ার স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে যোগ দেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য দুই বছর পরেই সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

নারী-মুক্তি আন্দোলনে শিবনাথ কেশবচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। কিন্তু মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি যখন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আন্দোলন শুরু করেন, কেশবচন্দ্র তার বিরোধিতা করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রকে অগ্রাহ্য করেই শিবনাথ হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় বা বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৭৭ খ্রিঃ শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগী তরুণদের নিয়ে ঘনবিশিষ্ট নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করেন। জাতীয়তা মূলক ও সমাজ-সংস্কারমূলক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিকল্পনা এই সমিতির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিবনাথের এই গুপ্ত সমিতিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু যোগ দিয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী এই গুপ্ত সমিতির অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল, জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার, সরকারি চাকরি পরিত্যাগ ও সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা। সমিতির সভ্যদের নিয়মিতভাবে অশ্বারোহন ও বন্দুকচালনাও শিক্ষা দেওয়া হত।

১৮৭৮ খ্রিঃ কুচবিহারের রাজপবিবারে কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভাঙ্গন ধরে। শিবনাথের নেতৃত্বে এই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই সময় থেকে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সমাজ সংস্কারের কাজেও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে শিবনাথ আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে ১৮৭৯ খ্রিঃ সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

একই বছরে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় স্টুডেন্টস সোসাইটি নামে একটি গণতান্ত্রিক ছাত্র প্রতিষ্ঠান।

১৮৮৮ খ্রিঃ শিবনাথ ছয় মাসের জন্য বিলাত গমন করেন। বিলাতে অবস্থান-কালে Journal of National Indian Association নামক স্থানীয় একটি পত্রিকায় শিবনাথের লিখিত মেজবউ উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল বিলাতি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত বাংলা উপন্যাস।

বিলাত থেকে ফিরে শিবনাথ ১৮৯২ খ্রিঃ সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম ও জনসমাজের সেবায় যথার্থ উৎসাহী, বৈরাগ্যভাবাপন্ন বিশ্বস্ত কর্মী গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাধনাশ্রম।

সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে শিবনাথকে। শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হতে লাগলেন। অবশেষে শয্যা নিলেন।

১৯১৯ খ্রিঃ ৩০ সেপ্টেম্বর লোকসেবক অক্লান্তকর্মা শিবনাথ পরলোক গমন করেন।

তাঁর রচিত সাহিত্য বিপুল। 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' তথ্যমূলক অতিমূল্যবান গ্রন্থ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নির্বাসিতের বিলাপ, বিধবার ছেলে, যুগান্তর, নয়নতারা, ধর্মজীবন, History of the Brahmo Samaj, Men I have seen প্রভৃতি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর পরাধীন ভারতে প্রথম যে জাতীয় কবি স্বাধীন ভরতের জাতীয় সংহতির স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুসূদনের পর হেমচন্দ্রকেই বলা হয় বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় মহাকবি।

মধুসূদনের অকাল মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "মহাকবির সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ-সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গ কবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখনও রোদন করিব না।"

বস্তুত উনিশ শতকের বাংলার শীর্ষস্থানীয় কবিযুগলের নাম হল মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রই তাঁর লেখার মাধ্যমে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীকে অধীনতার পাশ ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৮৩৮ খ্রিঃ ১৭ এপ্রিল হুগলি জেলার গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে হেমচন্দ্রের

জন্ম। তাঁর পিতা কৈলাসচন্দ্রের আদি নিবাস ছিল উত্তরপাড়ায়। বিবাহের পর থেকে তিনি শ্বশুরালয়েই বাস করতেন।

কৈলাসচন্দ্র ও আনন্দময়ীর ছয় পুত্রকন্যার মধ্যে হেমচন্দ্রই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। শৈশবে মামার বাড়ির গ্রামের পাঠশালাতেই শিক্ষারম্ভ হয় তাঁর। নয় বছর বয়সে তিনি দাদামশায়ের কাছে তাঁর খিদিরপুরের বাড়িতে চলে আসেন এবং এখানেই পড়াশুনা শুরু করেন।

ছেলেবেলা থেকেই হেমচন্দ্র ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। তাঁর অন্তর ছিল অত্যন্ত কোমল। পরের দুঃখ দেখলে প্রাণ কেঁদে উঠত।

ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন মেধাবী। বিভিন্ন বিষয় জানার আগ্রহ ছিল প্রবল। তাই জ্ঞান বুদ্ধিতে সহপাঠীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। পড়াশুনাতে বরাবরই তিনি বৃত্তি লাভ করেছেন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৫৯ খ্রিঃ হেমচন্দ্র বি.এ. পাস করেন। কিছুকাল তিনি মিলিটারি অডিটর জেনারেলের অফিসে কেরানির কাজ করেন। পরে কলকাতা ট্রেনিং একাডেমির প্রধান শিক্ষকের পদে চাকরি গ্রহণ করেন।

১৮৬১ খ্রিঃ এল. এল. পাস করার পরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৮৬২ খ্রিঃ মুন্সেফ পদ পেয়ে প্রথমে শ্রীরামপুরে ও পরে হাওড়ায় মুন্সেফের কাজ করেন। তারপর পুনরায় ওকালতির কাজে হাইকোর্টে ফিরে আসেন এবং ১৮৬৬ খ্রিঃ বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯০ খ্রিঃ হেমচন্দ্র সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। এই সময়ে আইন বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরাজি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে তিনি সরকারের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা পুরস্কার পান।

হাইকোর্টে আইন ব্যবসা থেকে প্রচুর অর্থাগম হত হেমচন্দ্রের। দেড়শো বছর আগে মাসিক তিন হাজার টাকা আয় থেকেই বোঝা যায় ওকালতিতে তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন।

হেমচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয়, তিনি বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি। ওকালতির সদাব্যস্ত জীবনে যেটুকু অবসর তিনি পেতেন সাহিত্য সাধনায় তা ব্যয় করতেন। কিন্তু পরে এমন একটা সময় উপস্থিত হল যখন আইনের কচকচি তাঁর কাছে নিতান্তই নীরস বলে বোধ হল। কাব্য সাধনাতেই তাঁর মন অধিকতর আকৃষ্ট হল।

১৮৬৪ খ্রিঃ ছাব্বিশ বছর বয়সে হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগুচ্ছ চিন্তা তরঙ্গিনী প্রকাশিত হল। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কবিখ্যাতি লাভ করেন।

দুই বন্ধুর পরপর অকাল মৃত্যুর ঘটনায় মর্মাহত কবি রচনা করেছিলেন চিন্তা তরঙ্গিনী গ্রন্থ। প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব নজির।

হেমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন একুশ বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। আর তেইশ বছর বয়সে তাঁরই লেখা কাব্যগ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হল। কবির পক্ষে এই অভূতপূর্ব ঘটনা যেমন আনন্দের গৌরবের তেমনি সৌভাগ্যের বিষয়। বস্তুতঃ ঘটনাটি ছিল হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার স্বীকৃতি।

এর চাইতেও আরও বড় স্বীকৃতি অপেক্ষা করছিল হেমচন্দ্রের জন্য। চব্বিশ বছর বয়সে হেমচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ৩৮ বছর বয়স্ক মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য আত্মপ্রকাশ করল।

মেঘনাদ বধ কাব্যগ্রন্থের জন্য মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। তেমনি হেমচন্দ্র চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর বৃত্রসংহার কাব্যের জন্য। এই গ্রন্থে তিনি পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

সময়ের বিচারে দেখতে গেলে সাহিত্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্র ছিলেন এক ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একই সঙ্গে মধুসূদনের সমসাময়িক আবার বঙ্কিম, নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথেরও ছিলেন সমকালীন।

রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রের কবিতা প্রথম পড়েছিলেন বিহারীলালের অবোধবন্ধু পত্রিকাতে। টানা তিন বছর ধরে এই পত্রিকায় হেমচন্দ্রের কবিতা ছাপা হয়েছিল।

একদিকে ওকালতি জগতে লক্ষ্মীর ভজনা, আবার তার পাশাপাশি সরস্বতীর সাধনা—এই দুই সাধনা একই সময়ে বজায় রাখতে গিয়ে পেশার ক্ষেত্রে ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে লাগলেন হেমচন্দ্র।

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মাসিক আয় কমে আসতে থাকে। এই সমস্যাটিকে অগ্রাহ্য করেই তিনি নিজেকে কাব্যসাধনায় নিমগ্ন রাখেন এবং কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৮৭২ খ্রিঃ এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় তিনি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বদেশীয়দের মধ্যে স্বদেশপ্রেমী কবি হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করলেও শাসক ইংরাজ সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েন।

স্বদেশ চেতনামূলক এই কবিতা প্রকাশ করার জন্য পত্রিকার সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

ভারত সঙ্গীত ছাড়াও বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে তিনি স্বদেশপ্রেম উদ্দীপক ভাব প্রকাশ করেছেন। ভারতবিলাপ, কালচক্র, বীরবাহু কাব্য, রিপন উৎসব, ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, গঙ্গা ও জন্মভূমি প্রভৃতি রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ভারতচন্দ্রের সব চেয়ে বিখ্যাত রচনা বৃত্রসংহার কাব্য। ১৮৭৫ খ্রিঃ দুই খন্ডে এই রচনা প্রকাশিত হয়।

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরন্তন প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। বৃত্রসংহার কাব্য প্রকাশিত হবার পর স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যটির সপ্রশংস সমালোচনা লিখে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

কাব্য আলোচনার এক স্থানে তিনি জগৎবিখ্যাত কবি মিলটনের সঙ্গে হেমচন্দ্রের তুলনা করেছেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন। ঃ

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—

এখানে 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিলটনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।'

বলাবাহুল্য, সাহিত্যসম্রাটের এরূপ উক্তি, তৎকালীন সময়ের ঈর্ষাকাতর নবীন কবিদের অনেকেরই মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল।

বস্তুতঃ কাব্য ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক হেমচন্দ্র তাঁর সমকালের মানুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও প্রীতি যেমন লাভ করেছেন তেমনি অনাদর, অবজ্ঞা ও ঈর্ষাও কিছু তাঁর ভাগ্যে কম জোটেনি।

হেমচন্দ্র ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক এবং সত্যের পূজারী। নানা ভাবে তাঁর কাব্যে এই ভাব উৎকীর্ণ হয়েছে। এছাড়াও নারীমুক্তি, বিশেষ করে অসহায় বিধবা রমণীর ওপর হিন্দু সমাজের হৃদয়হীন আচরণের বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কুলিন মহিলা বিলাপ কবিতাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল।

মৌলিক কাব্য রচনা ছাড়াও শ্রেষ্ঠ ইংরাজ কবিদের কবিতারও তিনি সুললিত কাব্যানুবাদ করেছিলেন। টেনিসন, ড্রাইডেন, আলেকজান্ডার পোপ প্রমুখ কবির রচনার তিনি অনুবাদ করেন যা অনুবাদকর্ম হয়েও মৌলিক রচনার স্বাদ-গন্ধী।

এই মহান কবি জীবনের শেষ পর্যায়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন এবং তাঁর শেষের দিনগুলো ছিল দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছিত।

এককালে আইন ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন হেমচন্দ্র। কিন্তু তাঁর মন ছিল উদার ও পরদুঃখকাতর। বৈষয়িক ব্যাপারেও ছিলেন অনভিজ্ঞ। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য কখনওই সচেষ্ট হন নি। তাঁর অর্জিত অর্থের একটা বৃহৎ অংশ আত্মীয়-স্বজন ও আশ্রিতদের ভরণপোষণে ব্যয়িত হত। একটা সময়ে পারিবারিক ক্ষেত্রে এমন বিপর্যয় দেখা দেয় যে হেমচন্দ্র দুঃখ শোক ও মানসিক আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন।

স্ত্রী কামিনী দেবী মধ্য বয়সে পাগল হয়ে যান। স্ত্রীকে সুস্থ করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই হয় ব্যর্থ।

এই সময়েই একের পর এক আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা তাঁকে সইতে হয়। ১৮৯৩ খ্রিঃ তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র মারা যান। কিছুদিনের মধ্যেই হেমচন্দ্রের বৈবাহিক পাইকপাড়া নিবাসী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মারা যান।

এই শোকাবহ ঘটনাগুলোর পরেই কবির শ্রদ্ধেয় সুহৃদ বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অকৃত্রিম বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি গভীর মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন।

পারিবারিক ক্ষেত্রে পুত্রদের তরফ থেকেও সুখী ও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি হেমচন্দ্র। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অল্প বয়সেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। অন্য সন্তানদের মধ্যেও বিশেষ উপার্জনশীল কেউ ছিলেন না। কবির আর্থিক অনটনের দিনে পুত্রদের কাছ থেকে কোন প্রকার সহযোগিতাই তিনি পাননি।

দুই চোখে ছানি পড়ায় ক্রমশঃ দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, তাই কবির শেষ জীবনের প্রতিটি দিন ছিল দুঃখ ক্লেশে জর্জরিত। তাঁর এই সময়ের জীবন-কাহিনী নিদারুণ এক দলিল হয়ে রয়েছে।

সাহিত্যরথী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 'অন্ধকবির শেষ কয়দিন' রচনায় লিখেছেন, 'শেষ পর্যন্ত স্থির হল কবির চোখে অস্ত্রোপচার করতে হবে। সাহেব ডাক্তার সন্ডার্স এলেন, এলেন ডাক্তার কালীচরণ বাগচী। বললেন, চোখে ছানি পড়েছে। অপারেশন করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। দুই চোখের দৃষ্টিই ক্ষীণ। ঠিক হল কবির বাম চোখেই অপারেশন করা হবে। ১৮৯৭ খ্রিঃ ২২ নভেম্বর ডাক্তার সন্ডার্স, ডাক্তার কালীচরণ বাগচীর সহায়তায় কবি হেমচন্দ্রের বাম চোখে অস্ত্রোপচার করলেন। কোন হাসপাতালে না গিয়ে খিদিরপুরে কবির দ্বিতীয় ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের নতুন বাড়িতেই হেমচন্দ্রের চোখে অপারেশন করা হয়।

সাত আট দিনের মাথায় বোঝা গেল, অপারেশন 'নট সাকসেসফুল,' বাম চোখটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। ডান চোখেও দেখেন না। কবি অন্ধ হলেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন কবি। একই সঙ্গে অসহায় বিষণ্ণ ও কাতর মর্মভেদী হাহাকার উঠল অন্তঃস্থল থেকে। নৈরাশ্যপীড়িত অন্ধ কবি ঈশ্বরকে নিবেদন করে বলেন—

বিভু কি দশা হবে আমার
একটি কুঠারাঘাত
শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন।
কবি আশা চূর্ণ করে
রাখিলে অবনী পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন।।
আমার সম্বল মাত্র
ছিল হস্ত পদ নেত্র।

অন্য ধন ছিল না এ ভবে।
সে নেত্র করে হরণ
হরিলে সর্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে।।

নেই নেই করেও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যেটুকু ছিল তাতে হেমচন্দ্রের শেষ জীবন দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত হবার কথা নয়। কিন্তু সেই সঞ্চয় তিনি রেখে দিয়েছিলেন আশ্রিতদের ভরণপোষণের জন্য। ফলে গুণগ্রাহী হিতৈষীদের দানের ওপরেই তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছিল। বলতে গেলে এই সময়ে ভিক্ষাই ছিল তাঁর শেষ সম্বল।

দৃষ্টি ক্ষমতা হারাবার পর ১৮৯৯ খ্রিঃ সরকারী উকিলের কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন হেমচন্দ্র।

কবির সম্যক অবস্থা অবগত হয়ে বাংলার সারস্বত সমাজ অকৃপণভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বান্ধব পত্রিকার স্পাদক রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায়বাহাদুর হারাণচন্দ্র রক্ষিত, হিতবাদী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অনুসন্ধান সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রমুখ মনীষী দুঃস্থ কবির জন্য অর্থ সাহায্যের চেষ্টা করেন। জীবনের শেষ কটা দিন দেশের মানুষের অর্থ সাহায্য নির্ভর করেই বেঁচেছিলেন হেমচন্দ্র।

শোকতাপ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে শেষ জীবন কাটিয়ে ১৯০৩ খ্রিঃ ২৮শে মে খিদিরপুরের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পরাধীন ভারতের গণজাগরণের প্রথম কবি।

পার্সি বিশী শেলী

ইংবাজি সাহিত্যের সুবর্ণযুগে ১৭৯২ খ্রিঃ ৪ঠা আগস্ট ইংলন্ডের সাসেক্সের অন্তর্গত ওয়ার্নহ্যামে জন্মগ্রহণ করেন শেলী। তাঁর পিতার নাম টিমথি শেলী।

ছেলেবেলায় পরিবারে বাবা মা কিংবা অন্য কারও সাহচর্য তেমনভাবে পাননি শেলী। এই কারণে ক্রমশই তিনি পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বপ্নচারী। কল্পনাই ছিল তাঁর সঙ্গী।

দশ বছর বয়সে সিয়ন হাউস অ্যাকাডেমির আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় তাঁকে। লেখাপড়ায় গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতিই তিনি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

প্রাথমিক স্কুলের পড়া শেষ হলে লন্ডনের সব চেয়ে নামী স্কুল ইটনে কিছুদিন পড়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এরপর অক্সফোর্ডের কলেজ জীবন আরম্ভ হয় আঠারো বছর বয়সে।

স্কুলজীবন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল শেলীর কাব্যরচনা। তরুণ মনের রোমান্টিক কল্পনার রঙে রঙীন ছিল তাঁর সেই কাব্যচর্চা।

পোশাক-আশাকের ব্যাপারে বাল্য বয়স থেকেই অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন শেলী। কলেজে ছাত্রদের মধ্যে তিনিই পরতেন সবচেয়ে দামী পোশাক। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তাঁর পোশাক থাকত অপরিচ্ছন্ন ও অসংলগ্ন। মাথার চুলে থাকত না বিন্যাস।

বাইরের এই অসংলগ্নতার মধ্যেই তরুণ কবিমনে নতুন এক চেতনার সঞ্চার করেছে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ। মনোরাজ্যে চলেছে ভাঙ্গা-গড়ার পালা। এই সময়েই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন শেলী।

১৮১১ খ্রিঃ শেলী লিখলেন The necessity নামে একটি প্রবন্ধ। কিন্তু এই প্রবন্ধ লেখার অপরাধে তিনি বহিষ্কৃত হলেন কলেজ থেকে। তাঁর প্রিয় বন্ধু জেফারসন হগ কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানালেন। তাকেও বহিষ্কার করা হল।

কলেজ থেকে বেরিয়ে দুই বন্ধু আশ্রয় নিলেন লন্ডনের পোলক স্ট্রিটের এক বাড়িতে। সেখান থেকে জেফারসন চলে গেলেন আমেরিকায়।

বাড়ি থেকে সাহায্য নেওয়া বন্ধ করেছিলেন শেলী। তাই নতুন আস্তানায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় খুবই দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হল তাঁকে। হাতে সম্বল বলতে কিছুই ছিল না।

এই দুঃসময়ে ছোট বোন মেরি শেলীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা না পেলে শেলীকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হত।

মেরি শেলী তাঁর এক বান্ধবী হেনরিয়েটা ওয়েস্ট ব্রোকের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ পাঠাতেন। এই সূত্র ধরেই হেনরিয়েটার সঙ্গে শেলীর প্রাথমিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

হেনরিয়েটার বাবা ছিলেন একটি কফি হাউসের মালিক। শেলীর সঙ্গে কন্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হতে দেখে তিনি অখুশি হলেন না এবং সেই বছরেই শেলীর সঙ্গে হেনরিয়েটার বিয়ে হলে তিনি তাদের ভালভাবেই মেনে নিলেন

শেলী ছিলেন কপর্দকহীন। কিন্তু একজন ব্যারনের নাতিকে জামাই হিসেবে পেয়ে যথেষ্টই গৌরবান্বিত বোধ করেছিলেন হেনরিয়েটার বাবা। ফলে মেয়ের বছরের খরচের জন্য তিনি অর্থ বরাদ্দ করে দিলেন।

উনিশ বছরের যুবা শেলী নবপরিণীতা পত্নীকে নিয়ে গেলেন আয়ারল্যান্ডে। এই সময়ের আয়ারল্যান্ড ভ্রমণ শেলীর জীবনের তন্ত্রীতে এক নতুন সুরের প্রতিধ্বনি তুলেছিল। আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং একটি প্রকাশ্য ধর্মসভায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, প্রত্যেকটি ধর্মই সমমর্যাদা সম্পন্ন। তাই শুধুমাত্র ধর্মের জন্য কোনও আইরিশম্যানকেই চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়।

ধর্মসভার এক শ্রোতা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, ক্যাথলিক ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তুমি যা বলছ তা ঠিক নয়।

শেলী এই প্রতিবাদের জবাবে Address to the Irish People শিরোনামে একটি প্রচারপত্র রচনা করলেন। এতে তিনি আয়ারল্যান্ডের জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, তোমরা মাদকাসিক্ত, লোভ, অবিচার আর কুসংস্কার থেকে মুক্ত হও।

কিন্তু একজন ব্রিটিশ নাগরিকের এই প্রচারকে আইরিশরা ভালভাবে নিল না। তাঁরা তাঁকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

আয়ারল্যান্ডে থাকা ঠিক হবে না বুঝতে পেরে শেলী হ্যারিয়েটাকে নিয়ে লন্ডনে ফিরে এলেন।

এখানে ভালভাবেই দিন কাটছিল তাঁদের। কিন্তু মূর্তিমন্ত অভিশাপের মতো বছর দুয়েক বাদে তাঁদের সংসারে থাকতে এলেন হ্যারিয়েটার এক বোন এলিজা।

১৮৭২ খ্রিঃ শেলী রচনা করলেন Queen Mab নামে এক দীর্ঘ কবিতা। এই কবিতায় প্রকাশ পেল আগামী দিনের এক মহৎ কবির প্রতিভার আভাস।

হ্যারিয়েটা ও শেলীর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল ১৯১৩ খ্রিঃ। তার নাম রাখা হল ইয়ানথি।

কন্যার জন্মের কিছুদিন পর থেকেই শেলীর মনে জেগে উঠল অস্থিরতা। তাঁর মনে হল, তিনি ক্রমশই সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ছেন। আরও একটি ব্যাপারে শেলীর মন ভেঙ্গে পড়েছিল।

এলিজাকে কেন্দ্র করে হ্যারিয়েটা স্বামীকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন। ফলে সংসারে নেমে এসেছিল দারুণ অশান্তি।

এই সময়ে শেলীর পরিচয় হল দার্শনিক গডউইনের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রথম পক্ষের সতেরো বছরের সুন্দরী কন্যা মেরি। মেরি ছিলেন বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। সৌন্দর্যের পূজারী তরুণ কবিকে দেখে আকৃষ্ট হলেন তিনি। দুজনের মধ্যে সৃষ্টি হল গোপন প্রেম।

দিনে দিনে হ্যারিয়েটা একা হয়ে পড়তে লাগলেন। শেলী তাঁকে আর সহ্য

করতে পারছিলেন না। বাধ্য হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব করলেন শেলী। কিন্তু হেনরিয়েটা সম্মত হলেন না। শেলী স্ত্রী-কন্যাকে ইংলন্ডে রেখে মেরিকে নিয়ে ফ্রান্সে পাড়ি দিলেন।

সপ্তাহ ছয়েক পরে শেলী ইংলন্ডে ফিরে এলেন। সেই সময় হেনরিয়েটার কোলে এলো এক পুত্র সন্তান। কিন্তু শেলীর জীবনে ততদিনে হেনরিয়েটার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। একদিকে মেরি অন্যদিকে কবিতা—এই নিয়েই মগ্ন হয়েছিলেন তিনি।

কিছুদিন পরেই শেলী ও হেনরিয়েটার মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল। দুবছর পরেই জীবনের জ্বালা জুড়োলেন হেনরিয়েটা আত্মহত্যা করে।

Alastar or the Spirit Solitude নামে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এক কবিতা রচনা করলেন শেলী ১৯১৫ খ্রিঃ। আত্মজীবনীমূলক এই রচনায় নিজের আত্মার কথাই প্রকাশ করলেন যে সুন্দরের সন্ধানে পরিভ্রমণরত।

Alastar প্রকাশের কিছুদিন পরেই মেরিকে নিয়ে জেনিভায় গেলেন শেলী। এই সময় তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন ইংরাজি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি বায়রনের প্রেমিকা জেনি। জেনিভায় বায়রনও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বায়রন ও শেলী উভয়েই ছিলেন পরস্পরের অনুরাগী বন্ধু। এই বন্ধুত্ব ইংরাজি সাহিত্যের দুই প্রতিভাবান কবির জীবন ও সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

জেনিভা বাসের সময়ে শেলী রচনা করেছিলেন Hymn to intellectual Beauty সহ কয়েকটি ছোট কবিতা। আর বায়রন রচনা করেছিলেন একটি দীর্ঘ কবিতা—The Prisoner of Chillon।

দুই কবিবন্ধু প্রতিদিন সন্ধ্যায় মিলিত হয়ে দুজনের লেখা পড়ে শোনাতেন। সেই লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন। মেরি ও জেনি প্রায় সময়ই দুই কবির আলোচনায় যোগ দিতেন।

এমনি এক সন্ধ্যায় শেলী ও বায়রন মেরিকে অনুরোধ করলেন কিছু রচনা করার জন্য। মেরি এক রাত্রির মধ্যেই এমন এক অসাধারণ উপন্যাস রচনা করলেন যে ওই একটি রচনার জন্যই ইংরাজি সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন তিনি। কালজয়ী এই উপন্যাসটির নাম ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।

জেনিভা থেকে ইংলন্ডে ফিরে আসার পর শেলী পরিচিত হলেন কবি লে হান্টের সঙ্গে। হান্ট ছিলেন বায়রন, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ সেই কালের দিকপাল কবিদের গুণমুগ্ধ অন্তরঙ্গ বন্ধু। শেলীও তাঁকে লাভ করলেন উৎসাহদাতা বন্ধুরূপে।

হান্টের বাড়িতেই উঠেছিলেন শেলী। কিছুদিন পরেই তিনি বিয়ে করলেন

মেরিকে। এই সময়ে তিনি তাঁর কালজয়ী কাব্য Prometheus Unbound রচনার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। নাটক এবং গীতিকবিতার মাধ্যমে এই কাব্যে শেলী উৎপীড়িত মানবাত্মার মুক্তিদাতার প্রতীক রূপে তুলে ধরেছেন শক্তিমান হারকিউলিসকে।

দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার বড় একটা তোয়াক্কা করতেন না শেলী। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ল। ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শেলী রওনা হলেন ইটালিতে। তাঁব সঙ্গে গেলেন মেরি, জেনি আর তাঁদের ছেলেমেয়েরা।

ইটালির রৌদ্রকরোজ্জ্বল মুক্ত পরিবেশে এসে অসুস্থ শেলী যেন এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হলেন। সেখানকার অপরূপ প্রকৃতির শোভা তাঁকে এতটাই মুগ্ধ বিহ্বল করে তুলল যে দেহের ক্লান্তি ও অসুস্থতা ভুলে তিনি ইটালির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ইটালির স্থাপত্য, শিল্পকলা পরিদর্শন করে সৌন্দর্য ও মানবতার পূজারী শেলীর কবিসত্তা যেন নতুন ভাবে পুষ্টি লাভ করল। ইটালিতে অবস্থান কালেই তিনি রচনা করলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি। স্বল্পায়ু কবি জীবনের শেষ চার বছর ইটালিতেই অতিবাহিত করেন।

ইটালিতে এসে রোম থেকে তিনি গেলেন নেপলসে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে এলেন পিসা নগরে। এখানে দেখা হল তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে। যুদ্ধ ফেরত সৈনিক অন্য এক সৈনিক পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন। শেলী জমে গেলেন তাঁদের সঙ্গে। হাসি আনন্দ গল্পে মেতে উঠলেন।

একদিন তাঁদের গল্পের আসরে অতিথি হলেন এক অধ্যাপক। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানালেন, ফ্লোরেন্সের এক কাউন্টের দুই সুন্দরী কন্যা সৎমায়ের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে।

ভাগ্য বিড়ম্বিত মেয়ে দুটির জন্য সমবেদনায় ভরে উঠল শেলীর মন। তাঁদের দেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কয়েকদিন পরেই সেই অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন শেলী।

তাঁরা যখন সেখানে পৌঁছলেন, বড় বোন এমিলিয়া বাগানে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম দর্শনেই তার রূপে মুগ্ধ হলেন শেলী। সৌন্দর্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল শেলীর প্রতি এমিলিয়াও আকৃষ্ট হলেন।

শেলীর জীবনে এভাবে নতুন এক নারীর ছায়াপাত হল। স্বামীর মনের পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পাবলেও অন্তরের ব্যথাকে মেরি কখনো প্রকাশ করেন নি।

শেলী-এমিলিয়ার প্রেম দীর্ঘায়িত হবার আগেই এমিলিয়ার বাবা অন্য জায়গায় মেয়ের বিয়ে স্থির করে ফেললেন।

আশাহত শেলী বিচ্ছেদ বেদনা ভুলবার জন্য আপন সৃষ্টির মধ্যে ডুব দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই এমিলিয়ার স্মৃতি তাঁর মন থেকে মুছে গেল।

শেলীর আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। তার মধ্যেই মেরির দুঃস্থ বাবাকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে হত।

এই নিয়েই মেরির সঙ্গে শেলীর অশান্তি শুরু হল।

এই সময়ে মেরি তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম দিলেন। কিন্তু জন্মের কয়েক সপ্তাহ পরেই শিশুটি মারা গেল।

এরপর শেলীর আরো দুটি সন্তান পর পর অকালে প্রাণ হারিয়েছিল।

সন্তান হারানোর বেদনা ভুলবার জন্য তিনি লেখার মধ্যে ডুব দিলেন। এইভাবে সংসার-জীবন থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগলেন শেলী।

সৃষ্টির কাজে এমন তন্ময় হয়ে থাকতেন তিনি যে প্রায় সময়ই খাবার কথা ভুলে যেতেন। মেরি টেবিলে খাবার রেখে যেতেন। প্রায় সময়ই খাবার তেমনিই পড়ে থাকত।

ক্রমে এমন হল যে, মানুষের সঙ্গও এড়িয়ে চলতে লাগলেন শেলী। একা একাই বনের মধ্যে, সমুদ্রের ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়তেন আর ডুবে থাকতেন নিজের চিন্তার মধ্যে।

এই নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যে ইটালির প্রকৃতি—সমুদ্র, অরণ্য, আকাশের তারা, পাখির কলকাকলি, পত্রপল্লবের মর্মর ধ্বনি, এক নতুন রূপ নিয়ে ধরা দিল তাঁর কাছে।

আর তাঁর অনুভব ও চিন্তার মধ্য থেকে উৎসারিত হতে লাগল আপন সৌন্দর্যে উজ্জ্বল একের পর এক কবিতা।

The cloud, To night, Song to prosperine, Ode to the West Wind, The Skylark, When soft voices die, The Indian serenade, Music, On a Faded violet প্রভৃতি অবিস্মরণীয় কবিতাগুলি এই সময়েই রচিত হয়।

কবি-বন্ধু কীটস অসুস্থ অবস্থায় ইটালিতে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। এই তরুণ কবির কবি প্রতিভার প্রতি শেলীর মনে ছিল প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। কিন্তু বন্ধুর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সেই ঈর্ষা ভুলে গিয়েছিলেন শেলী, কীটসকে সুস্থ করে তুলবার জন্য তিনও ব্যাকুল হলে উঠলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কীটস অকালে মৃত্যুবরণ করলেন। বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গভীর শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হল শেলীর। তিনি

লিখলেন অবিস্মরণীয় সেই কবিতা—Adonais। এমন মর্মস্পর্শী কবিতা বিশ্বসাহিত্যে কমই লেখা হয়েছে।

এক সময় কবি উঠে এলেন পিসা শহরে। কবি বায়রন তাঁর প্রতিবেশী। এই সময় তিনি সংবাদ পেলেন ইংলন্ডের কবি লে হান্ট আর্থিক অনটনে দিন যাপন করছেন।

শেলী সমুদ্র ভাল বাসতেন। তাই শহরের কোলাহল ছেড়ে ১৮২২ খ্রিঃ স্পেজিয়া উপসাগরের তীরে একটি বাড়ি ভাড়া করে বাস করতে লাগলেন।

সাঁতার জানতেন না শেলী। কিন্তু সমুদ্রস্নান করতে ভালবাসতেন। একদিন বন্ধু ট্রিলনির সঙ্গে স্নানে গিয়ে পা পিছলে ডুবে যেতে বসেছিলেন। বন্ধুর চেষ্টায় সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন।

শেলীর রোমান্টিক বিলাসী মনের কাছে মৃত্যুর রূপ ছিল ভিন্ন। মৃত্যুকে তাঁর মনে হত মুক্তিদাতা। জীবনের সব আবরণ উন্মুক্ত করে দেয় মৃত্যু। তাই ট্রিলনি যখন তাঁকে উদ্ধার করলেন, তখন শেলী বললেন, সাগরের তলায় জীবনের রহস্য রয়েছে বলে আমি জানতাম। আর কিছুক্ষণ জলের তলায় থাকলে আমি ঠিক সেই রহস্যের সন্ধান পেয়ে যেতাম।

কিছুদিনের মধ্যেই শেলী খবর পেলেন লে হান্ট ইটালিতে উপস্থিত হয়েছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র বন্ধু উইলিয়ামকে সঙ্গে করে তিনি লেগহর্নে গিয়ে হান্টের সঙ্গে দেখা করলেন। পরস্পরকে কাছে পেয়ে দুজনেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন।

এই সময় থেকে যেন অতিমাত্রায় উদ্দাম উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন শেলী। হান্টকে নিয়ে তিনি গেলেন পিসায়। সেখানে বন্ধুর সঙ্গে দিন কতক কাটিয়ে ১৮২২ খ্রিঃ ৮ জুলাই ফিরে এলেন লেগহর্নে। এই সময় বন্ধু উইলিয়ম ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

সেদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তার মধ্যেই ঘাট থেকে নৌকা খুলে জলে নামলেন তাঁরা। উদ্দেশ্য মুক্ত প্রকৃতির কোলে জলবিহার করবেন।

তাঁদের সমুদ্রে যেতে জেলেরা বারণ করল। আবহাওয়ায় তারা আসন্ন ঝড়ের আভাস পাচ্ছিল।

দুই বন্ধুর কেউই জেলেদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। ভেসে চললেন নৌকো নিয়ে।

অকস্মাৎ আকাশের কোণে দেখা দিল ঘন কাল মেঘ। আচমকা উঠল ঝড়। সমুদ্রের জল উথাল পাতাল করে দিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যেই প্রকৃতি শান্ত হয়ে গেল। শেলীর নৌকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দশদিন পর জেলেরা রেগগিয়োর সমুদ্রতীরে একটি মৃতদেহ খুঁজে পেল। বন্ধুরা এসে শনাক্ত করল শেলীর দেহ। তাঁর এক পকেটে পাওয়া গেল কিটসের কবিতার কপি, অন্য পকেটে সফোক্লিসের নাটক।

সৌন্দর্য ও প্রকৃতি প্রেমিক কবি শেলী সমুদ্র ভালবাসতেন। বিপ্লবী আদর্শে তাঁর কবিসত্তা গঠিত হলেও নিষ্কলুষ কল্পনার মধ্যেই প্রকৃতির মেঘ রৌদ্রে, আকাশ বাতাস পাহাড়ে স্কাইলার্ক পাখির মতোই ডানা মেলে উড়ে বেড়াত তাঁর ভাবুক মন। তিনি খুঁজে ফিরেছেন প্রেম সৌন্দর্য স্বাধীনতার জগতকে।

বন্ধুরা তাই শেলীর দেহ সমুদ্র তীরেই চিতার আগুনে তুলে দিল। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে যাওয়া হল রোমে, প্রিয় কবি কিটসের সমাধির পাশে সমাহিত করা হল। ইংলন্ডের দুই কবি ইটালির মাটিতেই পাশাপাশি চিরনিদ্রায় শায়িত রইলেন।

যোহান উলফগ্যাঙ ভন গ্যেটে

জার্মান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর পুরুষ গ্যেটের জন্ম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুট শহরে। ১৭৪৯ খ্রিঃ ২৮ শে আগস্ট।

সামান্য এক দর্জির ঘরে জন্মে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায় বলে গ্যেটের বাবা যোহান ক্যাসপার নিজেকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুপন্ডিত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ।

গ্যেটের মা ছিলেন সহজ সরল ও উদারহৃদয় মহিলা। গ্যেটে লিখেছিলেন, পিতার প্রভাবে জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল তাঁর। আর সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেছিলেন মায়ের কাছে।

চার বছর বয়সে গ্যেটেকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু স্কুলের চারদেয়ালের মধ্যে অল্পদিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি। স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা তাঁর ধাতে সইত না। অচিরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

বাধ্য হয়ে তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়িতে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হল।

পড়াশুনায় গভীর আগ্রহ ছিল বালক গ্যেটের। গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি শিখতে লাগলেন ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালিয়ান, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষা। সেই সঙ্গে চলল গান শেখা ও ছবি আঁকা।

প্রকৃতির প্রতি সহজাত আকর্ষণ ছিল গ্যেটের। তাই পড়াশুনার অবসরে তিনি দু'চোখ ভরে উপভোগ করতেন প্রকৃতির শোভা।

এই ভাবেই মানুষজন, তাদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল তাঁর।

একবার যা তিনি দেখতেন, তা স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকত। কৈশোরের এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁর রচনাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে।

দশ বছর বয়স থেকেই গ্যেটে কবিতা লিখতে শুরু করেন। সেই বয়সেই তিনি অনুভব করতেন তাঁকে বড় কিছু মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে হবে।

বস্তুতঃ সহজাত কবিপ্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন তিনি। তাই তাঁর জীবন ও ভাবনা চিন্তার প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গ্যেটের সত্তার সঙ্গে মিশে ছিল কবিতা ও প্রকৃতিপ্রেম।

কিশোর গ্যেটে একবার এক বন্ধুর সঙ্গে সরাইখানায় গেছেন। সেখানে সরাইওয়ালার কিশোরী কন্যা মার্গুরিতকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেললেন তিনি। যদিও মার্গুরিত ছিলেন তাঁর চাইতে বছর কয়েকের বড়।

দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দুজনের মধ্যে সৃষ্টি হল প্রণয়। কিশোর বয়সের এই প্রেমের মধ্যেই গ্যেটে সন্ধান পেলেন পবিত্র ও মহত্তম এক সৌন্দর্যের জগতের।

কিশোর প্রেম কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। মার্গুরিত তাঁর পিতার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। বিচ্ছেদ বেদনায় সাময়িক ভাবে মুষড়ে পড়লেন গ্যেটে।

পিতা যোহান ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল গ্যেটেও হবেন তাঁরই মত রাজকর্মচারী।

এই উদ্দেশ্যে তিনি ছেলেকে আইন পড়াবার জন্য লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

আইনের প্রতি কোনই আকর্ষণ বোধ করতেন না গ্যেটে। পিতার পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছা নিয়েই তাঁকে ভর্তি হতে হয়েছিল আইনের ক্লাশে। ফলে ক্বচিৎ তাঁকে ক্লাশে দেখা যেত। পথে প্রান্তরে বাজারে মানুষের ভিড়ে ঘুরে বেড়াতেই তিনি বেশি আনন্দ পেতেন।

তিনি মনে করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসঘরের মধ্যে যা শিখতে পারবেন তার চেয়ে অনেক বেশি জানার সুযোগ রয়েছে উন্মুক্ত পৃথিবীর মানুষজন ও জীবনেব নানা রূপের মধ্যে। মাত্র সতেরো বছর বয়সেই এই জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়েছিল তাঁর কবিমন।

এই সময়েই তিনি রচনা করলেন Lover's Quarrels এবং The fellow sinners নামে দুটি নাটক।

ক্রমে যৌবনে পা দিলেন গ্যেটে। সুদর্শন ও প্রাণসম্পদে ভরপুর এই তরুণের মধ্যে ছিল একটা স্বাভাবিক আকর্ষণশক্তি। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসত, মুগ্ধ হয়ে যেত।

গ্যেটের জীবনে দ্বিতীয় প্রেম এলো লিপজিগ শহরে। তাঁর পরিচয় হল

বাড়িওয়ালার মেয়ে এনেৎ-এর সঙ্গে এবং যথারীতি তাঁর প্রেমে পড়লেন। কিন্তু এবারেও এল ব্যর্থতা

এনেতের আচরণে মনে নিদারুণ আঘাত পেলেন তিনি এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু এবারেও কিছুদিনের মধ্যেই সামলে উঠলেন। তাঁর জীবনীশক্তি ছিল অফুরন্ত। বেদনার ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় সেই প্রাণশক্তি লাভ করল সৃষ্টির প্রেরণা।

ফল হল, আইনের ক্লাশে ভর্তি হয়েও গ্যেটে হলেন কবি। ক্লাশে ইস্তফা দিয়ে তিনি ফিরে এলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে।

গ্যেটের পরিবর্তন তাঁর মাতা-পিতার চোখ এড়াল না। তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এইসময় গ্যেটের মায়ের এক আত্মীয় তাঁকে অ্যালকেমির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন।

এই প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে নিকৃষ্ট ধাতুকেও সোনায় রূপান্তরিত করা যেত। এই বিদ্যাকেই পরবর্তীকালে গ্যেটে রূপ দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য ফাউস্তে।

আইনের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই লিপজিগ থেকে ফিরে এসেছিলেন তিনি। পিতা যোহান তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ছেলে আইনজ্ঞ না হয়ে অ্যালকেমিস্ট হবে, এ তিনি মেনে নিতে পারলেন না।

১৭৭০ খ্রিঃ তাই ছেলেকে তিনি পাঠালেন স্ট্যাটসবুর্গে। ভর্তি করিয়ে দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ক্লাশে।

এখানে আসার পর গ্যেটের বন্ধুত্ব হল কয়েকজন ডাক্তারির ছাত্রের সঙ্গে। তিনিও আকৃষ্ট হলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি। আইনের বদলে তিনি শুরু করলেন শরীরতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা।

স্ট্যাটসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই গ্যেটে হাতে পেলেন বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা। এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে তার মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি এবং অল্প দিনের মধ্যেই হয়ে উঠলেন স্ট্যাটসবুর্গের শিক্ষিত সমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

যেই ঘরে বাস করতেন গ্যেটে তার পাশের ঘরেই থাকতেন ওয়েল্যান্ড নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের এক ছাত্র। তাঁর সঙ্গে গ্যেটে একদিন গেলেন এক গ্রাম্য যাজকের বাড়িতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল যাজকের আঠারো বছরের সুন্দরী কন্যা ফ্রেডরিক ব্রিয়নের।

মুখে গ্রাম্য সরলতা মাখানো, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার তরুণীটি গ্যেটের মন হরণ করল। ব্রিয়নেরও ভাল লাগল গ্যেটেকে। দুজনেই বাঁধা পড়লেন প্রেমের

বাঁধনে। এই প্রথম গ্যেটে অনুভব করলেন প্রকৃত প্রেমের স্বাদ। জীবনের গভীরে এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন তিনি।

কিন্তু প্রেম গভীর হলেও বিবাহের প্রশ্নে পিছিয়ে আসতে হল গ্যেটেকে। সামাজিক কারণেই ব্রিয়নের সঙ্গে বিবাহ সম্ভব ছিল না। আবার বিচ্ছেদবেদনা নেমে এলো তাঁর জীবনে।

এই সময় আইন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি। বাবার আহ্বান পেয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হল ফ্রাঙ্কফুটে।

গ্যেটের দীর্ঘজীবনে প্রেম বারবার এসেছে। বহু নারীর সঙ্গ লাভ করেছেন তিনি। কিন্তু ফ্রেডরিকের সঙ্গে ভালবাসার বন্ধন তাঁর আমৃত্যু অটুট ছিল। ফ্রেডরিকও সমস্ত জীবন অবিবাহিতই থেকেছেন। যে মন তিনি গ্যেটেকে দিয়েছিলেন, জীবনে তা আর কাউকে দিতে পারেন নি।

গ্যেটের পিতা চেয়েছিলেন পুত্র আইনের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। তাই ফ্রাঙ্কফুটে ফিরে এসে গ্যেটেকে সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করতে হল। কিন্তু আদালতের পরিবেশ দেখে অল্পদিনের মধ্যেই আইন ব্যবসায়ের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন।

এই সময়েই গ্যেটে জীবনের লক্ষ্যপথ নিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সাহিত্যকেই করলেন জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

সুপ্রীম কোর্টে কাজ করার সময় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন গ্যেটে। সেই পরিবারের কুড়ি বছরের সুন্দরী কন্যা লটির সৌন্দর্য তাঁকে মোহমুগ্ধ করল। কিন্তু প্রেমের সূত্রপাতেই তিনি জানতে পারলেন লটি অন্য পুরুষের বাগদত্তা।

লটি তাঁর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে এই আঘাত বড় তীব্র হয়ে বাজল গ্যেটের হৃদয়ে। অসহ্য বেদনায় তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ অল্পসময়ের মধ্যেই আত্মস্থ হলেন তিনি। ধীরে ধীরে মানসিক সুস্থতা ফিরে পেলেন।

লটির প্রতি ব্যর্থ প্রেম, তার ভালবাসার ছলনা গ্যেটের হৃদয়ে গভীর বেদনার সঞ্চার করেছিল। সেই বেদনার প্রেরণায় মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে তিনি রচনা করলেন তাঁর অবিস্মরণীয় উপন্যাস The sorrows of werther। গ্যেটের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হল। আর অখ্যাত যুবক গ্যেটে লাভ করলেন দেশজোড়া খ্যাতি। অল্পদিনেই তাঁর খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ইউরোপে।

গ্যেটের কাহিনীর নায়ক ভের্টর এক স্বপ্নবিলাসী ছন্নছাড়া যুবক। বারবার প্রেমের আঘাত পেয়ে সে বেদনায় ভেঙ্গে চুরমার হয়।

ব্যর্থতার গ্লানি বুকে নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে আসে ভের্টর। নতুন জীবনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে থাকে মাঠে প্রান্তরে।

মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে মুগ্ধ ভের্টর প্রিয়বন্ধু হেলমকে চিঠি লিখতে বসে। তার পর পর চিঠি সাজিয়েই সৃষ্টি হয়েছে উপন্যাস।

শেষ পর্যন্ত হতাশায় দীর্ণ-হৃদয় ভের্টর আত্মহত্যা করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

উপন্যাসের নায়ক ভের্টরের বেদনা, আশা, নিরাশা, স্বপ্ন মানুষের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করল। কল্পনার চরিত্র হয়েও ভের্টর হয়ে উঠল জীবন্ত মানব। সে হয়ে উঠল তরুণ-তরুণীদের আদর্শ। তার পোশাক নীল কোট, হলদে ওয়েস্ট কোট হয়ে উঠল তাদের প্রিয় পোশাক। মেয়েরা সাজ নিল নায়িকার মতো সাদা পোশাক আর পিঙ্ক বো।

বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসে অগণিত জীবন্ত ভের্টর ছড়িয়ে পড়ল জার্মানীতে, ইউরোপের পথে পথে।

এখানেই শেষ হল না। ভের্টরের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য দলে দলে যুবক-যুবতী আত্মহননে মেতে উঠল।

বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে গ্যেটের উপন্যাস অর্থহীন আবেগলিপ্ত কাহিনী মাত্র হলেও, জীবনসন্ধানী তরুণ সমাজের কাছে এই উপন্যাসের আবেদন চিরকালীন।

প্রথম উপন্যাসের অসামান্য সাফল্যে অনুপ্রাণিত গ্যেটে আইন-ব্যবসায় ছেড়ে সাহিত্যকেই করলেন জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

ব্যর্থ নায়ক ভের্টরে-এর প্রেরণায় এই সময় থেকেই সম্ভবতঃ গ্যেটের মনে ফাউস্তের কল্পনা অঙ্কুরিত হতে শুরু করে।

গ্যেটের প্রিয় লেখক ছিলেন শেক্সপীয়র। তাঁর অনুকরণে তিনি ইতিপূর্বে একটি পঞ্চম অঙ্কের নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু সেই রচনার সাহিত্যমূল্য বিশেষ ছিল না।

১৭৭৪ খ্রিঃ তিনি লিখলেন আর একটি নাটক Clavigo। এই নাটকের বিষয়বস্তু তিনি সংগ্রহ করেছিলেন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান থেকে। Clavigo তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে তুলল।

এই সময়ে শিল্প, সংস্কৃতি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক যুবরাজ লুডউইগ গ্যেটেকে ওয়েমারে আমন্ত্রণ জানালেন। সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন তিনি। ছাব্বিশ বছর বয়স থেকে অবশিষ্ট জীবন তিনি ওয়েমারেই অতিবাহিত করেন।

রাজোদ্যানে প্রাসাদের কাছেই একটি বাড়িতে গ্যেটের থাকার ব্যবস্থা

হয়েছিল। গুণমুগ্ধ যুবরাজ তাঁকে অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মনোনীত করলেন।

নতুন এই দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না গ্যেটে। সাহিত্য জীনের সঙ্গে রাজনীতিকেও মেনে নিতে হল।

নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন গ্যেটে। তাই সমস্ত কাজকে দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একদিকে রইল সাহিত্য, অপর দিকে রাজনীতি।

রাজশক্তির প্রতি চরম আনুগত্য ছিল গ্যেটের। তাই তিনি তরুণ যুবরাজকে নানা বিষয়ে উপদেশ পরামর্শ দেবার সময়, প্রয়োজন হলে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

অমর সুরস্রষ্টা বিঠোভেন ও গ্যেটে একদিন রাজপথে হাঁটছিলেন। সেই সময় যুবরাজও সেই পথে আসছিলেন। তাঁকে দেখে সকলে রাজপথ থেকে সরে দাঁড়াল। বিঠোভেন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি নিজের মনে যুবরাজের সামনে দিয়ে পথ পার হয়ে গেলেন।

গ্যেটে কিন্তু মাথার টুপি খুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গ্যেটের এই আনুগত্য ছিল কৃতজ্ঞতার প্রকাশ মাত্র। সাহিত্য সংস্কৃতি ছিল তাঁর প্রাণ। রাজানুগ্রহে, যুবরাজেরে সভাসদ হলেও, তাঁর করণীয় কাজ বিশেষ কিছু ছিল না। জ্ঞানের চর্চার অফুরন্ত সুযোগই তিনি লাভ করেছিলেন।

ওয়েমারের জীবনেই গ্যেটের পরিচয় হয় এক অভিজাত পরিবারের সুন্দরী তরুণী লিলি স্কোনিমার সঙ্গে। আলাপ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হতে বেশিদিন লাগল না। বিয়ের প্রস্তাব দিলেন গ্যেটে।

কিন্তু লিলির পরিবারের কাছে গ্যেটের প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট বলে মনে হল না। ক্ষোভে অপমানে এই সম্পর্ক ছেদ করলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীকালে ফাউস্তের বহু দৃশ্যেই এই প্রেম রূপ লাভ করে কালজয়ী হয়ে আছে।

ইতিপূর্বে ফাউস্ত রচনায় হাত দিয়েছেন গ্যেটে। একদিকে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পড়াশুনা—জ্ঞান সাধনা, অন্যদিকে সাহিত্য সাধনা।

ওয়েমারের কৃষি, সাময়িক উন্নয়ন ও খনিজ উত্তোলনের কাজে উন্নতি বিধানের জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে পড়াশুনার সঙ্গে ইতিহাস, দর্শন, চিত্রকলার চর্চা করতেন গ্যেটে।

বস্তুতঃ তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ছিল অফুরন্ত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ফাউস্তের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে এই জ্ঞান অন্বেষা।

ফাউস্ত রচনা চলাকালীনই আমেরিকার বিপ্লবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্যেটে রচনা করলেন এগমঁত নামে নাটক। এরপর রচনা করলেন উইলেম মেস্তার

নামে উপন্যাস। নিজের জীবনকেই যেন তিনি তাঁর এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন।

জীবনে অনেক নারীরই সান্নিধ্যে এসেছিলেন গ্যেটে। ভালবেসেছিলেন প্রত্যেককে। কিন্তু জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাননি কাউকেই।

প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা তাঁকে বারবার হতাশাগ্রস্ত করেছে। কিন্তু সেই হতাশা ও বেদনা কখনও তাঁর চলার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি।

নিজের জীবনের আলোকেই গ্যেটে চিত্রিত করেছেন তাঁর উপন্যাসের নায়ক মেস্তারের জীবন।

বারবার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সেও বেদনায় বিধ্বস্ত হয়েছে, হতাশায় নুয়ে পড়েছে। কিন্তু নিজের চলার পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করলেও মেস্তার সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি একাধিক কারণে। গ্যেটের সার্থক উপন্যাস হল কাইন্ডার্ড বাই চয়েস বা সিলেকটিভ অ্যাফিনিটি।

নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন গ্যেটে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নাটক রচনাতেই তিনি অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ততা বোধ করেন। নাটকের মাধ্যমেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

এই উপলব্ধি থেকেই উপন্যাস রচনা থেকে সরে এলেন তিনি। গড়ে তুললেন নাটকের দল লিটল থিয়েটার।

এরপরে দলের প্রয়োজনেই তিনি রচনা করেছিলেন কয়েকটি অসাধারণ নাটক। পরিণত হয়ে ওঠে তাঁর জীবনবোধ, গভীরতর হয় অন্তর্দৃষ্টি। উপলব্ধি করেন মানুষে মানুষে ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধন। মানুষের প্রতি এই ভালবাসাই হয়ে উঠল গ্যেটের সৃষ্টির প্রধান উৎস।

ঊনচল্লিশ বছর বয়সে ১৭৮৮ খ্রিঃ গ্যেটের জীবনে আবির্ভাব হল নতুন এক নারীর। সৌন্দর্যময়ী ক্রিস্টিন ভালপাইন। ভাইয়ের জন্য একটি সুপারিশপত্র নিতে তিনি এসেছিলেন গ্যেটের কাছে।

ক্রিস্টিনের সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার, শান্ত নম্র স্বভাব মুগ্ধ করল গ্যেটেকে। ক্রিস্টিনকেই সঙ্গিনী করলেন তিনি। দীর্ঘ আঠারো বছর তাঁরা একই সঙ্গে বসবাস করলেন। পরে ১৮০৬ খ্রিঃ সন্তানের পরিচয়ের স্বীকৃতিদানের জন্য দুজনে বিবাহিত হলেন।

একের পর এক ঘটনায় আলোড়িত হয়েছে গ্যেটের জীবন। আশি বছরের সুদীর্ঘ জীবনে একের পর এক শোকের ঘটনা তাঁকে মুহ্যমান করেছে। প্রিয় বন্ধু, স্নেহের বোন, প্রিয়তমা পত্নী, একমাত্র সন্তান—এঁদের হারানোর বেদনা নীরবে সয়েছেন তিনি।

শোক দুঃখের আঘাত তাঁর জীবনের গতিকে কখনো প্রতিহত করতে পারেনি। সমস্ত বেদনা, সমস্ত ব্যর্থতাকে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রূপান্তরিত করেছেন। বেদনার অশ্রু হয়ে উঠেছে ফুল।

১৭৪৯ খ্রিঃ থেকে ১৮৩২ খ্রিঃ সুদীর্ঘ জীবনে সব মিলিয়ে ৬০টি বই লিখেছিলেন গ্যেটে। তার মধ্যে ছিল কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গাথা, গীতিকবিতা ও রূপকথার কাহিনী।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী হিসেবেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

যেই অবিস্মরণীয় কীর্তির জন্য গ্যেটে হয়েছেন কালজয়ী, সেই ফাউস্ত কাব্য গ্রন্থের প্রথম খন্ড লিখতে সময় লেগেছিল ত্রিশ বছর। পরবর্তী পঁচিশ বছরে সম্পূর্ণ করেছিলেন ২য় খন্ড।

ফাউস্ত রচনার কাজে প্রায় সমস্ত জীবন তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন। অতি আশ্চর্য প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাণ হল ফাউস্ত কাব্য।

মেঘ-রৌদ্রের বিচিত্র খেলায় মানবজীবন যদি হয় এক মহাকাব্য তাহলে তার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্যেটে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ফাউস্তের কাহিনীতে। বিশ্ব সাহিত্যের এক মহামূল্যবান সম্পদ তাঁর এই কাব্য।

আত্মজীবনীমূলক একটি রচনা গ্যেটে ফাউস্তের সমসাময়িক সময়েই লেখেন। এই লেখা থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

হাফিজের কাব্যপাঠে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনের অন্তিম পর্বে বেশ কিছু কবিতা লেখেন গ্যেটে। বৃদ্ধ বয়সের লেখা হলেও তাঁর মনের তারুণ্যের দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে এই লেখাগুলোতে।

গ্যেটের প্রতিভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন নেপোলিয়ন। জার্মানী দখল করার পর সৈন্যবাহিনীকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, গ্যেটের মর্যাদার যেন কোন হানি না ঘটান হয়।

তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ করে সসম্মানে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, একজন পরিপূর্ণ মানুষ আপনি, বলে সম্বোধন জানিয়ে।

বস্তুতঃ মনুষ্যজীবনের চরম আদর্শ—অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের সন্ধান রূপায়িত হয়েছিল গ্যেটের জীবনচর্যায়। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন আলোক-পথিক এক মহান অভিযাত্রী।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়েছিলেন গ্যেটে। ১৮৩২ খ্রিঃ ২২মার্চ অপরাহ্ন বেলায় অনুরাগীদের হাত ধরে এসে বসেছিলেন তাঁর লেখার ঘরে। সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন, মহান কবির জীবনের অন্তিম লগ্ন উপস্থিত।

দিনের বিলীয়মান আলোর দিকে তাকিয়ে গ্যেটে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আলোর আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে—"আরো আলো, আরো আলো"।

নিজের মহাজীবনের আলো বিচ্ছুরিত করে চির আলোর পথিক চলে গেলেন মহালোকের পথে।

জন কিটস

ইংরাজি সাহিত্যের দিকপাল কবি সৌন্দর্যের পূজারী জন কিটসের জন্ম ১৭৯৫ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে। বাবা টমাস কিটস ছিলেন ঘোড়ার আস্তাবলের সামান্য পরিচারক। কিন্তু তাঁদের আর্থিক অবস্থা ছিল মোটামুটি সচ্ছল। তাই ছেলেবেলাটা একরকম সুখেই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর।

সাত বছর বয়স হলে স্থানীয় এনফিল্ড স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল কিটসকে। বাড়ি ছেড়ে আবাসিক স্কুলে এসে মনমরা হয়ে থাকতেন তিনি। চোখের জল ফেলতেন লুকিয়ে। ছোট দুই ভাই, মা এদের কথা মনে পড়ত বলে পড়াশুনাতেও মন বসত না।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলেন বালক কিটস। পড়াশুনাতেও আগ্রহ বাড়ল।

দু বছর পার হতে না হতেই বাবা টমাস কিটস ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেলেন। পিতার মৃত্যুর শোক ভুলবার আগেই কিটসের মা আবার বিয়ে করলেন। কিন্তু সেই বিয়ে স্থায়ী হল না। একবছরের মাথাতেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। কিটসের মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফিরে এলেন বাপের বাড়িতে। কিটসের তখন বছর দশেক বয়স।

দুঃখের মধ্য দিয়েই আঘাত সয়ে সয়ে জীবনের ধাপগুলো অতিক্রম করতে হয়েছিল কিটসকে। দুঃখ ছিল তাঁর চিরসঙ্গী। পরিণত বয়সে ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাসের কথা বারবার স্মরণ করেছেন কবি।

১৮১০ খ্রিঃ বারো বছর বয়সেই মাতৃহারা হলেন কিটস। দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি।

ভাইবোনেরা ছোট, তাই মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করতেন কিটস নিজেই। আপ্রাণ করেও মাকে বাঁচাতে পারেন নি। মায়ের রোগ অজানিতে বাসা বাঁধল তাঁর শরীরে।

অসহায় ভাইবোনেদের দাদুর তত্ত্বাবধানে রেখে কিটস ফিরে এলেন স্কুলে।

মন ভারাক্রান্ত। আগের মতো আর বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোয় যোগ দিতে পারেন না। নিজের মনে পড়াশুনা নিয়েই থাকেন। আর মনের দুঃখ ভুলবার জন্য লেখেন কবিতা।

স্কুলের পড়া শেষ হলে অভিভাবকদের ইচ্ছায় এক শল্যচিকিৎসকের কাছে শিক্ষানবিসী শুরু করলেন। কয়েক বছর পরে তিনি ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। ততদিনে কবিতার নেশা তাঁর জমে উঠেছে।

এই সময়েই স্কুলের এক বন্ধু কিটসকে নিয়ে একদিন গেলেন হ্যাম্পস্টেডে। সেই সময়ের তরুণ খ্যাতিমান কবি লে হান্ট বাস করতেন সেখানে। সরকারের বিরুদ্ধে লেখার অপরাধে একবার জেলে যেতে হয়েছিল হান্টকে।

তিনি পরিচিত হয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি বলে। তরুণ কবিদের নানাভাবে উৎসাহিত করতেন তিনি।

১৮১৬ খ্রিঃ হান্টের সঙ্গে কিটসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকার কিটসের জীবনে গভীর প্রভাব রেখেছিল।

নবীন কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ হলেন হান্ট। তিনি তাঁকে উৎসাহিত করলেন। লেখার ভুলত্রুটি সংশোধন করে নানান পরামর্শ দিলেন।

এতদিনে যেন কিশোর কিটস সঠিক পথের সন্ধান পেলন। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

হান্ট একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হল কিটসের কবিতা।

এই পত্রিকার দপ্তরেই কিটসের সঙ্গে আলাপ হল তরুণ কবি শেলীর। অবশ্য তখনো তিনি কবি হিসেবে পরিচিত হননি। কিটসের সঙ্গে ক্রমে শেলীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

হান্টের প্রেরণায় কিটসের কবিমন এবারে হয়ে উঠল বাঁধনহারা। অভিভাবকের অসন্তোষ অগ্রাহ্য করে তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন সাহিত্যকেই পেশা করবেন।

এরপর ছোট দুই ভাইকে নিয়ে তিনি লন্ডন ত্যাগ করে হ্যাম্পস্টেডে চলে এলেন। হান্টের সাহচর্য তখন তাঁর কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

হ্যাম্পস্টেডে আসার কিছুদিন পরেই কিটসের প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হল। কিন্তু নতুন কবির এই বই কাব্যরসিকদের সমাদর লাভে ব্যর্থ হল। বইয়ের প্রায় সমস্ত কপিই অবিক্রিত পড়ে রইল।

প্রথম কবিতার বইতে কিটসের বিখ্যাত কবিতা On first looking into Champmans's Homer অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

হোমারের ইলিয়াড কব্যের ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন চ্যাপম্যান। সেই

অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন কিটস। তাঁর সেই অনুভূতিই তিনি প্রকাশ করেছিলেন উক্ত কবিতায়।

Sleep and poetry কিটসের অন্য এক বিখ্যাত কবিতা। যদিও এতে ছিল হান্টের প্রভাব। এই কবিতাটিও তাঁর প্রথম কাব্য সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

প্রথম কবিতার বই পাঠকসমাদর লাভ না করলেও কিটস নিরুৎসাহ হলেন না। ব্যর্থতাই হয়ে উঠল তাঁর প্রেরণা। নতুন উদ্যমে কাব্য সাধনায় ডুব দিলেন তিনি।

এই সময়েই ১৮১৭ খ্রিঃ লেখা হল তাঁর প্রথম দীর্ঘ কবিতা Endymion। একটি প্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল এই অসাধারণ কবিতাটি। প্রেমের শক্তিতে মর্তের মানুষ যে অমর্ত্যলোকে পৌঁছতে পারে এই দর্শনই হল কবিতাটির প্রতিপাদ্য।

কিটসের এক বন্ধু ব্রাউন এই সময়ে দেশভ্রমণে যাবার সংকল্প করলেন। কিটসকে তিনি সঙ্গী করলেন। বন্ধুর বদান্যতায় জীবনে এই প্রথম বাইরে ভ্রমণে গেলেন।

মা মারা গিয়েছিলেন যক্ষ্মা রোগে। একই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন কিটসের ভাই টম। ভ্রমণ শেষ করে এসে তিনি দেখলেন টম শয্যাশায়ী। কিটস নিজেই ভাইয়ের সেবা পরিচর্যার দায়িত্ব নিলেন।

ইতিমধ্যে Endymion প্রকাশিত হল। কিন্তু খ্যাতির বদলে কবির ভাগ্যে জুটল সমালোচকদের রূঢ় ভাষার তিরস্কার। ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন বিদ্রূপ করে লিখল, "কবি যশপ্রার্থী হাসপাতালের শিক্ষানবিস কবিতার নামে যা লিখেছে তাকে নির্বোধের আস্ফালন ছাড়া আর কী বলা যায়?"

সমালোচক সর্বশেষ এই উপদেশও দিল, কবি যেন কাব্য চর্চার বৃথা চেষ্টা না করে হাসপাতালের কাজে অথবা তার বাবার আস্তাবলের কাজে ফিরে যায়।

কবিতা সমালোচনার নামে বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তিগত আক্রমণ কিটসের মনে তীব্র আঘাত হয়ে বাজল। একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

মানসিক ভাবে এমনই বিপর্যস্ত হয়েছিলেন কিটস যে সারাজীবনে আর এই আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তা ডেকে এনেছিল তাঁর অকাল মৃত্যু।

অপরিণামদর্শী কুৎসাপূর্ণ বিরূপ সমালোচনা যে একজন তরুণ কবির জীবনে কতটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কিটসের অকাল মৃত্যু তার জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে রয়েছে।

বিধাতার এমনই নির্মম পরিহাস যে এই সময়েই কিটস পেলেন আরেক আঘাত।

বেশ কিছুদিন থেকেই টমের অসুখের বাড়াবাড়ি চলছিল। কিটস বুঝতে পারছিলেন, মাকে বাঁচাতে পারেননি তিনি, ভাইও তাঁকে অকালে ফাঁকি দিয়ে যাবে।

তাঁর সেই আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্য হল। ১৮১৮ খ্রিঃ ১লা ডিসেম্বর মারা গেল টম।

ভাইয়ের মৃত্যুর পর কিটস স্থির করলেন কবিতা লেখা ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর কবি প্রতিভা ছিল সহজাত। তাই শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্প রক্ষা করা সম্ভব হল না। বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা নিয়েই আবার শুরু করলেন কবিতা লেখা।

এই সময়ে ঘটল এক ঘটনা। ব্রাউনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন মিসেস ব্রাউন নামে এক মহিলা। তাঁর সুন্দরী তরুণী কন্যা ফ্যানি ব্রাউনকে দেখে মুগ্ধ হলেন কিটস।

দুজনের পরিচয় ক্রমেই গভীরতর হল। ফ্যানি শোনাতেন গান, কিটস তাঁকে পড়ে শোনাতেন নিজের কবিতা।

ফ্যানির প্রাণোচ্ছল সান্নিধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই নিরাশ কবি মানসিক শক্তি অনেকটা ফিরে পেলেন।

কিছুদিন পরে ফ্যানিকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন কিটস। ফ্যানি সানন্দে সম্মতি জানালেন। কিন্তু কিটস তখনো স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেন নি বলে এই বিয়েতে সম্মতি দিলেন না মিসেস ব্রাউন।

ফ্যানি ততদিনে হয়ে উঠেছেন কবির ধ্যানের দেবী। তাঁর পরবর্তীকালের অনেক কবিতাতেই ফ্যানির উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

কিটস এবারে অর্থ উপার্জনের দিকে মন দিলেন। লিখে চললেন একের পর এক কবিতা।

ফ্যানিকে লাভ করার দুর্দম বাসনা নিয়ে কিটস যেসব কবিতা লিখলেন পরবর্তীকালে সেগুলোই স্বীকৃত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা রূপে।

কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত চিঠি লিখতেন ফ্যানিকে। উচ্ছ্বাস ভরা কবির এই চিঠিগুলোতে তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা।

শরীর অনেকদিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না। টমের মৃত্যুর পর থেকেই মাঝে মাঝে মৃত্যুর চিন্তায় আচ্ছন্ন হত তাঁর মন।

অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর দ্রুত খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। কবি বুঝতে পারছিলেন তাঁর জীবনের স্বপ্ন সাধ কিছুই বুঝি আর পূর্ণ হবার নয়। এইবার মৃত্যুর ছায়া গ্রাস করবে তাঁকে।

তাঁর এই অনুভব ধরা পড়েছে ফ্যানিকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি

লিখেছেন, ''আমার এখন একই ভাবনা, তোমার অপরূপ লাবণ্যময় রূপ আর আমার মৃত্যুর ক্ষণ—হায়, এই দুটি যদি একই সাথে পেতাম।''

এক ভাগ্যহত তরুণ কবির আবেগ উচ্ছ্বাস আর ভালবাসায় ভরা এই চিঠিগুলো ইংরাজি সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে রয়েছে। কিটসের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ী ফ্যানিও অমরত্ব লাভ করেছেন।

কিটসের মেজ ভাই জর্জ বিয়ে করে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে অর্থ উপার্জনের সুবিধা করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। মাতামহ যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, তার দেখাশোনা করতেন মিস্টার অ্যাবি নামে এক ব্যক্তি। তিনিই ছিলেন তিন ভাইয়ের অভিভাবক। তিনি কিটসের কবিতা লেখাকে অপরিণত বুদ্ধির কাজ বলেই মনে করতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল পিতামহের সম্পত্তির অংশ পেলে কিটস সবই অপচয় করবেন।

তাই তিনি জানিয়েছিলেন বুদ্ধি পরিণত না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ অর্থকরী কোন পেশা গ্রহণ না করলে কিটসকে তিনি এক কপদকও দেবেন না। ফলে চরম অর্থকষ্টের মধ্যে থেকে দিনদিনই কবির শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

কিটস লিখেছিলেন, ''জীবনের প্রারম্ভেই যে দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, অনুগত স্ত্রীর মতো সেই দুঃখ আমৃত্যু আমার সঙ্গী হয়েছিল।'' অথচ এই দুঃখ কষ্ট তাঁর কিছুটা লাঘব হতে পারত যদি যথাসময়ে সামান্য অর্থ সাহায্যও পেতেন। যথার্থ ভাগ্যহীন ছিলেন বলেই সেই সাহায্য তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি।

দুর্ভাগ্যই তাঁকে বঞ্চিত করেছিল। কিটসের মৃত্যুর পরে তাঁর দিদিমার একটি উইল আবিষ্কৃত হয়।

সেই উইলে তিনি তাঁর নিজের নামের কিছুটা সম্পত্তি কিটসকে দান করে গিয়েছিলেন। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস।

কিটসের অসুস্থতা ফ্যানিকে ক্রমেই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল। অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা বেড়ে যেতে লাগল। শয্যাশায়ী কিটসের সামনে দিয়েই তিনি সাজগোজ করে বেরিয়ে যেতেন বাইরে। আর ক্ষোভে ঈর্ষায় অসহায়তায় হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হত কিটসের।

ফ্যানির অবহেলা অপমান হয়ে বাজছিল বুকে। সেই অপমানের জ্বালা আর সহ্য করতে পারছিলেন না কিটস। তাই একদিন সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা বুকে করে ফিরে এলেন লন্ডনে।

কিন্তু ইটালির রৌদ্রোজ্জ্বল শুকনো আবহাওয়া থেকে ইংলন্ডের স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় এসে বেশি দিন সুস্থ থাকতে পারলেন না তিনি।

একদিন বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। রোদ ঝলমলে দিন ছিল বলে সঙ্গে বিশেষ গরম পোশাক নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

কিন্তু বাড়ি ফিরেত রাত হয়ে গেল। বাইরে তখন হিমেল হাওয়া। তাতেই কাবু হয়ে পড়লেন তিনি। সেই রাতেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। সঙ্গে কাশি। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে।

মোমবাতির আলো ফেলে তিনি কিছুক্ষণ রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বন্ধু ব্রাউনকে বললেন যে, এই রক্তের চিহ্ন হল তাঁর মৃত্যুর পরোয়ানা। এই রক্তের রং তাঁর চেনা।

সেই যুগে যক্ষ্মা রোগের কোন চিকিৎসা ছিল না। লোকে বলত রাজযক্ষ্মা। ডাক্তার এসে দেখলেন কিটসকে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শিরা কেটে খানিকটা রক্ত বার করে দেওয়া হল। কিন্তু এতে রোগের কিছুমাত্র উপশম হল না।

একই রোগে মারা গিয়েছিলেন মা, ভাই। তাই কিটসের বুঝতে অসুবিধা হল না, এবার ডাক এসেছে তাঁর। তাঁকেও যেতে হবে। কিন্তু সেটা তাঁর মৃত্যুর বয়স নয়। সবে পঁচিশে পা দিয়েছেন।

সেই থেকে শুরু হল। মাঝে মাঝেই জ্বর আসতে লাগল। গলার স্বরও বসে গেল। কাশির সঙ্গে উঠে আসত রক্ত। দিনে দিনে আয়ু ফুরিয়ে আসতে লাগল তরুণ কবির। তখন আর তেমন করে লিখতেও বসতে পারেন না। অথচ কবিতা রয়েছে তাঁর রক্তে।

কিটসকে নিয়ে বন্ধুদের দুশ্চিন্তার অবধি নেই। তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্য সকলেই ব্যাকুল। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন ইংলন্ডের পরিবেশে থাকলে রোগের প্রকোপ দিনদিনই বাড়তে থাকবে। ইটালির শুকনো আবহাওয়ায় কবি অনেকটা সুস্থ থাকবেন।

এই সময়, ১৮২০ খ্রিঃ কিটসের তৃতীয় ও সর্বশেষ কাব্যসংকলন প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থের যুগোত্তীর্ণ কবিতাগুলিই কিটসকে পৃথিবীব সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে দিল।

কিছু বড় কবিতার সঙ্গে, সনেট বা ছোট কবিতা (ode) স্থান পেয়েছে এই সংকলন গ্রন্থে।

বড় কবিতাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল Isabella or the Pot of Basil, The Eve of Saint Agnes, The Eve of Saint Mark, Hyperion প্রভৃতি। ইতিহাস, পুরাণ ও কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত এই সব কবিতা রচনার উৎকর্ষে, কল্পনার ব্যাপ্তিতে, বর্ণনা ও আঙ্গিকের সৌন্দর্যে হয়ে উঠেছে অনন্যসাধারণ।

কিটস ছিলেন আলোর পথিক—সৌন্দর্যের পূজারী। তিনি বিশ্বাস করতেন অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় উত্তরণই হল মানব জীবনের

পরিপূর্ণতা। তাই মৃত্যুর মধ্যেও তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন, হতাশার মধ্যে জয়গান করেছেন জীবনের।

Hyperion হল অসমাপ্ত কাব্য। কিন্তু তার মধ্যেই কিটসের নিজস্ব রচনাশৈলী, মানসলোক ও কল্পনার উৎকর্ষ পরিস্ফুট।

তাঁর ছোট কবিতাগুলিও ছিল কাব্যসুষমা মন্ডিত অপরূপ সৃষ্টি। এই কবিতাগুলির মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের মৌলিক প্রশ্ন, ব্যক্তিমানুষের কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধ। রচনা করেছেন জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা সীমাবদ্ধ পার্থিব ভঙ্গুর জীবনের পাশাপাশি প্রাত্যহিক দুঃখ-যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে মৃত্যুহীন এক অমৃতলোকের আহ্বান।

কিটসের ছোট কবিতাগুলির মধ্যে অনন্যসাধারণ সৃষ্টি হল, Ode to a Nightingle, Ode to Autumn, Ode on Melancholy, Ode to Grecian Urn, প্রভৃতি।

কিটস মূলত ছিলেন কবি। গদ্য লেখার চেষ্টা কখনও করেননি। কিন্তু তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের মাত্র ছয় বছরের সাহিত্য জীবনে, উনিশ থেকে চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে যা সৃষ্টি করে গেছেন, তা পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। আপন সৃষ্টির মহিমায় অমরত্ব অর্জন করেছেন তিনি।

কিটসের কাব্যে তাঁর মানসলোকের সন্ধান পাওয়া গেলেও ব্যক্তিজীবনের কোন ছবি পাওয়া যায় না।

ব্যক্তি কিটসকে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর কিছু চিঠির মধ্যে। এই চিঠিগুলি কবি লিখেছিলেন তাঁর প্রণয়ী ফ্যানি ও বিভিন্ন বন্ধুর কাছে।

এছাড়াও বেশ কিছু বেদনা-সিক্ত চিঠি নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। ফ্যানিকে লেখা এই পত্রগুচ্ছ তাঁর মৃত্যুর পর এক নীতিবাগিশ লোকের হাতে পড়েছিল। বেদনার অশ্রুজলে সিক্ত ভাষা ও আবেগ-মাখা চিঠিগুলি পড়ে সেই লোকের ধারণা হয়েছিল উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সেগুলো বিষবৎ। চিঠিগুলো সে তাই পুড়িয়ে ফেলেছিল।

কিটসের পত্রগুচ্ছ তাঁর কবিতার মতই অসাধারণ। এগুলির মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর ব্যক্তিমানসের বিভিন্ন অনুভূতি ও আবেগ।

বন্ধুরা পরামর্শ করে স্থির করেছিলেন, রোগারোগ্যের জন্য কিটসকে পাঠানো হবে ইটালিতে। সেখানে রওনা হবার এক মাস আগে ১৮২০ খ্রিঃ তাঁকে নিয়ে আসা হল ফ্যানিদের বাড়িতে।

এই একটি মাস তিনি তাঁর প্রিয়তমা নারীর নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ফ্যানি আর তাঁর মার অক্লান্ত সেবায় জীবনের শেষ কটা দিন কবি কিছুটা স্বস্তি ও শান্তি লাভ করেছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে কিটস জাহাজে চেপে রওনা হলেন ইটালিতে। এবারে তাঁর সঙ্গী হলেন তরুণ শিল্পী বন্ধু সেভার্ন।

ছয় সপ্তাহের সমুদ্র পথে কিটস অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন ফ্যানিকে। এই সময়েই জীবনের শেষ কবিতা লিখেছিলেন কবি আকাশের ধ্রুবতারাকে নিয়ে। মৃত্যুর পর ওই ধ্রুবতারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার অভিলাষ জানিয়েছিলেন তিনি।

১৩ সেপ্টেম্বর রওনা হয়ে দীর্ঘ সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে কবি ইটালি এসে পৌঁছলেন ২১ অক্টোবর। এখানকার আকাশ রোদ ঝলমল, নেই কুয়াশা—ইংলন্ডের মতো হিমেল হাওয়া।

কিটসের মনে আশা জেগে উঠল। তাঁর মনে হল, তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার ফিরে যেতে পারবেন ফ্যানির কাছে।

কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। তাই কিটসের শেষ বাসনা অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল।

সেই সময় কবি-বন্ধু শেলী ছিলেন পিসায়। সংবাদ পেয়ে তিনি কিটসকে লিখলেন তাঁর কাছে যাবার জন্য। জানালেন, কবিকে রোগমুক্ত করবার সবরকম চেষ্টা তিনি করবেন।

কিটসের কবিপ্রতিভাকে ঈর্ষা করতেন শেলী। কিন্তু বন্ধুর বিপদের দিনে তাঁর মন ছিল বিকারমুক্ত। তাই আন্তরিকভাবেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিটসকে।

কিন্তু শেলীর কাছে যাওয়া হল না কিটসের। সেই সময় যক্ষ্মারোগের সবচেয়ে বড় চিকিৎসক ডাক্তার ক্লার্ক থাকতেন রোমে। কিটসকে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হল। ঘর ভাড়া নিয়ে অবিলম্বে চিকিৎসাও শুরু হল।

কিন্তু রোগের উপশম তো হলই না, উপরন্তু শরীর দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। কাশির সঙ্গে রক্তবমিও বন্ধ হল না।

যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এই সময় কবি বারবার ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু কামনা জানাতেন। বন্ধু সেভার্ন ছিলেন অহোরাত্রের সঙ্গী। ক্লান্তিহীন সেবা ও শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে তিনি কিটসের মনে সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করতেন।

যন্ত্রণাক্লিষ্ট কিটস একদিন সেভার্নকে ডেকে বললেন, তুমি ইংলন্ডে ফিরে যাও। আমাকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করে কেবল নিজেকেই শেষ করে চলেছ।

অতুলনীয় বন্ধুপ্রীতি ও কর্তব্যবোধ সেভার্নের। কোন অবস্থাতেই তিনি কর্তব্যচ্যুত হননি। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন প্রিয় কবির দিন শেষ হয়ে আসছে।

কিটস নিজেও তখন শেষের দিন গুণছেন। এমনি সময়ে একদিন এল ফ্যানির চিঠি।

কিন্তু সেই চিঠি খুলে পড়বার মতো ব্যাকুলতাটুকু নিঃশেষে শুষে নিদারুণ রোগযন্ত্রণা। কিটস বন্ধুকে অনুরোধ করলেন, মৃত্যুর পরে যেন এই চিঠি তাঁর কফিনে দিয়ে দেওয়া হয়।

এগিয়ে এলো সেই কালো শুক্রবার, ১৮২১ খ্রিঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি। রাত তখন এগারোটা। আচ্ছন্ন অবস্থায় বিছানায় পড়েছিলেন কিটস। সহসা চোখ মেললেন। ব্যাকুল সেভার্ন বসেছিলেন শিয়রের পাশে। কবি তাঁকে বললেন তুলে বসিয়ে দিতে। বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবারে আমি মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেব।

নিলেনও তাই। বন্ধু সেভার্নের কোলে মাথা রেখেই চিরদিনের মতো চোখ বুজলেন কবি কিটস।

বোরিস পাস্তেরনাক

অনন্য সাহিত্যকীর্তি যে কজন প্রতিভাবান লেখককে বিশ্ব সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্থায়ী আসন দান করেছে রুশ সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল কথাশিল্পী বোরিস পাস্তেরনাক তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

রাশিয়ার মস্কো শহরে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী জন্মেছিলেন বোরিস। সময়টা একটা সন্ধিলগ্ন—উনবিংশ শতকের সমাপ্তি এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভ। আবির্ভাবের এই ঐতিহাসিক পটভূমি তাঁর জীবন ও সাহিত্যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে।

বোরিসের পিতা লিওনিদ ওসিপোভিচ পাস্তেরনাক ছিলেন একজন দক্ষ এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। অপরদিকে মা রোজালিয়া ইসাদোরোভগা-এর ছিল পিয়ানো বাদনে পারদর্শিতা। ফলে বাড়ির পরিবেশে মিশেছিল এক আবেগময় শৈল্পিক প্রণোদনা। আর এই পরিবেশেই বোরিসের শিল্পীসত্তা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল।

রাশিয়ার ঋষিতুল্য অমর কথাশিল্পী লিওনিদ তলস্তয় ছিলেন বোরিসের বাবা লিওনিদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তলস্তয়ের গল্পের ছবি আঁকতেন তিনি। ফলে বাল্যবয়স থেকেই তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছেন বোরিস। স্বপ্নে কল্পনায় এই আশ্চর্য মানুষটি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর অন্তর্লীন প্রেরণার উৎস।

বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলেও তাঁরই মত বিখ্যাত চিত্রকর হয়ে উঠুক। তার জন্য তাঁর যত্নেরও ত্রুটি ছিল না।

বাবার ছবি আঁকার সময় তলস্তয়কে মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করতেন বোরিস। দেখে দেখে মনের অবচেতনে কখন অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল লেখক হবার বাসনা তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন নি।

অপরদিকে মায়ের পিয়ানো বাজানো শুনে শুনেই বয়স বেড়ে উঠেছিল। ফলে সঙ্গীতের প্রতিও জন্মে গিয়েছিল ভালবাসা। পড়াশোনার পাশাপাশি শুরু হয়েছিল সঙ্গীতের পাঠ নেওয়া।

স্কুলের গন্ডী পার হবার পর দর্শন নিয়ে পড়া আরম্ভ করলেন। প্রথমে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে জার্মানীর মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

লিরিকা নামের পত্রিকায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বরিসের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। এভাবেই লেখক বরিস পাস্তেরনাক-এর সাহিত্যাঙ্গনে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। সাহিত্য জীবনকেই উপজীব্য করবার প্রেরণা পান তিনি এই সময় থেকেই।

পরের বছর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হলেও পায়ে ত্রুটি থাকার কারণে তাঁর আর যুদ্ধে যোগ দেওয়া হয়নি। সৈন্যবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

প্রথমে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লব, জারতন্ত্রের পতন এবং পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—ঐতিহাসিক এই চরম অস্থিরতা ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বরিসের শৈশব এবং যৌবন অতিক্রান্ত হয়।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর বিপ্লবের পর সংঘাতপূর্ণ রাশিয়ায় এল ঐতিহাসিক রূপান্তর। কার্ল মার্কসের ভাবাদর্শে প্রাণিত লেনিন এবং স্তালিন এলেন বলশেভিকদের নেতৃত্বে। দেশ থেকে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা উঠে গেল, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসেরও ঘটল অবলুপ্তি। এলো গৃহযুদ্ধ।

কাতারে কাতারে সাধারণ মানুষ প্রাণ হারালো। এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—স্তালিনগ্রাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, হিটলারের পতন এবং স্তালিনোত্তর যুগে ক্রুশ্চেভের আবির্ভাব।

সামাজিক ও রাজনৈতিক এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলেছেন পাস্তেরনাক।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে লাইউভার্স চাইল্ডহুড গল্পগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান তিনি। ইতিপূর্বে প্রকাশিত মাই সিস্টারস লাইফ কাব্যগ্রন্থও যথেষ্ট খ্যাতি এনে দিয়েছিল তাঁকে। ফলে আর্থিক সঙ্গতির আশ্বাস পেয়ে মনেপ্রাণে লেখক জীবনকেই বেছে নিলেন।

পাস্তেরনাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে অ্যাবাব দ্য বেরিয়ারস এবং মাই সিস্টারস লাইফ।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল থিমস অ্যাণ্ড ভেরিয়েশনস, সেকেণ্ড

বার্থ, আরলি ট্রেনস এবং দ্য ভাস্ট আর্থ। তাঁর সর্বশেষ কবিতার বই হোয়েন দ্য স্কাইস ক্লিয়ার।

কবিতা এবং গল্প উপন্যাস রচনার পাশাপাশি অনুবাদ কর্মেও তিনি হাত দিয়েছিলেন। ইংরাজি, জার্মান ও ফরাসী ভাষা ভাল জানতেন। ফলে বিদেশী সাহিত্যের সেরা সম্ভার নিয়ে এলেন রাশিয়ান সাহিত্যে। শেকসপীয়ারের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসেবেও খ্যাতিলাভ করলেন।

পাস্তেরনাক-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস ডঃ জিভাগো প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে বেরয় ইতালিয় সংস্করণ। পরে মূল রুশ সংস্করণ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চমকপ্রদ আলোড়ন সৃষ্টি করল এই বই।

পরের বছরেই, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর সুইডিশ একাডেমির ঘোষণায় জানা গেল সেই বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে রুশ সাহিত্যিক বোরিস পাস্তেরনাককে তাঁর ডঃ জিভাগো উপন্যাসের জন্য।

রাজনৈতিক কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এই পুরস্কার গ্রহণ করতে পারলেন না পাস্তেরনাক।

ডঃ জিভাগো পৃথিবীর প্রায় সবকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। রাশিয়ার শাসকশ্রেণীর সমালোচনা করে লেখা পাস্তেরনাকের এই একমাত্র উপন্যাস সঙ্গত ভাবেই রাশিয়া জুড়ে আলোড়ন তুলেছিল।

লেখকের বিখ্যাত রচনাগুলি হল With my sister's life (1922) Themes and variations sublime, Maladay, krf the year, Aerial ways (1925) In Early Trains এবং একমাত্র উপন্যাস Doctor Zhivago

১৯৬০ খ্রিঃ ৩০ শে মে মানবতাবাদী এই মহান লেখকের জীবনাবসান হয়।

মিকেলেঞ্জেলো

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মিকেলেঞ্জেলো। কিন্তু কেবল ভাস্কর বললে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি ছিলেন একাধারে ভাস্কর, চিত্রশিল্পী কবি এবং স্থপতি।

মিকেলেঞ্জেলো হলেন শিল্পীদের শিল্পী। তাঁর জন্মের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে, এখনো পর্যন্ত তাঁর শিল্পকৃতি শিল্পীদের অনুপ্রেরণা হয়ে আলোর দিশারী রূপে বিরাজ করছে।

মিকেলেঞ্জেলোর পরিবার ছিল ইতালির ফ্লোরেন্সের অধিবাসী। সেই ফ্লোরেন্স,

পঞ্চদশ শতাব্দীতে যা ছিল ইতালির শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। সমগ্র ইউরোপের জ্ঞানী গুণী মানুষদের সমাবেশ ছিল সেখানে। দিনরাত চলত জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা।

লরেঞ্জ দ্যা মেদিচি ছিলেন ফ্লোরেন্স গণরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধান। তাঁরই প্রেরণা ও উৎসাহে ফ্লোরেন্সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জেগে উঠেছিল রেনেসাঁর প্রাণস্পন্দন।

কর্মসূত্রে ফ্লোরেন্স থেকে ক্যাস্পারেসক সহরে এসে বসবাস করছিলেন লুডোভিকো বোনোয়োত্তি। ছমাসের জন্য তিনি হয়েছিলেন এই সহরের মেয়র। সেই সময়ই তাঁর জগৎ বিখ্যাত সন্তান মিকেলেঞ্জেলোর জন্ম হয়। সময়টা ১৪৭৫ খ্রিঃ ৬ মার্চ।

মিকেলেঞ্জেলোর জন্মের পরেই তাঁর মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বাধ্য হয়েই সন্তানের জন্য একজন ধাত্রী নিয়োগ করেছিলেন লুডোভিকো। এই ধাত্রী ছিলেন একজন পাথর খোদাইকারীর স্ত্রী। তিনি নিজেও অবসর সময়ে পাথরের কাজ করতেন।

শিশু মিকেলেঞ্জেলো ধাত্রীমাতার পাথর ছেনি হাতুড়ি নিয়ে খেলা করতে শিখেছিলেন। এভাবেই মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে শিল্পের বীজ মিশে গিয়েছিল বিশ্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর সর্ব সত্তায়। পাথর কাটা দেখতে দেখতেই পাথর হয়ে উঠেছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

মিকেলেঞ্জেলোর পড়াশুনা শুরু হয়েছিল ইতালি ভাষাতেই। দশবছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল স্কুলে।

মিকেলেঞ্জেলোর এক বন্ধু ছবি আঁকা শিখতেন চিত্রশিল্পী গিরলানদিও-এর কাছে। দেশজোড়া খ্যাতি এই শিল্পীর। অন্তর্নিহিত আকর্ষণের তাগিদে বালক মিকেলেঞ্জেলো বন্ধুর আঁকা ছবি দেখে আঁকার চেষ্টা করেন। নিজেই আঁকেন গাছপালা পাহাড়ের ছবি। ছবি আঁকতে বসলে এমন তন্ময় হয়ে যেতেন তিনি যে অন্য কোন দিকে খেয়াল থাকত না।

একদিন বাবার কাছে মিকেলেঞ্জেলো বায়না ধরলেন ছবি আঁকা শিখবেন। লুডোভিকো চমকে উঠলেন ছেলের কথা শুনে। তাঁর ইচ্ছা ছিল ছেলে লেখাপড়া শিখে ব্যবসা করবেন। সংসারের দরিদ্রদশা ঘোচাবেন। তাই তিনি শিল্পের পথে দিতে রাজি হলেন না ছেলেকে।

শেষ পর্যন্ত মিকেলেঞ্জেলোর আগ্রহ দেখে বাবা সম্মত হলেন। ১৩ বছর বয়সেই স্কুলের পড়া সাঙ্গ হল মিকেলেঞ্জেলোর। তিনি ছবি আঁকা শিখতে ভর্তি হলেন গিরলানদিওর স্টুডিওতে।

কিন্তু এই শিক্ষকের কাছে বেশি কিছু শেখার ছিল না তাঁর। শিক্ষক নিজেই

একদিন জানালেন, আমি যা জানি এই ছেলেটি তার চাইতেও বেশি জানে। আমি তাকে কী শেখাব।

রাজকুমার লরেঞ্জ দ্য মেদিচি তাঁর প্রমোদউদ্যানে গড়ে তুলেছিলেন একটি ভাস্কর্যের সংগ্রহশালা। ইতালির শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছিল সেখানে। উদ্যানের পাশেই তাঁর বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভাস্করদের স্কুল। সেই স্কুলের দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছিলেন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বারতোলদোর হাতে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা সেখানে এসে শিক্ষা নিত।

একদিন মিকেলেঞ্জেলো ঘুরতে ঘুরতে মেদিচি প্রাসাদের উদ্যানের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাথর কুঁদে তৈরি সারি সারি মূর্তি সাজানো রয়েছে, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন রক্ত মাংসের জীবন্ত মূর্তি। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকেন কিশোর মিকেলেঞ্জেলো।

সেই দিনই নিজের পথ স্থির করে ফেললেন তিনি। ছবি আঁকা নয় ভাস্কর্যই হবে তাঁর একমাত্র ভবিষ্যৎ। নিরেট নিষ্প্রাণ পাথর কুঁদে তিনিও সৃষ্টি করবেন এমনি সব প্রাণবন্ত প্রতিমা।

১৪৮৯ খ্রিঃ মিকেলেঞ্জেলো ভর্তি হলেন মেদিচির স্কুলে। এখানেই অক্লান্ত শ্রমের মধ্য দিয়ে ১৪৯২ খ্রিঃ পর্যন্ত চলল তাঁর শিক্ষানবিসি। শিল্পের একনিষ্ঠ সাধকে রূপান্তরিত হলেন মিকেলেঞ্জেলো।

একদিন ফেলে দেওয়া এক টুকরো পাথর নিয়ে মিকেলেঞ্জেলো তার ওপরে খোদাই করে ফেললেন এক ভ্যাঙচানো জোকারের মুখ। নিজের সৃষ্টি প্রথম পাথরের মূর্তি। মনের আনন্দে বসলেন মূর্তিটি পালিশ করতে।

ঘটনাচক্রে সেই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন লরেঞ্জো। মূর্তি দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে জানতে চাইলেন মূর্তিটি কার তৈরি।

উত্তর শুনে তিনি বললেন, দেখে তো মনে হচ্ছে মানুষটি বৃদ্ধ। কিন্তু বৃদ্ধের মুখে সবগুলো দাঁত অক্ষত রয়েছে দেখছি। বুড়ো হলে মানুষের তো দু একটা দাঁত পড়ে যায়।

কথা শেষ করে তরুণ শিল্পীর পিঠে আলতো চাপড় মেরে চলে গেলেন লরেঞ্জো।

নিজের ভুল বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হল না মিকেলেঞ্জেলোর। বিষয়টা তাঁর আগেই নজরে আসা উচিত ছিল।

ছেনি আর হাতুড়ি তুলে নিলেন হাতে। বৃদ্ধের মুখের ওপরের পাটির একটা দাঁত ভেঙ্গে দিলেন।

পরদিন বাগানে এসে মূর্তিটির ওপর চোখ ফেললেন লরেঞ্জো। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন বারতোলদো। মুগ্ধ লরেঞ্জো তাঁকে বললেন, একদিনেই মূর্তির

বয়স কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। এই ছেলেকে বাইরে থেকে যাতায়াত করতে দেওয়া চলে না। এখন থেকে আমার প্রাসাদে আমার পরিবারের একজন হয়েই সে শিল্পচর্চা করবে।

সেদিন থেকেই মেদিচি প্রাসাদে নতুন এক জীবন শুরু হল তরুণ মিকেলেঞ্জেলোর।

বারতোলদো প্রাণমন ঢেলে শিক্ষা দিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রকে। গুরুর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার নয়ননন্দন ছবি, অনবদ্য মূর্তি দেখে উৎসাহে টগবগ করেন মিকেলেঞ্জেলো।

মনে মনে সঙ্কল্প করেন, তিনিও একদিন এমন মূর্তি গড়বেন, যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে ফ্লোরেন্সের মানুষ।

ইতিমধ্যে দৈব দুর্বিপাকের মতো বাইরের জগতে দেখা দিল আলোড়ন। ফ্লোরেন্সের প্রধান গীর্জায় যাজক নির্বাচিত হয়ে এলেন ধর্মান্ধ সাভানরোল। তিনি এসে ঘোষণা করলেন, মেদিচিদের পোষকতায় মানুষ অন্যায় আর পাপের চর্চা করে চলেছে।

শিল্প সাহিত্যের নামে যা করা হচ্ছে তা সবই ধর্মবিরুদ্ধ। সৌন্দর্যের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পাপ আর শয়তানের কীট।

ধর্মযাজকের কথায় মানুষের মনে আলোড়ন উপস্থিত হল। শিল্প সাহিত্যের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হতে দেরি হল না।

লরেঞ্জ বুঝতে পারেন না, সৌন্দর্যের মধ্যে কী করে লুকিয়ে থাকে পাপের কীট। মানুষের আত্মারই বাঙ্ময় প্রকাশ হল সৌন্দর্য—শিল্পসাহিত্য।

এই বিশ্বাস আর আদর্শের মধ্যেই আবাল্য লালিত হয়েছে তাঁর মানসিকতা, শিক্ষা। তাই অন্তর থেকে তিনি মেনে নিতে পারলেন না স্বৈরাচারী ধর্মযাজকের ফতোয়া। তিনি পাথর আর হাতুড়ি বাটালি নিয়ে বসলেন মূর্তি গড়তে।

এই সংকট সময়েই তিনি তৈরি করলেন দুটি মূর্তি—ম্যাডোনা আর সেন্টরের যুদ্ধ।

তৃতীয় মূর্তি গড়ার কাজে যখন হাত দিলেন এই সময়ে খবর পেলেন তাঁর জীবনের আদর্শ পুরুষ লরেঞ্জ মারা গেছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তাঁর বড় ছেলে পিয়েরো।

কিন্তু পিতার বিচক্ষণতা ও শিল্পসাহিত্য প্রীতি ছিল না পিয়েরোর মধ্যে। তাই তিনি জনসাধারণের মনে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হলেন।

ইতিমধ্যে সাভানরোলের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মান্ধ পুরুষ তাঁর নেতৃত্বে শুরু করল উন্মত্ত তান্ডব।

শিল্প সাহিত্য ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলো ধর্মান্ধতার তান্ডবে ধ্বংস হয়ে গেল। মেদিচি পরিবারের লোকজন প্রাণভয়ে নানাদিকে পালিয়ে গেল।

ফ্লোরেন্সে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না মিকেলেঞ্জেলো। তিনি চলে গেলেন বেলেনায়।

বিপ্লবের আগুন সেখানেও ছড়িয়েছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির বিবাদের কালো ধোঁয়া ক্রমশই আকাশ আচ্ছন্ন করছিল।

কুড়ি বছরের তরুণ মিকেলেঞ্জেলো নতুন সহরে নিতান্তই অনামী, অপরিচিত। কাজের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না। নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন ফ্লোরেন্সে।

শিল্পগতপ্রাণ মিকেলেঞ্জেলো। কাজ ছাড়া নিরানন্দময় দিনগুলো অসহনীয় হয়ে উঠলো তাঁর। করার মতো কাজ যখন বাইরে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের স্বপ্ন রূপদানের উদ্যোগ নিলেন।

হাতের শেষ সম্বলটুকু খরচ করে কিনে আনলেন একখন্ড পাথর। কয়েক দিনের চেষ্টায় পাথরে রূপ নিল অনবদ্য এক মূর্তি। মাথার তলায় হাত রেখে ঘুমোচ্ছে এক শিশু।

মূর্তি দেখে এক ব্যবসাদার বন্ধু সাগ্রহে কিনে নিলেন কাজটি। সেই ভদ্রলোক পুরনো শিল্পকর্ম বলে সেটি বিক্রি করার জন্য নিয়ে গেলেন রোমে। কিন্তু কার্ডিনাল বিয়ারিয়ো দেখেই বুঝতে পারলেন, এটি কোন প্রাচীন শিল্পকর্ম নয়। তিনি শিল্পীর সন্ধান করার জন্য ঠিকানা নিয়ে লোক পাঠালেন ফ্লোরেন্সে।

ফ্লোরেন্সের আবহাওয়া ইতিমধ্যে রূপ পাল্টাতে শুরু করেছে। ধর্মোন্মাদ সাভানরোলের নিয়ম-নীতির পীড়নে অতিষ্ঠ ফ্লোরেন্সের মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

এই অসন্তোষের সংবাদ রোমে পৌঁছলে পোপের আদেশে বন্দি করা হয়েছে সাভানরোলকে। শেষ পর্যন্ত ১৪৯৮ খ্রিঃ ফ্লোরেন্সের প্রধান গির্জার যাজককে পুড়িয়ে হত্যা করা হল। তার মৃত্যুর সঙ্গে স্বস্তি ফিরে এলো ফ্লোরেন্সের জনগণের মধ্যে।

ঠিক এমনি সময়েই রোম থেকে কার্ডিনালের আহ্বান পেলেন মিকেলেঞ্জেলো। আশান্বিত হলেন তরুণ শিল্পী।

ইটালীর শ্রেষ্ঠ সহর রোম, প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্যে মোড়া। নিশ্চয়ই ভাল কাজ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।

অবিলম্বে রোমে উপস্থিত হলেন মিকেলেঞ্জেলো। কার্ডিনাল বিয়ারিয়ো সাদরে গ্রহণ করলেন তরুণ শিল্পীকে।

কাজের জন্য ৭ ফুট মাপের এক টুকরো পাথর দিলেন তাঁকে। কিন্তু কি কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কিছুই জানালেন না।

আশায় আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন মিকেলেঞ্জেলো। একটি একটি করে দিন অতিবাহিত হয়, হাতের সম্বলও ফুরিয়ে আসে।

শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে উঠলেন তিনি। নিজেই পাঁচ ফ্লোরেন খরচ করে ছোট একটা পাথর কিনে কাজ শুরু করলেন।

তিন দিনের মধ্যেই শেষ করলেন একটি শিশুমূর্তি। স্বর্গীয় হাসি মাখানো সেই শিশুর মুখে।

মূর্তি তো তৈরি হল, এবারে বিক্রির চিন্তা। কোথায় যাবেন ভাবছেন, এমনি সময়ে একদিন পথে দেখা হল ছেলেবালার এক বন্ধু বালদুচ্চির সঙ্গে।

রোমের নামকরা ব্যাঙ্কার ইয়াকোপা গাল্লির কর্মচারী বালদুচ্চি। বন্ধুর তৈরি মূর্তিটি দেখেই তাকে টেনে নিয়ে গেল তার মালিকের কাছে।

গাল্লি ছিলেন যথার্থ শিল্পরসিক। মূর্তিটি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন তিনি। কিনে নিলেন ৭৫ ডুকেট দিয়ে। আশাতীত অর্থ পেয়ে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন শিল্পী।

তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীর পৃষ্ঠপোষণের ত্রুটি করলেন না ধনাঢ্য গাল্লি। তাঁকে তিনি নিজের বাগান বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন তাঁর সমস্ত ব্যয়ভার।

কার্ডিনাল ৭ ফুট মার্বেল পাথরটা মিকেলেঞ্জেলোকে দান করে দিয়েছিলেন। সেই পাথর নিয়ে এসে তিনি রূপ দিলেন প্রকৃতির দেবতা বাক্কোকে। জীবন ও ধ্বংসের রূপ একই মূর্তির মধ্যে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুললেন।

দেবতা বাক্কোর হাতে মদের পাত্র। তার পায়ের কাছে আঙুর গুচ্ছ থেকে রস চুষে খাচ্ছে একটি শিশু। অপূর্ব তার রূপ, অপরূপ ভঙ্গিমা।

মিকেলেঞ্জেলোর এই নতুন মূর্তি দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হলেন গাল্লি।

এক বৃদ্ধ কার্ডিনাল তাঁর উপাসনা কক্ষের জন্য একটি মূর্তি গড়তে চাইছিলেন। গাল্লি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন শিল্পীর।

এবারে নিজের আরাধ্য মূর্তির রূপদান করতে বসলেন মিকেলেঞ্জেলো।

ক্রুশ থেকে নামানোর পরে মৃত যিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন শোকাহত মাতা মেরী। অপার্থিব এক বেদনার মূর্তি । তিনি নাম দিলেন পিয়েটা। যার অর্থ করুণা।

মূর্তিটির কাজ শেষ হবার আগেই কার্ডিনাল মারা গেলেন। কিন্তু মূর্তির জন্য সম্পূর্ণ অর্থই দিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

কাজ শেষ হলে মিকেলেঞ্জেলো মূর্তিটি নিয়ে সকলের অলক্ষে গির্জায় রেখে দিলেন। মূর্তির তলায় খোদাই করে দিলেন নিজের নাম।

ইতিমধ্যে ফ্লোরেন্সে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। নতুন শাসনকর্তা পিয়েরো সোদেরিনি উৎসাহে নতুন করে শিল্প সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছে।

মাতৃভূমিতে ফেরার জন্য উতলা হয়ে উঠল শিল্পীর মন। রোম ছেড়ে রওনা হলেন ফ্লোরেন্সের পথে।

ফ্লোরেন্সে পৌঁছেই একটা চমকপ্রদ খবর পেলেন মিকেলেঞ্জেলো। স্থানীয় উল ব্যবসায়ী সমিতি একটা সতেরো ফুট মার্বেল পাথর দিয়ে মূর্তি গড়বার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু কাকে দিয়ে সেই কাজটি করাবেন তা ভেবে স্থির করতে পারছিলেন না।

শিল্পী লিওনার্দোকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ভাস্কর্য নিকৃষ্ট শিল্প বলে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

পাষাণ কুঁদে মূর্তি গড়ার শিল্পকর্মে উৎসর্গীকৃত প্রাণ মিকেলেঞ্জেলো অত্যন্ত আহত হলেন লিওনার্দোর উক্তি শুনে। তিনি স্থির করলেন কাজের মাধ্যমেই ভাস্কর্য শিল্পের এই অপমানের জবাব দেবেন।

উল ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে দেখা করে স্বেচ্ছায় কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মিকেলেঞ্জেলো। কাজ শুরু করলেন। অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে পাথরের বুক থেকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল বাইবেলের ডেভিড মূর্তি—শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক রূপে।

একদিন শেষ হল বিশাল আকৃতির ডেভিড মূর্তির কাজ। এই মূর্তি যে দেখে তারই মনে হয় যেন বাইবেলের বুক থেকে জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে ডেভিড।

এতদিনে সময় সুপ্রসন্ন হয়েছে। ডেভিড মূর্তির কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রোম থেকে আহ্বান এল স্বয়ং পোপের।

রোমে পৌঁছে কিন্তু হতাশ হলেন শিল্পী। একশ্রেণীর স্তাবকের চক্রান্তে পোপ মিকেলেঞ্জেলোকে কোন কাজ দেবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ব্যর্থমনোরথ শিল্পী ফিরে এলেন ফ্লোরেন্সে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার পোপের ডাক এল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার রোমে এলেন তিনি।

এবারে পোপ তাঁকে নিরাশ করলেন না। সিস্টাইন চ্যাপেলের ভেতরের ছাদে প্রভু যীশু ও তাঁর বারোজন শিষ্যের ছবি আঁকার দায়িত্ব দিলেন তাঁকে।

কিন্তু ছবি আঁকা তো চিত্রশিল্পীর কাজ। মিকেলেঞ্জেলো তো ভাস্কর। তিনি হোলি ফাদার পোপের কাছে পাথরের কাজ প্রার্থনা করলেন।

পোপ জনালেন, শিল্পীকে পাথরের কাজই দেওয়া হবে, তবে তার আগে তাকে সিসটাইন চ্যাপেলের কাজ শেষ করতে হবে। এটা তাঁর আদেশ।

পোপের আদেশ প্রভু যীশুর আদেশ বলেই গ্রহণ করলেন মিকেলেঞ্জেলো।

পোপের নিজস্ব সহর ভ্যাটিকান সিটির প্রধান চ্যাপেল হল সিসটাইন চ্যাপেল। প্রকাণ্ড কেল্লার মতো তার আকৃতি। তিনতলা সমান বাড়ির বিশাল ছাদ। সেই ছাদের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হলেন মিকেলেঞ্জেলো। ছবি এঁকে ওই বিশাল আকাশের মতো ছাদ ভরিয়ে তুলতে যে তাঁর জীবন কেটে যাবে।

কিন্তু মুহূর্তে মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেললেন তিনি। যে করেই হোক এ দায়িত্ব তাঁকে পালন করতেই হবে।

কাজে হাত লাগালেন শিল্পী। ভারা বেঁধে রংতুলি নিয়ে ওপরে উঠলেন।

ওপর থেকে ছাদটা চারদিকে তিন ভাগে বিভক্ত। তার এক ভাগে বাইবেলের বর্ণনা মিলিয়ে যীশুর ১২ জন শিষ্যের ছবি আঁকা শুরু করলেন তিনি।

একাই কাজ করে চলেন শিল্পী। ওপরের দিকে মুখ করে সবসময় কাজ করা চলে না। তাই কখনো কাত হয়ে, কখনো বসে, কখনো শুয়ে, কখনো হেলে—অতি কষ্টে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে কাজ করতে গিয়ে শরীরে খিল ধরে। ব্যথায় ঘাড় টাটিয়ে ওঠে।

তবু ক্লান্তিহীন বিরামহীন শিল্পী। আহার নিদ্রার কথা ভুলে যান। যখন ক্লান্তি বোধ করেন ভারার ওপরেই বিশ্রাম নেন। এভাবে টানা কাজ করে দশবারো দিন অন্তর একবার নেমে আসেন নিচে। তারপর আবার ভারায় উঠে যান। আত্মমগ্ন শিল্পীর সৃষ্টির সাধনা বুঝি একেই বলে।

চিত্রকরের কাজ নিতে সায় ছিল না মনের । কিন্তু কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আঁকার কাজে আকর্ষণ বেড়ে উঠলো মিকেলেঞ্জেলোর।

দীর্ঘ একবছরের নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ছবির কাজ শেষ করলেন। পোপের কাছে নিজেই অনুমতি প্রার্থনা করলেন, অন্য দুটি ছাদে বাইবেলের সৃষ্টি ও ধ্বংসের চিত্র আঁকার। পোপ সানন্দে অনুমতি দিলেন।

মিকেলেঞ্জেলো শুরু করে দিলেন আদম ঈভ আর স্বর্গোদ্যানের ছবি দিয়ে। ঈশ্বর জল আকাশ জীবজন্তু, ইত্যাদি তৈরি করে সবশেষে তৈরি করলেন মানুষ। প্রথম মানুষ আদম ও ঈভ, তাদের স্বর্গচ্যুতির কাহিনী।

এর পর মহাপ্রলয়ের কাহিনী। পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে মহাপ্লাবন সৃষ্টি করলেন। তীব্র জলস্রোতে সকলে ভেসে গেল। কেবল ভেসে রইল নোয়ার নৌকো।

দীর্ঘ চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সিসটাইন চ্যাপেলের কাজ শেষ করলেন মিকেলেঞ্জেলো। এই সব চিত্র কালোত্তীর্ণ—সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি।

সিসটাইনের কাজ শেষ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই মারা গেলেন পোপ। লরেঞ্জোর দ্বিতীয় পুত্র কার্ডিনাল জাভান্নি দ্য মেদিচি নতুন পোপ হলেন। তিনি দশম পোপ লিও।

মিকেলেঞ্জেলোর শিল্পী জীবনের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সেন্ট পিটার্স-এর গম্বুজটি। ১৫৩৭ খ্রিঃ এই গম্বুজ নির্মাণের কাজে হাত দেন তিনি।

এই মহৎ শিল্পীর শিল্পীসত্তার দ্বিতীয় প্রেম ছিল কবিতা। জীবনের প্রথম পর্বে

কবিতার প্রতি যে অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল তাঁর কঠোর শিল্পী জীবনের অন্যতম জীবনীশক্তি।

১৫৩৮ খ্রিঃ তাই ষাটোর্ধ্ব কবি মিকেলেঞ্জেলোকে দেখা যায় আবার সনেট রচনায় উদ্বুদ্ধ হতে।

স্বামীহীনা কবি ভিত্তোরিয়া বোলোনার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার পরে মিকেলেঞ্জেলো রচনা করেন অপরূপ সৌন্দর্য মণ্ডিত বিপুল সনেটগুচ্ছ। ১৫৩৮ খ্রিঃ তাঁর জীবনে আসেন ভিত্তোরিয়ো।

তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল আধ্যাত্মিক সুষমায় মণ্ডিত। ১৫৪৭ খ্রিঃ ভিত্তোরিয়োর মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্পর্ক ছিল অটুট।

ভিত্তোরিয়োর মৃত্যুতে মিকেলেঞ্জেলো বিচ্ছেদ বেদনায় এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে প্রায় সময়েই স্বাভাবিক বোধশক্তিও হারিয়ে ফেলতেন। ভাবনার অতল থেকে উৎসারিত শোকাবেগ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় সনেটের রূপ নিত। সনেটগুলো ছিল যেন কথার ভাস্কর্য—প্রেমিকার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

কাজের বিরাম কিন্তু ছিল না। কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েই তাঁর জীবন-তরণী পৌঁছে গেল একদিন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের ব্যাপ্ত বন্দরে।

১৫৬৪ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারির এক নিরালা অপরাহ্নে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি বন্টন করার পরে মহান যীশুর পায়ে তিনি সমর্পণ করলেন তাঁর আত্মাকে।

শিল্পের সাধনায় সারাটা জীবনই প্রায় মিকেলেঞ্জেলোর কেটেছে নির্জন একাকীত্ব আর অসীম কষ্টের মধ্যে। শিল্পকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন উদার মিতব্যয়ী ও অনাড়ম্বর। পরিবার পরিজনদের নির্দয় ব্যবহারেও বিচলিত হতেন না' কখনও কাউকে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতে জানতেন না। জীবনের সমস্ত তৃপ্তি তিনি অন্বেষণ করেছেন নিরলস কাজের মধ্যে।

বড় বড় কাজ নিয়ে কেটেছে দীর্ঘ সময়। সেই সময় কেবল কাজ করার শক্তিটুকুকে অটুট রাখার জন্যই যৎসামান্য রুটি গ্রহণ করতেন। সেই খাওয়া চলত কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

দিনের পর দিন চলেছে এভাবে। একসময় তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি ধনী হতে পারি, কিন্তু দিন কাটিয়েছি গরীবের মত।"

অর্থের প্রতি আকর্ষণ কখনোই তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। সঞ্চয়ের চিন্তা করেননি কখনো। ভদ্রভাবে চলার মতো যৎসামান্য অর্থ পেলেই খুশি থাকতেন।

সমসাময়িক সহশিল্পীদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ও সহৃদয়তার অভাব

ঘটেনি কখনো। তাঁর শিল্পকৃতীর বিরূপ সমালোচনাও তিনি গ্রহণ করতেন অমলিন উদারতায়।

তাঁর এক গুণমুগ্ধ বন্ধু একবার অনুযোগ করে বলেছিলেন, "সারাজীবন বিয়ে করলে না। ছেলেপুলে থাকলে তোমার শিল্পসৃষ্টি তারা ধরে রাখতে পারত।"

মিকেলেঞ্জেলো হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "শিল্পই আমার স্ত্রী। সেই আমাকে একটার পর একটা সৃষ্টিতে নিযুক্ত করেছে। আমার সৃষ্টিই আমার সন্তান। যত অকিঞ্চিতকর হোক, এই সব শিল্পের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব।"

আত্মগত মহান শিল্পীর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। অপূর্ব সাহিত্যগুণমণ্ডিত তাঁর সনেটগুলি, বিভিন্ন ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প আজও মিকেলেঞ্জেলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষের মধ্যে। শিল্পের ইতিহাসে চির অবিস্মরণীয় তাঁর নাম।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একাধারে নবীন বাংলার বিপ্লবগুরু, সমাজ সংস্কারক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। বাংলায় নতুন যুগে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন যে সকল মহাপ্রাণ পুরুষ, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী খন্নান গ্রামে ১৮৬১ খ্রিঃ ১১ ফেব্রুয়ারি ব্রহ্মবান্ধবের জন্ম হয়।

তাঁর পিতার নাম দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার কনিষ্ঠ পুত্র ভবানীচরণ। পরবর্তীকালে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নামেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

শিশুকালেই ভবানীচরণের মাতৃবিয়োগ হয়। ফলে পিতামহীর আদরে যত্নে বড় হয়ে ওঠেন তিনি। সম্ভবতঃ একারণেই, পিতামহীর স্নেহ প্রশ্রয়ে তাঁর স্বভাব হয়ে উঠেছিল অতি দুরন্ত ও অশান্ত। পরবর্তী জীবনেও তাঁর ব্যক্তিত্বে এই অশান্তভাব বর্তমান ছিল।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই মাতৃভূমির পরাধীনতার গ্লানি দূর করার, শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্ন দেখতেন ভবানীচরণ।

সেই সময়ে পরাধীন ভারতের দিকে দিকে নবজাগরণের ঢেউ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বক্তৃতা করে দেশের পরিস্থিতি

জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছেন। তাঁদের জ্বালাময়ী সে সকল ভাষণে থাকত মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের ডাক।

দূর দূর অঞ্চলে গিয়ে এই দেশনেতাদের বক্তৃতা শুনতে ভবানীচরণের ক্লান্তি ছিল না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে, ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি বক্তৃতা শুনতেন।

ছেলেবেলায় ঠাকুমার কোলে বসে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, গ্রাম্য-ছড়া হেঁয়ালি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভবানীচরণের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। পরে গ্রামের পাঠশালায়, ছয় বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়।

অসাধারণ মেধাবী ছিলেন ভবানীচরণ। একবার যা পড়তেন সহজে তা ভুলতেন না। বাল্য বয়স থেকেই ইংরাজি ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল তাঁর।

স্কুলে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গেই চলত দুষ্টুমি। সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে ভবানীচরণ ছিলেন দলনেতা।

পাঠশালার পরে চুঁচুড়ার হিন্দুস্কুলে ও হুগলী ব্রাহ্মস্কুলে পড়াশুনা করেন তিনি। সব স্কুলেই পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি ছিল তাঁর বাঁধা। একারণে ছাত্র শিক্ষক সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি।

সেই সময়েই ভবানীচরণের মধ্যে উত্তর কালের দেশনেতার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

তেরো বছর বয়সে উপনয়নের পরে ভবানীচরণ আমিষ আহার ত্যাগ করে পুরোপুরি নিরামিষাশী হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পর ভাটপাড়ায় টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।

সহজাত দুরন্তপনার মধ্যদিয়েই সুগঠিত শরীর ও অসাধারণ শক্তি অর্জন করেছিলেন ভবানীচরণ।

সুদৃঢ় শরীরে ছিল বুক ভরা সাহস। অসাধারণ এই শক্তি ও সাহসের সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলেন ভবানীচরণ।

সেই সময়ে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন বসু। ভবানীচরণের যখন সতেরো বছর বয়স সেই সময় একদিন তিনি আনন্দমোহনের কাছে গিয়ে বললেন, কেবল কলমবাজি আর গলাবাজিতে দেশোদ্ধার হবে না। ভারত উদ্ধার করতে হলে চাই তুখোড় তরোয়ালবাজি।

সেই বয়সেই ভবানীচরণ বুঝতে পেরেছিলেন শক্তি প্রয়োগ ছাড়া ভারতবর্ষকে ইংরাজদের কবলমুক্ত করা যাবে না। কেবল বক্তৃতা আর গলাবাজিতে ভারত স্বাধীন হবার নয়।

সশস্ত্র বিপ্লবই ছিল ভবানীচরণের আদর্শ। তাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে সামিল হয়ে আন্দোলন করা তাঁর পোষাল না। তিনি স্থির করলেন সৈনিক হবেন।

সঙ্কল্প স্থির হলে, দেশ উদ্ধারের টানে একদিন গৃহত্যাগ করতেও তিনি দ্বিধান্বিত হলেন না। অন্তরে যার জেগে উঠেছে শৃঙ্খলিত ভারত মাতার স্বাধীন শক্তিরূপিনী প্রতিমূর্তি তার পক্ষে কোন বন্ধনই তো বন্ধন নয়। তাঁর একমাত্র ব্রত সংগ্রাম—লক্ষ্য ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হলে শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন। তাই তিনি স্থির করলেন বাড়ি থেকে পালিয়ে পশ্চিমে কোন দেশীয় রাজার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষা নেবেন।

সঙ্কল্প কার্যে রূপায়িত করতেও বিলম্ব হয় না। সবে সতেরো বছরে পা দিয়েছেন ভবানীচরণ। কলেজের নবীন ছাত্র।

একদিন কলেজের দুমাসের মাইনে দশটাকা সম্বল করে তিনজন সঙ্গী জুটিয়ে গোয়ালিয়র রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

সঠিক পথের সন্ধান জানা নেই। ভাসা ভাসা একটা ধারণার ওপরে ভর করে ট্রেনে চেপে বসলেন চারবন্ধু।

ইটাওয়া স্টেশনে নেমে জানা গেল, সেখান থেকে ৩৬ ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে গোয়ালিয়র।

কুছ পরোয়া নেই। বুকের ভেতরে দাউদাউ জ্বলছে ভারত উদ্ধারের সঙ্কল্প। চারজনে মিলে পায়ে হেঁটেই সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলেন। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। সহজেই এই চার বাঙালী যুবকের পথকষ্ট অনুমান করা সম্ভব।

সমস্ত কষ্ট তুচ্ছজ্ঞান করে হৃদয়ে সিংহবলে বলীয়ান যুবকেরা পথে দুবার যমুনা ও চম্বল নদী পার হলেন।

সম্মুখে ধূ ধূ মাঠ, বালি আর কাঁটাঝোপে ভরা। ছাতু, গুড় আর ছোলা মাত্র আহার্য বলতে সম্বল। তাই নিয়েই অশেষ কষ্ট সহ্য করে তাঁরা একসময়ে স্বপ্নের গোয়ালিয়র পৌঁছলেন।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাওয়া, দুর্ভাগ্যবশত তা সফল হল না। গোয়ালিয়র মহারাজের সেনাপতি চার বাঙালী যুবককে সৈন্যবিভাগে ভর্তি করতে অসম্মত হলেন।

বাধ্য হয়েই ভবানীচরণ কলকাতায় ফিরে এলেন। ভর্তি হলেন মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউটে। কিন্তু পড়াশুনায় আর মন বসাতে পারলেন না।

সেই সময়ে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে ব্রাহ্ম আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাঁদের সংস্কারমূলক আন্দোলন কলকাতার যুবসমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই স্রোতের টানের বাইরে থাকতে পারলেন না ভবানীচরণও।

ততদিনে তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করেছেন। তবে নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন নি।

যেখানে যেমন জুটছে শিক্ষকতা করছেন। এই সূত্রেই তাঁর কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসা।

১৮৮৭ খ্রিঃ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং নববিধান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

কিছুকাল পরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁকে সিন্ধুদেশে যেতে হয়। সেখানে কয়েকজন রোমান ক্যাথালিক পাদরি এবং তাঁর খুল্লতাত রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৮৯১ খ্রিঃ তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন।

ভবানীচরণ প্রথমে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও একবছর পরেই তিনি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হন।

তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের সন্তান। কিশোর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন।

যৌবনে পদার্পণ করে দীক্ষা নিলেন ব্রাহ্মধর্মে। নিজেকে যুক্ত করেন কেশবচন্দ্রের সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে।

কেশবচন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে অভিন্ন সম্প্রীতি সম্পর্ক গড়ে তোলা।

সেই আদর্শে কাজ করার সময়েই খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ভবানীচরণ। পরে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রথমে প্রোটেস্ট্যান্ট ও পরে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

এই ধর্মান্তর গ্রহণের ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভবানীচরণের অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় ফুটে ওঠে।

কিছু দিনের মধ্যেই ভবানীচরণ খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষায় খ্রিস্টীয় মতে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। নতুন নাম নিলেন ব্রহ্মবান্ধব।

আর বন্দ্যোপাধ্যায় অংশ বাদ দিয়ে নতুন নামের সঙ্গে যুক্ত করলেন উপাধ্যায় যার অর্থ শিক্ষক বা গুরু।

খ্রিস্টধর্মে সন্ন্যাস গ্রহণের পর ব্রহ্মবান্ধবের প্রথম কাজ হল ভারতীয় জনগণের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে একাত্মতা বজায় রাখার জন্য খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মতো কালো আলাখাল্লা না পরে গ্রহণ করলেন গেরুয়া বস্ত্র।

তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই ভাবেই বিদেশী আবরণ মুক্ত করে খ্রিস্টধর্মকে সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন।

তিনি নিজেকে রোমান ক্যাথলিক বলেও প্রচার করতেন না। বলতেন তিনি ভারতীয় ক্যাথলিক।

এই সময়েই হিন্দু ক্যাথলিক অর্থাৎ ঈশাপন্থী হিন্দু সন্ন্যাসী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জব্বলপুরে নর্মদা তীরে ক্যাথলিক মঠ স্থাপন করেন।

ব্রহ্মবান্ধব ধর্মপ্রচারের সময় বাংলা ও সংস্কৃতে লেখা খ্রিস্টীয় সঙ্গীত গান করতেন। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতেন ভারতীয় বৈষ্ণবদের মতো করতাল বাজিয়ে গান করে।

বলাবাহুল্য গেরুয়াধারী এই খ্রিস্টান সন্ন্যাসী সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

ধর্মান্দোলনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়লেও দেশোদ্ধারের বীজটি অন্তরে মৃদুমন্দ স্বরে মন্দ্রিত হচ্ছিল।

১৮৯৭ খ্রিঃ স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ভারতীয় সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে ভারতে ফিরে এসেছেন। বিদেশে বহু সম্মান ও স্বদেশে বীরোচিত সংবর্ধনা লাভ করছেন তিনি।

বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয়ের দ্বারা বিশ্বসভায় নতুনভাবে পরাধীন ভারতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁর এই সাফল্যে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে যুবভারত, আত্মচেতনা ফিরে পেয়েছে পরাধীন ভারতবর্ষ।

দেশপ্রেম ও বেদান্তের মায়াবাদের বিবেকানন্দকৃত নতুন ভাষ্য প্রবলভাবে আকৃষ্ট করল যুব সমাজকে।

ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তা চেতনায়ও বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ আলোড়ন তুলল। তাঁর চিন্তা ও মননে পরিবর্তন ঘটল।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে ১৯০১ খ্রিঃ ব্রহ্মবান্ধব হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময়েই তিনি কলকাতার সিমলা অঞ্চলে বৈদিক আদর্শে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানের নাম দেন সারস্বত আয়তন। ভারতীয় আর্য ঋষিদের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় সনাতন আদর্শে নব ভারতকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এই প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

তিনি এখানে ছাত্রদেব শিক্ষা দান করতেন। কিন্তু কারো কাছ থেকে বেতন নিতেন না।

১৯০১ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কবির আহ্বানে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের নিয়ে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে যোগ দেন। এছাড়াও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তাঁর সক্রিয় সাহায্য পান।

ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজকে ব্রহ্মবান্ধব সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজ

রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের তিনি শুধু লেখাপড়াই শেখাতেন না, তাদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার শিক্ষাও দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র থেকে জানা যায়, ... "এমন সভায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। .... এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতৃদেবের সম্মতি পেয়েছি। .... তিনি তাঁর কয়েকজন অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন .... তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মতন, আহার-ব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে।"

আশ্রমের ছাত্রদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতেন ব্রহ্মবান্ধব। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বিবরণ থেকে জানা যায়— "একদিন এক পাঞ্জাবী পালোয়ান কি করে হঠাৎ শান্তি নিকেতনে উপস্থিত হল। কুস্তি শেখাবার জন্য আমরা একটি আখড়া তৈরি করেছিলুম। সেই দেখে পালোয়ানটির মহা উৎসাহ। পোশাক ছেড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকতে লাগল। তার বিপুল বলিষ্ঠ দেহ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে রইলুম, কারও সাহসে কুলালো না তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার সঙ্গে লড়াইতে নেমে যায়। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখি উপাধ্যায় মহাশয় কৌপিন পরে এসে উপস্থিত। তিনি তাল ঠুকে পালোয়ানকে লড়াই করতে আহ্বান করলেন। বাঙালী সন্ন্যাসীর কাছেই শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবী পালোয়ানকে হার মানতে হল। আমাদের তখন কি আনন্দ।"

শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালেই ১৯০২ খ্রিঃ ব্রহ্মবান্ধব স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ সংবাদ জানতে পারেন। এই দুঃসংবাদ শ্রবণে তাঁর অন্তরলোকে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হল।

তিনি এ সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন, 'সহসা একখানি ছুরি বুকের মধ্যে বিঁধিয়া গেল। স্বামীজির কাজ কেমন করিয়া চলিবে। হঠাৎ এক প্রেরণা তাঁর শক্তিকে চালিত করিল—যতটুকু তোমার শক্তি আছে ততটুকু তুমি কাজে লাগাও। বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি জয় ব্রত উদ্‌যাপন করতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তে ঠিক করিলাম বিলাত যাইব। হাওড়া স্টেশনে পৌছাইয়া স্থির করিলাম বিলাতে গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব।"

ফিরিঙ্গি বিজয়ের দুর্জয় সংকল্প নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব ১৯০২ খ্রিঃ বেদান্ত প্রচারের জন্য বিলাত যান। সেখানে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করে ইউরোপীয় শ্রোতাদের বিস্মিত মুগ্ধ করেন। ভারতীয় সন্ন্যাসীর মুখে গভীর

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, ভারতের চিরন্তন প্রেমের বাণী প্রচারের মাধ্যমে বিলাতের শ্রোতাদের মধ্যে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হল।

ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় বলেছেন, "তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী। অপরপক্ষে বৈদান্তিক—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রতিভাবশালী।"

বিলাতে বেদান্ত প্রচারকার্য সম্পূর্ণ করে ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৩ খ্রিঃ কলকাতায় ফিরে আসেন। সেই সময় ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশেষ করে বাংলার আকাশ বাতাস অগ্নিযুগের রণদামামা ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে। এই আবহাওয়ায় তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন রাজনৈতিক নেতা রূপে।

১৯০৪ খ্রিঃ মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন অগ্নিযুগের অন্যতম পুরোধাপুরুষ। ১৯০৪ খ্রিঃ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল সন্ধ্যা দৈনিক পত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর অগ্নিক্ষরা লেখনী ঘোষণা করল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন বলিষ্ঠ সংগ্রামের কথা।

১৯০৫ খ্রিঃ আরম্ভ হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত বঙ্গবাসীর বন্দেমাতরম মন্ত্রে প্রকম্পিত হল আকাশ বাতাস। বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। ব্রহ্মবান্ধবের তেজোদৃপ্ত লেখনী এই আন্দোলনে নতুন শক্তি সঞ্চার করল।

সন্ধ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনার তেজোময় ভাষা দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রাণে জ্বালা ধরিয়ে দিল। দেশজুড়ে স্বাদেশীকতার প্লাবন গর্জে উঠল। এককথায় বলা চলে ব্রহ্মবান্ধবের জ্বালাময়ী লেখনীর মাধ্যমে নববাংলার পুনর্জাগরণ ঘটল।

স্বদেশী জাগরণের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্রহ্মবান্ধবের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

হিন্দুসমাজের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজপ্রীতির মোহ মায়াজাল রচনা করেছিল। তাদের কাছে ইংরাজ বিরোধিতা ছিল গুরুতর অন্যায় কার্য।

এই ভ্রান্ত সমাজের চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য ব্রহ্মবান্ধব সন্ধ্যা পত্রিকার মাধ্যমে কঠোর সমালোচনার তীব্র আঘাত হানতে লাগলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস মীমাংসা কোনদিন করেননি তিনি। নির্ভীক সৈনিকের মতো অন্যায়কে বারবার কঠোর ভাবে আঘাত করেছেন। তিনি বলতেন "দেশের এই দুঃসময়ে যেখানে চারদিকে তমোভাব ও অসাড়তা সেখানে হাত বুলাইলে চলিবে না—খোঁচা না দিলে শোনানো যাবে না।"

আর এক জায়গায় উপমা প্রয়োগ করে তিনি লিখেছেন—"পুকুরের নীচে

পচা পাঁক জমিয়াছে। সেই জল খাইয়া লোকের জ্বর বিকার ধরিতেছে। ঐ পাঁক একবার ঘাঁটিয়া দিত হইবে। এখন ঘাঁটিতে গেলেই জল ঘোলা হইবে। এই ঘোলানো জল দেখিয়া আমাদের সভ্যবাবুরা নাক সেটকান। কিন্তু মানুষ যে মরে—সে বিষয়ে তাদের কোন সাড়া নাই ব্যথা নাই। তাহারা বুঝেন না যে ঘোলানোটার পরে যখন জল থিতুবে তখন সরোবর নির্মল ও স্বাস্থ্যকর হইবে।"

ঘুমন্ত জাতির জাগরণ ঘটছে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তাই ব্রহ্মবান্ধবকে সহ্য করা সম্ভব হল না। অবিলম্বেই তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল।

'সিডিনের হুড়ুম দুড়ুম', 'ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম' ও 'বোচকা সকল নিয়ে যাবেন বৃন্দাবন' প্রভৃতি তিনটি লেখার জন্য ১৯০৭ খ্রিঃ ব্রহ্মবান্ধবের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল।

সরকারের আদেশে সন্ধ্যা পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল। মুদ্রাকর সহ ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেপ্তার করা হল, পত্রিকা কার্যালয় খানাতল্লাশি হল।

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব। গ্রেপ্তার হবার পর গেরুয়া বস্ত্রের অপমান হবে বলে তিনি সাদা ধুতি পরে আদালতে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তিনি ব্রিটিশ কর্তৃত্ব মানেন না।

কঠোর পরিশ্রমে আগেই শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। তাই মামলা চলাকালীন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাঁর অপারেশান করা হল। অস্ত্রোপচারের তিনদিন পরে ১৯০৭ খ্রিঃ ২৭শে অক্টোবর সকাল ৯টায় এই সন্ন্যাসী বিপ্লবী মহান ভারতসন্তান ধনুষ্টঙ্কার রোগে দেহত্যাগ করলেন।

একসময় ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন, 'ফিরিঙ্গি আমাকে কারাগারে রাখে এমন সাধ্য ফিরিঙ্গির নাই।" বস্তুতঃ তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হয়েছিল।

মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যু সংবাদ সন্ধ্যা পত্রিকায় এভাবে ছাপা হল, "ইহাই সশরীরে স্বর্গারোহন—ইহাই তেজস্বীর ইচ্ছামৃত্যু—ইহাই কর্মবীরের দেহাবসান।"

স্বদেশবাসীকে নতুনভাবে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তেজস্বী ব্রাহ্মণ সন্তান যে কর্মধারা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তার পথ ধরেই পরবর্তীকালে ভারত ইতিহাস রচিত হয়েছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত

ব্রিটিশ যুগের বিখ্যাত সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের খ্যাতি কেবল দক্ষ প্রশাসক হিসেবে নয়, তিনি ছিলেন একাধারে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও স্বদেশানুরাগী। এই গুণাবলীর পরিচয় ছেলেবেলাতেই তাঁর চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছিল।

রমেশচন্দ্রের অগ্রজ যোগেশচন্দ্রের স্মৃতিচারণ থেকে রমেশচন্দ্রের বাল্য বয়সের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন "পিতা কার্যোপলক্ষে বাংলার নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। আমরাও তাঁহার সহিত ভাগলপুর, খুলনা, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলাম। পাবনাতে থাকাকালীন আমরা ঘোড়ায় চড়িতে শিখি। জিন না থাকাতে তাহার পিঠে গদি বাঁধিয়া লইয়া চড়িতাম। স্থানীয় নানা জায়গায় নানা স্কুলে আমাদের পড়িতে হইয়াছিল। পাবনা হইতে আসার সময় কিছুদিন পূর্বে এক আকস্মিক ঘটনায় রমেশচন্দ্রের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একদিন আমরা অপর দুটি বালকের সহিত মিলিয়া খেলা করিতেছিলাম। একটি বড় কাঠের বাক্স পড়িয়াছিল। একজন করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলাম আর সকলে উহার উপরের ডালাটি বাহির হইতে বন্ধ করিয়া শিকল আঁটিয়া দিতেছিল।

একবার আমি যখন ভিতরে ঢুকিলাম অন্যেরা ডালা বন্ধ করিয়া দিল। অমনি আমার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমি সত্বর ভিতর হইতে ভীষণ চিৎকার করিতে লাগিলাম এবং মাথা দিয়া ডালাটিতে ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কিন্তু যতই এরূপ ধাক্কা দিতেছি ততই বাহিরের শিকল বসিয়া যাইতেছে। সুতরাং বালকেরা আর উহা সহজে খুলিতে পরিতেছে না। রমেশ এই সময় একটু তফাতে ছিল। আমার চিৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া ব্যাপার বুঝিয়া অমনি বাক্সর ডালার উপর.চাপিয়া বসিল। ইহাতে শিকলটি আলগা হইয়া পড়িল। তখন অনায়াসে শিকল খুলিয়া আমাকে খালাস করিয়া দিল। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।"

এই বালকই বড় হয়ে স্বীয় চরিত্র মাধুর্য, ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব বলে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

১৮৪৮ খ্রিঃ ১৩ আগস্ট উত্তর কলকাতার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ঈশানচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। কার্যোপলক্ষে দেশের নানা স্থানে তাঁকে ভ্রমণ করতে হত। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়েস ১৮৬১ খ্রিঃ আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রমেশচন্দ্রের মাতা ঠাকুরমণি স্বামীর মৃত্যুর দুই বছর আগেই পরলোক গমন

করেছিলেন। পিতা-মাতৃহারা কিশোর রমেশচন্দ্র এরপর তাঁর খুল্লতাত শশিচন্দ্রের অভিভাবকত্বে ও স্নেহ-যত্নে মানুষ হতে থাকেন।

শশিচন্দ্র ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও লেখক। সেই যুগে ইংরাজিতে ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখে তিনি সুখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ Ancient World, Modern World এবং Bengal। তাঁর এই রচনাবলীর প্রভাব রমেশচন্দ্রের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

শশিচন্দ্র তাঁর পিতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। সময় সময় তিনি নিজেও বালকদের ইংরাজি গল্প ও কবিতা গ্রন্থ পড়ে শোনাতেন।

বর্তমান হেয়ার স্কুলের তখন নাম ছিল কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। এই স্কুলেই রমেশচন্দ্রের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এখান থেকেই ১৮৬৪ খ্রিঃ বৃত্তি সহ এন্ট্রাস পাস করেন। এই সময়ই মাত্র যখন পনের বছর বয়স, রমেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম মোহিনী বসুজা।

এন্ট্রান্স পাস করার পর রমেশচন্দ্র ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৬৬ খ্রিঃ এখান থেকে তিনি জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ নিয়ে এফ. এ. পাশ করেন। মাত্র এক নম্বরের জন্য এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম হতে পারেন নি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ পড়ার সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন বিহারীলাল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

তাঁরা যখন ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় তিন বন্ধু মিলে ১৮৬৮ খ্রিঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একরকম অভিভাবকদের অগোচরেই বিলাত যাত্রা করেন।

এই দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার কথা রমেশচন্দ্র পরে তাঁর অগ্রজ যোগেশচন্দ্রকে লিখে জানান। তিনি লেখেন, "আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া ৩ মার্চ সকাল আটটায় আমরা কলিকাতা হইতে এক স্টিমারে হুগলি নদীর উপর দিয়া ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঐখানে আমাদের মুলতান নামক এক ডাক সরবরাহকারী জাহাজে চড়িতে হইবে। ক্রমশঃ বিশাল হুগলী নদীর মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। নদীর উভয় তীরে বহু তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি সুন্দর তরুরাজি, কানন শোভিত কুটির, পল্লীসমূহ পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া আমরা মূলতান নামক জাহাজে চড়িলাম। .... নীরব নিশিথে জাহাজের ডেকে আসিয়া সহসা মনে হইল আত্মীয়স্বজন সুহৃদ বন্ধু কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্বগৃহ ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সকল আশা বিসর্জন দিয়া, বিদেশে চলিয়াছি—কি আশায়? আমাদের অভিপ্রায় পূর্বে ঘুণাক্ষরে প্রকাশিত হইলে কখনই আসা ঘটিয়া উঠিত না। অভিভাবকগণ কখনই

আমাদিগকে সমুদ্রযাত্রায় অনুমতি দিতেন না। আমরা চলিয়াছি এক বিষম দুঃসাধ্য সাধনে। দুরাশায় বুক বাঁধিয়া আমরা এই অকূল পাথারে ভাসিয়াছি। আমাদের এ আশা কি ফলবতী হইবে? না আমরা হতাশ্বাস হইয়া দারিদ্র্য, দুঃখ বহন করিয়া, কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া দেশে ফিরিব। সমুদ্রের নীল জল ক্রমশঃ অন্ধকারাবৃত হইয়া ধীর গম্ভীর শ্রী ধারণ করিতে লাগিল। আর আমাদের মনও উক্তরূপ অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যৎ ভাগ্যের ভীষণ চিন্তাবশে যেন ততোধিক নৈরাশ্যবিষাদে নিমগ্ন হইয়া আসিল।" ....

আজ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, অন্তরে উচ্চাভিলাষ ও জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা কতটা তীব্র হলে বাড়ির অভিভাবকদের অগোচরে এভাবে দুস্তর সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে অজানা অচেনা দেশ বিলাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সম্ভব। সেদিন এই অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক কাজটি তিন বন্ধু মিলে করেছিলেন।

অদম্য সাহস ও অবিচল নিষ্ঠার পুরস্কারও তারা যথাসময়ে লাভ করেছিলেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে এক বছর পড়াশুনা করে তিন বন্ধু ১৮৬৯ খ্রিঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসলেন।

রমেশচন্দ্রের বিষয় ছিল ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস ও রচনা, গণিত মনোবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সংস্কৃত। রমেশচন্দ্রদের সঙ্গে আরও ভারতীয় ও অনেক ইংরাজ ছাত্র পরীক্ষার্থী ছিল। তাদের অধিকাংশই লণ্ডন ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড অথবা কেমব্রিজ কলেজে শিক্ষালাভ করেছে। প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষনীয় বিষয়ে গভীর ও বিভিন্নমুখী জ্ঞান না থাকলে সিভিল সার্ভিসের মতো প্রতিযোগিতা মূলক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব হত।

ইংরাজি ভাষায় মোট ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪২০ নম্বর পেয়ে রমেশচন্দ্র ৩২৫ জন ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতেও ৫০০ নম্বরের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন ৪৩০।

বলাই বাহুল্য, তৎকালীন ভারতীয় ছাত্রদের স্বপ্ন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় রমেশচন্দ্র সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অপর দুই বন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের নামও উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। তিন বন্ধুর স্বজন স্বদেশ পরিত্যাগ করে বিলাতে আসা এভাবে সার্থক হয়েছিল।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রবর্তন হয় ১৮৫৩ খ্রিঃ। প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা ভারতে উচ্চ রাজপদে চাকুরি লাভ করতেন। ভারতীয়দের মধ্যে বাঙ্গালী ছাত্ররাই সর্বপ্রথম এই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয়দের জন্য এক নতুন পথের দিকদিশারী হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৩ খ্রিঃ সর্বপ্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আই সি এস হন।

তারপর ১৮৬৯ খ্রিঃ এই গৌরব লাভ করেন রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ও বিহারীলাল গুপ্ত।

উত্তরকালে এই তিন যুবক জীবনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

দেশহিতৈষণা, অসাধারণ বাগ্মিতা ও ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ গুণমুগ্ধ দেশবাসী কর্তৃক রাষ্ট্রগুরু অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় মণীষীদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ অন্যতম।

বিহারীলাল গুপ্তও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। চরিত্রের দৃঢ়তা, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও নানা সদগুণাবলীর দ্বারা তিনি স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন।

রাজকীয় উচ্চপদে কর্মনিযুক্ত থাকলেও রমেশচন্দ্রের প্রতিভা বিভিন্নমুখী কাজে উদ্ভাসিত হয়েছিল। দেশহিতৈষণা ও নানা সমাজ কল্যাণকর কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে তিনি বঙ্গ ভারতীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন।

আই সি এস হবার পরে আবও কয়েক মাস রমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে থেকে ইউরোপের বিভিন্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, খ্যাতনামা মনীষীদের জন্মস্থান পরিদর্শন করেন।

সেই বছরেই আলিপুরের অ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগ দিয়ে রাজকীয় কর্মজীবন শুরু হয় রমেশচন্দ্রের। ১৮৮৩ খ্রিঃ তিনি প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৪-৯৭ খ্রিঃ প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার হয়েছিলেন।

কর্মসূত্রে তাঁকে নানাস্থানে ঘুরতে হত। প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে যখন যেখানে গেছেন, স্বীয় কর্মদক্ষতা ও চরিত্রমাধুর্যে স্থানীয় সকল মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন।

সরকারী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি স্বদেশের কাজে ও দেশবাসীর সেবায় নিষ্ঠা সহকারে কাজ করেছেন। স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, উন্নতি সাধন এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। সকল স্থানে প্রজাদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

১৮৭৪ খ্রিঃ বরিশালের সাহাবাজপুর মহকুমা প্রবল বন্যা ও পরে দুর্ভিক্ষ মহামারীর কবলিত হয়।

সেই সময়ে রমেশচন্দ্র মেহেরপুরে কর্মনিযুক্ত ছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কবলিত সহাবাজপুরে প্রেরণ করা হয়।

সাহাবাজপুর হল বরিশাল জেলার দক্ষিণে গঙ্গাসাগর সঙ্গমের কাছে একটি দ্বীপ। চল্লিশ হাজার লোকের বসতি এখানে। প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে অধিবাসীরা চরম বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল। রমেশচন্দ্র এই সময় দুর্গতের সেবায় আত্মনিয়োগ করে অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজের জন্য সমগ্র বরিশালবাসী তাঁকে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

পরে এই স্থানের অভিজ্ঞতার বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করেন তাঁর Rambles in India গ্রন্থে।

তিনি লিখেছেন, "......... ৩১শে অক্টোবর, ১৮৭৪ খ্রিঃ পরপর প্লাবনে দক্ষিণ সাহাবাজপুর মহকুমা ভাসিয়া গেল। সাহাবাজপুর পৌঁছিয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলাম তাহা আর এ জীবনে ভুলিবার নহে। যুদ্ধাবসনে কোন যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যও অতটা বিষাদ ও রোমহর্ষক নহে। এমন কোন পরিবার নাই যাহাদের মধ্যে একজনও মারা যান নাই। শতশত শবদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিক পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ।

উক্ত মহকুমার হতভাগ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় ও তাঁর অভাগিনী পত্নী কোনও এক বৃক্ষচূড়া আশ্রয় করিয়া কোনও রূপে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিবারের সবাই ভাসিয়া গিয়াছিল। ঐরূপ পরিস্থিতির মধ্যে কৃষ্ণনগর হইতে ঐ ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রের ভারপ্রাপ্ত হইলাম। আদালত গৃহ ভাসিয়া গিয়াছে। চৌকিদারগণ কাজে অনুপস্থিত। সর্বত্রই এক বিশৃঙ্খলা। এত সংখ্যক শবদাহ করা এ সময়ে অসম্ভব। যাঁহাদের কিছুটা বাঁচিয়া গিয়াছে তাঁহারা নিজেদের কুটির নির্ম্মাণে ব্যস্ত। মৃতের সৎকাব কে কবিবে? যাহার যাহা গিয়াছে তাহা গিয়াছে। যে যাহা পাইয়াছে তাহা লইয়াছে। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারপূর্ণ সিন্ধুক ভাসিয়া গিয়াছে। প্রচুর অভিযোগ আসিতে লাগিল। এর জিনিস সে পাইয়াছে। একে অন্যের গবাদীপশু লইয়াছে ইত্যাদি। কাহাকেও অপরাধী করা অসঙ্গত মনে করিয়া সবাই একমত হইয়া নিয়ম নির্দ্ধারণ করিল—যাহারা ওইসব সম্পত্তি সরকারের কাছে জমা দিবে তার এক চতুর্থাংশ তাহারা পুরস্কার হিসাবে পাইবে। সব অভাব-অভিযোগই ধীরে ধীরে মিটিয়া গেল।"

দক্ষিণ সাহাবাজপুরেই কেবল নয়, অন্যান্য বহু স্থানেই জনকল্যাণমূলক যেসব কাজ রমেশচন্দ্র করেছেন, তাতে তাঁর মহানুভবতা ও পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতারও প্রমাণ হয়।

বস্তুত দেশের মানুষের হিতার্থে কাজ করাকে তিনি দেশসেবা বলেই মনে করতেন। সিভিল সার্ভিসে থাকাকালীন এভাবে সরকারী কাজের মধ্য দিয়েই রমেশচন্দ্র স্বদেশের সেবা করেছেন।

সরকারী চাকরিতে থাকলেও রমেশচন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবা করেছেন, রমেশচন্দ্রের মনেও সেই বাসনা সর্বদা জাগরুক ছিল। তাই দেখা যায়, সরকারী কাজে নানা জেলায় ও মহকুমায় কর্মরত অবস্থাতেও তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেছেন।

বন্যার জলে প্লাবিত সাহাবাজপুরে প্রচন্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলা গ্রান্ট ডাফ রচিত মারাঠা জাতির ইতিহাসের পুস্তকে মগ্ন হয়ে থাকতেন। মারাঠা বীর শিবাজীর বীরত্বকাহিনী রমেশচন্দ্রের মধ্যে নতুন কর্মপ্রেরণার সঞ্চার করত।

আবার যখন ত্রিপুরায় ছিলেন, সেখানে নিয়মিত পাঠ করেছেন টড সাহেবের লেখা রাজস্থানের ইতিহাস। দিনের কর্মক্লান্তি এভাবে দেশী ও বিদেশী মনীষীদের রচিত ভারতের অতীত ঘটনাবলীর ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে দূর করতেন রমেশচন্দ্র। আসলে এভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের পথ অনুসন্ধান করছিলেন তিনি।

তাঁব বলার বিষয়ও অচিরেই রমেশচন্দ্রের মানসপটে উদিত হল। তিনি স্থির করলেন ভারতের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবময় কাহিনী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবেন।

১৮৭১ খ্রিঃ রমেশচন্দ্র প্রথম একটি ইংরাজি বই প্রকাশ করেন—Three years in Europe। তাঁর এই বই, বিশেষতঃ ইংরাজি লেখার দক্ষতা গুণে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। বিদেশেও এই গ্রন্থের সমাদর হয়।

রমেশচন্দ্রের রচনাশৈলীর প্রশংসা করে রঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বাংলা ভাষায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার কথা বলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণাতেই রমেশচন্দ্র এরপর থেকে বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করেন। ইতিহাসেই তাঁর দখল বেশি ছিল। তাই ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী রচনাতেই তিনি প্রথমে হাত দিলেন।

বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম উপন্যাস বঙ্গ বিজেতা। এরপর প্রকাশিত হয়, একে একে মাধবী কঙ্কন, মরারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া সামাজিক উপন্যাসও রচনা করেছেন রমেশচন্দ্র। পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র রচনায় তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা

অধিকতর সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ছিল। সংসার, সমাজ প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস।

১৮৭৩-৭৪ খ্রিঃ পাবনায় কৃষকপ্রজারা বিদ্রোহী হলে রমেশচন্দ্র তাদের সমর্থনে বেঙ্গল ম্যাগাজিন পত্রিকায় বহু ইংরাজি প্রবন্ধ লেখেন। এসব লেখা তিনি ARCYDAE ছদ্মনামে লিখতেন।

১৮৮৩ খ্রিঃ রমেশচন্দ্র প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিন বছর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যান। ১৮৯২ খ্রিঃ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সি. আই. ই. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৮৯৪-৯৭ খ্রিঃ তিনি প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন। উচ্চপদ পেলেও, ভারতীয় বলেই কোনও পদেই তিনি স্থায়ী হতে পারছিলেন না।

বিশেষতঃ কলকাতার ইংরাজি কাগজগুলোতেও ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের বিরুদ্ধে লেখা হতে থাকে।

সেই সময় দেশজুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত্র হয়েছে। রমেশচন্দ্র সংকল্প করলেন কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালির ক্রিড়নক না থেকে দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। এই সিদ্ধান্তের পর ১৮৯৭ খ্রিঃ তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দেন।

অবসর নেবার পর রমেশচন্দ্র বিলাতেই প্রবাসজীবন যাপন করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস অধ্যাপনা করেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

বিলাতে থাকাকালে ভারতের গৌরব রক্ষায় সর্বদাই সচেতন ও সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর এই স্বদেশানুরাগ জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁকে কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১৮৯৯ খ্রিঃ রমেশচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই বছরেই লখনউ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতবাসীর নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন রূপে মেনে নেবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন।

রমেশচন্দ্রের দেশপ্রেম ও স্বদেশের গৌরব প্রচারে তাঁর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পরিচয় দেশবাসী পেয়েছে ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর বিবিধ ইংরাজি বাংলা গ্রন্থের মাধ্যমে।

সরকার কর্তৃক ভূমি রাজস্বের অপব্যবহার ও কৃষক বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় করে রমেশচন্দ্র লেখেন Famines and Land Assesments in India এবং The Peasantry of Bengal। তাঁর লিখিত গ্রন্থে ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শোষণ পদ্ধতি উদ্ঘাটন করতেও দ্বিধা করেননি রমেশচন্দ্র। এই বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Economic History of British India.

রমেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থ হল England and India—A Record of Progress during Hundred years 1785—1885, এবং Civilisation of Anccient India। সমগ্র ঋগ্বেদের প্রথম বাংলায় অনুবাদও করেন রমেশচন্দ্র। এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় ৮ খণ্ডে।

দেশের গৌরব বৃদ্ধিতে রমেশচন্দ্রের অবদানের স্বীকৃতি জানাবার জন্য কলকাতাবাসী দুটি প্রকাশ্য সভায় তাঁকে সংবর্ধনা জানান ১৯০০ খ্রিঃ ৬ ও ২৩ শে জানুয়ারি।

এরপর পুনরায় তিনি বিলাতে চলে যান। ফিরে আসেন ১৯০৪ খ্রিঃ এবং বরোদারাজের আহ্বানে সেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

তিন বছর এই পদে থেকে তিনি বরোদা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করেন।

বরোদায় থাকাকালীনই রমেশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দুই বৎসর চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৯০৯ খ্রিঃ ৩০শে নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রমেশচন্দ্র স্কুলের উপযোগী করে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসও লেখেন। তাঁর রচিত মাধবীকঙ্কন ও সমাজ উপন্যাস দুটি যথাক্রমে Slave Girl of Agra এবং Lake of Palms নামে ইংরাজিতে অনুবাদ হয় এবং বিলাতে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ বিশ্ববিখ্যাত কোষগ্রন্থ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও স্থান পেয়েছে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে বাংলাভাষার চর্চা প্রসার ও উন্নতিকল্পে অক্লান্তকর্মা মনীষী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় চরিত্রমাধুর্য ও কর্মকৃতিত্বগুণে স্বদেশবাসীর অন্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের তিনিই প্রথম ভারতীয় ভাইস চ্যান্সেলর।

১৮৪৪ খ্রিঃ ২৬শে জানুয়ারী কলকাতার নারকেলডাঙায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। দরিদ্র হলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিসেবে তাঁর পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর মাতা সোনামণি দেবী নিষ্ঠাবতী ধর্মপ্রাণ মহিলা ছিলেন।

মাত্র তিন বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে অসহায় জননীর স্নেহচ্ছায়ায় ও তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হতে থাকেন।

সংসারের অভাব অনটনের মধ্যেও সোনামণি পুত্রের লেখাপড়া ও চরিত্র গঠনের বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য যথাসাধ্য তিনি চেষ্টা ও উপদেশ দিতেন।

মায়ের কঠোর স্নেহ-শাসনের বেষ্টনের মধ্যেই সুশীলস্বভাব গুরুদাসের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল।

যখন তখন বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না, তাই অনেক সময় স্নেহশীলা জননীই হতেন তাঁর খেলার সাথী।

কখনো প্রতিবেশী বালকরা তাঁর সঙ্গে বাড়িতে খেলা করত। সোনামণি নিজের ছেলের সঙ্গে অন্যান্য বালকদের ওপরও দৃষ্টি রাখতেন। বালকদের মধ্যে কখনও কোনও বেয়াড়াপনা বা উশৃঙ্খলতা লক্ষ্য করলে তিনি তাদের স্নেহের সঙ্গে শাসন করতেন।

এভাবেই বাল্য বয়স থেকে মায়ের আজ্ঞার অনুবর্তী হয়ে চলার শিক্ষা লাভ করেছিলেন গুরুদাস।

বাস্তবতঃ মায়ের শাসন ও শিক্ষাগুণেই সন্তানের চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। সেকারণেই দেখা যায়, যাঁরাই উত্তর জীবনে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, মায়ের প্রভাব ছিল তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক। মহাপুরুষদের জীবন পর্যালোচনা করলেই এ সত্য অনুধাবন করা যায়।

গুরুদাসের কর্মময় জীবনও এ ভাবেই সার্থকতা লাভ করেছিল। পরিণত বয়সেও তিনি ছিলেন সর্বতোভাবেই মাতৃআজ্ঞানুবর্তী।

সোনামণির স্নেহকোমল স্বভাব ও পুত্র প্রতিপালনের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় তাঁকে প্রতিবেশীদের কাছেও আদরনীয় করে তুলেছিল।

কোমলমতি বালক-বালিকাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার তিনি পছন্দ করতেন না। মারধর করারও পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর স্নেহ মমতা ও মিষ্ট ব্যবহারে পাড়ার দুরন্ত ছেলেমেয়েরাও শান্ত হয়ে যেত।

স্নেহশীলা মায়ের সস্নেহ শাসন ও উপদেশের মধ্যে বড় হয়ে গুরুদাস যে সঠিক জীবনপথের অনুবর্তী হবেন এ আর বেশি কথা কি?

দারিদ্র্য দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সোনামণি পুত্রকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

সেই সময় ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলকে লোকে বলত গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল। প্রতিভাবান শিক্ষকরা এখানে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন।

জেনারেল অ্যাসেম্বলি ছেড়ে এই শিক্ষায়তনে এসে গুরুদাস বিশেষ করে সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক রিচার্ডসন সহেবের সান্নিধ্য লাভ করেন।

এই প্রতিভাশালী শিক্ষকের স্নেহ-সান্নিধ্যে তিনি ইংরাজি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষার সুযোগ পান।

এরপর গুরুদাস ভর্তি হন কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলে (হেয়ার স্কুল) এবং এখান থেকেই ১৮৫৯ খ্রিঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন।

প্রতিবৎসর স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি গুরুদাসের ছিল বাঁধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও সেই ধারাবাহিকতাই রক্ষা হয়।

হেয়ার স্কুলে গুরুদাস যেমন সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ প্রতিভাশালী শিক্ষকদের স্নেহ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তেমনি বেশ কয়েকজন প্রতিভাশালী চরিত্রবান সহপাঠীও লাভ করেছিলেন।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে স্বনামখ্যাত হয়েছিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন কাশ্মীরের রাজস্বসচীব। কলকাতার প্রসিদ্ধ আইনজীবী কালীনাথ মিত্র, মাননীয় বিচারপতি বসন্তকুমার মল্লিক প্রমুখ ছিলেন গুরুদাসের সহপাঠী।

সর্ববিষয়ে মাতৃআজ্ঞাধীন গুরুদাসের ছাত্রজীবন ছিল অনন্য গৌরবের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ১৮৬৫ খ্রিঃ এম.এ পাশ করেন।

১৮৬৬ খ্রিঃ আইন পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানটিও ছিল তাঁরই। পরের বছর তিনি ল অনার্স পাশ করেন।

স্কুল ও কলেজে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বিদ্যার্থী হিসেবে সমস্ত রকম বৃত্তি ও পুরস্কার গুরুদাস লাভ করেছিলেন।

এম. এ. পাশ করার পর গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এখানে গণিতের অধ্যাপক রূপে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল প্রতিভাবান সুশিক্ষকের সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন, শিক্ষক জীবনে তাঁদের সকলের গুণাবলী তাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত হতে দেখা গিয়েছিল। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক।

প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি স্বনামখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন এবং বিহারীলাল গুপ্তকে ছাত্র হিসেবে পেয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রতিভাবলে স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরববৃদ্ধি করেছিলেন।

ছাত্রদের প্রতি গুরুদাস ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। ফলে তাঁর নির্দেশ উপদেশ ছাত্ররা যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন এবং মেনে চলার চেষ্টা করতেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্মরত অবস্থাতেই গুরুদাস বহরমপুর কলেজে মাসিক তিনশত টাকা বেতনে অধ্যাপকের চাকরি পান।

বহরমপুরে থাকার সময়েই তিনি মায়ের অনুমতি নিয়ে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

মাতা সোনামণির আদেশ ছিল স্বাধীন আইন ব্যবসায়ে মাসিক একশত টাকা উপার্জন যখন হবে তখন তাঁকে কলকাতায় আসতে হবে।

মায়ের এই আদেশ শিরোধার্য করে তিনি নিষ্ঠা সহকারে আইন ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন।

এই সময়েই গুরুদাস মুর্শিদাবাদের নবাবের আইন উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হন। আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েও গুরুদাস কখনো তাঁর ধর্মবুদ্ধিকে ত্যাগ করেন নি।

সত্য ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি প্রতিটি মামলা গ্রহণ করতেন ও যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতেন।

এই সময়ের একটি ঘটনা বললেই তাঁর সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে। ১৮৭২ খ্রিঃ গুরুদাস বহরমপুর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরেই দৈনিক পঞ্চাশ টাকা ফি-তে একটি মামলা তিনি গ্রহণ করেন।

এই মামলার শুনানির আগের দিন বহরমপুরের একটি মামলার পরিচালনার আহ্বান আসে। তাতে তাঁর ফি পাবার কথা দেড় হাজার টাকা।

খুবই সামান্য মামলা—বিশেষ বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন এতে ছিল না। কিন্তু কলকাতার মামলার জন্য যিনি তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি গুরুদাসকে ছাড়তে চাইলেন না।

গুরুদাসের পক্ষে বহরমপুরের দেড়হাজার টাকার মামলা আর গ্রহণ করা সম্ভব হল না। তিনি সানন্দেই দৈনিক পঞ্চাশ টাকা ফি-এর মামলা নিয়ে সন্তুষ্ট রইলেন।

এই সত্যনিষ্ঠার পুরস্কারও গুরুদাস পেয়েছিলেন হাতে হাতেই। বহরমপুরের মামলা যখন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই কলকাতা নারকেলডাঙ্গায় বাড়ির জন্য একখণ্ড জমি কিনেছিলেন গুরুদাস।

যেই দালালের মাধ্যমে জমি কেনা হচ্ছিল, জমির আড়াই হাজার মূল্যের ওপরে তিনি দালালিবাবদ আরও তিনশত টাকা ধার্য করেছিলেন। কিন্তু দালাল ভদ্রলোক যখন শুনলেন যে গুরুদাস সত্যের খাতিরে দেড় হাজার টাকার মামলা

ছেড়ে পঞ্চাশ টাকার মামলা নিয়ে কলকাতায় রয়ে গেলেন, তখন তিনি তাঁর লাভের অংশ সানন্দে পরিত্যাগ করলেন।

১৮৭৭ খ্রিঃ গুরুদাস ডি-এল. উপাধি পান এবং পরের বছর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। ষোল বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

বিচারক হিসেবে গুরুদাসের কর্তব্যনিষ্ঠা প্রবাদের রূপ লাভ করেছিল। দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে কদাচিৎ তাঁকে আদালতে অনুপস্থিত হতে দেখা গেছে।

তাঁর পুত্র যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে পুত্রকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দেখেও তিনি যথারীতি অবিচলিত মনে ধীর স্থির ভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন।

প্রধান বিচারপতি গুরুদাসপুত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা জানতে পেরে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। গৃহে পৌঁছবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই তাঁর পুত্র দেহত্যাগ করে।

পরবর্তী জীবনে গুরুদাস অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন।

১৮৭৮ খ্রিঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ খ্রিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও আইন পরীক্ষক হন। তিনি তিন বছর সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে পরীক্ষা পরিচালনা ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

১৮৯০ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন গুরুদাস। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই পদ লাভ করেছিলেন। সেইকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা কোন বেতন পেতেন না।

দুই বছর পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য হন। ১৯১২ খ্রিঃ হন ল ফ্যাকাল্টির ডিন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তিনি ছিলেন অন্যতম উৎসাহী কর্মী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর প্রভূত অবদান ছিল। প্রতিষ্ঠার কাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন আমৃত্যু।

বিভিন্ন সামাজিক জনকল্যাণমূলক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল নিবিড়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষিণী সভার সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯০৪ খ্রিঃ গুরুদাস সরকার কর্তৃক স্যার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন।

দেশীয় ভাষার চর্চায় গুরুদাসের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার চর্চা আবশ্যিক করার কাজে তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টায় তাঁর প্রভূত অবদান ছিল। জাতীয়

শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনার তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী পুরুষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের কাজেও তিনি ছিলেন উৎসাহী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপের নিন্দা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। সক্রিয়ভাবে বাধাদান করেছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়েও তিনি ছিলেন সমান আগ্রহী।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় পরোক্ষভাবে তিনি রাজনীতিকদের সাহায্য করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রিঃ ১৬ অক্টোবর ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সভায় তিনি ছিলেন প্রধান বক্তা।

এই সভায় সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন বসু। গুরুদাসের জাতীয় চেতনা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সভার বক্তৃতা রাজনৈতিক নেতাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করেছিল।

১৯১৮ খ্রিঃ এই মহান কর্মবীর চিরবিশ্রাম লাভ করেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল জ্ঞান ও কর্ম, শিক্ষা, A few twoughts on Education এবং The Education Problem in India প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক রূপে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা Hindu Law of Marriage and Stridhan পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে এটিই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

দীনবন্ধু মিত্র

পরাধীন ভারতে জাতীয় চেতনায় নবশক্তির উদ্বোধন যদি করে থাকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ গ্রন্থ ও বন্দেমাতরম মাতৃমন্ত্র তাহলে এক্ষেত্রে পুরোধা বলতে হবে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটককে। নবজাগরণ যুগের অন্যতম প্রধান পুরুষরূপে জাতীয় চেতনার আবাহন রচনা করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর এই ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্দেমাতরম সঙ্গীত রচনা করেছিলেন ১৮৭৫ খ্রিঃ। আর দীনবন্ধু মিত্র বিদেশী ইংরাজদের অত্যাচারে লাঞ্ছিত দেশীয় নীল চাষীদের দুরবস্থার প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে নীলদর্পণ নাটক রচনা করেছিলেন ১৮৬০ খ্রিঃ। বিদেশী শোষণ ও শাসনযন্ত্রের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল তাঁর এই নাটক।

দীনবন্ধু নামে যিনি দেশকাল বিশ্রুত তাঁর পিতৃদত্ত নামটি অনেকেরই অজানা। সেই জমকালো নামটি বালক দীনবন্ধুকে এতই বিব্রত বিরক্ত করত যে শেষ পর্যন্ত নিজের উদ্যোগেই নামটি পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

দীনবন্ধুর পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। এখানেই ১৮৩০ খ্রিঃ এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা কালাচাঁদ মিত্র কায়ক্লেশে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতেন। ফলে অস্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই শৈশবকাল অতিবাহিত হয় তাঁর।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়েছিল দীনবন্ধুকে। কিন্তু বেশিদিন এখানে পড়াশুনা করার সুযোগ পেলেন না। পুত্রের লেখাপড়ার খরচ চালাতে হিমশিম খেতেন কালাচাঁদ।

তাই স্কুল ছাড়িয়ে মাসিক আট টাকা মাইনেতে জমিদারি সেরেস্তায় কাজে ঢুকিয়ে দিলেন পুত্রকে।

পড়াশুনায় আগ্রহ ও উৎসাহ কোনওটাই কম ছিল না দীনবন্ধুর। উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে তাই অবিলম্বে ঘরছাড়া করল। দীনবন্ধু পালিয়ে কলকাতা চলে এলেন।

এখানে পিতৃব্যের গৃহে থেকে অতি দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন। পড়াশুনা চালাবার জন্য এই সময় বাসন মাজার কাজ পর্যন্ত তাঁকে করতে হয়েছে।

দীনবন্ধু ১৮৪৬ খ্রিঃ প্রথমে লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষা শুরু করেন। পরে হেয়ার সাহেবের কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলে ভর্তি হন।

কলকাতায় স্কুলে ভর্তি হবার সময়েই পিতৃদত্ত গন্ধর্বনারায়ণ নাম পাল্টে দীনবন্ধু রাখেন তিনি। ওই নাম নিয়ে সহপাঠীদের কাছে খুবই হেনস্থা হতে হতো তাঁকে গ্রামের স্কুলে।

গন্ধর্বনারায়ণকে ছেলেরা সংক্ষিপ্ত করে 'গন্ধ' করে নিয়েছিল। ওয়াক থুঃ থুঃ গন্ধ, এই বলে সকলেই তাঁকে নিয়ে তামাসা করত। এই নিয়ে খুবই অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে বালক দীনবন্ধুকে। পাছে কলকাতার স্কুলেও 'গন্ধ' সংক্রান্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়, তাই আগেভাগেই নিজের পছন্দকরা নাম স্কুলের খাতায় লিখিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, সেই নামেই তিনি পরবর্তীকালে দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে ১৮৫০ খ্রিঃ দীনবন্ধু শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাশ করেন এবং ভর্তি হন হিন্দু কলেজে।

কলেজের পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের পরিচয় দেন তিনি। সব পরীক্ষাতেই বৃত্তি লাভ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল তাঁর বাঁধা।

কলেজের সব পরীক্ষায় বরাবর ভাল ফল করেও শেষ পরীক্ষা কিন্তু তাঁর দেওয়া হল না। সংসারের প্রয়োজনে চাকরি নিতে হল। একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে ১৮৫৫ খ্রিঃ পাটনায় পোস্টমাস্টারের কাজে যোগ দেন।

কাজ অতি সামান্য হলেও সেই কাজই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন তিনি। ফলে যোগ্যতার সঙ্গে মাত্র দেড় বছর চাকরি করার পরেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েন এবং পোস্টাল ইনসপেক্টর পদে উন্নীত হন।

এই কাজটি তাঁকে সম্পন্ন করতে হত ওই অঞ্চলে সব কটি ডাক ঘরে ঘুরে ঘুরে। কাজকর্মের তদারকি করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। চোদ্দ বছর এই দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠুভাবে করে কর্মদক্ষতার পারিচয় দিয়েছিলেন। ফলে নতুন পদে উন্নীত হলেন তিনি। এই পদে তাঁর কাজ ছিল পোস্টমাষ্টার জেনারেলকে সাহায্য করা। দায়িত্বপূর্ণ নতুন পদেও তিনি অসাধারণ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

আসাম অঞ্চলে লুসাই যুদ্ধ শুরু হলে স্থানীয় ডাকব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। বিপর্যস্ত ডাকব্যবস্থার কাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার গুরুদায়িত্ব দিয়ে ১৮৭১ খ্রিঃ দীনবন্ধুকে পাঠানো হয়।

যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও দীনবন্ধু কাছাড়ে গিয়ে অসাধারণ কর্মনিপুণতার সহায়তায় বিশৃঙ্খল ডাক ব্যবস্থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।

তাঁর এই দক্ষতার জন্য ইংরাজ সরকার ১৮৭১ খ্রিঃ দীনবন্ধুকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।

এরপর থেকে দেশব্যাপী ছড়ানো ডাকব্যবস্থার কোথাও কোনও রূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেখানেই দীনবন্ধুকে পাঠানো হত। ফলে বছর ভর তাঁকে দেশের দূর দূর অঞ্চলে যাতায়াত করতে হত।

নদীয়া, বীরভূম, দার্জিলিং, ওড়িশা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ডাক বিভাগের উন্নতি বিধানে দীনবন্ধু অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

বিভাগীয় কাজে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সরকারের কাছ থেকে রায়বাহাদুর খেতাব লাভ করেছিলেন দীনবন্ধু।

কিন্তু ডাক বিভাগে তাঁর যথোচিত পদোন্নতি হয়নি পরাধীন দেশের হতভাগ্য নাগরিক বলে।

অধিকতর দুঃখের বিষয় যে কর্মকর্তাদের অন্তর্কলহের ফলে দীনবন্ধুকে বদলি হতে হয় পরিদর্শকের কাজ থেকে পূর্বের নিম্নতর পদে।

কলেজ জীবনে দীনবন্ধু কবি ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর প্রেরণায় তিনি সংবাদ প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন।

তখনকার দিনে অনেক কবি সাহিত্যিকই গুপ্ত কবির পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

দীনবন্ধুও গুপ্তকবির অনুপ্রেরণায় সেই সময় কাব্য রচনা করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন।

কর্মজীবনে সরকারি কাজে তাঁকে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়। সেই সুবাদে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয় এবং বহু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়।

এইভাবে লোকচরিত্র সম্পর্কে তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য জীবনে চরিত্র সৃষ্টির কাজে প্রভূত সহায়ক হয়েছিল। মানবচরিত্র বিশ্লেষণ ও রূপায়নে দীনবন্ধুর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। সকলই ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফল।

এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "দীনবন্ধু রচিত অনেক নাটক প্রকৃত ঘটনা ভিত্তিক এবং অনেক চরিত্র তৎকালীন জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে রচিত।"

সুবিখ্যাত রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সান্নিধ্য দীনবন্ধু লাভ করেছিলেন কৃষ্ণনগরে থাকাকালে। তাঁর সাধুচরিত্র তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি এই মহৎ মানুষটি সম্পর্কে লিখেছিলেন—

পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য-বিমন্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়।
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত।
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন থাকে ভাল দুর্বিনীত মন।
বিদ্যাবিতরণে তিনি সদাহরষিত,
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।

রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্রের মহৎগুণাবলী যে দীনবন্ধুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

চরিত্রের যেসব গুণাবলী অর্জিত হলে অতিসাধারণ স্তর থেকে নিজেকে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে উন্নীত করা যায়, দীনবন্ধু নিঃসন্দেহে সেসকলের অধিকারী হয়েছিলেন এবং বাঙ্গালী চাকুরিজীবীদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই অতি উচ্চপদের অধিকারী হয়েছিলেন।

দীনবন্ধুর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, অসাধারণ পরিশ্রম, নিষ্ঠা, উচ্চাশা, সাধুতা এবং পরদুঃখকাতরতা।

সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কৌতুকপ্রিয়তা।

চরিত্রের এই সকল গুণাবলী দীনবন্ধুর কর্মক্ষেত্র ও জীবনপথের পাথেয় স্বরূপ ছিল।

দীনবন্ধুর ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিখ্যাত নাটক নীলদর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রিঃ শেষ দিকে ঢাকা থেকে। নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারে লাঞ্ছিত দেশীয় নীলকর চাষীদের দুরবস্থার প্রকৃত চিত্র তিনি এই নাটকে যথাযথ রূপদান করেছিলেন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সামাজিক দিক থেকে নীলদর্পণ নাটকের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সেই সময়ে দেশের সাধারণ কৃষক সম্প্রদায় ইংরাজ নীলকরদের বীভৎস অত্যাচারের ফলে সর্বস্বান্ত হচ্ছিল। নানান অপকৌশলে ও অত্যাচারে চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করা হত।

এজন্য গৃহে অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের ওপর অত্যাচার ইত্যাদি কোন কাজেই বর্বর ইংরাজ নীলকরগণ পরাঙ্মুখ হত না।

কর্মসূত্রে ঢাকায় অবস্থান কালে দীনবন্ধু নীল-প্রপীড়িত বহুস্থানে ভ্রমণ করেছিলেন এবং অসহায় চাষীদের অমানুষিক লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

স্বদেশবাসী চাষীসম্প্রদায়ের দুঃখের জ্বালা তাঁর বুকেও তীব্র হয়ে বেজেছিল। সেই হৃদয়যন্ত্রণা নিয়েই তিনি নীলদর্পণ নাটক রচনা করেছিলেন।

এই নাটক যে কেবল জাতীয় চেতনার উদ্বোধক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা নয়। বহুভাবে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

এই নাটককে কেন্দ্র করে সেইকালে দেশব্যাপী অলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কাগজে কাগজে ব্যাপক প্রচারের ফলে নাটকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেশজুড়ে নীলচাষ বিরোধী এক প্রবল আন্দোলনের সূচনা হয়।

১৮৬০ খ্রিঃ ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় নীলদর্পণ। লেখকের নাম ছিল এরকম—কদাচিৎ পথিকস্য।

সেই সময়ে দীনবন্ধু ডাক বিভাগের সুপারিনটেন্ডেন্ট। তাই তাঁর নিজের নামে নাটকটি প্রকাশে অসুবিধা ছিল।

পাদরি রেভারেণ্ড লং সাহেব নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করার জন্য এবং রাজকর্মচারীদের সচেতন করার জন্য নীলদর্পণ-এর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন। এটিই প্রথম ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত নাটক।

ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হলে, নীলকরদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের

সূত্রপাত হয় তার ঢেউ ইংলণ্ডে গিয়েও পৌঁছায়। ফলে সেখানেও ওঠে প্রতিবাদের ঝড়।

দেশে বিদেশে সমালোচিত হবার ফলে নীরকর সাহেবরা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। পাদরি লং সাহেবই হন তাদের আক্রোশের শিকার। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়।

১৮৬১ খ্রিঃ ৯ জুলাই আদালতের রায়ে লং সাহেবের একমাসের কারাদন্ড এবং একহাজার টাকা জরিমানা হয়।

মামলার রায় শোনার জন্য সেদিন আদালতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও উপস্থিত হয়েছিলেন। দীনবন্ধু সেদিন নিজেই লং সাহেবের বদলে জেলে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। জরিমানার টাকা আদালতেই মিটিয়ে দিলেন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু শেষ অবধি কারাবাস এড়াতে পারলেন না লং সাহেব। ওই বছরের ২৪শে জুলাই একমাসের মেয়াদে তাঁকে কারাগারে যেতে হল।

দীনবন্ধু কিন্তু নিরস্ত হলেন না। দ্বিধাহীন হৃদয়ে তিনি সামাজিক সংস্কারমুখী সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। মূলতঃ সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই তাঁর লেখনী অগ্রসর হতে লাগল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যঙ্গ ও কৌতুক রসের আশ্রয় নিলেন।

নীলদর্পণ-এর পরে প্রকাশিত হল নবীন তপস্বী। তারপর বিয়ে পাগলা বুড়ো ও সধবার একাদশী নামে দুটি প্রহসন।

আগাগোড়া কৌতুকরসের মোড়ক দিয়ে সমাজের নানা কুপ্রথা আচার-আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত হেনেছেন তিনি।

১৮৬৭ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় লীলাবতী নাটক ও পরে জামাই বারিক। লীলাবতী নাটকের মতোই জামাই বারিক কৌতুক নাটিকাও সেকালে কলকাতার সমাজে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল।

সেকালের কলকাতার ধনী পরিবারগুলোতে ঘরজামাই রাখা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরালয়ের বাইরে বড় বড় ব্যারাক তৈরি হত জামাইদের জন্য। সেখানে যে পরিবেশে জামাইদের থাকতে হত তারই জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছিলেন দীনবন্ধু।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থেও জামাই বারিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সময় তাঁর বালক বয়স। বড়দের জন্য লিখিত বই পড়ার অধিকার ছিল না বাড়ির বালকদের।

কিন্তু বইটি পড়ার তীব্র আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ এক আত্মীয়ার আঁচল থেকে চাবি চুরি করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন, "চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্য্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না। তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন—আমারও সেই দশা।"

এই সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় সামাজিক বিষয়ে নাটক প্রহসনাদি রচনাতেও দীনবন্ধুর কী অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

নাট্যকার হিসাবে দীনবন্ধুর আবির্ভাবের পূর্বেই মধুসূদন নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর প্রধান নাটকগুলি যখন সবই প্রায় প্রকাশিত হয়ে গেছে, সেই সময় দীনবন্ধুর প্রথম নাটক প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে দীনবন্ধুর রচনায় মধুসূদনের কোনও প্রভাব ছিল না। রচনারীতি এবং বিষয়নির্বাচনেও দীনবন্ধুর স্বাতন্ত্র্য ছিল স্পষ্ট।

বিপথগামী যুবকসম্প্রদায়, বিকৃত স্বভাব উচ্চবিত্ত শ্রেণী, দরিদ্র কৃষক ও নিম্ন শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের চরিত্র রূপায়নের মাধ্যমে তিনি সমাজের বিকৃতি, কুসংস্কার, রীতি-নিয়ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ব্যঙ্গ কৌতুক ও রঙ্গরস ছিল তাঁর হাতিয়ার।

সঙ্গতভাবেই রঙ্গরস প্রধান নাটক ও প্রহসনগুলি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তখনকার বাংলা থিয়েটারগুলিতেও এইসকল নাটক প্রাধান্য লাভ করেছিল।

সেই কালে ধনীক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ করে ধনীদের গৃহেই অভিনয়-সংস্কৃতির চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। বিলিতি থিয়েটারের অনুকরণে বিভিন্ন পরিবারে কয়েকটি নাট্যশালাও গড়ে উঠেছিল। প্রচুর ব্যয়ে ও মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমকের সঙ্গে সেই সকল মঞ্চে সাধারণতঃ পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হত। বিশেষ বিশেষ পরিবারেব লোকজনই কুশীলবের ভূমিকায় অভিনয় করত। এই নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগ থাকত না। নব্যযুবক শ্রেণীও ধনীদের শখের থিয়েটারে ছিল অপাঙ্কতেয়।

দীনবন্ধুর লীলাবতী, সধবার একাদশী প্রভৃতি সামাজিক নাটক প্রকাশিত হবার পর নব্যযুবক শ্রেণী নাটক অভিনয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এইকালে নাটক অভিনয়ের জন্য বিশেষ খরচপত্রের বালাই ছিল না। ফলে নাটক মঞ্চস্থ হবার প্রাথমিক বাধা আর রইল না।

অচিরেই একটি যুবগোষ্ঠী সঙ্ঘবদ্ধ হল বাগবাজারে এবং দীনবন্ধুর নাটক নিয়েই তারা প্রথম থিয়েটার তৈরি করল। এই ভাবেই বঙ্গদেশে থিয়েটার ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সূচনা হয়।

নাটক অভিনয় আর নিছক প্রমোদ বা ধনীক শ্রেণীর খেয়ালখুশিতে আবদ্ধ থাকল না। সর্বশ্রেণীর দর্শকের জন্যই টিকিট কেটে নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ হয়ে গেল।

এই সাধারণ রঙ্গালয়ে ১৮৭২ খ্রিঃ ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধুর নীল দর্পণ নাটক দিয়েই প্রথম অভিনয় আরম্ভ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই নাটককে আঙ্কল টমস কেবিন-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, ‘‘টম কাকার কুটীর আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।’’

নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের ইতিহাস স্মরণীয় হয়ে আছে আরো একটি উল্লেখযোগ্য কারণে। এই নাটকের অভিনয় দেখতে এসে বিদ্যাসাগর মহাশয় মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। অভিনয়ের সাফল্যের সার্থকতম পুরস্কার হিসাবে সেদিন ভাগ্যবান অভিনেতা আনন্দে গর্বে মাথায় স্থাপন করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাজনের পাদুকা।

দীনবন্ধু নীলদর্পণ নাটক রচনার মাধ্যমে যেমন জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের পুরোধা পুরুষ হয়ে আছেন, তেমনি, বঙ্গীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের গৌরব অর্জন করেছেন।

অভিনেতা-কবি-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাষায়, ‘‘বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন ....।’’

নীলদর্পণ, বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক, লীলাবতী, সধবার একাদশী ছাড়াও দীনবন্ধু নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী প্রভৃতি নাটক রচনা করে যশ লাভ করেছিলেন।

মাত্র ৪৩ বছর বয়সে দীনবন্ধু মিত্রর কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে। তিনি পুস্তকাকারে কমলে কামিনী নাটকটি দেখে যেতে পারেন নি। নাটকটি যখন ছাপা হচ্ছে তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়।

অক্ষয়কুমার দত্ত

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাবে বাংলার জাতীয় জীবনে যে নবজাগরণের সূচনা হয় অক্ষয়কুমার ছিলেন তার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তা বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে এক বিপুল পরিবর্তন এনেছিল।

১৮২০ খ্রিঃ ১৫ জুলাই তৎকালীন নবদ্বীপের সন্নিহিত চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমারের জন্ম। তাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত, মাতা দয়াময়ী দেবী।

পীতাম্বর ছিলেন দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি। দয়াময়ী ছিলেন তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী। পিতার গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন অক্ষয়কুমার।

মাত্র সাত বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ হয়েছিল তাঁর। কিন্তু বেশিদিন সেখানে পড়াশুনা করা হয়নি। আট-ন বছর বয়স হতেই পীতাম্বর ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এখানে এক পাদ্রীর কাছে অক্ষয়কুমারের ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়।

পাদ্রীর সংস্পর্শে ছেলেকে ক্রমেই খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হতে দেখে পিতা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। এখানে মাত্র দুই বছর পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার।

এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন হার্ভম্যান জেফ্রয় নামে এক সাহেব। এই সাহেবের কাছেই অক্ষয়কুমার গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু ও জার্মান ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যবয়স থেকেই অসাধারণ মেধাবী ছিলেন তিনি। অধ্যবসায় ও জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁর বিদ্যার্জনের সহায়ক হয়েছিল। অধীত ভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্যাদি পাঠ করে তিনি তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতেন।

সেই সময় খিদিরপুরে থাকতেন অক্ষয়কুমার। সেখান থেকে প্রতিদিন কলকাতার জোড়াসাঁকোয় যাতায়াত করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ত। সেকারণে তাঁকে নিয়ে আসা হল দর্জিপাড়ায় পিসতুতো দাদা রামধন বসুর বাড়িতে। এখানে থেকেই তিনি স্কুলে যাতায়াত করতেন।

বিদেশী ভাষা সাহিত্যের পাশাপাশি গণিত, বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের প্রতিও গভীর আগ্রহ ছিল অক্ষয়কুমারের। স্বভাবতঃই প্রবল অধ্যবসায় ও নিষ্ঠাবলে কিশোর বয়সেই তিনি এ সকল বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। দেশীয় সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রাদির প্রতিও স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল তাঁর এবং গভীর আগ্রহ সহকারে এই সকল বিষয়ে নিয়মিত চর্চা করতেন।

ফলে একটি পরিচ্ছন্ন পরিশীলিত মন কৈশোর থেকেই তাঁর মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

তৎকালীন রীতি অনুযায়ী মাত্র পনেরো বছর বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের কিছুকাল পরেই অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে পড়াশুনা ত্যাগ করে পরিবারের ভরণপোষণের চেষ্টায় ব্যাপৃত হতে হয়।

পিতার অনুপস্থিতিতে সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ল তাঁর ওপরে। এবার কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল তাঁকে। শুরু হল দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম।

অত কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও অক্ষয়কুমারের জ্ঞানস্পৃহা রইল সমান জাগরুক। বন্ধুবান্ধবের কাছে বইপত্র সংগ্রহ করে নিয়মিত তিনি জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করে গেছেন।

একবার একটি কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাক্রমে তাঁর পরিচয় হয় কবি ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে।

সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কবি। প্রভাকর নামে একটি জনপ্রিয় সাহিত্যপত্রও তিনি সম্পাদনা করতেন।

অক্ষয়কুমার গেলেন প্রভাকর কার্যালয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে। সেদিন ঘটনাচক্রে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক অনুপস্থিত ছিলেন।

প্রভাকর পত্রিকার জন্য The Englishman পত্রিকার কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ করার প্রয়োজন হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে বললেন কাজটা করতে।

ইতিপূর্বে গদ্যরচনায় বিশেষ অভ্যাস না থাকলেও অক্ষয়কুমার কবিতা রচনা করেছেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই তিনি রচনা করেছিলেন অনঙ্গমোহন নামে কাব্যগ্রন্থ।

স্বভাবতঃ ঈশ্বর গুপ্তর প্রস্তাবে অক্ষয়কুমার তাঁর অক্ষমতার কথা জানালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিবরের উৎসাহে তিনি অনুবাদের কাজটুকু সমাধা করলেন। লেখা পড়ে সন্তুষ্ট হলেন ঈশ্বর গুপ্ত।

তিনি সানন্দে জানালেন যে. এত দিন এই কাজটি যিনি করে আসছেন অক্ষয়কুমারের অনুবাদ তাঁর চাইতেও উৎকৃষ্ট হয়েছে।

এই ছোট্ট ঘটনাটিই অক্ষয়কুমারকে প্রবল অনুপ্রাণিত করল। তিনি গদ্য রচনা এবং সাংবাদিকতাব কাজে উৎসাহিত হলেন।

এর পর থেকেই তিনি প্রায় নিয়মিত ভাবে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার জন্য ইংরাজি সংবাদপত্র থেকে প্রবন্ধাদির বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। এভাবেই সূত্রপাত হয় অক্ষয়কুমারের গদ্যরচনার।

১৮৩৯ খ্রিঃ তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। বাংলার নবজাগরণের নবীন স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে অক্ষয়কুমারের জীবন এক নতুন গতিবেগ পেল। তিনি যেন এতদিন পরে জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেলেন।

১৮৪০ খ্রিঃ তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বছরই অক্ষয়কুমার এই পাঠশালার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হলেন। মাসিক বেতন ধার্য হল আট টাকা।

পরে মাস কয়েকের মধ্যেই দুই ধাপে তাঁর বেতন বৃদ্ধি হয়ে হয়েছিল চোদ্দ

টাকা। পাঠশালায় শিক্ষকতার কাজে থাকাকালীনই কিছুকাল তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

সেই কালে ইংরাজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষার চর্চা পুরোপুরিই কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। মাতৃভাষা বাদ দিয়ে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াতেই বাঙ্গালী গৌরবান্বিত বোধ করত।

অবশ্য তার সঙ্গে জাগতিক বাস্তব লাভালাভের বিষয়টিই যে প্রবল ছিল তা বলাই বাহুল্য।

মাতৃভাষার এই অবহেলা ও অনাদরের যুগে শুধুমাত্র বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যই তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

সেই কালে খ্রিস্টান মিশনারিদের সুকৌশল প্ররোচনায় দেশের অল্পমতি বালক-বালিকারা পরধর্মের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। হিন্দুধর্ম ও বাঙ্গালী জীবনের ইতিহাসে সে ছিল এক চরম বিপর্যয়ের কাল।

এই পরিস্থিতিতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসী ও পরবর্তী প্রজন্মকে মিশনারিদের প্রলোভন থেকে মুক্ত রাখা। দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার পর জাতীয় চেতনার এই নতুন ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অক্ষয়কুমার প্রাণমন ঢেলে কাজ করতে লাগলেন।

বাংলা ভাষা ছিল অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার। সেই কারণেই ছাত্রদের পাঠদানের উপযুক্ত পুস্তকাদিও রচিত হয়নি। পুস্তকের অভাবে পাঠশালার শিক্ষাদান কাজে খুবই অসুবিধা হতে লাগল।

এই অসুবিধা অনুভব করে অল্পদিনের মধ্যেই অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষায় একখানি ভূগোল পুস্তক রচনা করেন। ১৮৪১ খ্রিঃ তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়।

এরপর তিনি একখানি পদার্থবিদ্যার বইও রচনা করেন। এছাড়া রচনা করেন তিন ভাগে বিভক্ত চারুপাঠ। তাঁর রচিত চারুপাঠ প্রথম থেকে তৃতীয় ভাগ বহুকাল বাংলা স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮৪২ খ্রিঃ টাকির স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার বিদ্যাদর্শন নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অবশ্য এই পত্রিকার মাত্র দুটি সংখ্যাই প্রকাশিত হতে পেরেছিল।

পরের বছরেই আগস্ট মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্ররূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পেলেন অক্ষয়কুমার। তাঁর উপযুক্ত সম্পাদনায় ও প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনা সম্ভারে পত্রিকাটি অল্পকালের মধ্যেই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রে পরিণত হয়।

পত্রিকাটির চর্চিত বিষয়াদি ছিল চমকপ্রদ। তত্ত্ববিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের মননশীল প্রবন্ধাদি পত্রিকাটির গৌরব বৃদ্ধি করেছিল।

নানা বিষয়ের প্রবন্ধাদির সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, হিন্দুবিধবাদের সমর্থনে এবং বাল্যবিবাহ ও নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ লেখাও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হত। প্রায়শই ছাপা হত সচিত্র প্রবন্ধ।

অক্ষয়কুমার যুক্তিপূর্ণ তথ্য ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-বিজ্ঞান-পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি নিয়মিত রচনা করতেন।

এইভাবে তাঁর বলিষ্ঠ কলম চালনা ও মননশীলতার ফলে বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়।

তৎকালে বাংলার দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় নীলকর সাহেব ও জমিদারদের পীড়ন ও অত্যাচারে চরম দুরবস্থায় কবলিত হয়েছিল।

অক্ষয়কুমার এই সকল অবিচারের বিরুদ্ধেই নির্ভীকভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখনী চালনা করতেন।

সে যুগে বাংলাভাষায় গদ্যরচনার রীতি বিশেষ প্রচলিত ছিল না। বাংলা ভাষায় কোন বইও ছিল না। এমত অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনা লিখে অক্ষয়কুমার একদিকে যেমন বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করলেন, তেমনি তরুণ সমাজের দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট করলেন অবহেলিত বাংলা রচনার প্রতি। তাঁর সহযোগী লেখকদের মধ্যে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ দেশবরেণ্য মনীষীগণ।

১৮৪৩ খ্রিঃ থেকে ১৮৫৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ বারো বছর তিনি পরিচালনা সম্পাদনা দ্বারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

সম্পাদক জীবনের শুরুতেই ১৮৪৩ খ্রিঃ দেবেন্দ্রনাথ এবং অপর উনিশজন বন্ধুর সঙ্গে অক্ষয়কুমার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দলই প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম।

অক্ষয়কুমার ছিলেন যুক্তিবাদে বিশ্বাসী। ফলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেও বেদের অভ্রান্ততা তিনি স্বীকার করতেন না।

অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রবলরূপে ভাববাদী এবং বেদের অভ্রান্ততায় আস্থাশীল। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের কর্তা। তাঁর মতেই সমাজ পরিচালিত হত।

অক্ষয়কুমার নিজের মত প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রেরণায় অবিলম্বে আন্দোলন আরম্ভ করলেন এবং জ্ঞান ও যুক্তির সহযোগে ব্রাহ্মসমাজের ভ্রান্তি দূর করতে সচেষ্ট হলেন।

বেদান্ত ধর্ম অনুসারী ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাচার্যদের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার রীতিমতো শাস্ত্রীয় তর্কে অবতীর্ণ হলেন এবং শেষাবধি নিজমত প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হন।

১৮৫০ খ্রিঃ দেবেন্দ্রনাথ বহু অনুসন্ধান ও আলোচনা-চিন্তাদির পরে অক্ষয়কুমারের মতই যুক্তিসিদ্ধ বলে মেনে নিলেন এবং বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস বর্জন করেন।

ব্রাহ্মসমাজে তৎকালে ঈশ্বরোপাসনা হত সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষার বদলে বাংলা ভাষার প্রবর্তন হয় অক্ষয়কুমারের উদ্যোগে। অবশ্য পরে তিনি প্রার্থনাদির প্রয়োজন স্বীকার করতেন না।

১৮৫২ খ্রিঃ জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ স্বীয়ভবনে আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক সমস্যাদির বিষয়ে আলোচনা ও সমাধানের জন্যই এই সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সভার সভাপতি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার ছিলেন সম্পাদক।

কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় নর্মালস্কুল স্থাপন করেন ১৮৫৫ খ্রিঃ ১৭ই জুলাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা ও রচনাদির সূত্রে তাঁর সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পূর্বেই পরিচয় হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের উচ্চ ধারণা ছিল। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে ওই বছরেই বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারকে তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করলেন। মাসিক বেতন ধার্য হয় একশত পঞ্চাশ টাকা।

অবশ্য অক্ষয়কুমার বেশিদিন এই স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারেন নি। দুরারোগ্য শিরোরোগের দরুন তিন বছর পরে ১৮৫৮ খ্রিঃ শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এই সময় তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে তাঁকে মাসিক ২৫টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হয়। পরে তাঁর লিখিত বইয়ের আয় বৃদ্ধি পেলে তিনি এই বৃত্তি নেওয়া বন্ধ করেন।

শিরোরোগের উপশমের আশায় প্রথমে কিছুদিন অক্ষয়কুমার বাংলার বাইরে ভ্রমণ করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না।

শেষ পর্যন্ত হাওড়ার বালী অঞ্চলে গঙ্গার তীরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একখানি বাড়ি নির্মাণ করলেন।

বাড়ির সঙ্গেই নিজহাতে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছিলেন। দেশি বিদেশি অনেক গাছ এখানে রোপন করেছিলেন এবং যত্নের সঙ্গে তাদের লালনপালন ও সংরক্ষণ করতেন।

এই বাগানের তিনি নাম দিয়েছিলেন শোভনোদ্যান।

মাথার যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে খুবই কাতর হয়ে পড়তেন অক্ষয়কুমার। সেই সময় এই বাগানে এসে পায়চারী করে তিনি অনেকটা আরামবোধ করতেন।

তাঁর বিখ্যাত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড এই বাগানে বসেই তিনি রচনা করেন।

এই গ্রন্থের সুদীর্ঘ উপক্রমণিকা অংশে তিনি আর্যভাষা ও সাহিত্যের প্রধান তিন শাখা—ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরানীয় এবং বৈদিক ও সংস্কৃত বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। ভারতে ভাষা বিজ্ঞান সম্বন্ধে সেটিই প্রথম আলোচনা। তাঁর আগে এ বিষয়ে আর কেউ আলোকপাত করেননি।

শেষজীবনে শিরোরোগে অশেষ কষ্ট ভোগ করেছেন অক্ষয়কুমার। শেষ দিকে সামান্য শব্দও সহ্য করতে পারতেন না।

মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের যে পরিকল্পনা অক্ষয়কুমার করেছিলেন দুরারোগ্য শিরোরোগের জন্য তা তিনি রূপায়িত করতে পারেন নি।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কঠোর নীতিপরায়ণ, বিনয়ী ও ধার্মিক। পরদুঃখকাতরতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

অভাবে পড়ে কেউ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে তার অভাব দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হন। প্রার্থনার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু রোগযন্ত্রণার তীব্রতায় শেষ দিকে তাঁর এই মনোভাব স্থির রাখতে পারেন নি। একবার শিরোরোগে অত্যধিক কাতর অবস্থায় বাড়ির নিত্যপূজ্য নারায়ণের আসনে প্রণাম করেন। রোগ উপশমের প্রার্থনা জানান।

এই রোগযাতনা নিয়েই অক্ষয়কুমার ১৮৮৬ খ্রিঃ ২৭শে মে বালীর বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সরোজিনী নাইডু

বাঙলার মেয়ে সরোজিনী নাইডু ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কবি, রাজনীতিক ও বাগ্মী হিসেবে তিনি দেশে ও বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তাঁর পিতার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। মায়ের নাম বরদাসুন্দরী দেবী। অঘোরনাথের পৈতৃক নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার

ব্রাহ্মণগাঁ। বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় বংশের উত্তরপুরুষ অঘোরনাথ নিজে ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত, গিলক্রাইস্ট বৃত্তিপ্রাপ্ত, এডিনবরা কলেজের স্নাতক ও জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

হায়দরাবাদ কলেজের অধ্যক্ষপদে কর্মরত থাকার সুবাদে তাঁকে সপরিবারে সেখানেই থাকতে হত। চলনে বলনে, জীবনযাত্রায় তিনি ইংরাজদের আদবকায়দায় অভ্যস্ত ছিলেন।

এই পরিবেশেও বরদাসুন্দরী দেবী তাঁর বাঙালীয়ানা পুরোদস্তুর বজায় রেখেছিলেন। গৃহস্থালীর সব কাজ তিনি নিপুণভাবে নিজে পরিচালনা করতেন। অবসর সময়ে কবিতা রচনা করতেন—নিজস্ব বাংলা ভাষায়।

অঘোরনাথ গৃহেই ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সরোজিনী বাল্য বয়স থেকে ইংরাজিতে কথা বলতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন। পড়াশুনাতেও ছিল তাঁর গভীর মনোযোগ।

মায়ের কাব্যপ্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করেছিলেন সরোজিনী। গাছপালা, ফুল, আকাশের বর্ণালী, প্রকৃতির পালা বদলের দৃশ্য মুগ্ধ করত তাঁকে। পড়ার টেবিলে প্রায়ই তাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে দেখা যেত।

কখনো আবার অঙ্কের খাতাতেই প্রকৃতির রূপমুগ্ধ বালিকা নিজের মনে কবিতার পংক্তিরচনায় তন্ময় হয়ে যেতেন।

মেয়ের কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে অঘোরনাথ তাঁকে উৎসাহিত করতেন। বলতেন, ইংরাজিটা আরও ভালো করে শিখতে পারলে অনেক ভাল ভাল কবিতা তিনি রচনা করতে পারবেন।

পিতার প্রেরণায় ও উৎসাহে সরোজিনীর কাব্যচর্চার উৎসাহ যেমন বৃদ্ধি পেল, পড়াশুনার প্রতিও আগ্রহ বাড়ল।

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আরো ভাল ইংরাজি শেখার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায় বলে মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি এক অসম্ভবকে সম্ভব করে সকলকে চমৎকৃত করলেন। এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষাজগতে এক অনন্যকীর্তির অধিকারিনী হলেন।

সারাক্ষণ বই-এর মধ্যেই ডুবে থাকতেন সরোজিনী। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহে নাওয়া খাওয়ার কথাও তাঁর ভুল হয়ে যেত।

অল্প বয়সে এত মানসিক পরিশ্রম তাঁর শরীর বইতে পারল না। ক্রমেই রোগা হয়ে যেতে লাগলেন। ডাক্তার দেখে মানসিক পরিশ্রম কমাবার উপদেশ দিলেন।

উদ্বিগ্ন অঘোরনাথ কিছুদিনের জন্য মেয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দিলেন। উপযুক্ত পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন বিদেশী নার্স।

কিন্তু দু-চারদিন যেতে না যেতেই হাঁপিয়ে উঠলেন সরোজিনী। কিছু একটা পড়াশুনা না করে থাকা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। কিন্তু বই নিয়ে বসা পিতার বারণ।

অগত্যা খাতা কলম নিয়ে বসলেন। লিখতে লাগলেন কবিতা। ছয় দিনে লিখে ফেললেন তেরোশো লাইনের এক কাব্য, দুহাজার লাইনের একটি নাটিকা।

কিশোরী কন্যার এই কীর্তি দেখে অঘোরনাথ এতটাই বিস্মিত পুলকিত হলেন যে নিজেই নাটিকাটির মুদ্রনের ব্যবস্থা করলেন।

১৮৯৪ খ্রিঃ তিনি মুদ্রিত নাটিকাটি হায়দরাবাদের নিজামকে উপহার দিলেন। কিশোরী কবির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নিজাম পুরস্কার স্বরূপ তাঁর বিদেশে শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩০০ পাউন্ড বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

বিদেশে গিয়ে শিক্ষা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা সরোজিনীরও ছিল। নিজামের বৃত্তি লাভ করে তাঁর সেই স্বপ্ন পূর্ণ হল। ষোল বছর বয়সে ১৮৯৫ খ্রিঃ তিনি ইংলণ্ড গমন করলেন।

কিন্তু বয়স কম থাকার জন্য সরোজিনী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তাঁকে দুবছর লণ্ডনের কিংস কলেজে পড়তে হল। আঠারো বছর বয়স হলে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার অধিকার লাভ করলেন। তাঁর পড়াশুনা আরম্ভ হল বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজে।

এখানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেই সঙ্গে কবিতা রচনা করেও অনেকের প্রশংসা লাভ করেন।

এই সময় অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে সরোজিনী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পিতার নির্দেশে সুইজারল্যান্ড ও ইতালি ভ্রমণ করলেন। পরে পাঠ অসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে এলেন।

ইংলণ্ডে অবস্থান কালে কবিতা রচনা করে কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন সরোজিনী। দুজন বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্য সমালোচক Edmund Goose এবং Asthar Symons তাঁর রচনার প্রশংসা করেন। তাঁদের প্রেরণায় তাঁর প্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ ঘটে।

বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে Nightingle of East আখ্যা দিয়েছিলেন।

তাঁর রচিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ Bird of Time, The Broken Wing, Golden Threshold, The Songs of India দেশে ও বিদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং সাহিত্য জগতে কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

দেশে ফিরে আসার তিন মাস পরে ১৮৯৮ খ্রিঃ হায়দরাবাদের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মোতিয়ালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

বিবাহের পর থেকে সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় পরিচিত হলেন সরোজিনী নাইডু হিসেবে।

ইংরাজি আদবকায়দায় মানুষ হলেও সরোজিনীর অন্তর জুড়ে ছিল স্বদেশ-প্রীতি। তাই পরাধীন দেশে যখন স্বাধীনতার জাগরণ ঘটল, তিনি দূরে থাকতে পারলেন না।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ভারতীয় ভাব ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এতকাল পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শেই কবিতা রচনা করতেন তিনি। এবার তাঁর রচনায় রূপ পেতে লাগল প্রাচীন ভারতের আদর্শ এবং নবজাগ্রত ভারতের আন্তর-বাণী।

এই সময় থেকেই তাঁর রচিত বিবাহের গান, ঘুমপাড়ানি গান, পালকি বেহারা ও ভিস্তিওয়ালার গান, মন্দিরের আরতির ঘণ্টা, আজান ধ্বনি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের কবিতাবলী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করল।

কবিতা রচনার জন্য ইণ্ডিয়ান নাইটিংগেল আখ্যা কৌশোরেই পেয়েছিলেন সরোজিনী। ১৯১৪ খ্রিঃ তাঁকে সম্মানিত করা হয় রয়েল সোসাইটি অব লিটারেচার সংস্থার ফেলো নির্বাচিত করে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টায় ১৯১৩ খ্রিঃ লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় অধিবেশন হয়। এই মহতী সভায় সরোজিনী সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা করে দেশের নেতৃবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন।

এই সূত্রেই স্বদেশীয় রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে ভাবীকালের জননেত্রীর। ১৯১৫ খিঃ তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন।

১৯১৬ খ্রিঃ লক্ষ্ণৌতে এবং ১৯১৭ খ্রিঃ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে যোগদান করলেন সরোজিনী। দুটি অধিবেশনেই তাঁর ওজস্বিনী ভাষণে ছিল স্বদেশ-মন্ত্রের আহ্বান।

অচিরেই নেতৃত্বের প্রথম সারিতে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং দেশনেত্রী হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

পরের বছর মাদ্রাজে কাঞ্জিভরমে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন।

১৯১৯ খ্রিঃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো। সরোজিনী সেই আন্দোলনে যোগদান করেন।

সেই বছরেই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটে দুরাচারী ইংরাজ সরকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নিরস্ত্র, অসহায় ভারতীয়দের ওপর নির্বিচারে গুলিচালনা ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশজুড়ে আরম্ভ হল প্রবল আন্দোলন। সরোজিনীও ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই আন্দোলনে।

অতঃপর অ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগ-এর প্রতিনিধি হিসেবে সরোজিনী ইংলন্ড যান। সেখানে বিভিন্ন সভায় ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্য বক্তৃতা করতে লাগলেন।

একই সঙ্গে ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকারের দাবীতে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললেন।

দেশে ফিরে এসে, ১৯২১ খ্রিঃ তিনি বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন।

সেই সময় আফ্রিকার কেনিয়াতে ভারতীয় উপনিবেশিকদের ওপর চলছিল শ্বেতাঙ্গ উৎপড়ীন।

এককালে গান্ধীজি, তখনো তিনি ভারতের রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি, দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করেছিলেন। সেইকালে তিনি উৎপীড়িত ভারতীয়দের পক্ষাবলম্বন করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন এবং শান্তি ফিরিয়ে আনেন। পুনরায় সেখানে ভারতীয় নিপীড়নের সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন গান্ধীজি সরোজিনীকে কেনিয়া যাওয়ার পরামর্শ দেন।

সরোজিনী কেনিয়া যান এবং সেখানে তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতা ও উদ্দীপক বক্তৃতার প্রভাবে ভারতীয়গণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন জোরদার করে তোলে। সরোজিনী দেশে ফিরে আসেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সরোজিনী নাইডু তখন বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্ব। ১৯৩০ খ্রিঃ গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলেত যাবার সময় গান্ধীজি সরোজিনিকেও সঙ্গী করলেন। ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার দাবি নিয়ে তাঁরা সেখানে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কিন্তু ব্যর্থ হল গোলটেবিল বৈঠক।

ভারতে ফেরার পথে গান্ধীজির সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন সরোজিনীও। পরে সেই বছরেই গান্ধীজি লবন সত্যাগ্রহ শুরু করলে তিনিও সেই আন্দোলনে যোগ দেন। সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে অতিক্রম করেন মাইলের পর মাইল পথ। লবন আইন অমান্য করায় গান্ধীজির সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সরোজিনী। তাই কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে করতেন না। জাতীয় আন্দোলনের সকল স্তরেই তিনি থাকতেন পুরোভাগে।

গান্ধীজির ডাকে সারা ভারত জুড়ে যখন আরম্ভ হল ভারত ছাড় আন্দোলন সেইকালে গান্ধীজি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরোজিনীও গ্রেপ্তার হলেন। বন্দি অবস্থায় তাঁকে রাখা হয় পুনায় আগাখাঁর প্রাসাদে। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৯৪৩ খ্রিঃ ২১শে মার্চ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল।

ভারতীয় জনসাধারণের লাগাতার আন্দোলন, আত্মত্যাগ ও কঠোর নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট। সার্থক হল সরোজিনীর জীবনের স্বপ্ন।

ভারত শাসনের কর্তৃত্ব লাভ করল ভারতীয় কংগ্রেস দল। সরোজিনী নিযুক্ত হলেন বর্তমান উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল। ভারতে তিনিই হলেন প্রথম মহিলা রাজ্যপাল।

আমৃত্যু এই পদেই নিযুক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৪৯ খ্রিঃ ১লা মার্চ দেশবরেণ্য নেত্রী সরোজিনী নাইডুর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর ত্যাগ ও কীর্তির মহিমা চিরজাগরুক হয়ে রয়েছে কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর অন্তরে।

কর্নেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

বাঙালী ভীরু ও কর্মবিমুখ জাতি এই অপবাদ খন্ডন করেছিলেন কর্নেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। অদম্য মনোবল, কর্তব্য সম্পাদনে অবিচল নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে তিনি সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিদেশে যশ, সম্মান, অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করে স্বদেশের ও স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

কর্নেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের দুঃসাহসিক জীবন-কাহিনী পরাধীন ভারতে মুক্তি সংগ্রামীদের প্রেরণা স্বরূপ ছিল।

Morning shows the day বহুপ্রচলিত এই ইংরাজি প্রবাদ সুরেশচন্দ্রের দুরন্ত দুঃসাহসী জীবনের যথাযথ প্রতিফলন বললে অত্যুক্তি হবে না। ভবিষ্যতের নির্ভীক ও শক্তিমান মানুষটির চরিত্র তাঁর ছেলেবেলার জীবনেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

সুরেশচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল নদীয়া জেলার ইছামতীর তীরবর্তী নাথপুর গ্রামে ১৮৬১ খ্রিঃ। তাঁর পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস।

ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য গিরিশচন্দ্র প্রথমে গ্রামের স্কুলেই ভর্তি

করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লেখাপড়ার চাইতে সঙ্গীদের নিয়ে মাঠে প্রান্তরে নদীর তীরে দুরন্তপনা করতেই বেশি ভালবাসতেন তিনি।

লেখাপড়ায় অমনোযোগ দেখে সুরেশচন্দ্রকে তাঁর পিতা নিজের কর্মস্থল কলকাতায় নিয়ে আসেন। ভর্তি করে দেন লন্ডন মিশন স্কুলে।

কিন্তু কলকাতার ইট-কাঠে ঘেরা বদ্ধ পরিবেশে দুদিনেই হাঁপিয়ে ওঠেন বালক। গ্রামের খোলা মাঠ, মুক্ত আকাশ তাঁকে কেবলি হাতছানি দিয়ে ডাকত। তাই স্কুলের ছুটি পেলেই ছুটে চলে আসতেন গ্রামে। পুরনো বন্ধুদের নিয়ে আগের মতো ঘুরে বেড়াতেন যত্রতত্র।

একবার গাছের উঁচু ডাল থেকে পাখির ছানা পাড়তে গিয়ে তো মহা বিপত্তি।

পাখির ছানা নিয়ে গাছ থেকে নামছেন—অমনি চোখে পড়ল, গাছের কোটর থেরে বেরিয়ে সাপ ফণা উঁচিয়ে আছে। ছোবল দেয় আর কি!

বালক সুরেশ কিন্তু বিচলিত হলেন না। হাত থেকে পাখির ছানাটা ফেলে খপ করে চেপে ধরলেন সাপের মাথা।

পকেটে ছিল পেন্সিল-কাটা ছুরি। বাঁহাতে সেই ছুরি বার করে দাঁত দিয়ে ফলাটা খুলে ফেলেতে একটা মুহূর্তও অপচয় হল না। তারপর বাঁ হাতে সাপের গলাটা কেটে নিচে ফেলে দেন।

গাছের নিচে দাঁড়ানো স্তম্ভিত আতঙ্কিত ছেলেরা তাদের দলপতির দুঃসাহসিক কীর্তি দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

আর একবার ছুটিতে বাড়িতে এসেছেন। দুজন সঙ্গীকে নিয়ে একদিন রওনা হলেন দূরে ঝিলে মাছ ধরতে।

এমনি সময় সামনে হৈ রৈ শব্দ। তাকিয়ে দেখেন ঝোপ ভেঙ্গে এক বুনো শুয়োর দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে তাদেরই দিকে। আর পেছনে তাকে তাড়া করে আসছে একপাল কুকুর নিয়ে জন কয়েক সাহেব শিকারী।

বুনো শুয়োর ততক্ষণে একেবারে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে। সুরেশের সঙ্গীরা প্রথমে হতভম্ব! পরক্ষণেই ছুটন্ত বুলেটের মতো দুজন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল দুটিকে।

এমন বিপদের মুখে পড়েও সুরেশ কিন্তু অবিচল। তিনি হাতের ছিপ বাগিয়ে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই দুরন্ত বেগে ছুটে এসে বুনো শুয়োর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপরে।

বন্দুকের গুলিতে আহত রক্তাক্ত শুয়োর আক্রোশে ফুঁসছে। সুরেশ দৃঢ় হাতে ছিপ আঁকড়ে প্রাণপণে আঘাত করলেন তার মাথায়।

আচমকা আঘাতে থমকে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগল জানোয়ারটা। সেই অবসরে একের পর এক ছিপের আঘাত পড়তে লাগল তার মাথায়।

প্রচন্ড সেই আঘাত বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না শুয়োরটা। এক সময় লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল মাটিতে।

ততক্ষণে শিকারীর দল ছুটে এসেছে সেখানে। তাদের বন্দুকের গুলিতে মুহূর্তে নিশ্চল হয়ে গেল সাক্ষাৎ যম।

গ্রামের প্রান্তেই ছিল নীলকুঠি। সেখানকার সাহেবরাই ধাওয়া করেছিল বুনো শুয়োরটাকে। নির্ভীক সুরেশের সাহসিকতা দেখে বিস্মিত সাহেবরা তাঁর প্রশংসা করল। পরে যাবার সময় তাঁকে তাদের নীলকুঠিতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল।

সেদিনের এই বুনো শুয়োর শিকারের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে তাকে কেন্দ্র করেই সুরেশচন্দ্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের শুভ সূচনা হয়েছিল।

সাহেবদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে এরপর থেকে মাঝে মাঝেই সুরেশচন্দ্র নীলকুঠিতে উপস্থিত হতে লাগলেন। নির্ভীক বালক অল্প দিনেই সাহেবদের মন জয় করে নিলেন।

নীলকুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন এক পাদ্রী। সুরেশচন্দ্রকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। তিনিও স্কুল ছুটিতে বাড়িতে এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন।

একবার তো সাহেবের কাছে রয়েই গেলেন। এদিকে স্কুলের ছুটি শেষ। ছেলেকে ফিরতে না দেখে অস্থির হয়ে গিরিশচন্দ্র লোক পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য।

এভাবেই দিন কাটতে লাগল। বয়স যত বাড়তে লাগল, সুরেশচন্দ্রের দুরন্তপনাও ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কলকাতার স্কুলেও তাঁর সঙ্গীর অভাব হল না। শারীরিক শক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে তিনি তাদেরও দলপতির আসনটি অবলীলায় দখল করে বসেছেন।

একদিন চার বন্ধু মিলে গেছেন গড়ের মাঠে বেড়াতে। তখন সেখানে সাহেবদের আনাগোনাই ছিল বেশি। ইংরাজরা পথচলতি দেশীয় লোকদের নানাভাবে হেনস্থা করে মজা পেত।

সেদিন দুজন ইংরাজ যুবক তাদের নানাভাবে উত্যক্ত করতে লাগল। নিগার, নেটিভ ইত্যাদি বলে বিদ্রূপ করতে লাগল।

সুরেশচন্দ্র কিন্তু মুখবুজে অপমান সহ্য করলেন না। তিনিও দিলেন পাল্টা গালি। সেই থেকে শুরু হল হাতাহাতি।

দু'হাতে বেপরোয়া ঘুঁসি চালিয়ে সুরেশচন্দ্র সেদিন একাই ইংরাজ যুবকদের শায়েস্তা করলেন। বাঙালী যুবকের বেধড়ক মার খেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করল।

স্বভাবে দুরন্ত হলেও মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুরেশচন্দ্র স্কুলের অধ্যক্ষ অস্টন সাহেবের স্নেহভাজন ছিলেন। তিনিও আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন সাহেবের কোয়ার্টারে।

ওদিকে ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে বেশিরভাগ সময়টাই কাটাতেন নীলকুঠির সাহেবদের সঙ্গে।

খ্রিস্টান ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা এভাবে ক্রমশই বাড়ছে দেখে পিতা গিরিশচন্দ্র খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্র পিতার কোন নিষেধেই কর্ণপাত করলেন না।

পিতা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলে শাসালেন। তথাপি সাহেবদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা বন্ধ হল না।

শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ গিরিশচন্দ্র একদিন পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সেই সময় সুরেশচন্দ্রের বয়স মাত্র তেরো বছর।

নিতান্তই কিশোর বয়স। ভাগ্যের ফেরে সেই বয়সেই তাঁকে নিতে হল পথের আশ্রয়।

জীবিকা অর্জনের জন্য একটা কাজ তো চাই। কিন্তু কাজ কে দেবে অপরিচিত কিশোরকে? তবুও কলকাতার পথে পথে ঘুরতে লাগলেন তিনি।

কোনও দিন খাবার জোটে, কোনও দিন উপবাসে নয়তো কলের জল খেয়ে কাটে।

শেষ পর্যন্ত একটা উপায় যদি হয় সেই ভরসায় দেখা করলেন লন্ডন স্কুলের অধ্যক্ষ অস্টন সাহেবের সঙ্গে। মনে জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস। তাঁকে যে করে হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে।

অধ্যক্ষের আশ্রয়ে থেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন সুরেশচন্দ্র। তাঁরই চেষ্টায় সাহেবদের স্পেনসেস হোটেলে সামান্য বেতনের একটা কাজও জুটে গেল।

পায়ের তলায় যেন মাটি পেলেন একটু। সেটুকুই অবলম্বন করে নিজেকে টেনে তুলবার সঙ্কল্প করলেন।

স্পেনসেস হোটেলে কাজটি সুরেশচন্দ্রের জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তাঁর দুরন্ত দুর্বার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকটা প্রস্তুতি এখানেই সম্পন্ন হয়েছিল।

ইংরাজ নরনারীর সঙ্গে মেলামেশা করে এখানে তিনি তাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। ইংরাজিতে কথা বলার অভ্যাসও বেশ সড়গড় হল।

হোটেলের অফিসে সামান্য লেখাপড়ার কাজের সঙ্গে আরও একটি কাজ সুরেশচন্দ্রকে করতে হত। ইউরোপ থেকে আগত সাহেবদের স্পেনসেস হোটেলে নিয়ে আসার জন্য প্রায়ই তাঁকে যেতে হত জাহাজঘাটে।

এমনি যাওয়া-আসার ফলে দিনে দিনে তাঁর মনে বিদেশ গমনের সাধ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল।

তখনকার দিনে এদেশীয় অনেকেই ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশে পাড়ি দিত। সুরেশচন্দ্রও রেঙ্গুন যাওয়ার সঙ্কল্প নিলেন।

বেতনের টাকা থেকে যৎসামান্য যা সঞ্চয় হয়েছিল, তা নিয়েই একদিন রেঙ্গুনের জাহাজে চড়ে বসলেন।

রেঙ্গুনের দিনগুলো খুব সুখকর না হলেও তাঁব অভিজ্ঞতার ঝুলি অপূর্ণ ছিল না।

স্থির সঙ্কল্প আর অবিচল আত্মবিশ্বাস মানুষের ভাগ্য তৈরি করে। সুরেশচন্দ্রের জীবনেও এই আপ্তবাক্য সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

পথই তাঁকে পথ দেখাল। রেঙ্গুনে পদার্পণ করার পরেই সৌভাগ্যবশতঃ এক পুরনো বন্ধুর দেখা পেয়ে গেলেন এবং তাঁর আবাসেই থাকবার সাময়িক ব্যবস্থা হয়ে গেল।

অপরিচিত নতুন দেশে এবারে শুরু হল চাকরির চেষ্টা।

একদিন পথ চলেছেন, সহসা পাশের বাড়ি থেকে কানে এল মহিলার আর্তনাদ। স্থানকাল বিবেচনা না করেই তিনি বিপন্নকে রক্ষা করার স্বাভাবিক প্রেরণাবশে ছুটে গেলেন বাড়ির ভেতরে।

দুই মগদস্যুর হামলা হয়েছিল সেই বাড়িতে। আক্রান্ত হয়েছিলেন গৃহকর্ত্রী। নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে সুরেশচন্দ্র হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দস্যুদের ওপর।

আবাল্য খেলাধুলো ও দৌড়ঝাঁপে পুষ্ট সুগঠিত ও বলশালী শরীর সুরেশচন্দ্রের। মুহূর্তে বেপরোয়া ঘুসি চালিয়ে ধরাশায়ী করলেন দস্যু দুজনকে। প্রাণভয়ে তারা ছুটে পালাতে বিলম্ব করল না।

বিপন্ন মহিলাকে উদ্ধার করে আবার পথে নামলেন তিনি। জীবিকার্জনের একটা ব্যবস্থা যে না করলেই নয়।

কিন্তু অনেক ঘোরাঘুরি করেও রেঙ্গুনে কোনও সুবিধা করতে পারলেন না। তাই শেষপর্যন্ত আবার মাদ্রাজগামী জাহাজে চড়ে বসলেন।

মাদ্রাজে পৌঁছতে পৌঁছতে হাতের শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষ হল। দুর্দশার চূড়ান্ত হল এখানে। দেশে ফিরবেন সে উপায়ও নেই, গাড়িভাড়া পাবেন কোথায়?

সহায় সম্বলহীন সুরেশচন্দ্র একদিন মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হলেন যে সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করবেন স্থির করলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই পথে এক পাদ্রীর সঙ্গে তাঁয় পরিচয় হল। তাঁর

দুরবস্থার কথা শুনে পাত্রী নিজের বাড়িতেই একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন সুরেশচন্দ্রের।

কিছুদিন চাকরি করার পরে হাতে পথ খরচের টাকা জমলে কলকাতায় চলে এলেন তিনি। উঠলেন অস্টন সাহেবের আশ্রয়ে।

এবারে মাথায় চাপল বিলেত যাবার চিন্তা। সেই উদ্দেশ্যেই জাহাজঘাটে আনাগোনা শুরু করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এক ইংলণ্ডগামী জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। সেই ক্যাপ্টেনই তাঁকে জাহাজের সহকারী স্টুয়ার্টের পদে চাকরি দিলেন।

এবারে লন্ডনে পৌঁছবার আর বাধা রইল না। লন্ডনে পৌঁছে তিনি ইস্ট এণ্ড পল্লীতে একটি ঘর ভাড়া করে চাকরির সন্ধান করতে লাগলেন।

বিদেশ বিভুঁয়ে দিনকয়েকের মধ্যেই পকেট শূন্য হল। ভাড়া ঘর ছেড়ে পথে নামতে হল।

এই সঙ্কটকালে এক সংবাদপত্র বিক্রেতা বালক তাঁকে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়ে দিল। তিনিও পথে পথে পত্রিকার হকারি শুরু করলেন।

কিন্তু একাজে বিশেষ সুবিধা হল না। পেটের দায়ে কিছুদিন পরেই তাঁকে মুটেগিরির কাজ নিতে হল। পরিশ্রম সাপেক্ষ হলেও রোজগার এবারে ভালই হতে লাগল।

লন্ডন শহরে থাকার খরচ ছিল অত্যধিক। তাই কিছুদিন পরে অল্প খরচে থাকার জন্য তিনি চলে এলেন শহরতলীতে।

প্রয়োজনই মানুষের বুদ্ধি যোগায়। সুরেশচন্দ্রও একদিন নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে গ্রামের দিকে ফিরি করতে বেরিয়ে পড়লেন।

এই কাজে নেমে নানা দিকে ঘোরাঘুরি ও লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে একদিকে যেমন তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়তে লাগল, তেমনি লাভও ভালই হতে লাগল।

অর্থ এমনই এক বস্তু যা মানুষকে সুস্থির হতে সাহায্য করে। ভাল উপার্জন হতে থাকায় সুরেশচন্দ্রও এবারে নিজের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন। এই সময়েই তিনি রসায়ন ও গণিতের সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন ভাষা শেখায় মনোযোগী হলেন।

বাস্তব বড় বিচিত্র, গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। বলেছিলেন এক পাশ্চাত্য মনীষী। সুরেশচন্দ্রের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনকাহিনী কল্পিত উপন্যাসকেও হার মানায়।

নিজেই নিজের জীবনকে গড়েপিটে তৈরি করছেন সুরেশচন্দ্র, সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে অদম্য মনোবলকে সম্বল করে।

বাস্তব অভিজ্ঞতার শিক্ষায় ততদিনে সময় ও সুযোগকে কাজে লাগাবার পথ চিনেছেন তিনি।

একদিন পথে এক বাজিকরের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর মনে হল এই বিদ্যাটা রপ্ত করতে পারলে তার সুবাদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার বৃহত্তর সুযোগ লাভ করতে পারেন।

সঙ্কল্প স্থির করে সেই বাজিকরের কাছেই ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে নিজের চালচলন পোশাক-আশাকও পাল্টে ফেললেন। এখন তিনি পুরদস্তুর সাহেব।

শারীরিক নানা কৌশল আগেই রপ্ত ছিল। ইন্দ্রজালবিদ্যার সঙ্গে তাকে যুক্ত করে তিনি নিজেই উদ্ভাবন করে ফেললেন নতুন নতুন খেলা।

এই সময় অযাচিতভাবে সুযোগও এসে গেল। এক সার্কাস দলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল এবং নিজের ক্রিয়াকৌশলের পরিচয় দিয়ে সেই দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন। সপ্তাহে উপার্জন হতে লাগল তিন শিলিং করে।

সুরেশচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এখানে যে তিনি সকল অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন। প্রবল আত্মবিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে সর্ব অবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি হাসিমুখে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেছেন।

সার্কাস দলে ছিলেন এক জার্মান যুবতী। তিনি হিংস্র বন্য পশুদের বশ করতে জানতেন।

বাঘ সিংহের খাঁচায় ঢুকে সেই পশুদের সঙ্গে নানা খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতেন। মেয়েটি ফরাসী ভাষাও জানতেন।

সুরেশচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই সেই মেয়েটির কাছ থেকে ফরাসী ভাষা শিখে নিলেন। সেই সঙ্গে তালিম নিলেন হিংস্র পশুদের নিয়ে খেলা দেখাবার ক্রিয়াকৌশল। অচিরেই যাদুর খেলা ও নানা শারীরিক কৌশলের সঙ্গে সিংহদের নিয়েও খেলা দেখাতে লাগলেন সুরেশচন্দ্র।

মুগ্ধ দর্শকদের মুখে মুখে তাঁর দক্ষতার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হল না। সময়টা ১৮৮২ খ্রিঃ।

বিখ্যাত বন্যপশু ট্রেনার জামবাকসাহেব একদিন সার্কাস দেখতে এসে সুরেশচন্দ্রের খেলা দেখে বিস্মিত হলেন। পরে তিনি এই তরুণ শিল্পীকে নিজের পশুশালায় সহকারী রূপে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সাহচর্য ও শিক্ষাগুণে হিংস্রজন্তুর খেলায় সুরেশচন্দ্র এমনই দক্ষ হয়ে উঠলেন যে খাঁচার পশুদের তিনি ইচ্ছা মাত্র বশীভূত করতে পারতেন।

খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা সুযোগও আসতে লাগল। এক নতুন সার্কাস দলে যোগ দিলেন সুরেশচন্দ্র।

দলের সঙ্গে তিনি লণ্ডন থেকে হামবুর্গ যান। এখানে তিনি গাজেনবাক, জোগ কার্ল প্রভৃতি বিখ্যাত দলে খেলা দেখিয়ে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন।

স্থানীয় খবরের কাগজগুলি তাঁর ছবি সহ বীরত্বের কাহিনী ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগল।

এই সময় তিনি দলের সঙ্গে ইউরোপের নানা দেশে খেলা দেখিয়ে প্রশংসা অর্জন করেন।

সর্বশেষ জার্মানী হয়ে তিনি আসেন আমেরিকায়। নিউইয়র্কে তিনি মিঃ উইস-এর সার্কাস দলে কিছুদিন খেলা দেখান। নিউইয়র্ক থেকে চলে আসেন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে।

সুপ্রসন্ন ভাগ্যই যেন অক্লান্তকর্মা সুরেশচন্দ্রকে এখানে নিয়ে এল। সাফল্য ও গৌরবের উজ্জ্বল সোপান-পথ তাঁকে স্বাগত জানাল।

রাজধানী শহর রিও-ডি-জেনিরোতে খেলা দেখিয়ে বীরের সম্মান লাভ করলেন তিনি।

সেই সময় নানা বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতাও অর্জন করেছিলেন সুরেশচন্দ্র।

কার্যকারণে নানা দেশ পরিভ্রমণের ফলে পর্তুগীজ, ড্যানিশ, ইটালিয়, জার্মান, স্প্যানিশ, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা ভালভাবে শিখতে পেরেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে গণিত, দর্শন ও রসায়ন শাস্ত্রও আয়ত্ত করেছিলেন।

সেই সময় ব্রেজিলের সরকারী পশুশালার সুপারিনটেনডেনটের পদটি খালি ছিল। সুরেশচন্দ্রের নানা বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সরকার তাঁকে পশুশালার শূন্যপদে নিয়োগ করলেন।

ততদিনে একটা স্থায়ী কাজ পেয়ে সুরেশচন্দ্র সুস্থিত হতে পারলেন। ক্রমে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করলেন।

পশুশালায় কিছুদিন কাজ করার পর তিনি চাকরি নিলেন রাজকীয় অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীতে। সেখান থেকে একদল পদাতিক সৈন্যের কর্পোরেল করে তাঁকে পাঠানো হল সান্টাক্রুজে।

কিছুদিন পরে রিও-ডি-জেনিরোর সামরিক হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক করা হল তাঁকে।

সুরেশচন্দ্রের চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল এটি যে, সবসময়েই নতুন কিছু শেখার প্রতি আগ্রহ বোধ করতেন। হাসপাতালের চাকরিতে এসেও

চিকিৎসাবিদ্যার অনেক বিষয় আয়ত্ত করলেন। বিশেষ করে দক্ষতা অর্জন করলেন অস্ত্রোপচারে।

পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে সুরেশচন্দ্র যখন খুবই ব্যতিব্যস্ত সেই সময় ব্রেজিলে শুরু হল রাষ্ট্রবিপ্লব। আহত ও মরণোন্মুখ সৈন্যদের ভিড় পড়ে গেল হাসপাতালে।

শহরের সমস্ত হাসপাতাল হয়ে উঠল বিভীষিকাময় মৃত্যুপুরী। হাসপাতালগুলি দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ল সুরেশচন্দ্রের ওপর। তাঁর তত্ত্বাবধানে শৃঙ্খলার সঙ্গে রোগীদের চিকিৎসা হতে লাগল। এসময়ের তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কর্তৃপক্ষ।

তাঁর কর্মনৈপুণ্যের পুরস্কার হিসাবে এরপরে সুরেশচন্দ্র পেলেন পদাতিক বাহিনীর সার্জেন্ট পদ।

সেই সময় নানাস্থানে চলছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ। সুরেশচন্দ্র নির্ভীক কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনা করে উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারদের প্রশংসা লাভ করলেন। কিছুদিন পরেই তিনি উন্নীত হলেন লেফটেনান্ট পদে।

একজন বিদেশীর পক্ষে সৈন্যবাহিনীর এই গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করা কম গৌরবের কথা নয়। নিজের কর্মোদ্যোগ নির্ভীকতা ও কুশলতার গুণে সুরেশচন্দ্র সেই দুর্লভ গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

নতুন পদে উন্নীত হবার পর সুরেশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হল রিও-ডি-জেনিরো শহরে। এখানে আসার পর তিনি এক চিকিৎসকের কন্যাকে বিবাহ করে সংসার পাতলেন। সম্মান, অর্থ, যশ পেয়েছিলেন, এবারে তিনি লাভ করলেন গৃহশান্তি।

দেশে যে মানুষ একদিন খিদের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন, বিদেশে এসে তিনি লাভ করলেন মানুষের আকাঙ্ক্ষীত পরিপূর্ণ জীবন। এই রাজধানী শহরে এখন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

সদ্য স্বাধীন দেশ ব্রাজিল। বিদ্রোহীরা ক্রমশই তাদের নাশকতামূলক তৎপরতা বৃদ্ধি করে চলেছিল। রাজকীয় নৌবাহিনীকেও তারা ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করে ফেলল। তারা রিও-ডি-জেনিরো শহরে গুলিবর্ষণ করতে লাগল।

স্থলবাহিনীর মনোবল দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমন সময় তাদের সাহায্যে এগিয়ে গেলেন সুরেশচন্দ্র। তাঁর আক্রমণকৌশলে পিছু হটতে বাধ্য হল বিপক্ষদল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তারা নাথেরয় শহর আক্রমণ করল।

তাদের নির্বিচার গুলিবর্ষণে বহু বাড়ি ধ্বংস হতে লাগল। লোকজন মারা পড়তে লাগল। রাজকীয় পদাতিক বাহিনী প্রবল আক্রমণের মুখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

দলের প্রধান সেনাপতি দেখলেন শহরের দখল রাখা সম্ভব হবে না। দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে তিনি অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। তিনি বললেন, আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে দেশকে এই দারুণ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে?

সকলেই মাথা নিচু করে রইলেন। সেনাপতি বুঝতে পারলেন, এবারে পরাজয় নিশ্চিত।

এমন সময় বত্রিশ বছরের তরুণ সেনা সুরেশচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি পারি। আমাকে আপনি মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য দিন যাঁরা মরতে ভয় পায় না।

বিস্মিত প্রধান সেনাপতি এই বিদেশী বীরকে নীরবে সম্মান জানিয়ে অবিলম্বে পঞ্চাশজন উপযুক্ত সৈন্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সেই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই বিরাট শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুরেশচন্দ্র। তুমুল যুদ্ধ হল উভয় পক্ষে। রাজকীয় বাহিনীর মরণপণ লড়াইয়ের সামনে পর্যুদস্ত হয়ে গেল শত্রুরা।

সুরেশচন্দ্র এমনই কৌশল অবলম্বন করলেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই বহু সংখ্যক শত্রুসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই ধরাশায়ী হল। বহু বিদ্রোহী সৈন্যকে বন্দী করে সুরেশচন্দ্র শিবিরে ফিরে এলেন।

এই কঠিন যুদ্ধে জয়লাভের পর রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর মনোবল বেড়ে গেল। অন্যান্য অঞ্চলেও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে তারাই জয়ী হতে লাগল। ব্রাজিল থেকে নিশ্চিহ্ন হল বিদ্রোহীরা।

এই যুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শনের জন সেনাবাহিনীতে ও সরকারী উচ্চ মহলে বহু প্রশংসা লাভ করলেন সুরেশচন্দ্র। বহু পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হল। কিন্তু তাঁর আর পদোন্নতি হয় নি।

অবশ্য উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষায় লালায়িত ছিলেন না সুরেশচন্দ্র। জীবনে যখন যে পদে থেকেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। কর্তব্য প্রতিপালনেই ছিল তাঁর আনন্দ।

তবে তিনি যদি বিদেশীয় না হয়ে আমেরিকার অধিবাসী হতেন তবে নাথেরয় যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়ের গৌরবলাভের পর বীরত্বের উপযুক্ত মর্যাদা পেতেন।

বীরত্বপূর্ণ বহু কীতিকলাপের গৌরবদীপ্ত নায়ক সুরেশচন্দ্রের জীবন যে কোন দেশের যে কোন জাতির আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত। অথচ বিদেশের মাটিতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল সুরেশচন্দ্রের কীর্তিকাহিনী। ভারতের বিশেষ করে বাঙলার কজন আজ তাঁকে স্মরণ করে! তাঁর জীবনকথা প্রতিটি বাঙালী যুবকের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৯০৫ খ্রিঃ ২২ সেপ্টেম্বর ব্রাজিলে পরলোক গমন করেন বাঙালী বীর সুরেশচন্দ্র। মৃত্যুকালে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী, তিনপুত্র ও এক কন্যা বিদেশেই রয়ে গেলেন।

ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে দ্য ভলতেয়ার

সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সমাজ জীবনে চিন্তা ও মননের বিপ্লব ঘটিয়ে মানব ইতিহাসে যিনি স্বাধীনতার প্রতীক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর নাম ভলতেয়ার। নির্ভীক, সত্য ও ন্যায়ের পূজারী এই মহান পুরুষের চিন্তার ফলেই সেযুগের স্বৈরতান্ত্রিক ফ্রান্সের মানুষ সামাজিক অজ্ঞতা, কুসংস্কার, চার্চের মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, নির্যাতন ও কদর্যতার কবল থেকে মুক্তিলাভ করে এক নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। সংঘটিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লব।

দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে ভলতেয়ার চিহ্নিত হয়েছেন ইতিহাস-পুরুষ রূপে।

জীবিতকালেই ভলতেয়ার হয়ে উঠেছিলেন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর সর্বাত্মক সমাজ-বিপ্লবের হাতিয়ার ছিল তাঁর রচিত সাহিত্য। তিনি লিখেছেন নাটক, গল্প, ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ক ও সমালোচনামূলক সাহিত্য। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটেছে শ্লেষ ও বিদ্রূপের ছটায়।

শাসক, সমাজপতি ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর লেখনী হয়ে উঠেছিল সৈনিকের অস্ত্র। পৃথিবীতে অপর কোন লেখক জীবদ্দশায় তাঁর মতো প্রভাবশালী ছিলেন না।

অথচ তাঁর সম্মুখের পথ ছিল না কুসুমাস্তীর্ণ। রাষ্ট্রের হাতে পীড়ন, নির্বাসন, কারাদণ্ড, চার্চের হাতে লাঞ্ছনা—তাঁর জীবনে কোনও নিগ্রহেরই অভাব ঘটেনি। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অপ্রতিহত বেগে তিনি তৈরি করেছিলেন চিরন্তন সত্যের পথ। তাঁর বাণী জনমানসে ঘটিয়েছিল মুক্তির দুর্বার জাগরণ।

প্যারিসে এক সম্ভ্রান্ত বংশে ১৬৯৪ খ্রিঃ ২১শে নভেম্বর ভলতেয়ারের জন্ম। চতুর্দশ লুই তখন ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ভলতেয়ারের পিতা নোটারি আরোয়েট ছিলেন বাস্তববাদী তীক্ষ্ণধী মানুষ। মা ছিলেন সংস্কৃতিমনা, সংগতি-সম্পন্ন বংশের কন্যা।

উত্তরাদিকারসূত্রে পিতামাতা দুজনেরই কাছ থেকে ভলতেয়ার পেয়েছিলেন দোষে গুণে মিশ্রিত পরস্পরবিরোধী ভাব।

জন্ম থেকেই ছিলেন ক্ষীণজীবী। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অসাধারণ মেধা সম্পন্ন। মাত্র তিন বছর বয়সেই ছড়া কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন।

দুর্বল সন্তানটি বাঁচে কি মরে এই আশঙ্কায় তাঁর বাবা মা শিশু বয়সেই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। সেই সময় তাঁর নামকরণ হয় ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে।

পিতৃদত্ত নামে নয় আরুয়ে পরবর্তীকালে তাঁর নিজের দেওয়া ভলতেয়ার নামেই সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছেন।

ফ্রান্সের কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গের কারাগারে অবস্থান করার সময় তিনি এই নামটি গ্রহণ করেছিলেন।

বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর দশ বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল এক খ্রিস্টান যাজকের স্কুলে। কিন্তু শিক্ষার চাইতেও ফ্রাঁসোয়ার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁর ধর্মপিতা অ্যাবে দি শ্যাটেনফ-এর শিক্ষা। এই ধর্মপিতা ছিলেন মনেপ্রাণে যুক্তিবাদী। চাক্ষুষ করা যায় না এমন কিছুতে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সেকালের সমাজে রীতিমত এক বিপরীত ব্যক্তিত্ব শ্যাটেনফ। কিশোর ফ্রাঁসোয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার আভাস সম্ভবত তাঁর চোখেই প্রথম ধরা পড়েছিল।

তাই তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে ফাঁসোয়াকে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁর সান্নিধ্য ও শিক্ষার ফলেই সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন ফ্রাঁসোয়া।

ছেলেকে আইন শিক্ষা দেবেন এই ইচ্ছা ছিল ফ্রাঁসোয়ার বাবার। কিন্তু কিশোর ফ্রাঁসোয়া একদিন বাবাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, কোনও পেশাগত শিক্ষা তাঁর পছন্দ নয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভই তাঁর অভিলাষ।

সেই বয়সেই আরও কয়েকটি চারিত্রিক গুণ ফ্রাঁসোয়ার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। সেগুলো হল, সত্যবাদিতা, সততা ও স্বাধীনতার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পিতার একান্ত ইচ্ছাতেই ফ্রাঁসোয়া হেগে গিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রদূতের সহকারী হিসাবে কাজে যোগ দিলেন।

সমাজের দরিদ্র বঞ্চিত সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল ফ্রাঁসোয়ার সহজাত মমতা ও সহানুভূতি। সাধারণের প্রতি একাত্মতা বশেই তিনি উচ্চবিত্ত অভিজাত ও তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি পোষণ করতেন তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা। এই মানসিক অবস্থায় আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে কাউকে তোষামোদ করা তাঁর ধাতে

সইত না। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও তাই মানিয়ে চলতে না পেরে কিছুদিন পরেই প্যারিসে ফিরে এলেন।

এর পর সাধারণ এক করণিকের চাকরি নিলেন। সেই সময় তাঁর ধর্মপিতার যোগাযোগে রাজপরিবারের কিছু সদস্যের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হল তাঁর। শিহরিত হলেন পঙ্কিলতায় লিপ্ত মানুষগুলোর কদর্যরূপ দেখে।

সাহিত্যের প্রতি আগ্রহবশেই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর লেখালেখির অভ্যাস তৈরি হয়েছিল। নানা বিষয় নিয়ে লিখতেন। রাজপরিবারের ঘৃণ্য পরিবেশের অভিজ্ঞতা তাঁকে নতুনভাবে প্রাণিত করল। তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন শ্লেষাত্মক ছোট ছোট কবিতা প্রবন্ধ।

কিছুদিনের মধ্যেই নিজের অভিজ্ঞতা অনুভূতি প্রকাশের জন্য সাহিত্যের এক ভিন্ন ক্ষেত্র বেছে নিলেন ফ্রাঁসোয়া। তিনি লিখলেন Cedipe নামে ট্রাজেডি নাটক। কিন্তু যথাযথ উৎসাহী বন্ধু ও সুযোগের অভাবে সেই নাটক প্রকাশ বা মঞ্চস্থ করতে পারা গেল না।

ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বরাবরই ভাবিত ছিলেন ফ্রাঁসোয়ার বাবা। সাহিত্য নিয়ে মেতে উঠে পাছে উচ্ছন্নে যায় এই আশঙ্কায় তিনি ছেলেকে তাঁর ধর্মবাবার ভাই হল্যান্ডের মার্কুইস ডি স্যাটেনফের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর তাঁর পরিচয় হল মায়ের এক বান্ধবীর মেয়ে অলিম্পে দুয়ের সঙ্গে। পরিচয় অল্পদিনেই পরিণতি পেল প্রেমে।

প্যারিসে মায়ের কানে এই সংবাদ পৌঁছালে তাঁকে অবিলম্বে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কিছুটা রদবদল ঘটল। ১৭১৫ খ্রিঃ ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই মারা গেলেন। সিংহাসনে বসলেন পঞ্চদশ লুই।

মাত্র চার বছর বয়সী নাবালক সম্রাটের অভিভাবক রূপে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন তাঁর কাকা অর্লিয়েন্সের ডিউক ফিলিপ।

নতুন সম্রাটের শাসনে রাজকীয় বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিল করা হল। নিপীড়িত প্রজারা ক্রমে ফিরে পেল তাদের বাক্‌স্বাধীনতা।

এই সুযোগে ফ্রাঁসোয়াও তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে লিখলেন আক্রমণমুখী ব্যাঙ্গাত্মক প্রবন্ধ ফিলিপকে নিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দি হলেন তিনি। তাঁকে আঠারো মাসের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গে।

কারাগারে বসেই ফ্রাঁসোয়া তাঁর দীর্ঘ কাব্য হেনরি ফোর রচনা শুরু করলেন।

জেলজীবনে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। মুক্ত হবার পর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ডিউক ডি বেথুনের আমন্ত্রণে তিনি চলে এলেন সুলিতে। এখানে এসে সংশোধন করলেন Cedipe। পরিচয় হল মিলি ডি লিভলির সঙ্গে। তাঁরই উৎসাহে লিখতে শুরু করলেন অভিনয়োপযোগী নাটক।

প্যারিসে ফিরে এসে গুণগ্রাহী বন্ধুদের সহযোগিতায় মঞ্চস্থ করলেন Cedipe নাটক। রাজপরিবারের নানা পাপ, দুর্নীতি ও ব্যভিচার তুলে ধরা হয়েছিল এই নাটকে। ফলে অল্পদিনেই অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করল। কিন্তু ফ্রাঁসোয়ার পরবর্তী নাটক কয়েকটি তেমন জমল না। ব্যর্থ হয়ে দ্রুত হাতে মহাকাব্য হেনরি ফোর শেষ করলেন।

এই সময়েই তিনি ভলতেয়ার ছদ্মনাম নিলেন। সেই সঙ্গে হেনরি ফোরের নতুন নামকরণ করলেন হেনরিয়েড।

কিন্তু প্রোটেস্টান্টদের বক্তব্যকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে এই অভিযোগে বইটি প্রকাশের অনুমতি পেলেন না। বাধ্য হয়ে রুয়েন থেকে ১৭২৩ খ্রিঃ হেনরিয়েড প্রকাশ করলেন।

এই সময় বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল ভালতেয়ারকে।

কিছুদিনের মধ্যেই আকস্মিকভাবে পড়লেন বিপর্যয়ের মুখে। এক রাজকর্মচারী শেভলির যোহন প্রকাশ্যে ভলতেয়ারকে অপমান করায় তিনি তার বিরুদ্ধে লিখলেন বিদ্রূপাত্মক কবিতা। ক্রুদ্ধ যোহন একদিন দলবল নিয়ে বেদম প্রহার করল ভলতেয়ারকে।

অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি ডুয়েলে আহ্বান জানালেন যোহনকে।

নির্দিষ্ট দিনে ডুয়েলের জায়গায় উপস্থিত হলেই মিথ্যা অভিযোগে বন্দি করা হল ভলতেয়ারকে। আবার তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাস্তিল দুর্গে।

সেখানে পনেরো দিন এই দফায় বন্দি ছিলেন তিনি। স্বেচ্ছায় ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাবার অঙ্গীকার করে ছাড়া পেলেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে ইংলণ্ডে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিলেন ভলতেয়ার।

ইংলণ্ডের মানুষ তাঁকে সহানুভূতির সঙ্গেই গ্রহণ করল। লর্ড বালিংব্রুকের মাধ্যমে দেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। বন্ধুত্ব হল জোনাথন সুইফটের সঙ্গে। তাঁকে তিনি বলতেন বিদ্রোহী ইংরাজ।

এছাড়া পরিচিত হলেন তখনকার দিনের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, যেমন, পোপ ইয়ং, গে, কনগ্রিভ, ডাচেস অব মার্লবরো, চেস্টারফিল্ড, পিটারবার্গ প্রমুখ।

ইংলণ্ডের ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত পরিবেশ মুগ্ধ করল ভলতেয়ারকে। ইংরাজ জাতির সম্মানবোধ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা গভীরভাবে প্রভাবিত করল তাঁকে। ইংরাজ কবি দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের রচনা তাঁর মনন ও জ্ঞান বিকাশের সুযোগ করে দিল।

ভলতেয়ার ইংলণ্ডে বসবাস করলেন তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে রচনা করলেন History of Charls Twelve এবং Letters on the English। ১৭২৯ খ্রিঃ প্যারিসে ফিরে এসে তিনি প্রকাশ করলেন পত্রগুচ্ছ। এই লেখাগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর মনন ও চিন্তা। পাশাপাশি ছিল সহজাত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিচ্ছুরণ।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বইটি বাজেয়াপ্ত হল। প্রকাশককে বন্দী করা হল বাস্তিল দুর্গে। প্রমাদ গুণলেন ভলতেয়ার। পালিয়ে আশ্রয় নিলেন Cirey-তে Chatelet নামে এক সহৃদয় মহিলার আবাসে।

নিঃসন্তান ২৮ বছরের এই মহিলা ছিলেন স্বামীসুখে বঞ্চিতা। সুরূপা ছিলেন না, তাই সম্ভবতঃ স্বামী তাঁর সম্পর্কে ছিলেন নিস্পৃহ। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহী নির্বাসিত লেখকের প্রতি দুজনেই ছিলেন সহানুভূতিশীল।

অল্পদিনেই মাদামের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ভালতেয়ারের এবং এই সম্পর্ক অটুট ছিল দীর্ঘ পনের বছর, মাদামের মৃত্যু পর্যন্ত।

মাদামের উষ্ণ ভালবাসা ও সান্নিধ্যের প্রেরণায় অব্যাহত ছিল ভালতেয়ারের সাহিত্য রচনা। এখানেই তিনি রচনা করেছিলেন বীরাঙ্গনা জোয়ান অব আর্কের জীবন নিয়ে Mondain, ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক রচনা Mahomet, কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ও Merope.

প্রুশিয়ার যুবরাজ দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী। ভলতেয়ারের রচনায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে রাজদরবারে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু মাদাম রাজি না হওয়ায় ভলতেয়ার সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলেন না।

মুক্ত বুদ্ধির স্বাধীনচেতা লেখক ও চিন্তাবিদ হিসেবে ততদিনে ভলতেয়ারের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের ও বিদেশের চিন্তাবিদ, লেখক ও সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের মাধ্যমে মতামতের আদান প্রদান হত। কিন্তু নির্বাসিত জীবনের গ্লানি প্রতিনিয়ত তাঁর মনকে পীড়া দিত। ফলে ক্রমেই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

১৭৪৯ খ্রিঃ দুর্দিনের বন্ধু মাদামের মৃত্যুতে তীব্র শোকে ভেঙ্গে পড়লেন ভলতেয়ার। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন।

এই সময়ে হিতৈষীদের আহ্বানে তিনি প্যারিসে ফিরে এলেন এবং নাটক রচনায় হাত দিলেন।

কিছুকাল পরেই ভলতেয়ারের অনুরাগী দ্বিতীয় ফ্রেডারিক প্রুশিয়ার সিংহাসনে বসলেন। তাঁর আমন্ত্রণ পেয়ে ভালতেয়ার চলে গেলেন প্রুশিয়ায়।

সম্মানীত অতিথি হিসেবে রাজপ্রাসাদেই রাখা হল তাঁকে। প্রুশিয়ায় দু বছর ছিলেন ভলতেয়ার। সেখানে থাকতেই তিনি জানতে পেরেছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহী রচনার অপরাধে ফ্রান্সে তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ততদিনে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের আচার আচরণেও কিছুটা কর্তৃত্বের আভাস ফুটে উঠতে শুরু করেছে। উপযুক্ত সময় বুঝে প্রুশিয়া ত্যাগ করে ভলতেয়ার চলে এলেন জেনেভার কাছে ফার্নে নামে এক গ্রামে। সেখানে বাস করতেন তাঁর ষাট বছর বয়সী ভাইঝি ডেনিস। তাঁর সান্নিধ্যে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে বাধা-বন্ধনহীন প্রকৃত স্বাধীন ও নির্ভার জীবন লাভ করলেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এখানেই শান্তিতে কাটিয়েছেন তিনি।

প্রুশিয়ায় থাকার সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল ভলতেয়ারের বৃহত্তম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ The Epoch of Louis XIV।

মানব ইতিহাস ও সভ্যতার অগ্রগতির পরম্পরা দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দার্শনিকের ভূমিকা সম্পর্কেও স্পষ্ট সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন, ইতিহাসের ঘটনাবলীকে দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে পারেন বলে একমাত্র দার্শনিকের পক্ষেই প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব।

ভলতেয়ারের এই রচনা আধুনিক ইতিহাস রচনার দিকনির্দেশক গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত।

ফার্নের শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভলতেয়ার রচনা করলেন তাঁর মহত্তম সৃষ্টি Candid। দীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতির পর মাত্র তিন দিনে সম্পূর্ণ করেছিলেন এই লেখা।

যত কিছু অন্যায়, মিথ্যাচার, অসত্য, সংস্কার ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আবাল্য লালিত দুরন্ত ক্রোধ ও অপরিমেয় ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে এই লেখায় ব্যঙ্গ রসসিক্ত সহজ সরল ভাষা ও জটিলতাহীন বিচিত্র এক কাহিনীর মধ্য দিয়ে। বিশ্বসাহিত্যে এমন ব্যঙ্গ রচনার কোন তুলনা নেই। সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এই কাহিনীর কাঠামো জীবন-বিদ্ধৃত, আবেদন চিরকালীন।

এর পর নিজের মতপ্রকাশে রচনায় আর কোন আড়াল রাখলেন না ভলতেয়ার। পরিহাস বিদ্রূপ স্থগিত রেখে সরাসরি আঘাত হানলেন ধর্মজগতের অচলায়তনে। বহু যত্নে ও শঠতায় জনমানসে গড়ে তোলা চার্চের ভাবমূর্তি তীব্র আঘাতে ফালাফালা হতে লাগল তাঁর এক একটি শাণিত রচনায়।

এই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা Quotations of Zapeta-তে তিনি যাজকদের শয়তানি ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিয়ে ধর্মের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দেবার আহ্বান জানালেন।

ধর্মাচরণের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই বিদ্রোহী ভলতেয়ারের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। চিরনিপীড়িত ধর্মের নিগড়ে বদ্ধ মুক্তিকামী মানুষকে এক নতুন জীবনের সন্ধান দিলেন তিনি।

মৃত্যুর দুবছর আগে প্যারিসে ফিরে এসেছিলেন তিনি। অগণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেশের জ্ঞানীগুণী মানুষেরা রাজকীয় অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত করলেন তাঁকে।

সেই সময় প্যারিসের প্রধান রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল তাঁরই রচিত নাটক। ফরাসী সাহিত্য একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হলেন তিনি। প্রধান রঙ্গমঞ্চে মাথায় মুকুট পরিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হল তাঁকে। মঞ্চে স্থাপিত হল তাঁর মূর্তি। প্রাণবন্যার জোয়ারে উদ্বেলিত হয়ে উঠল গোটা দেশ।

জীবিতকালে ভলতেয়ার হয়ে উঠেছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে সম্মানিত প্রতিভা। কেবল নাটক রচনা করেই নয়, গল্প কবিতা, উপন্যাস, নিবন্ধ, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি রচনাই ছিল তরবারির মত ক্ষুরধার।

হাতের কলমকে তিনি ব্যবহার করেছেন সৈনিকের হাতের অস্ত্রের মতো। পরবর্তীকালে তাঁর বিপুল রচনাবলী ৭০ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

ভলতেয়ার মানুষকে যাজক সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর পীড়ন থেকে মুক্ত হবার, স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিলেন, যে স্বাধীনতা তাদের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করেছিল।

১৭৭৮ খ্রিঃ ৩০ মে। ভলতেয়ারের ট্রাজেডি নাটক ইরেনে-এর অভিনয় মঞ্চ। অসংখ্য দর্শনার্থীর ভিড় চারদিকে। চরম সাফল্য পেল ইরেনে নাটক।

ইরেনে-এর সাফল্যে উদ্বেলিত ৮৩ বছরের নাট্যকার ভলতেয়ার। সহসা তিনি বলে উঠলেন, এবারে আমি শান্তিতে মরতে চাই—

ক'টি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেই সমাপ্তি ঘটল মানব ইতিহাসের এক মহৎ জীবনের। ভলতেয়ার গত হলেন।

রামগোপাল ঘোষ

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ রামগোপাল ঘোষ।

সেকালে তাঁকে গ্রীসের জননেতা ও শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, যাঁকে বলা হয় বিশ্বমানবতার বিবেকের বার্তাবহ, তাঁর সঙ্গে তুলনা করে বলা হত ইন্ডিয়ান ডেমোস্থেনিস।

অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন রামগোপাল, প্রতিহত করেছেন অন্যায়কারীকে।

কেবল অনন্যসাধারণ বাগ্মীরূপেই নয়, সমাজ সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, লোকশিক্ষার প্রসার, জ্বলন্ত দেশপ্রেম প্রভৃতি মহৎ কর্মকৃতিত্বের গৌরবোজ্জ্বল দীপ্তিতে বাংলার জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন রামগোপাল ঘোষ।

তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার ত্রিবেণীর কাছে বাঘাটি গ্রামে। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

১৮১৫ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে উত্তর কলকাতায় বেচু চ্যাটাজী স্ট্রীটে মাতুলালয়ে রামগোপালের জন্ম।

পিতা গোবিন্দচন্দ্র কলকাতায় ছোটখাট ব্যবসা করতেন। সামান্য রুজিরোজগার যা হত তাতে একরকম স্বচ্ছল ভাবেই সংসারযাত্রা নির্বাহ হত।

শিশু বয়সেই রামগোপালের অসাধারণ মেধা, সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি তাঁর অভিভাবকদের নজর আকর্ষণ করে। নতুন কিছু শেখা ও জানার আগ্রহও ছিল তাঁর প্রবল।

গৃহে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ছয় বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় চিৎপুর রোডে শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে।

অসাধারণ প্রতিভাধর বালকের উপযুক্ত পড়াশুনা সাধারণ একটি স্কুলে সুসম্পন্ন হবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। এই সময় ভাগ্যই যেন তাঁকে একটি সামান্য ঘটনার মাধ্যমে সঠিক পথে চালিত হবার পথ করে দিল।

সেকালের কলকাতায় প্রথম বাঙালি পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে হরচন্দ্র ঘোষের নাম সুপরিচিত ছিল। তাঁর সঙ্গে রামগোপালের এক আত্মীয়ার বিবাহ হয়েছিল। বালক রামগোপাল তাঁর ঠাকুমার সঙ্গে সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

বিবাহ মণ্ডপে সমবেত কমবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেকালে ধাঁধার আসর বসত। ছোটদের বিদ্যাবুদ্ধি যাচাই করার উদ্দেশ্যেই প্রধানত এই ধরনের প্রতিযোগিতার প্রচলন হয়েছিল।

হরচন্দ্রের বিবাহ বাসরে ওইরকম এক আসরে অংশ নিয়ে রামগোপাল

অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন হরচন্দ্র। তিনি বাসর ঘরে বসেই রামগোপালের মা ও ঠাকুমাকে পরামর্শ দেন তাঁকে হিন্দু কলেজে পড়াবার জন্য।

এই ঘটনায় পরিবারের সকলে উৎসাহিত হয়ে রামগোপালকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নিয়মিত এই স্কুলে ছেলের পড়ার খরচখরচা চালাবার মত সামর্থ গোবিন্দচন্দ্রের ছিল না।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুমার অর্থসাহায্যে তাঁকে হিন্দুস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই স্কুলে ভর্তি হবার পর অল্প সময়ের মধ্যেই রামগোপালের মেধা ও অধ্যবসায়ের প্রতি মহামতি ডেভিড হেয়ারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। খুশি হয়ে তিনি নতুন ছাত্রটিকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেন। গোবিন্দচন্দ্র এইভাবে পুত্রের পড়ার খরচের চিন্তামুক্ত হলেন।

এই সময়ে আকস্মিকভাবেই আরও একটি ইঙ্গিতবহ ঘটনা ঘটল রামগোপালের জীবনে। অনাগত ভবিষ্যতে যে নামে তিনি দেশবিশ্রুত খ্যাতি ও গৌরবের অধিকারী হবেন, নিয়তি যেন আপনা থেকেই তার ব্যবস্থা করে দিল।

রামগোপালের প্রকৃত নাম ছিল গোপাল। তিনি তখন হিন্দু কলেজের জুনিয়ার বিভাগে ভর্তি হবেন। বয়স নয়ের কোঠায়।

রেজিস্ট্রারে নাম তুলবার সময় হেডমাষ্টারমশাই ডি. এনসেলেস তাঁর নাম জানতে চাইলেন। গোপালের নাম ভালভাবে শুনতে না পাওয়ায় তিনি রেজিস্ট্রারে লিখে ফেলেন রামগোপাল। তখন থেকেই গোপাল রামগোপাল নামকরণ লাভ করলেন।

সেই সময় হিন্দু কলেজ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াতেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে এক পর্তুগিজ যুবক। আদি কলকাতাতেই তাঁর জন্ম ও শিক্ষা। তিনি ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী যুবক। নিজেকে তিনি ভারতীয় বলেই দাবি করতেন এবং এ দেশকে স্বদেশ বলে গণ্য করতেন।

ডিরোজিওর সাহচর্যে ও শিক্ষায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এক প্রবল পরিবর্তনের হাওয়া আলোড়ন তোলে।

তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কলেজের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক তালিকায় ইংরাজ কবি আলেকজান্ডার পোপ অনূদিত হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি, কবি ড্রাইডেনের ভার্জিল কাব্য, শেকসপিয়ারের একটি বিয়োগান্তক নাটক, কবি মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট মহাকাব্য, গে'র ফেবলস প্রভৃতি পড়াবার জন্য সংযোজন করেছিলেন।

নিজেও তিনি ক্লাশে রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পুস্তক, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস প্রভৃতি ছাত্রদের পড়ে শোনাতেন।

অচিরেই ক্লাশে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসামান্য উপলব্ধি ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে রামগোপাল ডিরোজিওর মনোযোগ আবর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। তিনি হয়ে উঠলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র-শিষ্যদের অন্যতম।

ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের ও যুক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ডিরোজিও মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়িতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে সম্মিলনী ও বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, অদৃষ্টবাদ, নাস্তিকতা, আস্তিকতা, সাহিত্য, ইতিহাস, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় হত।

এই সভায় ছাত্রদের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ডিরোজিওর প্রগতিপন্থী ছাত্র-শিষ্যরাই প্রধানত অংশ গ্রহণ করত। বলাবাহুল্য, রামগোপালও এখানে সামিল হলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদিতে মধ্যমণি হয়ে উঠলেন।

ডিরোজিওর শিষ্যদলের মধ্যে যাঁরা এই সভায় নিয়মিত যোগ দিতেন তাঁদের মধ্যে আটজন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং রামগোপাল ঘোষ ছিলেন অগ্রণী।

পরবর্তীকালে এঁরা প্রত্যেকেই বাঙলা তথা ভারতের সংস্কারমূলক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ক্রমে ডিরোজিওর এই সভার আকর্ষণে শহরের বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ বুদ্ধিজীবী ও রাজপুরুষগণও উপস্থিত হতে লাগলেন।

বিভিন্ন সময়ে নানান বিষয়ে ছাত্ররা সভায় স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ ও বিনিময় করতেন। তাদের বক্তৃতা শুনবার জন্য প্রায় সময়ই হাজির থাকতেন বাংলার ডেপুটি গভর্নর ডব্লু, ডব্লু বার্ড, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি লর্ড রায়াস, ডেভিড হেয়ার, গভর্নর জেনারেলের ব্যক্তিগত সচিব কর্নেল বেনসন, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মিল প্রমুখ।

সেকালে এদেশের হিন্দুসমাজ ছিল অজ্ঞানতা, অন্ধ কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত। বস্তুতঃ অজ্ঞানতা তথা প্রকৃত শিক্ষার অভাবই ছিল সকল অধোগতির মূলে।

ডিরোজিও উপলব্ধি করেছিলেন উদারপন্থী পাশ্চাত্য শিক্ষায় ছাত্রদের গড়ে তুলতে পারলে তাঁরাই সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হতেও বিলম্ব হয় নি। অচিরেই তাঁর ছাত্ররা ধর্মীয় আচার, জাতিবিচার, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও নারীশিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষাবিস্তারের সপক্ষে এক প্রতিবাদী বিপ্লবের সূচনা করলেন।

ডিরোজিওর ছাত্ররা মুখে যেমন সংস্কারের কথা বলতেন তেমনি তাঁরা আচরণও করতে লাগলেন প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে। তাঁরা জাতিবিচারের প্রতীক উপনয়ন পরিত্যাগ করলেন। নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিকও পরিত্যক্ত হল। সেই সময় তাঁরা সময় কাটাতেন হোমারের মহাকাব্য পড়ে। ধর্মের ধ্বজাধারী সমাজপতি, টিকিধারী ফোঁটাকাটা ব্রাহ্মণ দেখলেই তাঁরা উপহাস বিদ্রূপে মুখর হয়ে উঠতেন। এমনকি তাঁদের অনেকেই ইংরাজদের সংশ্রবে থেকে নিষিদ্ধ খাদ্য খেতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

মোটকথা, সংস্কারপন্থী ছাত্রদের জীবনযাপনের ধারাই আমূল বদলে গেল।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিপরীতে চলতে গিয়ে ডিরোজিওর ছাত্রদের যে সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সকল প্রকার চাপ ও নির্যাতন সত্ত্বেও নিজেদের মত ও বিশ্বাস থেকে কেউ বিচ্যুত হননি।

বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে নবজাগরণের দূত রূপে ডিরোজিওর এই ছাত্রদের নাম এদেশের সামাজিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ডিরোজিওর ছাত্ররা চিহ্নিত হয়েছিলেন ডিরোজিয়ান বা ইয়ংবেঙ্গল আখ্যায়।

রামগোপালের তীব্র জ্ঞান-পিপাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর মেধা ও অধ্যবসায়। ডিরোজিওর প্রগতিমুখী সংস্কার আন্দোলনের প্রচারের পাশাপাশি কলেজের পড়াও চলছিল পুরোদমে।

কিন্তু কথায় বলে অর্থচিন্তা চমৎকারা। তাই পারিবারিক প্রয়োজনে অর্থোপার্জনের জন্য কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখেই রামগোপালকে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল।

অল্পদিনের চেষ্টাতেই যোসেফ নামে এক ইহুদী ব্যবসায়ীর গদিতে সামান্য বেতনের একটা কাজ জুটিয়ে নিলেন রামগোপাল।

কিছুদিন পরে কেলসন নামে এক ধনী ব্যবসায়ী যোসেফের ব্যবসার অংশীদার হলে রামগোপালের পদোন্নতি হল। মুৎসুদ্দির দায়িত্ব পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আয় রোজগারও বাড়ল।

অংশীদারী বিবাদের ফলে অল্পসময়ের ব্যবধানেই কেলসন ও যোসেফের ব্যবসা আলাদা হয়ে গেল। কেলসন রামগোপালকে তাঁর নিজস্ব কোম্পানিতে বেনিয়ান করে নিয়ে এলেন। ফলে তাঁর রোজগারও আগের তুলনায় বাড়ল অনেক গুণ।

রামগোপালের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বৈষয়িকজ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়ে কেলসন তাঁকে নিজের কোম্পানির অংশীদার করে নিলেন। কোম্পানির পরিবর্তিত নাম হল কেলসন ঘোষ অ্যান্ড কোং।

খুব বেশিদিন এই যৌথ ব্যবসায়ে যুক্ত থাকতে হয়নি উদ্যোগী পুরুষ রামগোপালকে। অচিরেই তিনি আর জি ঘোষ কোম্পানি নামে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করলেন। সময়টা ছিল ১৮৪৮ খ্রিঃ।

উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরা যেকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি ছিলেন বিমুখ, সেই সময়ে প্রথম পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়ে রামগোপাল নিজস্ব স্বাধীন ব্যবসায় নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ব্যবসার ক্ষেত্রে অসাধারণ কর্মকুশলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রামগোপালের ব্যক্তিগত জীবনের সহৃদয়তা সততা ও সত্যপরায়ণতার মতো মূলধন। ফলে অচিরেই বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপা লাভ করে তাঁর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ ঘটে।

ছাত্রাবস্থায় শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন রামগোপাল, লক্ষ্মী লাভের পরও সেই চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হননি তিনি। শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যমে দেশের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার কাজে তিনি আজীবন লিপ্ত থেকেছেন।

বস্তুতঃ তাঁর সকল কাজের প্রেরণার উৎস ছিল দেশপ্রীতি, দেশের সমাজ ও মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি।

বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিয়মিত পড়াশুনার চর্চা বজায় রেখেছিলেন। সুযোগ মতো সভাসমিতিতে যোগ দিতেন, অংশগ্রহণ করতেন জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়।

১৮৩১ খ্রিঃ ডিরোজিওর পরলোক গমনের পর তাঁর শিষ্যরা গুরুর চিন্তাধারা সক্রিয় রাখার উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত হয়ে গঠন করেছিলেন এপিস্টোনারি অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি। তাঁদের সম্পাদনায় জ্ঞানান্বেষণ নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার লেখকদের মধ্যে রামগোপাল ছিলেন অন্যতম।

লেখালেখির বাইরে সুবক্তা রূপেও যথাকালে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তিনি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথ ১৮৪২ খ্রিঃ বিলেত থেকে দেশে ফিরে আসেন। সেই সময় জর্জ টমসন নামে এক ইংরাজ বাগ্মী তাঁর সঙ্গে এদেশে আসেন।

এই সাহেব ছিলেন মানবতাবাদী সংগঠক। আমেরিকায় দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন।

সেই সময়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন ভারতের মানুষের দুর্দশার কথা জানতে পেরে টমসন দ্বারকানাথের সঙ্গী হয়েছিলেন। এদেশে এসে তিনি ডিরোজিওর প্রারব্ধ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর ভাষণ শুনে মানুষ উদ্বুদ্ধ হত। স্বভাবতঃই রামগোপাল ও তাঁর বন্ধুরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

ডিরোজিওপন্থী যুবকদল অচিরেই টমসন সাহেবকে সানন্দে গুরুর স্থলাভিষিক্ত করে নিলেন।

রামগোপাল তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্য হয়ে উঠলেন। তিনি টমসন সাহেবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সংস্কার আন্দোলনের প্রচার শুরু করলেন। রামগোপাল ছিলেন এই সমিতির অন্যতম প্রধান বক্তা।

টমসন সাহেবের প্রভাবে রামগোপাল ও ডিরোজিওর অন্যান্য শিষ্য ক্রমেই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। এই সময়ে রামগোপালের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় দেশব্যাপী গণচেতনার উদ্দীপনা ঘটে। তাঁর আগুনঝরা ভাষা ও শাণিত যুক্তির প্রভাবে এই সময়ে বহু অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধান হয়েছে।

তাঁর প্রদত্ত বহু বক্তৃতা সেইকালে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই তাঁর বাগ্মীতার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশে গভর্নর হয়ে এসে শিক্ষাবিস্তারের কাজে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। এজন্য ভারতবাসী তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৪৭ খ্রিঃ কলকাতা টাউন হলে স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে লর্ড হার্ডিঞ্জের একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সেই সভায় রাখা হয়েছিল।

কিন্তু উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের মধ্যে লর্ড হিউম, টারটন ও কোলভিল প্রমুখ ইংরাজ ব্যারিস্টার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভাষণ দেন। ফলে লর্ড হার্ডিঞ্জের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বানচাল হতে বসে।

সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রামগোপাল এবং ডিরোজিওর সুযোগ্য শিষ্য দলের অন্যতম কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। তাঁরা হার্ডিঞ্জের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাবের সপক্ষে বলার জন্য রামগোপালকে অনুরোধ জানালেন।

রামগোপাল তখন হার্ডিঞ্জের প্রতি দেশবাসী কেন এত কৃতজ্ঞ তা ব্যাখ্যা করে ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতা করেন।

তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ আবেগময় বক্তব্য উপস্থাপনায় উচ্চারিত ভাষণ শ্রোতাদের এতটাই মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করল যে গোটা সভাগৃহ স্তব্ধ হয়ে রইল। বক্তৃতার শেষে তুমুল করতালিতে সকলে বক্তাকে অভিনন্দন জানাল।

রামগোপালের শাণিত যুক্তির সামনে সেদিন নস্যাৎ হয়ে গেল ইংরাজ ব্যারিস্টারদের বিরোধী বক্তব্য।

এইদিনের ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকায়। তাঁরা লিখেছিলেন, "এ ডেমোস্থিনিস হ্যাজ আপিয়ার্ড অন দি প্লাটফর্ম। এ ইয়ং

বেঙ্গলি হ্যাড ফ্লোরড থ্রি ইংলিশ ব্যারিস্টারস।"

রামগোপালের বক্তৃতার ফলে এরপরই দেশবাসীর আন্তরিক চেষ্টায় লর্ড হার্ডিঞ্জের একটি অপূর্ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল গড়ের মাঠে। সেই মূর্তিসহ তদানীন্তনকালের বহু দেশহিতৈষী কর্মযোগী পুরুষের মূর্তি বর্তমানে অপসারিত হয়েছে। ফলে অতীত ইতিহাসের নিদর্শন দর্শনলাভে আজ দেশবাসী বঞ্চিত।

রামগোপালের অবদান দেশহিতৈষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত। তিনি স্কুল স্থাপনের কাজে ডেভিড হেয়ারকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। নিজ পল্লীতেও একটি স্কুল ও পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন।

এককালে বেনিভোলেন্ট সোসাইটির সম্পাদক রূপে হিন্দু চ্যারিটেবল ইনসটিটিউট স্থাপনেও সাহায্য করেন।

এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য থাকাকালে তাঁরই উদ্যোগে এদেশে বিদ্যালয় স্থাপনের বেসরকারী চেষ্টায় সরকারী সাহায্যদানের রীতি প্রবর্তিত হয়।

নারীশিক্ষা প্রসারেব লক্ষ্যে ১৮৪৯ খ্রিঃ বেথুন সাহেবকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে রামগোপাল সক্রিয় সাহায্যদান করেন।

চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষালাভের জন্য দ্বারকানাথ চারজন ছাত্রকে বিলাতে পাঠাবার পরিকল্পনা করলে রামগোপাল পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৮৫৪ খ্রিঃ তিনিই ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন। সেইকালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির রাজনৈতিক বক্তৃতায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিতেন।

সেইকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হত না। শ্বেতাঙ্গদেরই তাতে একচেটিয়া অধিকার ছিল। ১৮৫৩ খ্রিঃ রামগোপাল প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের সুযোগ দেবার জোরালো দাবি তোলেন।

ভারতীয়দের আইন ও আদালতে সমানাধিকারের আইনের খসড়ার সমর্থনে রামগোপাল A few remarks on certain Draft Acts, Commonly called Black Act নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিবরণ ও নিন্দা এই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছিল। এরফলে শ্বেতাঙ্গদের রোষোৎপত্তি ঘটে এবং তিনি অ্যাগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতি পদ থেকে অপসারিত হন।

নবীন বাংলা গঠনের অন্যতম পথিকৃত, অকৃত্রিম স্বদেশ হিতৈষী রামগোপাল ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন, উদার, সত্যনিষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ও বন্ধুবৎসল। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালী। ধর্মীয় কুসংস্কারের ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন আজীবন। বাগ্মী ও

সমাজ সংস্কারক রামগোপাল স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের স্কুল স্থাপনে তিনি নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। নিজ পল্লীতে একটি স্কুল ও পাঠাগার স্থাপন করেন। এছাড়া বেনিভোলেন্ট সোসাইটির সম্পাদক রূপে হিন্দু চ্যারিটেবল ইনসটিটিউশন স্থাপনেও সাহায্য করেন।

রামগোপালের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। সেকালের সামাজিক প্রথা মেনে কৈশোরেই বিবাহ্ করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন অশেষ গুণশালিনী মহিলা। তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতা ছিল অসাধারণ। অর্থবান স্বামীর ঘরণী হয়েও অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে জীবন যাপন করতেন তিনি।

প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রামগোপালের দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। অল্প বয়সেই পুত্র দুটির মৃত্যু হয়েছিল।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর রামগোপাল দ্বিতীয়বার বিবাহ্ করেছিলেন। দ্বিতীয় সংসারে তাঁর কোনও সন্তান ছিল না।

বিষয়কর্মের ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও রামগোপাল নানা বিষয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করতেন। নানা সভাসমিতিতেও তিনি যোগ দিতেন এবং বক্তৃতা দিতেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করত।

রামগোপালের বন্ধুবাৎসল্য এমনই ছিল যে তখনকার কলকাতায় এ নিয়ে লোকের মুখে মুখে অনেক গল্প তৈরি হয়েছিল। যে কোনও বিপদ আপদে তিনি তাঁর বন্ধুদের পাশে উপস্থিত থাকতেন। অর্থ,সামর্থ্য সকল প্রকারেই তিনি বন্ধুদের সাহায্য করতেন। বন্ধুরা একদিন তাঁর বাড়িতে না এলে তিনি অস্থির হয়ে তাঁদের খোঁজ নিতেন।

রামগোপালের বাল্যবন্ধু ও ফাইভ ফ্লাওয়ার্স অব হিন্দু কলেজ-এর অন্যতম রসিককৃষ্ণ মল্লিক একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে নিজের গঙ্গাতীরের বাগানবাড়িতে রেখে রামগোপাল চিকিৎসা ইত্যাদির যাবতীয় ভার বহন করেছিলেন।

রামগোপালের সহৃদয়তা ও সত্যপরায়ণতার কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত।

প্রগতিবাদী ডিরোজিওর শিষ্য ভক্ত হওয়ার ফলে রামগোপালকে সমাজের উৎপাতও কম সইতে হয়নি। তাঁর ঠাকুরদার মৃত্যুর পরে সমাজপতিরা মৃতের পারলৌকিক কাজে অংশ নিতে অস্বীকার করে প্রচার করতে লাগল রামগোপাল হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী ও সমাজচ্যুত।

ভয় পেয়ে রামগোপালের বাবা ছেলেকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন

তিনি যেন হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে কোন কাজ না করেন। বাবার কাতরতা ও চোখের জল দেখে রামগোপালের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। চোখের জল ফেলতে ফেলতেই ব্যাকুলস্বরে তিনি বলেন, 'বাবা, আপনার অনুরোধে আমি সব কাজ করতে পারি, সমস্ত ক্লেশ সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু বাবা মিথ্যা কথা বলতে পারব না।'

তাঁর এরূপ সত্যপরায়ণতা রামগোপালকে তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

আর একবার, ১৮৪৭ খ্রিঃ ঘটনা সেটি, ব্যবসাসূত্রে এমন ঝুঁকি দেখা দিল যে প্রচুর দেনার দায় রামগোপালের কাঁধে চাপার উপক্রম হল। সেই দায় এড়াবার জন্য তাঁর বিষয়ী বন্ধুরা পরামর্শ দিল বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বেনামী করে ফেলবার জন্য। তাঁদের সে পরামর্শ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে রামগোপাল বন্ধুদের বললেন, 'আমি যদি সর্বস্বান্ত হই, তাও হাসিমুখে মেনে নেব। কিন্তু কাউকে আমি বঞ্চিত করতে পারব না। সবার ঋণ আমি পরিশোধ করব।'

বাণিজ্যকর্মী হলেও আপন ন্যায়নিষ্ঠার ক্ষেত্রে রামগোপাল ছিলেন নির্ভীক সৈনিকের মতোই অবিচল।

নিমতলার বর্তমান শ্মশানঘাট রামগোপালের কর্মকৃতিত্বের জয় ঘোষণার অন্যতম স্মারক হয়ে আছে। সময়টা ১৮৬৪ খ্রিঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি। তৎকালীন কলকাতার মিউনিসিপালিটি প্রস্তাব নিল গঙ্গাতীর থেকে নিমতলা শ্মশানঘাট অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হবে।

এই সংবাদে কলকাতাবাসী হিন্দুরা মর্মাহত হল। দীর্ঘকালের স্থায়ী শ্মশানঘাট পবিত্র গঙ্গার তীর থেকে অপসারিত হলে হিন্দুদের লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। সকলে মিলে একত্রিত হয়ে এই অন্যায় উদ্যোগের বিরোধিতা করবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

কলকাতার হিন্দু সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিরা রামগোপালের শরণাপন্ন হলেন। সকলেরই বিশ্বাস, যুক্তিতর্কের অস্ত্রে একমাত্র রামগোপালের পক্ষেই সম্ভব মিউনিসিপ্যালিটির অন্যায় জেদ চূর্ণ করা। অচিরেই রামগোপালকে নেতা করে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হল। সেই সভায় রামগোপাল তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা ও যুক্তির সাহায্যে মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তাবের অসারতা প্রমাণ করে বললেন, 'হিন্দুমাত্রই কামনা করে মৃত্যুর পরে পবিত্র গঙ্গার তীরে তার দেহের দাহকার্য সম্পন্ন হবে এবং তার আত্মা চিরশান্তি লাভ করবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও এই বিশ্বাস পোষণ করি। মহামান্য সরকার বাহাদুর যদি হিন্দুদের এই ঐকান্তিক বাসনার বিঘ্নসৃষ্টি করতে চান অন্য কোন

স্থানে গঙ্গাতীরের শ্মশানঘাট স্থানান্তরিত করে তাহলে, দেশের প্রজাসাধারণের বৃহত্তম অংশ এ কাজকে তাঁদের জাতীয় জীবনে একটা মারাত্মক বিপর্যয় বলেই বিবেচনা করবে। শান্তিপ্রিয় প্রজাদের মধ্যে এইভাবে অসন্তোষের বীজ রোপন করা প্রশাসনের পক্ষে হিতজনক কখনোই হতে পারে না।'

রামগোপালের জোরালো প্রতিবাদ, শানানো বক্তৃতার ফলেই শেষ পর্যন্ত কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি শ্মশানঘাট স্থানান্তরের প্রস্তাব কার্যকর করা থেকে বিরত হয়।

নাগরিকদের এই জয়লাভের পেছনে রামগোপালের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে দেশের মানুষ উল্লাসে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল।

শরীর দুর্বল হয়ে পড়ায় একসময় রামগোপাল বিষয়কর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে আর এক মহৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি।

তখনো পর্যন্ত বন্ধুদের কাছে তাঁর অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। তিনি কারও কাছে সেই টাকার দাবি জানান নি। কেবল তাই নয় বন্ধুদের ঋণমুক্ত করে দিয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। পরপারের দুয়ারে পৌঁছে বন্ধুবৎসল রামগোপাল এই বন্ধুকৃত্য করে এক অবিশ্বাস্য নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

রামগোপাল স্বল্পায়ু পেয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থের একটা বড় অংশ ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির দেশীয় শাখায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে দান করে যান।

অবশেষে চুয়ান্ন বছর বয়সে ২৬ জানুয়ারি বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পুরোধাপুরুষ অক্লান্তকর্মা রামগোপাল ঘোষ চিরবিশ্রাম লাভ করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথের লেখক পরিচয়টুকুই সাধারণের কাছে পরিচিত। সকলে জানে তিনি ব্যঙ্গ ও কৌতুক রচনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কেবল এটুকুতেই তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

তাঁর আদর্শ জীবন-সাধনা, চারিত্র-পরিচয় যে কোন কর্মোদ্যোগী পুরুষের প্রেরণাস্থল। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে তিনি উন্নতির শীর্ষ অবস্থানে স্থাপন করেছিলেন। পিচ্ছিল চলার পথের বাধার ভ্রূকুটি তাঁকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি।

সকল অবস্থায় অচল অটল থেকে গভীর অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা বলে তিনি নক্ষত্র-উজ্জ্বল এক গরিমাময় জীবন লাভ করেছিলেন।

সত্যনিষ্ঠা ও একান্ত কর্মোদ্যোগ যে কখনও বিফল হয় না, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ত্রৈলোক্যনাথের জীবন।

বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শ্যামনগরের কাছে রাহুতা গ্রামে ১৮৪৭ খ্রিঃ ২২শে জুলাই এক দরিদ্র পরিবারে ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম। তাঁর পিতার নাম বিশ্বম্বর মুখোপাধ্যায়। মাতা ভবসুন্দরী দেবী। ছয় ভাইয়ের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন সকলের বড়।

বিশ্বম্ভরের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ হত। এই পরিবারে তাই বাল্যবয়স থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটে তাঁর।

তখন থেকেই তাঁর মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব জন্ম নেয়। উত্তরকালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন জীবনসংগ্রামের এক দুর্বার সৈনিক।

স্বভাবে দুরন্ত হলেও ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। লেখাপড়ার সময় মনোযোগের ঘাটতি হত না। ছিল প্রখর বুদ্ধি ও সাহস। একবার যা পড়তেন তা কখনও ভুলতেন না। করবেন বলে স্থির করলে সে কাজে কোনও অবস্থাতেই পিছপা হতেন না।

গ্রামের পাঠশালাতেই পড়াশুনা শুরু হয়েছিল তাঁর। তারপর চুঁচুড়ায় ডাফ সাহেবের স্কুলে ও পরে তেলেনিপাড়া স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত টানা পড়াশুনার মধ্যেই ছিলেন একরকম।

সেইকালে বাংলার গ্রামে প্রবল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত রোগভোগে।

১৮৬২ খ্রিঃ রাহুতা গ্রামেও দেখা দিল কালান্তক ম্যালেরিয়া। এই সময়ে কিছু দিনের ব্যবধানে মড়কে একে একে ত্রৈলোক্যর ঠাকুরমা, বাবা ও মা মারা গেলেন। তিনি তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

এই ভাগ্যবিপর্যয়ে দরিদ্র সংসারের অবস্থা তছনচ হয়ে গেল। তাঁর পক্ষে আর লেখাপড়া চালানো সম্ভব হল না। কঠিন বাস্তব তাঁকে পথে নামিয়ে আনল। শুরু হল জীবন-সংগ্রাম।

সংসারের অনটনের চাপে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন ত্রৈলোক্য। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে কাজ?

পুরুলিয়ার মালভূমে থাকতেন এক আত্মীয়—শশিশেখর। কাজ পাবার আশায় ১৮৬৫ খ্রিঃ তাঁর কাছেই রওনা হলেন ত্রৈলোক্যনাথ।

একরকম নিঃসম্বল অবস্থাতেই রেলপথে রানীগঞ্জ পর্যন্ত গেলেন। এরপর যেতে হবে তিনদিনের হাঁটা পথ।

তখনকার দিনে যাতায়াত ব্যবস্থার সুব্যবস্থা ছিল না। পথঘাট তৈরি হয় নি। জঙ্গল আর পাহাড়ের পথ পাড়ি দিতে হবে ত্রৈলোক্যকে। পথে হিংস্র জন্তুর, দস্যুতস্করের ভয়। সবকিছু তুচ্ছজ্ঞান করে অজানা পথে নেমে পড়লেন তিনি।

খাবারদাবার সঙ্গে কিছুই ছিল না। ক্ষুধাতৃষ্ণায় একমাত্র জলই ছিল ভরসা। এইভাবে টানা পথচলে একসময় দামোদর নদী অতিক্রম করলেন।

সেই সময় পথে তাঁর আলাপ হল এক হিন্দুস্থানী চাপরাশির সঙ্গে। লোকটি আসামে কুলি পাচার করবার ঠিকাদারি করত। পরিচয় গোপন করে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে সে নানা গ্রাম থেকে কুলি সংগ্রহ করত।

ত্রৈলোক্য এসব কিছুই জানতেন না। সরল মনে নিজের দুরবস্থার এবং কর্মসন্ধানের কথা তাকে জানালেন। আসানসোলে গিয়ে চাকরি দেবার নাম করে লোকটি তাঁকে রানীগঞ্জে নিয়ে গেল।

আরও কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে চাপরাশি যখন এখান থেকে আসামের পথে রওনা হয়েছে, তখন ব্যাপারটা তাঁর কাছে আর অপরিষ্কার রইল না।

ত্রৈলোক্য পালাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে সুযোগ করে দিল চাপরাশির রক্ষিতা। মাঝপথে তিনি ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন এবং অতি কষ্টে পুরুলিয়ার পথ ধরে মালভূমে শশিশেখরের বাড়িতে পৌঁছলেন।

আত্মীয়টি ত্রৈলোক্যকে সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর সকল দায়িত্বই কাঁধে তুলে নিলেন। তাঁর সহায়তায় ত্রৈলোক্য স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হবারও সুযোগ পেলেন।

প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পড়তেই ত্রৈলোক্য ফার্সি ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এক মৌলবীর কাছে ফার্সি শিখে অল্প দিনের মধ্যেই সমৃদ্ধ পারসিক সাহিত্য পড়ে ফেললেন।

পারস্য সাহিত্যের বেস্তাঁ, পান্দনামা, আমদানা, গোলেস্তাঁ ইত্যাদির মধুর আস্বাদ তাঁকে পারসিক গোলাপ খুশবুর মতোই মোহিত করল।

বাড়ির জন্য মন ছটফট করছিল। তাই একদিন মানভূম ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলেন তিনি। দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁকে খাটিয়ে নেবার মতলবে এই সময় এক আত্মীয় যশোরে কোটচাঁদপুরে কাজ দেবার নাম করে নিয়ে এল। আত্মীয়টি সেখানে কন্ট্রাক্টরের কাজ করত।

কাজ পাবার আশা নিয়ে এলেও আত্মীয়টির ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ত্রৈলোক্য আবার বাড়ি ফিরে এলেন। দুর্ভাগ্য যেন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল তাঁকে। আবার

কাজের সন্ধানে নেমে এলেন বর্ধমানে। হরকালী মুখোপাধ্যায় নামে এক আত্মীয়ের কাছে।

হরকালী ছিলেন বর্ধমানের স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনসপেক্টর। সদয় হয়ে তিনি ত্রৈলোক্যকে স্কুল শিক্ষকের কাজের জন্য পাঠালেন কাটোয়ায়। সেখানে ব্যর্থ হলে, বীরভূমে কীর্ণাহার ও পরে রামপুরহাটেও চেষ্টা হল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে কোথাও চাকরি জুটল না।

একটি কাজের আশায় পাগলের মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটেছেন ত্রৈলোক্য। সঙ্গে সম্বল বলতে কিছুই ছিল না। লজ্জাবশতঃ আত্মীয় হরকালীর কাছেও পয়সাকড়ি চাইতেন না। চলার পথে অচেনা মানুষের বাড়ি অতিথি হয়ে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতেন।

ভাগ্যের এমন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কখনও ভেঙ্গে পড়েননি তিনি। অদম্য মনোবল আর দুর্জয় সাহসে ভর করে কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করেছেন।

পথের দুর্গমতাই ত্রৈলোক্যকে অপরাজেয় করে তুলেছিল। জীবন-সংগ্রামের রূঢ় বাস্তবতা থেকে যে দুর্লভ বস্তু এ সময়ে তিনি লাভ করেছিলেন তা হল মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা। যা উত্তরকালে তাঁর সাহিত্য রচনার কাজে সহায়ক হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যের তাড়নায় পথে নেমেও বারবার ব্যর্থ হলেন ত্রৈলোক্য। তবু দমলেন না। একটু দম নেবার জন্য বর্ধমান রওনা হলেন। রামপুরহাট থেকে হাঁটাপথে সিউড়ি পৌঁছলেন।

অনাহারে পথ চলে সেই সময় ধুঁকছেন তিনি। আশ্রয় ও আহারের আশায় এক স্কুলেব হেডমাস্টার নবীনচন্দ্র দাসের শরণাপন্ন হলেন। সৌভাগ্যবশতঃ দুইই জুটল। পরদিন রওনা হলেন বর্ধমানের পথে।

নিঃসম্বল অবস্থায় পথে নেমে এই সময় তাঁকে তেঁতুল পাতা চিবিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়েছে।

সম্বল বলতে সঙ্গে ছিল একটি ছাতা। মগরায় পৌঁছে এতটাই অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত এক দোকানদারের কাছে ছাতাটি বন্ধক রেখে আহার্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

ততদিনে ভাগ্য কিছুটা প্রসন্ন হয়েছিল। বর্ধমানে ফিরে আসার কিছুদিন পরে হিতৈষী হরকালীবাবুর চেষ্টায় বীরভূমের দ্বারকার স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেলেন ত্রৈলোক্যনাথ।

কিছুদিন সেখানে কাজ করার পর রানীগঞ্জের উখড়ায় এক স্কুলে মাসিক আঠারো টাকা মাইনেতে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হলেন।

সময়টা ১৮৬৬ খ্রিঃ। দেশজুড়ে দেখা দিয়েছে চরম দুর্ভিক্ষ অবস্থা। এই

সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি পরে লিখেছেন, "রাত্রিদিন লোকের ক্রন্দনে, কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় নর-নারী বালক বালিকাদের অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দুর্ভিক্ষের ফলে জিনিসপত্র মহার্ঘ। বাড়িতে চার-চারটি ভাই। এই আঠারো টাকায় প্রবাসে নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান। তার উপর গ্রামের বাড়ীতে ভাইদের প্রতিপালন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িত। নিজের জন্য যৎসামান্য রাখিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতাম আর বাড়িতে পাঠাইতাম।"

তাঁর আত্মকথা থেকে জানা যায় পরবর্তী কালে তিনি শাহজাদপুরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জমিদারি স্কুলে পঁচিশ টাকা মাইনেতে শিক্ষক নিযুক্ত হন।

ত্রৈলোক্যনাথ বরাবরই ছিলেন লোকহিতব্রতী। নিজে অপরিসীম দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের মধ্যে বড় হয়েছিলেন বলে দুঃখীর ব্যথা-যন্ত্রণা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন।

সময় সুযোগ মতো সাধ্যানুযায়ী লোকের উপকার করার চেষ্টা করতেন তিনি। তাঁর চরিত্রের এই পরিচয় দুর্ভিক্ষের বর্ণনাতেও পাওয়া যাবে।

শাহবাজপুর অঞ্চল বর্ষাকালে জলে ডুবে যেত। নৌকো ছাড়া সেই সময় স্থানান্তরে যাতায়াতের কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

ত্রৈলোক্য তখন সেখানে পরিচিত শিক্ষকমশায়। একবার বর্ষাকালে এক অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়লেন।

নৌকোয় যাওয়ার পথে তাঁর চোখে পড়ল তিন বৃদ্ধা এক মাটির ঢিবিতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সঙ্গে কোন জিনসপত্র নেই। চারদিকে জল।

তাদের উদ্ধার করার জন্য কাছে এসে পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তরই পেলেন না। দেখা গেল তারা তিন জনই দৃষ্টিহীন, কানে শুনতে পায় না, কথাও বলতে পারে না।

কোথা থেকে এই হতভাগ্য তিন বৃদ্ধা সেখানে এসেছে, কে তাদের নিয়ে এল, কিছুই জানার উপায় ছিল না। ত্রৈলোক্যনাথ অসহায় তিনটে মানুষকে ওরকম অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রেখে আসতে পারলেন না। নিজেদের নৌকোয় তুলে শাহবাজপুরে নিয়ে এলেন।

ঠাকুরবাড়ির জমিদারির নায়েবমশাই কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের এই কাজে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। জাতিগোত্র জানা নেই, অজ্ঞাতকুলশীল, হোক না দুর্গত অসহায়, মুমূর্ষু এই মানুষগুলো মারা যাবার পর মৃতদেহ কে পরিষ্কার করবে?

এই নিয়ে প্রবল কথাকাটাকাটি হল। রূঢ়ভাষায় অভিযোগ শুনতে হল ত্রৈলোক্যনাথকে তাঁব এই মানবিক ব্যবহারের জন্য।

নায়েবমশাই হুকুম করলেন, মানুষগুলো যেখানে ছিল ত্রৈলোক্যনাথ যেন সেখানেই তাদের রেখে আসেন। কেউ তাকে কোনরকম সাহায্য করবে না।

ত্রৈলোক্য কিন্তু হুকুম গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। নিজ দায়িত্বেই তিনি রেখে দিলেন তিন বৃদ্ধাকে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, পরদিন বুড়িদের দেখা পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজখবর করেও তিনি ব্যর্থ হলেন।

এই ব্যাপার নিয়ে সেসময় তাঁর সঙ্গে শাহবাজপুর জমিদারির সম্পর্ক ছেদ হল। এককথায় স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

বাড়ি ফেরার পথে পাটনায় তাঁর সঙ্গে নীলদর্পণখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয় হয়েছিল।

ফের কর্মহীন বেকারত্ব। মাথায় দুর্ভাবনা। কিছুতেই দমবার পাত্র নন তিনি। সারাজীবন ধরে সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলবার শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। তাই হতাশার অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলোর সন্ধানে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

কিছুদিন পরে জানতে পারলেন তাঁর হিতৈষী আত্মীয় হরকালীবাবু কটকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে রয়েছেন। দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে ত্রৈলোক্য উপস্থিত হলেন কটকে। এই যাত্রায় তাঁকে মহানদী পার হতে হয়েছিল সাঁতার কেটে।

শেষ পর্যন্ত হরকালী মশায়ের চেষ্টায় ত্রৈলোক্যনাথ পুলিশের সাব ইনসপেক্টরের কাজ পেলেন।

সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দেবার পর এতদিনে একটু যেন নির্ভরতার আশ্রয় পাওয়া গেল। বস্তুতঃ এই কাজ পাবার পর থেকেই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কঠিন অধ্যবসায় ও নিষ্ঠানিবিড় কর্মোদ্যোগের পুরস্কার অর্জন করলেন তিনি।

কটকে ১৮৬৮ খ্রিঃ থেকে পুলিশের কাজে থেকে ওড়িয়া ভাষা ভালভাবে শিখলেন ত্রৈলোক্যনাথ। এখানে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ওড়িয়া মাসিকপত্র উৎকল শুভকরী।

এই সময়ে ত্রৈলোক্যর সুপ্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান ঐতিহাসিক ডব্লু ডব্লু হান্টার সাহেবের সাহচর্যে আসার সুযোগ ঘটে। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে হান্টার সাহেব তাঁকে নিজের অধীনে কলকাতায় নিয়ে এলেন। বেঙ্গল গেজেটিয়ার সংকলনের কাজে নিযুক্ত হলেন তিনি।

কর্মদক্ষতা গুণে এখানে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে হান্টার সাহেবের সহযোগী হয়েছিলেন। দশখণ্ডে প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিকেল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল

সঙ্কলন তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং হান্টার সাহেবের উদ্যোগে পরে প্রকাশিত হয়েছিল।

এর পরে ত্রৈলোক্যনাথ পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে প্রধান কেরানীর পদে যোগ দেন। পরে বিভাগীয় ডিরেক্টরের একান্ত সহযোগী পদে উন্নীত হন।

এই কাজে থাকাকালে ত্রৈলোক্যনাথ স্বাধীনভাবে দেশহিতকর কাজ করার সুযোগ পান এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ উদ্যোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবহেলিত নানান কুটিরজাত শিল্পদ্রব্য ও শিল্পীসম্প্রদায় পাশ্চাত্য জগতে পরিচিতি ও মর্যাদা লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহু পূর্ব থেকে কারুকার্যকরা নানান শিল্পদ্রব্য তৈরি হত। রাজদরবারে এবং সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে এসকল শিল্পদ্রব্যের খুবই সমাদর ছিল।

ইংরাজ রাজত্বেও রাজকর্মচারীরা শিল্প সমৃদ্ধ কাশীর রেশম কাপড়, পিতলের কাজ, লখনৌ-এর চিকন, সূচীদ্রব্য, সোনা-রূপার অলঙ্কার, বিদরীর কাজ, মোরাদাবাদের পিতলের মিঞা কলম, নগীনার কাঠের কাজ ইত্যাদির সমাদর অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এসব শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা ছিল এক দুরূহ কাজ।

দক্ষ শিল্পীরা বংশানুক্রমিকভাবে এসব কাজ করতেন। তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্যের নির্দিষ্ট কোন বাজার না থাকাতে ক্রেতার অভাবে দিন দিনই শিল্পীরা হীন অবস্থার শিকার হয়ে চলেছিলেন।

অন্নসংস্থানের তাড়নায় অনেক শিল্পীই বংশগত পেশা পরিত্যাগ করে অন্য পেশায় নিযুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছিলেন। এভাবে ভারতের মহামূল্যবান কুটিবজাত শিল্প অবলুপ্ত হতে বসেছিল।

স্বদেশপ্রাণ ত্রৈলোক্যনাথ সুযোগ পেয়েই পরাধীন জাতির অবহেলিত শিল্পীসম্প্রদায়ের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার ও সংরক্ষণের প্রয়াসে তৎপর হলেন।

সরকারের এক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী বকসাহেবের কাছ থেকে তিনি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়ে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করলেন এবং এলাহাবাদে একটি হোটেলে সেসব প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেন।

স্টেশনের সন্নিকটবর্তী এই হোটেলে বিলেতগামী সাহেব মেমদের আনাগোনা ছিল। দেশীয় শিল্পদ্রব্য তাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্য ছিল ত্রৈলোক্যনাথের।

তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হল না। হু হু করে বিক্রি হতে লাগল এই সব শিল্পসম্ভার।

শ্বেতাঙ্গ ক্রেতাদের আগ্রহ দেখে হোটেলমালিক এবার নিজেই ব্যবসায় নেমে

পড়লেন। প্রদর্শনীর অবিক্রিত মালপত্র নিজের টাকাতেই কিনে নিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ বকসাহেবের ঋণের টাকা পরিশোধ করে দিলেন।

দেশীয় কুটীর শিল্পের প্রচার ও প্রসার কল্পে ত্রৈলোক্যনাথের এই উদ্যোগের ফলে অচিরেই তার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ফলে দেশের নানা প্রান্তের ব্যবসায়ীগণ উৎসাহিত হয়ে ভারতীয় কারুশিল্পের ব্যবসায় এগিয়ে এল। দেশে ও বিদেশে সমাদর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় দুঃস্থ শিল্পীদের অন্নসংস্থানের সুযোগ সুবিধাও ফিরে এল।

মানুষের দুঃখে প্রাণ কাঁদত বলে দেশহিতকর নানা কাজের সঙ্গে সকল সময়ই যুক্ত থাকতেন ত্রৈলোক্যনাথ। এসকল কাজে বিপদ বাধা বা ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতিকে কোন কালেই তিনি বড় করে দেখতেন না।

একবার হরিদ্বারের কাছে রাজঘাটে এসেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। সেই সময় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ অবস্থা চলছে। খাদ্যশস্যের ফলনের ব্যাপক অপ্রতুলতা হেতু দুর্ভিক্ষপীড়িত বহু মানুষ অনাহারে প্রাণ হারাচ্ছিল।

মানুষের দুরবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না তিনি। ব্যক্তিগত অর্থে যব কিনে বিতরণ শুরু করলেন।

সঙ্গের সমস্ত অর্থই ফুরিয়ে গেল। এদিকে ফিরতে হবে এলাহাবাদে। শেষ পর্যন্ত কোনও রকমে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলেন।

বিপত্তির ওখানেই শেষ হল না। পথে সঙ্গের বাক্স, জামাকাপড় ও দামী জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেল। একরকম সর্বস্ব খুইয়েই এলাহাবাদে ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু অন্ততঃ কিছু মানুষের উপকার করতে পেরেছেন ভেবে সব ক্ষতিই অগ্রাহ্য করলেন।

সেবারেই তিনি গ্রামে ঘোরার সময় জানতে পারলেন খাদ্যাভাবের সময়ে গাজর খাইয়ে মানুষের প্রাণরক্ষা সম্ভব হতে পারে।

১৮৭৭-'৭৮ খ্রিঃ তিনি গাজর চাষের উপকারিতা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করলেন। সরকার তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সরকারী নির্দেশ ও উৎসাহে জেলায় জেলায় ব্যাপকভাবে গাজর চাষের ব্যবস্থা হতে লাগল।

এই ব্যবস্থার উপকার পাওয়া গেল দু বছর পরেই। ১৮৮০ খ্রিঃ রায়বেরিলী ও সুলতানপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কেবলমাত্র গাজর খেয়ে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচল।

ত্রৈলোক্যনাথ তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষি-বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। ১৮৮১ খ্রিঃ তিনি ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে বদলি হলেন। এই সুযোগে তিনি কেবল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নয় সারা ভারতের কারুশিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন।

তাঁর আগ্রহে ও চেষ্টায় ১৮৮৩ খ্রিঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীর। সেই প্রদর্শনীতে ত্রৈলোক্যনাথ হলেন কয়েকটি বিষয়ের অধ্যক্ষ।

সেই বছরেই বিলেতে যে আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী হল তাতে যোগ দেবার জন্য ত্রৈলোক্যনাথকে ভারত সরকারের প্রতিনিধি মনোনীত করা হল। কিন্তু সেকালে এদেশীয় গোঁড়া হিন্দু সমাজ বিলাত গমনের বিরোধী ছিলেন। ম্লেচ্ছ দেশে গেলে ব্রাহ্মণের জাত যেত এবং তাদের সামাজিক বয়কটের শিকার হতে হত। আত্মীয়-স্বজনের আপত্তির ফলে সেবার আর তাঁর বিলেত যাওয়া সম্ভব হল না।

শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সরকার সবিশেষ অবগত ছিলেন। তাই তিন বছর পরে ১৮৮৬ খ্রিঃ তাঁকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ঔপনিবেশিক শিল্প প্রদর্শনীতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন ভারত সরকার।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও সকল সামাজিক ও পারিবারিক বাধা অগ্রাহ্য করে সেবারে তিনি বিলেত পাড়ি দিলেন। সেবারে ইংলন্ডের বহু জায়গা ছাড়াও ইটালি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করে দেশে ফিরে এলেন।

তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা পরে প্রকাশ করেছেন বই আকারে। তাঁর রচিত এ ভিজিট টু ইউরোপ অন্যতম বিখ্যাত বই।

১৮৮৬ খ্রিঃ রাজস্ব বিভাগ ছেড়ে তিনি যোগ দিলেন কলকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর পদে। এই কাজে থাকার সময়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য শিল্পদ্রব্যের বিবৃতিমূলক তালিকাপুস্তক Art Manufacturers of India রচনা করেন।

আজীবন সরকারী পদে চাকরি করলেও বাংলাদেশে প্রধানত হাস্যরসাত্মক সাহিত্য রচয়িতা হিসেবেই ত্রৈলোক্যনাথের সমধিক পরিচিতি। উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। উপন্যাস, কবিতা ও বিজ্ঞানবিষয়ের পুস্তক রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

ব্যঙ্গ উপন্যাস কঙ্কাবতী রচনা করে তিনি লেখক খ্যাতি লাভ করেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ খ্রিঃ। তাঁর রচিত বিখ্যাত বাংলা গ্রন্থ ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, মুক্তমালা, মডেল ভগিনী, কালাচাঁদ, নেড়া হরিদাস, ময়না কোথায়, মজার গল্প, পাপের পরিণাম, ডমরু চরিত প্রভৃতি।

এছাড়া ভারতীয় বিজ্ঞানসভা, A Descriptive Catalogue of Products, A Hand Book of Indian Products, A list of Indian Economic Products প্রভৃতি তাঁর বহুপ্রশংসিত রচনা।

বিজ্ঞানবোধ সহ কয়েকটি স্কুল পাঠ্য বইও তিনি লিখেছিলেন। সেকালের বিখ্যাত কয়েকটি পত্রিকা যেমন বঙ্গবাসী, জন্মভূমি প্রভৃতি এসবের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

ভ্রাতা রঙ্গলালের সহযোগিতায় তিনি একসময় নিজের গ্রামে একটি ছাপাখানাও করেছিলেন। বিশ্বকোষ রচনাকালে তিনি রঙ্গলালকে সাহায্য করেন। দুজনের সম্পাদনায় বিশ্বকোষের কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। Wealth of India পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

শেষ জীবনে ত্রৈলোক্যনাথ সাহিত্য সাধনাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। সেযুগের বরেণ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বর্তমান কালেও তাঁর সরস রচনাগুলি সমান ভাবে সমাদৃত।

এক চিরঅপরাজেয় পরিপূর্ণ সংগ্রামী মানুষ ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁর জীবন-সংগ্রামের কাহিনী সকল মানুষেরই প্রেরণার স্থল। এই মহৎ প্রাণ ত্রৈলোক্যনাথের কর্মময় জীবনের অবসান হয় ১৯১৯ খ্রিঃ।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

আমাদের দেশে নতুন যুগের সমাজসচেতন, জাতীয়তাবাদী ও মুক্তবুদ্ধির অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। তাঁর সত্যানুরাগ ছিল প্রবাদের মতো। তাঁর দৃঢ় চিত্ততা ও প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার পথ সুগম হয়েছিল।

১৮৩৩ খ্রিঃ ২রা নভেম্বর হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে মহেন্দ্রলালের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছিল।

পিতা তারকনাথকে হারিয়েছিলেন শিশু বয়সেই। শিশুপুত্রকে নিয়ে মা আশ্রয় নিয়েছিলেন কলকাতার নেবুতলায় পৈতৃক বাড়িতে। সেখানে আসার পর মাত্র বছর চারেক মায়ের স্নেহ সাহচর্য পেয়েছিলেন তিনি।

মাত্র ৩২ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন বাবা। মাও গত হলেন অত্যন্ত কম বয়সে। অনাথ মহেন্দ্রলালের লালন-পালনের দায়িত্ব নিলেন তাঁর দুই মামা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। তাঁদের তত্ত্বাবধান ও যত্নে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন অনাথ বালক।

মহেন্দ্রলালের শিক্ষা শুরু হয় স্থানীয় পাঠশালাতেই। ইংরাজী শেখাবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন এক গৃহশিক্ষক।

এই গৃহশিক্ষকের নাম ছিল ঠাকুরদাস। মহেন্দ্রলাল তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। ঠাকুরদাসের উৎসাহ ও প্রেরণাতেই বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্মেছিল তাঁর।

পরবর্তীকালেও ঠাকুরদাসের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অটুট ছিল মহেন্দ্রলালের। যত দিন তিনি জীবিত ছিলেন মহেন্দ্রলাল তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদাদানে ত্রুটি করেননি।

সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই তাঁর মামারা ভাগ্নেকে যুগোপোযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার চেষ্টায় কার্পণ্য করেননি। ইংরাজী শিক্ষায় কিছুটা অগ্রসর হলে তাঁরা তাঁকে ভর্তি করিয়ে দিলেন ডেভিড সাহেবের হেয়ার স্কুলে।

এই মহাপ্রাণ শিক্ষাব্রতীর অনুগ্রহে এখানে অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন বালক মহেন্দ্রলাল।

পড়াশুনায় বরাবরই ভাল ছিলেন মহেন্দ্রলাল। অদম্য কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা তাঁকে নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলত। বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণই ছিল প্রবল।

১৮৩৯ খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হন। উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য এরপর ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে।

সেইকালে দেশে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার বিশেষ ছিল না। হিন্দু কলেজেও বিজ্ঞান পড়ার তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু মহেন্দ্রলালের অজানা বিষয়কে বিজ্ঞানের আলোয় দেখার আগ্রহ এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে কলেজের পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত বিষয় তাঁকে তৃপ্ত করতে পারত না।

চেষ্টা চরিত্র করে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ের বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন। তাতে জ্ঞানস্পৃহা আরও বেড়ে গেল।

হিন্দু কলেজের পড়া শেষ হলে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন মহেন্দ্রলাল। সেখানে ছয় বছর পড়াশুনা করে ১৮৬১ খ্রিঃ আই এম এস এবং ১৮৬৩ খ্রিঃ এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসক হলেন।

তাঁর আগে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র ডাঃ চন্দ্রকুমার দে এম. ডি উপাধি পেয়েছিলেন ১৮৬২ খ্রিঃ। মহেন্দ্রলাল এবং জগবন্ধু বসু ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম. ডি।

মেডিকেল শিক্ষা সমাপ্ত করে মহেন্দ্রলাল স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।

কলকাতার দ্বিতীয় এম. ডি হিসাবে সুচিকিৎসার গুণে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর পশার জমে উঠল। চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে অচিরেই চিকিৎসা জগতে হয়ে উঠলেন অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

সেই সময় ডাঃ সূর্যকুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে কলকাতায় British Medical Association-এর শাখা গড়ে ওঠে। মহেন্দ্রলাল হয়েছিলেন প্রথমে তার সেক্রেটারি ও পরে সহ সভাপতি।

সমিতির প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার গুণাগুণের প্রশংসা করে মহেন্দ্রলাল এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য ও বাগ্মীতায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হয়েছিলেন।

একজন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই মহেন্দ্রলাল এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সমালোচনা করেছিলেন।

তখনকার কলকাতা শহরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের অভাব ছিল না। ডাঃ রাজেন্দ্র দত্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। লোকপরম্পরায় মহেন্দ্রলালের সমালোচনার কথা তিনি জানতে পারলেন।

ডাঃ মহেন্দ্রলালের সঙ্গে ডাঃ দত্তের পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। একদিন উভয়ের সাক্ষাৎ হলে ডাঃ দত্ত মহেন্দ্রলালের সেদিনের সভায় হোমিওপ্যাথি বিষয়ে বিভিন্ন উক্তির বিরোধিতা করেন।

দুজনেই নিজেদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। অতএব তাঁদের আলোচনা বিচারে পর্যবসিত হতে বিলম্ব হল না। তর্ক বিতর্ক বিচারের জের চলল কয়েকদিন ধরে।

ইতিমধ্যে ঘটল অন্য এক ঘটনা। মর্গ্যান নামে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের ফিলজফি অব হোমিপ্যাথি নামে একটি বই ঘটনাচক্রে এসে পড়ল মহেন্দ্রলালের হাতে।

সেইকালে ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত কিশোরীচরণ মিত্র মহাশয়ের সম্পাদনায়। সেই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উক্ত বইটি সমালোচনার ভার পেলেন মহেন্দ্রলাল।

বইটি পড়তে গিয়ে চমৎকৃত হলেন তিনি। তার মধ্যে তাঁর অজ্ঞাত বেশ কিছু তথ্যের সন্ধান পেলেন। বিষয়গুলি সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে কোন সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ তাঁর কাছে অসমীচীন বোধ হল।

বাধ্য হয়ে তিনি হোমিওপ্যাথি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাজেন্দ্র দত্তের শরণাপন্ন হলেন। বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

মহেন্দ্রলালের বিনম্র আগ্রহ ও মনোভাব লক্ষ্য করে আনন্দিত হলেন ডাঃ দত্ত। কয়েকটি কঠিন রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল দেখাবার জন্য মহেন্দ্রলালকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিভিন্ন রোগীর অবস্থা দেখালেন।

মহেন্দ্রলাল আগ্রহ সহকারে রোগীদের নিজস্ব বিধিমতেই পরীক্ষা করলেন এবং তাদের ওপর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

যথা সময়েই নিজস্ব পদ্ধতির ভুলত্রুটিগুলি তাঁর চোখে ধরা পড়ল। তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন।

তাঁর প্রতীতি হল বিভিন্ন রোগে জার্মান ডাক্তার হ্যানিম্যানের উদ্ভাবিত প্রণালী যুক্তিসম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য।

এই ঘটনার প্রভাবে চিকিৎসক হিসাবে মহেন্দ্রলালের ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি হয়ে উঠলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক।

কলকাতা শহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল। এই অবস্থায় নিজের পশার প্রতিপত্তি স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি নির্বিকার চিত্তে নিজের পরিবর্তিত বিশ্বাস মনে চেপে রাখতে পারতেন। অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে অন্য সুখ্যাত চিকিৎসকগণের ন্যায় করণীয় সব কিছুই বজায় রাখা অসম্ভব হত না।

কিন্তু সত্যানুরাগে একনিষ্ঠ মহেন্দ্রলাল যা সত্য বলে জানতেন তা নির্দ্বিধায় বলতে বা করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

ব্যক্তিগত লাভলোকসানের নীচ চিন্তা তিনি কখনও মনে প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ও স্বাধীনচেতা।

তাই কারও বিরাগ উৎপত্তির তোয়াক্কা না করে তাঁর মত পরিবর্তন ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি আস্থার কথা চিকিৎসক বন্ধুদের জানাতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই চিকিৎসক হিসেবে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া প্রচার করবার বৃহত্তর সুযোগ উপস্থিত হল। ১৮৬৭ খ্রিঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের ৪র্থ বার্ষিক সভায় মহেন্দ্রলাল অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর বহুনিন্দিত কতগুলি ত্রুটি উল্লেক করে সারগর্ভ বক্তৃতা করলেন। সেই সঙ্গে নির্ভীক চিত্তে সর্বসমক্ষে ডাঃ হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করে তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

প্রকাশ্য সভায় মহেন্দ্রলালের দৃঢ় মতামত শোনার পরে বহু সাহেব ও ভারতীয় ডাক্তার যারপরনাই রুষ্ট হন।

মহেন্দ্রলাল যখন উপস্থিত অন্যান্য ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন জনৈক শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার ওয়ালাহ এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যে তিনি বারবার মহেন্দ্রলালের বক্তব্যে বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন।

শেষপর্যন্ত চিৎকার করে বললেন যে ডাঃ সরকার যদি এই সংগঠনের সদস্য থাকেন এমনকি এই সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবেও উপস্থিত থাকেন তাহলে তিনি এই সভা ও সংগঠন পরিত্যাগ করবেন।

তখনকার সুখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ চক্রবর্তী, ডাঃ ইওয়াট প্রমুখ অনেকেই ওয়ালাহ-এর বক্তব্য সমর্থন করে মহেন্দ্রলালের বহিষ্কার দাবি করতে লাগলেন। নিজের বিশ্বাসে অচল অটল দৃঢ়চিত্ত মহেন্দ্রলাল অম্লানবদনে সভা ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে এলেন।

এই প্রসঙ্গে পরে তিনি যা বললেন, তা এক ঐতিহাসিক শপথ হিসেবে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

তিনি বললেন, ''আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব, তাতে কিছু এসে যাবে না. তবে যা সত্য তা অস্বীকার করতে পারব না। সত্য যা তা বলতেই হবে বা করতেই হবে।''

মহেন্দ্রলালের বিশ্বাস মননশীলতা ও বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে সমিতির সদস্য ডাক্তারগণ মাথা ঘামালেন না। তাঁকে অবিলম্বেই সমিতি থেকে বহিষ্কার করা হল।

কেবল তাই নয়, তাঁকে একঘরে করার জন্য নানা রকম উৎপীড়ন আরম্ভ হল।

মেডিকেল কলেজের মিশনারি ডাক্তার ইওয়াট মহেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লিখতে আরম্ভ করলেন।

অনেকে মহেন্দ্রলালের নিন্দা সূচক বক্তৃতাও করলেন। সেই সব বক্তব্য খবর হিসেবে সংবাদপত্রে ছাপা হতে লাগল।

এসকল অপপ্রচারের ফল ফলতেও দেরি হল না। মহেন্দ্রলালের পসার বসে গেল। কোনও রোগীই তাঁর কাছে যেতে ভরসা পায় না।

মহেন্দ্রলাল কিন্তু দমলেন না। সকল বিরুদ্ধতার বিপক্ষে নিজের সত্য মতামত প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এক বছরের মধ্যেই, ১৮৬৭ খ্রিঃ প্রকাশ করলেন Calcutta Journal of Medicine পত্রিকা। এর মাধ্যমে তিনি নির্দ্বিধায় নিজের মতামত জনসাধারণকে জানাতে লাগলেন।

এই সময় তাঁর ভূতপূর্ব অনেক প্রফেসরও তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি সকল বিরূপ সমালোচনা ও নিন্দনীয় রটনা শান্ত ভাবে উপেক্ষা করেছিলেন।

তিনি নিজে এই অবস্থাকে পরে ঘোর পরীক্ষা বলে উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'I was sustained by my faith in the ultimate triumph of truth.''

সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী জেনেই তিনি নিজের বিশ্বাসে স্থির ও অটল ছিলেন। ভূতপূর্ব শিক্ষকদের প্রতিও অশ্রদ্ধেয় উক্তি কখনও করেন নি।

এক বক্তৃতায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন "Whatever may now have become the differences between my venerable preceptors of the Medical College and myself shall always look back with ecstacy and gratitude on those days when I used to be charmed by their elequence pregnant with the words of Science."

উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সময়ে মহেন্দ্রলালই কালক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সম্মান ও গৌরভ লাভ করেছিলেন। তাঁর সত্যানুরাগ ও অনমনীয় দৃঢ়তা দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছিল।

আজীবন হোমিওপ্যাথির প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন মহেন্দ্রলাল। এই কাজে তাঁকে যথোপযুক্ত সহায়তা করেছিলেন বিখ্যাত অক্রূর দত্তের পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়।

বস্তুতঃ মহেন্দ্রলালের চেষ্টাতেই এদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সমাদৃত ও প্রসার লাভ করেছিল।

দেশহিতকর বহু কাজের মধ্য দিয়ে জাতির সেবায় প্রাণমন সমর্পণ করেছিলেন মহেন্দ্রলাল। তাঁরই প্রত্যক্ষ সাহায্যে ও অনুপ্রেরণায় এককালে ভারতবাসী বিশ্ববিজ্ঞান সভায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ পেয়েছিল।

দেশবাসীকে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত ও সুযোগদানের উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খ্রিঃ ১৫ জানুয়ারী কলকাতায় Indian Association for the Cultivation of Science. প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহেন্দ্রলাল। এই বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ছয় বছর আগেই ১৮৭০ খ্রিঃ এবিষয়ে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করে মহেন্দ্রলাল হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিলেন। দেশের জ্ঞানীগুণী ধনী অনেকেই এই মহাকাজে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা দিগম্বর মিত্র প্রমুখ অনেকেই টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন।

এ বিষয়ে সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাদ্রী লাফোঁ সাহেবের কাছ থেকেও। সাধারণ মানুষও তাঁদের সাধ্যানুযায়ী অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

সকলের সমবেত সাহায্যে এবং প্রধানত মহেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এক মহতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয়

বিজ্ঞানচর্চার সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন তৎকালীন লাটসাহেব রিচার্ড টেম্পল।

পরে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অ্যাসোসিয়েশনের কাজের সূত্রপাত হয়েছিল ২১০ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে। পরবর্তীকালে কাজকর্মের প্রসার ঘটায় সংস্থাটি স্থানান্তরিত হয় যাদবপুরের একটি প্রশস্ত বাড়িতে।

এখানে গড়ে ওঠে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি পরীক্ষাগার ও আধুনিক বিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী।

বউবাজারের বাড়ির পরীক্ষাগারে গবেষণা করে দশ বছরের মধ্যেই ভারতের বিশিষ্ট পদার্থবিদ সি. ভি. রমন আলোর বিকিরণ তত্ত্ব আবিষ্কার করে ১৯২৫ খ্রিঃ এফ আর এস হন। তাঁর আবিষ্কার আখ্যাত হয় Raman effect নামে। এই অবদানের জন্য ইংরাজ সরকার তাঁকে ১৯২৯ খ্রিঃ স্যার উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

১৯৩১ খ্রিঃ বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে নোবেল কমিটি জগদ্বিখ্যাত নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করেন রমনকে। ভারত তথা সমগ্র এশিয়ার বিজ্ঞান সাধনা এভাবে বিশ্ব বিজ্ঞান ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃত লাভ করেছিল।

মহেন্দ্রলাল ১৮৭০ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হলেন। ক্রমে সমাজ সংস্কারের কাজেও তাঁর হস্ত প্রসারিত হল।

শহরের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ তাঁর চিকিৎসার ভার ডাঃ সরকারের ওপর দেন। ঠাকুরকে রোগমুক্ত করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর থেকে ডাঃ সরকারের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণারও পরিবর্তন ঘটে। ঠাকুরের মনের অলৌকিক মাধুর্য ও প্রেম এবং তাঁর ভেতর থেকে অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ ডাক্তার সরকার লক্ষ্য করতেন, তাতেই ধর্ম বিষয়ে তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন।

এক বছর দুর্গাপুজোর সন্ধিক্ষণে ঠাকুরের মধ্যে যে অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ লাভ করে ডাক্তার সরকার তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ভাবাবেশকালে ঠাকুরের স্পন্দনাদি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় প্রতীয়মান ঠাকুরের সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনওরূপ আলোক এখনও পর্যন্ত প্রদান করতে অক্ষম।

সাধ্যানুরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও ঠাকুরের রোগ ডাঃ সরকার ভাল করতে পারেন নি।

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের কয়েক বছর পরে ১৯০৩ খ্রিঃ ডাঃ সরকার নিজেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। অবশেষে ১৯০৪ খ্রিঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

মতিলাল শীল

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলার সমাজসংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে নব জাগরণের অভ্যুদয় ঘটেছিল তার মূল প্রেরণা ছিল প্রধানতঃ সর্বতোমুখী সংস্কারচিন্তা।

অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলা তথা ভারতের গণমানসে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী আধুনিক চিন্তা ও মননের আলোকপাত ঘটিয়েছিলেন যে সকল মুক্তবুদ্ধি জাতীয়তাবাদী মনীষী তাঁদের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও দীপ্তিমান ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী কিছু ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে কর্মবীর মতিলাল শীল অন্যতম। বাঙালীর ইতিহাসে তাঁর কীর্তিকথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

অক্লান্ত পরিশ্রম বুদ্ধিবল ও বিচক্ষণতার সাহায্যে অতি সাধারণ অবস্থা থেকে সমাজের শীর্ষস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মতিলাল। স্বোপার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিত্ত তিনি অকাতরে ব্যয় করেছিলেন দরিদ্র অশিক্ষিত দেশবাসীর কল্যাণে। তথাকথিত বাবুকালচারের যুগে মতিলাল ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্রিম আদর্শ পুরুষ।

প্রাচীন কলকাতার উত্তরাঞ্চলে কলুটোলা পল্লীতে ১৭৯২ খ্রিঃ অতি সাধারণ এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম হয়েছিল মতিলালের। তাঁর পিতা চৈতন্যচরণ শীল ছিলেন সামান্য কাপড়ের ব্যবসায়ী। প্রতিদিনের সংসারিক ব্যয় নির্বাহ করে যৎসামান্য অর্থই তিনি সঞ্চয় করতে পারতেন।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই পিতৃহারা হয়েছিলেন মতিলাল। আত্মীয়স্বজনদের প্রতাবণার ফলে কেবল বসত ভিটেটুকু ছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাননি তিনি। সেটুকু আঁকড়ে ধরেই কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই শুরু হয় মতিলালের।

সৌভাগ্যবশতঃ দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় বাবু বীরচাঁদ শীল সেই সময়ে পিতৃহারা বালকের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁরই উৎসাহে ও

চেষ্টায় পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। বাংলা আর অঙ্কের প্রাথমিক শিক্ষাটুক সেখানেই হয়েছিল।

সেইকালের কলকাতায় সাধারণ পরিবারের শিশুদের শিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল না। অলিতে গলিতে আঙুলে গোনা দু-চারটে পাঠশালাই ছিল সম্বল।

আর ছিল গুটিকয় ইংরাজি স্কুল। ইংরাজদের পরিচালিত সেই সব স্কুলে বাঙালি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরাই পড়তে পারত। অনেক বাড়িতে ছেলেদের জন্য ইংরাজ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হত। তাঁরাই তাদের ইংরাজি ও বিলাতি চালচলনে দুরস্ত করে তুলতেন।

পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার পরে মতিলাল মার্টিন বোল নামে এক ইংরাজের ইংরাজি স্কুলে কিছুদিন পড়েন। তারপর তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় কলুটোলার মদন মাষ্টারের স্কুলে। এখানে ইংরাজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ছিল।

এই মদন মাষ্টারের স্কুলের পড়াশুনাটুকুই ছিল মতিলালের জীবনের একমাত্র সম্বল। পিতৃহীন দরিদ্র বালকের পক্ষে পড়াশুনায় এর বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না।

অভিভাবক বাবু বীরচাঁদ শীলের উদ্‌যোগে কিশোর বয়সেই বিয়ে হয় মতিলালের। বিয়ের পর থেকেই তাঁর জীবনে সৌভাগ্যের উদয় হয়। ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথ খুঁজে পান তিনি।

বিয়ের কিছুদিন পরে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে মতিলালকে তীর্থ ভ্রমণে যেতে হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নানা তীর্থ পর্যটনের কালে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় তাঁর। তার ফলে লোকচরিত্র ও লোকব্যবহার সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি।

ফোর্ট উইলিয়ামে সামরিক অফিসারদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের মধ্য দিয়ে প্রথম অর্থোপার্জন শুরু করেন মতিলাল।

সেই সঙ্গে খালি শিশি বোতল ও কর্কের ব্যবসায় শুরু করেন। এই ভাবে ভালই অর্থাগম হতে থাকে তাঁর।

এসব কাজের মধ্যে দুই বছর বালিখালের চেক পোস্টে কাস্টমস দারোগা হিসেবেও কাজ করেন।

ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান হিসাবে সহজাত ব্যবসায় বুদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি। তার ফলে ব্যবসাক্ষেত্রে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অল্পদিনের মধ্যেই ইউরোপীয় বণিকসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। সেই সূত্রেই ১৮২০ খ্রিঃ তিনি স্মিথসন সাহেবের বেনিয়ান নিযুক্ত হন।

কর্মতৎপরতা গুণে অল্পদিনের মধ্যেই আরও সাত আটটি ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর বেনিয়ানের দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হয়।

স্বক্ষেত্রে সেই সময় এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন তিনি যে, বিলাতের জাহাজী নাবিকরাও তাঁর মাধ্যমে জাহাজের মালপত্র কিনে নিশ্চিন্ত হত।

ক্রমে আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায়ে লিপ্ত হন মতিলাল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এদেশের বিভিন্ন মাল পাঠাতেন তিনি। প্রধানতঃ দেশীয় রেশম, নীল, সোরা এবং চাল রপ্তানীর বদলে তিনি আমদানী করতেন বিদেশের কাপড় এবং লৌহজাত দ্রব্যাদি।

প্রখর ব্যবসায় বুদ্ধি বলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। সফল বাঙালী ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে কলকাতার বণিকসমাজেরও মধ্যমনি হয়ে ওঠেন তিনি।

মতিলালের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী হিসেবে বাঙালীর দক্ষতা ও প্রতিপত্তি নতুন মাত্রা পেল।

অর্থোপার্জনের জন্য কখনও অসৎ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেননি মতিলাল। সততাই ছিল তাঁর প্রধান মূলধন। সেই সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্যবসায়ীসুলভ ঝুঁকি নেবার সাহস ও বিচক্ষণতা।

একবার, ১৮৩৯ খ্রিঃ হেনরী ডসন অ্যান্ড বেসটেল কোম্পানির অংশীদার মিঃ ডসন তাঁদের দুটি জাহাজ নব্বই হাজার টাকার বিনিময়ে মতিলালের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। জাহাজ দুটি মরিশাস ও রেঙ্গুন যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ ডসন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলেন। শর্ত অনুযায়ী মতিলাল জাহাজ দুটি ক্রয় করে নিলেন।

মিঃ ডসন জাতে ইংরাজ। স্বভাবতঃই ইংরাজ শাসনাধীন ভারতে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তিরও অধিকারী। মতিলালকে প্রভাবিত করার জন্য তিনি যথেষ্ট অনুনয় বিনয় শেষে হুমকি প্রদর্শন করতেও ছাড়লেন না। কিন্তু সাহসী মতিলাল কোন কিছুতেই কর্ণপাত করেননি। শেষ পর্যন্ত স্পর্ধিত ইংরাজ বণিক তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

মতিলালের ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ১৮৩৯ খ্রিঃ প্রথম দিকে ডসনের কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময়ে মতিলালের খ্যাতি প্রতিপত্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে প্রয়োজনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরাও সাহায্যের জন্য তাঁর দারস্থ হতেন। বিদেশে মাল রপ্তানির ক্ষেত্রে যে কোন জটিলতার সমাধান মতিলাল করতে সক্ষম ছিলেন।

১৮৪০ খ্রিঃ নাগাদ একবার মথুরার লছমিচাঁদ রাধাকিষণ কোম্পানির মালিক দশ লক্ষ টাকার আফিম খরিদ করেন। কিন্তু যথাসময়ে উপযুক্ত সরকারি শুল্ক দিতে না পারায় সঙ্কটে পড়েন এবং মতিলালের শরণ নেন।

সরকারি মহলে প্রভাব খাটিয়ে মতিলাল তাঁকে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করেন। কেবল তাই নয়, বাজেয়াপ্ত মালের পাওনা টাকা যাতে সরকারের কাছ থেকে ভদ্রলোক পেতে পারেন তার প্রতিশ্রুতিও আদায় করে দেন।

এই দুর্ঘটনার পরে কোম্পানিটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। মতিলাল নামমাত্র সুদে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার দিয়ে সেই যাত্রায় কোম্পানিটিকে রক্ষা করেন।

এই ভাবেই প্রথম লছমিচাঁদ রাধাকিষণ কোম্পানির সঙ্গে মতিলালের সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। পরে তাদের আমদানি রপ্তানির ব্যবসায়ের সমস্ত অধিকার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করে।

এই কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সুফল ফলতেও বিলম্ব হল না। বিভিন্ন সংস্থা থেকে তারা বড় বড় অর্ডার পেতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কোম্পানির অবস্থা ঘুরে গেল।

নানান কোম্পানির বেনিয়ান হিসাবে প্রচুর অর্থাগম হত মতিলালের। তিনি তার একটা বড় অংশ নিজের ব্যবসায় পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করতেন।

নানা ধরনের ব্যবসায় পুঁজি খাটিয়ে অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা ছিল তাঁর সহজাত। তাই একটার পর একটা ব্যবসায় তিনি বাড়িয়ে গেছেন অবলীলায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য ছিল তাঁর করায়ত্ত।

এরপর জাহাজী ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে তিনি বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেন। চীন ও ইউরোপের বিভিন্ন লাইনে মতিলালের জাহাজ চলাচল শুরু করল।

সেই সময় ছোট বড় মিলিয়ে মোট তেরোটি জাহাজের মালিক হয়েছিলেন তিনি। অন্তর্দেশীয় জাহাজী ব্যবসায় তিনিই প্রথম বাষ্পীয়পোত ব্যবহার করেন।

কলাকাতা বন্দরে যে সকল মালবাহী জাহাজ আসত, সেগুলিকে বঙ্গোপসাগরের মুখ থেকে হুগলী নদীতে নিয়ে আসা এবং পুনরায় সাগরের মুখে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করার জন্য মতিলাল টাগবোট বা টানা জাহাজ নামিয়েছিলেন। নব্বই অশ্বশক্তির এই জাহাজটির নাম ছিল বেনিয়ান। কলকাতা বন্দরে টাগবোটের প্রচলন তিনিই প্রথম করেছিলেন।

তাঁর কর্মকুশলতায় সেইকালে ইংরাজরাও বিস্ময় মেনেছিল। প্রতিপত্তি ও খ্যাতির দিক থেকে তিনি রুস্তমজী কাওয়াসজী ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন।

এরপর আসামের পাহাড়ি এলাকা থেকে সংগৃহীত চায়ের ব্যবসাতে নামলেন মতিলাল। তাঁর চেষ্টায় বিখ্যাত আসাম কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ আরম্ভ হল।

ইতিপূর্বেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কার-টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি। বেঙ্গল টি অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত হত তাদেরই তত্ত্বাবধানে। অতঃপর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হাজি ইস্পাহানি, রুস্তমজি কাওয়াসজি এবং মতিলালের সহযোগিতায় উক্ত দুটি কোম্পানি মিশে গিয়ে ১৮৩৯ খ্রিঃ লন্ডনে গঠিত হল আসাম কোম্পানি। এই কোম্পানির সমান সংখ্যক শেয়ারভোগী ছিলেন দ্বারকানাথ ও মতিলাল।

জাহাজ ও চায়ের ব্যবসার পাশাপাশি বন্ধকীর কারবারেও অর্থ লগ্নি করতেন মতিলাল।

এই কারবারে প্রচুর অর্থ উপার্জন হত তাঁর। এই সূত্রে বহু বড় বড় বিখ্যাত সম্পত্তি বাঁধা পড়ত তাঁর কাছে।

ঝুঁকির ব্যবসাতে কখনও পিছপা হতেন না মতিলাল। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই হিসাব বানচাল হয়ে যেত। অনেকবারই লোকসানের কড়ি গুণতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু অর্থাগমের তুলনায় গুণাগারের পরিমাণ কখনোই বড় হতে পারেনি বলে উপার্জনের ঢল অব্যাহতই ছিল।

সামান্য এক মাল সরবরাহকারী কারবারি থেকে নিজেকে বঙ্গীয় তথা ভারতীয় বণিক সমাজের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন মতিলাল। ১৮২০ খ্রিঃ থেকে ১৮৩৯ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রভূত অর্থবিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি।

সেই যুগের কলকাতা জুড়ে গড়ে উঠেছিল বাবু সমাজ। নানা উপায়ে হঠাৎ বড়লোক হওয়া বাবুরা মাইফেল মজলিশের ফুর্তিতে অকাতরে অর্থ অপচয় করতেন।

টাকার গরমে নানান হাস্যকর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন এই বাবু সমাজ। অর্থের অপচয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার রেওয়াজই হয়ে উঠেছিল বাবু সমাজের কালচার।

ব্যাঙের বিয়ে, বেড়ালের বিয়ে, বুলবুলির লড়াই, পায়রা ওড়ানো প্রভৃতি নানা উপলক্ষে অঢেল অর্থ ব্যয় করতেন নব্যবাবুরা।

নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন তাঁরা। সমাজের অপরাপর মানুষদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেবার মতো মানসিকতা কারোরই ছিল না। ফলে একদিকে যেমন বাবু সমাজ অর্থের অপচয়ে উন্মত্ত থাকত, অপরদিকে সমাজের সাধারণ মানুষ দারিদ্য ও অশিক্ষার অন্ধকারে হাবুডুবু খেত।

দুরবস্থার সুযোগে সাহায্যের অছিলায় এই সমাজে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সক্রিয়

হয়ে উঠেছিল বিদেশী মিশনারীরা। নানা প্রলোভন সামনে রেখে তারা এদেশীয় হিন্দুদের খ্রিস্টান করে নিত। এই রকম এক সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেই উত্থান ঘটেছিল মতিলালের।

ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের অহঙ্কারে তিনি কিন্তু বাবুসমাজের বেহিসেবি স্রোতে গা ভাসাননি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্তই সাদাসিধা মানুষ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ এক কপর্দকও খরচ করতেন না।

সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ তিনি অকাতরে ব্যয় করেছেন সমাজের দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষের কল্যাণে। শহর কলকাতাকে সুন্দর রূপ দেবার জন্যও তাঁর চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের কার্পণ্য ছিল না।

পশ্চিমের উন্নত জাতিসমূহের সঙ্গে মেলামেশার ফলে মতিলাল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার উন্নতি। তাই তিনি সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিলেন শিক্ষা প্রসারের কাজে।

সেইকালে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল হাতে গোনা। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি মাদ্রাসা। আর এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ামে চলত দুটি কলেজ।

সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছেলেদের লেখাপড়া শেখার জন্য কয়েকজন বিত্তবান মানুষের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দু কলেজ। প্রথমে চিৎপুরে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে মাত্র ২০ জন ছাত্র নিয়ে ছিল এই স্কুল। সময়ান্তরে এই স্কুলেরই নাম হয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারি।

মতিলাল উদ্যোগী হলেন কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে। হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা নেওয়া হল এবং কলেজের কাজ চালু হল ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়িতে। কলেজ চালানোর জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং গঙ্গানারায়ণ দাস প্রমুখ। তবে খরচখরচার অধিকাংশ দায়িত্বই বহন করেছিলেন মতিলাল।

এরপর ১৮৪৩ খ্রিঃ মতিলাল নিজের বাড়িতেই শীলস কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই কলেজে একসঙ্গে পাঁচশ ছাত্রের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শীলস কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পিল, অ্যাডভোকেট জেনারেল সহ বহু আইনজীবী, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধি জর্জ টমসন এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শীলস কলেজে প্রথমে মাইনে নেওয়া হত এক টাকা। বিনিময়ে বিনামূল্যে

ছাত্রদের দেওয়া হত বইপত্র, খাতা পেন্সিল। পরে এখানে পড়াশুনা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হয়ে যায় এবং কলেজের নাম হয় শীলস ফ্রি কলেজ।

স্কুল বিভাগের বাইরে ফ্রি কলেজ বিভাগও কিছুদিন পরে চালু হয়েছিল। কিন্তু পরিচালনার ত্রুটির জন্য কলেজ বিভাগ বেশিদিন চালু রাখা সম্ভব হয়নি। তবে মতিলালের অর্থে গঠিত ট্রাস্ট্রিফান্ড থেকেই স্কুল পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব পালিত হত।

অবিলম্বেই শীলস কলেজের জন্য তৎকালীন হ্যালিডে স্ট্রিটে একটি প্রকান্ড দোতলা বাড়ি তৈরি হল এবং যথাসময়ে স্কুল স্থানান্তরিত হল। প্রসঙ্গতঃ হ্যালিডে স্ট্রিটের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে সেন্ট্রাল এভেনিউ। যার বর্তমান নাম চিত্তরঞ্জন এভিনিউ।

শীলস কলেজ পরিচালিত হত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের তত্ত্বাবধানে। এখানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল সাতজন জেসুইট পাদ্রীর সঙ্গে কয়েকজন দেশীয় শিক্ষক।

সেইকালে শিক্ষক হিসাবে জেসুইট পাদ্রীদের খুব সুনাম ছিল। নিজের কলেজে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্য ছিল মতিলালের। কিন্তু এক বছরের মাথাতেই ১৮৪৪ খ্রিঃ এই ইহুদী পাদ্রী শিক্ষকদের নিয়ে খুবই ঝামেলায় পড়ে গেলেন তিনি।

অভিযোগ উঠল, দুপুরে টিফিনের সময় জেসুইট পাদ্রীরা নিজেদের খাদ্য নিষিদ্ধ মাংস ও বিয়ার মাঝেমাঝে ছাত্রদেরও খেতে দেন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে নিষিদ্ধ মাংস আহার করলে জাতিচ্যুত হতে হত।

মতিলাল অবিলম্বে এই সমস্যার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করলেন। তিনি টিফিনে ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে খাবার দেবাব ব্যবস্থা কবলেন।

কেবল তাই নয় জেসুইট পাদ্রীদের অপসারণ করার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। স্কুলে নিয়োগ করলেন সাধারণ ইউরোপীয় ও এশীয়ান শিক্ষকদের।

মতিলালের প্রতিষ্ঠিত শীলস কলেজে দেশের ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের ছেলেরাই পড়ার সুযোগ পেত। হিন্দু কলেজের আদলেই নানা বিষয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত।

অনাথ ও দরিদ্র ছাত্ররা বিনামূল্যে স্কুল বোর্ডিং-এ থাকা ও খাওয়ার সুবিধা পেত।

মতিলালের সহযোগিতা ও অর্থ সাহায্যে স্থাপিত হল হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ। ১৮৫৩ খ্রিঃ নাগাদ হিন্দু কলেজের একটি ঘটনায় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়।

ঘটনাটি হল, হীরা বুলবুল নামে এক বারবনিতার ছেলেকে ভর্তি করা হয়েছিল হিন্দু কলেজে। ফলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অভিভাবকদের মধ্যে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজ পরিচালন সমিতিতে যে সকল অভিজাত হিন্দু সদস্য পদত্যাগ করলেন তাঁরা নিজেদের পরিবারের ছেলেদের কলেজ ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। তাঁদের দেখাদেখি অন্যান্য অনেক ছাত্রই সরে পড়ল।

পরে সকলের সমবেত উদ্যোগে এবং মতিলালের অর্থ সাহায্যে গড়ে তোলা হল হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ। এখানেও দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন মতিলাল।

মতিলালের বদান্যতায় এভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মতিলাল নগরের নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেও যত্নবান হন।

সেইকালের কলকাতা বর্তমানের একটি বড় গ্রামের চাইতে খুব একটা বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর ছিল না। ঝোপজঙ্গল চারদিকে, রয়েছে খানাখন্দ ডোবা। সেই সঙ্গে শহর ঘিরে কাঁচা নর্দমা।

মশা আর মাছির উৎপাত নাগরিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল বলা চলে। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া আর পেটের রোগ। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অকালে বহুলোক প্রাণ হারাত।

নেটিভদের আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা শহরে বিশেষ না থাকলেও ফোর্ট উইলিয়ামে শ্বেতাঙ্গ ফৌজের রোগেশোকে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

১৭০৭ খ্রিঃ অবশ্য কলকাতায় প্রথম হাসপাতাল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারী অনুদান ছিল মাত্র দু'হাজার টাকা। অবশিষ্ট সমস্ত খরচ দেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়।

তবুও এই হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গরাই অগ্রাধিকার পেত। নেটিভরা বড় একটা সেখানে চিকিৎসার সুযোগ পেত না! ফলে দেশের লোকের ভরসা বলতে ছিল দেশীয় কবিরাজ ও হেকিমি ওষুধ। এদের সঙ্গে ছিল কিছু নেটিভ ডাক্তার।

দেশীয় যেসব চিকিৎসককে ইংরাজ ডাক্তাররা তালিম দিয়ে দিতেন তাদেরই বলা হত নেটিভ ডাক্তার। শহরে কয়েক জায়গায় এই নেটিভ ডাক্তাররা ডিসপেনসারিও খুলেছিল।

চিকিৎসাব্যবস্থার এই বেহাল অবস্থা দূর করার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৩৫ খ্রিঃ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল মেডিকেল কলেজ। এখানে জ্বরজারির চিকিৎসার জন্য খোলা হয়েছিল কুড়ি বেডের ফিভার হসপিটাল।

ফিভার হসপিটাল খোলার জন্য মতিলাল শীলের অবদান ছিল বিপুল। বারো হাজার টাকা মূল্যের বিশাল জমি দিয়েছিলেন তিনি। দান করেছিলেন নগদ একলক্ষ টাকা।

দেশীয় তরুণরা যাতে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ায় উৎসাহিত হয় সেজন্য তিনি ছাত্রদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মতিলাল শীলের অর্থ সাহায্যে প্রসূতিদের জন্য এই সময় একটি আলাদা হাসপাতালও খোলা হয়।

মতিলাল শীলের বদান্যতা ও মহানুভবতার কথা সেইকালে লোকের মুখে মুখে ফিরত। বিখ্যাত সমাচার দর্পণ পত্রিকা ১৮৪০ খ্রিঃ ২২ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় লিখেছিল "........ জমিদারেরা তাদের পিত্রাদিশ্রাদ্ধে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন। আর সাধারণ লোকের দুরবস্থার দিকে তাঁদের নজর পড়ে না। সেক্ষেত্রে মতিলাল শীলের মাহাত্ম্য এই পত্রিকার মারফৎ জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগ্য হইয়াছে।"

ব্যক্তিগত জীবনে মতিলাল ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। ধর্মের নামে বাহ্যিক আড়ম্বর তিনি পছন্দ করতেন না। অযথা অপব্যয় বলেই মনে করতেন।

তাঁর কাছে দেশহিতৈষণা ও লোকসেবাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হত। এই জন্য সামাজিক কুসংস্কার দূর করার ব্যাপারেও মতিলাল উদ্যোগী হয়েছিলেন।

দেশের নিরন্ন দরিদ্র দুঃখী মানুষের জন্য মতিলাল নিজে বেলঘরিয়া অঞ্চলে একটি অতিথিশালা তৈরি করে দিয়েছিলেন।

তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের ধনবান মানুষরাও যাতে দরিদ্রের দুঃখ দূর করার কাজে সচেষ্ট হয় সেজন্য তাঁদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন "...... জমিদারদের বলি, নিজেদের উপার্জনের সবকিছু বিসর্জন না দিয়ে কিছু অংশ যদি এই দুর্দশাগ্রস্ত গরিব চাষীদের সাহায্য করেন, যেমন তাঁদের দশটি গাড়ির একটি ও একজোড়া বলদ বিক্রি করে এদের সাহায্যে ব্যয় করেন তাহলে অন্তত কিছু ঘর চাষা খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে।"

ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নানা আড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অর্থব্যয় করেন তাঁদের ধর্মের মূল কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে একবার তিনি বলেছিলেন "দান বদান্যতা সকল দেশ সকল ধর্ম সকল জাতির মধ্যেই ধর্মমূলক প্রধান কৃত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। আপনারা একবার আমাদের দেশের শত শত নিরন্ন ও বস্ত্রহীন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দরিদ্রের দারিদ্যমোচন, অন্নহীনকে অন্নদান, অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের অবশ্য

পালনীয় কর্তব্যকর্ম। এই পবিত্র কর্ম হইতে আমরা দূরে সরিয়া আছি। এইগুলির অনুষ্ঠানেই ধর্মসভার মুখ উজ্জ্বল হইবে।"

দানবীর মতিলাল অনাথ ও বিধবাদের জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডারও গঠন করেছিলেন।

স্নানার্থীদের জন্য গঙ্গায় ঘাট নির্মাণ তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বর্তমানে এই ঘাট মতিলাল ঘাট নামে পরিচিত।

বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত হিন্দু বিবাহ আন্দোলনেরও সক্রিয় সমর্থক ছিলেন মতিলাল। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার বহু আগে থেকেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবিষয়ে সচেষ্ট হন।

আইন পাস হয় ১৮৫৬ খ্রিঃ। তার পনেরো বছর আগেই ১৮৪১ খ্রিঃ হরকরা পত্রিকায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে হিন্দু যুবক কোনও বিধবাকে বিবাহ করবে তাকে দশ হাজার টাকার নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে।

তৎকালীন প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজে মতিলালের এই ঘোষণা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরেও আলোড়ন তুলেছিল।

বহু জনহিতকর কাজের জন্য মহাত্মা মতিলাল শীল বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। জীবদ্দশায় বহু ধন তিনি উপার্জন করেছেন এবং জনকল্যাণের কাজে সেই অর্থ অকাতরে ব্যয় করেছেন। জীবনে কখনও অর্থ উপার্জনের জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করেন নি। তাঁর এই ধারা তাঁর বংশধরদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

মতিলালের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন হীরালাল শীল। দানশীলতার জন্য তিনিও দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দেশে আকাল বা দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র খুলে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষকে ক্ষুধার অন্নদান করেছেন। প্রতিদিন তিন হাজার মানুষ সেখানে খেতে পেত।

১৮৫৪ খ্রিঃ মাত্র ৬৩ বছর বয়সে খ্যাতকীর্তি মতিলাল শীলের মৃত্যু হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাংলার শিক্ষা ও সাহিত্য জগতে বিশিষ্ট অবদানের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষাব্রতী। বিশিষ্ট সাহিত্যসাধক ও একনিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিক।

সাহিত্য ছাড়াও বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ও সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

১৮৬৪ খ্রিঃ ২০ আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দি গ্রামে এক সারস্বত পরিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী। তাঁর পিতামহ ও পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর সকলেই ছিলেন সাহিত্যানুরাগী।

বাল্য বয়স থেকেই এক স্নিগ্ধ সাহিত্যিক পরিমন্ডলের সাহচর্য লাভ করায় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

পাঁচবছর বয়সেই পড়াশুনা শুরু হয়েছিল তাঁর। বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছয় বছর বয়সে ১৮৭০ খ্রিঃ ২৫ মে তাঁকে কান্দি ইংরাজি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

বাল্যবয়স থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী। পিতা গোবিন্দসুন্দরের উৎসাহে ও শিক্ষায় তাঁর মধ্যে জাগরিত হয়েছিল জ্ঞানের স্পৃহা। স্কুলপাঠ্য বাইয়ের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ার আগ্রহ শৈশব থেকেই জন্মেছিল।

গোবিন্দসুন্দর গল্পের মাধ্যমে পুত্রকে শোনাতেন দেশ বিদেশের ইতিহাসের কাহিনী। দেশীয় বীরদের আত্মত্যাগের কাহিনী। প্রকৃতির নানা রহস্যের কথাও সহজ সরল ভাষায় গল্পের মতো করে তিনি বুঝিয়ে দিতেন রামেন্দ্রসুন্দরকে। আকাশের তারাদের পরিচয়, তাদের অবস্থান—শিশু বয়সেই পিতার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন তিনি।

প্রকৃতি শান্ত হওয়ায় স্কুলে ছাত্র শিক্ষক সকলেরই কাছে প্রিয়পাত্র ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পড়াশুনা ছাড়া কিছুই জানতেন না। ক্ষীণকায় ও দুর্বল শরীরের জন্য দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলোয় উৎসাহ পেতেন না।

তাঁর প্রিয় খেলা ছিল ছক্কাপাঞ্জা, বাঘবন্দী, কড়ি খেলা প্রভৃতি—যা ঘরে বসেই একা বা সঙ্গীদের নিয়ে খেলা যেত।

ক্ষীণজীবী হলেও পরীক্ষায় বরাবরই ভাল ফল করতেন। কান্দি ইংরাজি স্কুল থেকেই ১৮৮১ খ্রিঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন।

পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ কেমন ছিল, রামেন্দ্রসুন্দরের নিজের লেখা থেকেই জানা যায়। স্মৃতিচারণায় একজায়গায় তিনি লিখেছেন, "আমার যখন আট বছর বয়স, আমি যখন গ্রাম্য পাঠশালায় তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। আমাদের বাড়িতে বঙ্গদর্শন যাইত। লুকাইয়া বঙ্গদর্শন পড়িতাম। সব বুঝিতাম না ..... অথচ পড়িতাম, লুকাইয়া পড়িতাম।"

কান্দি স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই সেইকালের সামাজিক রীতি অনুযায়ী মাত্র ১৪ বছর বয়সে রমেন্দ্রসুন্দরের বিবাহ হয়। তাঁর বালিকা পত্নীর নাম ছিল ইন্দ্রপ্রভা দেবী।

একটি বিয়োগান্তক ঘটনাও ঘটে তাঁর জীবনে এই সময়ে। অকালে পিতা গোবিন্দসুন্দরের মৃত্যুতে দারুণ শোকে ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পরে পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর তাঁকে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করে দেন। এখান থেকেই ১৮৮৬ খ্রিঃ বি.এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্সসহ প্রথম স্থান লাভ করেন।

কলেজে বিজ্ঞান পড়াতেন পেডলার সাহেব। রামেন্দ্রসুন্দর এই শিক্ষকের খুবই প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁরই উৎসাহ ও প্রেরণাতে ১৮৮৭ খ্রিঃ তিনি এম. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের স্বর্ণপদক ও পুরস্কার সহ প্রথমস্থান লাভ করেন।

পরের বছর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপরীক্ষায় বসেন এবং রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে বৃত্তি পান।

পরবর্তী দুই বছর প্রেসিডেন্সি কলেজ লেবরেটরীতে বিনা বেতনে গবেষণা করেন।

এই সময়ে তিনি সাহিত্য ও বিভিন্ন দেশের ইতিহাস নিয়েও গভীর ভাবে পড়াশুনা শুরু করেন। পড়াশুনার সুবিধার জন্য ১৮৯০ খ্রিঃ থেকে কলিকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

১৮৯১ খ্রিঃ রিপন কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উল্লেখযোগ্য যে সেই বছর থেকেই এই কলেজে বি. এ. ক্লাশে বিজ্ঞান পড়ানো আরম্ভ হয়।

বিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেও রামেন্দ্রসুন্দরের আগ্রহ বরাবরই ছিল সাহিত্যের প্রতি। ফলে তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষায় থাকত সাহিত্যের স্পর্শ। তাঁর এই নতুন রীতির পাঠদান ছাত্রদের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠত এবং পাঠ্যবিষয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেত।

অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। শোনা যায়, তাঁর বিজ্ঞানের ক্লাশে আশপাশের কলেজের ছাত্ররাও ভিড় করত।

পড়াবার সময় সেই কালে অধ্যাপকরা ইংরাজি ভাষাই ব্যবহার করতেন। ইংরাজের রাজত্বে ইংরাজি ছিল রাজভাষা। কাজেই ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানই ছিল রীতি। রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু ক্লাশে ইংরাজির সঙ্গে বাংলা ভাষারও সাহায্য নিতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার নিজেই বলেছিলেন, "অধ্যাপকের আসনে বসে বাঙলা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঙ্ঘমধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না।"

বস্তুতঃ মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ এবং তীব্র স্বদেশ প্রীতির বশেই তিনি প্রচলিত রীতি ভঙ্গে উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁর এই স্বদেশপ্রেম পরবর্তী বহু ঘটনার মধ্যেই তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু ছিলেন বিজ্ঞানশাস্ত্রের গভীরের অনুসন্ধানী। তাঁর বিজ্ঞান দর্শনই তিনি ছাত্রদের দেখাতেন বোঝাতেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী ও প্রণালীতে। বলাবাহুল্য ছাত্রদের কাছে তিনি দুরূহ বিষয়গুলো অঙ্কের সাহায্য ছাড়াই এমন প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরতেন যে পড়ার কাজ ক্লাশেই সমাধা হয়ে যেত।

বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি তিনি সরলভাষায় অতি সাধারণেরও বোধ্যগম্য করে তুলবার দুর্লভ ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এ ছিল তাঁর ব্যাপক সাহিত্য পাঠ ও নীরব সাহিত্যচর্চার প্রত্যক্ষ ফল।

তাঁর একটি লেখা থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন তুলে ধরা যায়। নিয়মের রাজত্ব প্রবন্ধের এক জায়াগায় তিনি লিখেছেন, "প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম অমুকের গাছের নারিকেল বৃক্ষচ্যুত হইবা মাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে লোকটা মিথ্যাবাদী। কেহ বলিবে পাগল। এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন; তিনি বলিবেন হইতেও পারে, তবে ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেননা তাহার ধ্রুব বিশ্বাস যে নারিকেল খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতর জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এহেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।"

১৯০৩ খ্রিঃ রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন ছয় মাসের জন্য। পরে অধ্যক্ষপদেই স্থায়ী হন।

ছাত্রদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন আদর্শ শিক্ষক তেমনি কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব পালনেও তিনি প্রশ্নাতীত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অধ্যক্ষতার সময়ে রিপন কলেজের পড়াশুনা ও বিধিব্যবস্থার এমন সুখ্যাতি ছড়িয়ে ছিল যে ছাত্রসংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে। ক্রমে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দুই হাজারে।

তাদের সুবিধা অসুবিধা জানার জন্য তিনি ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতেন। অত্যন্ত তৎপরতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ছাত্রদের অভাব অভিযোগ অপনোদনের চেষ্টা করতেন। দরিদ্র ছাত্রদের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি থাকত। বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত সাহায্য করতেন। ছাত্রদের জরিমানার টাকা তিনি কলেজফাণ্ডে জমা দিতেন না। সেই অর্থ জমা পড়ত দরিদ্র ছাত্রদের ফাণ্ডে।

ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও আত্মমর্যাদা জাগরিত করার উদ্দেশ্যে তিনি উপদেশচ্ছলে বলতেন যে তারা ভারতীয় ছাত্র। তাদের ওপরেই ভারতবর্ষের খ্যাতি অখ্যাতি নির্ভর করছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যচর্চার শুরু ছাত্র জীবনেই। ১৮৮৫ খ্রিঃ অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত নবজীবন পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ মহাশক্তি প্রকাশিত হয়। পরে এই পত্রিকায় বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর আরও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

পরবর্তীকালে সাধনা, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান, স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন।

তাঁর সকল রচনাই ছিল জ্ঞানগর্ভ। কিন্তু ভাষার সাবলীলতায় ও সুচারু প্রকাশ ভঙ্গীমায় ছিল অনবদ্য। অতি দুরূহ বিষয়ও স্বকীয় প্রাঞ্জল ভাষার গুণে অতি সহজবোধ্য হয়ে উঠত। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ করার দুর্লভ দক্ষতা তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কলেজে সহকর্মী অধ্যাপকদের সঙ্গেও তিনি প্রায় সময়ই বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে মেতে উঠতেন। কখনো বৌদ্ধদর্শন, কখনো বৈদিক যজ্ঞ, কিংবা ইহুদি জাতির ইতিহাস, অথবা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিষয় তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু হত।

তাঁর রচনা সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, "দর্শনই হোক বা বিজ্ঞানই হোক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হোক—রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন হয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত। কল্পনায় মাখামাখি থাকত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত।"

কলেজের অধ্যক্ষতার দায়িত্বপালনের পাশাপাশিই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নতিকল্পে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য জগতে পরিষদ বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিল। একটা সময়ে পরিষদই হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র।

বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে পরিষদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। পরিষদের কাজের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর যুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মাতৃভূমির অতীত গৌরব ও জাতির ধ্যানধারণাকে পরিষদের কাজের মাধ্যমে তুলে ধরবার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁকে।

১৯০৫ খ্রিঃ লর্ড কার্জনের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ও তুমুল আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। স্বদেশানুরাগী রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গভঙ্গের

প্রতিবাদে রচনা করেন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। বাঙ্গালীজাতির মনের কথাই যেন অনবদ্য ভাষার তাঁর রচনায় ব্যক্ত হয়েছে—"মা লক্ষ্মী কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেব না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরব না। ঘরে থাকতে পরের নেব না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলে নেব না। মোটা অন্ন ভোজন করব। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করব। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।" তাঁর প্রস্তাবেই বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে অরন্ধন পালিত হয়।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যের বন্ধনে মিলিত করার উদ্দেশ্যে সেই সময়েই বঙ্গীয় সম্মিলনের আয়োজন করা হয়। কাশীমবাজারে উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সেই সভায় পরিষদের আদর্শ ব্যাখ্যা করে রমেন্দ্রসুন্দর যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তাঁর গভীর স্বদেশানুরাগ ব্যক্ত হয়। তিনি বলেন, "যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব। ...... কিন্তু আমরা কিরূপে সেই মায়ের অর্চনা করিব? আমরা যে মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া তাহার স্তন্যপানে বর্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিয়াছি কি? তাহা বলিতে পারি না—যেদিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সেদিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে।"

কলকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল স্বাদেশিকতার বোধে জাগ্রত। তাই আমৃত্যু তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে গেছেন। বাংলা ভাষার মর্যাদা বিষয়ে তিনি এমনই সজাগ ছিলেন যে একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেষ্টা রূপে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি না দেওয়ায় তিনি প্রবন্ধ পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ভাইস চ্যান্সেলার স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি দেন। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ছিল এমনই উগ্র। তাঁর সাহিত্য সাধনাও ছিল দেশ সেবারই ভিন্নরূপ। আর তাই বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনুপম সাহিত্য কীর্তির জন্যই তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ব্যাক্তিগত জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন নিরহঙ্কারী ও সদালাপী। অনাড়ম্বর জীবনযাপনেই তিনি অভ্যস্থ ছিলেন। আচার আচরণে, পোষাকে পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছাড়াও কাশীর পন্ডিত সমাজের কাছ থেকে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধিও পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনদিন তিনি নামেব পাশে ডিগ্রি বা উপাধি ব্যবহার করেননি। উপাধি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল, এ দেশে ঈশ্বরচন্দ্রই একমাত্র বিদ্যাসাগর।

কর্মবহুল জীবনের শেষপ্রান্তে এসে শোকে রোগে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। স্নেহময়ী জননী চন্দ্রকামিনী দেবীর ও কন্যা গিরিজার মৃত্যুশোক তাঁর কর্মোদ্যম হরণ করেছিল। তার ওপরে ছিল নানা রোগের আক্রমণ। অবশেষে ১৯১৯ খ্রিঃ ৬ জুন মৃত্যুর অমৃতময় স্পর্শে তাঁর সব জ্বালাযন্ত্রণার অবসান ঘটে।

রামেন্দ্রসুন্দরের শেষশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যতাপস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি মন্তব্য করেন, "আমাদের চোখের সামনে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।"

রামেন্দ্রসুন্দর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, প্রকৃতি, কর্ম-কথা, জিজ্ঞাসা, বিচিত্র প্রসঙ্গ, নানাকথা ও জগৎ-কথা। এছাড়া রয়েছে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ ও যজ্ঞ কথা। কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও তিনি রচনা করেন। তার মধ্যে Aids to Natural Philosophy বিখ্যাত। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিচিত্র বিষয়ের ওপর অসংখ্য রচনা বিক্ষিপ্ত ভাবে অগ্রন্থিত অবস্থায় রয়ে গেছে।

জরথুশস্ত্র

পৃথিবীর ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে মহাপুরুষ জরথুশস্ত্র অন্যতম। সৎচিন্তা, সৎবাক্য, সৎকর্মভিত্তিক যে ধর্মমত তিনি প্রচার করেছিলেন আসলে তা ছিল এক প্রাচীনতর ধর্মবিশ্বাসের সংস্কৃত রূপ। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মহান ধর্মসংস্কারক, কবি ও দার্শনিক।

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় আটশ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন জরথুশস্ত্র। এই হিসাবে আমাদের বুদ্ধদেবেরও কিছুকাল আগে তিনি জন্মেছিলেন।

তাঁর জীবনকাহিনী ও বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অনেকেই মনে করেন বর্তমান ইরানের এক রাজবংশে জরথুশস্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পৌরুশসপ এবং মাতার নাম দুঘধোবা দেবী।

প্রাচীন ধর্মগুরুদের অনেকেরই জন্মের সঙ্গে অলৌকিক কাহিনী জড়িত থাকতে দেখা যায়। জরথুশস্ত্রের জন্ম সম্বন্ধেও অনেক দিব্যকাহিনী শোনা যায়।

তাঁর আবির্ভাবকালে সমগ্র দেশে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে মূলে সজ্জিত হয়েছিল চতুর্দিক। দেশত্যাগ করে পাপত্মারা পলায়ন করেছিল।

সেই আনন্দময় পরিবেশে দিব্যবিভামন্ডিত স্বর্ণকান্তি শিশু জরথুশস্ত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্বর্ণময় কান্তি ছিল বলেই তাঁর নাম হয়েছিল জরথুশস্ত্র।

এই শব্দটির এক অর্থ স্বর্ণকান্তি। অপর অর্থ সত্যনিষ্ঠ। বস্তুতঃ নামকরণের মধ্যেই তাঁর পরিচয়ের প্রকাশ ঘটেছিল, উভয় অর্থেই তিনি ছিলেন সার্থকনামা।

তাঁর শৈশবের তথ্য সম্বন্ধে জানা যায়, সাত বছর বয়স হলে তাঁর পিতা তাঁকে একজন সুযোগ্য শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

জরথুশস্ত্র ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও জ্ঞানপিপাসু। সুযোগ্য শিক্ষকের শিক্ষায় ও নিজের মেধা ও নিষ্ঠার বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হন। পনের বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন সম্পন্ন হয়।

কৈশোরকালেই জরথুশস্ত্রর মধ্যে কতগুলি বিশেষ গুণ প্রকাশ পায়। রাজবংশে জন্মেও ভোগৈশ্বর্যের প্রতি ছিল তাঁর সহজাত বিরাগ। ধর্মের প্রতি ছিল প্রবল অনুরাগ তেমনি সকলের প্রতি, এমন কি মনুষ্যেতর পশুপাখির প্রতিও তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ। অনেক সময়েই দেখা যেত, নিজের খাবার তিনি উপবাসী মানুষের সঙ্গে ভাগ করে খাচ্ছেন।

সত্যের প্রতি ছিল তাঁর অন্তরের গভীর আকর্ষণ। যা সত্য বলে জানতেন, তা বলতে বা করতে কখনও দ্বিধা বোধ করতেন না।

তাঁর সময়ে ইরানের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল কুসংস্কার ও নানা অনাচারে পূর্ণ। ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হত বহু অসৎকর্ম। দরিদ্র দুঃখী মানুষের জন্য সমাজের অর্থশালী ও সম্ভ্রান্ত মানুষদের সহানুভূতি ও বেদনাবোধ ছিল না। দুর্বল নিপীড়িত হত সবলের হাতে।

সমাজের এই সকল দুর্নীতিও দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হতেন কিশোর জরথুশস্ত্র। মানুষের দুঃখ দূর করার উপায় চিন্তা করে তিনি অধীর হয়ে উঠতেন।

জানা যায়, তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সংসার বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হবোরি। স্ত্রীর গর্ভে তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা লাভ করেছিলেন তিনি।

জগৎ ও জীবনের রহস্য জানার তীব্র আগ্রহে ক্রমশই তাঁর মধ্যে ঈশ্বর চিন্তা গভীর হয়ে উঠতে থাকে।

ত্রিশ বৎসর বয়সে ঈশ্বর লাভের জন্য তিনি গৃহত্যাগ করে সাবাতন নামে পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন।

এই সময় দিন রাত্রি তিনি গভীর ধ্যানে অতিবাহিত করতেন। আহার করতেন গাছের ফল, কন্দ।

এই ভাবে দিন মাস বছর অতিক্রান্ত হয়ে চলল। ধীরে ধীরে তিনি স্বীয় হৃদয়ে এক পরম শক্তির উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করলেন।

দীর্ঘ দশ বছরের কঠোর তপস্যার পরে এক দিব্য ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি পরম শক্তির দর্শন লাভ করলেন।

একদিন, পাহাড়ের গুহায় ধ্যানভঙ্গ হলে এক দিব্য জ্যোতির প্রভায় চারদিক উদ্ভাসিত দেখতে পেলেন। সেই উজ্জ্বল প্রভার মধ্যে পরমেশ্বর আহুর মাজদার দিব্যমূর্তি দর্শন করে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

অতঃপর এক নতুন চেতনার উপলব্ধির মধ্যে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। অন্তরে অনুভব করলেন, মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে সত্য ও ন্যায়ের পথে নিয়ে যাবার ঐকান্তিক প্রেরণা।

এরপর তিনি আরও বহুবার আহুর মাজদার দর্শনলাভ করেছেন। লাভ করেছেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ—সত্যধর্ম প্রচারের দ্বারা লোকের কল্যাণসাধনের জন্যই তিনি নির্দিষ্ট।

প্রত্যাদেশ লাভের পর পর্বতের গুহা ত্যাগ করে তিনি নেমে এলেন লোকালয়ে। প্রথমে গেলেন আজারবাইজান। সেখান থেকে ভারতবর্ষ। পরমেশ্বর আহুর মাজদার কথা, ন্যায় ও সত্যের বাণী শোনাতে লাগলেন মানুষকে। কিন্তু কোনও জায়গাতেই মানুষ তাঁর কথা শুনতে চাইল না। উপহাস বিদ্রূপে জর্জরিত হতে হল তাঁকে।

করুণাময় ঈশ্বরের প্রেরণা ও শক্তিতে উদ্বুদ্ধ জরথুশস্ত্র তাঁর এই পরাজয়ে নিরাশ হলেন না। তিনি একের পর এক দেশ পর্যটন করতে লাগলেন সত্যধর্মের বাণী নিয়ে।

এক সময় তিনি উপস্থিত হলেন ফরগনা রাজ্যে। রাজা তাঁর সত্যধর্মের বাণী শুনলেন। কিন্তু পুরোহিতের পরামর্শে বিভ্রান্ত হলেন। জরথুশস্ত্রকে গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্র হতে লাগল।

কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে গেলেন তিনি। ফরগনা রাজ্য ত্যাগ করে আবার নামলেন পথে।

বহু ছোট বড় রাজ্য নগর অতিক্রম করলেন তিনি। কিন্তু অজ্ঞান মানুষ তাঁর উপদেশে কোথাও কর্ণপাত তো করলই না, কোথাও কোথাও নির্মম ভাবে লাঞ্ছিত হলেন।

সকল লাঞ্ছনা নির্যাতন, ব্যর্থতাকে করুণাময় আহুর মাজদার পরীক্ষা বলেই

মনে করলেন তিনি। মানুষের অজ্ঞতা দেখে তাদের প্রতি করুণায় ব্যথিত হল তাঁর হৃদয়।

অবশেষে পারস্যের (ইরানের) সীমান্তে উপনীত হলেন জরথুশস্ত্র। সামনেই বিস্তীর্ণ নদী। নদী পার হবার জন্য কিছু মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি সকলকে ডেকে বললেন, আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাদের পরপারে পৌঁছে দেব।

জরথুশস্ত্র নদীতে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ স্রোত থমকে গেল। জল নেমে এলো হাঁটুর নিচে।

স্বচ্ছন্দে নদী অতিক্রম করে ওপারে পৌঁছলেন তিনি, তাঁর সঙ্গে অন্য সকলে। অপরিচিত এই পুরুষের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে সকলে অভিভূত হল। বুঝতে পারল তিনি একজন ঐশীশক্তিসম্পন্ন সাধক। ভয়ে ভক্তিতে অনেকেই তাঁর অনুসরণ করে চলল।

দীর্ঘ দশ বছর নানা দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি উপস্থিত হলেন ইরানের সীমান্তে এক জনহীন অরণ্যসঙ্কুল স্থানে। সেখানে সত্যলাভের উদ্দেশ্যে সাধনায় লিপ্ত ছিলেন তাঁর খুড়তুত ভাই মেধিওলা। তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিল অনুগামী ভক্তের দল।

জরথুশস্ত্রের সত্য ধর্মের বাণী শুনে উদ্বুদ্ধ হলেন মেধিওলা। উপলব্ধি করলেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন জরথুশস্ত্র। তিনি দীক্ষা গ্রহণ করলেন তাঁর কাছে। মেধিওলাই হলেন জরথুশস্ত্রের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য।

সেই কালের ইরান ছিল পৌত্তলিক ধর্মের অনুগামী। জরথুশস্ত্র তাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের কথা প্রচার করতে লাগলেন। সেই সময়ে ইরানে রাজত্ব করছিলেন গুস্তাস্প নামে এক রাজা। জরথুশস্ত্রের এক-ঈশ্বর ভিত্তিক সৎধর্মের বাণী তাঁকে আকৃষ্ট করল। ধর্ম বিষয়ে নানা প্রশ্নের উত্তরে জরথুশস্ত্রের দিব্যজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তিনি আকৃষ্ট হলেন।

রাজার পুরোহিত জাক নিজের প্রতিপত্তি হারাবার আশঙ্কায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। রাজাকে তিনি বোঝালেন, জরথুশস্ত্র একজন যাদুকর মাত্র। যাদুশক্তির প্রভাবে সে রাজাকে হত্যা করে রাজ্য দখল করতে চায়।

পুরোহিতের প্ররোচনায় রাজা জরথুশস্ত্রকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ঘটল এমন এক ঘটনা যার ফলে পুরোহিত জাকের সমস্ত ষড়যন্ত্রই বানচাল হয়ে গেল।

রাজার প্রিয় ঘোড়া বেহজাদ সহসা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। কী এক জটিল রোগে রাতারাতি তার পেছনের পা দুটি তলপেটের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে লেগে গেছে।

পশুশালার চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টা করেও রোগ নির্ণয় করতে পারল না। প্রিয় ঘোড়াটি মরতে বসেছে বুঝতে পেরে রাজা খুবই বিচলিত ও দুঃখিত হলেন। এই সময় প্রহরী এসে তাঁকে সংবাদ দিল, বন্দি জরথুশস্ত্র একবার অসুস্থ ঘোড়াটাকে দেখতে চান। আশান্বিত হয়ে রাজা জরথুশস্ত্রকে তাঁর কাছে উপস্থিত করতে আদেশ দিলেন।

রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জরথুশস্ত্র বললেন, মহারাজ, আমার চারটি শর্ত যদি আপনি পালন করেন তবে আমি আপনার ঘোড়াকে সুস্থ করে তুলব।

রাজা শর্তগুলি জানতে চাইলে জরথুশস্ত্র বলেন, পুতুলপূজা ত্যাগ করে আপনাকে আমার ধর্মমত গ্রহণ করতে হবে। রাণীকেও এই ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়তঃ, খুব শীঘ্রই একটি যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে সেনাপতি হবে আপনার পুত্র আসফানদিয়ার। চতুর্থ শর্ত হল, আপনার অসাধু পরামর্শদাতাদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে।

রাজা জরথুশস্ত্রের শর্ত স্বীকার করে নিলেন। তখন ঘোড়াটিকে সুস্থ করে তুলবার জন্য জরথুশস্ত্র সর্বশক্তিমান আহুর মাজদার নিকট প্রার্থনা জানালেন। তাঁর প্রার্থনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অসুস্থ ঘোড়াটি সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

অভিভূত রাজা গুস্তাস্প ও উপস্থিত সকলে অনুভব করলেন, জরথুশস্ত্র তাঁর দেবতা আহুর মাজদার শক্তিতে শক্তিমান এক মহান পুরুষ। তিনি যথার্থই সত্য পথের পথিক।

এর পর রাজা ও রানী জরথুশস্ত্রের ধর্মমত গ্রহণ করলেন। রাজার প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই একেশ্বরবাদী নতুন ধর্মমতের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে জরথুশস্ত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগল।

জরথুশস্ত্রের প্রচারিত ধর্মমতের নাম হল মাজদায়াস্নি। সংক্ষেপে বলা হয় মাজদা ধর্ম।

মাজদা শব্দের অর্থ হল এক ঈশ্বর। আর জরথুশস্ত্রের নির্দেশ হল আহুর মাজদাই হলেন একমাত্র ঈশ্বর। তিনি ছাড়া অন্য কোন দেবতা উপাস্য নাই। তিনি সকলের সৃষ্টি ও রক্ষাকর্তা। একমাত্র মাজদার উপাসনাই মানুষের কর্তব্য।

মহাত্মা জরথুশস্ত্রের অমরবাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য ও সৎ কার্যের দ্বারা মানুষ চারিত্রিক শুচিতা লাভ করতে পারে।

ক্রোধ ও প্রতিহিংসা আত্মার সৌন্দর্যকে কলুষিত করে। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতিও অন্যায় আচরণ করতে নেই।

যারা অপরকে ভালবাসে, অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে, তারা আহুর মাজদার আশীর্বাদ লাভ করে।

তাঁর কাছে সর্বদা সৎপথে চালিত করার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। যারা নিয়মিত প্রার্থনা করে তারাই প্রকৃত উপাসক।

ধনী দরিদ্র, ছোট বড় সকলের প্রতিই আমাদের কর্তব্য সমান ভাবে পালন করা উচিত।

এই মহৎ গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, চন্দ্র, সূর্য, সমুদ্র, বায়ু—প্রভৃতির মধ্যে আহুর মাজদার মহিমার প্রকাশ। অগ্নি তাঁর জ্ঞান, জ্যোতি ও পবিত্রতার প্রতীক। তাই অগ্নির মাধ্যমে তাঁর উপাসনাই প্রশস্ত। কিন্তু অগ্নি নিজে উপাস্য নয়।

মাজদা ধর্মের অনুসারী পার্সীগণ এই কারণে অগ্নির মাধ্যমেই জগৎপ্রভু সর্বশক্তিমান আহুর মাজদার উপাসনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তারা অগ্নি উপাসক নন।

সমস্ত আবেস্তা গ্রন্থ জুড়ে রয়েছে জরথুশস্ত্রের বহু মূল্যবান উপদেশ ও আহুর মাজদার প্রশস্তি।

আবেস্তা গ্রন্থে যেসকল ধর্মীয় স্তোত্র রয়েছে তার মধ্যে প্রথম পাঁচটি সংকলন করেছেন জরথুশস্ত্র নিজে। অবশিষ্টগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা।

ইরানের রাজা একেশ্বরবাদী মাজদা ধর্মে দীক্ষিত হবার ফলে একদিকে যেমন জনসাধারণ এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তেমনি পৌত্তলিক জনসাধারণের একটা অংশ রাজার বিরোধী হয়ে উঠেছিল। এই বিরোধী গোষ্ঠীর প্ররোচনায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি বিরোধী হয়ে উঠল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল।

শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে সাহস পেলেন না রাজা গুস্তাস্প। বিশেষ করে শক্তিশালী তুরানের রাজার প্রতাপ তাঁকে ভীত করে তুলেছিল।

জরথুশস্ত্র রাজাকে সাহস দিয়ে বললেন, আহুর মাজদা স্বয়ং তাকে বক্ষা করবেন। তুরানের রাজা নিশ্চয় পরাজিত হবেন।

রাজা গুস্তাস্প পূর্বসর্ত মতো তাঁর পুত্রকে সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠালেন। রাজকুমারের বীরত্বে পর্যুদস্ত হল শত্রুবাহিনী। তুরানের রাজা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

কিছুদিন পরেই শক্তিসংগ্রহ করে তুরানের রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু এবার গুস্তাস্পের বীর পুত্রের হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হল। অন্য রাজারা যুদ্ধ করতে সাহস পেল না।

এই ঘটনার পর জরথুশস্ত্রের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বেড়ে গেল। তারা তাঁর উপদেশ শোনার জন্য ভিড় করতে লাগল।

জরথুশস্ত্র দেশে দেশে ঘুরে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে লাগলেন। সেই কালে রাজাদের অধিকাংশই ছিলেন অত্যাচারী ও স্বার্থপর। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল দুঃখ-কষ্টে ভরা। জরথুশস্ত্র তাদের শোনাতে লাগলেন কল্যাণের বাণী; জীবনে সুখী হবার উপায়।

মানুষের কাছে গিয়ে তিনি বলতেন, সৎভাবে জীবন যাপন কর, অপরকে ভালবাসো। যারা অসৎকর্ম পরিত্যাগ করে সৎ আচরণ করে মৃত্যুর পর তারা অনন্ত সুখ লাভ করে।

জরথুশস্ত্র কোন দেবদেবী উপাসনার কথা বলেননি। তাঁর মতে ঈশ্বর সমস্ত রূপের আধার, তাঁর কোন রূপ নেই।

তিনি বলতেন, আহুর মাজদাকেই ঈশ্বর রূপে উপাসনা করবে। তাহলে সমস্ত বিপদ ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাবে।

অগ্নি হচ্ছে প্রাণের প্রতীক। সমস্ত শক্তির উৎস। জরথুশস্ত্রের সাধনকালে অগ্নিই সর্বপ্রথম তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিল। তাই অগ্নিকে তিনি বলেছেন আহুর মাজদার পুত্র।

কিন্তু অগ্নি উপাস্য নয়। তাঁর অনুগামীরা অগ্নিকে উপাসনার একটি মাধ্যম রূপে পবিত্র স্থানে প্রজ্জ্বলিত করে রাখে।

কথিত আছে, জরথুশস্ত্র তাঁর তপস্যালব্ধ শক্তিবলে অসংখ্য মানুষের কল্যাণ সাধন করেছেন। বহু রোগক্লিষ্ট রোগারোগ্য লাভ করেছে, অন্ধ ব্যক্তি ফিরে পেয়েছে দৃষ্টিশক্তি। অনেক দুর্বিপাক থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন তিনি।

তাঁর শক্তিবলে গুস্তাস্প ক্রমশ ইরানের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেন। সেই সঙ্গে নতুন নতুন অঞ্চলে জরথুশস্ত্রের ধর্মমতও প্রচারিত হতে থাকে। ক্রমে সুদূর গ্রীস থেকে পূর্বভারতের প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর ধর্মমত ছড়িয়ে পড়ে।

প্রায় ৭৭ বছর বয়স পর্যন্ত পারস্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে তাঁর সত্য ধর্মমত প্রচারের পর এক পর্বতগুহায় জরথুশস্ত্র চিরসমাধি লাভ করেন।

জরথুশস্ত্রের অনুগামীদের বলা হয় পার্সী। বর্তমানে পার্সীদের সংখ্যা কমে এসেছে। কিছু সীমাবদ্ধ অঞ্চলে তারা বাস করে। ভারতবর্ষেও বহু পার্সি বসবাস করে।

মহাত্মা জরথুশস্ত্রের অমরবাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে যে পবিত্র গ্রন্থে তার নাম জেন্দ আবেস্তা। এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ রয়েছে।

এই গ্রন্থ বলে, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা আত্মাকে কলুষিত করে। পরের দুঃখ দূর করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ।

যে ব্যক্তি পরের দুঃখ দূর করে, সেই আহুর মাজদার প্রকৃত উপাসক। আত্মপ্রশংসা বিষবৎ পরিত্যজ্য। অন্যের নিকট আমরা যেরূপ ব্যবহার আশা করব, অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহারও সেই রকম করা উচিত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও প্রতিবেশীদের সুশিক্ষাদান অবশ্য কর্তব্য।

এই গ্রন্থ আরও বলেছে, জগৎপিতা আহুর মাজদার মহিমা প্রকাশ করে সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য। এরা হল তাঁর উপাসনার প্রশস্ত মাধ্যম। অগ্নির মাধ্যমেও তিনি উপাস্য।

পার্সী সমাজে হিন্দুদের মতো উপনয়ন-প্রথা প্রচলিত। নারী-পুরুষ উভয়েই উপনয়ন ধারণ করতে পারে।

মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধেও নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকলেরই সমান ব্যবস্থা। পার্সীরা মৃতদেহ পাহাড়ের ওপর অনাবৃত অবস্থায় রেখে দেয়। শকুনি প্রভৃতি মাংসভুক পাখি ওই মৃতদেহ খেয়ে নেয়। কোনরূপ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের বিধান আবেস্তা সমর্থন করেনি।

জরথুশস্ত্র নিজেই বিবাহ করেছিলেন। তাঁর মতে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। কিন্তু তিনি বহুবিবাহের নিন্দা করেছেন।

পার্সী সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি হল অভিশাপ। ফলে এই সমাজ পরিনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত।

জরথুশস্ত্রের মতে মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। সৎ বা অসৎ কর্ম অনুসারেই মানুষের গতি হয়।

পবিত্র জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের সকল উপাদানই রয়েছে। পরবর্তী যুগের বহু ধর্মগুরু জরথুশস্ত্রের পথই অনুসরণ করেছেন।

মধ্যযুগে মুসলমানদের আক্রমণে ও ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে জরথুশস্ত্রের ধর্মের প্রভাব অনেক হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু কবি হাফিজ প্রমুখ বহু মুসলিম মনীষী জরথুশস্ত্রের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

ইউরোপেও বহু মনীষী জরথুশস্ত্র ও তাঁর মহান আদর্শের প্রভূত প্রশংসা করেছেন। মহাদার্শনিক প্লেটো জরথুশস্ত্রকে বলেছেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী মানুষ।

কনফুসিয়াস

মানুষকে অসত্য থেকে সত্যে, অজ্ঞানতা থেকে প্রজ্ঞার পথে উত্তরণের জন্য জগতে যুগে যুগে যেসকল মহৎ চিন্তাবিদ দার্শনিক মানবতাবাদী মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে চীন দেশের কনফুসিয়াস অন্যতম। তাঁর আবির্ভাবের আড়াই হাজার বছর পরেও তাঁর চরিত্রের গুণাবলী ও মহৎ আবদানের কথা স্মরণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে, খ্রিস্টের জন্মের ৫৫১ বছর আগে চীনের লু রাজ্যের (শান্টং প্রদেশের অন্তর্গত) ফায়াক নগরে কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম খুঙ।

লোকগুরু রূপে খ্যাতি লাভ করার পর তাঁর নাম হয় খঙ-ফু-ৎসে অর্থাৎ শিক্ষাগুরু খঙ। এই কথার ল্যাটিন রূপই কনফুসিয়াস। এই নামেই তিনি পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন।

মহাত্মা কনফুসিয়াসের জন্মের কিছুকাল আগেই ৬০৪ খ্রিঃ পূর্বাব্দে চীন দেশে তাও ধর্মের বাণী প্রচার করে গেছেন লা-ও-ৎসে।

আমাদের ভারতবর্ষেও কয়েক বছর আগেই আবির্ভাব ঘটেছে গৌতম বুদ্ধের, ৫৬৩ খ্রিঃ পূর্বাব্দে।

চীনদেশের লু রাজ্যে বাস করতেন শ্যালোং হেউ বা লু শিয়াং নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী। সুপ্রাচীন সাং রাজবংশের অন্যতম বংশধর ছিলেন তিনি। বীরত্ব সাহস ও কৃতিত্বের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল।

পুত্রসন্তান কামনায় একাধিক পত্নীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তথাপি, কোন পত্নীর গর্ভে পুত্রের জন্ম না হওয়ায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। জানা যায়, নয়টি কন্যার পিতা হয়েছিলেন লু শিয়াং।

একবার এক গ্রাম্য পথে চলার সময় তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে এক চাষীর কুটিরে গিয়ে জল চাইলেন। চাষীর কিশোরী মেয়ে চেং সাই এসে তাঁকে জল দিল।

সুলক্ষণা মেয়েটিকে দেখে লু শিয়াং-এর মনে হল, তাঁর গর্ভে নিশ্চয়ই তাঁর পুত্র সন্তান জন্মাবে। চাষীর কাছে তিনি মেয়েটিকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলেন।

সেই গ্রামেই আত্মীয় পরিজনদের অজ্ঞাতে লু শিয়াং চেং সাইকে বিয়ে করলেন। এই বিয়ের কথা অন্য স্ত্রীরা যাতে জানতে না পারেন সেই জন্য তিনি চেং সাইকে পিতৃগৃহেই রেখে এলেন।

এই ঘটনার কয়েকমাস পরেই নিজ গৃহে অসুস্থ হয়ে পরলোক গমন করেন লু শিয়াং।

যথাসময়ে নবপরিণীতা চেং সাই একটি সর্বসুলক্ষণ যুক্ত পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। এই নবজাতক শিশু সন্তানই পরবর্তীকালে কনফুসিয়াস নামে জগতের মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেন।

লু শিয়াং নিজের পরিচয়টুকুর বাইরে হতভাগ্য চেং সাইকে অর্থ সম্পত্তি কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নি। চেং সাই কিন্তু তার জন্য মাতৃত্বের দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি।

শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে রাজধানী শহর চুফ্‌র কাছে এক গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। চরম অভাব অনটনের মধ্যে মায়ের স্নেহে যত্নে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন কনফুসিয়াস।

স্বামীর বংশ মর্যাদা ও বীরত্বের জন্য গর্ববোধ করতেন চেং সাই। শিশুবয়স থেকেই মায়ের শিক্ষায় পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন কনফুসিয়াস।

বয়স একটু বাড়লে ছেলেকে স্কুলে পাঠালেন চেং। অসাধারণ মেধা ছিল কনফুসিয়াসের। জ্ঞান অর্জনেও ছিল প্রবল আগ্রহ। তাছাড়া ধর্মবিশ্বাস ছিল তাঁর সহজাত।

স্কুলে ছাত্রশিক্ষক সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন কনফুসিয়াস। চেং সি নামে এক গুণী শিক্ষকের উপযুক্ত শিক্ষায় পনের বছর বয়সের মধ্যেই অসাধারণ বিদ্বান হয়ে ওঠেন তিনি।

সেইকালে প্রাচীন চিনে তাও ধর্মের প্রভাব থাকলেও সমাজ ছিল নানা কুসংস্কারে পূর্ণ। ধর্মের নামে লোকে নানা অসার ও যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠান পালন করত। প্রকৃতির নানা বিপর্যয়কে তারা ঈশ্বরের ক্রোধ মনে করে তা প্রশমনের জন্য বিচিত্র সব মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম করত।

দেশজুড়ে ছিল অভাব অনটন। ন্যায়নীতি, ধর্মবোধ, শান্তি শৃঙ্খলা কোথাও ছিল না। দেশের সম্ভ্রান্ত ও ধনীক শ্রেণীর নিপীড়ন অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিল দরিদ্র সাধারণ মানুষ।

এই বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিমন্ডলের গভীর প্রভাব পড়েছিল কিশোর কনফুসিয়াসের মনে। তিনি ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের কল্যাণচিন্তায় সেই বয়সেই খুব অধীর হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর মায়ের ইচ্ছা ছিল, পুত্র উপযুক্ত লেখাপড়া শিখে রাজদরবারে কোন কাজ গ্রহণ করেন এবং নিজের কর্মকৃতিত্বের মধ্যদিয়ে পিতৃপরিচয় তুলে ধরেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছায় বাধ সাধলেন অন্তর্যামী।

কনফুসিয়াসের যখন ১৫ বছর বয়স সেই সময় হঠাৎ তাঁর মা মারা যান। মা-ই ছিলেন তাঁর জীবনের সর্বস্ব। তাঁকে হারিয়ে নিদারুণ শোক পেলেন তিনি।

কিন্তু অন্তর্নিহিত জ্ঞানের বলে কনফুসিয়াস এই বিয়োগ বেদনা অল্প সময়েই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলেন।

জীবনের সকল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর অধ্যয়ন ও বিদ্যাশিক্ষা অব্যাহত রেখেছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর সংসারে বন্ধন বলতে আর কিছু রইল না। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান অর্জন। একান্ত মনে সেই কাজেই নিজেকে এবার থেকে নিবিষ্ট করলেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে সেই খ্যাতি লু রাজ্যের রাজার কানেও পৌঁছল। সেই সঙ্গে তাঁর দারিদ্র্যের কথাও জানতে পেরে কনফুসিয়াসকে শস্যভান্ডারের হিসাব রক্ষকের পদে নিয়োগ করলেন তিনি।

সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মানুষকেই এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দেওয়া হত। কর্মপ্রাপ্তির কিছুকাল পরেই ১৯ বছর বয়সে বিবাহ করেন কনফুসিয়াস।

তাঁর স্ত্রীর নাম পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তাঁদের এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মেছিল বলে জানা যায়। তবে যেহেতু পার্থিব সুখের চেয়ে জ্ঞানের প্রতিই কনফুসিয়াসের আকর্ষণ ছিল বেশি, তাঁর সংসারজীবন যে বিশেষ সুখের হয়নি তা অনুমান করা যায়।

অনেকে বলেন, স্ত্রীর সঙ্গে পরে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল। তবে অকালে স্ত্রী বিয়োগের কথাও বলেছেন অনেক ঐতিহাসিক।

কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার বলে অল্পদিনেই পদোন্নতি ঘটল কনফুসিয়াসের। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই তিনি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান করতেন। নানা স্থানে ছুটে যেতেন।

একসময়ে গুপ্তবিদ্যা বিষয়ক দুটি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পান তিনি। দুটির মধ্যে একটি পুঁথির নাম ইচিং। কথাটির অর্থ পরিবর্তনের ধারা।

এই পুঁথিগুলিতে মোট চৌষট্টিটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে জগতের পরিবর্তনের ধারা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতীত ও বর্তমান সহ ভবিষ্যৎ বিষয়েও নানা কথা ছিল তাতে। স্বভাবতই গুপ্তবিদ্যা বিষয়ের এই পুঁথি কনফুসিয়াসের মনোযোগ আকৃষ্ট করল।

দ্বিতীয় পুঁথির নাম শিচিং। এটি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার সংকলন। ছন্দবন্ধ-গীতিময় কবিতার মাধ্যমে এতে চীনদেশের রাজবংশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

এই সকল কবিতা পাঠ করে কনফুসিয়াসের মনে হল, সুর বসিয়ে এগুলিকে গান হিসাবে তিনি গাইবেন।

কিন্তু সংগীত বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা তাঁর ছিল না। তাই একজন প্রবীণ সংগীত শিক্ষকের কাছে কিছুকাল সংগীত শিক্ষা করে পুঁথির কবিতাগুলিকে গান হিসাবে গাইতে আরম্ভ করলেন।

গানগুলি রচয়িতার নাম কেউ জানত না। কিন্তু গভীর আন্তর অনুভূতির বলে রচয়িতার সত্যকার পরিচয় কনফুসিয়াসের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি তাঁর সংগীত গুরুকে জানালেন, এসকল গান রচনা করেছেন রাজা ওয়েন।

তিনি আরো জানালেন, রাজা ওয়েন ছিলেন দীর্ঘদেহী পুরুষ, ময়লা গায়ের রং। মন ছিল উদার।

সংগীত শিক্ষক বংশানুক্রমিক শিক্ষার ফলে এই গোপন তথ্য জানতেন। তাই কনফুসিয়াসের কথা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন।

কনফুসিয়াসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় এই সংগীত শিক্ষকই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

এই সংগীত শিক্ষক ছিলেন যথার্থ পন্ডিত ও গুণী ব্যক্তি। কিন্তু অন্ধ। গুরুর প্রতি কনফুসিয়াসের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল অটুট। পরবর্তীকালে তিনি যখন দেশবিখ্যাত জ্ঞানী বলে সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন, তখনও কোন অন্ধগায়ক বা সংগীত শিক্ষককে দেখলেই তাঁকে সম্মান জানাতেন। এমনই ছিল তাঁর চারিত্রিক উদারতা ও মহত্ত্ব।

রাজ সরকারে শস্যভান্ডারের হিসাব রক্ষকের কাজ দিয়ে কর্মজীবন শুরু হয়েছিল কনফুসিয়াসের। পরে তাঁকে দেওয়া হল গবাদিপশুর তত্ত্বাবধান ও রক্ষণা-বেক্ষণের কঠিন দায়িত্ব। সেই সময়ে তিনি একুশ বছরের তরুণ।

এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বের কাজ পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারেননি কনফুসিয়াস। কেননা, একটি আদর্শ দেশ গঠনের রূপকল্প এতদিনে তিনি নিজের মনে ছকে ফেলেছিলেন।

সেই লক্ষ্য রূপায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল দেশের শাসনব্যবস্থা ও ধর্মীয় আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণ। সেই ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত তিনি মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না।

এই সময়ে সুযোগ পেলেই তিনি শহরে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের অবস্থা সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতেন। পর্যালোচনা করতেন প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক শাসনব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি।

সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, অভাবঅনটন, ধর্মীয় পুরুষদের অনাচার, সম্ভ্রান্ত সমাজের স্বেচ্ছাচার দেখে তিনি অসহনীয় মানসিক পীড়া বোধ করতেন।

সেইকালে চিনের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। দেশে তখন চু বা চাউ বংশীয় সম্রাটদের রাজত্ব। প্রজাশাসন ভুলে সম্রাট বিলাস-ব্যসনেই মত্ত। সেই সুযোগে সামন্ত রাজারা স্বাধীন হয়ে ওঠার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সমগ্র দেশ। স্বৈরাচারী সামন্ত রাজারা পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত। ফলে শাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, জনজীবন বিধ্বস্ত। কোথাও শান্তি শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই।

এই অবস্থার মধ্যে থেকে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গভীর চিন্তার বলে কনফুসিয়াস উপলব্ধি করতে পারলেন, কেবলমাত্র শিক্ষার অভাবেই দেশের এই সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা। শৃঙ্খলাই ঈশ্বরের বিধান। তাই বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে ধ্বংস। মানুষের বিবেকবোধ, নীতিবোধ জাগরিত হলে দূর হবে এই বিষাক্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা। আর প্রকৃত শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাগতে পারে বিবেকবোধ। ধর্মীয় চেতনা।

নিজের উপলব্ধি, ভাবনা চিন্তা নিয়ে তিনি রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এই ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দূর দূরান্তে। ছাত্ররা দলে দলে তাঁর কাছে শিক্ষা লাভের জন্য আসতে লাগল।

চাকরি ত্যাগ করে কনফুসিয়াস জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাদের নীতিবোধ ও মুক্তবুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সুব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তোলার কাজকেই তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলেন।

তাঁর ছাত্র নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল বিচিত্র। সমাজের সকল স্তরের মানুষই তাঁর শিষ্য হতে পারত। কিন্তু যারা সৎ পরিশ্রমী ও চরিত্রবান দরিদ্র হলেও তাদের তিনি আগ্রহের সঙ্গে শিক্ষা দিতেন।

ছাত্ররা যাতে নিজেদের অন্তরের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি প্রাণপাত করতেন।

শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কনফুসিয়াস মহাজ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে দেশের মানুষের সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করলেন।

কিন্তু এত কিছুর পরেও দেশের কোন রাজদরবার তাঁর উপদেশ বা পরামর্শের জন্য উৎসাহিত হয়নি। অভিজাত মানুষেরাও বিত্তহীন বলে তাঁর উপদেশ ও শিক্ষায় বিশেষ কর্ণপাত করত না।

অর্থ প্রতিপত্তিবিহীন কনফুসিয়াসের জীবনযাত্রাও ছিল অতি সাধারণ। তদুপরি তিনি ছিলেন অনেকটাই কুৎসিতদর্শন। অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহ, চওড়া মুখ ও নাক, বিশালাকৃতির মাথা মিলিয়ে তিনি ছিলেন বিরূপ-দর্শন পুরুষ।

তার ওপরে পিঠ ছিল কচ্ছপের মতো। হাঁটতেও পারতেন না স্বচ্ছন্দ গতিতে। হাঁটার সময় হাতদুটি পাখির ডানার মতো দুপাশে ছড়িয়ে থাকত।

পন্ডিত বিজ্ঞ বলে মুখে স্বীকার করলেনও এমন একটি বিকৃত-দর্শন দরিদ্র মানুষের উপদেশ যাচ্ঞা করতে স্বভাবতঃই অভিজাত সম্প্রদায় কুণ্ঠা বোধ করতেন।

ইতিমধ্যে আকস্মিক একটি ঘটনায় অভিজাত শ্রেণী কনফুসিয়াসের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

কনফুসিয়াস বাস করতেন রাজধানী চু ফু শহরে। সেখানে অভিজাত সমাজের প্রধান ছিলেন বৃদ্ধ মেং। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পুত্রদের বলে যান তারা যেন অবিলম্বে কনফুসিয়াসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে। তিনি কেবল মহাজ্ঞানী নন, মহা ধার্মিক।

বৃদ্ধ মেং-এর পুত্ররা কনফুসিয়াসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর থেকে অভিজাত

সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময় পর্যন্ত ৩৮০০ জন ছাত্র তাঁকে শিক্ষাগুরু বলে স্বীকার করেছিলেন।

ইতিমধ্যে লু রাজ্যে দেখা দিল সামরিক বিপর্যয়। প্রতিবেশী দেশের আক্রমণের ফলে কনফুসিয়াস দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি পার্শ্ববর্তী সি রাজ্যের রাজা চিং-এর আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

রাজা চিং তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁকে বসবাসের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। রাজা চিং পরে রাষ্ট্রনৈতিক অনেক বিষয়েই কনফুসিয়াসের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এখানে দীর্ঘ সাত বৎসর তিনি অবস্থান করেছিলেন।

সেই সময় চিং রাজবংশের এক কর্মচারী, তার নাম ইয়ং হু, কূটকৌশলে রাজাকে বিতাড়িত করে শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। কূটবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার বলে অল্প সময়ের মধ্যেই সে পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্য দখল করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ইয়াং হু মহাজ্ঞানী কনফুসিয়াসের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাবান। সে তাঁকে রাজ্যের মন্ত্রীপদে আমন্ত্রণ জানান।

কনফুসিয়াস জানতেন এই নতুন রাজা তার প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাছাড়া সে পররাজ্য লোভী। রাজ্য পরিপালন করার মতো কোন মহৎ গুণও তার মধ্যে ছিল না। এমন নীতিহীন হীন চরিত্রের মানুষকে কোনও ভাবেই সাহায্য করতে চাইলেন না তিনি। প্রত্যাখ্যান করলেন ইয়াং হুর আহ্বান।

ক্ষমতালাভ করেও কনফুসিয়াসের প্রতি শ্রদ্ধাবনত ছিলেন ইয়ং। তাই তাঁর প্রত্যাখ্যানে রুষ্ট না হয়ে একাধিকবার মন্ত্রীপদ গ্রহণ করবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

সাধারণ মানুষের দুঃখমোচন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপনের স্বার্থে কোন রাজ্যের উচ্চ পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল কনফুসিয়াসের। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন একজন আদর্শহীন শাসকের অধীনে থেকে স্বাধীন ভাবে রাজ্যের উন্নয়ন সাধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। তাই তিনি বার বার ইয়ং-এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

দীর্ঘ সাত বছর পরে লু রাজ্যের তরুণ সামন্ত রাজা তিং কনফুসিয়াসের কাছে প্রধানমন্ত্রী পদের আমন্ত্রণ পাঠালেন। রাজা তিং-এর সশ্রদ্ধ আহ্বান গ্রহণ করলেন কনফুসিয়াস।

তাঁবই তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে তারপর থেকে রাজ্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কাজ চলতে লাগল।

এতদিন পরে নিজের স্বপ্ন রূপায়নের সুযোগ পেলেন কনফুসিয়াস। তাঁর

উপযুক্ত পরিচালনা ও পরামর্শে অল্পদিনেই লু রাজ্যে সকল দিকে সুস্থিতি এল। শস্য উৎপাদন ও রাজস্ব বৃদ্ধি পেল। প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেরও উন্নতি হল।

লু রাজ্যের উন্নতিতে অল্পদিনেই প্রতিবেশী রাজারা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। তারা রাজা তিং ও প্রধানমন্ত্রী কনফুসিয়াসকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল।

তাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা দূরদর্শী কনফুসিয়াস চর মারফত আগেই জানতে পারলেন এবং কৌশলে শত্রুদের সব আয়োজন পণ্ড করে দিলেন। লু রাজ্যেও যেসকল রাজকর্মচারীর আনুগত্যের অভাব ছিল, তাদের অপসারিত করে রাজা তিং-এর প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের নিয়োগ করলেন।

সামন্ত রাজারা যাতে শক্তিশালী হয়ে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে কনফুসিয়াস তাদের অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা সীমিত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তিনি জানতেন মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ নীতিবোধ জাগরিত না হলে তাদের জীবন ও আচরণ হয়ে পড়বে বিশৃঙ্খল ও অসংযত। আইনের শাসনে মানুষের চরিত্রের উন্নতি বিধান করা যায় না।

সেই কারণে তিনি জনগণের নীতিবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য নানা উপদেশ দিতেন। তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

কনফুসিয়াসের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সমগ্র চীন দেশের মধ্যে লু রাজ্য হয়ে উঠেছিল শান্তিসুখের স্থান। অধিবাসীরা সেখানে নির্ভয়ে ও নিরাপদে বাস করতে পারত।

কনফুসিয়াস মানুষকে যে সব ধর্মীয় উপদেশ দিতেন, নিজের জীবনেও তা সর্বাংশে পালন করতেন। রাজা তিংকেও তিনি সংযত জীবন যাপনের অনুবর্তী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কনফুসিয়াস বলতেন, একমাত্র আদর্শ রাজাই তার প্রজাদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন।

কনফুসিয়াসের সৎ উপদেশ ও শিক্ষায় রাজা তিং জীবনচলনায় নীতিঅনুবর্তী হলেও একদিন শিকার যাত্রায় তাঁর চারিত্রিক স্খলন ঘটল। এই সংবাদ জানতে পেরে মর্মাহত কনফুসিয়াস তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে লু রাজ্য ত্যাগ করে চলে যান।

কয়েকজন মাত্র অনুগত শিষ্য এই সময় তাঁর অনুগমন করেছিলেন।

পথে ওয়ে রাজ্যে এক ছাত্রের বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি আবার পথ চলতে লাগলেন। যখন যে রাজ্যে যান, সেখানকার রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে প্রাসাদে নিয়ে যান। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর উপদেশ ও মতামত শোনেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোন রাজাই তাঁর উপদেশকে শাসনব্যবস্থায় প্রয়োগ করতেন না।

এ সব ঘটনা থেকে কনফুসিয়াস উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করবার উপযুক্ত মানুষ কোথাও নেই।

কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিতে থাকেন।

কনফুসিয়াস তাঁর যাত্রাপথে প্রাচীন পুঁথির সন্ধান করতেন। পেলে মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। তিনি সারাজীবন ধরেই জ্ঞানের সন্ধান করেছেন। যেখানে যেমন সুযোগ পেয়েছেন, জ্ঞান আহরণ করেছেন।

জ্ঞান অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে মানুষের হৃদয়কে কলুষমুক্ত করে। তাই তিনি তাঁর ছাত্রদেরও জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দিতেন।

তিনি বলতেন, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল দয়া ও ত্যাগ। জীবমাত্রই ঈশ্বরের সন্তান। অপরের প্রতি যখন মানুষের হৃদয়ে দয়া ও ভালবাসার জাগরণ হবে তখনই সে হয়ে উঠবে প্রকৃত মানুষ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে সে হবে ধন্য।

অর্থের লালসা মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

একসময় কনফুসিয়াস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে উপস্থিত হলেন চেন রাজ্যে। সেখানে তখন ঘোর অরাজক অবস্থা।

জনগণের দুরবস্থা দেখে তাঁর মনে পড়ল লু রাজ্যের কথা। সেখানে নিজের নীতি ও আদর্শকে রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁকে গ্রহণ করতে পারল না।

একদিন কনফুসিয়াস শিষ্যদের নিয়ে পথে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় তিনখানি রথে চেপে লু রাজ্যের তিন রাজকর্মচারী সেখানে উপস্থিত হল। তারা কনফুসিয়াসকে অভিবাদন করে জানাল, মহামান্য রাজার আদেশে তাঁরা গুরু কুংকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

লু রাজ্যের রাজা ও রাজকর্মচারীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, বহু ভাগ্যবলে কনফুসিয়াসের মতো উপদেষ্টা তারা পেয়েছিল। রাজ্য পরিচালনায় কনফুসিয়াসের উপদেশ অপরিহার্য।

শিষ্যদের নিয়ে আবার লু রাজ্যে ফিরে এলেন কনফুসিয়াস। রাজা ও অন্যান্যরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

কনফুসিয়াস সশিষ্য লু রাজ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। রাজা তাঁর পরামর্শ মতো রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই লু রাজ্যের দুরবস্থার অবসান ঘটল। প্রজাদের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এল।

রাজ্যশাসনের ব্যাপারে কনফুসিয়াস যে সব উপদেশ দিতেন সেগুলো হলো—

(১) দেশের রাজা হবে সৎ ও আদর্শবান। রাজা যদি ন্যায়ের পথে চলে তাহলে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

(২) রাজা গরীবদের দেখাশোনার সঙ্গে বৃদ্ধ ও অশক্তদেরও সাহায্য করবে।

(৩) যোগ্যতা অনুযায়ী প্রজারা যাতে কাজ করতে পারে রাজাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৪) রাজ্যের প্রতিটি জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে।

(৫) উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিদের ওপর নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করতে হবে।

(৬) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। নিয়মিত সময়ে পুরনো রাস্তা ও সাঁকো ইত্যাদির মেরামত করতে হবে। এসব কাজ তদারকির জন্য কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

(৭) দেশের সর্বক্ষেত্রেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ধনী বা দরিদ্র কোনও প্রজাই যাতে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সময়ে সময়ে রাজাকে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে উপদেশ নির্দেশ দেবার প্রয়োজন হলেও কনফুসিয়াস বেশিরভাগ সময়ই ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তবে শিষ্যদের উপদেশ দিতেন নিয়মিত।

বয়স বাড়ছিল তাঁর। শরীরও ভেঙ্গে পড়ছিল। একদিন কনফুসিয়াস তাঁর শিষ্যদের কাছে ডাকলেন। সময়টা ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৯ অব্দ। শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, আমার এবার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। তোমরাই আমার শেষকৃত্য সম্পন্ন করবে। কোনও আড়ম্বর করবে না। তাহলে আমার ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথে বাধা পড়বে।

এর পরেই সমাধিস্থ হন তিনি এবং সেটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ সমাধি অবস্থা।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শিষ্যরা কনফুসিয়াসের শেষকাজ সম্পন্ন করল। তাঁর সমাধিস্থলে মন্দির তৈরি করা হল। মন্দিরের পাশে কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করে শিষ্যরা বাস করলেন দীর্ঘ তিন বছর।

প্রাচীন পৃথিবীর ধর্মউপদেষ্টাদের অন্যতম কনফুসিয়াস নতুন কোন মতবাদ বা ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেননি। সময়ানুগ বিচারে পুরনো রীতিনীতির সংস্কার করেছিলেন তিনি।

মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলতেন, মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি হল,

সততা, পবিত্রতা, ভালবাসা, দয়া ও জ্ঞান। এই গুণই মানুষকে দেবত্ব দান করে। কনফুসিয়াসের মধ্যে এই সমস্ত গুণেরই সমবেশ ঘটেছিল।

নতুন কোনও ধর্মমত প্রতিষ্ঠা না করেও প্রচলিত ধর্মীয় জীবনে কনফুসিয়াস ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন ধর্মবিপ্লবী।

রামতনু লাহিড়ী

বঙ্গদেশের নতুন যুগের অন্যতম অগ্রনায়ক ডিরোজিওর অনুগামী ইয়ংবেঙ্গল দলের অন্যতম ও প্রথম যুগের কৃতকর্মা শিক্ষাবিদ, মুক্তবুদ্ধি সমাজকর্মী রামতনু লাহিড়ী। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত লাহিড়ী পরিবারের সন্তান। সেইকালে নানা সৎকর্ম ও সদাশয়তার জন্য এই বংশের সুখ্যাতি ছিল।

১৮১৩ খ্রিঃ নদীয়া জেলার বারাইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে রামতনুর জন্ম। তাঁর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও পরোপকারী মানুষ। রামতনুর মাতা জগদ্ধাত্রী দেবী ছিলেন সাধ্বী স্বাধীনচেতা মহিলা।

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী কাজ করতেন নবদ্বীপের রাজসরকারে লালাবাবুদের অধীনে। এতবড় এস্টেটের ম্যানেজারের পদে থাকলেও কখনো অসৎ পথ অবলম্বন করেননি তিনি। তাই সামান্য উপার্জনের দ্বারাই তাঁকে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হত।

জগদ্ধাত্রী দেবী সত্যপরায়ণ স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান রাধাকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যা। ধনী ঘরের মেয়ে হয়েও, তিনি স্বামীর সংসারের দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন।

পরিবারের এই পরিমন্ডলেই বড় হয়ে উঠেছেন রামতনু। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

রামকৃষ্ণ তাঁর ছেলেদের লেখাপড়ার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। পাঁচবছর বয়সেই হাতেখড়ি দিয়েছিলেন রামতনুর। তাঁর তত্ত্বাবধানেই রামতনুর ফারসী ও ইংরাজী শিক্ষা চলত।

বালক রামতনু ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে জুটিয়ে প্রায়ই নানা দুষ্টুমীতে মেতে উঠতেন।

সেইকালে কৃষ্ণনগরে নানা কাজেই দূর দূর অঞ্চল থেকে লোকে ঘোড়ায় চড়ে বা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আসত। সেই সব ঘোড়া মাঠে চরত।

রামতনু সঙ্গীদের নিয়ে সুযোগ পেলেই ঘোড়ার পিঠে চাপবার চেষ্টা করতেন। এই ভাবে ঘোড়ায় চড়ার নেশায় মেতে পড়াশুনাতেও তিনি যথেষ্ট অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন।

তাছাড়া ওই বয়সেই নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশে তাঁর মন বহির্মুখী হয়ে উঠছিল।

ছেলের মতিগতি পিতা রামকৃষ্ণের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি রামতনুকে কৃষ্ণনগরে না রেখে কলকাতায় চেতলায় তাঁর বড় ছেলে কেশবচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কাজ করার সুবাদে কেশবচন্দ্রকে কলকাতায় একাই থাকতে হত। কাজেই তিনি কাজে বেরিয়ে গেলে সারা দিন রামতনু বাসায় একাই থাকতেন।

দাদার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া চললেও তাঁর অবর্তমানে রামতনু স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার সুযোগ পেতেন।

সেইকালের কলকাতায় চেতলা হাট চালের কারবারের জন্য বিখ্যাত ছিল। দূর দূর অঞ্চল থেকে টালিনালা পথে অসংখ্য নৌকা বোঝাই হয়ে সেখানে মাল আসত। ফলে নানা শ্রেণীর লোকের সমাবেশ চেতলায় লেগেই থাকত। তাদের সংস্রবে এসে পাছে ছোট ভাইটি বিপথগামী হয়ে পড়ে, সেই অশঙ্কাতেই কেশবচন্দ্রকে সর্বদা শঙ্কিত থাকতে হত।

শেষ পর্যন্ত তিনি রামতনুকে অন্যত্র রেখে ইংরাজি স্কুলে পড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কৃষ্ণনগরে থাকতেই ফারসীর সঙ্গে ইংরাজি কিছুটা পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন রামতনু। দাদার কাছে পড়াশোনা করে তাঁর ইংরাজী জ্ঞান ও হাতের লেখা অনেকটা সড়গড় হয়েছিল।

বাংলায় ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম পথিকৃত সমাজসেবী ডেভিড হেয়ার সাহেব সেই সময় নিজেই স্কুল খুলে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে বিনা বেতনেও অনেক ছাত্র পড়ালেখার সুযোগ পেত। কেশবচন্দ্র হেয়ার সাহেবের স্কুলেই ছোট ভাইকে ভর্তি করাবার মনস্থ করলেন।

সুযোগ একটা জুটেও গেল কিছুদিনের মধ্যে।

কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সেই সময়ে হাতিবাগানে থাকতেন। হেয়ার সাহেবের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। তাঁকে ধরেই রামতনুকে একদিন হেয়ার সাহেবের কাছে পাঠানো হল।

গৌরমোহন অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে রামতনুকে তাঁর স্কুলে নেবার জন্য

হেয়ার সাহেবকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সেই সময় ছাত্র ভর্তির এমনই চাপ ছিল যে সাহেবের পক্ষে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হল না।

সেই সময় ছেলেদের তাঁর স্কুলে নেবার জন্য বহু লোকই হেয়ার সাহেবকে নানাভাবে পীড়াপীড়ি করত। সুস্থ ভাবে তাঁর পথ চলারও উপায় ছিল না অভিভাবকরা কিংবা ছেলেরা তাঁর পাল্কীর সঙ্গে চলতে চলতে ক্রমাগত কাকুতি মিনতি করতে থাকত।

অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলেও গৌরমোহন কিন্তু নিরাশ হলেন না। তিনি কেশবচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন, রামতনুকে অন্য অনেক বালক যেমন করে থাকে. তেমনি হেয়ার সাহেবের পাল্কির পাশে পাশে ছুটতে হবে। তাতে সাহেবের মন নরম হবে, তিনি যে করে হোক একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বালক রামতনু একদিন চেতলা থেকে হাতিবাগানে গৌরমোহনের বাসায় চলে গেলেন।

সেখান থেকে তিনি প্রতিদিন হেয়ার সাহেবের পাল্কির পাশে পাশে ছুটে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করবার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন।

পরিবেশ পরিস্থিতি দেখেশুনে ততদিনে রামতনুরও ঝোঁক চেপে গেছে। যে করে হোক হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ করে নিতে হবে এই সঙ্কল্পে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

হেয়ার সাহেবের পাল্কি ধরার জন্য তিনি প্রতিদিনই সকালে বাড়ি থেকে বার হতে লাগলেন। এই করতে গিয়ে প্রায় দিনই তাঁকে অনাহারে কাটাতে হত।

নানা কাজে হেয়ার সাহেব শহরের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। দুপুরে বাসায় ফিরে আসতেন।

বাসায় ফিরে একদিন পাল্কি থেকে নেমেই দেখেন সামনে দাঁড়ানো রামতনু। পাল্কির সঙ্গে ছুটে ছুটে ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থা। মলিন মুখ দেখেই তিনি বুঝলেন ক্ষুধাতৃষ্ণায় বালক রামতনু খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন।

সেদিন রামতনুকে ডেকে সাহেব বাড়িব পাশের মিষ্টির দোকান থেকে পেট ভরে তাঁকে খাইয়ে দিয়েছিলেন।

এই ভাবে একদিন দুদিন নয় টানা দুমাস পাল্কির সঙ্গে ছোটার পর রামতনুর বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ দেখে হেয়ার সাহেব আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁকে তাঁর কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলে অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে ভর্তি করে নিলেন।

এই ঘটনা বালক রামতনুর জীবনে এক স্থায়ী ছাপ এঁকে দিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভাল কিছু অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। নিরন্তর চেষ্টা কখনো বিফল হয় না।

বলাবাহুল্য সেই ঘটনার পর থেকেই দুরন্ত-স্বভাব বালক রামতনুর জীবনের ধ্যানধারণা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পথ খুঁজে পেল। তিনি পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

কলুটোলা স্কুল থেকে রামতনু দু'বছর পর বৃত্তি পেয়ে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন।

পড়াশুনার কৃতিত্ব ও চরিত্রগুণে রামতনু হেয়ার সাহেবের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। একবার তিনি ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হলে হেয়ার সাহেবই তাঁর চিকিৎসার ভার নেন।

১৮৩২ খ্রিঃ রামতনু হিন্দু কলেজে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ষোলটাকা বৃত্তি পেলেন। বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ দানের জন্য সেইকালে কৃতী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হত। বৃত্তির টাকাতেই সারা বছর তাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হত। ষোলটাকা বৃত্তি পেয়ে রামতনু স্বভাবতই পরিবারের প্রতি কর্তব্যসচেতন হয়ে উঠলেন।

তিনি ছোট দুই ভাই রাধাবিলাস ও কালীচরণকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

তিন জনের খাইখরচ ও ঘরভাড়া ওই বৃত্তির টাকাতেই কষ্টেসৃষ্টে সঙ্কুলান করতে হত।

ফলে রান্না খাওয়ার সব কাজই নিজেদের হাতে সারতে হত। দু'বেলা খাবার ছাড়া অন্য কিছু জুটত না।

অনেক সময়ই পাল্টাপাল্টি করে তিন ভাইকে পোশাক পরতে হত। পায়ে জুতো ছিল না কারোরই।

কিন্তু তাতেও সব দিক সামাল দেওয়া যেত না। বাধ্য হয়ে তখন বন্ধুদের কাছে কিংবা হেয়ার সাহেবের কাছে ধারের জন্য রামতনুকে হাত পাততে হত।

এইভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেই রামতনু বঙ্গভারতীর কৃপালাভের সাধনা করেছেন।

১৮৬২ খ্রিঃ কলকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষকপদে বৃত হয়েছিলেন তরুণ ডিরোজিও। তিনি পড়াতেন ইতিহাস ও ইংরাজি সাহিত্য। অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রদের হৃদয় জয় করে তাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন।

সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী এই মহান শিক্ষকের শিক্ষা ও সাহচর্যে বেড়ে ওঠা ছাত্ররাই পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতের প্রগতিমূলক আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

শিক্ষাগুরু ডিরোজিও ছিলেন নব্য বঙ্গের দীক্ষাগুরু। তিনি ক্লাশে বিখ্যাত

মনীষীদের রাজনৈতিক দর্শনের প্রচার ও ব্যাখ্যা করে ছাত্রদের জ্ঞান যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার ভিত্তি গড়ে দিতেন।

হিন্দুস্কুলে পড়ার সময় রামতনু মহাত্মা ডিরোজিওর সংস্রবে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ডিরোজিওর অনুগামী ছাত্রদের অন্যতম হয়ে উঠলেন।

ডিরোজিও তাঁর শিষ্য-ছাত্র রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ ও অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই সভায় জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, অদৃষ্টবাদ, নাস্তিকতা, আস্তিকতা, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান সামাজিক নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় হত। এটিই ছিল আমাদের দেশে ছাত্রদের প্রথম আলোচনা সভা বা ছাত্র সংগঠন।

হেয়ার সাহেব ছাড়াও দেশের জ্ঞানী গুণী বিখ্যাত ব্যক্তিরা সুযোগ মতো উপস্থিত থেকে ছাত্র-শিক্ষকের আলোচনায় যোগ দিতেন। তাঁদের উপস্থিতি ছাত্রদের জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারে সহায়তা করত।

ডিরোজিওর উপযুক্ত শিক্ষায় রামতনুর স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ও সংস্কারমুক্ত চেতনার উন্মেষ হয়। তিনি ডিরোজিওর অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম রূপে পরিচিত হলেন।

১৮৩৩ খ্রিঃ রামতনুর কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হল। সঙ্গে সঙ্গেই কর্মজীবনে প্রবেশেরও সুযোগ পেয়ে গেলেন। হিন্দু কলেজেরই জুনিয়র শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন তিনি।

হেয়ার সাহেবের সাহায্য সহযোগিতাতেই লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন রামতনু। পেয়েছিলেন মাতৃস্নেহের স্পর্শ। ১৮৪২ খ্রিঃ এই পরহিতব্রতী মহাত্মার মৃত্যু হলে আপনজন হারানোর শোক পেলেন তিনি।

অল্প সময়ের ব্যবধানেই পর পর কয়েকটি শোকাবহ ঘটনা এই সময়ে তাঁর জীবনে ঘটে যায়।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাবিলাস অকালে আগেই গত হয়েছিলেন। বড় ভাই কেশবচন্দ্রও ইহধাম ত্যাগ করলেন। সম্মুখ কর্তব্য দায়িত্বের আহ্বানে সমস্ত শোকই তিনি প্রবল মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে সামলে উঠতে সক্ষম হলেন।

সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এবার তাঁকেই তুলে নিতে হল। কৃষ্ণনগরে বৃদ্ধা মাতার অসুখে বিসুখে ভাল চিকিৎসা হচ্ছিল না। মাকে সুস্থ করে তুলবার জন্য কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে এলেন এবং তাঁর উপযুক্ত সেবাযত্নে নিযুক্ত হলেন।

সাংসারিক জীবনেও রামতনুকে অনেক ঝড়ঝাপটা সইতে হয়েছে। সেইকালের রীতি অনুযায়ী হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছিল।

বছর কয়েক পরে সেই পত্নী মারা যান। তাঁর দ্বিতীয় বিবাহও সুখের ছিল না। তীব্র মানসিক অশান্তি সেই সময় তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল।

বাধ্য হয়ে রামতনুকে তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে হয়েছিল। এই বালিকা বধূকে নিয়েই তিনি কলকাতায় সংসার পেতেছিলেন।

অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে হয়েও সাধ্বী মাতাকে সারাজীবন দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সইতে দেখেছেন রামতনু। দরিদ্র স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য কোনও অবস্থাতেই কোনও দিন তিনি পিতৃগৃহের মুখাপেক্ষী হননি।

স্বামীভক্তি, সততা, তেজস্বিতা ও স্নেহের প্রতিমূর্তি মাতাকে রামতনু সর্বদাই দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করেছেন। তাই অসুস্থা জননীকে নিজের কাছে এনে মাতৃসেবার কোনও প্রকার ত্রুটি রাখেননি।

কলেজের কাজের সময়টুকুর বাইরে সকল সময়েই তিনি মাতার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকতেন। নিষ্ঠা সেবা ও ভক্তিতে তাঁর বালিকা স্ত্রীও ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী।

তাঁদের প্রাণপাত সেবাযত্নের পরেও জননীর রোগ ভাল হল না। কিছুকাল রোগভোগের পর কলকাতাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

১৮৪৬ খ্রিঃ রামতনুর কর্মস্থলের পরিবর্তন ঘটল। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন তিনি।

উদারহৃদয় ছাত্রদরদী হেয়ার সাহেবের স্নেহধন্য এবং ডিরোজিওর মতো ছাত্রবৎসল আদর্শ শিক্ষকের সুযোগ্য ছাত্র রামতনু। শিক্ষাগুরুর আদর্শেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে। শিক্ষাদানে ও ব্যবহারে ডিরোজিওকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করতেন সর্বদা।

যথাযথ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রামতনু ছাত্রদের পড়াতেন প্রাণমন ঢেলে। তাদের সঙ্গে মিশতেন বন্ধুর মতো। কলেজের মাঠে খেলায় সঙ্গ দিতেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক।

কেবল ছাত্রদের শিক্ষাদানের মধ্যেই একজন আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য শেষ হয় না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমাধুর্য তাঁর শিক্ষাদানব্রতের অনুসারী হয়ে যখন ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা জাগানোর সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠন ও নীতি উন্নত করার সহায়ক হয়ে ওঠে তখনই তাঁকে আদর্শ শিক্ষক অভিধায় ভূষিত করা চলে।

রামতনু ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। সততা, তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ।

শিক্ষাগুরুর আসনে থাকলেও তিনি ছাত্রদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতেন, তাদের মধ্যে বিচারবোধ উন্নত করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতেন।

ক্লাশে পাঠ্য বিষয়ের সূত্র অনুসরণ করে তিনি পাঠ্য বিষয়ের বাইরের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তাতে ছাত্ররা পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কেও আগ্রহী হয়ে উঠত।

রামতনু সমস্ত বিষয়ই এমন বিস্তারিত ভাবে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন যে তাদের অমনোযোগী হবার সুযোগ থাকত না।

স্বদেশের প্রচলিত রীতিনীতি, কুসংস্কার, জাতিভেদ, ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা ও অহেতুক বাড়াবাড়ি ইত্যাদি বিষয়েও ছাত্রদের মধ্যে বিচারবোধ ও স্বাধীন চিন্তা জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করতেন রামতনু। আন্তরিক ভাবেই তিনি মানুষ গড়ার দায়িত্ব প্রতিপালন করতেন। শিক্ষাগুণে ও ব্যক্তিত্ব প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্ররা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত হয়ে পড়ত।

সেই সময় কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন তুমুল আলোড়ন তুলেছে। তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের নানা প্রান্তে। সংস্কারবাদী নব্য সম্প্রদায় ও সমাজের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী দল তীব্র বাদানুবাদে লিপ্ত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও কঠোর শ্রমে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রানুমোদন স্বীকৃত হয়েছে।

একসময় কৃষ্ণনগরেও বিধবা বিবাহ নিয়ে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল। শহরের প্রগতিপন্থীরা এই সময়ে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি সভার আয়োজন করে জানালেন, বিধবা বিবাহ প্রচলনে তাঁরা সকল প্রকার সাহায্য দানের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই সুযোগে রটনা করল যে ধর্মবিরোধী নব্য দল সভাসমাবেশের নাম করে নিষিদ্ধ মাংস ও সুরা পানের আয়োজন করেছে।

এই অপপ্রচারের ফলে চাবদিকে ক্ষোভের সৃষ্টি হল। কলেজের অধ্যক্ষকে সভা করার অনুমতি দেবার জন্য সমাজপতিদের ধিক্কার শুনতে হল। প্রগতিপন্থী রামতনুও এই দুঃখজনক ঘটনার আঁচ থেকে রক্ষা পেলেন না। আত্মীয়-স্বজনের তিরস্কার ও সামাজিক নির্যাতন তাঁকে যারপর নাই বিব্রত করে তুলল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হলেন কৃষ্ণনগরের বাস উঠিয়ে দিতে। এই সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটে। তাঁর প্রথম শিশু সন্তানটি খাট থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিল। মাথার আঘাত গুরুতর হওয়ায়, তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

একদিকে ব্যক্তিগত শোকতাপের আঘাত অপরদিকে সামাজিক নির্যাতন, এই দুয়ের মধ্যে পড়ে রামতনু দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর তিনি বর্ধমান কলেজে বদলির ব্যবস্থা করলেন। এ বিষয়ে তিনি সে সময় বাল্যবন্ধু বর্ধমানের ডেপুটি কালেকটর রসিকলাল মল্লিকের কাছ থেকে সহৃদয় সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

রামতনু বর্ধমানে কাজে যোগ দিলেন ১৮৫১ খ্রিঃ। আর সেই বছরেই এমন একটি ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটল যার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

মানবতাবাদী রামতনু কোনও প্রকার আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে বিশেষ করে মূর্তিপূজা ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন না।

লোকহিতৈষণা ও মানবকল্যাণের কর্মকেই তিনি প্রকৃষ্ট ধর্মাচরণ বলে বিশ্বাস করতেন। অথচ নিজে ছিলেন ধর্মপরায়ণ রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান। সেই হিসাবে, মূর্তিপূজা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বর্জন করলেও ব্রাহ্মণের পরিচয় বাহক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেননি।

কৃষ্ণনগরে থাকার সময়েই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটেছিল। একবার মায়ের বাৎসারকি শ্রাদ্ধক্রিয়ায় তিনি বসেছেন, সেই সময় এক কিশোর তাঁর উদ্দেশ্যে মন্তব্য করে বলেছিল, "এদিকে তো বলা হয় কিছুই মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্তে বসা হয়েছে, পৈতাটি বেশ ঝুলছে, বামনাই দেখান হচ্ছে।"

কথাগুলো কানে যেতে রামতনু খুবই বিব্রত ও লজ্জাবোধ করলেন। সেই সময় থেকেই তিনি উপবীত পরিত্যাগের বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হন।

বর্ধমানে আসার পরে কার্যকারণে তাঁর উপবীত বর্জনের সংকল্প কার্যকরী হয়।

১৮৫১ খ্রিঃ পুজোর ছুটিতে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি গাজিপুরে যাচ্ছিলেন। পথে রান্নাবান্নার দায়িত্ব মাঝিমাল্লাদের হাতেই দেওয়া হয়েছিল।

একদিন যখন রান্নাবান্নার কাজ চলছে, বন্ধুদের একজন রসিকতা করে বলল, "এদিকে তো মাল্লাদের হাতে খাচ্ছি, অথচ পৈতেটা রেখে বামনাই দেখাচ্ছি, কি ভন্ডামিই করছি।"

রঙ্গচ্ছলে বলা হলেও কথাগুলির গূঢ়ার্থ রামতনুর মনে গভীর রেখাপাত করল। তাঁর মনে পড়ল কৃষ্ণনগরের কথা—কিশোরের মন্তব্য। নিঃশব্দে তিনি গলা থেকে পৈতাটি খুলে নৌকার ছইয়ে ঝুলিয়ে দিলেন।

এই ভাবেই তাঁর উপীবত ত্যাগের সংকল্প সিদ্ধ হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ হয়ে পৈতা পরিত্যাগ করে ইতিপূর্বে অনেক ইয়ংবেঙ্গল সদস্যই সমাজে আলোড়ন ঘটিয়েছিলেন। সমাজের চোখে নিন্দনীয় এই কর্মটি প্রগতিপন্থীরা করেছেন, যতকিছু গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতার প্রতিবাদ হিসেবে।

রামতনুর পৈতাত্যাগের ঘটনাটিও চারদিকে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল।

সবে তিনি বর্ধমানে কাজে যোগ দিয়েছেন, তার মধ্যেই প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে একেবারে ঝড়ের মুখে পড়ে গেলেন।

হিন্দু সমাজের সমাজপতিরা তাঁকে অচিরেই একঘরে ঘোষণা করল। ফলে ধোপা, নাপিত, বাড়ির কাজের লোক সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করল।

ঘরে বালিকা বধূ, প্রথম পক্ষের দুগ্ধপোষ্য পুত্র। রামতনু একেবারে অথৈ জলে পড়লেন। ঘর-গৃহস্থালীর কাজ কর্ম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

কিন্তু হাসিমুখেই তিনি এই দুঃসময়কে বরণ করে নিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে, সংসারের জলতোলা বাসনমাজা থেকে শুরু করে দাসদাসীদের কৃত্য সকল কাজই তিনি নিজ হাতে সমাধা করতে লাগলেন। দুঃখের কথা এই যে, সহযোগিতা তো দূরের কথা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকেও এই সময় বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা ছাড়া কিছু পান নি।

এই পরিস্থিতির মধ্যে সুস্থির হয়ে কাজ করা বেশি দিন সম্ভব হল না। একবছর থাকার পর ১৮৫২ খ্রিঃ পরেই চলে এলেন উত্তর পাড়ার ইংরাজি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে।

সেই সময় অদূরেই কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠেছে ইংরাজি শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তাঁর সঙ্গে রামতনুর এই সময়েই চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতনুর প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি তাঁকে বন্ধু হিসাবে নানা ভাবে সাহায্য করতেন।

পৈতা ত্যাগের নির্যাতন রামতনুকে ভোগ করতেই হচ্ছিল। তাঁর অসুবিধাদি লাঘব করার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহস্থালীর দ্রব্যসামগ্রী কলকাতা থেকে কিনে পাঠিয়ে দিতেন।

উত্তর পাড়ায় রামতনু শিক্ষক হিসাবে অল্প সময়ের মধ্যে অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এখানে তাঁর কার্যকাল স্থায়ী হয়েছিল মাত্র দেড় বছর। দুই কন্যা লীলাবতী ও ইন্দুমতীর জন্মও হয়েছিল এখানেই।

বদলি হয়ে রামতনু চলে এলেন বারাসাত স্কুলে। স্থানটি কলকাতার অদূরবর্তী হওয়ায় কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে রামতনুর নতুন করে যোগাযোগ স্থাপিত হল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগও বৃদ্ধি পেল।

বারাসাতেও ছাত্রদের শ্রদ্ধা ভালবাসা অল্পদিনেই অর্জন করলেন রামতনু। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রদের চরিত্র গঠনের ওপরেও বরাবরই সমান গুরুত্ব দিতেন তিনি।

নানা সৎ উপদেশ ও দেশ বিদেশের মনীষীদের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত উপাস্থাপনার দ্বারা চেতনা সঞ্চার করতেন।

জ্ঞান অর্জন ও চরিত্র গঠনের অঙ্গ হিসেবে ছাত্রদের তিনি শ্রমশীল হওয়ার শিক্ষাও দিতেন। অবসর সময়ে ছাত্রদের নিয়ে তিনি স্কুলসীমার অন্তর্বর্তী বিস্তীর্ণ জমিতে চাষাবাদের কাজেও নিযুক্ত হতেন।

বদলির চাকরিতে বেশিদিন এক জায়গায় থিতু হওয়ার উপায় ছিল না। তাই বারাসাতের পরে তৎকালীন পূর্ব্বঙ্গে বরিশাল জেলাস্কুলেও কিছুকাল তাঁকে প্রধান শিক্ষকের কাজ করতে হয়।

সর্বশেষ এলেন কৃষ্ণনগর কলেজে এবং এখান থেকেই ১৮৬৫ খ্রিঃ সরকারী চাকরি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

সরকারী কর্ম থেকে যখন রামতনু অবসর গ্রহণ করেন, ততদিনে তাঁর সাধুতা কর্তব্যপরায়ণতা ও সমাজ হিতৈষণার খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে।

আপামর সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে স্বয়ং বিদ্যাসাগরের পরেই তাঁর নাম উচ্চারিত হত।

একজন কৃতকর্মা শিক্ষাব্রতী হিসেবেও তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন। সেকালে মহাজ্ঞানী আর্নল্ডের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে বলা হত Arnald of Bengal.

চব্বিশ (উত্তর) পরগনার গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় জমিদার পরিবারে নাবালক ছেলেদের অভিভাবক নিয়োগের প্রশ্নে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। একজন সজ্জন, কর্তব্যপরায়ণ ও সাধুচরিত্রের খ্যাতিমান মানুষের সন্ধান করা হচ্ছিল।

সরকার বাহাদুরের পরামর্শে সেই সময় রামতনুকেই মুখোপাধ্যায় পরিবারে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আজীবন তিনি ছিলেন কুসংস্কারের বিরোধী। জাতিভেদও মানতেন না। গোবরডাঙ্গায় থাকাকালীন তিনি উদারভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করতেন।

কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি আস্থা না থাকলেও তাঁর ধর্ম ভাবনা ছিল কেশব সেনের প্রভাবপুষ্ট। নবীন ব্রাহ্মদের বাড়িতে নানা অনুষ্ঠানে ও উপাসনাতেও তিনি নিয়মিত যোগদান করতেন। তাঁর চরিত্রগুণে ও পবিত্র সান্নিধ্যে সকলের মধ্যেই সদভাব জাগরিত হত।

১৮৫০ খ্রিঃ তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রবল সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রিঃ তিনি স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হন।

নারীমুক্তি আন্দোলনের পক্ষাবলম্বীরা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিল হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্রী হিসাবে রামতনু তাঁর কন্যা ইন্দুমতীকে পাঠিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মনেতা প্রখ্যাত কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতে গেলে টাউন হলের সভায় তিনি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীদেরও প্রকাশ্য স্থানে বসিয়ে দিতেন।

নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের মনে জ্ঞান স্পৃহা জাগাবার জন্য রামতনু সর্বদা ব্যগ্র ছিলেন। তিনি কলকাতায় এসে এক একটি পরিবারের মধ্যে কিছুদিন বাস করতেন এবং মেয়েদের একত্র করে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। মেয়েদের দিয়েও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করাতেন।

তাঁর সান্নিধ্যে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বাড়িব সাংস্কৃতিক আবহাওয়া ও রুচির পরিবর্তন ঘটে যেত।

জাতীয় সমস্যা সমাধান ও ব্রাহ্ম বিবাহের সুবিধার জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭২ খ্রিঃ ভারতাশ্রম নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে রামতনুও নিজের আত্মীয়দের নিয়ে বাস করেন।

এখানে বাসকালে একবার তিনি তাঁর এক মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যান। সেই বন্ধুটি এককালে সরকারী চাকরি করতেন। চরিত্রের নানা দোষ ত্রুটির জন্য নিন্দাভাজন ব্যক্তিটির নাম শুনে আশ্রমবাসীদের মধ্যে এক মহিলা বলে উঠলেন, "ওমা, এমন মানুষকেও আপনি দেখতে যান? সে যে লক্ষ্মীছাড়া লোক।"

রামতনু তাঁর বন্ধুটির অখ্যাতির বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন। এ-ও জানতেন অবসর গ্রহণের পর বন্ধুটি ধর্মকার্যে লিপ্ত থেকে নিজ স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করেছেন। আন্তরিক ধর্মাচরণ, সহৃদয়তা ও কর্তব্যপরায়ণতা গুণে তিনি যৌবনের সকল দোষ ত্রুটি বর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রামতনু ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধু।

মহিলার মুখে বন্ধু সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্য শুনে রামতনু মনে ব্যথা পেলেন। তিনি মহিলাকে বললেন, "ঠাকরুণ, আমি জানি কেন আপনি তাকে লক্ষ্মীছাড়া বলছেন। এখন সে অন্য মানুষ, ধর্মকর্ম নিয়েই থাকে। চিরকালই মানুষ মন্দ থাকে না।"

এর পর তিনি বন্ধুটির নানা গুণ ও কর্মকৃতিত্বের কথা একে একে প্রকাশ করে প্রশ্নের ছলে বললেন, "এতসব কি আপনি করতে পারতেন?"

ভদ্রমহিলা অকপটে স্বীকার করলেন, এত কাজ তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হত না।

কথাচ্ছলে নানা দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে রামতনু এর পর যা বললেন, তাতেই প্রকাশ পায় তাঁর সত্যকার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়।

তিনি বললেন, "আমরা মানুষের মন্দটাই দেখি; ভালটা দেখি না। মন্দ

মানুষের ভালটা দেখতে হয়। ঈশ্বর যদি আমাদের মন্দটাই ধরেন তাহলে কি আমরা পার পাই?"

রামতনু ছিলেন জ্ঞান-তাপস। জ্ঞানান্বেষণে তিনি সারা জীবন ব্যয় করেছেন। শিক্ষাগুরু হিসেবে ছাত্রদেরও তিনি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন।

১৮৮৩ খ্রিঃ ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম সভায় রামতনু সভাপতিত্ব করেন।

শেষ বয়সে নানা শোকতাপে খুবই অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিঃ খাট থেকে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙ্গে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তারপর আর সুস্থ হতে পারেননি।

মৃত্যুশয্যায় তাঁকে দেখতে এসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "স্বর্গে দেবগণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন, তোমাকে তাঁরা সাদরে গ্রহণ করবেন।"

১৮৯৮ খ্রিঃ ২৩ আগস্ট, সাধু রামতনু ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্লেটো

মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানের জগতের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির ক্ষেত্রে যেসব চিন্তাশীল ব্যক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গ্রীক দর্শনেব শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্লেটো।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের চিন্তা ও দর্শনকে সুসংহতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়েছিলেন প্লেটো ও অ্যারিস্টটল—এঁরা হলেন গুরু-শিষ্য পরম্পরা। এই তিন মনীষী ছিলেন গ্রীক দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

কেবল তাই নয় সমগ্র ইউরোপের নতুন দর্শন ও সংস্কৃতির উজ্জীবনেও এঁদের প্রভাব অপরিসীম।

বহুমুখী প্রতিভা ছিল প্লেটোর। তিনি একাধারে ছিলেন কবি দার্শনিক ও নাট্যকার। মানবতার শিক্ষক বলা হয় তাঁকে। ইউরোপের চিন্তাধারায় আইডিয়ালিজম-এর উদ্ভাবক তিনি।

এই দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মহাকবি গ্যেটে বলেছেন, 'সর্বদাই নিত্য সত্যের দিকে ধাবমান প্লেটোর প্রতিভা। সত্য, শিব ও সুন্দর—এই ছিল তাঁর প্রতিটি বাক্যের লক্ষ্য। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনাই ছিল, প্রতিটি মানুষের অন্তরকে সত্য-শিব-সুন্দরের মুখী করে তোলা।'

এথেন্সের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মেছিলেন প্লেটো। তাঁর পিতা অ্যারিস্টটল ছিলেন এথেন্সের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কখনও তিনি আগ্রহ বোধ করতেন না।

তিনি ছিলেন ভাবুক ও কল্পনাপ্রবণ। সংসারের বিচিত্র জটিলতার মধ্যে থেকেও তিনি নিজেকে জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত রাখতেন।

প্লেটো পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন প্রবল জ্ঞানস্পৃহা।

সুঠাম লাবণ্যময় দেহের অধিকারী ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে ছিল সহজাত বুদ্ধিমত্তা আর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর।

পিতার নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল অ্যারিস্টক্লিজ। কিন্তু অপরূপ দেহলাবণ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে ডাকা হত প্লেটো নামে। প্লেটো শব্দের অর্থ হল প্রশস্ত কাঁধ।

প্লেটো যেই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সেইকালে এথেন্স ছিল শিক্ষায় দীক্ষায় সমৃদ্ধিতে অগ্রগণ্য। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের আবহাওয়া হয়ে উঠেছিল উত্তাল।

সিসিলি রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বিপর্যস্ত দেশ, দুর্নীতি বিস্তার লাভ করছে সর্বক্ষেত্রে। গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে এসেছে এথেন্স।

স্বদেশের এই দুর্বিপাকের মধ্যেই কৈশোরে উত্তীর্ণ হন প্লেটো। স্বভাবতঃই এই সময় থেকেই রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির প্রতি তাঁর মন বিরূপ হয়ে ওঠে। তিনি পিতার অনুসরণে জ্ঞানের অনুশীলনেই আত্মনিয়োগ করেন।

কুড়ি বছর বয়সে মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তার আগেই বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে তিনি সাহিত্য, সংগীত শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

সেইকালে দেশ বিদেশ থেকে ছাত্ররা সক্রেটিসের কাছে শিক্ষালাভের জন্য আসত। ছাত্র-শিষ্যদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি কোনও শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেননি। অদ্ভুত ছিল তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি।

ছাত্রদের নিয়ে তিনি নগরের পথে পথে ভ্রমণ করতেন। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে তিনি প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

কোন একটি বিষয়ে নিজস্ব মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশের সুযোগ দিতেন তিনি ছাত্রদের। তিনি প্রশ্ন করতেন, উত্তর শুনতেন, পরে নিজের মতামত বিচার করে তাদের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করতেন।

ইতিমধ্যে স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধে ৪০৪ খ্রিঃ পূর্বাব্দে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে

এথেন্সে প্রতিষ্ঠিত হল স্পার্টার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের দেশে স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার আর রইল না। দেশের নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষ নিজেদের মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী শাসনের সমালোচনা করতে সক্রেটিস কিন্তু বিরত রইলেন না। সত্যের পূজারী আগের মতোই পথে ঘুরে ঘুরে, জন সমাবেশে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে সত্য-সন্ধানের শিক্ষা দেওয়া অব্যাহত রাখলেন।

সক্রেটিসের বক্তৃতার আকর্ষণে এথেন্সের যুবসমাজ ভিড় করে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। এর ফলে স্বৈরাচারী শাসকবর্গ শঙ্কিত হয়ে পড়ল। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারি ঘোষণা করতে তারা কালবিলম্ব করল না। কিন্তু নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশে সক্রেটিস রইলেন অবিচল অটল।

শেষ পর্যন্ত, দেশের যুব সমাজকে বিপথে চালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল সক্রেটিসকে। তিনি প্রচলিত দেবপূজা মানেন না, নতুন দেবতার পূজা প্রচলনের চেষ্টা করছেন—যাজক সম্প্রদায়ের এই অভিযোগও তার সঙ্গে যুক্ত হল।

সক্রেটিস বন্দি হলেন। বিচারের মিথ্যা অছিলায় তাঁকে বিষপানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।

সত্যান্বেষী সক্রেটিস দেশময় প্রজ্ঞার আলো জ্বালাবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে কিন্তু সেই চেষ্টা বন্ধ হল না।

গুরুর প্রারব্ধ কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে জ্ঞানের মশাল হাতে আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্লেটো।

দীর্ঘ আট বছর গুরুর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর চিন্তা ভাবনার সার্থক উত্তরাধিকারী, গুরুর জ্ঞানের ধারকবাহক হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

সক্রেটিস তাঁর উপলব্ধ সত্য বিতরণ করতেন বক্তৃতার মাধ্যমে। কখনও কিছু লিখে যাননি। তাঁর শিষ্যরাও কলম ধরেননি। প্লেটো সেই অসম্পূর্ণ কাজটি করলেন। সক্রেটিসকে নিজের রচনার মাধ্যমে জগৎবাসীর কাছে পরিচিত করে তুললেন তিনি।

বস্তুতঃ প্লেটো উদ্যোগী না হলে পৃথিবীর মানুষ মহাত্মা সক্রেটিসের কথা জানতেই পারত না।

সক্রেটিসের জীবন, তাঁর দর্শন ও মহত্ত্বের কথা ব্যক্ত করে প্লেটো যেসব লেখা লিখেছেন, তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, সেখানে গুরুর মহিমা কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

উপরন্তু সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে রেখেছেন নেপথ্যে, একজন অন্তরালবর্তী দর্শকের ভূমিকায়। গুরুর প্রতি শিষ্যের এমন গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা জগতে বিরল।

প্লেটো নিজেও ছিলেন একজন মহান চিন্তাবিদ দার্শনিক। আপাতদৃষ্টিতে, তিনি সমস্ত জীবন ধরে গুরুর মতাদর্শ প্রচার করেছেন তাঁর রচনার সংলাপ ও তত্ত্বকথার মাধ্যমে মনে হলেও একথা অস্বীকার করা চলে না যে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশে বিরত থেকেছেন।

সক্রেটিসকে কেন্দ্র করেই তিনি নিজেকে, নিজের মনন চিন্তনকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর সমস্ত মনন চিন্তনের প্রেরণা ও উৎস ছিল সক্রেটিসের জীবন ও বাণী।

গুরুর মৃত্যুর পরে এথেন্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠায় প্লেটো এথেন্স ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

কিছুদিন গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলে, পরে ইটালি, সিসিলি ও মিশরে পরিভ্রমণ করলেন। দেশ পর্যটনের এই অভিজ্ঞতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের প্রসারে সহায়ক হয়েছিল।

বিভিন্ন দেশে, জ্ঞানী চিন্তাবিদদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও মতামত বিনিময় হয়েছে। তিনি নিজেও সর্বত্রই প্রজ্ঞাবান হিসেবে খ্যাতি, সম্মান ও সমাদর লাভ করেছেন।

দীর্ঘ দশ বছর প্রবাস বাসকালে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি যখন এথেন্সে ফিরে এলেন, দূর দূর অঞ্চল থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে আসতে লাগল। ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি গুরু সক্রেটিসের পদ্ধতি অনুসরণ না করে জনকোলাহল ও প্রকাশ্য স্থান থেকে দূরে একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করলেন।

শহরের উপকণ্ঠে নিজস্ব বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের নাম দিলেন একাডেমি। এই একাডেমিকে কেন্দ্র করেই ছাত্রদের মধ্যে তিনি জ্ঞান বিতরণ করতেন, তাঁর মনন ও মনীষার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হত তাদের জ্ঞান ও চিন্তার জগৎ।

প্রধানত দর্শন চিন্তায় ব্যাপৃত থাকলেও মানবজাতির কল্যাণভাবনায় উদ্বুদ্ধ প্লেটো একটি আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকথিত রাষ্ট্রনেতাদের অসহযোগিতায় সেই স্বপ্ন রূপায়ণের সুযোগ তিনি পাননি।

একবার সিলিলি দ্বীপের শাসকবর্গ উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে যান। সিসিলিকে আদর্শ রাষ্ট্র রূপে গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু

তথাকথিত রাজনীতির ঘোলাজলে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলেন। বাধ্য হয়ে ফিরে এলেন এথেন্সে।

কিন্তু এক আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ তিনি ফুটিয়ে তুললেন তাঁর রচনায়। লিখলেন বিখ্যাত রিপাবলিক গ্রন্থ।

গ্রিসের তথা ইউরোপের তিন উজ্জ্বল নক্ষত্রের অন্যতম ছিলেন প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল। উনিশ বছরের তরুণ অ্যারিস্টটল যখন তাঁর কাছে ছাত্র হয়ে এলেন তখন প্লেটোর বয়স ষাট ছুঁয়েছে। নবীন শিষ্যের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি বুঝতে বিলম্ব হয়নি প্লেটোর।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দ্যুতি প্রকাশিত ছিল অ্যারিস্টটলের অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার মধ্যে। তাই সারাজীবনের অর্জিত জ্ঞান ও চিন্তার ফসল উজাড় করে দিলেন প্রিয় শিষ্যকে।

পাশ্চাত্য দর্শনের যাত্রাপথ যেভাবে রচিত হয়েছিল সক্রেটিসের হাতে তাতে ছিল সুষ্ঠু সঙ্গতির অভাব। প্রধানতঃ উপদেশ কিংবা সমালোচনাচ্ছলে তিনি ছাত্রদের দর্শনের শিক্ষা দিতেন।

নিজেকে তিনি কোথাও বলেছেন দংশনকারী মৌমাছি, সমালোচনার দংশনে মানুষকে জাগ্রত রাখাই তাঁর কাজ।

কোথাও সত্যকে প্রসব করানোর কাজে নিজেকে ধাত্রীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কোথাও আবার বলেছেন, ধর্মরাজ্যই কাম্য হওয়া উচিত। ধর্মপথ অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জিত হবে সমস্ত সম্পদ।

দর্শনের এই অসংবদ্ধ অবস্থাকে প্লেটোই প্রথম একটি সুদৃঢ় সুশৃঙ্খল রূপ দান করলেন। জীবনব্যাপী দর্শনের পূজারী হলেও বাস্তবকে তিনি অস্বীকার করেননি। তাঁর কল্পনায় ছিল আদর্শ রাষ্ট্রের চিন্তা। বাস্তবে তার অস্তিত্ব কোথাও না থাকলেও তিনি তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে তার রূপরেখা অঙ্কিত করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত এই গ্রন্থে রাষ্ট্রনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সমাজজীবনের সমস্ত দিকেই আলোকপাত করেছেন।

সাহিত্য, শিক্ষা, শরীরচর্চা, শিল্পকলার সঙ্গে সুপ্রজননবিদ্যা সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন।

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের প্রশ্নে প্রথমেই শাসক নির্বাচনের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতির জন্য তিনি দায়বদ্ধ রেখেছেন শাসকদের। তিনি বলেছেন, নাগরিকদের মধ্যে থাকবে তিনটি স্তর। শাসক, সৈনিক ও জনসাধারণ ও ক্রীতদাস।

শাসকদের থাকবে জ্ঞান ও উপযুক্ত শাসন ক্ষমতা, সাহস ও বীরত্ব থাকবে সৈনিকদের মধ্যে। আর শাসকদের প্রতি আনুগত্য ও সংযম থাকবে জনগণের মধ্যে।

এই তিন স্তরের প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালন করে তবে রাজ্যে শৃঙ্খলার অভাব থাকবে না।

রাষ্ট্রের সকল স্তরের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য শাসকদের প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার। প্লেটো তাঁর গ্রন্থে তাই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে কিছু শিক্ষা দেওয়া চলে না।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে শরীরচর্চা করলে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয় না বটে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষাদান মনের কোন উন্নতিই করতে পারে না।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বকালের সত্য কথাটি জগৎকে শিখিয়ে গেছেন প্লেটো।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বৈরাচারের নিন্দা করে তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রে সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে থাকবে সহৃদয় সম্প্রীতির সম্পর্ক। পরস্পরের প্রতি তারা থাকবে সহানুভূতিশীল। উচ্চ নীচ বলে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না।

রাষ্ট্র তথা মানব সমাজের কল্যাণের জন্য সুপ্রজনন বিষয়েও প্লেটো চিন্তা করেছেন।

প্রাচীন গ্রীসে প্রচলিত ধারার সমর্থন জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে বলেছেন, সুস্থ সবল শিশুর জন্মের জন্য চাই নিরোগ সবল দেহ। ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যেই ব্যাধিগ্রস্ত পিতামাতার সন্তান জন্ম দেওয়া উচিত নয়।

প্লেটো বিশ্বাস করতেন মানুষের মহৎ চিন্তা ও কর্মের প্রেরণার মূলে নারীর বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন গ্রীক মনীষীর দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে তিনি দেখিয়েছেন তাঁদের মহৎ প্রেরণার উৎস ছিলেন শিক্ষিতা রুচিসম্পন্ন নারীরা। তিনি তাই নারীশিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি উদার নীতির প্রশংসা করে বলেছেন বিদুষী নারীরাই পারে পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে উঠতে।

নারীপুরুষের সমান অধিকারের প্রসঙ্গে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, অহমিকা বশে পুরুষরা যেন নারীদের উপেক্ষা না করে।

একটি আদর্শ রাষ্ট্র, আদর্শ মানবসমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে দার্শনিক প্লেটো

তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে যে সব শিক্ষা দিয়েছেন, তার বাস্তবতা জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তাই শেষ জীবনে বাস্তব প্রয়োজনে আইনের শাসনের কথা তিনি লেখেন তাঁর The Laws গ্রন্থে।

দার্শনিক প্লেটো ছিলেন সংগীতরসিক। কাব্য অলঙ্কার নন্দনতত্ত্বের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। মানবিক গুণ বিকাশের ক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকারও প্রশংসা করেছেন তিনি।

প্লেটো নিজে ছিলেন বীররস প্রধান সংগীতের ভক্ত।

তাঁর অন্তর্নিহিত কবিসত্তার প্রকাশ ঘটেছে দর্শনশাস্ত্র আলোচনার মধ্যেও। কাব্যসৌন্দর্যে মন্ডিত ছিল তাঁর দর্শনের ভাষা। তাঁর রচনা শৈলীতে ছিল সাহিত্যিক কুশলতা।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল প্লেটোর রচনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, প্লেটোর প্রতিটি রচনাই সাহিত্যিক উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

নানা ঐতিহাসিক ঘটনার হাত ধরে অনুপম নাটকীয়তা, হাস্যরস, গাম্ভীর্য ও করুণ রস তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাগভীর রচনাকে প্রাণবন্ত অতুলনীয় করে তুলেছে। বিশ্রুত দার্শনিক বার্ট্রান্ড বলেছেন, "রচনাশৈলীর সৌন্দর্যে, বিষয় বৈচিত্র্যে ও বিশুদ্ধতায় প্লেটোর নাম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে অমর হয়ে থাকবে।"

ধর্মীয় উপাসনা, পূজানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না প্লেটো। মঙ্গলময় এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি এবং বিশ্বাস করতেন পবিত্র চরিত্র ও জ্ঞানের মাধ্যমেই ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়।

শেষ বয়সে প্লেটো উপদেষ্টা হিসেবে আহ্বান পেয়ে সাইরাকিউসে গিয়েছিলেন। সম্রাট ডায়োনিসিয়াসকে তিনি একজন দার্শনিক শাসক হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

সেই কারণে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশের সঙ্গে অনুপযুক্ত কাজের জন্য সম্রাটের তীব্র সমালোচনাও করতেন।

ডায়োনিসিয়াস কিন্তু শেষপর্যন্ত সবকিছু মেনে নিতে পারলেন না।

অসন্তোষের বশবর্তী হয়ে তিনি অন্তরীণ করে রাখলেন প্লেটোকে।

সাইরাকিউসের অন্যতম রাজপুরুষ জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিকের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তিনি গোপনে প্লেটোকে মুক্ত করে এথেন্সে পাঠিয়ে দেন।

সম্রাট ডায়োনিসিয়াস পরে নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্লেটোকে পত্র লিখলেন।

ক্ষুব্ধ বৃদ্ধ দার্শনিক উত্তরে সম্রাটকে জানিয়েছিলেন যে দর্শন চিন্তা ভিন্ন অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার মত বাজে সময় তাঁর নেই।

বিরাশি বছর আয়ু পেয়েছিলেন প্লেটো। খ্রিঃ পূর্ব ৩৪৭ অব্দে, এক বন্ধুর ছেলের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই বিবাহ অনুষ্ঠানেই এক নিভৃত কক্ষে সকলের অগোচরে চির নিদ্রা লাভ করেছিলেন।

রবার্ট ক্লাইভ

ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে চুয়ান্ন বছর হল। তার আগে প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনাধীনে থেকে ভারতীয় জনগণ শোষিত নিপীড়িত হয়েছে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্থপতি ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। দীর্ঘস্থায়ী দুরপণেয় দুর্ভাগ্যের বোঝা তিনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবাসীর জীবনে।

এদেশের মানুষের কাছে তাঁর পরিচয় যাই হোক না কেন, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিমান প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল অপরিসীম উদ্যম, নিষ্ঠা, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা, সূক্ষ্ম বিচারবোধ প্রভৃতি গুণাবলী। এই গুণ বলেই পার্থিব জীবনের নানা দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও পৃথিবীর ইতিহাসে বিজেতাদের তালিকায় রবার্ট ক্লাইভের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মেকলে যথার্থই বলেছেন, "His name stands high on the roll of conquerors."

এক সময়ে ব্রিটিশের উপনিবেশ গোটা পৃথিবী জুড়ে এতটাই প্রসার লাভ করেছিল যে বলা হত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্যাস্ত হয় না। প্রবাদ হলেও বাস্তব সত্য ছিল তাই।

ব্রিটিশের পৃথিবীজোড়া উপনিবেশের মধ্যে ধনে সম্পদে সমৃদ্ধতম দেশ ভারতবর্ষ ছিল তার প্রাণ। আর এখানেই কর্মক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল ক্লাইভের প্রতিভার স্ফুরণ।

রানী এলিজাবেথের সময় থেকেই ভারতের সঙ্গে ইংলন্ডের ব্যবসা শুরু হয়েছিল। ক্রমে ব্যবসা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘাঁটি ও দুর্গ স্থাপিত হয় মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায়।

কলকাতায় উপনিবেশ স্থাপনের অনুমতি ইংরাজরা লাভ করেছিল মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৯০ খ্রিঃ। সেই সময় ইউরোপের ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজরা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেছিল।

ইংরাজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই সকল দেশও প্রতিষ্ঠা করল এক একটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

ফরাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল চন্দননগরে, ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় এবং পর্তুগীজরা গোয়াতে। ইংরাজরা মাদ্রাজ থেকে তাদের উপনিবেশ স্থানান্তরিত করে বাংলার সূতানুটিতে।

সাম্রাজ্যবাদী এই দেশগুলির মধ্যে এদেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তেমনি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিবাদও যথেষ্টই ছিল।

শেষ পর্যন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই জয়লাভ করেছিল। তাই সেইকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলতে ইংরাজদেরই বোঝাত।

রবার্ট ক্লাইভের প্রথম জীবনের কথা আজও পর্যন্ত অজানা রয়ে গিয়েছে। নানা সূত্রে যেটুকু জানা গেছে, তাতে দেখা যায় ইংলন্ডের এক হত দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭২৫ খ্রিঃ নাগাদ।

তাঁর বাবা ছিলেন দুর্দান্ত মদ্যপ। সামান্য আয়রোজগার যা করতেন মদ খেয়েই সব উড়িয়ে দিতেন। বাড়িতে এসে পাড়া মাতিয়ে জুড়তেন চিৎকার চেঁচামেচি।

মাতাল স্বামীর অত্যাচার নিষ্ঠুরতায় অতিষ্ঠ হয়ে তিন বছরের শিশু ক্লাইভকে নিয়ে তাঁর মা তাঁর মাসীর বাড়ি চলে যান। বাবার স্নেহ ভালবাসা কোনদিনই কপালে জোটেনি শিশু ক্লাইভের।

মাসীর বাড়িতে থাকার সময়েই ক্লাইভকে লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠানো হয় একটা স্কুলের বোর্ডিং বাড়িতে।

বাপমায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্কুলে এসে শিশু বয়সেই নিষ্করুণ পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় তাঁর।

সহপাঠীদের সঙ্গে তাদের মা বাবা দেখা করতে আসে। বুক ভরা স্নেহের সঙ্গে তারা নিয়ে আসে কত খাবার। কিন্তু ক্লাইভের জন্য ছিল না কেউই। ঈশ্বরের করুণা আর স্নেহ ছাড়া বেড়ে ওঠার জন্য আর কোন অবলম্বনই পাননি ক্লাইভ।

স্কুলের জীবনেই ক্লাইভ তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নেন। অকরুণ এই পৃথিবীতে যে করেই হোক তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে, নিজের একটু স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

লেখাপড়ায় খুব বেশিদূর এগোতে পারেননি ক্লাইভ। শরীর ছিল বলিষ্ঠ, শক্তপোক্ত। সমবয়সী বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে দল পাকানো, মারপিট করার দিকেই যত ঝোঁক তার।

সেই কালে অপদার্থ অকম্মা ছেলেদেরই সাধারণতঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

চাকরিতে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তরুণ ক্লাইভও তেমনি কোম্পানির রাইটার অর্থাৎ কেরানী হয়ে চলে এলেন মাদ্রাজে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দেশ, অপরিচিত আবহাওয়া। তার মধ্যেই কাজ শুরু করেন তরুণ ক্লাইভ। অফিসে কাজ যতটা না করেন, নিজের জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকেন তার বেশিক্ষণ।

ইংলন্ডের গ্রামের ছোট্ট বাড়ি, পরিচিত পরিজন—সবকিছু ছেড়ে সাত সমুদ্র পেরিয়ে ভারতবর্ষে এসে পড়েছেন, তাঁর এই দূরযাত্রার শেষ কোথায়? নগণ্য এক অপরিচিত অভাজন হয়েই কি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে? বিধাতা কি উপযুক্ত কোন কাজ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করেন নি?

সহকর্মীরা সকলেই স্বজাতীয়। তাঁরা তাঁর হাবভাব দেখে ভাবে ছোেটো নিতান্তই হাবাগোবা গোবেচারা। তারা মাঝে মাঝেই পেছনে লাগে তাঁর। অপদার্থ বলে বিদ্রূপ করে।

একদিন উত্যক্ত ক্লাইভ উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দিলেন সকলকে। বেধড়ক পিটিয়ে অফিসের মধ্যেই ঘায়েল করে দিলেন।

যথারীতি কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ গেল। তাঁরা তাঁকে রাইটার কাজের অযোগ্য ও অভদ্র বলে সাব্যস্ত করলেন। তিরস্কৃত হলেন ক্লাইভ।

এরপর থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন তিনি কর্মস্থলে। তাঁর সঙ্গে সকলেই মেলামেশা বন্ধ করে দিল।

বাইরে বেপরোয়া ভাব নিয়ে থাকলেও মনে মনে নিজেকে নিয়ে, জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা বেড়ে গেল।

ভেবে কোন কূল কিনারা পান না। ব্যর্থতার অন্ধকার ছাড়া কোন দিকে কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত নেই। শেষে জীবনের ওপর তীব্র ঘৃণায় আত্মহত্যা করার সঙ্কল্প করলেন।

একদিন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে পিস্তল তুলে নিলেন। বুক তাক করে ট্রিগার টিপলেন। পর পর দুবার।

কিন্তু অদ্ভুত কান্ড। গুলি বেরোল না। ত্রস্তব্যস্তে পিস্তল পরীক্ষা করে দেখলেন, কোন গোলমাল নেই কোথাও, গুলি ভরাই রয়েছে।

তবু পরীক্ষা করার জন্য জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপলেন। প্রচন্ড শব্দের সঙ্গে গুলি ছুটে বেরোল।

এই দৈব ঘটনায় অশান্ত ক্লাইভ আত্মস্থ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁকে নিয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্য রকম—আত্মহত্যা তার নিয়তি নয়। স্বদেশের প্রয়োজনে নিশ্চয় মহৎ কোন কাজের জন্যই তিনি নির্দিষ্ট। তাঁকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যেতে হবে সময়ের জন্য।

এর পর থেকে জীবনের মোড় ঘুরে গেল ক্লাইভের। অদৃশ্য এক শক্তি যেন সঞ্চারিত হল তাঁর মানসিকতায়, সমস্ত চিন্তা জুড়ে।

এরপর আরও একটি ঘটনায় নিজের পৃথিবীর চেহারাই পাল্টে গেল ক্লাইভের চোখে। নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন তিনি।

স্কুলে লেখাপড়ায় বেশিদূর অগ্রসর হতে না পারলেও ক্লাইভের অনিয়মিত ভাবে বাইরের বই পড়ার অভ্যাসটা তৈরি হয়েছিল।

সময় সুযোগ মতো তিনি মাদ্রাজের লাটসাহেব মিস্টার মার্সের লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশোনা করতেন।

একদিন লাইব্রেরীতে ঢুকে বিভিন্ন লেখকের লেখা এমন কিছু বই তাঁর হাতে পড়ল, যেগুলো তাঁকে জানিয়ে দিল, জীবনে হতাশা এলেও হারাবার কিছু নেই। পৃথিবীতে যারা সাফল্যের শিখর স্পর্শ করে সার্থক হয়েছেন, স্বনামধন্য হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই হতাশার প্রতিকূলতার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে।

সংগ্রামই জীবন। সংগ্রামশীল জীবন কখনো ব্যর্থ হয় না। বলবান পুরুষই পারে সংগ্রাম করতে। যে দুর্বল ভয় তারই। তার কোন প্রতিপক্ষ থাকে না।

জীবন সম্পর্কে ধারণা রাতারাতিই যেন পাল্টে গেল ক্লাইভের। নতুন উদ্যমে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি যেখানে নিজের উপযুক্ততা প্রমাণ করতে পারবেন।

উদ্যমী পুরুষের সুযোগের অভাব হয় না। বিচার করে সুযোগকেই সৌভাগ্যে রূপ দিতে পারেন তাঁরা।

ক্লাইভও তেমনি এক সুযোগ পেয়ে গেলেন এক সময়। সময়টা ইউরোপের এক সংকটকাল। ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মধ্যে বেধে গেছে প্রচন্ড যুদ্ধ। তার আলোড়ন এসে পৌঁচেছে এদেশেও।

ভারতে অবস্থিত ইংরাজ আর ফরাসীদের মধ্যেও শুরু হয়ে গেল সংঘর্ষ। ফরাসীরা মাদ্রাজ অধিকার করে নিল।

ইংরাজ যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে ক্লাইভও ছিলেন। এই বন্দিত্বই তাঁর সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিল।

কৌশলে বন্দিদশা থেকে পলায়ন করে বহু পথ পাড়ি দিয়ে ক্লাইভ এসে আশ্রয় নিলেন ইংরাজদের একটি দুর্গে। দুর্গটির নাম ফোর্ট সেন্ট ডেভিড। দুর্গের কর্তৃপক্ষ মেজর লরেন্সকে ক্লাইভ জানালেন, তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে চান। তাঁরা আনন্দের সঙ্গেই সবল স্বাস্থ্যবান যুবক ক্লাইভকে সৈন্যদলে স্থান দিলেন।

মসীজীবী ক্লাইভ অসিজীবী হয়ে যেন এতদিনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান পেয়ে গেলেন। সমস্ত উদ্যম, শক্তি নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পণ্ডিচেরীতে প্রথম যুদ্ধেই ক্লাইভ তাঁর সাহস ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে মেজর লরেন্সের প্রশংসা লাভ করলেন।

প্রাথমিক সংঘর্ষের পর পণ্ডিচেরীতে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হল। ফলে সাময়িক ভাবে ভারতবর্ষে ফরাসী ও ইংরাজদের মধ্যে বিবাদের অবসান হয়। কিন্তু ক্লাইভ সহজাত দূরদৃষ্টি বলে বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যে ফরাসী ও ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ কখনো বন্ধ হবার নয়।

ইতিমধ্যে ক্লাইভ লেফটেনান্ট পদে উন্নীত হলেন। পুরোপুরি সৈনিকের জীবনে নিজেকে সঁপে দিলেন তিনি।

ফরাসী গভর্নর দুপ্লে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি তৎকালীন মোগল সম্রাটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজদের বিতাড়িত করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

ক্লাইভের আশঙ্কা অচিরেই সত্য প্রমাণিত হল।

দুই প্রতিপক্ষই নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা প্রসারের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এমনি সময়েই দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকের শাসনক্ষমতা নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হল। নবাব পরলোক গমন করেছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার কথা নবাবপুত্র মহম্মদ আলির। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন ভূতপূর্ব নবাবের জামাতা চন্দ্রসাহেব।

সুযোগ বুঝে দুই পক্ষের সমর্থনে এগিয়ে এলো ইংরাজ ও ফরাসী। মহম্মদ আলীর পক্ষ অবলম্বন করল ইংরাজরা। ফরাসীরা সমর্থন জানাল চন্দ্র-সাহেবকে। এই ভাবে এই দুই শক্তি চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হল।

মেজর লরেন্সের দূরদৃষ্টিতে তরুণ সৈনিক ক্লাইভের প্রতিভা ধরা পড়েছিল। লেফটেনান্টের পদ থেকে তিনি উন্নীত হয়েছেন ক্যাপ্টেন পদে। ফলে সামরিক পরিষদে স্থান হয়েছে তাঁর, সামরিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তিনি।

ফরাসীরা ইতিমধ্যে ত্রিচিনোপল্লিতে অবরোধ গড়ে তুলেছে। মেজর লরেন্স ফরাসী অবরোধ ভেঙ্গে দেবার সামরিক দায়িত্ব দিলেন ক্লাইভকে।

যুদ্ধের নির্দেশ পেয়েই মাত্র পাঁচশত সৈন্য সঙ্গে নিতে ক্লাইভ কর্ণাটকের রাজধানী আর্কটে উপস্থিত হলেন। শুরু হল দুই পক্ষে মুখোমুখি সংঘর্ষ। সময় টা ১৭৫১ খ্রিঃ।

আর্কট যাত্রার সময় ক্লাইভ মেজর লরেন্সকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, মাদ্রাজ থেকে আরো সৈন্য পাঠাবার জন্য।

কিন্তু পরবর্তী সাহায্যের প্রত্যাশা না রেখেই তিনি পথের দুর্গমতা ও বর্ষা ঋতুর প্রতিকূল আবহাওয়া তুচ্ছ করে অতর্কিতে আর্কটের ফরাসী দুর্গ আক্রমণ করলেন।

দুর্গে অবস্থিত দেশীয় সৈন্যবাহিনী তরুণ সেনাপতি ক্লাইভের আক্রমণ

প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হল। যুদ্ধ পরিত্যাগ করে তারা পলায়ন করে। একরকম বিনা রক্তপাতেই ক্লাইভ যুদ্ধে জয়লাভ করলেন এবং ফরাসী দুর্গ অধিকার করেন।

পরবর্তীকালে এই প্রাচীন দুর্গটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল আধুনিক আর্কট শহর।

সাফল্যের সার্থকতা ক্লাইভকে আরও দুঃসাহসী নির্ভীক করে তুলেছিল। এরপর আরও দুটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অসাধারণ কৌশলের পরিচয় দিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে দিলেন তিনি। অধীন বাহিনীর সৈনিকদের মনে সাহস সঞ্চারিত করার অসামান্য ক্ষমতা ছিল ক্লাইভের। তাঁর সঠিক পরিচালনায় মৃত্যুকে তুচ্ছ করে তারা যুদ্ধলিপ্ত হত।

এই ভাবে মাত্র দুই বছরের মধ্যেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সংযম, সাহস ও রণনৈপুণ্যের বলে ফরাসীদের দমন করে ক্লাইভ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

প্রকৃতপক্ষে আর্কট যুদ্ধের জয়লাভের মধ্য দিয়েই ক্লাইভের জীবনে সৌভাগ্যের উদয় হয়েছিল। তাঁর বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। সম্মান, প্রশংসা, পদোন্নতি এই সময়ে যেন ভিড় করে এসেছিল তাঁর জীবনে।

তাঁর যুদ্ধজয়ের সংবাদ বিলাতে কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীকেও চমৎকৃত করেছিল। ভারতবর্ষ ও ইংলন্ডের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর সুখ্যাতি ফ্রান্সে পৌঁছতেও বিলম্ব হয়নি।

মাদ্রাজে থাকতেই স্বদেশীয় একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন ক্লাইভ। স্ত্রী লাভের পরে অর্থ সম্মান, একজন সার্থক মানুষের জীবনে যা কিছু আকাঙ্ক্ষিত থাকে সবই লাভ করলেন ক্লাইভ।

দরিদ্র দুঃস্থ পিতার অখ্যাত অবজ্ঞাত এক হতভাগ্য সন্তান ছিলেন, হলেন সম্মানে সম্পদে পদমর্যাদায় সমাজের একজন, দেশের গৌরবস্থল।

যুদ্ধের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ক্লাইভের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। বিশ্রাম লাভের জন্য তিনি ১৭৫৩ খ্রিঃ ইংলন্ডে ফিরে গেলেন।

দেশের মাটিতে তাঁর জন্য বিপুল সংবর্ধনা আর প্রচুর অভিনন্দন অপেক্ষা করছিল। আর্কট যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীর বাঁধভাঙ্গা উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতায় কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

দেশে সুখের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেননি ক্লাইভ। কিছুদিন পরেই মাদ্রাজের সেন্ট ফোর্ট ডেভিড দুর্গের লেফটেনান্ট কর্নেলের পদ নিয়ে ভারতবর্ষে চলে এলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই মাদ্রাজের গভর্নরের অবসর গ্রহণের কথা। স্থির ছিল, তিনি অবসর নিলে সেই পদের দায়িত্ব লাভ করবেন ক্লাইভ।

সেই সময়ে বাংলার নবাব ছিলেন যুবক সিরাজদ্দৌলা। তাঁর সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রবল বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। ততদিনে কলকাতায় ইংরাজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ গড়ে তুলেছে। শক্তি সংগ্রহ করে উদ্ধত হয়ে উঠছিল ইংরাজদের আচরণ।

ক্ষুব্ধ নবাব কলকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়াম অধিকার করে নিলেন। গভর্নর ড্রেক দলবল নিয়ে পালিয়ে কলকাতার অদূরে ফলতায় গঙ্গার ওপরে একটি জাহাজে আশ্রয় নিলেন।

ইংরাজদের বিপর্যয়ের কথা মাদ্রাজে যখন পৌঁছায়, তার কিছুদিন আগেই মাত্র দেশ থেকে ফিরে এসেছেন ক্লাইভ। কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর মতো একজন সাহসী রণনিপুণ ও তেজস্বী সেনানীর প্রয়োজন ছিল। তাই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ক্লাইভকেই সেই দায়িত্ব দিলেন।

১৭৫৭ খ্রিঃ বাংলায় আবারও এক কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ক্লাইভকে, যে সংগ্রামের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। যা ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ নামে সুপরিচিত।

পলাশীর যুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়ে চিরকালের মতো দুঃখের মেঘে আচ্ছাদিত করল ভারতের ভাগ্যাকাশ।

কলকাতায় যখন ব্রিটিশ শক্তি নবাবের হাতে বিপর্যস্ত তখন ফরাসীরা চন্দননগরে কেল্লা বানিয়ে বেশ ঝাঁকিয়ে বসেছে। নবাবের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্কও বন্ধুত্বের।

অপরদিকে ইংরাজদের অবস্থা টলমল। কলকাতার দখল হাতছাড়া। ফলতার কাছে এক জাহাজে সকলে কোণঠাসা। নবাবের হুকুমে দেশের লোকের ইংরেজের কাছে কোন জিনিস বিক্রিবাট্টা নিষিদ্ধ হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ক্লাইভ তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা নিয়ে উপস্থিত হলেন বাংলায়। এখানে পলাশী প্রান্তরে নবাবের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ক্লাইভ রহস্যজনক কূটকৌশল বিস্তার করে এক রক্তাক্ত বিশ্বাসঘাতকতার শিকারে পরিণত করেছিলেন বাংলার নবাবকে।

ভারতের সেই কলঙ্কময় ইতিহাস নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি ও পারিষদদের বিশ্বাসঘাতকতার কালিমায় মসীলিপ্ত। ক্লাইভের দিক থেকে পলাশীর যুদ্ধই তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি।

আর তাঁর এই কর্মকৃতিত্বের বলেই বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশের ভাবী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়।

পলাশীর প্রান্তরে নবাব সৈন্য ও ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল মাত্র নয় ঘন্টা। বিজয়ী ক্লাইভের তখন বয়স ছিল বত্রিশ। আর পরাজিত নবাব সিরাজদ্দৌলা ছিলেন সাতাশ বছরের তরুণ।

ক্লাইভের কূট কৌশলে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ পর্যবসিত হয়েছিল অভিনয়ে।

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করে ক্লাইভ সাফল্যের চূড়ান্ত শিখর স্পর্শ করলেন। ইংলন্ড উদ্বেল হয়ে উঠল তাঁর প্রশংসায়।

পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পরেই ১৭৬০ খ্রিঃ ইংলন্ডে ফিরে গেলেন ক্লাইভ। এদেশে থাকতে নানা অসদুপায়ে নবাবের প্রচুর টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। সেই টাকায় ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি হয়েছিলেন তিনি।

ইংলন্ডে অজস্র সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন ক্লাইভ। ১৭৬২ খ্রিঃ তিনি হলেন ব্যারন অব পলাশি। দুবছর পরেই নাইট উপাধি লাভ করে হলেন লর্ড রবার্ট ক্লাইভ।

পাঁচ বছর জীবনের চূড়ান্ত ভোগসুখ ও সম্মান উপভোগের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ১৭৬৫ খ্রিঃ বাংলার গভর্নর হয়ে এদেশে ফিরে এলেন। এই পদে দুবছর থাকার পরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইংলন্ডে ফিরে যান।

ভাগ্যদেবতা ততদিনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ক্লাইভের দিক থেকে। তাই এবারে সম্মানের ভূষণ নয়, ইংলন্ডে তাঁর ভাগ্যে জুটল নানা নিন্দা অপযশ ও অভিযোগের কলঙ্ক।

অভিযোগ পার্লামেন্টে আনা হল তাঁর বিরুদ্ধে। কোম্পানির সঙ্গেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কেন না, কোম্পানির কাজ করতে গিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন তিনি—কোম্পানিকে করেছেন বদনামের ভাগী।

পার্লামেন্টারী কমিশনের সামনে জবাবদিহি করতে হল ক্লাইভকে। অবশ্য বিচারে মুক্তি লাভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মাথায় চেপে ছিল জালিয়াতির অপযশ।

রাতারাতি যেন ইতিহাসের পটপরিবর্তন ঘটে গেল। জাতীয় নায়কের পদ থেকে এক ঘৃণ্য দুষ্কৃতি রূপে পরিগণিত হলেন ক্লাইভ।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে ইতিহাসের করুণ দৃশ্যান্তর নিঃশব্দে মেনে নিতে হয়েছিল ক্লাইভকে। স্বদেশবাসীকে সারা জীবনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি দিয়েছিলেন সাম্রাজ্য; আর তারা তাঁকে দিল অখ্যাতি অপযশ। কুটিলগতি ইতিহাসের প্রহসন বুঝি একেই বলে!

ক্লান্তিতে অবসাদে হতাশায় দেহে মনে ভেঙে পড়লেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিমান দুর্ধর্ষ ক্লাইভ। বয়সও ততদিনে পঞ্চাশে পৌঁচেছে। ভাগ্য প্রতিকূল, দেশবাসী প্রতিকূল। স্বাস্থ্যও অনুকূল হল না। ভগ্ন মনে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই শেষদিনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন তিন।

অবশেষে এল সেই অবধারিত দিন, ১৭২৫ খ্রিঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর।

সেদিন পরিবারের সকলকে নিয়ে বসেছেন তাস খেলতে। তাঁর ব্যবহারে কথায় কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ল না কারো।

তাসের দান চালতে চালতে হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে গেলেন ক্লাইভ। দরজায় খিল আঁটার শব্দ পাওয়া গেল। পরমুহূর্তেই দম্ দম্ পিস্তলের শব্দ।

আত্মহত্যা করে কলঙ্কিত জীবনের অবসান ঘটালেন রবার্ট ক্লাইভ।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রশস্তি রচনা করে লিখেছিলেন ঃ

"জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ সুউচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধন শিখর শ্রেণী, যেথায় গহনগুহা হতে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্য রূপে সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি। বিদায় কালের অর্ঘ মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোরে।"

সার্বভৌমিক জ্ঞানের সাধনাকেই যিনি জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রভৃতি জ্ঞানের সমুদয় শাখাতেই ছিল যাঁর স্বকীয় বিচরণ, বহুমুখী জ্ঞানের প্রশংসায় যিনি দেশে বিদেশে গুণীজনের দ্বারা স্তুত, তাঁর যথাযথ প্রশস্তি রচনা কবিগুরু ভিন্ন আর কার দ্বারা সম্ভব হত।

জীবিতকালে তিনি চলমান বিশ্ববিদ্যালয় নামে আখ্যাত হয়েছিলেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পন্ডিত স্যার মাইকেল স্যাডলার তাঁকে অভিহিত করেছিলেন এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে।

বহুমুখী প্রতিভা ও অপরিসীম জ্ঞানের স্তম্ভস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষাবিদ রূপে পরিচয়ও সামান্য নয়। ইউরোপীয় ও ভারতীয় মিলিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক দশটি ভাষায় ছিল তাঁর ব্যুৎপত্তি।

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথের আরো একটি পরিচয়, তুলনামূলক সাহিত্য ও ধর্মদর্শন বিচারে এবং দর্শন আলোচনায় গণিতের সূত্র প্রয়োগে ভারতে তিনিই পথিকৃৎ।

হুগলী জেলার হরিপাল গ্রামে ১৮৬৪ খ্রিঃ ৩ সেপ্টেম্বর ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পিতা মহেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী।

শৈশবেই মাতাপিতাকে হারিয়ে মাতুল রাধারমণ নানের আশ্রয়ে পালিত হন।

অসাধারণ কৌতূহল ও মেধা ছিল বালক ব্রজেন্দ্রনাথের সহজাত। এই কৌতূহলই উত্তরকালে তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল বহুমুখী জ্ঞানের স্পৃহা।

এখনকার স্কটিশচার্চ কলেজের সেকালে নাম ছিল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনসটিটিউশন। ১৮৮১ খ্রিঃ এখানে যখন তিনি বি.এ ক্লাসের ছাত্র, নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নরেন্দ্রই ভবিষ্যতে বিবেকানন্দ নামে বিশ্বখ্যাত হয়েছিলেন।

উভয়েই ছিলেন জ্ঞানের সাধক—সত্য-সন্ধানী। তাই গভীর বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। বয়সে নরেন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথের চেয়ে এক বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু পড়তেন এক ক্লাশ নিচে।

দুই বন্ধুই ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন। নিয়মিত তাঁরা উপাসনাতেও যোগ দিতেন।

১৮৮৪ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন ব্রজেন্দ্রনাথ। সেই বছর তিনিই ছিলেন প্রথম বিভাগে একমাত্র উত্তীর্ণ ছাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মজীবন শুরু হয় সিটি কলেজে, ইংরাজীর অধ্যাপক পদে। চাকরি লাভের অব্যবহিত পরে তাঁর বিবাহ হয়। পত্নী ইন্দুমতী ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের অনুরাগিনী।

সিটি কলেজে একবছর কাজ করার পরে ১৮৮৫ খ্রিঃ তিনি নাগপুর মরিস কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

প্রথমে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেও পরে অধ্যক্ষের পদের দায়িত্ব নিয়ে সব মিলিয়ে ১৮৮৭ খ্রিঃ পর্যন্ত তিন বছর এখানে তিনি কর্ম নিযুক্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ লিভিংস্টোন সাহেব চলে যাওয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার আহ্বান পেলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। মরিস কলেজ ছেড়ে তিনি চলে এলেন বহরমপুরে এবং দীর্ঘ নয় বছর অধ্যক্ষের পদে খ্যাতি ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করেন।

এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। কর্তব্যনিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগুণে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মী অধ্যাপকদেরও শ্রদ্ধা সম্মান অর্জন করতে সমর্থ হন।

সকলের সহায়তায় অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি নানা ভাবে কলেজের উন্নতি বিধান করেন। তাঁর অবদানের কথা স্বয়ং মহারাজা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতেন।

১৮৯৯ খ্রিঃ রোমে প্রাচ্যবিদ সম্মেলনের আয়োজন হয়। সেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই ছিল তাঁর প্রথম ইউরোপ যাত্রা।

প্রাচ্যদেশীয় পন্ডিতমন্ডলীর এই ঐতিহাসিক সমাবেশে তাঁর ভাষণে ব্রজেন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বের এমন রসমধুর বিশ্লেষণ করেন যে রাতারাতি তাঁর পান্ডিত্য ও সুগভীর জ্ঞানের খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

কুচবিহারে থাকাকালীন দ্বিতীয়বার ব্রজেন্দ্রনাথকে ইউরোপ যেতে হয়েছিল। সেবার তিনি গিয়েছিলেন ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য।

১৯১১ খ্রিঃ লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাতি কংগ্রেসে (Universal Races Congress) অতিথিরূপে যোগদানের আমন্ত্রণ আসে। ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং প্রধান বক্তা নির্বাচিত হন।

এবারে তাঁর ভাষণ, নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের সুচিন্তিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানভিক্ষু। জ্ঞানের অন্বেষণ ও অনুশীলকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রদের প্রতিও ছিলেন স্নেহপরায়ণ ও কর্তব্যসচেতন। তাই একজন সফল ও কৃতী অধ্যাপক রূপে ছাত্রমহলে তিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

সেই সময় বাংলার শিক্ষাজগতের অন্যতম রূপকার স্যার আশুতোষ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রাণপুরুষ। তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভাবান অধ্যাপকদের তিনি নিয়ে আসছেন এখানে।

ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যাপনা ও পান্ডিত্যের খ্যাতি স্যার আশুতোষেরও কর্ণগোচরে হয়েছিল। ১৯১২ খ্রিঃ ব্রজেন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আহ্বান জানালেন তিনি।

স্যার আশুতোষের সস্নেহ আহ্বানের মর্যাদা রক্ষা করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলেন না ব্রজেন্দ্রনাথ। তিনি এখানে ১৯১২ খ্রিঃ দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন।

সাত বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে করেন এবং স্নাতকোত্তর ক্লাশের ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জনে সমর্থ হন।

এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজেও নানাভাবে তিনি আশুতোষকে সহায়তা করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের কলকাতার জীবন নানা দিক থেকেই সুফলপ্রসূ হয়েছিল।

সংস্কৃত সহ প্রাচীন আধুনিক দশটি ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় তিনি পূর্বেই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানের ফলে সংগৃহীত তথ্যাদি সংযোগে এই সময়ে তিনি Positive Science of the Ancient Hindus নামে একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করে তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেন এবং পি-এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯১৫ খ্রিঃ এই নিবন্ধই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় তাঁরা গভীর জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসন্ধান এবং অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতের জ্ঞান সাধনার পরম্পরা সুপ্রাচীন। সেই সুদূর অতীতে ভারত থেকেই জ্ঞানের আলো যুগে যুগে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিস্মৃতপ্রায় গৌরবোজ্জ্বল সেই কীর্তিকাহিনী ব্রজেন্দ্রনাথ বিধৃত করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে।

এই বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি-এসসি উপাধি প্রদান করে।

বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন সময়ের ভাষণ ও রচিত নিবন্ধে। স্নাতকোত্তর ক্লাশে তাঁর সারগর্ভ ভাষণ ও বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা ছাত্রদের গভীর ভাবে প্রভাবিত করত।

বর্তমানে তুলনামূলক সাহিত্য ও দর্শন বিচারে এবং দর্শন আলোচনায় গণিতের সূত্র প্রয়োগ এক অতি প্রচলিত রীতি। ব্রজেন্দ্রনাথই ভারতে এই রীতির পথিকৃৎ।

১৯২১ খ্রিঃ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ওই বছরেই মহীশূর রাজ্যের তদানীন্তন মহারাজার আহ্বানে তাঁকে ওই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করতে হয়।

মহারাজ উক্ত পদ গ্রহণের জন্য প্রথমে অনুরোধ জানিয়েছিলেন স্যাডলার কমিশনের চেয়ারম্যান, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পন্ডিত স্যার মাইকেল স্যাডলারকে। তিনি সেই পদে প্রস্তাব করেন ব্রজেন্দ্রনাথের নিয়োগ।

নতুন কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে দায়িত্ব প্রতিপালন করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

সেই যুগে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূরের অগ্রগতি বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। একমাত্র এই রাজ্যেই তখনো পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে প্রশাসনিক কার্যেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। সেই দক্ষতার সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্য।

ফলে বিদ্যোৎসাহী মহারাজার গুণগ্রাহীতার অনুরোধে আরও গুরুতর দায়িত্বভার পরে তাঁকে প্রতিপালন করতে হয়।

ইতিমধ্যে ১৯২১ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ব্রজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যান এবং বিশ্বভারতীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

১৯২২ খ্রিঃ মহীশূরের শাসনতন্ত্র সংস্কারের জন্য যে সংসদ গঠিত হয় ব্রজেন্দ্রনাথকে করা হয় তার সভাপতি। দুই বছর পরেই ১৯২৪ খ্রিঃ তিনি মহীশূর সরকারের কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন।

মহীশূর রাজ্যের শাসনতন্ত্র সংস্কার বিষয়ে তিনি যে তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত ভাষণ দেন প্রধানতঃ তারই ভিত্তিতে ওই রাজ্যের নতুন শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছিল।

১৯৩০ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে খ্যাতি ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করেন।

মহীশূর ত্যাগ করার আগেই ১৯২৬ খ্রিঃ তিনি নাইট বা স্যার উপাধিতে ভূষিত হন এবং পরে গুণমুগ্ধ মহীশূররাজ তাঁকে 'রাজতন্ত্র প্রবীণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মহীশূরে ব্রজেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই ১৯৩০ খ্রিঃ তিনি মহীশূরের কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।

সেই সময় তাঁর দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। দুর্বল হয়েছে স্মরণশক্তি। কিন্তু অফুরন্ত কর্মশক্তি তাঁকে সতেজ প্রাণবন্ত রেখেছিল। কাজ ছাড়া তিনি থাকতে পারতেন না।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। দেশের জ্ঞানীগুণীরাও তাঁর সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হতেন না। তাঁর আদর্শ চরিত্র ও গৌরবদীপ্ত কর্মময় জীবন তাঁকে দেশবাসীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁরা তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল আচার্য সম্বোধনে।

কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে ১৯৩৩ খ্রিঃ ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হয়। সেই উপলক্ষে তিনি মূল্যবান ভাষণ দেন। জ্ঞানে কর্মে ও উপলব্ধিতে ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন অখন্ড সত্যের সাধক, বিশ্বপথিক। রাজা রামমোহনের সার্থক উত্তরসাধক।

১৯৩৫ খ্রিঃ ব্রজেন্দ্রনাথের বাহাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় এক সাড়ম্বর উৎসব পালিত হয়। সেনেট হলে এই উৎসবের আয়োজন করেছিল ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। তার কিয়দংশ এই প্রবন্ধের প্রথমেই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দু বছর পরেই ১৯৩৭ খ্রিঃ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে এক ঐতিহাসিক ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ব্রজেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। জীবনের সর্বশেষ প্রকাশ্য সভায় সভাপতির ভাষণে আজীবন সত্যের ও সুন্দরের পূজারী ব্রজেন্দ্রনাথ সেদিন দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "বিশ্বের মধ্যে মানুষকে আর মানুষের মধ্যে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই মানবতাকে সকল রকম সংকীর্ণতা মুক্ত করা যেতে পারে।"

মহীশূর থেকে ফিরে আসার পর প্রায় নয় বছর কাল দেশবাসী ব্রজেন্দ্রনাথের প্রেরণাদায়ী পবিত্র সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিল। দেহ জীর্ণ হলেও অটুট কর্মশক্তি নিয়েই তিনি সকলের মধ্যে বিচরণ করেছেন।

অবশেষে ১৯৩৮ খ্রিঃ ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর কর্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জীবন সায়হ্নে আত্মজীবনী লিখবার পরিকল্পনা করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। দুই খন্ডে সম্পূর্ণ করবার ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুর কয়েক বছব আগে এই কাজে হাত দেন তিনি।

দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসায় নিজের হাতে লেখার ক্ষমতা ছিল না। লেখার কাজটি তাঁর সেক্রেটারিই সম্পন্ন করছিলেন। তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম খন্ডের কাজ শেষ করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। কিন্তু দ্বিতীয় খন্ড শুরু করার আগেই মৃত্যুলোকের আহ্বান এসে পৌঁছেছিল। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মায়ীক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও বঙ্গ মাতার এই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁর দেশবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যে সকল বাঙালী মনীষীর কঠোর জীবনসাধনা ও গৌরবময় কর্মকৃতিত্বে বাঙালী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, শিল্প বিজ্ঞান, রাজনীতি, ব্যবসা, ক্রীড়া ও শরীর চর্চায় ভারতের প্রাগ্রসর জাতি হিসেবে এককালে বাঙালীর খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। প্রধানতঃ বাঙালী মনীষার অবিস্মরণীয় প্রজ্ঞার আলোকে রূপলাভ করেছে আধুনিক ভারতবর্ষ। বাঙালীজাতির গৌরবময় সে কীর্তিকাহিনী ভারত ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে জাতীয় জীবনের অতীত গরিমার সমস্ত উত্তরাধিকার বিস্মৃত হয়ে আজকের বাঙালী এক নগণ্য মূষিকে পরিণত। উত্তরাধিকারের আস্ফালন করার যোগ্যতাটুকুও তার অবশিষ্ট নেই। আত্মবিস্মৃতি আর পূর্বসূরীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা একটা গোটা জাতির জীবনে কী করুণ পরিণতি ঘটাতে পারে বর্তমান বাঙালী সত্তা তার প্রকৃষ্ট নজির।

অবক্ষয়ের ধারামুখে রুখে দাঁড়াতে না পারলে এই জাতির পুনরভ্যুদয়ের আশা দুরাশা মাত্র। আর এই দুরূহ কাজ সম্ভব করে তুলবার জন্য একান্ত প্রয়োজন আত্মচেতনার জাগরণ ঘটানো, পূর্বসূরীদের গরিমা-গৌরবের স্মরণের মধ্যেই নিহীত আছে সেই সঞ্জীবনী শক্তি। স্মরণে মননে সংকল্পে তাকেই করতে হবে ধ্রুবতারা।

মুখে যাঁরা ভাষা ফুটিয়েছেন, বুকে দিয়েছেন বল, মনেতে তেজ আর বাহুতে শক্তি, সেই মহান পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে তবে আবার ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভভ হবে।

বাঙালী আবার টেনে ধরার শক্তি পাবে ইতিহাসের ঝুঁটি। জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের পুনরধিকার পারবে প্রতিষ্ঠা করতে।

স্বজাতির কীতিমান পুরুষদের জীবন-সাধনা কর্মকৃতিত্ব হল স্পর্শমণির মতো। উত্তরপুরুষের স্থবির চেতনার তা নবজন্ম দান করে—সজীব সক্রিয় করে তোলে ধমনী।

তাই একদিন যেই বাঙালী সন্তান অতি সাধারণ স্তর থেকে নিজেকে অতি অসাধারণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন, তেমন একজনের কঠোর জীবনসংগ্রামের কথা তোমাদের শোনাব।

অসাধারণ সেই বাঙালী সন্তানের নাম রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। যেই যুগের বাঙালী যুবক জীবনে একটা মাসমাইনের চাকরিকেই জীবনের সার্থকতা গণ্য করত, পরাধীন মসীজীবীর স্বপ্নে বিভোর থাকত, সেই যুগে চলমান স্রোতের মূর্তিমান প্রতিবাদ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি।

একজন স্বাধীন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ব্যবসাক্ষেত্রে বেনিয়া ইংরাজের সমকক্ষ প্রতিভা যে বাঙালীরও রয়েছে তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

অবশ্য তার জন্য দরকার হয়েছে কঠোর পরিশ্রম আর সুদৃঢ় সঙ্কল্প। একজন সহায়সম্বলহীন মানুষ যে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় নিজেকে উন্নত করতে পারে, স্যার রাজেনের জীবন আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

জীবনে আঘাত আছে, দুঃখ, পরাজয় সবই আছে। কিন্তু কোনও কিছুতেই যারা সঙ্কল্পচ্যুত না হয়ে, আপন লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে পারে নিষ্ঠাভরে তাদের

জয় যে অনিবার্য তারই এক আদর্শ দৃষ্টান্ত রাজেন্দ্রনাথের জীবন। এমন জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারলে সমগ্র জাতির চরিত্রে আবার বেগ সঞ্চারিত হবে, সোজা হয়ে উঠবে নুয়ে-পড়া মেরুদণ্ড।

১৮৪৪ খ্রিঃ ২৩ জুন তারিখে চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার ভাবলা গ্রামে এক সাধারণ গৃহস্থের ঘরে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বারাসাতে মোক্তারী করতেন।

গাঁয়ের পাঠশালায় ভর্তি হবার বয়সেই, যখন মাত্র বছর ছয়েক তাঁর বয়স, সেই সময় ভগবানচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

অতি সামান্য রোজগার থেকে কোন সঞ্চয়ই রেখে যেতে পারেননি তিনি। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে সংসারে নেমে এল অন্ধকার।

নিঃসম্বল বিধবা শিশুপুত্রের হাত ধরে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হলেন। কায়ক্লেশে তিনি দুটি প্রাণীর অন্ন সংস্থানের জন্য প্রাণপাত করতে লাগলেন।

গ্রামের পাঠশালায় সামান্য বাংলা লেখাপড়া শিখেছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। বিধবা মায়ের সাধ ছেলেকে ইংরাজি স্কুলে লেখাপড়া শেখাবেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের কোন সাহায্য পেলেন না।

শেষে নিরুপায় হয়ে তিনি স্বামীর কমক্ষেত্র বারাসাতে পরিচিত এক ভদ্রলোকের দ্বারস্থ হলেন। তাঁর আশ্রয়ে রেখে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার আবেদন জানালেন।

এক সময়ে এই সদাশয় ভদ্রলোক ভগবানচন্দ্রের কাছ থেকে নানাভাবে উপকার পেয়েছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা বশে তিনি রাজেন্দ্রনাথের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিতে সম্মত হলেন। তাঁর বাড়িতেই আশ্রয় পেল পিতৃহীন বালক। তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল বারাসাতের স্কুলে।

লেখাপড়ায় বরাবরই মনোযোগী ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। তাই পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক হতে লাগল। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার আগেই কঠিন বসন্ত রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

রোগের তীব্র আক্রমণে জীবনসংশয় দেখা দেয় তাঁর। ভাগ্যক্রমে সে-যাত্রায় যমের মুখ থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু শরীর এমন ভেঙ্গে পড়ল যে পড়াশুনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

অসহায় বিধবা মা ছেলের স্বাস্থ্য উদ্ধারের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে আগ্রায় বসবাসকারী তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হল। ছেলেকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আবেদন জানালেন সেই ভাইয়ের কাছে। তিনি সম্মত হলেন।

দুর্বল রুগ্ন শরীর রাজেন্দ্রনাথের। সবে চোদ্দতে পা দিয়েছেন। সেই অবস্থায়

গ্রামের পরিচিত একজনের সঙ্গে চৌত্রিশ মাইল পায়ে হেঁটে তিনি উপস্থিত হলেন নবাবগঞ্জে এক আত্মীয়ের বাড়ি।

তাঁর কাছ থেকেই পেলেন সামান্য পথখরচ আর কিছু শীতবস্ত্র। সেই নিয়েই বালক রাজেন্দ্রনাথ বহুকষ্টে আগ্রায় পৌঁছলেন।

আগ্রায় বছর তিনেক ছিলেন তিনি। সেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু আকস্মিক ভাবে বাড়ি থেকে দুঃসংবাদ নিয়ে চিঠি এল। মা মৃত্যুশয্যায়, পত্রপাঠ তিনি যেন চলে আসেন।

সেইকালে অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া রীতি ছিল। গ্রামের বাড়িতে মা-ও যে তাকে সংসারী করাবার জন্য উৎসুক হয়েছেন, তা ভাবতে পারেন নি কিশোর রাজেন্দ্রনাথ। তাই চিঠি পাওয়া মাত্রই পড়াশুনা ফেলে রেখে ভাবলায় ফিরে এলেন।

এসে দেখেন মা সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় তাঁর বিয়ের বন্দোবস্ত করেছেন। সেই উদ্দেশ্যেই মার অসুখের মিথ্যা সংবাদ দিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে।

রাজেন্দ্রনাথ কিন্তু বেঁকে বসলেন। তিনি কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হলেন না।

কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে বিয়ে করতে হল। এই বাল্য বিবাহের ক্ষোভ তিনি সারাজীবনে ভুলতে পারেননি। পরবর্তীকালে যখনই সুযোগ পেতেন বাল্যবিবাহের পাপ থেকে দূরে থাকার জন্য তরুণদের উপদেশ দিতেন।

আর আগ্রায় ফেরা হল না। বিয়ের পর কলকাতায় এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে থেকে লন্ডন মিশনারী সোসাইটি স্কুলে পড়াশুনা করতে লাগলেন।

আগ্রায় খ্রিস্টান মিশনারীদের স্কুলে পড়াশুনা করতেন তিনি। অবৈতনিক ছাত্র হিসেবেই সুযোগ পেয়েছিলেন। কলকাতার স্কুলেও মিশনারীদের দয়াতেই তাঁর পড়াশুনা সম্ভব হয় এবং এই স্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

খ্রিস্টান মিশনারীদের দয়ার কথা সারা জীবন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন রাজেন্দ্রনাথ। যখন প্রভূত অর্থবিত্তের অধিকারী হয়েছেন, সুযোগ পেলেই খ্রিস্টান মিশনের সেবাকর্মে অকাতরে অর্থ দান করেছেন। দুঃখের দিনের কথাগুলো কখনও ভোলেননি তিনি।

যাঁদের কাছ থেকেই সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন, কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁদের স্মরণ করে গেছেন।

বাল্য শৈশব কৈশোর কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে তাঁর। তাই দারিদ্র্যকে জয় করার দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন জীবনের নিদারুণ বাস্তবতা থেকে।

ছেলেবেলাতেই সংকল্প করেছিলেন. অর্থের অভাব ঘোচাতে হবে। দশজনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। যেমন করেই হোক স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করবেন।

কেরানীগিরির পরাধীন চাকরিকে রাজেন্দ্রনাথ জীবনের অপচয় বলেই মনে করতেন। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কোন রকমে একটা চাকরি লাভের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত না করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা বলতে তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে শেখানো হতো ওভারসিয়ারির কাজ। তিন বছর পড়ার পর পরীক্ষা দিয়ে পাস করলে একটা সার্টিফিকেট পাওয়া যেত।

আত্মীয়ের বাসায় থেকে রাজেন্দ্রনাথ পড়াশুনা চালাতে লাগলেন।

তখন তো কেবল মাত্র পড়াশুনার চিন্তাই নয়। বাড়িতে রয়েছেন মা ও সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী। পুরো সংসারের ভার তাঁর কাঁধে। নিত্য অভাব অনটনের চাপ। তাই অবসর সময়ে ছাত্র পড়িয়ে সংসারে ঠেকা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু সংসারের চাপ ক্রমান্বয়ে এমনই বেড়ে উঠল যে সে চাপ সামলে তিন বছর পড়াশুনা চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। তাঁর আর ওভারসিয়ারির সার্টিফিকেট নেওয়া হল না। কলেজ ছেড়ে অর্থ উপার্জনের উপায় অনুসন্ধানে নামতে হল।

যে আত্মীয়ের আশ্রয়ে ছিলেন, রাজেন্দ্রনাথের নাজেহাল অবস্থা দেখে দয়াপরবশ চেষ্টাচরিত্র করে তিনি একটা চাকরির সন্ধান আনলেন। কিন্তু কেরানীর চাকরির জন্য আবেদন করতে রাজি হলেন না রাজেন্দ্রনাথ।

বাড়িতে মা বউ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন. নিজেরও অন্নসংস্থানের নিশ্চয়তা নেই, সেই অবস্থায় একটা নিশ্চিত চাকরির সুযোগ অবহেলা করছেন রাজেন্দ্রনাথ, তাঁর আত্মীয় এই ধৃষ্টতা সহ্য করতে পারলেন না। বিশেষতঃ তাঁরই আশ্রয়ে যখন রয়েছেন রাজেন্দ্রনাথ।

অনেক বুঝিয়ে, ভর্ৎসনাতেও যখন রাজি করানো সম্ভব হল না, বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক তাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন।

বাধ্য হয়ে পথে নেমে এলেন রাজেন্দ্রনাথ। সহায় সম্বলহীন, বন্ধুহীন অবস্থায় কলকাতার পথকেই এবারে অবলম্বন করলেন।

দরিদ্র বাঙালীর ছেলে হয়ে কেরানীগিরি করবেন না, স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করবার কথা ভাববেন—সেকালের সমাজে এই ভাবনা ছিল নিছকই হাস্যকর এক পাগলামী।

সেই পাগলামীর বশেই শেষ পর্যন্ত শেষ আশ্রয়টুকু থেকে বিতাড়িত হলেও ভেঙ্গে পড়লেন না রাজেন্দ্রনাথ।

কলকাতার পথে পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে লাগলেন।

পথে দেখা হল এক বন্ধুর সঙ্গে। নিজের দুরবস্থার কথা তাঁকে খুলে বললেন। সহানুভূতিশীল বন্ধুটি তাঁকে নিজের মেসে নিয়ে গেল।

সেখানে থেকেই অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা স্কুল মাস্টারির কাজ জুটল। মাসিক বেতন পনেরো টাকা।

স্কুল শিক্ষকের কাজ নিলেও নিজের আবাল্য পোষিত সংকল্পের কথা ভুললেন না রাজেন্দ্রনাথ। স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের কি উপায় করা যায়, কোথায় কিভাবে সুযোগ পাওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

চাকরি পাবার পর থেকেই মাসে দশটাকা করে নিয়মিত বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। পাঁচ টাকা দিয়ে কলকাতায় নিজের থাকা খাওয়ার খরচ চালাতে হত।

ফলে এই সময় অধিকাংশ দিনই তাঁকে একবেলা না খেয়ে থাকতে হত। দুবেলা টিফিনের কথা তো ছিল স্বপ্ন।

এক ছুটির দিনে রাজেন্দ্রনাথ কি মনে করে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন আলিপুরে চিড়িয়াখানায়। মনে ভাবনাচিন্তার অন্ত নেই। ক্লান্ত হয়ে সেখানে পুকুরের ধারে এসে বসলেন।

কাছেই সেই পুকুরের ওপরে একটা সাঁকো তৈরি হচ্ছিল। দেশীয় মজুরদের নিয়ে কাজ করছিলেন একজন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার।

সাহেবের সব কথা মজুররা বুঝতে পারছিল না। ফলে সাহেবকে কাজ বোঝাবার জন্য একই কথা বার বার বলতে হচ্ছিল। তাতে মাঝে মাঝে রেগেও উঠছিলেন তিনি। এই নিয়ে বেশ চেঁচামেচি হচ্ছিল কাজের জায়গায়।

রাজেন্দ্রনাথের সামনেই এই ঘটনা ঘটছিল। তিনি সাহেবের মনের অবস্থা বুঝতে পারছিলেন। এক সময় উঠে এগিয়ে গিয়ে সাহেবের বক্তব্য বিষয়টা তিনি বুঝলেন।

তারপর সাহেবকে বিনীত ভাবে বললেন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি বিষয়টা ওদের বুঝিয়ে দিতে পারি। সাহেব সম্মত হলেন। তখন রাজেন্দ্রনাথ নিজে মজুরদের সঙ্গে কাজে হাত লাগালেন।

তরুণ যুবকের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে সাহেব খুশি হলেন।

তিনি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন।

রাজেন্দ্রনাথ নিজের মনোবেদনা ও হতাশার কথা প্রকাশ করার একটা মনোমত সুযোগ এতদিনে পেলেন। আশান্বিত হয়ে অকপটে দুরবস্থার কথা জানিয়ে বললেন, আমি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে চাই। কিন্তু কোন সুযোগ

পাচ্ছি না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে একটা সুযোগ করে দিলে বাধিত হই।

সাহেব তাঁকে পরদিন তাঁর অফিসে দেখা করতে বললেন।

এই উদার স্বভাব সাহেবের নাম ব্রাডফোর্ড লেসলী। তিনি ছিলেন সেই সময়কার কলকাতা করপোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। পরে নাইট হুড পেয়ে স্যার ব্রাডফোর্ড লেসলী হন।

রাজেন্দ্রনাথ পরদিনই সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হলেন সাহেব এবং সেই দিনই তাঁকে করপোরেশনের একটা কাজের দায়িত্ব দিলেন।

ভারতের অন্যতম যশস্বী শিল্পপতি ও ইঞ্জিনিয়ার রাজেন্দ্রনাথের সুবিশাল কর্মজীবনের সেটিই ছিল প্রথম কাজ।

যথা সময়েই কাজটি সুসম্পন্ন করলেন তিনি। সাহেব খুশি হয়ে নতুন কাজের বরাত দিলেন তাঁকে।

এই ভাবে ধাপের পর ধাপ পার হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজেন্দ্রনাথ একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদার হয়ে উঠলেন। এতদিনের জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল রাজেন্দ্রনাথের।

গোড়ায় যে বিলাতি ঠিকাদার কোম্পানির ওভারসিয়ার রূপে কাজে নেমেছিলেন তিনি, পরে সেই মার্টিন কোম্পানিরই অংশীদার ও সর্বময় মালিক হন।

আজকের আধুনিক কলকাতা মহানগরীর অন্যতম গর্ব যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধ ও পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, এইগুলো নির্মিত হয়েছিল সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার রাজেন্দ্রনাথেরই তত্ত্বাবধানে। মার্টিন কোম্পানির রেলপথ স্থাপনের কৃতিত্বও তাঁরই।

একদিন যে কলকাতা সহরে তিনি উপবাসী অসহায় অবস্থায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেই কলকাতা সহর সময়ান্তরে অলঙ্কৃত হয়ে উঠল তাঁরই কর্মকুশলতায়। অবিচল সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রম মানুষকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকে। রাজেন্দ্রনাথ নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় এভাবে তাঁর জাতির জন্য এক নতুন পথ উন্মোচিত করে গেলেন।

প্রভূত অর্থ বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েও নিজের অশ্রুসজল বাল্য কৈশোরের কথা তিনি কখনো ভোলেন নি। জনহিতকর কাজে অকাতরে তিনি অর্থব্যয় করতেন। নিজের জন্মভূমি বসিরহাটের উন্নতিকল্পে তিনি বহু অর্থ দান করেছেন।

রাজেন্দ্রনাথ ১৯০১ খ্রিঃ প্রথমবার এবং ব্যবসায়ের প্রয়োজনে পরে কয়েকবার বিলাত যান। ১৯১১ খ্রিঃ তিনি কলকাতার শেরিফ হন। সম্মান মর্যাদায় সমাজের সর্বোচ্চ আসনে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল।

১৯৩১ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি-এস-সি (ইঞ্জিনিয়ারিং) উপাধিতে ভূষিত করে।

স্বজাতির সম্মুখে স্বাবলম্বী জীবনের অতুল কর্ম কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত রেখে কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ ১৯৩৬ খ্রিঃ ১৫ মে ইহলোক ত্যাগ করেন।

পেস্টালটসি

মানব সমাজে এমন বহুবিধ নিয়ম-নীতি সুযোগ-সুবিধা ক্রিয়াশীল রয়েছে, যা সভ্যতার নিয়ামক রূপে গণ্য হয়ে থাকে। এমনই একটি বিষয় হল শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

আজকের শিশু আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ। প্রতিটি জাতির পক্ষেই শিক্ষায় সহবতে সুষ্ঠুভাবে শিশুর জীবন গঠন এক সুমহান দায়িত্ব।

প্রকৃত শিক্ষাই মানুষের মনকে সজাগ সচেতন করে তোলে। সত্য ও সুন্দরকে ভালবাসতে শেখায়। তাই জীবনের প্রথম পর্বের শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

যুগে যুগে দেশে দেশে শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মনীষীরা চিন্তা ভাবনা করেছেন। যাকে শিক্ষা দিতে হবে তার সম্পর্কে কি পদ্ধতিতে কোন কোন বিষয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ইত্যাকার বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই আজও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলছে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অতি পুরনো এই বিষয়ে ইউরোপে প্রথম যিনি নতুন করে পথ প্রদর্শন করেছিলেন, একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জীবনপাত সংগ্রাম করে গেছেন, অথচ নিজের জীবনে তার সফল প্রয়োগ দেখে যেতে পারেননি, তাঁর কথাই এখানে বলবার চেষ্টা করব।

প্রতঃস্মরণীয় সেই মহান শিক্ষাগুরুর নাম পেস্টালট্‌সি। আশ্চর্য যে, তাঁর প্রদর্শিত প্রণালীকে আদর্শ করেই আজ জগতে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার হয়ে চলেছে।

১৭৪৬ খ্রিঃ ১১জানুয়ারী জুরিখে পেস্টালটসি জন্মগ্রহণ করেন। অতি সাধারণ এক পরিবারে জন্মে অতি সাধারণ অবস্থাতেই সারাজীবন দুঃখকষ্টের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেছেন তিনি। তাই তাঁর জীবনের অনেক বিষয়ই আজও রয়ে গেছে অজানা।

বাল্য শৈশব কেমন কেটেছে, কোথায় শিক্ষালাভ করেছেন, এসব বিষয় এতদিন পরে অনুমান নির্ভর। তবে তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি নিজের সম্পর্কে

যে ধারণা দিয়েছেন নানা লেখায় তাতে বোঝা যায়, তাঁদের তিন ভাইবোনের শিক্ষার বিষয়ে মা বাবা উভয়েই ছিলেন খুবই সজাগ। বিশেষ করে মায়ের প্রভাব পেস্টালটসির জীবনে খুবই গভীর হয়েছিল।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে পিতৃহারা হন তিনি। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিধবা মা সংসারে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন।

কিন্তু তিনি ছিলেন এক অসাধারণ নারী। দুরবস্থার মধ্যেও কখনো মনোবল হারান নি। অপার স্নেহে ও সতর্ক যত্নে সন্তানদের মানুষ করত লাগলেন।

বাবার মৃত্যুর পর মায়ের জীবন ও বাড়ির অভিজ্ঞতা থেকে পেস্টালটসি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেন।

এই শিক্ষাই তিনি আজীবন মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'মায়ের মতো শিক্ষক পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। স্নেহময় পিতা তাঁর সন্তানকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, শিক্ষকের উচিত ছাত্রকে সেভাবে দেখা। লেখাপড়া শেখার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে, স্নেহ এবং ভালবাসা।'

বস্তুতঃ যেসব বিষয়ের ওপরে শিক্ষার ভিত দাঁড়িয়ে, সেই বিষয়গুলোই নতুন করে তুলে ধরেছিলেন তিনি।

উনিশ বছর বয়সে খবরের কাগজে পেস্টালটসির একটি সমালোচনামূলক রচনা ছাপা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ক্ষমতাসীন সরকারের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। ফলে রাজদ্রোহের অপরাধে এই সময় তাঁকে সাময়িকভাবে কারারুদ্ধ হতে হয়।

দরিদ্র কৃষকেরা সমস্ত জমিদারদের দ্বারা শোষিত হত। প্রতিবাদের ভাষা ছিল না তাদের মুখে, বুকে ছিল না সাহস। দরিদ্র কৃষকদের অসহায়তা পেস্টালটসিকে পীড়া দিত। তাদের স্বার্থরক্ষার চিন্তায় খুবই অধীর হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি স্থির করলেন আইনের শিক্ষা নেবেন। তাহলে আদালতে কৃষকদের স্বার্থের সমর্থনে দাঁড়াতে পারবেন।

এই সময় ইউরোপের মহৎ চিন্তার উদগাতা, মানবতার পূজারী দার্শনিক রুশোর কিছু লেখা পড়ে পেস্টালটসির জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

রুশো প্রচার করেছিলেন, সভ্যতার আড়ম্বর মানুষকে প্রকৃতির থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, দুঃখ তার তাই হয়েছে নিত্যসঙ্গী। সভ্যতার নানা আসবাব ত্যাগ করে মানুষকে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে হবে। জীবনযাত্রার প্রয়োজনে যেটুকু দরকার তাই নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

সেই কালে রুশোর এই শিক্ষার প্রভাবে অনেক মানুষেরই জীবনধারা পাল্টে

গিয়েছিল। পেস্টালটসিও রুশোর লেখা পড়ে আইন পড়ার বাসনা ত্যাগ করলেন। ফিরে গেলেন গ্রামে, সামান্য কিছু জমির ব্যবস্থা করে চাষবাসের কাজে মন দিলেন।

এই সময়ে এক অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। যথাসময়ে তাঁর একটি ছেলে হল।

ছেলেটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছেলের লেখাপড়ার কি ব্যবস্থা করবেন সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করতে লাগলেন।

তাঁরা তিন ভাইবোন শৈশবে মা ও বাবার স্নেহচ্ছায়ায় শিক্ষালাভ করেছেন। সেই স্মৃতি তাঁর মধ্যে সজাগ ছিল। নিজের ছেলের শিক্ষার প্রসঙ্গে তাঁর মনে হল অন্য সব ছেলেরও ভাল করে লেখাপড়া শেখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি কৈশোরেই তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। বাড়িতে স্কুলে জোর করে, বেতের ভয় দেখিয়ে যেভাবে নানা বিষয় শেখাবার চেষ্টা করা হয়, তার ফলে শিশুমনের অকাল মৃত্যু ঘটে। কেউ বুঝতে চায় না যে কয়েকটা কথা শেখাবার জন্য, এত পরিশ্রম করে, অর্থব্যয় করে যা করা হচ্ছে তার পরিণাম কি দাঁড়াচ্ছে।

অনভিপ্রেত বোঝার চাপে শিশুদের স্বাভাবিক মনটি মরে যায় বলে তারা শেখানো কথা মনে রাখতে পারে না। মনে থাকলেও জীবনে কোন কাজে লাগে না। জীবনে যা কাজে লাগে না সে শিক্ষার প্রয়োজন কতটুকু?

পেস্টালটসি ভাবতে লাগলেন কোমল মনটি মেরে না ফেলে কি করে ছেলেকে মানুষ করা যায়।

শেষ পর্যন্ত তিনি মনস্থির করে ফেললেন। স্ত্রীর যা টাকাকড়ি ছিল তা দিয়ে একটা আশ্রম খুলে ফেললেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনুনয় বিনয় করে কুড়িটি ছেলেও জোগাড় করলেন। তাদের বাড়িতে রেখে পুত্রস্নেহে নিজের মনের মতো করে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পেস্টালটসির শিক্ষাপ্রণালী তাঁর ছাত্রদের অভিভাবকদের পছন্দ হল না। তিনি লেখাপড়া শেখানোর নামে ছেলেদের নিয়ে খেলাতেই মেতে থাকেন। এই অভিযোগ তুলে কুড়িটি ছেলেকেই একে একে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেলেন।

লেখাপড়া শিখতে এসে বাচ্চারা যদি কেবল খেলাই শিখতে পায় তাহলে কোন অভিভাবক আর তা মেনে নিতে পারেন?

কিন্তু পেস্টালটসির কাছে এ ছিল দামী খেলা। তার পেছনেই দেখতে দেখতে তাঁর সর্বস্ব ব্যয় হল। শেষ পর্যন্ত স্কুলটাও উঠে গেল।

তারপর এই দুঃসাহসী স্কুল মাস্টারের খোঁজখবর আর কেউ পায় নি দীর্ঘ আঠারোটি বছর।

কেবল ভিটেমাটিটুকুই যা সম্বল বলতে ছিল। দুবেলা নিয়মিত খেতেও তাঁরা পেতেন না। বাইরে বেরুবার উপযুক্ত পোশাকও তাঁর থাকতো না। তবুও সত্যিকারের মানুষ গড়ার শিক্ষার ব্যবস্থা কি করে করা যায়, সেই ভাবনা একদিনের জন্যও তিনি ভুলতে পারেন নি।

ধ্যানরত যোগীর মতো দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে নিভৃত নিবাসে থেকে কেবলই ভেবেছেন।

তারপর একদিন কলম ধরলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা ভাবনার কথা গল্পের ছলে লিখলেন। জার্মান ভাষায় লিখিত তাঁর এই বইটির নাম Leonard and Gertrude. এই বইতে তিনি লিখেছেন, Gertrude নামের একটি মেয়ে কি করে ধীরে ধীরে তার স্বামীর মনোভাব বদল করল, আর নিজের সংসারের সঙ্গে গোটা গ্রামেই নিয়ে এল এক নতুন জীবন। সেই স্বর্গীয় পরিবেশে গ্রামের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠতে লাগল দেবশিশুদের মতো।

বইটি প্রকাশিত হলে কোন কোন মহলে প্রশংসিত হল। সুইস সরকার একটি সোনার মেডেল দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করল।

পেস্টালটসির তখন সংসারের অন্ন সংস্থানেরই সঙ্গতি নেই। তাই পুরস্কার পাওয়া মেডেলটি বিক্রি করে দিতে হল খাবার কেনার জন্য।

পুরস্কারে উৎসাহিত হয়ে এরপর তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতগুলি নিয়ে ছোট ছোট বই লিখতে লাগলেন।

তাঁর ধারণা ছিল, শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে নিজের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী কাজ করার একটা সুযোগ কোন না কোন ভাবে পেয়ে যাবেন। প্রয়োজন কিছু অর্থের। তাহলেই তাঁর ধারণাকে তিনি সত্যে রূপ দিতে পারেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বইগুলো সমাদর পেল না। কোন লোকও এগিয়ে এল না তাঁকে সহযোগিতা করতে।

সেই সময়েই ১৭৯৮ খ্রিঃ দেখা দিল রাজনৈতিক বিপর্যয়। ফরাসীরা সুইজারল্যান্ড আক্রমণ করে বসল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সুইজারল্যাণ্ডের পতন হল, ফরাসীদের দখলে গেল দেশ।

যুদ্ধের ফলে অনেক শিশুই অনাথ হয়ে পড়েছিল। ফরাসী সরকার এই শিশুদের Stanz নামক জায়গায় একটা শিবিরে নিয়ে তুলল।

পেস্টালটসি একদিন জানতে পারলেন শিবিরের শিশুদের দেখাশুনা করার জন্য উপযুক্ত লোকের সন্ধান করা হচ্ছে।

আশান্বিত হয়ে উঠলেন তিনি। নিজের ধারণাকে সত্যি করে তোলার এই

তো পরম সুযোগ। এই সুযোগ হাতছাড়া হতে দিলেন না পেস্টালটসি। ধরা-করা করে কাজটি নিলেন।

শিবিরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এরপর তিনি নেমে পড়লেন কাজে। তাঁর প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে কয়েকমাসের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সহবতের অভাবনীয় উন্নতি ঘটল।

তদারকে এসে সরকারী প্রতিনিধি বিস্মিত হলেন এবং পেস্টালটসির শিক্ষা-প্রণালীর প্রশংসা করলেন। কিন্তু ভাগ্য মন্দ পেস্টালটসির। কিছুদিন পরেই তাঁকে সেই শিবির ত্যাগ করতে হল।

যুদ্ধের প্রয়োজনের মুখে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়টার কোন গুরুত্ব রইল না। অনাথ শিশুদের শিবিরে করা হল আহত সৈনিকদের হাসপাতাল নিরাশ হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলেন পেস্টালটসি।

সামান্য সময়ের জন্য হলেও তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণাকে রূপ দিতে পেরেছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর শিক্ষাপ্রণালী কেবল মিথ্যা কল্পনা মাত্র নয়।

সাফল্যের আনন্দে এই সময় এক অসম্ভব কাজ করে বসলেন তিনি। বহু চেষ্টা করে নেপোলিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর শিক্ষাপ্রণালী তাঁকে বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু রণোন্মাদ সমরনায়ক সেদিন তাঁর যুদ্ধজয়ের উন্মাদনায় বিভোর ছিলেন। কোন স্কুলমাস্টারের তুচ্ছ শিক্ষাপ্রণালীর স্থান কোথায় সেখানে?

নেপোলিয়ন সরাসরি বলে দিলেন, এ.বি.সি নিয়ে ভাবনার সময় আমার এখন নেই।

তবুও আশা ছাড়লেন না পেস্টালটসি। তাঁর উদার দূরদৃষ্টি যে কোনও ক্ষুদ্র সীমারেখায় আবদ্ধ ছিল না! তা দেশ জাতির পরিধি অতিক্রম করে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ গতিপথ আলোকিত করছিল। তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারতেন, মহাকালের রথচক্রতলে সবকিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার আলো অবিনশ্বর। তার গতিধারা কেউ রোধ করতে পারে না। আর অনাগত দিনে সমাজ, জাতি, দেশ, সভ্যতার ধারক বাহক যারা হবে, বর্তমানের সেই শিশুদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এক সুমহান কর্তব্য।

সেই কর্তব্যবোধের প্রেরণাতেই তিনি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ফলপ্রসূ শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে চিন্তা ভাবনায় ডুবে থেকেছেন। নিজের চিন্তাকে রূপ দিতে গিয়ে হয়েছেন সর্বস্বান্ত। পেয়েছেন মানুষের অবজ্ঞা অবহেলা। তবু নিরস্ত হননি। নিজের মতামত দেশের লোককে জানাবার জন্য লিখেছেন বই। কেউ তাঁর কথায় সাড়া দেয়নি। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেনি।

পেস্টালটসি নিজের সংকল্পে ছিলেন অনড়। কেউ মানুক না মানুক, তাঁর কথা জগৎকে শোনাতে হবে, বোঝাতে হবে। চেষ্টায় নিরত না থেকে তাঁর যে স্বস্তি নেই।

আবার কলম তুলে নিলেন পেস্টালটসি। আগের বইখানির সঙ্গে যোগ রেখে Gertrude-এর কাহিনীই রচনা করলেন। এ বইয়ের নাম দিলেন How Gertrude Teaches her children।

তিনি নিজে যে পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়েছেন তাই বিশদভাবে তুলে ধরলেন Gertrude-এর মধ্য দিয়ে।

এবারে অনাদৃত হলেন না। বইখানি শিক্ষিত মহলে সমাদৃত হল। দেশের পণ্ডিতজনেরা তাঁর শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

এবারে দুঃখের বোঝা কিছুটা লাঘব হল। সেই সঙ্গে সংসারের অভাবও অনেকটা ঘুচল।

পেস্টালটসি ১৮০৫ খ্রিঃ Yverdune-এ একটা স্কুল খুললেন। এবারে আর ছাত্রের জন্য দোরে দোরে ধন্না দিতে হল না আগের মতো।

সমাদৃত বইয়ের কল্যাণে অবস্থার অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছিল। একটি দুটি করে বেশ কিছু ছাত্রও জুটে গেল। প্রাণমন ঢেলে নিজস্ব পদ্ধতিতে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে লাগলেন তিনি।

শিক্ষক হিসাবে পেস্টালটসির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। দিনে দিনে ছাত্রের সংখ্যার সঙ্গে তাঁর স্কুলেরও উন্নতি হতে লাগল।

এক এক করে সেই স্কুল নিয়েই কেটে গেল কুড়িটি বছর। ততদিনে ইউরোপের দেশে দেশে পরিচিতি লাভ করলেন পেস্টালটসি। তাঁর শিক্ষাপ্রণালী শিখবার জন্য নানা দেশ থেকে লোক আসতে লাগল তাঁর কাছে। দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে গেল তাঁর চিন্তার ফসল, সাফল্যের গৌরব।

নানা উত্থানপতনের মধ্যে দিয়েই সারা জীবনের পথ হেঁটেছেন পেস্টালটসি। সৌভাগ্য তাঁর কোন দিনই স্থায়ী হয়নি।

এবারেও হল না।

কুড়ি বছর একাদিক্রমে চলার পর একদিন নানা কারণে Yverdune-এর স্কুলটিও উঠে গেল। তীব্র নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। বুকভরা বেদনা নিয়ে ১৮২৭ খ্রিঃ ফিরে এলেন নিজের গ্রামে। তাপর নিঃশব্দে একদিন বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

ছেলেমেয়েদের আদর্শ মানুষ করে গড়ে তুলবার যে প্রণালী পেস্টালটসি বলে গেছেন, পৃথিবীর মানুষ কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করতে পারে নি। সময়ের

বিবর্তনে তাঁর অনেক পদ্ধতিই আজ বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মূল বিষয়গুলোই আজও জগতের শিশু শিক্ষার প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করছে।

পেস্টালটসির শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান কথাই হল, যাকে শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষককে সবার আগে সেই ছাত্রের মন মানসিকতাকে জানতে হবে। শিশু মনকে উপেক্ষা করে কোন শিক্ষাই কার্যকরী হতে পারে না।

জাঁ জাক রুশো

আজন্ম মানবতার অনুরাগী ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু, মানুষের দুঃখে সংবেদনশীল হৃদয় জাঁ জাক রুশো মানব ইতিহাসের সব চেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব।

১৭১২ খ্রিঃ ২৮শে জুন জেনেভা শহরের এক সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা আই জাক ঘড়ির ব্যবসা করতেন। মা সুজান ছিলেন সুন্দরী বিদুষী। তাঁর চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ হয়েছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে রুশো মায়ের অনেক গুণ লাভ করেছিলেন।

জন্মের অল্প কয়েকদিন পরেই মাতৃহারা হন রুশো। ধাত্রীর সেবা যত্নেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন।

বাবার উৎসাহে পড়ালেখার প্রতি তাঁরা আগ্রহ ভালবাসা সৃষ্টি হয় বাল্য বয়সেই। মায়ের সংগ্রহে রাখা বই বাবা তাঁকে তাঁর আট ন বছর বয়সেই পড়ে শোনাতেন।

দশ বছর বয়স পর্যন্ত বাবার সাহচর্য পেয়েছিলেন রুশো। এক ফরাসী অফিসারের সঙ্গে বিবাদকে কেন্দ্র করে অভিযুক্ত হয়েছিলেন আই জাক। তাঁর নামে গেপ্তারি পরোয়ানা বেবিয়েছিল। ফলে বালক রুশোকে বাড়িতে রেখেই তাঁকে জেনেভা থেকে পালিয়ে যেতে হয়।

এই সময় কাকা বার্নাড তাঁর দেখাশোনার ভার নেন। কাকার ছেলেও ছিলেন রুশোর সমবয়সী। দুই জনকেই লেখাপড়া শেখাবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় এম্ লাঁবেসিয়ের নামে এক গ্রাম্য যাজকের বাড়িতে।

খোলামেলা গ্রাম্য পরিবেশে দুই ভাইয়ের দিন ভালই কাটতে লাগল। মায়ের অভাববোধ সংগুপ্ত ছিল বালক রুশোর অন্তর্লোকে। তাই এখানে আসার পর যাজকের সুন্দরী কুমারী বোনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন তিনি।

ত্রিশ বছরের এই শিক্ষয়িত্রী পড়াতেন দুই ভাইকেই। নারীসত্তার সহজাত

বোধ থেকেই তিনি সম্ভবত রুশোর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই স্নেহের শাসনের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে মিশে থাকত কঠোরতা। তাতে মানসিকভাবে আহত হতেন বালক রুশো, কিন্তু সেই মনোবেদনা প্রকাশ করতে পারতেন না।

এই সময়ের অনুরাগ ভালবাসার প্রভাব রুশোর জীবনে গভীর ছায়াপাত করেছিল।

সম্ভবতঃ রুশোর অনুরক্তি ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে উঠছিল। তাই একদিন তুচ্ছ অপরাধে দুই ভাইকে লাঁবেসিয়ের স্কুল ছাড়তে হল।

দুই বছর পরে তাঁরা আবার ফিরে এলেন জেনেভায়।

সেই সময় রুশোর বাবা আত্মগোপন করেছিলেন কাছেই এক গ্রামে। রুশো মাঝে মাঝেই যেতেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

সদ্য কৈশোরে উত্তীর্ণ রুশো এখানে পরিচিত হন ডুলজঁ ও গোঁতা নামে দুই তরুণীর সঙ্গে। তেরো বছরের রুশো তাঁর চাইতে সাত আট বছরের বড় দুই তরুণীর প্রতি ক্রমেই এক অসম অনুরাগে জড়িয়ে পড়লেন।

কিন্তু এই প্রেম বেশিদূর গড়াবার আগেই কাকা রুশোকে এক কারখানায় কাজে ঢুকিয়ে দিলেন।

উদ্দাম স্বাধীন জীবন থেকে এবার এক দমবন্ধ হওয়া বদ্ধ জীবনে বন্দি হলেন তিনি। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও কাজে সামান্য ভুলত্রুটির জন্য বকাঝকা মারধোর জুটতে লাগল কপালে।

কারখানার এই পরিবেশ রুশোর মনকে পীড়িত করতে লাগল। রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইতেন। কিন্তু মনের জ্বালা মেটাতে বেশি কিছু করার সুযোগ পেতেন না। আক্রোশ মেটাতে প্রায়ই হাতের কাছের দরকারী এটা সেটা চুরি করে সরিয়ে ফেলতেন।

কারখানার শ্রমিক জীবন, মাঝেমাঝে ধরা পড়ে শেয়াল-কুকুরের মতো মারধোর খেতে হত।

এই বন্দি নির্যাতিত জীবনেও রুশোর শান্তির আশ্রয় ছিল একটি জায়াগা। নিয়মিত কিছু না কিছু পড়ার অভ্যাসটা বরাবরই ছিল। মন যখন অশান্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠত তিনি স্বস্তি লাভ করতেন বই হাতে নিয়ে।

কারখানার চার দেয়ালের দমবন্ধ পরিবেশ থেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার জন্য সময় সুযোগ মতো গিয়ে বসতেন কোনও লাইব্রেরীতে। পছন্দমতো বই নিয়ে তাতে ডুবে যেতেন।

এই সময় থেকেই মনের অবচেতনে জন্ম নিয়েছিল এক বিদ্রোহী সত্তা। সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে বাঁধভাঙ্গা বিদ্রোহের অঙ্কুরোদ্গম তাঁর চরিত্রে এভাবেই হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত কারখানার নিশ্চিত জীবনের বন্ধন একদিন ছিন্ন করতে হল তাঁকে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনেও ষোল বছর বয়সে পথে এসে নামলেন। কোথায় যাবেন কি করবেন কিছুই স্থির নেই। অনির্দিষ্ট পথই হল তাঁর আশ্রয়।

ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন ক্যাথলিক চার্চের এক পরিচিত যাজকের বাড়িতে। যাজককে জানালেন, তিনি পড়াশুনা করতে চান। তাঁর আগ্রহভরা চোখের দৃষ্টিতেও ছিল সেই আকুতি।

সহৃদয় যাজক রুশোকে পাঠিয়ে দিলেন অ্যানসিতে, ধর্মপরায়ণা এক নারী মাদাম ওয়ারেনের কাছে।

ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী মাদাম ছিলেন দয়ালু ও উদার। বিধবা এই মহিলার বয়স ছিল আঠাশের কোঠায়। অপরূপ সুন্দরী। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন রুশো।

সঙ্গের চিঠিতে যাজক মশাই তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখে জানিয়েছিলেন। চিঠি পড়ে দয়াবতী মাদাম বললেন, এই বয়সে ঘর ছেড়ে আসা বড় দুর্ভাগ্যের। তুমি এখানে থেকেই পড়াশুনা কর, আমি সাধ্যমত সাহায্য করব। তাঁর আশ্রয়েই রয়ে গেলেন রুশো।

মাদার ওয়ারেনের জীবন ছিল ঝঞ্ঝা তাড়িত বড় বিচিত্র। ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিদুষী কন্যা। বিবাহও হয়েছিল সমপর্যায়ের এক পরিবারে। সেই সূত্রে রাজার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন।

বিবাহিত জীবন তাঁর সুখের হয়নি। সেই গ্লানির মধ্যেই অকালে স্বামী বিয়োগ হয়েছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পরে পূর্বপরিচয়ের সুযোগে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর হল। রাজা তাঁর জন্য মাসোহারা বন্দোবস্ত করে দিলেন।

তাঁদের সম্পর্ক সমাজের মানুষ ভালচোখে দেখল না। ফলে বাধ্য হয়ে অ্যানসিতে বাস পরিবর্তন করতে হয়েছিল মাদামকে।

প্রাচুর্যের মধ্যেই বসবাস। তাই সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর মানুষজনের আনাগোনা এখানেও হতে লাগল। দয়ার্দ্র হৃদয় মাদাম সব বুঝতে পেরেও কাউকে কখনো বিমুখ করতেন না।

বুদ্ধিদীপ্ত ভাবোচ্ছল চেহারা ছিল রুশোর। সহজেই মাদামের স্নেহ ভালবাসা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। তাঁর ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি পড়াশুনার জন্য রুশোকে পাঠিয়ে দিলেন তুর‍্যার ধর্মীয় শিক্ষালয়ে।

এখানে এসে চরম অস্বস্তিতে পড়লেন তিনি। ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুকঠোর বাধানিষেধ নিয়ম-নীতি তাঁর স্বাধীনতা পিয়াসী মনে বিরাগ সৃষ্টি করল। তথাপি নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তাতেই বন্দিশালার বন্ধন তাঁকে মেনে নিতে হল। ভাবলেন শিক্ষা শেষ হলে নিশ্চয় ভাল কোন চাকরি জুটবে।

প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় উপদেশ আর তাত্ত্বিক জ্ঞানে মনোনিবেশ করলেন। যথাসময়ে পাঠ্যক্রম শেষ হল।

কিন্তু যার আশায় দিন গুণছিলেন, সেই চাকরি কোথায়? আশা পূর্ণ হল না। মাত্র বিশ ফ্রাঁ সম্বল করে পথে নামলেন রুশো।

এতদিন তাঁর সমস্ত দায়িত্বই বহন করেছেন মাদাম। তাই প্রথমে তাঁর কাছে ফিরে যাবার কথা মনে হলেও সঙ্কোচে যেতে পারলেন না। ভাবলেন, আর কেন তাঁর বোঝা হয়ে থাকা।

ঘুরতে ঘুরতে একজায়গায় এসে একটা চাকরির সন্ধান পেলেন রুশো। শুনলেন এক কাউন্টেস বাড়ির পরিচারকের সন্ধান করছেন।

রুশো কাজের প্রার্থী হয়ে দেখা করলেন কাউন্টেসের সঙ্গে। বহাল হলেন কাজে। বাড়ির আরও অনেক পরিচারক পরিচারিকার মধ্যে ঠাঁই হল তাঁর।

নারীর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ রুশোর আবাল্যের সহচর। যেখানেই গেছেন, নারীর সঙ্গ তাঁকে তীব্র আকর্ষণে জড়িয়েছে। এ যেন তাঁর অপ্রতিরোধ্য নিয়তিরই বিধান। এখানে, নতুন কর্মস্থলেও এক অল্প বয়সী সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী পরিচারিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন।

অল্পদিনেই জন্ম নিল গভীর প্রেম। শান্ত ভীরু স্বভাবের গ্রাম্য মেয়েটিকে সর্বদা খুশি রাখার জন্য ব্যস্ত থাকতেন রুশো। একদিন সম্ভবতঃ তাকে দেবার জন্যই তিনি গৃহকর্ত্রীর একটি ফিতে চুরি করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ধরা পড়ে গেলেন এবং জেরার মুখে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তিনি বলে দিলেন, তরুণী পরিচারিকাটি তাঁকে দিয়েছে ফিতাটি।

সরল প্রকৃতির মেয়েটি রুশোর কথার প্যাঁচ ধরতে পারেনি। সে অকপটে জানাল, সে রুশোকে ফিতে দেয়নি।

কিন্তু নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য মেয়েটির কথার জোর প্রতিবাদ করলেন রুশো। ভীরু মেয়েটি নিরুপায় হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

শেষ পর্যন্ত দুজনেই অপরাধী সাব্যস্ত হলেন এবং চাকরি হারালেন।

নিরপরাধী মেয়েটি চুরির অপবাদ মাথায় নিয়ে এরপর কোথায় হারিয়ে গেল। রুশো পরে অনেক খোঁজ করেও জানতে পারেননি। এই ঘটনা তাঁকে তীব্র অপরাধবোধে সারাজীবন পীড়া দিয়েছে।

রুশোর পরের চাকরিস্থল এক ধনী পরিবার। সেখানে তিনি গৃহকর্তার ছেলের শিক্ষকতার দায়িত্ব পেলেন। আজন্ম শিক্ষানুরাগী রুশো। এতদিন পরে এখানে আবার পড়াশুনার সুযোগ পেলেন। নিজে পড়েন, ছাত্রকে পড়ান। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চিন্ত জীবন।

কিন্তু এই একঘেয়ে জীবনে অভ্যস্ত থাকা রুশোর স্বভাববিরুদ্ধ। কিছুদিন পরেই তাঁর অস্থির মন পালাই পালাই করতে লাগল। একদিন বাঁধন ছেঁড়ার ডাকও এসে পৌঁছল।

আলাপ হল বাকল নামে এক ভবঘুরে তরুণের সঙ্গে। সে পায়ে হেঁটে চলেছে জেনেভায়। শুনে রুশোর মন আনন্দে নেচে উঠল।

মনের স্বচ্ছ চেতনায় বুঝি মাদাম ওয়ারেনের সুন্দর মুখের টানও প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে ছিল তাঁর মন। জেনেভা যেতেই পড়বে অ্যানসি—মাদাম ওয়ারেনের কটেজ।

কথা নেই বার্তা নেই, বাকল-এর সঙ্গেই একদিন জেনেভার দীর্ঘ পথে রওনা হলেন রুশো।

দীর্ঘদিন মাদামের সঙ্গে দেখা হয়নি। এখন তিনি তাঁকে আগের মতোই সহজভাবে নেবেন কিনা এমন আশঙ্কা যতই তিনি অ্যানসির কাছাকাছি হচ্ছিলেন, তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করতে লাগল।

কিন্তু কয়েকদিনের পথ চলার শেষে ন্যানসিতে পৌঁছে সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তিনি মাদামের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাত দুটি ধরে নতজানু হয়ে রুদ্ধ আবেগে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

মাদামের স্নেহ-কাতর মাতৃহৃদয়ও রুশোকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল। তিনি পুত্রস্নেহে রুশোকে বুকে টেনে নিলেন।

সবে কুড়িতে পা দিয়েছেন রুশো।

জীবনের দীর্ঘ পথ সামনে। মাদাম বুঝতে পারছিলেন না কোন পথে পরিচালিত করলে রুশোর জীবন প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পাবে।

এই প্রাণবন্ত তরুণের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য এবার তাঁকে পাঠালেন এক সেমিনারিতে।

সেখানে যাবার আগে যে কটাদিন মাদামের বাড়িতে ছিলেন রুশো, অনাবিল আনন্দের মধ্যে কাটিয়েছেন।

ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসতেন গান বাজনা। মাদামের বাড়িতে কয়েকটা গানের বই হাতে পড়েছিল তাঁর। সেমিনারিতে যাওয়ার সময় সেই বইগুলোও তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

সেমিনারির ধর্মশিক্ষা রুশোর মনকে তৃপ্ত করতে পারল না। এখানে কেবল ধর্মসঙ্গীত তাঁর মনকে টানত। অবসর সময়ে তিনি সঙ্গীতচর্চা করতেন।

রুশোর অমনোযোগিতা সেমিনারি কর্তৃপক্ষের নজর এড়াল না। তাঁরা তাঁকে নিষ্কৃতি দিলেন। রুশো ফিরে এলেন মাদামের কাছে।

রুশো ফিরে আসায় মাদাম নিজেও যেন স্বস্তি পেলেন। রুশো কাছে থাকলে এক অপার পরিপূর্ণতায় তাঁর হৃদয় ভরে থাকে।

রুশোর সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে বুঝতে পেরে মাদাম বাড়িতেই তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন।

মাদামের এক অনুরাগী ভক্ত ল মেতর ছিলেন গীতিকার, সুরকার গায়ক। এই প্রাণোচ্ছল মানুষটিকে পছন্দ করতেন তিনি। তাঁকেই রুশোর সঙ্গীত শিক্ষার দায়িত্ব দিলেন।

সঙ্গীত শিক্ষায় রুশোর অসাধারণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে ল মেতার উৎসাহিত উল্লসিত হলেন। তাঁর শিক্ষা ও সাহচার্যে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই আশাতীত উন্নতি দেখালেন রুশো।

এই সময় অ্যানসিতে এক সুদর্শন তরুণ গায়কের সঙ্গে পরিচিত হন রুশো। অপরিচিত গায়কের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই মেলামেশায় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

মাদাম কিন্তু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অপরিচিতের সঙ্গে আকস্মিক ঘনিষ্ঠতা তিনি ভালভাবে নিতে পারলেন না। কি করে তাঁকে সেই তরুণ গায়কের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন ভাবতে লাগলেন।

সেই সুযোগও পেয়ে গেলেন তিনি যথাসময়ে। অ্যানসি ত্যাগ করে বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল ল মেতর-এর। মাদাম রুশোকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

শিল্পী গায়ক হিসেবে ল মেতর-এর খ্যাতি ছিল। তাঁর সঙ্গে রুশো যে কদিন ছিলেন তরুণ সঙ্গীতশিক্ষার্থী হিসেবে উপযুক্ত সমাদর পেয়েছেন।

কিন্তু সহজাত অস্থিরতা রুশোকে বেশি দিন এক জীবনে সুস্থির থাকতে দিত না। ল মেতর-এর সঙ্গও তাই একঘেয়ে হয়ে উঠল। একদিন কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেলেন রুশো। দুদিন পথে কাটিয়ে উপস্থিত হলেন অ্যানসিতে।

কিন্তু মাদামের কটেজে এসে দেখেন মাদাম নেই। কোথায় গেছেন কেউই বলতে পারল না।

মাদামকে দেখার ব্যাকুলতা নিয়েই ছুটে এসেছিলেন তিনি। তাঁর অদর্শনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। কোথায় গেলে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে?

অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি জানতে পারলেন, রাজা তাঁকে গোপন কাজে প্যারিসে পাঠিয়েছেন।

একুশ বছরের ভবঘুরে যুবক রুশো। সম্বলহীন অসহায়। প্যারিসে যাবার আর্থিক সঙ্গতি তাঁর কোথায়?

কিন্তু নানা স্থানে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে ততদিনে

তাঁর মন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ও সজাগ পোক্ত হয়েছে। তাই তিনি স্থির করলেন প্যারিসে যাবার অর্থ যে করেই হোক তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে।

গান বাজনাতে যেটুকু দখল জন্মেছিল তাই তাঁর পুঁজি। সেই সম্বল নিয়েই তিনি চলে এলেন লুজানে। একজন ফরাসী সঙ্গীতজ্ঞ এই ছদ্ম পরিচয়ে খুলে বসলেন গানের স্কুল। মনের ইচ্ছা, গান শিখিয়ে প্যারিসে যাবার পথখরচ জোগাড় করবেন।

দেখতে দেখতে জনা কয় ছাত্রীও জুটে গেল। শিক্ষক হিসাবে পরিচিতিও লাভ করলেন তিনি।

এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবেই প্যারিসে যাবার সুযোগ এসে গেল।

এক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর এক ভাগ্নেকে প্যারিসে নিয়ে যেতে হবে। এককথায় রাজি হয়ে গেলেন রুশো।

আভিজাত্য আর অড়ম্বরে মোড়া প্রাসাদনগরী প্যারিসে সেই প্রথম পদার্পণ রুশোর। মুগ্ধ হয়ে তিনি কর্মব্যস্ত নগরীর বাড়িঘর লোকজন দেখেন। এখানে সকলেই সকলের কাজে ব্যস্ত। পাশে ফিরে তাকাবার ফুরসৎ নেই কারো। নিজের চিন্তায় থৈ পান না রুশো।

মাদাম কোথায় থাকেন কিছুই জানেন না। অনুমানে নির্ভর করে সম্ভাব্য জায়গায় সন্ধান করতে থাকেন।

এই সময় সৌভাগ্যক্রমে মাদামের এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছ থেকেই রুশো জানতে পারলেন মাদাম রয়েছেন চেম্বারীতে।

রুশোর ব্যাকুল হৃদয় মাদামের সাক্ষাৎ লাভের জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বহু দূরের পথ চেম্বারী। সেখানে যাবার মতো সঙ্গতি পকেটে নেই। তবুও পথকেই সম্বল করে রওনা হয়ে পড়লেন।

গ্রামের পর গ্রাম পার হতে লাগলেন পায়ে হেঁটে। আহার নিদ্রা বিশ্রামের বালাই নেই। কখনো কোন গ্রামে কারো বাড়িতে আশ্রয়, আহার জোটে তো পরদিন অনাহারে। পথের গাছতলাতেই কাটে রাত।

এমনি অমানুষিক ক্লেশ সয়ে সাতদিন পরে তিনি এসে পৌঁছলেন চেম্বারীতে।

মলীন জীর্ণ পোশাকে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে মাদামের খোঁজ করতে লাগলেন।

অবশেষে শহরের একপ্রান্তে একটা ছোট্ট বাড়িতে মাদামের সন্ধান পেলেন। অবসন্ন দেহে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সস্নেহে কাছে টেনে নিলেন মাদাম।

মাদামের জীবনেও চলছিল ঝড়। তার চিহ্ন ছিল তাঁর জীবনযাত্রায় জীর্ণ বাসগৃহে। অ্যানসির প্রাচুর্য বিলাসিতা সবই অনুপস্থিত এখানে।

বিস্মিত বিহ্বল রুশো ক্রমে জানতে পারলেন, মাদাম রাজার কাছ থেকে যে মাসোহারা পেতেন, নানা কারণে তা বন্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করাও সম্ভব ছিল না।

তিনি জানতে পেরেছিলেন রাজার এক জেনারেলের তত্ত্বাবধানেই রয়েছে তাঁর মাসোহারা পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি। সুন্দরী বুদ্ধিমতী মাদাম তাই সেই জেনারেলেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

অনুগ্রহ পেতেও দেরি হয়নি। জেনারেলকে খুশি করার জন্যই তিনি তাঁর এই পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়িতে এসে উঠেছেন। জেনারেলের অনুগ্রহে তাঁর মাসোহারাও বজায় রয়েছে।

মাদামের সুপারিশে জেনারেল রুশোকে দিন কয়েকের মধ্যেই সরকারী জরীপ বিভাগে উঁচু পদে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন।

এতদিনে সুস্থির হবার মত অর্থোপার্জনের একটা সুযোগ পেলেন রুশো। কিন্তু তাঁর মন স্থির হল না। মাদামের কাছে থেকেও তিনি যেন মাদামকে কাছে পান না। নানান উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সর্বক্ষণ আসছে মাদামের কাছে। তাদের সঙ্গে হাসি আনন্দ হৈ হল্লায় মেতে থাকেন মাদাম। এসব রুশোর কাছে খুবই পীড়াদায়ক হয়ে উঠল।

মাদাম তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পারেন। কিন্তু জেনারেলকে খুশি রাখার জন্য এই জীবন থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় ছিল না তাঁর।

রুশো চাকরিতে মনোযোগ দিলেন। সেই সঙ্গে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন পড়াশুনা আর সঙ্গীতচর্চায়।

ছোট্ট শহর চেম্বারী। গানবাজনা জানা গুণী মানুষ এখানে তেমন কেউ ছিলেন না। তাই রুশোর গানের খ্যাতি মুখে মুখে চারদিকে অল্পদিনেই ছড়িয়ে পড়ল, ধনী পরিবারগুলো থেকে অহরহ ডাক আসতে লাগল। সকলেই চায় তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের গান শেখান।

রুশোর মনও চাকরির একঘেয়ে জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই একদিন চাকরি ছেড়ে সঙ্গীত শিক্ষকের জীবনই বেছে নিলেন তিনি। তাঁর মনের কথা ভেবে মাদামও তাঁকে বাধা দিলেন না।

চাকরি ছেড়েও স্বস্তি পান না রুশো। কেমন এক মানসিক অস্থিরতা প্রতিনিয়ত তাঁকে চঞ্চল করে রাখে।

শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা গান শিখতে আসে তাঁর কাছে। তাদের অনেকের চোখেই তিনি অন্য আলো দেখতে পান। কিন্তু সে অনুভূতি ক্ষণিকের। মন স্থির করতে পারেন না কোথাও।

মাদামের আর্থিক অবস্থা যত খারাপের দিকে যাচ্ছে ততই নতুন নতুন অতিথির সমাগম বাড়ছে তার বাড়িতে। তাদের সঙ্গদান করতেই ব্যস্ত থাকেন মাদাম। রুশো তাঁর একাকীত্ব ভুলে থাকেন গানের স্বরলিপি তৈরি করে। এভাবে বেশ কিছু স্বরলিপি তৈরি হতে থাকে।

একদিন তাঁর ইচ্ছা হল, স্বরলিপিগুলি নিয়ে প্যারিসে গেলে হয়তো সমাদর পাবেন। একবার কোনওরকমে একটু ঠাঁই সেখানে করে নিতে পারলে তাঁর অভাবও দূর হবে।

সঙ্কল্প মতন একদিন মাদামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্যারিসে রওনা হলেন। সেখানে দেখা করলেন সঙ্গীত অ্যাকাডেমির প্রধানের সঙ্গে। পরীক্ষা করে দেখা হল তাঁর স্বরলিপি। বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন এ ধরনের স্বরলিপিতে বিশেষত্ব রয়েছে। কিন্তু সাধারণ রুচিতে গ্রহণযোগ্য হবে না।

রুশো বুঝতে পারলেন, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। পাণ্ডুলিপিতে কিছুটা সংশোধন করে বই দাঁড় করালেন। হাতে টাকা যা আছে তাতে একা বই ছাপার ঝুঁকি নেওয়া চলে না। আধাআধি খরচে একজন প্রকাশক জুটিয়ে বই বার করলেন। কিন্তু বই তেমন বিক্রি হল না।

এরপর কি করা যায় বুঝতে পারছিলেন না রুশো। সৌভাগ্যক্রমে এমনি সময়ে দুজন শুভানুধ্যায়ী পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁদের একজন দিদেরো, তাঁরই সমবয়সী লেখক। অন্যজন বর্ষীয়ান ফাদার কাস্তেল। তাঁর পরামর্শে রুশো তাঁর বই মেয়েদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন।

তাতে কাজও হল। মেয়েরা গ্রহণ করল তাঁর স্বরলিপি। এই সুবাদে রুশো পরিচিত হলেন মাদাম দুপ্যাঁ-এর সঙ্গে। একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারীর দ্বিতীয়া পত্নী তিনি। তরুণী, সুন্দরী। প্রথম পরিচয়েই দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

মাদামের মাধ্যমে এই সময়ে একটা সম্মানজনক চাকরিও জুটে গেল রুশোর। ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারীর চাকরি নিয়ে চলে এলেন ভেনিসে।

এখানে বছর দেড়েক চাকরি করতে পেরেছিলেন রুশো। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় চাকরি ছেড়ে চলে এলেন প্যারিসে।

পুরনো বন্ধু দিদেরো। তাঁর পরামার্শে ও উৎসাহে নানান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। লেখালিখির সূত্রে পরিচিত হতে লাগলেন অনেকের সঙ্গে। সামান্য অর্থাগমও হতে লাগল।

নতুন জায়গায় এবারে কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন রুশো। কম খরচের একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু সেখানে সমাজের যত নীচু স্তরের মানুষের আনাগোনা। হৈ চৈ, মদ আর জুয়ার ছড়াছড়ি। অসহ্য হলেও নিজের মনেই থাকেন রুশো। কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না।

কিন্তু সেখানেই একদিন ঘটনাচক্রে তেরাজ নামে সহজ সরল একটা গ্রাম্য মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন রুশো।

তেরাজ কাজ করত হোটেলে। তার প্রতি অশোভন আচরণ হচ্ছে দেখে

রুশো প্রতিবাদ না করে থাকতে পারলেন না। মেয়েটির ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন।

কৃতজ্ঞ তের্যাজ তার ভালবাসা সরলতা ও অন্তরের মাধুর্যে অল্পদিনেই রুশোর মন জয় করে নিল। রুশোর অশান্ত জীবনে শান্তি নিয়ে এল গ্রাম্য মেয়েটি।

বিবাহিত না হয়েও স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতে লাগলেন দুজনে। রুশোর লেখালিখির সামান্য টাকাতেই সংসার চালান তের্যাজ।

সন্তানের ভরণপোষণের ক্ষমতা ছিল না রুশোর। তবুও এক বছরের মধ্যেই তিনি সন্তানের পিতা হলেন। অবাঞ্ছিত এই সন্তানকে তিনি রেখে এলেন সরকারী হাসপাতালের পরিত্যক্ত শিশুদের মধ্যে। এভাবে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান পরিত্যাগ করলেন রুশো।

সন্তান প্রতিপালনের দায় এড়াতে রুশো সেদিন নিজের আর্থিক অক্ষমতাটাকেই বড় করে দেখেছিলেন। সন্তানহারা মাতা তের্যাজের হৃদয়ের হাহাকার তাঁর কানে পৌঁছয়নি। পরপর পাঁচটি সন্তান হারিয়েও তের্যাজ কিন্তু রুশোর কাজে বাধা দেননি।

পরবর্তীকালে অবশ্য এই হৃদয়হীন কাজের কৈফিয়ত হিসাবে রুশো তাঁর দারিদ্র্যের দোহাই পেড়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে দিদেরো সরকারবিরোধী লেখার জন্য বন্দী হয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে রুশো বন্ধুকে মুক্ত করার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তবে চেষ্টাচরিত্র করে সাক্ষাতের অনুমতি জোগাড় করলেন।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে একদিন একটা সাহিত্য পত্রিকা হাতে পেলেন। তাতে দেখলেন, দিজোঁ অ্যাকাডেমি একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন, প্রবন্ধের বিষয় হল বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নতি কি মানুষের নৈতিক উন্নতি ঘটিয়েছে?

অস্থিরমতি রুশোর সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল সমাজসচেতক আন্তর অনুভূতির। প্রতিযোগিতার প্রবন্ধের বিষয়টি এতদিনে সেই কাজ করল। রুশো লেখার জন্য এক তীব্র উন্মাদনা অনুভব করলেন।

কিন্তু কী লিখবেন? হাজারো চিন্তা মনে উদয় হতে থাকে। ক্রমে তাঁর অন্তরের গভীর থেকে জেগে উঠতে থাকে ঘুমন্ত বিদ্রোহী সত্তা।

ফরাসী সমাজের যাবতীয় অনাচার অবিচার ও অত্যাচার, অভিজাত শ্রেণীর শোষণ, রাজশক্তির অপশাসন, সাধারণ মানুষের অন্তরের ক্ষোভ সমস্ত কিছু জ্বালাময়ী ভাষায় রূপ পেল রুশোর প্রবন্ধে।

যেন এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি সহসা বিস্ফোরণ ঘটাবার পথ খুঁজে পেল। সব

শেষে রুশো ঘোষণা করলেন সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের কথা।

লেখা শেষ করে প্রবন্ধ জমা দিয়ে এলেন। ফলাফল ঘোষণা হতে অখ্যাত রুশো রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেলেন তিনি।

একটি সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন করে সেদিন আবির্ভাব ঘটল মানব ইতিহাসের এক মহাজীবনের।

এই পুরস্কার রুশোর মনের আগল খুলে দিল। তাঁর ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল এক নতুন মানুষ। আগুন-ঝরা ভাষায় তাঁর কলম থেকে একের পর এক লেখা প্রকাশ পেতে লাগল।

১৭৫২ খ্রিঃ প্রকাশিত হল রুশোর নাটক The village soothsayer। এক গ্রামীণ দৈবজ্ঞর কাহিনী। প্যারিসে অভিনীত হল নাটকটি। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে অভিষিক্ত হলেন রুশো।

এই সময়ে রাজদরবারেও অভিনীত হল রুশোর নাটক। আমন্ত্রিত হয়ে রাজা রানী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে রুশো অভিনয় উপভোগ করলেন।

সেই রাতে রাজা ঘোষণা করলেন, রুশোকে ভাতা দেওয়া হবে। তিনি যেন নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত থেকে রাজার দেওয়া ভাতা গ্রহণ করেন।

রুশো কিন্তু রাজার ভাতা গ্রহণ করেননি। রাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর লেখা যে তাহলে অর্থহীন হয়ে যাবে। অসুস্থতার অজুহাতে রুশো পালিয়ে গেলেন।

অখ্যাত রুশোর এখন প্যারিস জোড়া খ্যাতি। গুণগ্রাহী ও ভক্তদের ভিড় ক্রমশই বাড়তে থাকে। লেখায় বিঘ্ন ঘটতে লাগল। একদিন তেরাজকে নিয়ে চলে এলেন জেনেভায়।

এখানে এক অভিজাত গৃহিণীর বদান্যতায় রুশো শহর থেকে দূরে ফুলে ফুলে সাজানো ছোট্ট একটা বাগানবাড়ি পেয়ে গেলেন বসবাসের জন্য। তেরাজকে নিয়ে সেখানেই উঠলেন।

স্থির করলেন, এই পাখির কূজন মুখরিত, কোলাহলহীন, গাছপালা ঘেরা বাড়িতে বসেই এতকালের মনে জমানো কথা লিখবেন।

রুশো তাঁর নতুন আবাসের নাম দিলেন হার্মিটেজ। এখানে এসে তিনি প্রথম লিখলেন একটি উপন্যাস—La Nouvelle Helaise (The New Eloisa)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক সমাদর পেল এই উপন্যাস।

এই সময় হার্মিটেজের মালিক মাদাম এপিনের বৈমাত্রেয় বোনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে রুশোর। মাদাম এপিনে তাঁদের এই সম্পর্ক সহজভাবে মেনে নিতে পারলেন না। রুশো হার্মিটেজের আশ্রয়চ্যুত হলেন।

প্যারিসের কোলাহল থেকে দূরে থাকার জন্যই এই নির্জন প্রকৃতির কোলে চলে এসেছিলেন রুশো। তাই সেখানে আর ফিরে গেলেন না। ঠাঁই পেলেন মার্শাল ডিউক দ্য লুক্সেমবুর্গ নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাসাদে।

নিশ্চিন্তে নিজের লেখায় মনোনিবেশ করলেন এবারে রুশো। একই সঙ্গে দুটো লেখায় হাত দিলেন। একটি উপন্যাস, অপরটি রাষ্ট্র-সমাজ বিষয়ে তাঁর স্বাধীন মতামত বিষয়ক বই।

উপন্যাসটি Emile নামে প্রকাশিত হল ১৭৬২ খ্রিঃ। এটি প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং মাদাম লুক্সেবুর্গ।

আদর্শ শিক্ষা বিষয়ে রুশোর চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে শিশু এমিলের জীবনকে অবলম্বন করে। মুক্ত প্রকৃতি থেকে শিশু তার স্বভাব অনুসারে আপনা থেকেই শিক্ষা নেবে। তাকে কোনও কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় এনে স্বাভাবিক বিকাশের পথ বন্ধ করা উচিত নয়।

রুশো তাঁর এই বক্তব্য প্রকাশের জন্য এমিলের শিক্ষা-জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।

জন্ম থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সময়। অভিভাবকদের কর্তব্য দেখা এই সময় যাতে শিশুর কোনও খারাপ অভ্যাস গড়ে না ওঠে।

শিশুর শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর হল ছয় থেকে বারো বছর বয়স। এই সময়টায় নজর দেওয়া উচিত শিশুর দৈহিক বিকাশের প্রতি। সুস্থ মন পাবার জন্য সুস্থ দেহের প্রয়োজন।

রুশো অভিভাবকদের সতর্ক করে বলেছেন, শিশু বড়দের কাছ থেকেই ভাল মন্দ অভ্যাসগুলো পেয়ে থাকে।

রুশো বারো থেকে পনেরো বছর বয়সটাকে বলেছেন শিশুর বাস্তবধর্মী শিক্ষার কাল। এই সময় সামাজিক বিষয় ও কর্তব্যের সঙ্গে সে পরিচিত হবে। ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে পছন্দমতো বৃত্তি শিক্ষা করবে।

পনেরো থেকে কুড়ি—এই বয়সে এমিলের হবে হৃদয়ের শিক্ষা। সমাজ বিজ্ঞান, নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা হবে তার চর্চার বিষয়।

এমিলের শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে রুশো মেয়েদের শিক্ষার সম্পর্কেও অনেক কথা বলেছেন।

রুশো তাঁর এমিল উপন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিক দর্শনের বীজ রোপন করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে তাঁর এই অগ্রবর্তী চিন্তাধারা অনুধাবন করার মতো অবস্থা ছিল না তৎকালীন সমাজ-মানসের।

ফলে এমিল পেল প্রচন্ড বিরূপ সমালোচনা। বইটিকে সমাজহানিকর

অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল প্যারিসের আদালত থেকে। লেখকের বিরুদ্ধে বেরুল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

গ্রেপ্তার এড়াতে বন্ধুদের পরামর্শে রুশো তেরাজকে মার্শালের প্রাসাদে রেখে পালিয়ে গেলেন সুইজারল্যান্ডে।

কেবল প্যারিসে নয়, গোটা ইউরোপেই এমিল আলোড়ন তুলেছিল। প্রচলিত চিন্তার জগতে প্রচন্ড আঘাত হিসাবে সমালোচিত হতে থাকল এমিল। রুশোকে ঈশ্বরবিদ্বেষী বলেও অভিহিত করা হল।

সুইজারল্যাণ্ডেও চার্চের উষ্মা ধূমায়িত হচ্ছে বুঝতে পেরে শহর ছেড়ে রুশো চলে গেলেন দূরের গ্রামে। পরে তেরাজকেও নিয়ে এলেন কাছে।

রাষ্ট্র-সমাজ বিষয়ে লেখা রুশোর বইটিও Social Contract নামে প্রকাশিত হয় এই সময়। এই বইতে তিনি বলেছেন, মানুষের সর্বাত্মক মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারের উচিত একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করা। তাঁর এই উক্তিও ছিল বিপ্লবাত্মক।

পত্রপত্রিকাগুলো রুশোর লেখার বিরুদ্ধে এমনই বিষোদগার করতে আরম্ভ করেছিল যে সাধারণ মানুষও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। তাই নির্বাসিত জীবনেও স্বস্তি ছিল না রুশোর।

একদিন নিভৃত গাঁয়ের বাসস্থানও তাঁকে ত্যাগ করতে হল। তেরাজকে সঙ্গে করে তিনি চলে এলেন স্যাঁ পিয়ের নামে এক নির্জন শান্ত দ্বীপে, যার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ নেই বললেই চলে।

কিন্তু জনরোষ রুশোর বিরুদ্ধে এমনই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে এই নিরালা দ্বীপও তাঁকে আশ্রায় দিতে ভরসা পেল না।

ভাগ্য রুশোকে পথে এনে দাঁড় করাল। কোথায় যাবেন তিনি?

এই সঙ্কট সময়ে রুশোকে উদ্ধার করে ইংলন্ডে নিয়ে গেলেন দার্শনিক ডেভিড হিউম।

এখানকার উদার স্বাধীন পরিবেশে হাঁপ ছেড়ে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত রুশো। কিন্তু ততদিনে শরীর মন দুইই ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর। বয়সও হয়েছে আটান্ন। ক্রমাগত আঘাত পেয়েছেন তিনি মানুষের কাছ থেকে।

এই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও রুশো লিখলেন তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ The confession. দীর্ঘ পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ করা রুশোর আত্মজীবনীমূলক এই গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যের কালজয়ী গ্রন্থগুলোর অন্যতম।

বারোখণ্ডে সম্পূর্ণ রুশোর এই গ্রন্থকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। দেশের বহুধাবিভক্ত ধারার অর্থনীতির সঙ্গে এতে আলোচিত হয়েছে সামাজিক মানুষের আচার ব্যবহার হৃদয় ও মনোজগতের সমস্ত ভাব অনুভূতি।

একদিকে রয়েছে সমাজব্যবস্থার বাস্তব চিত্র, উদার মহৎ প্রকৃতির সাধারণ মানুষের জীবন। অন্যদিকে স্বার্থপর অভিজাত শ্রেণীর দুর্নীতি ও ব্যভিচার। মানবজীবনের এক পূর্ণাঙ্গ দলিল বলা চলে রুশোর Confession কে।

এই বইটিও সমসাময়িক পৃথিবীর মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ফ্রান্স সহ পৃথিবীর বহু দেশেই এ বই নিষিদ্ধ হয়েছিল।

তীব্র এক মানসিক বিপর্যয়ে ভুগছিলেন রুশো। স্বভাবও হয়ে পড়েছিল খুবই রুক্ষ।

এই অবস্থায় বছরখানেক ইংলণ্ডে থাকার পর গোপনে পালিয়ে চলে আসেন ফ্রান্সে। সৌভাগ্যবশতঃ কিছুদিন পরে প্যারিসে আসার সরকারী অনুমতিও পাওয়া গেল।

একটা গোটা জীবন নিরবচ্ছিন্ন কঠিন সংগ্রাম ও অনিয়মের মধ্যে অতিবাহিত হল। দেহ মন কোনটাই আর টানতে পারছিল না।

তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গী তেরেসা কিন্তু ধৈর্যহারা হননি। জগতের এই মহান চিন্তা নায়কের ভাগ্যবিড়ম্বনার অংশভাগিনী হয়ে নীরবে শেষদিন পর্যন্ত সংসারের ভার বহন করে গেছেন। রুশোর জীবনে ও কর্মকৃতিত্বে এই অসামান্যা নারীর অবদানও সামান্য নয়।

অবশেষে ১৭৭৮ খ্রিঃ ২ জুলাই প্যারিসে রুশো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশে নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন তৎকালীন পটলডাঙা হিন্দু কলেজের সতেরো বছর বয়সী তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। মাত্র পাঁচ বছর শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তার মধ্যেই তিনি ছাত্রসমাজকে জাতীয়তাবাদ, সমাজ চেতনা ও মুক্তবুদ্ধির উন্মেষের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন।

ছাত্রদের হৃদয়ে তিনি গেঁথে দিয়েছিলেন স্বাদেশিকতার প্রেরণা, বিশ্বতোমুখী দৃষ্টিভঙ্গী, যাবতীয় অন্ধ ও পশ্চাৎমুখী সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিন্যাস।

ডিরোজিও ছিলেন সত্য ও যুক্তিবাদের পূজারী এক মহান সংস্কারক। আমাদের দেশের ইতিহাসে নব্যবঙ্গে দীক্ষাগুরু রূপেই তাঁকে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

ডিরোজিওর শিক্ষাচর্চা কেবল হিন্দু কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য বিতর্কে যোগ দেওয়া, আবৃত্তি করা, কবিতা লেখা ছাড়াও আলোচনা সভার গুরুত্ব বুঝে তিনি গঠন করেছিলেন অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। এই সভাই আমাদের দেশের প্রথম আলোচনা সভা। এক অর্থে এদেশের প্রথম ছাত্রসংগঠনও এটি।

ডিরোজিওর প্রতিষ্ঠিত সভায় তাঁর সবসেরা ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ।

ডিরোজিওর অকাল প্রয়াণের পর শিক্ষকের প্রজ্বলিত মশাল বহন করেছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র-শিষ্যের দল। আর এই দলের অন্যতম প্রধান ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজের প্রচলিত নানা কুসংস্কার, অসার ধর্মীয় আচার নীতির বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি। এই জন্য তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল গৃহ, স্বধর্ম। তবুও আপন কর্মধারায় অবিচলিত থেকে মহান শিক্ষা-গুরুর প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনকে প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, খ্রিস্টধর্মপ্রচারক ও বহুভাষাবিদ্ দেশহিতব্রতী মনীষীরূপে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৮১৩ খ্রিঃ ২৪ মে কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণমোহন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুর অঞ্চলে নবগ্রাম পল্লীতে।

কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ ছিলেন নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কৌলিক যজমানি বৃত্তিতে তাঁর পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব হত না। সামান্য জমিজমা যা ছিল, তার আয়ের ওপরেই তাঁকে নির্ভর করতে হত।

কৃষ্ণমোহনের মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও দয়াবতী মহিলা।

পিতামাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে কৃষ্ণমোহন ছিলেন দ্বিতীয়। দরিদ্র পরিবারে জন্মে শৈশব থেকেই সর্ববিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা।

জীবনকৃষ্ণ ঠনঠনের কাছে গুরুপ্রসাদ লেনে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। শ্বশুরবাড়ির বাস উঠিয়ে সেই বাড়িতেই সপরিবারে বসবাস করতেন।

কৃষ্ণমোহনের পড়াশুনা শুরু হয়েছিল গৃহেই। পরে তাঁকে মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের ঠনঠনের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়।

লেখাপড়ায় কৃষ্ণমোহনের ছিল গভীর আগ্রহ। সব বিষয়ই খুঁটিয়ে জানার

চেষ্টা করতেন। ক্লাশের পড়াও করতেন মনোযোগ সহকারে। এ সকল কারণে ডেভিড হেয়ারের স্নেহ ভালবাসা লাভ করেছিলেন তিনি। কৃতিত্বের সঙ্গে পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করে কৃষ্ণমোহন পটলডাঙ্গা হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন।

তাঁর স্কুলের কৃতিত্ব দেখে বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না কতটা পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করে কৃষ্ণমোহনকে লেখাপড়া করতে হত।

দরিদ্রের সংসার। তাই মায়ের সঙ্গে গৃহকর্মের অনেক কাজই তাঁকে নিয়মিত করতে হত। সংসারের একবেলার রান্নার দায়িত্বও তাঁর ওপরেই ছিল। এতসব কিছু সামলে অধিক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করতে হত কৃষ্ণমোহনকে। ক্লাশের পরীক্ষায় বরাবরই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতেন। স্কুলের বৃত্তিভোগী ছাত্রহিসেবে ১৮২৪ খ্রিঃ তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন।

১৮২৮ খ্রিঃ কৃষ্ণমোহন কলেজের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে মাসিক ১৬ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

সেই বছরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ফলে সাংসারিক অভাব অনটনের চাপে পড়াশুনা ছেড়ে কৃষ্ণমোহনকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। ১৮২৯ খ্রিঃ ডেভিড হেয়ার তাঁকে তাঁর পটলডাঙ্গা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন।

ডিরোজিওর সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে কৃষ্ণমোহনের অন্তরে প্রজ্বলিত ছিল গুরুর মন্ত্রদীক্ষা। মানুষের জীবনের সবচেয়ে মহৎ শিক্ষা কৃষ্ণমোহন লাভ করেছিলেন ডিরোজিওর কাছ থেকে।

সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা—এই শিক্ষার বশবর্তী থেকে ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ সমাজের সকল প্রকার কুসংস্কার কুপ্রথা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন।

গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করা সে যুগে ছিল এক অসম্ভব দুঃসাহসী কাজ। কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরে কৃষ্ণমোহন প্রকাশ্যে সেই কঠিন কাজে অগ্রসর হলেন।

মাত্র ১৮ বছর তখন তাঁর বয়স। তিনি প্রকাশ করলেন Enquirer পত্রিকা। জ্বালাময়ী ভাষায় সমাজ-সংস্কৃতির অচলায়তনে হানতে লাগলেন কঠিন আঘাত।

আলোড়ন উঠল দেশময়। গোঁড়া হিন্দু সমাজপতির দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার মাধ্যমে নব্য শিক্ষিত তরুণদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ বর্ষণ আরম্ভ করল।

এভাবে প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের মধ্যে বাদানুবাদের আসর ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল।

আলেকজাণ্ডার ডাফ খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন ১৮৩০ খিঃ। কিছুদিন পরেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনসটিটিউশন।

দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের জন্য মহাত্মা রামমোহনও এই কাজে ডাফকে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন।

ডাফ সাহেব বাস করতেন হিন্দু কলেজের সংলগ্ন একটি বাড়িতে। সেই বাড়ির একতলার একটি প্রশস্ত হলঘরে ডাফ সাহেব ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করতেন।

ডাফ সাহেবের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল দলের ছাত্ররা সমবেত হতে লাগলেন এবং হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ দিকগুলি তুলে ধরে সেসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন।

কৃষ্ণমোহন এই সময় অগ্রণী হলেন সামাজিক প্রথা ভাঙ্গার আন্দোলনে। তিনি সদলে নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ইত্যাদি করতে লাগলেন প্রকাশ্যে।

গোঁড়ার দল ক্ষিপ্ত হয়ে সমাজের তরুণদের এভাবে বিপথে চালিত করবার জন্য শিক্ষক ডিরোজিওকেই সর্বাংশে দায়ি করলেন। তাঁদের চাপে পড়ে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে তাঁর বক্তব্য বলার অবকাশ না দিয়েই শিক্ষক পদ থেকে অপসারণ করলেন।

১৮৩১ খ্রিঃ ২৫ এপ্রিল ডিরোজিও পদত্যাগ করলেন। এরপর আর মাত্র আট মাস জীবিত ছিলেন তিনি।

হিন্দু সমাজের গোঁড়া সমাজপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণের জন্য তরুণেরা কৃষমোহনের গৃহে সমবেত হতেন। সভায় আলোচনার মধ্যে স্থির হত আক্রমণের পথ।

ডিরোজিওর অপসারণের অপমান ও জ্বালা প্রকাশিত হত তরুণদের ভাষণে, লেখায়। সমস্ত বিরণ প্রকাশিত হত প্রতি সপ্তাহে Enquirer ও জ্ঞানান্বেষণের পাতায়।

ডিরোজিও-শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা।

এই সময়ে অনেক তরুণ টিকিধারী ফোঁটাকাটা ব্রাহ্মণ পথে দেখলে টিটকিরি বিদ্রূপে তাদের অতিষ্ঠ করে তুলত। 'আমরা গরু খাই গো' বলে তাদের ছুঁয়ে দিতে উদ্যত হত।

কৃষ্ণমোহনের অগ্রবর্তীতায় গোঁড়া হিন্দু সমাজের প্রতি তরুণদের আক্রমণ এমনই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল যে পরিবারের সঙ্গে বাস করাই তাঁর পক্ষে

কষ্টকর হয়ে পড়ল। সেই অনিবার্য কাজটি ১৮৩১ খ্রিঃ এক নাটকীয় ঘটনার দ্বারা তরান্বিত হল।

এই বছর অগাস্ট মাসের ২৫ তারিখে কৃষ্ণমোহন কোনও কাজে বাড়িতে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর বন্ধুরা বাড়ির বারান্দায় একত্র হয়ে হিন্দুসমাজের কুসংস্কার গোঁড়ামি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চারে আলোচনা করতে লাগলেন।

হিন্দু পাড়ার মধ্যে স্বভাবতঃই এ কাজে তাঁদের উৎসাহ ছিল বেশি। উল্লাসে উত্তেজনায় তারা টগবগ করছিলেন।

এই সময় কয়েকজন গিয়ে কাছেই মেছুয়া বাজার থেকে গোমাংস ও রুটি কিনে নিয়ে এল। উল্লাসধ্বনি সহকারে সেই নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে হাড়গুলো ছুঁড়ে ফেললেন পাশের চক্রবর্তীদের বাড়িতে। সেই সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে গো-হাড় গো গো-হাড় ধ্বনি।

বাড়ির লোকজন ছুটে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণমোহনের বন্ধুদের কীর্তিকলাপ দেখে উত্তেজনায় ক্রোধে মারমুখী হয়ে ছুটে আসে। মার খেতে খেতে কোনও ক্রমে আত্মরক্ষা করে তরুণের দল পালিয়ে যান।

উত্তেজিত প্রতিবেশীরা কৃষ্ণমোহনের বড় ভাই ভুবনমোহনের নিকট গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা সমস্বরে দাবি জানাল, কৃষ্ণমোহনকে বাড়িতে রাখা চলবে না।

কৃষ্ণমোহন বাড়ি ফিরে এসে সব ঘটনা শুনে দুঃখিত হলেন। তিনি উত্তেজিত প্রতিবেশীদের বুঝিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। সকলে একবাক্যে আদেশ জারি করলেন, সেই মুহূর্তে একবস্ত্রে তাঁকে পাড়া ছেড়ে যেতে হবে। বাধ্য হয়েই সেদিন কৃষ্ণমোহনকে গৃহত্যাগ করতে হল।

বৃহত্তর সমাজ তথা জাতিকে কুশিক্ষা, কুপ্রথা, কুসংস্কারের কবল থেকে উদ্ধার করার সংস্কার আন্দোলনে নেমে পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে নামলেন কৃষ্ণমোহন।

কিন্তু কোথায় যাবেন? কোনও হিন্দুপল্লীতে আশ্রয় পাওয়া যে অসম্ভব তা তিনি জানতেন। তবুও বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে দেখা করলেন।

সব শুনে দক্ষিণারঞ্জন বন্ধুকে সাহস করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু ঘটনাটা জানাজানি হতে, মাসখানেকের মধ্যেই পাড়ার পিতৃস্থানীয় প্রতিবেশীরা আপত্তি জানালেন।

কৃষ্ণমোহন বন্ধুর আশ্রয়চ্যুত হলেন। এরপর তিনি চলে এলেন চৌরঙ্গি অঞ্চলে ফিরিঙ্গিপাড়ায়। এক সাহেব দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের ব্যক্তিদের নির্যাতনে গৃহচ্যুত কৃষ্ণমোহন তাঁর

মানসিক অবস্থার বর্ণনা করে Enquirer পত্রিকায় লিখে জানিয়েছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য-অনুরাগীদের কী নিদারুণ লাঞ্ছনাগঞ্জনার মধ্যে দিয়ে চলতে হত।

তিনি লিখেছিলেন "We left the home where we passed our infant days. We left our mother that nourished us in our childhood, we left our brother with whom we associated in our earliest days. We left our sisters with whom we sympathised since they were born ....."

সমাজ সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করে ইয়ং বেঙ্গল দলভুক্ত তরুণদের দুর্ভোগ সামাজিক নিষ্ঠুর নির্যাতন উৎপীড়নের মধ্যেই শেষ হত না, আপনজনদের কাছ থেকে, গৃহের আশ্রয়টুকু থেকেও তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে দিত।

এর পরও নিজেদের পরিচালিত সম্পাদিত কাগজে কাগজে তরুণদের বিরুদ্ধে চলত বিষোদ্গার। এমনকি মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে তাঁদের চরিত্রে কালিমা লেপন করা হত।

তরুণদের ধর্মীয় আচরণের প্রতি বিতশ্রদ্ধভাব, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নিন্দাবাদ এবং তাদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের কাজে সেইকালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের রিফর্মার পত্রিকা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল।

এই গোঁড়ার দলের হৃদয়ে মমত্ব উদারতা বলে কিছু ছিল না। তারা যথার্থই ছিল নির্মম, হৃদয়হীন। অনাথ অসহায়ের চোখের জল, করুণ আকুতি এদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারত না। ডিরোজিওর অনুগামী প্রতিবাদী তরুণদের প্রতিও তারা ছিল নির্মম, নির্দয়।

সমাজ-সংস্কৃতির পিচ্ছিল সোপান যাঁরা আবর্জনামুক্ত করে জ্ঞানের আলোকে সিঞ্চিত পরিশুদ্ধ করতে চায় যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁদের এমনি লাঞ্ছনা নির্যাতনই ভোগ করতে হয়।

মহামতি সক্রেটিসকে বিষ পান করে প্রাণ দিতে হয়েছিল, পরিত্রাতা যিশুকে হতে হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ। আরবভূমিতে ঈশ্বর-দূত মহম্মদকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল।

জাতিকে সংস্কারমুক্ত উন্নত জীবনের অনুসারী করার কাজে সমাজ সংস্কারক রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরকেও গোঁড়াসমাজের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল।

এই মহান পুরুষেরা সকল লাঞ্ছনা নির্যাতন হেলায় তুচ্ছ করে সত্যের জয় ঘোষণা করে গেছেন। তাঁরা অন্যায়কে করেছেন ঘৃণা, সত্যের প্রতি থেকেছেন একনিষ্ঠ।

বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণরা এই একই শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদের শিক্ষাগুরু

ডিরোজিওর কাছে। তাঁর শিক্ষার প্রেরণা বলেই সমাজের সকল প্রকার বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা দৃঢ়পদক্ষেপে আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হবার শক্তি পেয়েছিলেন। দু পক্ষের বাদপ্রতিবাদে নবীনদের শাণিত যুক্তির অস্ত্রে ক্রমেই কোনঠাসা হতে লাগল গোঁড়া সমাজপতির দল।

১৮৩১ খ্রিঃ মাত্র কয়েক দিনের রোগ ভোগের পর আকস্মিক মৃত্যু হল ডিরোজিওর। কৃষ্ণমোহন শেষ সময় পর্যন্ত অক্লান্তভাবে গুরুর সেবা শুশ্রূষায় নিরত ছিলেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর অল্পকিছুকাল পরেই কৃষ্ণমোহন ডাফ সাহেবের কাছে ক্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তাঁর ধর্মান্তরের কথা প্রচারিত হলে হিন্দুসমাজে প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই অপকর্মের শাস্তি স্বরূপ অবিলম্বে পটলডাঙ্গা স্কুলের চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়।

চাকরি খুইয়ে সাময়িকভাবে অসহায় বোধ করলেও কৃষ্ণমোহন নিশ্চেষ্ট থাকেননি। অর্থোপার্জনের একটা উপায়ও হয়ে গেল অবিলম্বে। চার্চ মিশনারী স্কুলে সুপারিনটেনডেন্টের পদে নিযুক্ত হলেন তিনি।

এই সময়ে তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল বিশপস কলেজে অধ্যয়ন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ল্যাটিন, গ্রিক, হিব্রু প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেন।

খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজে তাঁকে অনেকবারই উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণে যেতে হয়েছে। সুযোগ্য ধর্মপ্রচারক রূপেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবার পর থেকে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছিল। ধর্মান্তরিত জামাতা তাঁর শ্বশুরমশায়ের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাই স্ত্রী বিন্দুবাসিনীকে তাঁর পিত্রালয়েই অবস্থান করতে হচ্ছিল।

এই পরিস্থিতি চলেছিল বছর কয়েক। পরে কৃষ্ণমোহন আইনের সাহায্য নিয়ে স্ত্রীকে তাঁর বাবার কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে স্ত্রীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

১৮৩৭ খ্রিঃ শিবপুর বিশপস কলেজের সংলগ্ন বেগম সমরু গির্জায় কৃষ্ণমোহন যাজকত্ব লাভ করেন। এদেশে বাঙালী যাজকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম। এই সময় থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে রেভারেণ্ড শব্দটি যুক্ত হয়। দুবছর পরে তিনি ভ্রাতা কালীমোহনকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

গির্জায় প্রতি রবিবারে তিনি বাইবেলের উপদেশ বিষয়ে ভাষণ দিতেন। পরে এই বক্তৃতাগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় এবং গির্জার স্কুলে ছাত্রদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়।

কৃষ্ণমোহন এই সময় দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির জন্য আট হাজার টাকা দান করেন।

১৮৪৩ খ্রিঃ মাইকেল মধুসূদন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারে কৃষ্ণমোহনের সহায়তা ছিল। ১৮৩৯ খ্রিঃ ক্রাইস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠিত মির্জাপুর স্কুলে তিনি সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। এখানে দীর্ঘ তেরো বৎসর কর্মরত ছিলেন। ১৮৫২ খ্রিঃ বিশপস কলেজে অধ্যাপক হন এবং শিবপুরেই বসবাস করতে থাকেন।

একই সময়ে বহুবিধ কাজের সঙ্গে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন কৃষ্ণমোহন। কলেজের শিক্ষাদান, ধর্মপ্রচার ইত্যাদির সঙ্গে লেখালেখি ও পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতেন।

নব্যদলের মুখপত্র দি অ্যানক্যোয়ারার, দি ইউথ, গভর্নমেন্ট গেজেট সংবাদ সুধাংশু পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত।

তাছাড়াও জ্ঞানোপার্জিকা সভা, এশিয়াটিক সোসাইটি, বেথুন সোসাইটি, ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, ভারত সংস্কার সভা প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

১৮৬৭ খ্রিঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর অব ল ও সরকার কর্তৃক সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত হন।

দুবার তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনার হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিরও সভ্য নিযুক্ত হন।

দেশে শিক্ষার প্রসারের জন্য কৃষ্ণমোহন বিভিন্ন সারস্বত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন। সমসাময়িক ছাত্রসমাজে কৃষ্ণমোহনের প্রভাব ছিল গভীর।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় বিশপ উইলসন কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে লিখেছিলেন, “বিগত পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ হিন্দু কলেজের ছাত্ররা দর্শন শাস্ত্র, ইংরাজি সাহিত্য এবং খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে যে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেছে তার জন্য কৃষ্ণমোহনের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।”

১৮৭৬ খ্রিঃ ইণ্ডিয়া লিগের আন্দোলনের ফলে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে কৃষ্ণমোহন পৌরসভার সদস্য হন।

তিনি বাংলা, সংস্কৃত ইংরাজি ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বাংলায় বিশ্বকোষ রচনায় তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। তিনি তেরো খণ্ডে ইংরাজি বাংলা সংকলন গ্রন্থ বিদ্যাকল্পদ্রুম প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ দি পারসিকিউটেড (নাটক), উপদেশকথা, ডায়ালগস অন দি হিন্দু ফিলসফি, ষড়দর্শন সংবাদ, দি এরিয়ান উইটনেস, টু অ্যাসেজ অ্যাজ সাপ্লিমেন্টস টু দি এরিয়ান উইটনেস প্রভৃতি।

কৃষ্ণমোহন ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। বিশপস কলেজে উপাসনা মঞ্চে তিনি বাংলায় উপাসনা প্রচলন করেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রিঃ ১১মে কৃষ্ণমোহনের কর্মময় মহান জীবনের অবসান হয়।

ভাস্করাচার্য

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভাস্করাচার্য রচিত গণিতগ্রন্থ লীলাবতী। এটি পৃথিবীর আদিতম গণিতের গ্রন্থ।

ভাস্করাচার্য গণিত শাস্ত্রের যে বিশাল গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, তাতে রয়েছে চারটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডটির নাম লীলাবতী।

ভাস্করাচার্যের যখন মাত্র ৩৬ বছর বয়স, সেই সময় তিনি, ১১৫০ খ্রিঃ সিদ্ধান্ত শিরোমণি রচনা করেছিলেন।

ইউরোপে প্রথম গণিতের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তারও অর্ধশতাব্দীকাল পরে ১২০২ খ্রিঃ। এই বই রচনা করেছিলেন লিওনার্দ দ্য পিসা নামে এক পণ্ডিত।

ভাস্করাচার্যের গণিতগ্রন্থ রচনার একটি কাহিনী আছে। জীবনের এক সংকটাপন্ন সময়ে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

ভাস্করাচার্যের বাস ছিল দক্ষিণ ভারতের বিজ্জুবিড় নামক এক নগরে। অঙ্ক ও জ্যোতিষ বিষয়ে অতি অল্প বয়সেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন তিনি। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ থেকে দেশান্তরে।

সম্মান, অর্থ, যশ কোনও কিছুরই অভাব ছিল না পণ্ডিত ভাস্করাচার্যের। কিন্তু তবুও তাঁর মনে শান্তি ছিল না।

তাঁর গৃহে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছিল একমাত্র সন্তান কন্যা লীলাবতী। রূপে গুণে সে ছিল অতুলনীয়া। পিতার কাছেই নানা শাস্ত্রের পাঠ সম্পন্ন হয়েছিল তাঁর।

কিন্তু তবুও এই কন্যাকে নিয়েই তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করছিলেন ভাস্করাচার্য।

জন্মসময়েই তিনি কন্যার কোষ্ঠী প্রস্তুত করেছিলেন। গণনায় তিনি দেখেছিলেন, বিবাহের অল্পকাল পরেই কন্যার বৈধব্যযোগ। একথা তিনি আর কাউকে প্রকাশ করেননি, নিজের মনেই গোপন রেখেছিলেন।

এতকাল নিজেও একরকম ভুলেই ছিলেন। কিন্তু এখন বিবাহযোগ্যা কন্যাকে পাত্রস্থ করতে নানা দিক থেকে তাগিদ আসছে। এবারে পাত্রের সন্ধান না করলেই নয়। কিন্তু কার সঙ্গে বিবাহ দেবেন কন্যার? যে ছেলে তাকে বিবাহ করবে, তারই রয়েছে মৃত্যুযোগ।

দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যেই কাটতে থাকে ভাস্করাচার্যের দিন।

নিজের গণনায় ভুল থাকতে পারে অনুমান করে আরো কয়েকজন গণৎকারকে দিয়ে মেয়ের কোষ্ঠী নতুন করে গণনা করলেন। কিন্তু সকলেই এককথা বললেন, বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই তার স্বামীর মৃত্যু হবে।

একমাত্র কন্যা, বিদুষী, রূপ-গুণবতী। প্রতিবেশীরা অনেকেই সৎপাত্রের সংবাদ আনতে লাগলেন। কিন্তু কাউকে কিছু মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেন না ভাস্করাচার্য। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হতে থাকেন তিনি।

একদিন, পুঁথিপত্র ঘাঁটতে বসলেন। ভাবলেন, নিশ্চয়ই এই দুর্দৈব প্রতিকারের কোনও পথ তিনি খুঁজে পাবেন।

দিন কয়েকের পরিশ্রমে একটা শুভযোগ পেয়েও গেলেন। এই শুভক্ষণে বিবাহ দিতে পারলেই কেবল কন্যার বৈধব্যযোগ রোধ করা সম্ভব।

এতদিন পরে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন ভাস্করাচার্য। শুভ মুহূর্তটিকে যে করেই হোক কাজে লাগাতে হবে। সন্ধান করে উপযুক্ত পাত্রও পাওয়া গেল। আলাপ আলোচনার পর বিবাহ স্থির হতে বিলম্ব হল না।

প্রস্তুতি শুরু হল এবার শুভকার্যের। শুভ দিনে শুভক্ষণে লীলাবতীকে পাত্রস্থ করার আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখলেন না পিতা।

যথানিয়মে নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হল। সেদিন সকাল থেকেই শুভক্ষণ যাতে পার না হয়ে যায় তার জন্য সজাগ হয়ে রইলেন উদ্বিগ্ন ভাস্করাচার্য।

তাঁর ঘরের কোণে একটি বালি ঘড়ি বসিয়েছেন সঠিক সময় নির্ধারণের জন্য। বিবাহ বাড়ির কাজের ফাঁকে বারে বারে এসে নিজে সেই ঘড়িতে সময় দেখতে লাগলেন।

সময় নির্ধারণের জন্য আজকাল আমরা ঘড়ি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সেই যুগে, সেই সুদূর অতীতে এদেশে ব্যবহার হত সূর্যঘড়ি, বালি ঘড়ি ইত্যাদি।

বালি ঘড়িতে দুটি সম আকৃতির বাটি ওপর নিচ করে বসান হত। দুটো পাত্রেরই নিচের দিকে মুখোমুখি সংলগ্ন থাকত দুটো ছোট্ট ফুটো।

ওপরের পাত্রে ভরা থাকত বালি। তার থেকে ফুটো দিয়ে নিচের পাত্রে বালি ঝরে পড়ত। নির্দিষ্ট সময়ে পাত্রটি খালি হয়ে সব বালি নিচের পাত্রে ঝরে পড়ত। তখন ঘড়িটিকে আবার উল্টো করে দেওয়া হত।

লীলাবতী অন্তঃপুরে ছিলেন। পুরোহিত বিবাহানুষ্ঠানের তোড়জোড় করছেন।

নির্দিষ্ট ক্ষণ উপস্থিত হলেই সুসজ্জিতা লীলাবতীকে অন্তঃপুরিকারা অনুষ্ঠান স্থলে নিয়ে যাবে।

ইতিপূর্বে কৌতূহলী হয়ে লীলাবতী বারকতক গিয়ে বালি ঘড়িটিকে দেখে এসেছিলেন। প্রকৃত ব্যাপারটি তিনি জানতেন না।

এদিকে সময় বয়ে চলে। পুরোহিত অপেক্ষা করতে থাকেন। লগ্ন আর হয় না। কী ব্যাপার? অধৈর্য হয়ে ভাস্করাচার্য বালিঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তিনি হায় হায় করে ওঠেন।

লীলাবতী যখন ঝুঁকে বালি ঘড়ি দেখছিলেন, তখন সকলের অলক্ষ্যে তাঁর গলার হার থেকে একটি মুক্ত খসে পড়েছিল ঘড়ির বালিতে। তাইতেই বাটির বালি পড়ার ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সকলের অজান্তে পার হয়ে গিয়েছিল বিয়ের লগ্ন।

কন্যার বিবাহ বন্ধ করার আর কোন উপায় ছিল না। বিধির নির্বন্ধ অপ্রতিরোধ্য। মানুষের প্রতিকার চেষ্টা সেখানে নিরর্থক চেষ্টা মাত্র।

বিবাহের কিছুকাল পরেই স্বামীকে হারিয়ে লীলাবতী ফিরে এলেন পিতৃগৃহে। তাঁর মুখের হাসি মনের আনন্দ চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল।

কন্যার বৈধব্যবেদনায় কাতর ভাস্করাচার্য তখন তাঁকে নিয় বসলেন বিদ্যাচর্চায়। লীলাবতীকে শিক্ষা দেবার জন্যই এই সময় তিনি রচনা করলেন গণিত শাস্ত্রের বিশাল গ্রন্থ সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা সংস্কৃতির গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সকল মনীষী চিন্তাবিদের প্রতিভার অবদানে, ভাস্করাচার্যের স্থান তাঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো।

১১১৪ খ্রিঃ দাক্ষিণাত্যের বিজ্জবিড় গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ভাস্করাচার্যের জন্ম। তাঁর জীবনকাহিনী নানা কিংবদন্তীতে মোড়া। সেসবের সত্যাসত্য নিরূপণ করা কঠিন।

তবে কিছুকাল আগে বর্তমান চেন্নাই অঞ্চলের অন্তর্গত চালিসগাও নামক স্থানে এক মন্দিরে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি থেকে তাঁর পিতৃপরিচয়, বংশপরিচয় ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়েছে।

ভাস্করাচার্যের পিতার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। পিতামহের নাম মনোরথ। তাঁদের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষদের নাম যথাক্রমে প্রভাকর, গোবিন্দ, ভাস্কর ভট্ট এবং ত্রিবিক্রম।

এই শিলালিপি থেকে ভাস্করাচার্যের দুই পুত্রের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন লক্ষ্মীধর ও চঙ্গদেব। এঁরা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। বংশের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই শিলালিপিতে প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়েছে।

ভাস্করাচার্য ছিলেন সাংখ্য, তন্ত্র বেদবিৎ মহাপণ্ডিত। কাব্যছন্দেও তাঁর জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। গণিতে শিবের মতোই মহাজ্ঞানী ছিলেন তিনি। তাঁকে বলা হয়েছে ভট্ট পারদর্শী।

আশ্চর্যের বিষয় যে এই শিলালিপিতে ভাস্করাচার্যের বংশ তালিকায় লীলাবতীর নাম অনুপস্থিত। তবে অনেক পণ্ডিত মনে করেন, লীলাবতী নামে বিদুষী কন্যার জনক ছিলেন ভাস্করাচার্য এবং তাঁর গণিত গ্রন্থের লীলাবতী অংশটি লীলাবতীরই রচনা।

ভাস্করাচার্য তাঁর গ্রন্থটি কন্যাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

লীলাবতী সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও মূল গ্রন্থ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। এই গ্রন্থ চারখণ্ডে বিভক্ত, প্রথম খণ্ডের নাম লীলাবতী। তাতে রয়েছে সাধারণ গণিতের আলোচনা। ২৭৮টি শ্লোকের দ্বারা সরল গণিতের বিভিন্ন পদ্ধতি—যোগ, ঘনমূল, অনুপাত, সমানুপাত, বিপরীত ক্রিয়া, সুদকষা, ভগ্নাংশ, লাভক্ষতি প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে।

লীলাবতীতে জ্যামিতির ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ট্রাপিজিয়ম, বৃত্ত প্রভৃতি নিয়ে নির্ভুল আলোচনা রয়েছে। বহুল প্রচলিত লীলাবতী গ্রন্থটি তার বিষয় মাহাত্মে সিদ্ধান্ত শিরোমণির অন্তর্ভুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র পুস্তকের মর্যাদা লাভ করেছিল। দ্বিতীয় খণ্ডটিতে রয়েছে বীজগণিতের আলোচনা।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীধরাচার্য বীজগণিতের যে তত্ত্বগুলি উদ্ভাবন করেছিলেন, ভাস্করাচার্য তাঁর গ্রন্থে সেগুলোই বিস্তৃত করেন। শ্রীধরাচার্য তাঁর গণিতসার গ্রন্থে পাটীগণিত, বীজগণিতের, ভগ্নাংশ, সুদনির্ণয়, দ্বিঘাত সমীকরণ, বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

ভাস্করাচার্য তাঁর গ্রন্থে গণিতশাস্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তা হল জ্ঞাতরাশি ও অজ্ঞাতরাশি। জ্ঞাতরাশিকে তিনি বলেছেন পাটীগণিত। দ্বিতীয় ভাগটির নাম দিয়েছেন বীজগণিত।

আধুনিককালে অজ্ঞাতরাশি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে a, b, x অথবা z বা অন্য কোন সংখ্যা অজ্ঞাতরাশির পরিবর্তে ধরা হয়। ভাস্করাচার্যও একই রীতিতে অজ্ঞাতরাশি নির্ণয় করার জন্য সাদা, কাল, হলদে ইত্যাদি রং অথবা হীরা, মণি, মুক্তা প্রভৃতি মাণিক্যের নাম ব্যবহার করেছেন।

সিদ্ধান্ত শিরোমণির তৃতীয় খণ্ডটি গোলাধ্যায়। চতুর্থ খণ্ড হল গণিতাধ্যায়। এতে জ্যোর্তিবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার ফলাফল আলোচনা করেছেন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয়, পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রমাণ দিয়েছেন। গোলাধ্যায় থেকে ভাস্করাচার্যের এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে রয়েছে, এক কচ্ছপের পিঠের ওপরে চারদিকে চারটি বিশাল হাতি আমাদের এই পৃথিবীকে ধরে রেখেছে। কচ্ছপটি রয়েছে সমুদ্রে ভাসমান।

কোন কোন পুরাণে বলা হয়েছে, অনন্ত নামে এক সহস্রমুখ সাপ তার ফণার ওপর ধরে রেখেছে পৃথিবীকে। কেবল হিন্দু পুরাণেই নয়, পৃথিবীর সব দেশের মানুষই মনে করত, পৃথিবী কোন আধারের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিউটনেরও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের অন্ততঃ পাঁচশো বছর আগে ভাস্করাচার্য পৃথিবী সম্পর্কে এ সকল ধারণাকে নিছকই কল্পনা প্রমাণ করেছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তি বলে।

গোলাধ্যায়ের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, "নান্য ধারঃ স্ব শক্তৈব বিয়ত নিয়তাং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।"

এই শ্লোকে ভাস্করাচার্য ঘোষণা করেছেন, মহাসমুদ্রে ভাসমান বস্তুর মতোই পৃথিবী মহাকাশে ভাসমান একটি বস্তু, এর কোন আধার নেই।

পৃথিবী যে গোলাকার তারও ঘোষণা ভাস্করাচার্যই প্রথম করেছিলেন। একটি সুন্দর শ্লোকের মাধ্যমে তিনি নিজেই প্রশ্ন রেখেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন।

পৃথিবী যে গোল তার প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছেন, বিরাট একটি বৃত্তের পরিধির অদি ক্ষুদ্র কোন অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাকে সমান বা সমতল বলেই মনে হবে। এই একই কারণে বিরাট আয়তনের এই পৃথিবীর বুকে দৃষ্টিপাত করে মানুষ অতি ক্ষুদ্রতম অংশই দেখতে পায়, তাই তার কাছে মনে হয় পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্বের কথা নিউটনের আবিষ্কারের বহু আগেই ঘোষণা করেছেন ভাস্করাচার্য। তিনি তাকে বোঝাতে চেয়েছেন আকর্ষণ শব্দটি দিয়ে—মাধ্যাকর্ষণ বলেননি তিনি।

ভাস্করাচার্য বলেছেন, পৃথিবীর এক আকর্ষণী শক্তির জন্যই কোন বস্তু উৎক্ষিপ্ত হলে তা পুনরায় ভূমিতে পতিত হয়।

"আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া
যৎঘস্থং গুরু বাড়িমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি
সমে সমান্তারক্ক পতত্বীয়ং যে।"

আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি বিজ্ঞানীর সাধনায় মধ্যযুগের ভারতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবনের যে উন্নত ধারার সূত্রপাত হয়েছিল, উপযুক্ত উত্তরসাধকের অভাবে এবং সামাজিক ধর্মপ্রবণতার চাপে তার গতি হয়েছিল স্তব্ধ। তাই ইউরোপের মানুষের কাছে তাঁদের নাম পৌঁছবার সুযোগই

পায়নি। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের প্রথম আবিষ্কারকের গৌরব থেকে তাঁরা হয়েছেন বঞ্চিত।

আরব জ্ঞানানুসন্ধানীদের উদ্যোগেই ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণির ফার্সী অনুবাদও প্রথম প্রাচ্যের সীমা অতিক্রম করে পাশ্চাত্যে পৌঁচেছিল এবং খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ভাস্করাচার্য মধ্যযুগের পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন।

পরিবারের বংশানুক্রমিক বিদ্যাচর্চা ও বিজ্ঞানসাধনার উত্তরাধিকার পূর্ণ সার্থকতা পেয়েছিল ভাস্করাচার্যের মধ্যে। সহজাত সংস্কারমুক্ত উদার মন তাঁকে সত্যের সাধনায় ব্রতী করেছিল।

সেই যুগের প্রবল ধর্মীয় আবহে থেকেও ভাস্করাচার্য নিজের চিন্তাভাবনাকে ধর্মের চিরাচরিত ধারায় গণ্ডিবদ্ধ রাখেন নি। যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোতে তিনি প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করেছেন এবং চিরাচরিত ধারণাগুলিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে উজ্জয়িনী পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। পরিণত বয়সে আচার্য ভাস্কর এখানেই অবস্থান করেছেন।

১১৫০ খ্রিঃ ৩৩ বছর পরে ১১৮৩ মতান্তরের ১১৮৪ খ্রিঃ তিনি রচনা করেন করণকুতূহল নামে অপর একখানি গ্রন্থ। জ্ঞান প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ পরিণতির প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এই গ্রন্থে।

ভাস্করাচার্য মারা যান ৭১ বছর বয়সে ১১৮৫ খ্রিঃ।

তীর্থঙ্কর মহাবীর

আবহমান ভারতের চিরন্তন প্রেম মৈত্রী ও অহিংসার বাণী যে দুই মহামানবের সাধনসিদ্ধ জীবনে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল তাঁদের একজন ভগবান বুদ্ধদেব, অপরজন তীর্থঙ্কর মহাবীর।

বর্ণাশ্রম শাসিত প্রাচীন আর্যভারতে উভয়েরই আবির্ভাব হয়েছিল সমসাময়িক সময়ে। দুজনের জীবনধারাতেও দেখা যায় আশ্চর্য মিল। তাঁদের প্রচারিত সর্বজনীন ধর্মের মূলমন্ত্রও ছিল অহিংসা।

মহাবীর তীর্থঙ্কর ছিলেন জৈন ধর্মের ২৪তম তীর্থঙ্কর। তাঁর পূর্বে আরও ২৩জন তীর্থঙ্কর ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছেন,

"প্রথম তীর্থঙ্কর হইতে পার্শ্বনাথ ২৩তম এবং মহাবীর ২৪তম। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রে এই সম্প্রদায় নানা নামে পরিচিত। ইঁহারা সংসারের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এজন্য নির্গ্রন্থ। ইঁহারা ইন্দ্রিয়বিজয়ী এজন্য অরিহন্তা (অর্হৎ)। ইঁহারা পৃথিবীর সমস্ত লোভ ও আকর্ষণ তপোবলে জয় করিয়াছেন এজন্য ইঁহারা জিন (জয়ী)। ইঁহাদের সন্ন্যাসীরা শ্রাবক এবং সন্ন্যাসিনীরা শ্রাবিকা নামে অভিহিত। .....

"..... জৈনরা বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক তরুলতারও আত্মা আছে। তাঁহারা জীবের দুঃখকষ্টের প্রতি এত মমতাশীল ও সদয় যে, একটি গাছের পত্রপল্লব ছিঁড়িতেও কষ্ট বোধ করেন পাছে তাহাদের আত্মা কষ্ট পায়। তাঁহাদের একদল শিরে ময়ূরপুচ্ছ লইয়া রাজপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সরাইয়া পথ পর্যটন করেন, পাছে কোন জীব পদপীড়নে বিনষ্ট হয়। তাঁহারা নিজের শরীরের রক্তের দ্বারা মশক ও ছারপোকার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ধর্মের অঙ্গীয় মনে করেন এবং পিপীলিকাকেও কোন কোন জৈন ধর্মাবলম্বী নিত্য শর্করা প্রদান করিয়া জীবে দয়া সূত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।"

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডল ছিল সম্পূর্ণভাবেই ব্রাহ্মণশাসিত। আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, ধর্মের নামে নানা অনাচার কুসংস্কার, অবাধ পশুবলি ও বর্ণভেদের কঠোর অনুশাসনে মানবতার লাঞ্ছনা ইত্যাদির বেড়াজালে ভারতবর্ষের মানুষ চূড়ান্ত অধঃপতনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই যুগ-সংকটকালে প্রেম, করুণা, অহিংসা ও সংস্কারমুক্ত উদার ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন মহাবীর। একই সময়ে বুদ্ধদেবও তাঁর ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন, যদিও এই দুই মহাপুরুষের কোনও দিনই প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎকার হয়নি।

খ্রিঃ পূর্ব ৫৯৯ অব্দে বৈশালীর কুন্ডপুর গ্রামে জৈনধর্মাবলম্বী এক ধনী জমিদার গৃহে মহাবীরের জন্ম হয়। কথিত হয়, তাঁর জন্ম সময়ে দেশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, ব্যবসায় বৃদ্ধির ফলে ধনাগমের পথ প্রসার লাভ করেছিল—সব দিকেই দেখা দিয়েছিল সুসময়। পিতামাতা তাই নবজাতক শিশুটির নাম রেখেছিলেন বর্ধমান। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু। মাতা ত্রিশলা ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী।

শৈশবে ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের মধ্যে লালিত পালিত হন বর্ধমান। পরিবারের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তাঁর সহজাত ধর্মভাব বিকাশ লাভ করে। তিনি হয়ে ওঠেন অকপট সত্যবাদী নির্ভীক।

পিতামাতার ধর্মপ্রাণতা তাঁকে আকৃষ্ট করে ত্যাগ ও তপস্যার প্রতি,

মানবজীবনের নশ্বরতার ভাবনা তাঁকে ভাবিত করে তোলে। অসাধারণ মেধা ছিল তাঁর। তাই অল্পকালের মধ্যেই নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ক্রমে কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁর মধ্যে দেখা দেয় সুখ ভোগৈশ্বর্যের প্রতি বিরাগ। তাঁকে এই সময় দেখা যেত সর্বত্যাগী শ্রমণ বা সন্ন্যাসী পরিব্রাজকদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে।

পুত্রের মতিগতি দেখে ভাবিত হন পিতামাতা। বর্ধমানকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য যৌবনের প্রথমেই বৈশালীর এক সামন্ত রাজার পরমাসুন্দরী কন্যা যশোদার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিছুকাল পরে এক কন্যা সন্তানের পিতা হন বর্ধমান। কন্যার নাম রাখা হয় অনবদ্যা। পরে তাঁর এই কন্যাই প্রিয়দর্শনা নামে অভিহিত হন।

ভোগ লালসায় উন্মত্ত পথভ্রষ্ট মানুষকে যিনি মানবজীবনের চরম আনন্দের সন্ধান দেবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, মোহ মায়াবন্ধনমুক্তির যিনি পথ দেখাবেন, সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে শান্তি পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর হৃদয় মথিত হতে থাকে এক অজানা আনন্দলোকের আহ্বানে। সংসার থেকে নিজেকে মুক্ত করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে অধীর করে তোলে। ক্রমেই তিনি উপলব্ধি করেন জীবনের প্রকৃত সুখ ভোগসুখের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু কে দেবে তাঁকে প্রকৃত সুখ, জীবনের চরম আনন্দের সন্ধান?

এক সময়ে তিনি কৃতসংকল্প হন, শ্রমণ ধর্মে দীক্ষা নিয়ে পরিব্রাজন অবলম্বন করবেন, ত্যাগের পথে ব্রীত হবেন অভীষ্ট লাভে।

রূপবতী স্ত্রী, আদরের কন্যা, সংসারের সব বন্ধনই তুচ্ছ হয়ে যায় বর্ধমানের জীবনে। এক অগ্রহায়ণের অপরাহ্নবেলায় সবকিছু হেলায় পরিত্যাগ করে গৃহত্যাগী হলেন তিনি।

কৌপীন আর উত্তরীয় কেবল সম্বল করে পথে বেরিয়ে নির্গ্রন্থ শ্রমণ বা সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রমণদের অবশ্য পালনীয় দশটি ব্রত—ক্ষমা; মার্দব (বিনয়) আর্জব (সরলতা), লোভহীনতা, অকিঞ্চনতা, সত্য, সংযম, তপস্যা, শৌচ ও ব্রহ্মচর্য হল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

এরপর সন্ন্যাসী বর্ধমানের শুরু হল জীবনের এক নতুন অধ্যায়—চূড়ান্ত ক্লেশ ও নির্যাতনের পরিব্রাজক জীবন।

দুঃসহ সে জীবন। ইন্দ্রিয় জয়ের দুশ্চর এক তপস্যা। রোদ বৃষ্টি তুচ্ছ করে নগ্নপদে পথচলা। কত জনপদ, বন্ধুর পথ শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্য বিজন প্রান্তর একে একে অতিক্রম করতে থাকেন তিনি।

দিনের পর দিন উপবাসে পিপাসায় ক্লীষ্ট হয় শরীর। পথে প্রান্তরে সহ্য করতে হয় নিষ্ঠুর মানুষের উৎপীড়ন। সবকিছু সহ্য করেছেন বর্ধমান নির্বিকারে,

নিজের তপস্যায় থেকেছেন অটল। নশ্বর মানবজীবনের আদি অন্ত জানতে হবে তাঁকে, জানতে হবে জগৎ সংসারের রহস্য। অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এই কঠোর তপস্যার ক্ষান্তি নেই।

একের পর এক বছর পার হয়ে যায় পথে পথে। অবশেষে একদিন তিনি এসে পৌঁছান নালন্দায়। সাহিত্য সংস্কৃতি বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান নালন্দা। দেশ বিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজনের সমাবেশ এখানে। তাঁদের সঙ্গে কয়েক মাস শাস্ত্র আলোচনায় অতিবাহিত করে আবার পরিব্রাজনে বের হলেন।

ততদিনে সম্পূর্ণ দিগম্বর বর্ধমান। শেষ সম্বল উত্তরীয় ও কৌপীনটুকু কবে কোথায় পথের ধুলোয় হারিয়ে গেছে। মৌনব্রতী তিনি।

এই সময়ের তাঁর দুশ্চর তপস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় জৈন শাস্ত্র আচারাঙ্গ সূত্রে।

ত্যাগ, কৃচ্ছ্রতা, সংযম আর সহনশীলতার মধ্যে তপস্যামগ্ন বর্ধমান। ষড়রিপুর শত প্রলোভনও তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি।

দিগম্বর সন্ন্যাসীকে পাগল মনে করে দুষ্টবুদ্ধি লোক পাথর খন্ড ছুঁড়ে তাঁর শরীর রক্তাক্ত করেছে। এমনও হয়েছে, মজা দেখার জন্য নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মানুষ তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে মাংস কেটে নিয়েছে। কখনও ভাবাবিষ্ট দেহটিকে উল্লাসে আছড়ে ফেলেছে।

সেই আঘাতে দেহাস্থি ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়েছে। উদগ্র তপস্যা বর্ধমানের। শত নির্যাতনেও তিনি বিচলিত তপস্যাচ্যুত হননি। বরং এসকল বাহ্যিক নির্যাতন তাঁর মনকে দেহাত্মবোধ জয় করতে সহায়তা করেছে।

উদগ্র তপস্যার মধ্য দিয়ে তিনি লাভ করেন দৈবী বিভূতি। পার্থিব জীবনের সকল দুঃখ-দৈন্য জয় করে হয়ে ওঠেন সিদ্ধকাম।

দীর্ঘ তেরো বৎসব অতীত হয় এমনি কঠিন তপস্যার মধ্য দিয়ে। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, সিদ্ধিলাভের আর বিলম্ব নেই।

তেরো বছর পরে বর্ধমান উপস্থিত হন ঋজু নদীর তীর সংলগ্ন জম্ভীয় গ্রামে। সেই সময় তাঁর মন সর্বদা আরূঢ় থাকে এক অপার্থিব লোকে। ভাবাবিষ্ট তন্ময় অবস্থা। রোমাঞ্চ পুলক, শিহরণ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ পরিস্ফুট তাঁর সর্বাঙ্গে। স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সর্ব কলেবর।

গ্রামের প্রান্তে এক শালবৃক্ষতলে আসন নেন তিনি। ধ্যানে বিলীন হয় তাঁর স্থূল দেহের অনুভূতি। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর লোকে বিলীন হতে থাকে তাঁর সমগ্র সত্তা। অতঃপর তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান লোকে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে দিব্য অনুভূতি বা মোক্ষলাভ করলেন বর্ধমান।

মানবাত্মার বিচিত্র আনন্দময় স্বরূপটি দুদিন নিশ্চল সমাধিতে অবস্থান করে উপভোগ করেন তিনি।

সমস্ত ইন্দ্রিয় জয়ের সার্থকতার মধ্য দিয়ে ততদিনে তিনি হলেন জিন বা কেবলী। এখন জগতের কোন রহস্যই আর তাঁর কাছে অজ্ঞাত নেই। স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত কিছুর স্বরূপ তিনি জ্ঞাত।

অমৃতত্ব লাভের তপস্যায় সিদ্ধি লাভের পর বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মানুষকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেবার জন্য মহাবীর নেমে এলেন লোকসমাজে। তাঁর অমৃতময় বাণী মুমুক্ষু প্রাণে জাগিয়ে তোলে আর্তি। দলে দলে লোক ছুটে এসে তাঁর শরণ নিতে থাকে।

২৪তম তীর্থঙ্কর রূপে এরপরে মহাবীর ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। তিনি আর্ত মানবকে শোনালেন জগতের দুঃখদৈন্য থেকে মুক্তি লাভের উপায়। মোক্ষলাভেই মানবজীবনের সার্থকতা। কৃচ্ছ্রতা ও সংযম অবলম্বন করতে হবে। কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির মধ্য দিয়ে জাগবে মুমুক্ষা। মুমুক্ষা থেকেই মোক্ষ—সর্বকামনা সিদ্ধ হয়ে সার্থক হবে মানবজীবন।

মহাবীরের প্রচারিত ধর্মমত ছিল উদার সর্বসঙ্কীর্ণতামুক্ত। তাঁর ধর্মের মূল মন্ত্র অহিংসা।

আর্ত মানুষের মধ্যে ধর্মের বাণী প্রচার করে আচার্য জীবনে প্রবিষ্ট হন মহাবীর। একে একে তিনি অতিক্রম করেন অঙ্গ, মগধ, বিদেহ, কাশী, কোশল, পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশ। দলে দলে লোক তাঁর কাছে শ্রমণ ধর্মে দীক্ষা নিতে থাকে।

ধর্মপ্রচারের কাজ সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই সময় মহাবীর একটি সংঘ গঠন করেন। পুরুষজাতির পাশাপাশি ধর্মোন্নতি সাধনের পথে স্ত্রীজাতির জন্য কোন বিধিনিষেধ রাখেননি মহাবীর। তাঁর প্রধান সন্ন্যাসিনী শিষ্যা ছিলেন অঙ্গ দেশের এক সামন্ত রাজার কন্যা চন্দনা।

নানা দুঃখ যন্ত্রণায় জর্জরিত ছিল চন্দনার জীবন। মহাবীরের বাণীতেই তিনি মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তাঁর শরণ নেন। শ্রমণ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি হন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী। পরবর্তীকালে মহাবীরের সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘের নেতৃপদের দায়িত্ব লাভ করেন।

দুঃখ দৈন্যে কাতর গৃহী মানুষের আত্মোন্নতির সাধনের জন্যও মহাবীর সচেষ্ট ছিলেন। সত্য ও অহিংসার পথ অবলম্বন করে তারা যাতে ধর্মীয় জীবন যাপন করতে পারে, তার পথও তিনি নির্দেশ করে গেছেন।

মহাবীরের উদার ধর্মমত সমাজের সকল স্তরের মানুষকেই আকৃষ্ট করতে থাকে। ফলে সমাজের একশ্রেণীর সুযোগসন্ধানী মানুষ স্বার্থহানির আশঙ্কায়

মহাবীরের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। তাদের হীন চক্রান্তে তাঁকে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

সমসাময়িক আজীবক সম্প্রদায়ের গোশাল নামে এক ধর্মনেতা মহাবীরের প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। কিন্তু মহাবীরের সাধন ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে অচিরেই তিনি তাঁর অনুরাগী হয়ে ওঠেন ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

অদৃষ্টবাদী আজীবক সম্প্রদায় বিশ্বাস করত মানুষ তার কর্মফল নিয়েই জন্মায়। কর্মফলের ভাল মন্দ সবকিছুই মানুষকে ভোগ করতে হয়। কর্মফল অলঙ্ঘ্য।

কিন্তু মহাবীর বিশ্বাস করতেন, মানুষের কর্মফল অমোঘ নয়। সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ও ধর্মাচরণের দ্বারা মানুষ তার কর্মফলকে অতিক্রম করতে পারে। মহাবীর ছিলেন পুরুষকারে বিশ্বাসী। মানুষ অদৃষ্টের অধীন একথা তিনি মানতেন না।

মতামতের এই বিরুদ্ধতা নিয়ে গোশাল মহাবীরের ধর্মমতের বিরোধী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তপস্যালব্ধ শক্তিতে মহাবীরকে তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। অপরিসীম সাধনঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন মহাবীর। মুগ্ধ গোশাল অবশেষে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এমনি করে সকল প্রকার বিরুদ্ধ শক্তিকেই মহাবীর তাঁর তপস্যালব্ধ শক্তিবলে পরাভূত করেছিলেন।

মোক্ষলাভের পর ত্রিশ বছর ধর্ম প্রচারে ব্রতী ছিলেন মহাবীর। অবশেষে বিহারের অন্তর্গত পাবা নগরে খ্রিঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন।

মহাবীর যেই সময়ে দেশে দেশে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়িয়েছেন, সেই সময়ে বুদ্ধদেবও তাঁর ধর্মমত প্রচারে রত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সমসাময়িক কালে আবির্ভূত হয়েও তাঁদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার কখনো ঘটেনি।

মহাবীর ও বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্মমত অনেকাংশেই ছিল হিন্দুধর্মের মতবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই উভয় ধর্মমতই ভারতের জনগণের সমর্থন লাভ করেছিল। সমসাময়িককালে অজাতশত্রুর পুত্র উদরি এবং নন্দরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাবীর প্রচারিত ধর্মমত বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রসারলাভ করে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও ছিলেন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক।

আচরণগত মতভেদের দরুণ খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকে জৈনগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

শ্বেতাম্বরগণ বিশ্বাস করতেন ধর্মলাভে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই অধিকার রয়েছে। সাধনার দ্বারা সকলেই মোক্ষলাভ করতে পারে। আর তাঁরা পরিধান করতেন শ্বেতবস্ত্র।

দিগম্বরগণ কোনপ্রকার বস্ত্র ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁরা মনে করতেন, একমাত্র পুরুষরাই মোক্ষলাভের অধিকারী হতে পারে।

শ্বেতাম্বরগণের নেতৃপদে ছিলেন স্থূলভদ্র। জৈন ধর্মগ্রন্থ কল্পসূত্র রচয়িতা ভদ্রবাহু ছিলেন দিগম্বরদের নেতা। মহাবীরের উপদেশাবলী দ্বাদশ অঙ্গ বা সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু দিগম্বরগণ এই গ্রন্থকে প্রামাণ্য মনে করেন না।

শঙ্করাচার্য

জীবনের সর্বস্তরে যখন ধর্মের গ্লানি প্রকট হয়ে ওঠে, ধর্মের নামে প্রাধান্যলাভ করে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি, অনাচার, অন্যায়, ব্যভিচারে কলুষিত হয়ে ওঠে সমাজজীবন; সেই যুগ সন্ধিক্ষণে পরিত্রাতা রূপে যুগে যুগে দেশে দেশে সত্যের বার্তাবাহক মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে থাকে। আচার্য রূপে আপন কর্ম ও সাধনার দ্বারা তাঁরা অধর্মের গ্লানি দূর করে চিরন্তন সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। যুগপুরুষ আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবও এমনি ভারতবর্ষের এক যুগসংকটকালে হয়েছিল।

বর্ণাশ্রমশাসিত ব্রাহ্মণ্য ভারতের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের মধ্যে ভগবান বুদ্ধদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর প্রেম করুণা অহিংসা ও সংস্কারমুক্ত উদার ধর্মমত। ভারতবর্ষের নিপীড়িত সমাজ মানস সাদরে বরণ করে নিয়েছিল তাঁকে।

বৌদ্ধধর্মের মহাবাণী বৈদিক ভারতকে প্লাবিত করে ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া খণ্ডের অন্যান্য দেশে।

কিন্তু বুদ্ধের পরিনির্বাণের কয়েকশো বছরের মধ্যেই নানা আচার কুসংস্কার আর তান্ত্রিকতার অনাবিল অনুপ্রবেশ ঘটে বুদ্ধমত কলুষিত হয়ে ওঠে। শোচনীয় অধঃপতন নেমে আসে ভারতবাসীর জীবনে।

বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতাপে প্রাচীন মুনি ঋষিদের সাধনালব্ধ অধ্যাত্মজ্ঞান ভুলে গিয়েছিল মানুষ। অবলুপ্তপ্রায় সেই শাশ্বত অদ্বৈতবাদের পুনরুত্থান ঘটিয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর।

অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রহ্ম ছাড়া জগতের সব কিছুই মিথ্যা। ব্রহ্ম থেকেই সকল কিছুর উৎপত্তি, ব্রহ্মাতেই অবলুপ্তি। এই দার্শনিক মতবাদকে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রথম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক শঙ্করাচার্যের জীবনকাহিনী অতি বিচিত্র।

দক্ষিণ ভারতের কেরালার কালাডি গ্রামে ৭৮৮ খ্রিঃ বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে শঙ্করের জন্ম। তাঁর পিতার নাম শিবগুরু, মাতা বিশিষ্টা দেবী।

শ্রুতিধর হয়েই জন্মেছিলেন শঙ্কর। একবার যা শুনতেন তা কখনও ভুলতেন না। বাল্য বয়সেই তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে সকলে বিস্মিত হয়েছিলেন।

পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পরিবার। পিতার কাছেই পুত্রের শিক্ষা শুরু হয়। কিন্তু বেশিদিন পিতার সান্নিধ্য পাননি শঙ্কর। তিন বছর বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পুত্রের লালনপালনের ভার গ্রহণ করলেন বিশিষ্টা দেবী।

পাঁচ বছর বয়সে উপনয়নের পরে তাঁকে পাঠানো হল গুরুগৃহে। সেখানে মাত্র দুবছরের মধ্যেই নানা শাস্ত্র আয়ত্ত করে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন।

মাত্র সাত বছরের বালকের এমন অতিলৌকিক প্রতিভা জগতে বিরল। শিক্ষান্তে গৃহে ফিরে এসে নিজেই টোল খুললেন। প্রথমে সংশয় থাকলেও শঙ্করের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। টোলের শিক্ষকতাতেও অল্পদিনেই শঙ্করের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

মাধবাচার্যের বিখ্যাত শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থে বলা হয়েছে, শঙ্করের বাল্যকালে একবার কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সর্বসুলক্ষণযুক্ত বালককে দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা তাঁর ভাগ্য গণনা করতে চান।

গণনা শেষ হলে তাঁরা বিশিষ্টা দেবীকে জানান, এই বালক একদিন ভারতের অধ্যাত্ম জগতে দীপ্তিমান সূর্যের মতো নিজেকে প্রকাশ করবে। ভারতবর্ষের মানুষ যুগ যুগ ধরে তাঁকে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে স্মরণ করবে।

পরেই বিষণ্ণ কণ্ঠে পণ্ডিতরা জানালেন, কিন্তু এই বালক স্বল্পায়ু, মাত্র ষোল বৎসর সে ইহলোকে থাকবে।

বিশিষ্টা দেবী সাশ্রু নয়নে এই দুর্দৈবের প্রতিবিধান জানতে চাইলে, পুনরায় গণনা করে পণ্ডিতরা বললেন, যদি বালক সন্ন্যাস গ্রহণ করে তবেই এই অকাল-মৃত্যু রোধ করা সম্ভব।

তারপর থেকে মায়ের প্রতিটি দিন কেটেছে গভীর শঙ্কায় উদ্বেগে। ব্যাকুল হয়ে তিনি কেবল ভাবছেন, কী করে একমাত্র পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দেবেন। বুকে পাষাণ বেঁধে দিন যাপন হয় মায়ের, পুত্রকে কাছ ছাড়া করার কথা ভাবতে বুক ফেটে যায়।

অপর দিকে ধীমান বালক শঙ্করের হৃদয়ে পণ্ডিতদের গণনা নতুন প্রজ্ঞার আলো প্রজ্বলিত করে। জগতে মৃত্যুই পরম সত্য। জীবনের পরিসমাপ্তি কখন

আসবে কেউ জানে না। যতক্ষণ জীবন তার মধ্যেই জানতে হবে জগতের স্বরূপ, সুখ-দুঃখময় জীবনের গূঢ়তম রহস্যকে। জানতে হবে মুক্তির পথ।

তিনি উপলব্ধি করেন, এক একটি মুহূর্তের সঙ্গে জীবনের পরিধিও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। বৃথা কালক্ষেপের সময় নেই। মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসংকল্প হয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন।

নিজের টোলে ছাত্রদের শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় মাতৃসেবায় নিজেকে নিয়োগ করেন।

এই সময় একদিন তাঁর মা দূরবর্তী পূর্ণা নদী থেকে জল আনতে যান। ফেরার পথে পথশ্রমে ক্লান্তিতে পথের মধ্যেই তিনি মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েন।

মায়ের দুঃখ দূর করবার জন্য অভিভূত শঙ্কর শিবের উপাসনা করেন। কিছু দিন পরেই দেখা যায় নদীর স্রোত গতি পরিবর্তন করে তাঁদের গৃহের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এই অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচারিত হলে শঙ্করের নাম সমগ্র কেরল দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের তৎকালীন রাজা রাজশেখর স্বয়ং এসে শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার উপহার দিতে চান। কিন্তু শঙ্কর সবিনয়ে সেসব প্রত্যাখ্যান করেন।

শঙ্করের যখন আট বছর বয়স, তৎকালীন সামাজিক রীতি অনুযায়ী তাঁর বিবাহের প্রস্তাব আসে। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁর আয়ু মাত্র ষোল বছর। তাছাড়া তিনি জন্মসন্ন্যাসী।

এর কিছুদিন পরেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে মাতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। পিতা মাতার অনুমতি ভিন্ন সন্ন্যাস গ্রহণ করা চলে না।

মাতা বেদনায় অধীর হন, কিছুতেই সম্মতি দিতে চান না।

কিন্তু যাঁর জীবন কর্ম দৈব নির্দিষ্ট, দৈবের অনুগ্রহেই তার সমস্ত প্রতিকূলতা অসারিত হয়।

একদিন বালক শঙ্কর মায়ের সঙ্গে পূর্ণা নদীতে স্নান করতে গেছেন। এমন সময় এক কুমীর শঙ্করকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। নিরূপায় মাতা এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে চিৎকার করতে থাকেন।

শঙ্কর তখন মাতাকে বলেন, মা, তুমি যদি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দাও তবে আমার প্রাণ রক্ষা হয়। এই কুমীর এখনই আমাকে ছেড়ে দেবে।

পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল মাতা সেই মুহূর্তে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেন। কুমীরও সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

মায়ের অনুমতি পাবার পর আট বছর বয়সেই গৃহত্যাগ করে পথে বার হলেন শঙ্কর। বিপদসঙ্কুল পথ প্রান্তর অরণ্য অতিক্রম করে প্রস্তরাকীর্ণ পাহাড়ি

পথ ধরে দীর্ঘ দুই মাস পরে তিনি উপস্থিত হলেন নর্মদা নদীর তীরে ওঙ্কারনাথ পাহাড়ে।

গৃহত্যাগের আগেই শঙ্কর জানতে পেরেছিলেন অদ্বৈতবাদী মহাযোগী গোবিন্দপাদ এই পাহাড়েরই নিভৃত গুহায় ধ্যানমগ্ন রয়েছেন

ঈশ্বর উপলব্ধির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল শঙ্কর সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করে উপস্থিত হলেন ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগীর সমীপে। অন্তরের আর্তি জানিয়ে বলেন, প্রভু, আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান ও সন্ন্যাস দিয়ে কৃতার্থ করুন।

দিব্যকান্তি বালকের প্রতি করুণার দৃষ্টি বর্ষণ করে গোবিন্দপাদ শঙ্করকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বালক শঙ্কর যে উত্তর দিয়েছিলেন, জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। শঙ্কর বললেন, প্রভু আমি পার্থিব বস্তুনিচয়ের কোনওটিই নই। ইন্দ্রিয় সমষ্টিগত দেহও আমি নই। এই সমস্ত কিছুর অতীত শিব-স্বরূপ নির্লিপ্ত পরমাত্মার একটি অংশ মাত্র।

শঙ্করের উত্তরে মুগ্ধ হন গোবিন্দপাদ। তিনি উপলব্ধি করেন, এই বালক সাধক এক মহাশক্তির আধার। তিনি সাগ্রহে তাঁকে অদ্বৈত তত্ত্ব শিক্ষা দেন। সন্ন্যাস দীক্ষাও তাঁর কাছেই পেলেন শঙ্কর। তারপর গুরুর গৃহেই কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন।

দীর্ঘ তিন বৎসর একাদিক্রমে সুগভীর তপস্যার পর গুরু প্রসাদে সাধনায় সিদ্ধ হলেন শঙ্কর। তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হল অধ্যাত্ম সাধনার গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান। গুরু তাঁকে বললেন, বৎস তুমি তপঃসিদ্ধ হয়েছ। এবার পরিব্রাজনে বার হও। প্রথমে বারাণসীতে যাও, সেখানে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কর।

গুরুর নির্দেশ পেয়ে শঙ্করচার্য এলেন কাশীতে।

সেইকালে কাশী ছিল ভারতের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলন কেন্দ্র। এখানে শাস্ত্রজ্ঞ সাধু পণ্ডিতেরা নিজেদের মধ্যে ধর্ম আলোচনা, হোমযজ্ঞ শাস্ত্র পাঠে নিরত থাকতেন। শঙ্কর এসে তাঁদের মধ্যে স্থান নিলেন। অল্প দিনেই কিশোর সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সকলে মুগ্ধ হলেন।

শঙ্করের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। শাস্ত্রবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর কাছে শাস্ত্র আলোচনার জন্য সমবেত হতে লাগলেন।

শঙ্কর সকলের মতামতই শান্তভাবে শুনতেন। পরে নিজের শাণিত যুক্তিতে তাঁদের অভিমত খন্ডন করে অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতেন। এই

ভাবে দেশের মহা মহা তত্ত্ববিদ পন্ডিত শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্কে তাঁর কাছে পরাজিত হতে লাগলেন এবং অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

অপরাজেয় শাস্ত্রবেত্তা পন্ডিত ব্রহ্মবাদী শঙ্করের ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা বুঝি তখনো কিছু বাকি ছিল। কাশীতে এক অলৌকিক ঘটনার মধ্যদিয়ে তাঁর সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হল।

একদিন তিনি সঙ্কীর্ণ গলি পথে মণিকর্ণিকার ঘাটে চলেছেন স্নানে। দেখলেন একটি মেয়ে তার স্বামীর মৃতদেহ কোলে নিয়ে পথ জুড়ে বসে আছে।

নিকটবর্তী হয়ে শঙ্কর মেয়েটিকে বললেন, মা, শবদেহটা পথের পাশে সরিয়ে নিয়ে যাও।

শঙ্করের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, সাধকবর, আপনি প্রচার করছেন শক্তিহীন ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জগতের অধীশ্বর। আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহলে শক্তিহীন এই শবদেহকে বলুন, সে নিজেই পাশে সরে যাবে।

এই উক্তি শুনে স্তম্ভিত হন শঙ্কর। মুহূর্তে তাঁর ভ্রম দূর হয়। তিনি উপলব্ধি করলেন, জগৎক্রিয়ায় ব্রহ্ম একা নন তার সঙ্গে ক্রিয়াশীল রয়েছেন আদ্যাশক্তি। তিনিই বিশ্বজগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী। তাঁর শক্তিতেই ব্রহ্ম সক্রিয়, জগৎ নিয়ন্ত্রণকারী। ব্রহ্মের উপস্থিতি রয়েছে সর্বজীবে, সর্বভূতে। কিন্তু আদ্যাশক্তি মহামায়ার শক্তি ভিন্ন সকলেই অচল অনড়। জগতে প্রতিটি কাজের পেছনেই রয়েছে আদ্যাশক্তিরই শক্তি।

শঙ্কর আরও উপলব্ধি করলেন, আদ্যাশক্তিকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মের উপদেশ অসম্পূর্ণ। ঈশ্বর একদিকে যেমন নিরাকার তেমনি সাকারও। জীব ও ব্রহ্ম অভেদ।

এই ঘটনার পর থেকে অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা শঙ্কর, দ্বৈত মতবাদও প্রচার করতে লাগলেন।

ব্রহ্ম ও জীব অভেদ এই জ্ঞান লাভ হলেও আচারনিষ্ঠ শঙ্করের মন থেকে জাতিভেদের কুসংস্কার তখনো দূর হয়নি। অস্পৃশ্য নিচ জাতির প্রতি সংস্কার বশেই তিনি ঘৃণা বোধ করতেন।

একদিন কাশীর সংকীর্ণ গলিপথ দিয়ে যাচ্ছেন শঙ্কর। এমন সময় সামনে পড়ল এক চণ্ডাল, তার সঙ্গে চারটি কুকুর। ছোঁয়াছুঁয়ির শঙ্কায় স্বভাবতঃই শঙ্কর সেই চণ্ডালকে পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডাল উত্তর করল, তুমি কাকে সরে যেতে বলছ, দেহ না আত্মাকে? আত্মা তো, শুদ্ধস্বভাব ও সর্বব্যাপী কিন্তু নিষ্ক্রিয়। আর দেহ জড়, চলনশক্তি বর্জিত; কি করে সরবে? তোমার ব্রহ্মতত্ত্বের এক ও অভিন্ন ধারণা

যদি সত্য হয় তাহলে তোমার দেহ আর আমার দেহে পার্থক্য কোথায়? তুমি তো জ্ঞানী, তাহলে ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে ভেদ করছ কেন?

চণ্ডালের জ্ঞানগর্ভ বচনে লজ্জিত হলেন শঙ্কর। তাঁর মনের কুসংস্কারের ভ্রম মুহূর্তে দূর হল। তিনি সবিনয়ে বললেন, তোমার কাছ থেকে আমি সর্বজীবে সমজ্ঞান শিক্ষা লাভ করলাম, তোমাকে প্রণাম।

সেই দিন থেকে শঙ্করের মন থেকে অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার দূর হল।

এই সময়ে চোলদেশীয় এক ব্রাহ্মণ যুবক সনন্দন শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই আচার্য শঙ্করের প্রথম শিষ্য। পরবর্তীকালে সনন্দনের নাম হয় পদ্মপাদ। শঙ্করাচার্যের অন্যান্য প্রিয় শিষ্য হলেন হস্তামলক, ভোটকাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য, সমিৎপাণি, চিদ্বিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্তি, ভানুমরীচি, বুদ্ধিবিরিঞ্চি ও আনন্দগিরি।

একান্ত গুরুভক্ত সনন্দন ছিলেন শঙ্করের প্রিতম শিষ্য। তাঁকে তিনি অত্যধিক স্নেহ করতেন। এ নিয়ে শিষ্যবর্গের অনেকের মনেই ঈর্ষা ছিল। শঙ্কর তা বুঝতে পেরে একদিন সুকৌশলে এক বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা করে সনন্দনের গুরুভক্তির অনন্য নিষ্ঠা প্রমাণ করলেন।

সেদিন সনন্দন গঙ্গার অপর পারে দাঁড়িয়ে নৌকার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এপার থেকে শঙ্কর তাঁকে ডেকে বললেন, সনন্দন, আমার বিশেষ প্রয়োজন, তুমি এখনই এপারে চলে এসো।

গুরুর আহ্বান পেয়ে সনন্দন মুহূর্ত মাত্র কালক্ষেপ করলেন না। তাঁর পায়ে ছিল খড়ম। তাই নিয়েই তিনি গুরুরনাম জপ করতে করতে গঙ্গার জলে নেমে পড়লেন। তারপর এপার লক্ষ্য করে হেঁটে আসতে লাগলেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপেই নদীর বুকে পদ্মফুল ফুটে উঠতে লাগল।

এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সকলেই অভিভূত হন। শঙ্কর সেই দিন থেকেই সনন্দনের নতুন নামকরণ করলেন পদ্মপাদ।

কাশীতে একবৎসর বাস করার পর শঙ্কর পরিব্রাজনে বের হলেন। প্রথমে উত্তরাপথে নানা তীর্থ পর্যটন করে তিনি উপস্থিত হলেন হিমালয় পর্বতে ব্যাসদেবের পুণ্যাশ্রম বদরিকাশ্রমে।

এখানে অবস্থান কালে তিনি সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ ও বিভিন্ন ছন্দে স্তবস্তোত্রাদি প্রণয়ন করেন। এ সকলের মধ্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, উপনিষদ ভাষ্য, গীতাভাষ্য, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত, সনৎসুজাত ভাষ্য অন্যতম। ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে শঙ্কর এসকল জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।

উল্লেখ করার বিষয় হল, সুপ্রাচীন কালে হিমালয়েরই সপ্তসিন্ধব নামক স্থানে ব্রহ্মবিদ আর্য ঋষিগণ বেদ রচনা করেছিলেন।

শঙ্করের দিগ্বিজয় গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনার পর ব্যাসদেব ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে তা পাঠ করে আনন্দে অভিভূত হন। পরে শঙ্করকে বর দিয়ে বলেন, বৎস ভারতের সুপ্রাচীন বৈদিক ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার সুমহান দায়িত্বভার তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। তোমার ষোল বৎসরের পরমায়ু বত্রিশ বৎসর হোক।

বদরিকাশ্রম থেকে সতের বছর বয়সে শঙ্কর ধর্মবিজয়ে বের হন। দীর্ঘ পনের বৎসরকাল তিনি ভারতের নানা প্রান্তে পর্যটন করেন। এই সময়ে দেশের খ্যাতনামা বৌদ্ধ পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে বিকৃত বৌদ্ধমতবাদ খন্ডন করেন এবং বেদাশ্রিত সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মবিজয়ে বেরিয়ে শঙ্কর প্রথমে প্রয়াগে গিয়ে মহাপন্ডিত সুমারিল ভট্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে তাঁর নির্দেশে যোগবলে আকাশ পথে মিথিলার মাহিষ্মতী নগরে উপস্থিত হয়ে কর্মকান্ডী দুর্ধর্ষ পন্ডিত মন্ডন মিশ্রকে শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করেন।

ছয়দিন ব্যাপী দুজনের যে তর্কযুদ্ধ চলে তার মীমাংসা করেন মন্ডনপত্নী উভয়ভারতী। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল সুবিদিত। মন্ডন মিশ্র তর্কে পরাস্ত হন।

স্বামীর পরাজয়ের পর উভয়ভারতী শাস্ত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে শঙ্করকে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। আজন্ম সন্ন্যাসী শঙ্কর গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে ছিলেন অনভিজ্ঞ। তাই প্রশ্নোত্তর দানের জন্য তিনি কয়েকদিন সময় চেয়ে নেন।

সেই সময় শঙ্কর যোগবলে জানতে পারেন মগধের রাজা অমরক পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ তিনি শিষ্যদের নিয়ে বাইরে এসে পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় ধ্যানস্থ হলেন। তারপর সূক্ষ্মশরীরে রাজার দেহে প্রবেশ করলেন।

মৃত রাজা জীবিত হয়ে উঠলেন। শবযাত্রীরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে রাজা পুনর্জীবন লাভ করেছেন ভেবে মহাউল্লাসে সমারোহ সহকারে তাঁকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

রাজার দেহে প্রায় একমাস অবস্থান করে শঙ্কর রানীর কাছ থেকে নারী পুরুষের সম্পর্কের সব বিষয় জেনে নেন। পরে রাজার দেহ ত্যাগ করে নিজের দেহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শিষ্যবর্গ তাঁর ধ্যানস্থ দেহ রক্ষা করছিলেন। স্বীয় শরীরে ফিরে আসার পর শঙ্কর শিষ্যদের নিয়ে উভয়ভারতীর সম্মুখীন হন এবং তাঁকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। মন্ডনমিশ্র পরে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নামকরণ হয় সুরেশ্বরাচার্য।

সেই সময় কেরলে গ্রামের বাড়িতে শঙ্করের মাতা মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে স্মরণ করছিলেন। যোগবলে তা জানতে পেরে শঙ্কর তৎক্ষণাৎ মগধ থেকে মায়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি মায়ের যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করেন এবং মৃত্যুকালে তাঁকে ইষ্টমূর্তি দর্শন করান।

মাতার পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে শঙ্কর ভারতের অন্যান্য প্রান্তে ভ্রমণ করেন। এই সময় বৌদ্ধ, জৈন, যাজক, দ্বাইক, কাপালিক, কণাদ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত ক্ষপণক, নীলকণ্ঠ, সৌগত, রুচক, বান, ময়ূর, দন্ডী, উগ্র ভৈরব, শ্রীহর্ষ, ভাস্কর পন্ডিত ও অভিণব গুপ্ত প্রমুখকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করেন। এঁদের অধিকাংশই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মবিজয় কালে বিভিন্ন প্রদেশের রাজা ও ধনশালী ব্যক্তি শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি নানা স্থানে বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করেন। পান্থশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অন্নসত্র ছাড়াও পথিকদের ও যানবাহনের পশুদের জন্য জলাধার ও বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করেন।

কাশ্মীরের সারদামঠে কিছুকাল অবস্থান করার পর শঙ্কর তৎকালীন শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান তক্ষশীলায় উপস্থিত হন। এখানে শাস্ত্রযুদ্ধে দেশ বিখ্যাত অনেক পন্ডিতকে তিনি পরাস্ত করেন।

কাশ্মীর থেকে তিনি কেদারনাথে আসেন, এখানে তিনি বেশিরভাগ সময়ই ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তারপর একদিন শিষ্যমন্ডলীকে উপদেশ দানের পর যোগবলে দেহত্যাগ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল বত্রিশ বছর।

ধর্মবিজয়কালে আচার্য শঙ্কর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন। এছাড়া হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসার কল্পে মহীশূরে তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকায় গোমতী তীরে সারদামঠ, পুরীতে সমুদ্রকূলে গোবর্ধনমঠ ও বদ্রীনাথে অলকানন্দা নদী তীরে যোশী বা জ্যোতির্মঠ স্থাপন করেন। এক এক জন শিষ্যকে প্রত্যেক মঠের পরিচালন দায়িত্ব অর্পণ করেন। বর্তমানে এই সকল মঠের প্রধানগণ শঙ্করাচার্য নামেই অভিহিত হয়ে থাকেন।

আচার্য শঙ্করের অন্যতম কীর্তি হিন্দু ধর্মের সন্ন্যাসিভেদে দশনামী সম্প্রদায় গঠন। এই সম্প্রদায়গুলির পদবী হল তীর্থ, বন অরণ্য, গিরি, পুরী ভারতী, পর্বত, সাগর, সরস্বতী ও আশ্রম।

শঙ্কর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হল, মোহমুদ্গর, সাধনপঞ্চক, মান্ডুক্যকারিকা ভাষ্য, আনন্দলহরী, মণিরত্নমালা, বিবেকচূড়ামণি, আত্মবোধ, সাধনপঞ্চক, যতিপঞ্চক, অপরাধভঞ্জন, আত্মবোধ, গোবিন্দাষ্টক, সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত, বেদসার, শিবস্তব ইত্যাদি। তাঁর প্রণীত স্তব স্তোত্র শ্লোকের সংখ্যা প্রায় ৭৫ টি।

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রকরদের অন্যতম ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্পর্শে ইউরোপের চিত্রকলার ইতিহাসকে উজ্জীবিত করেছিলেন। যদিও তাঁর জীবনকাহিনী ছিল এক বিস্ময়কর মানসিক অস্থিরতায় তাড়িত, অস্থির, অবিন্যস্ত।

থিওডোরাস ভ্যান গঘ ছিলেন হল্যান্ডের এক পল্লীর ধর্মযাজক। জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁর প্রথম পুত্রটি মারা গিয়েছিল। সেই স্বল্পায়ু শিশুপুত্রের নাম রাখা হয়েছিল ভিনসেন্ট।

ঠিক একবছর পরেই ১৮৫৩ খ্রিঃ থিওডোরাসের দ্বিতীয় পুত্রটির জন্ম হলে, মৃত সন্তানের নামে শিশুর নামকরণ করেছিলেন তিনি ভিনসেন্ট।

নবজাত শিশুটির জীবনে মাতা-পিতার স্নেহ যত্নের ঘাটতি ছিল না। কিন্তু তথাপি বালক বয়স থেকেই তার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের জেদ ও অস্থির স্বভাবের লক্ষণ ফুটে উঠল। শিশুটি রেগে যেত অল্পেই এবং রাগের সময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সংঘাতিক সব কান্ড ঘটিয়ে বসত। সম্ভবতঃ সেই কারণেই বিশেষত মায়ের কিছুটা বিরাগ প্রকাশ পেত পুত্রের প্রতি।

এই অবস্থা থেকেই বালক ভ্যান গঘের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল স্নেহ ভালবাসার বুভুক্ষা আর এক ধরনের হীনমন্যতা। তাঁর সবসময়েই মনে হত কেউ তাঁকে পছন্দ করে না, ভালবাসে না। তিনি অবাঞ্ছিত।

এই মানসিক বোধ থেকেই পরবর্তী জীবনে ভ্যান গঘ কেবলই খুঁজে বেড়িয়েছেন এমন এক নারীকে, যার কাছ থেকে পাবেন নিরন্তর প্রেম ভালবাসা। সারা জীবনে বহু নারীর সঙ্গেই উদ্দাম প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন তিনি। করেছেন সুখের সন্ধান।

কিন্তু তাঁর জীবনব্যাপী সেই অন্বেষণ ব্যর্থই হয়েছে। না পেয়েছেন কাঙ্ক্ষীত নারীর সন্ধান, না সুখ।

দুর্ভাগ্য এটাই যে, এই ব্যর্থতাই মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন করে তুলেছিল তাঁকে—যার পরিণতি ছিল উন্মাদ রোগ।

পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে ভালবাসা না পেলেও ছোট ভাই থিওকে গভীরভাবে ভালবাসতেন ভিনসেন্ট। থিওর কাছ থেকে পেয়েও ছিলেন ভালবাসার প্রতিদান আমৃত্যু।

বদমেজাজী অস্থির স্বভাবের ভিনসেন্টকে নিয়ে এমনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর বাবা মা, যে মাত্র ১১ বছর বয়সেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বহুদূরে ডেভেনবার্গের এক আবাসিক বিদ্যালয়ে।

পাঁচ বছর এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন ভিনসেন্ট। কিন্তু বিদ্যালয় জীবন তাঁর সুখকর ছিল না। পুত্রের নামে অস্থিরতার নালিশ শুনে শুনে এতো বিরক্ত হতে হয়েছিল তাঁর বাবা মাকে, শেষ পর্যন্ত ১৫ বছর বয়সে তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক আর্ট গ্যালারিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভিনসেন্টের কাকা ছিলেন অর্থবান এবং এই গেটপিল আর্ট গ্যালারির তিনি ছিলেন অংশীদার। সেই সূত্রেই ভবিষ্যতের এক মহৎ শিল্পপ্রতিভার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল শিল্পের জগতের সঙ্গে।

এই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা ছিল লন্ডনে। ১৮৭৩ খ্রিঃ হেগ থেকে ভিনসেন্ট বদলি হয়ে এলেন লন্ডনস্থ শাখায়।

আর্ট গ্যালারির পরিবেশের প্রভাবেই অন্তর্গত প্রতিভা উদ্দীপনা লাভ করেছিল। ছবি আঁকা মকশো করতে করতেই ছবির নেশায় পড়ে গেলেন তিনি।

জগদ্বিখ্যাত চিত্রকরদের শ্রেষ্ঠ কাজগুলো তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিল। নিজেকেও একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর রূপে গড়ে তুলবার সঙ্কল্প জন্ম নেয় তাঁর মধ্যে। রেমব্রাঁ, মিলেট-এর শিল্পকর্মগুলো ছিল তাঁর প্রধান প্রেরণা।

ছবি আঁকার অনুশীলনের মধ্য দিয়েই ভিনসেন্ট উপলব্ধি করলেন সমস্ত শিল্পকর্মের পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য বা নীতি প্রকাশের তাগিদ থাকে।

লন্ডনে ভিনসেন্ট ঠাঁই নিয়েছিলেন মিসেস লয়্যা নামে এক ফরাসি মহিলার বাড়িতে। থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত এখানেই করেছিলেন।

মিসেস লয়্যা ও তাঁর মেয়ে উরশুলা বাচ্চাদের একটি স্কুল চালাতেন। মা-মেয়ের সংসারে ভিনসেন্ট যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিলেন। তাঁদের সহৃদয় ব্যবহার ভিনসেন্টের স্নেহ-প্রীতি-বুভুক্ষু মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করত।

নিজের পারিবারিক পরিবেশে যা তিনি পাননি এতকাল, সেই পারিবারিক সুখ শান্তির আস্বাদ তিনি এখানে লাভ করলেন।

তাঁর অন্তরের স্নেহ-বুভুক্ষা লয়্যার পরিবারের পরিবেশে অনেকটাই পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু ভিনসেন্ট অল্পদিনেই নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। উরশুলাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললেন। কিন্তু উরশুলা ছিল অন্য একজনের বাগদত্তা। ফলে এ নিয়ে খুবই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হল।

হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন ভিনসেন্ট। শেষ পর্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে একদিন লন্ডনের বাস উঠিয়ে হল্যান্ড চলে গেলেন।

এই সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থা এমন হল যে কাউকেই বিশেষ করে মেয়েদের সহ্য করতে পারতেন না। উরশুলার প্রত্যাখ্যানের জ্বালা তাঁর স্বভাবে একটা বিদ্বেষভাব জাগিয়ে রাখত।

এই অন্তর্দাহ নিয়ে এই সময় থেকেই ভিনসেন্ট নিয়মিত গণিকাপল্লীতে যাতায়াত শুরু করলেন। এখানে প্রত্যাখ্যানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এখানেই ডুবে গেলেন তিনি।

সারাজীবনে আর ভিনসেন্ট কখনও গণিকাপল্লীর আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

কিছুদিনের মধ্যেই দুঃখ হতাশা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলেন ভিনসেন্ট। ততদিনে জীবিকার্জ্জনের প্রশ্নটাও তীব্র হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কাকার কিছু কাজের দায়িত্ব নিয়ে আবার স্বভাবিক জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই সময়ে তাঁকে লন্ডন আর প্যারিসের মধ্যে প্রায়ই যাতায়াত করতে হত। কাজের মধ্যে থাকতে থাকতেই তাঁর মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হল। তিনি স্থির করলেন, অবশিষ্ট জীবন নিপীড়িত মানবজাতীর কল্যাণে ব্যয় করবেন। স্বাভাবিক ভাবেই বাইবেলের প্রতি এই সময়ে আকৃষ্ট হল তাঁর ছন্নছাড়া মন। নিয়মিত বাইবেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গির্জাতেও যাতায়াত আরম্ভ হল।

গির্জার পবিত্র পরিবেশের সান্নিধ্যে আসার পরে ভিনসেন্ট স্থির করলেন, এবারে গির্জার কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন এবং ধর্মপ্রচার করবেন।

এই সময়ে যেন দৈব যোগাযোগেই গেটপিল সংস্থার যোগাযোগটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল। কাজে অমনোযোগিতার জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন ভিনসেন্ট।

যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নব উদ্যমে জীবনের নতুন পথে পা বাড়ালেন তিনি। কিছুদিন ইংলন্ডের বস্তি অঞ্চলে দরিদ্র শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণের কাজে লিপ্ত রইলেন।

কিন্তু শিক্ষকতার কাজে তেমন তৃপ্তি মিলল না। ধর্মভাবে উদ্দীপিত তাঁর মন সেই পথেই তাঁকে টানতে লাগল।

লন্ডন ছেড়ে হল্যান্ডে চলে এলেন ভিনসেন্ট। এখানে বেরুনেজ অঞ্চলে খনি শ্রমিকদের গ্রামেই তাঁর কর্মস্থল নির্দিষ্ট করলেন। চার্চের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই স্বাধীন ভাবে শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কাজে নেমে পড়লেন।

দুঃখী আতুর অসহায় জনে প্রেম বিতরণের উপদেশ দিয়েছেন যীশু। কাঙ্গালের সেবাকেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলে নির্দেশ করেছেন তিনি।

সর্বজনীন এই খ্রিস্টনীতি অনুসরণ করে ভিনসেন্ট শ্রমিকদের মধ্যে যারা সবচাইতে বেশি অসহায়, দুঃস্থ তাদের সেবাচর্যায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

সহজাত আন্তর প্রেরণার বশে ভিনসেন্ট যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল না কোন কৃত্রিমতা কিংবা ব্যবসায় বুদ্ধি। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। কিন্তু স্থানীয় যাজকমহল এতে সন্তুষ্ট হতে পারল না। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নিয়মনীতির প্রশ্ন তুলে তাঁরা ভিনসেন্টের কাজে বাধার সৃষ্টি করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপর এমন চাপ সৃষ্টি হল যে তিনি বাধ্য হলেন তাঁর সেবাব্রতের কাজ বন্ধ করতে। সময়টা ছিল ১৮৮০ খ্রিঃ।

কিন্তু হল্যান্ডের বেরুনেজ অঞ্চলের খনিশ্রমিকদের পাতুরেজেস গ্রামেই সকলের অলক্ষ্যে ভিনসেন্টের নবজন্ম হল। বলা যায় নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন তিনি।

বেরুনেজে আসার পর ভিনসেন্ট খনিশ্রমিকদের নিয়ে কিছু ছবি এঁকেছিলেন। এই ছবিগুলোই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে তুলল। তিনি ছবি আঁকার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

সেই সময় ভিনসেন্টের ছোট ভাই থিও গেটপিল সংস্থাতেই মোটা মাইনের উঁচু পদে কাজ করছিলেন। দাদা ছবি আঁকার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, এই খবর জানতে পেরে থিও খুবই আনন্দিত হলেন। তাঁর থাকা খাওয়া ও মডেল ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই জন্য তিনি ভিনসেন্টকে নিয়মিত টাকা পাঠাতে লাগলেন। ভিনসেন্টও নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু অস্থিরমতি ভিনসেন্টের বেরুনেজ বেশিদিন ভাল লাগল না। কিছুদিন পরেই তিনি চলে এলেন হেগ-এ।

নিয়তিই যেন অদম্য আকর্ষণে ভিনসেন্টকে হেগ-এ টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এখানে আসার পর কিছুদিনের মধ্যেই সিয়েন নামের এক গণিকার সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। গণিকাটি সেই সময় ছিল সন্তানসম্ভবা। তার ওপরে ছিল রোগগ্রস্ত। উগ্র স্বভাব ও রুক্ষ ব্যবহারের জন্য সকলেরই সহানুভূতি হারিয়েছিল সে।

সেবাদর্শে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ভিনসেন্ট মেয়েটির অসহায় অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারেন নি। মেয়েটির সেবা পরিচর্যার জন্য তিনি সেই নোংরা পরিবেশে এসেই বাস করতে লাগলেন।

অযাচিত সেবা সাহচর্য ও সাহায্য পেয়েও মেয়েটি তার স্বভাব বর্জন করতে পারেনি। কারণে অকারণে সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করত এবং ভিনসেন্টের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসত।

এত সত্ত্বেও ভিনসেন্ট কটু ভাষিণী মেয়েটিকে ত্যাগ করলেন না। তার সদ্যোজাত সন্তানটির প্রতিও তিনি অতিমাত্রায় স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠলেন।

এই সময় ভিনসেন্ট এক চিঠিতে ছোট ভাই থিওকে জানালেন যে এই দুঃস্থ গণিকাটিকে তিনি বিয়ে করতে চান এবং তার সঙ্গেই থাকতে চান।

এই চিঠি পেয়ে স্বভাবতই বিচলিত হলেন থিও। তিনি বুঝতে পারলেন, এবারে চরম সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছেন তাঁর দাদা। ভিনসেন্টের এই কীর্তি যে তাদের পরিবারকেও কলঙ্কিত করে তুলবে এই চিন্তায় তিনি মর্মপীড়া বোধ করতে লাগলেন। হেগ-এ ভ্যান গঘ পরিবার খুব অপরিচিত ছিল না।

দাদাকে খুবই ভালবাসতেন থিও। তাছাড়া তাঁর ছবি আকাঁর প্রতিভার প্রতিও ছিল তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাই দাদার প্রতি একেবারে বিরূপ হল না তাঁর মন।

ভিনসেন্ট জানিয়েছিলেন, সব কিছুর মধ্যেও তাঁর ছবি আঁকার কাজ তিনি করে চলেছেন। থিও সর্বান্তঃকরণে কামনা করতেন দাদার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। তাই নিয়মিত অর্থ সাহায্য তিনি বন্ধ করলেন না।

সিয়েনকে নিয়ে খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন ভিনসেন্ট। সেবাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই তাঁকে মেয়েটির সমস্ত লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করবার শক্তি জুগিয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু দিনে দিনে পরিস্থিতি এমনই চরম হয়ে উঠছিল যে ভিনসেন্টের মন বিচলিত না হয়ে পারল না। শেষ পর্যন্ত একদিন সিয়েনকে পরিত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হলেন।

ভাইয়ের পাঠানো টাকাতেই নিজের ভরণপোষণ ও আঁকাজোকার খরচ অতিকষ্টে সংকুলান করতে হচ্ছিল। তাই অল্প খরচে থাকার জায়গার সন্ধান করে ভিনসেন্ট এসে উঠলেন নেদারল্যান্ডস-এর ডেনথে শহরে।

এখানকার কৃষকরাও ছিল অতি দরিদ্র। তাদের অবস্থা দেখে বেদনাহত হলেন ভিনসেন্ট। কিন্তু সম্ভবতঃ আকস্মিক ভাবেই তাঁর অস্থির মনে এই সময়ে কিছুটা বাস্তববোধ সজাগ হয়েছিল। কিংবা আঁকার কাজে মনের অনুরাগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বেরুনেজ-এর মতো এখানে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন না ভিনসেন্ট। দিন কতক পরেই লুয়েন-এর নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং পূর্ণ উদ্যমে ছবি আঁকার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

ভিনসেন্টের বাবা তাঁর গির্জাটি করেছিলেন তাঁতীপাড়ার মধ্যে। এখানকার মানুষের সরল সহজ জীবনযাত্রা ভিনসেন্টের আবেগপ্রবণ মনে নিবিড় অনুভূতির সঞ্চার করল। তিনি তাদের জীবনকে কেন্দ্র করেই তাঁর কল্পানা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করলেন।

গির্জার কাজের সঙ্গে যুক্ত এক বেগেম্যান পরিবারের সঙ্গে অল্পদিনেই কাজের সূত্রে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন ভিনসেন্ট। এই পরিবারের একটি মেয়ে মার্গট ছিলেন নবীন শিল্পীর চাইতে বয়সে অনেক বড়। তবু শিল্পীর অনুভূতিপ্রবণ মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। মার্গটিও সাড়া না দিয়ে পারলেন না। উভয়েই গভীর প্রেমে আসক্ত হলেন।

কিন্তু বিবাহের প্রশ্নে মার্গট-এর পরিবার বেঁকে বসল। প্রেমিক যুগলের মিলনের বাধা হয়ে দাঁড়াল দুজনের বয়সের ব্যবধান। দ্বিতীয়তঃ তরুণ শিল্পী একজন অকর্মণ্য অপদার্থ পুরুষ ছাড়া কিছু নয়, ভিনসেন্ট সম্পর্কে পরিবারটির ধারণা ছিল এরকমই।

অভিভাবকদের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ মার্গট বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। শেষে হলেন গৃহবন্দি। এরপর ভিনসেন্টের সঙ্গে তার কোনও দিনই দেখা হয়নি।

রাগে শোকে, ব্যর্থতার যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন ভিনসেন্ট। এই নিয়ে তাঁর বাবা মা ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও তীব্র মনোমালিন্য হয়ে যায়। কেবল ছোট ভাই থিও-এর সঙ্গেই তাঁর শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক বজায় রইল।

১৮৮৫ খ্রিঃ বাবার মৃত্যু হলে ভিনসেন্ট অ্যান্টওয়ার্পে চলে গেলেন এবং নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন। এতদিনে যেন নিজের মুখোমুখি হবার সময় পেলেন শিল্পী।

উপলব্ধি করলেন জীবনের মূল্যবান দিনগুলো বৃথাই নষ্ট হয়েছে, মনের মতো কাজ এখনও পর্যন্ত কিছুই করা হয়ে উঠল না। আত্মধিক্কারে জর্জরিত হতে লাগলেন ভেতরে ভেতরে।

মানসিক এই অস্থিরতার মধ্যেই একের পর এক ছবির কাজ শেষ করতে লাগলেন আর টাকার জন্য ক্রমাগত থিওকে চিঠি লিখতে লাগলেন। থিও লিখলেন, ভিনসেন্ট যেন লুয়েনে ফিরে যান। কিন্তু ভিনসেন্ট ফিরে যেতে সম্মত হলেন না।

ইতিমধ্যে সংস্থার কাজে থিও প্যারিস এসেছেন জানতে পেরে ভিনসেন্ট ট্রেনে চেপে উপস্থিত হলেন সেখানে। ভাইকে চিরকূট পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে ল্যুভর-এ দেখা করার কথা জানালেন।

দাদার চিঠি পাওয়া মাত্র থিও ল্যুভ্র-ও উপস্থিত হলেন। সেই সময় গ্যালারিতে ভিনসেন্ট রেমব্রাঁ-এর একটি চিত্র তন্ময় হয়ে দেখছিলেন। কিন্তু তাঁর রুগ্ন বিদ্ধস্ত চেহারা দেখে বেদনাহত হলেন ভ্রাতৃবৎসল থিও।

শরীর স্বাস্থ্য ঠিক না হলে ছবি আঁকার কঠিন পরিশ্রম করবেন কী করে? তাই থিও দাদাকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে তুললেন। এখানে এসে ভিনসেন্ট যেন

নতুন ভাবে উদ্দীপিত হয়ে ছবি আঁকার কাজে মেতে উঠলেন। রং তুলি আর ক্যানভাসই হয়ে উঠল তাঁর একমাত্র সঙ্গী।

ছবি আঁকার সঙ্গে চলল বিভিন্ন গ্যালারি ঘুরে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের শিল্পকর্ম পর্যবেক্ষণের কাজ।

সেই যুগের ইমপ্রেশনিস্ট প্রভাবিত উন্নতমানের চিত্রকলা বিশ্লেষণ করে ভিনসেন্টের ধারণা হল, সব ছবিই যেন একই কথা, আভিজাত্যের দম্ভ প্রকাশ করছে। এই অঙ্কনরীতির মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নেই।

জীবনের বাস্তবতার ঘাত প্রতিঘাতে বিদ্ধস্ত ভিনসেন্টের মধ্যে ততদিনে জন্ম নিয়েছিল এক বিদ্রোহী সত্তা। তাই প্রচলিত শিল্পরীতি তাঁর কাছে পীড়াদায়ক মনে হতে লাগল। তিনি সংকল্প নিলেন, নিজস্ব এক রীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ করবেন।

জীবনের এই পর্বে একজন মাত্র সমসাময়িক শিল্পীকেই তিনি আদর্শরূপে মেনে নিতে পেরেছিলেন। এই শিল্পী হলেন পল গগ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সুযোগও অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হল একদিন। গগ্যাঁ সেদিন থিওর আর্ট গ্যালারিতে এসেছিলেন। ততদিনে নিজস্ব মৌলিক অঙ্কনরীতির জন্য যথেষ্টই পরিচিতি লাভ করেছিলেন তিনি।

ভাবপ্রবণ এই শিল্পী ছিলেন বেশভূষা-বিলাসী এবং উন্নাসিক স্বভাবের। তাঁর কথাবার্তায় উগ্রতার সঙ্গে থাকত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। সেই কারণে সকলেই তাঁকে একরকম এড়িয়ে চলত।

ভিনসেন্ট কিন্তু ইতস্ততঃ করলেন না। যেচে পরিচিত হলেন এবং তাঁদের মধ্যে চিন্তার মৌলিকতার সূত্রে আলাপ জমে উঠতেও সময় লাগল না।

পরিচয়ের কিছুদিন পরে ভিনসেন্ট গগ্যাঁকে প্রস্তাব দিলেন, শিল্পীকে নিয়ে তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে যেতে চান এবং সেখানে তাঁর নতুন শিল্পরীতির একটি চিত্রশালা খুলবেন।

ভিনসেন্টের প্রস্তাব ব্যঙ্গের হাসির সঙ্গে উড়িয়ে দিলেন গগ্যাঁ। তিনি জানালেন, আপাততঃ বৃটানিতেই তাঁর থাকার ইচ্ছা।

ইতিপূর্বে গগ্যাঁ স্বাধীন ভাবে শিল্পচর্চা করার জন্য পরিবার পরিজনের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। প্যারিসে ভাল চাকরি করতেন। তাতেও ইস্তফা দিয়েছেন। কাজেই এমন মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা ভিনসেন্টের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে একাই দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে যেতে হল। আরলেস শহরে তিনি বসবাস আরম্ভ করলেন।

পাহাড়ঘেরা এই শহরে এসে ছবি আঁকার এক আদর্শ পরিবেশ পেয়ে

গেলেন ভিনসেন্ট। নদীর ধারে ঘুরে ঘুরে যা কিছু ভাল লাগে—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে এঁকে নেন।

সূর্যের সোনা-ঝরা আলো মুগ্ধ করে ভিনসেন্টকে। এই সময়ে তার সঙ্গে যেন হলুদের ব্যবহারটাও একটু বেশি হয়ে পড়ে। এই রং তাঁর ছবিকে একটা ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে, যা উত্তরকালে তাঁর চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করেছে।

এই সময়ে আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে ভিনসেন্টের প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় ধরা পড়েছে।

নিজের কাজ নিয়েই আর্লসে ডুবে থাকতেন ভিনসেন্ট। স্থানীয় লোকের সঙ্গ এড়িয়ে চলেন।

থিওর টাকা আসে নিয়মিত। তার ব্যবস্থা মতো প্যারিস থেকে রং তুলিরও জোগান পান ভিনসেন্ট সময়মতো। একরকম নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন।

একদিন বন্ধু গগ্যাঁর চিঠি পেয়ে জানতে পারলেন প্রচণ্ড দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটছে তাঁর। পাওনাদারের ভয়ে সরাইয়ের ঘর থেকে বেরুতে পারেন না।

গঁগ্যার শিল্পপ্রতিভাকে সম্মান করতেন ভিনসেন্ট। তাঁর মধ্যে যে এক কালজয়ী শিল্পীসত্তা রয়েছে এ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার আত্মপ্রকাশের পথ যে এভাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে! অসহায় ভিনসেন্ট ছটফট করেন। বন্ধুকে দেনামুক্ত করে নিজের কাছে নিয়ে আসার আর্থিক সামর্থ্য তো তাঁর নেই।

এভাবেই শীতকালটা কেটে গেল। একদিন গগ্যাঁ এসে উপস্থিত। দীর্ঘদিন পরে এই সাক্ষাৎ দুজনকেই আবেগে উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে তুলল।

দুই শিল্পী—দু'জনের শিল্পের ধারণাও ভিন্ন। একজনের যা পছন্দ, অন্যজনের তাতে অপছন্দ। ফলে কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও তর্ক বিতর্ক দুজনের মধ্যে লেগেই থাকে।

এখানে এক পতিতা পল্লীতে যাতায়াত ভিনসেন্টের। সেখানে র‍্যাচেল নামে মেয়েটিকে তাঁর খুব পছন্দ। মেয়েটি আবার ভিনসেন্টের কানদুটোতে হাত বুলোতে ভালবাসে। ভিনসেন্ট রহস্য করে তাকে বলেন, একদিন এ দুটো তোমাকে উপহার দেব।

অপার রহস্যঘেরা প্রকৃতিকে রঙতুলিতে সজীব করে ফুটিয়ে তুলতে ক্লান্তি নেই দুই শিল্পীর। আহার নিদ্রা ভুলে নেশাগ্রস্তের মতো ছবি এঁকে চলেন।

নিয়মিত অনিয়ম আর অত্যাচারে দুজনেই শরীরে মনে ক্রমশঃ কেমন বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠতে থাকেন। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না।

থিও যে টাকা পাঠায় তা দিয়ে হোটেলের খরচ সঙ্কুলান হয় না। হাতে বাড়তি পয়সা থাকে না। তাতে ভিনসেন্টের মেজাজ সব সময়েই উত্তপ্ত হয়ে থাকে। এদিকে বন্ধুকে চলে যাবার কথাও বলতে পারে না।

একদিন দুজনে যান র‍্যাচেলের কাছে। হাত শূন্য। র‍্যাচেল ভিনসেন্টকে কৌতুক করে বলে, পয়সা নেই তো কী, তোমার একটি কান কেটে দিলেই হবে।

বাড়ি ফিরে আসেন দুজনে। কিন্তু খানিক পরেই একা বেরিয়ে পড়লেন ভিনসেন্ট। গগ্যাঁকে লুকিয়ে দাড়ি কামাবার ক্ষুরটা এনেছেন সঙ্গে করে। র‍্যাচেলের ঘরে গিয়ে নিজের একটা কান কেটে দিয়ে রক্তাক্ত শরীরে ফিরে আসেন বাড়িতে।

ওই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে গগ্যাঁ আর সেখানে থাকলেন না। সোজা প্যারিসে গিয়ে থিওকে খবর দিলেন।

ভিনসেন্টকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। দু'সপ্তাহ পরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। দুর্বল শরীর নিয়েই বাড়িতে বসে ছবি আঁকেন।

এদিকে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, শিল্পীটা পাগল। নিজের কান কেটে ফেলেছে। ছেলেরা দল বেঁধে আসে তাঁকে দেখতে। ক্ষেপায়, টিটকিরি দেয়।

ঘরে বসে থেকেও রেহাই নেই। উত্যক্ত হতে হতে মাথার মধ্যে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে।

একদিন আর সহ্য করতে পারলেন না। হাতের কাছে যা পেলেন ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর প্রচণ্ড চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরল কয়েদখানায়। সেখান থেকে এক স্থানীয় ডাক্তার তাঁকে ভর্তি করে দেন সেন্ট মেরির উন্মাদাগারে।

কয়েকদিনেই সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন রং তুলি নিয়ে। কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

সংবাদ পেয়ে থিও ছুটে এলেন। ভিনসেন্টকে নিয়ে এলেন আর্ভাসে। থিওর বিশেষ পরিচিত ডাঃ গ্যাচেট নিলেন চিকিৎসার দায়িত্ব। পেশায় ডাক্তার হলেও গ্যাচেট একজন শিল্প বিশেষজ্ঞও বটে। ফ্রান্সের শিল্পী মহলে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

ভিনসেন্টের কয়েকটি ছবি আগেই দেখেছিলেন তিনি। তাঁর আর্লে বসে আঁকা 'হলদে সূর্যমুখী' ছবিটি দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এ ছবির তুল্য দ্বিতীয় একটি নেই।

ডাঃ গ্যাচেট নিজের বাড়ির কাছে একটা হোটেলে নিয়ে এলেন ভিনসেন্টকে। দুজনে ছবি নিয়ে এখানে আলাপ আলোচনা হয়। ছবি সম্বন্ধে ডাক্তারের জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হন ভিনসেন্ট।

একদিন ডাক্তারের একটা ছবি আঁকলেন ভিনসেন্ট। অনবদ্য সে ছবি। তাঁর আঁকা শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির অন্যতম এটি।

কিছুদিন পরেই আবার উন্মত্ততা দেখা দিল। ছবি আঁকতে আর ভাল লাগে না। ঘরে মন টিকছে না। ড্রয়ার খুলে একটা রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

কিছুদূর গিয়েই নিজের কপাল লক্ষ্য করে গুলি করলেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও কপাল ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। রক্তাক্ত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

স্থানীয় লোকজন ধরাধরি করে নিয়ে এল ডাঃ গ্যাচেটের বাড়িতে। খবর পেয়ে প্যারিস থেকে ছুটে এলেন থিও।

দিন ফুরিয়ে এসেছিল। ছোট ভাইয়ের হাত নিজের হাতে টেনে নিলেন ভিনসেন্ট। অস্ফুটে বললেন, জীবন বড় যন্ত্রণাময় থিও। আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

এই শেষ কথা বলে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন ভিনসেন্ট। সময়টা ১৮৯০ খ্রিঃ। এইভাবে শেষ হয়ে গেল উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর জীবন।

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ তাঁর জীবিতকালে একটির পর একটি ছবি এঁকে গেছেন। বিক্রী হয়নি একটিও। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেসব ছবিই বিক্রি হয়েছে লক্ষ টাকা দামে। ভ্যান গঘের জীবন নিয়ে এ যেন মহাকালের এক পরিহাস।

যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ

সঙ্গীতের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এই অমর শিল্পীর বেদনাদীর্ণ জীবনকাহিনী উপন্যাসের কল্পিত গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। তাঁর জন্ম হয়েছিল জার্মানির স্যাক্সনি অঞ্চলের আইসবাখ-এ ১৬৮৫ খ্রিঃ।

সেবাস্তিয়ানের বাবা যোহান অ্যারোনিয়াস ছিলেন আইসবাখ-এর টাউন কনসার্ট-এর যন্ত্রবাদক। তাঁর মায়ের নাম এলিজাবেথ লামারহার্ট। সেবাস্তিয়ান ছিলেন তাঁর পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান।

সঙ্গীতের পরিবেশেই জন্মেছিলেন সেবাস্তিয়ান। কিন্তু বাল্য বয়সেই তাঁর জীবন-বীণায় বেজে উঠেছিল বেসুরো তান। মাত্র দশ বছর বয়সেই অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে বাবা মা দুজনকেই হারান তিনি।

তাঁর ভরণপোষণ ও লালন পালনের দায়িত্ব পড়ে বড় ভাই ক্রিস্টোফারের ওপরে।

উত্তরাধিকার সূত্রেই পিতার সঙ্গীত প্রতিভা লাভ করেছিলেন সেবাস্তিয়ান। সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন চমৎকার কণ্ঠস্বর। তাই দাদা তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার দিকে অমনোযোগী হতে পারেননি।

প্রথম জীবনে সঙ্গীতে তালিম পেয়েছিলেন যোহান পাসলবোন নামে একজন সঙ্গীত শিল্পীর কাছে।

কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হবার আগেই মাত্র পনেরো বছর বয়সেই সংসারের প্রয়োজনে তাঁকে চাকরি নিতে হয়। চাকরিটাও পেয়েছিলেন কণ্ঠস্বরের খাতিরে।

১৭০৭ খ্রিঃ বাইশ বছর বয়সে সেবাস্তিয়ান বিয়ে করেন এক আত্মীয়-কন্যা মেরিয়া বারবারাকে। মাত্র তেরো বছর স্থায়ী হয়েছিল তাঁদের বিবাহিত জীবন। ১৭২৭ খ্রিঃ ৭ জুলাই বারবারা অকালে মারা যান।

নবীন সঙ্গীতশিল্পীর তখন বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ। স্ত্রী বিয়োগের পর মানসিক ভাবে খুবই একা হয়ে পড়েন তিনি। এই একাকীত্ব তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির কাজে অন্তরায় হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে পরের বছরেই ১৭২১ খ্রিঃ দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। স্ত্রীর নাম হল ম্যাগডালেনা।

পনেরো বছর বয়সেই চাকরি নিতে হয়েছিল সেবাস্তিয়ানকে। কিন্তু ১৭২৩ খ্রিঃ মধ্যে একাধিকবার তাঁকে চাকরি বদল করতে হয়েছিল। ১৭২৩ খ্রিঃ লিপজিগে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস সুরু করেন।

সঙ্গীতের সাধক হলেও সেবাস্তিয়ানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল সংযম ও নিষ্ঠায় পরিপুষ্ট। ধীরস্থির মানুষটির উচ্ছ্বাস ছিল কম। সুন্দর কথা বলতে পারতেন, চলাফেরার ভঙ্গিটিও ছিল মনোমুগ্ধকর।

সর্বোপরি সংসারের প্রতি ছিলেন দায়িত্বশীল। একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা হিসেবে কর্তব্য সম্পর্কে ছিলেন সদাসচেতন।

বস্তুতঃ যেমন সুরের ছন্দে সদা নিমগ্ন ছিল তাঁর হৃদয়মন তেমনি ছন্দোময় ছিল তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ। সংসার আর সঙ্গীত সাধনার মধ্যেই নিজেকে নিমগ্ন রাখতেন।

সংসারের অর্থের চাহিদা মেটাবার জন্যেই বারবার চাকরি বদল করতে হয়েছিল তাঁকে। অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। আর্থিক অনটনের পীড়ায় ভুগেছেন বারবার। তাই সঙ্গী হয়েছিল পাওনাদারদের অপমান।

সারাজীবন ধরেই রোজগার করেছেন, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কোনও দিনই হাতে পাননি সেবাস্তিয়ান। সেকারণে প্রতিপদে চলতে হত হিসাব করে। এজন্য অনেক সময়েই তাঁকে কৃপণ বলে মনে হয়েছে। আসলে মানুষটি ছিলেন দিলখোলা। স্বভাবে ব্যবহারে ছিলেন বিনয়ী ও অমায়িক।

মানুষের সঙ্গ পছন্দ করতেন বলে প্রিয় মানুষকে প্রায়ই বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন। এজন্য পরে অসুবিধাও ভোগ করতে হত খুব।

সঙ্গীতের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বিষয়ে ছিলেন খুবই সজাগ। সেই যুগে সঙ্গীত ও সঙ্গীত শিল্পীদের এতটা মর্যাদার চোখে দেখা হত না। সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে খুব কম লোকই গ্রহণ করত।

এই পরিবেশে অর্থোপার্জন ও সঙ্গীতের সম্মানরক্ষার জন্য তাঁকে অপরিসীম পরিশ্রম করতে হত। ক্ষেত্র বিশেষে রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজন হত। নিজের কর্তব্যনিষ্ঠার বলে সমসাময়িক কালের সকল বাধাই সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন তিনি। প্রত্যেকটি চাকুরিস্থলেই তিনি সুনামের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছেন।

লিপজিগে দীর্ঘ সাতাশ বছর বসবাস করেছেন সেবাস্তিয়ান। এই সময়ে কঠোর সাধনা ও সৃষ্টিশীল রচনার মাধ্যমে তিনি সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নিজেকে খ্যাতির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

জীবনকালের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অক্লান্তভাবে সঙ্গীত রচনার মধ্যে ব্যয় করেছেন সেবাস্তিয়ান। কিন্তু কখনো আত্মপ্রচারের দুর্বলতায় আক্রান্ত হননি। ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁর অন্তরে শক্তি জোগাত। কঠোর বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হয়েও কখনো বিচলিত হননি। দুঃখ যন্ত্রণা তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে কখনো ম্লান করতে পারেনি।

সমকালের আত্মসর্বস্ব অক্ষম ক্ষমতালোভীদের ঈর্ষা স্বার্থের আঘাতে বার বার ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন সেবাস্তিয়ান। অবহেলা অপমান তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে অবদমিত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

এটা সত্য যে সত্যকার সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী হয়েও তদনুরূপ অর্থ বা ক্ষমতা লাভ করতে পারেননি তিনি। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য সমসাময়িক সমাজ তাঁর প্রতিভাকে কখনো অস্বীকার করতে পারেনি।

অখ্যাত, অবজ্ঞাত দরিদ্র অবস্থার মধ্যেই একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল সেবাস্তিয়ানকে। কিন্তু মহাকাল তাঁর কীর্তিকে বিস্মৃত হতে পারেনি। যে সমাদর সম্মান শ্রদ্ধা জীবিত অবস্থায় লাভ করেননি তিনি, তাঁর মৃত্যুর তিনশ বছর পরে জগৎবাসীর কাছ থেকে তা লাভ করেছেন অনায়াসে।

মহাকালের এক বিচিত্র রসিকতা যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ-এর জীবন।

১৭৩৫ খ্রিঃ সেবাস্তিয়ান তাঁর পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন অরিজিন অব দ্য মিউজিক্যাল ফ্যামিলি। সেই খসড়া রচনা থেকে জানা যায় এক সঙ্গীত-সাধক পরিবারেই জন্মেছিলেন তিনি। সঙ্গীতের জগতে তাঁর পূর্বপুরুষরাও খ্যাতকীর্তি ছিলেন।

তবে একদিকে তাঁদের সকলের থেকে সেবাস্তিয়ান ছিলেন স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বংশে একমাত্র তিনিই সঙ্গীত রচনা করেন সর্বপ্রথম।

সেবাস্তিয়ানের পূর্বসূরীদের মধ্যে যোহান ক্রিস্টোফার, যোহান মাইকেল আর যোহান লাউইস খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যেও উইলহেলম ফ্রেডিম্যান, কার্ট ফিলিপ ইম্যানুয়াল ও যোহান ক্রিস্টিয়ানও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। যোহান ক্রিস্টিয়ান তো আখ্যাত হয়েছিলেন ইংলন্ডের বাখ অভিধায়।

অখ্যাত দরিদ্র বাখ এক সময় কয়ার মাস্টারের চাকরি পেয়েছিলেন লিপজিগের সেন্ট টমাস চার্চসংলগ্ন স্কুলে। এখানে চাকরি করাকালীন দীর্ঘদিন তিনি বাতি জ্বালিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত গান আর স্বরলিপি রচনা করেছেন। ফলে একটা সময়ে চোখের অসুখে আক্রান্ত হলেন তিনি। ডাক্তারেরা তাঁর চোখে অস্ত্রোপচারের নির্দেশ দিলেন।

সময়টা ছিল ১৯৪৮ খ্রিঃ।

বাখ-এর বয়স হয়েছে পঁয়ষট্টি। প্রথমা স্ত্রী গত হয়েছেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী অ্যানাই তখন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী।

স্কুলের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে ইতিমধ্যে। চার্চ অনুগ্রহ করে তাঁদের থাকার জন্য যে আশ্রয়টুকু দিয়েছিল তাঁদের তা ছেড়ে অন্যত্র যাবার সঙ্গতি নেই। তাই চার্চের দেওয়া জায়গাটুকুতেই সকলের মন জুগিয়ে থাকতে হচ্ছিল তাঁদের।

দিনের বেলায় চার্চের অর্গান বাজানো চলে না। কর্তৃপক্ষের নিষেধ। রাতের বেলা যে অর্গানে বসবেন তারও উপায় নেই। অন্যদের ঘুমের অসুবিধা হবে। কিন্তু সুরই যে বাখ-এর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সুর ছাড়া তিনি বাঁচেন কী করে?

এই পরিস্থিতিতে তীব্র মানসিক কষ্টে দিন কাটছিল তাঁর।

ইতিমধ্যে ডাক্তার তাঁর চোখে অস্ত্রোপচারের দিন নির্দিষ্ট করলেন।

আগের দিন বাখ খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। বার বার মিনতি জানাতে লাগলেন, তাঁকে একটু অর্গান বাজাতে সুযোগ দেবার জন্য।

চার্চ কর্তৃপক্ষকে বলবার উপায় নেই। একেই তো তাঁরা দয়া করে বাসস্থানটুকু দিয়েছেন। তার ওপর অর্গান বাজিয়ে অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালে দুরবস্থার অবধি থাকবে না। শেষ পর্যন্ত শেষ আশ্রয়স্থলটুকুও হয়তো হারাতে হবে।

অথচ বাখ এমন করুণভাবে বারবার কাকুতিমিনতি করতে লাগলেন যে অ্যানা দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

পরদিনই অপারেশন। অপারেশনের পরে অবস্থা কেমন দাঁড়াবে কে জানে? হয়তো কোনও দিনই আর চোখে দেখতে পাবেন না বাখ। বসতে পারবেন না অর্গানের সামনে।

অ্যানা ভাবতে থাকেন নানা কথা। একবার একটু অর্গান বাজাতে চেয়েছেন কেবল। স্বামীর এই সামান্য চাওয়াটুকু তাঁর জীবনের এমন সঙ্কটকালে পূরণ হবে না?

অনেক ভাবনা চিন্তার পর অ্যানা মনস্থির করে ফেললেন। রাত গভীর হলে তিনি হাত ধরে বাখকে নিয়ে এলেন চার্চের হলঘরে। বসিয়ে দিলেন অর্গানের সামনে। সুরের প্রিয় যন্ত্রটিকে জড়িয়ে ধরে আবেগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন শিল্পী। চোখের কোল গড়িয়ে জল নেমে এল।

এরপর সুর তুললেন অর্গানে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করলেন বাজানো। অ্যানাকে ডেকে বললেন, এবারে চলো আমি প্রস্তুত।

অর্গানের শব্দে চার্চের লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাঁরা ছুটে এসে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন।

একজন কয়ার মাস্টারের অর্গান বাজানোর অধিকার নেই। সেই নিয়ম ভঙ্গ করে এর আগেও অনেকবার অপমানিত হয়েছেন বাখ। কিন্তু আজকের অপরাধ গুরুতর। অ্যানা রাতের অন্ধকারে বাখকে লুকিয়ে গির্জায় নিয়ে এসেছেন। সে রাতে চূড়ান্ত অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে হল উভয়কে।

স্বামীর শেষ ইচ্ছা একটু ক্ষণের জন্য হলেও পূরণ করতে পেরেছেন, এই পরিতৃপ্তিতে ভরেছিল অ্যানার মন। তাই বারবার চার্চের কিউরেটর উইনলিকের তাড়িয়ে দেবার হুমকি শুনেও মুখ বুজে থাকতে পেরেছেন।

পরদিন বাখ-এর চোখের অপারেশন হল। কিন্তু ফল হল বেদনাদায়ক। অপারেশনের পর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল পক্ষাঘাত। সেই অবস্থাতেই দু'বছর শয্যাশায়ী থাকলেন বাখ। তারপর ১৭৫০ খ্রিঃ ২৮ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অ্যানা একা হয়ে গেলেন। চার্চের ঘর ছেড়ে দিতে হল তাঁকে। সামান্য যা জিনিসপত্র ছিল বিক্রি করে দিলেন। কেবল রেখে দিলেন বাখ-এর গান আর স্বরলিপির পাণ্ডুলিপিগুলো। প্রাণে ধরে সেগুলো নষ্ট করতে পারলেন না।

বাখ-এর দশজন ছেলেমেয়ে তখনো বেঁচেছিলেন। তাঁদের অনেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কারো কাছেই স্থান হল না অ্যানার। জঞ্জাল ভেবে পাণ্ডুলিপিগুলোও কেউ রাখতে রাজি হলেন না।

শেষ পর্যন্ত ফুটপাতেই আশ্রয় নিলেন দুর্ভাগিনী অ্যানা। বাখ-এর পরিচিত এক মাংসের দোকানের সামনে ঠাঁই হয়েছিল তাঁর। মাংসের দোকানী কোয়েলারের দয়াতেই কোনও রকমে ভিক্ষেসিক্ষে করে আরও দশ বছর বেঁচেছিলেন অ্যানা।

১৭৬০ খ্রিঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে তিনি বাখ-এর পাণ্ডুলিপির গোছা মাংসের দোকানীর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলো কোয়েলার রেখে দিয়েছিল তার সেলারে।

বাখ-এর দুঃখময় জীবনের সঙ্গীত সাধনার ইতিহাস এরপর একশো বছর চাপা পড়েছিল সময়ের যবনিকার আড়ালে। সেই যবনিকা উন্মোচিত হয়েছিল লিপজিগের জিওয়ানড্ হাউস অর্কেস্ট্রার কনডাকটর ফেলিক্স মেনডেলেসনের হাতে।

লিপজিগ অর্কেস্ট্রার বোর্ড অব ট্রাস্টির আহ্বানে নিয়োগপত্র নিয়ে এই শহরে এসেছিলেন ফেলিক্স।

একদিন তিনি কোয়েলারের মাংসের দোকানে গিয়েছেন মাংস কিনতে। ততদিনে কোয়েলার গত হয়েছে। দোকান চালায় তারই এক বংশধর মার্টিন কোয়েলার।

নামী দোকান। তাই ভিড়ও খুব। মাংস মোড়ানোর কাগজ ফুরিয়ে গিয়েছিল। কোয়েলারের বউ ছুটে গিয়ে বাড়ির ভেতরে কাগজের স্তূপ থেকে কিছু কাগজ তুলে আনল। সেই কাগজে জড়িয়েই খদ্দেরদের মাংস দেওয়া হতে লাগল।

ফেলিক্স পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সমস্ত কিছু। হঠাৎ হলদে হয়ে যাওয়া এক টুকরো কাগজের ওপরে চোখ পড়তেই ভীষণ ভাবে চমকে উঠলেন তিনি। দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে এই কয়টি কথা—"দি প্যাশন অব আওয়ার লর্ড, অ্যাকর্ডিং টু সেন্ট ম্যাথু—বাই যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ। সময়টা ছিল ১৮৬০ খ্রিঃ।

এমনি আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়েই বাখ রচিত সঙ্গীতের শেষ খণ্ডটি কালের যবনিকা ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বাখ-এর সঙ্গীত নিয়ে এর পরের ইতিহাস ফেলিক্স-এর জীবনকে কেন্দ্র করে। বাখ-এর প্যাশন সঙ্গীতকে রূপান্তরিত করতে তাঁকে যে সংগ্রাম ও সাধনা করতে হয়েছিল, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

ফেলিক্স ছিলেন ইহুদী। তাই খ্রিস্টানদের গান গাইবার বিরুদ্ধে তাঁকে সমাজের কম বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। বাখ-এর প্যাসন রূপায়িত করতে কোনও সঙ্গীতশিল্পীর সহযোগিতা পাননি তিনি। সেই গানের প্রথম অনুষ্ঠান তিনি করেছিলেন চারশো জন অখ্যাত চাষী অনুচরদের নিয়ে।

তারপর থেকে বাখ জয় করে নিয়েছিলেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। মুগ্ধ বিস্ময়ে মানুষ শুনেছে সেই ধ্রুপদী সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা।

সমকালের মানুষের অবহেলা অবজ্ঞা পেলেও পরবর্তীকালের মানুষ বাখকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ভোলেনি। তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে।

লুডউইগ ভন বিটোভেন

বিশ্বের সঙ্গীত শিল্পের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা জার্মানীর লুডউইগ ভন বিটোভেনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর কালজয়ী অসাধারণ সুরমূর্চ্ছনা একদিকে যেমন মানুষকে বিতরণ করে অনাবিল আনন্দ লহরী তেমনি দুঃখ, বেদনা হতাশার ক্ষণে জোগায় সান্ত্বনা ও প্রেরণা।

বিশ্ববন্দিত এই সঙ্গীত সাধকের জীবন ছিল বড়ই বেদনাময়। বিধাতার নির্মম পরিহাসে সুর আর শব্দের ছন্দময় সৌন্দর্যের সাধনায় যিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সেই তাঁর জীবন থেকে মুছে গিয়েছিল সমস্ত শব্দ। বধিরত্ব তাঁকে নিমজ্জিত করেছিল চির নৈঃশব্দের জগতে। তবুও হার মানেননি এই মহান শিল্পী। নৈঃশব্দের দুস্তর বেদনায় নিমজ্জিত থেকেও তিনি রচনা করেছেন নতুন নতুন সুর।

বিটোভেনের জন্ম জার্মানির বন নগরীর রাইনল্যান্ড নামক স্থানে ১৭৭০ খ্রিঃ ১৬ই ডিসেম্বর।

তাঁর বাবা ও ঠাকুরদা উভয়েই ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। বাবা জোহন বিটোভেন কোলনের পুরপ্রধানের সভায় বেহালা বাজাতেন। বিটোভেনের সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর বাবার কাছেই।

ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা লাভ করেছিলেন বিটোভেন। তাই সুর আর সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হতেন বাল্য বয়সেই। তাই দেখে মাত্র চার বছর বয়সেই বাবা তাঁকে বসিয়ে দিয়েছিলেন পিয়ানোর সামনে।

বাবার নির্দেশে একটা ছোট্ট কুঠুরিতেই বেহালা আর পিয়ানোর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা রেওয়াজে বন্দি থাকতে হত তাঁকে।

সমবয়সী বন্ধুরা যখন খেয়াল-খেলায় সঙ্গীদের নিয়ে হৈ হুল্লোড় করত ছোট্ট বিটোভেনকে তখন ক্লান্তিহীন ভাবে তাঁর বাদ্যযন্ত্রে বাজাতে হত একঘেয়ে গৎ।

কখনও মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে বাবা তাঁকে বসিয়ে দিতেন রেওয়াজে। ঢুলু ঢুলু চোখে পিয়ানো বাজাতে গিয়ে কিংবা বেহালার ছড় টানতে টানতে ভুল হয়ে যেত। বাবার চড় খেয়ে আবার সম্বিৎ ফিরে পেতেন।

জোহন শিশুপুত্রকে দিন রাতের বেশির ভাগ সময়টাই ব্যস্ত রাখতেন রেওয়াজে। ঘন্টার পর ঘন্টা একঘেয়ে সুরে সর গম বাজিয়েও বিরক্ত হবার উপায় ছিল না। এভাবেই বাবার কঠোর শাসন ও শিক্ষার মধ্যে থেকে শিশু শিল্পীর প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে।

জোহন ছিলেন প্রচন্ড মদ্যপ। চূড়ান্ত বেহিসেবী ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। ফলে সংসারে অভাব অনটন ছিল নিত্যসঙ্গী। সংসারের আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যেই

সম্ভবতঃ তিনি চেয়েছিলেন পুত্রকে শিশু সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলবেন। যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন, সহজাত প্রতিভাবলে অল্প দিনের মধ্যেই শিশু বিটোভেন বাবার সমস্ত শিক্ষা রপ্ত করে নিলেন।

পুত্রের পড়ালেখার বিষয়ে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না জোহন। কিন্তু জীবনে কাজ চলার মতো সামান্য বিদ্যা পেটে না থাকলে যে চলে না সেই বাস্তবজ্ঞানের অভাব ছিল না তাঁর।

তাই একটা সাধারণ স্কুলে তিনি ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন শিশু বিটোভেনকে। সেখানেই তেরো বছর বয়স পর্যন্ত যা কিছু বিদ্যাচর্চা হয়েছিল তাঁর।

বিটোভেনের বয়স যখন নয়, সেই সময় তাঁর বাবা তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার ভার দিলেন রাজসভার অর্গানবাদক ক্রিশ্চিয়ান গোৎলব নেফির ওপর।

নেফি ছিলেন মনেপ্রাণে সঙ্গীতসাধক। তাই অল্পদিনেই তিনি সঠিক ভাবে বিটোভেনের সঙ্গীত প্রতিভাকে উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার ফলেই একটি সুশৃঙ্খল ধারায় বিটোভেনের প্রতিভা বিকাশের পথ পেল। ক্রমে তিনি একে একে পরিচিত হলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের রচনার সঙ্গে। নিজেও উদ্বুদ্ধ হলেন সুর সৃষ্টির প্রেরণায়।

মাত্র এগারো বছর বয়সে বিটোভেন তাঁর শিক্ষাগুরু নেফির উৎসাহে রচনা করলেন পিয়ানোর সোনাটো। শিশু শিল্পীর এই অসাধারণ সৃষ্টি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মহামান্য পুরপ্রধানকে।

১৭৮২ খ্রিঃ মাত্র বারো বছর বয়সেই বিটোভেন পুরপ্রধানের দববারে সহকারী অর্গানবাদক রূপে যোগদান করেন।

সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার বিষয়ে বিটোভেন ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। বাল্য বয়সের সঙ্গীত রচনার সময়েও এবিষয়ে তাঁর সচেতনতার অভাব ছিল না। তাই যখনই যে সুর রচনা করেছেন, তার জন্য তাঁকে করতে হয়েছে কঠোর পরিশ্রম।

যতক্ষণ পর্যন্ত না সৃষ্ট সুরের মূর্চ্ছনা তাঁকে সন্তুষ্ট করত, ততক্ষণ পর্যন্ত একের পর এক সুর বাতিল করতেন নির্দ্বিধায়।

সময়ের দিকে খেয়াল থাকত না। চূড়ান্ত সুরের সন্ধানে মগ্ন হয়ে থাকতেন পিয়ানোর টেবিলে। পছন্দমতো তাল মাত্রা সুর মিলিয়ে একটি পাণ্ডুলিপির পূর্ণতা আনার জন্য, বিশুদ্ধ ভাবে সঙ্গীতকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মাসের পর মাসও ব্যয় করেছেন বিটোভেন। এমনি সুকঠিন অধ্যবসায় বলেই তিনি অর্জন করেছেন সাফল্যের সার্থকতা।

সঙ্গীতকার ও পিয়ানোবাদক হিসেবে অল্প দিনেই বিটোভেনের নাম ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। স্বীকৃতিও এলো অচিরে।

১৭৮৪ খ্রিঃ নতুন পুরপ্রধান হলেন ম্যাক্স ফ্রাঞ্জ। তরুণ সঙ্গীতশিল্পীকে তিনি নিযুক্ত করলেন দরবারের দ্বিতীয় অর্গান বাদক। মাসিক বেতন ১৫০ ফ্লোরিন। এতদিনে জীবনে প্রথম বেতনভুক পদ পেলেন বিটোভেন।

তিন বছর যোগ্যতা ও সম্মানের সঙ্গে এই পদে কাজ করার পর। ১৭৮৪ খ্রিঃ পুরপ্রধান তাঁকে পাঠালেন ভিয়েনায়, মোৎজার্টের কাছে সঙ্গীতের নতুন পাঠ নেবার জন্য।

প্রথম সাক্ষাতের পর বিটোভেন স্বরচিত তিনটি সঙ্গীত বাজিয়ে শোনালেন মোৎজার্টকে।

তরুণ শিল্পীর সঙ্গীত শুনে কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না মোৎজার্ট। নিস্পৃহ নির্বিকার মুখে উঠে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

কিন্তু ভবিষ্যতের বিশ্ববরেণ্য সঙ্গীতপ্রতিভাকে চিনতে ভুল হয়নি মোৎজার্টের। পরে তিনি এক বন্ধুকে বললেন, এই ছেলেটির ওপর তোমরা নজর রাখতে ভুল করো না। ভবিষ্যতে এর সৃষ্টি একদিন পৃথিবীতে আলোড়ন তুলবে।

মোৎজার্টের ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি দেখে হতাশ হলেও বিটোভেন তাঁর কাছেই তালিম নিতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু তাঁর ভাগ্য ছিল বিরূপ। বেশি দিন ভিয়েনায় থাকা সম্ভব হল না। মাস দুয়েকের মাথাতেই বাবার চিঠিতে জানতে পারলেন মা অসুস্থ।

মোৎজার্টের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন বিটোভেন। ফিরে আসার মাসখানেকের মধ্যেই মাকে হারালেন।

মদ্যপ যথেচ্ছাচারী বাবাকে কোন দিনই পছন্দ করতেন না বিটোভেন। সংসারে মাই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। মাকে হারিয়ে তাই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। সংসারেও দেখা দিল বিশৃঙ্খলা।

বাবা দিনরাত মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকেন : নিয়মিত রাজসভায়ও যেতে পারেন না। ফলে মাইনেও বন্ধ হল।

দুটি অসহায় ভাই কার্ল আর জন। তাদের নিয়ে চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়তে হল বিটোভেনকে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় নেমে পড়লেন।

মাত্র সতেরো বছরের কিশোর বিটোভেন এই সময় একদিকে যেমন রচনা করেছেন পর পর পিয়ানো কনসার্টো, ভায়োলিন কনসার্টো তেমনি নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন সঙ্গিতানুষ্ঠানে। থিয়েটারে, চ্যাপেলে বাজিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেছেন।

পুরঅধিকর্তার দরবারে বছর তিনেক কাজ করেছিলেন বিটোভেন। তার মধ্যেই একবার তাঁর পরিচয় হয় বিখ্যাত সঙ্গীতকার হেডেনের সঙ্গে।

বনের রাজসভায় এসেছিলেন হেডেন। এই সময় বিটোভেনের কয়েকটি স্বরচিত সুর শুনে মুগ্ধ হন শিল্পী। নবীন শিল্পীকে কেবল প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে শেখালেন কয়েকটি সুর।

পুরপ্রধান হেডেনকে অনুরোধ জানান বিটোভেনকে কিছুদিন তাঁর তত্ত্বাবধানে রেখে তালিম দেওয়ার জন্য।

হেডেন সানন্দে সম্মতি জানালেন। কিন্তু সংসারের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব তখন বিটোভেনের ওপরে। মদ্যাসক্ত বাবা, ছোট দুটি ভাই, সকলেই তাঁর রোজগারের ওপরে নির্ভরশীল। এই অবস্থায় বিদেশে যেতে হলে পুরপ্রধানের দরবারে চাকরিটা ছাড়তে হয়।

এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে বিটোভেনকে রক্ষা করলেন পুরপ্রধানের এক সদাশয় বন্ধু ওয়েল্ডস্টেইন। বিটোভেনের প্রতিভায় আস্থাশীল ছিলেন ওয়েল্ডস্টেইন। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় পুরপ্রধান তাঁর জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন যাতে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি হেডেনের কাছে গিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করতে পারেন।

মোৎজার্ট, হেডেন প্রমুখ প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের উপস্থিতির সুবাদে সেই কালে ভিয়েনা হয়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তীর্থক্ষেত্র। দেশ বিদেশের শিল্পীদের প্রতিনিয়ত আনাগোনা সেখানে।

বিটোভেন যখন ভিয়েনায় উপস্থিত হন, তার কিছুকাল আগেই মোৎজার্ট গত হয়েছেন। উপস্থিত হেডেনই ভিয়েনার সঙ্গীত আসরের মধ্যমণি।

হেডেন সাদরে গ্রহণ করলেন বিটোভেনকে। সযত্নে চলতে লাগল তাঁর শিক্ষাদান পর্ব।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হতাশায় বিমর্ষ হয়ে পড়তে লাগলেন বিটোভেন। হেডেনের সবই কেমন সেই পুরনো গতে বাঁধা—নতুন সুরের ছোঁয়া কোথাও নেই। কিন্তু তিনি যে নতুন পথের পথিক। গতানুগতিকতার বন্ধন ছিন্ন করে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় ব্যাকুল তাঁর হৃদয়।

হেডেন বিটোভেনকে শেখান এক ধারা, বিটোভেন তাঁকে পাশ কাটিয়ে তৈরি করেন অন্য ধারা। চিরাচরিত নিয়মের তোয়াক্কাই করেন না।

ফল যা হবার তাই হল। গুরু শিষ্যের মধ্যে দেখা দিল মতবিরোধ। অভিযোগ শুনে বিটোভেন স্পষ্ট জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না, পুরনো পথ আঁকড়ে থাকতে তাঁর ভাল লাগে না। নিত্য নতুন সুরের সন্ধান করেই তিনি আনন্দ পান।

নবীন আর পুরাতনের মতবিরোধ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পরিণতি পেল বিচ্ছেদে।

তাঁর ভিয়েনায় অবস্থানকালেই বিটোভেনের বাবা মারা যান। ভাইদের তিনি নিয়ে এলেন নিজের কাছে।

পুরপ্রধানের নির্দিষ্ট ভাতায় তিনজনের খরচ সংকুলান হওয়ার নয়। তাই অর্থের প্রয়োজনে এই সময় ছোট ছোট অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগলেন। কয়েকটি অভিজাত বাড়িতেও সঙ্গীত শিক্ষকের দায়িত্ব নিলেন।

ভিয়েনায় এসেছিলেন সঙ্গীতে নতুন পাঠ নেবার জন্য। নিত্যদিনের টানাপোড়েনের মধ্যে সেকথাও কিন্তু ভুললেন না।

বিখ্যাত ইতালীয় সঙ্গীতকার স্যালিভির কাছে নিয়মিত পাঠ নিয়েছেন তিনি। স্যালিভি ছিলেন মোৎজার্টের প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেকেই মনে করতো, তাঁর বিষ-প্রয়োগের ফলেই মোৎজার্টের মৃত্যু হয়েছিল।

ত্রিশের কোঠায় পা দেবার পর থেকেই বিটোভেনের স্বভাবে দেখা দিল এক অদ্ভুত পরিবর্তন। কেমন যেন উদাসী অন্যমনস্ক হয়ে উঠল তাঁর চলাফেরা। অবিন্যস্ত চুল, এলোমেলো পোশাকে ঘোরাফেরা করেন।

কখনো আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে এমন ব্যবহার করেন যেন কাউকে পরোয়া করেন না।

শহরের অভিজাত গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই ছিল তাঁর বন্ধু। তাদের বাড়িতে ভোজসভায় প্রায়ই তাঁর আমন্ত্রণ হত। সেখানে গিয়েও এমন সব ব্যবহার ও মন্তব্য করে বসতেন যা সকলকে বিব্রত করে তুলত।

কিন্তু তিনি যখন পিয়ানোর সামনে বসে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করতেন, নিমিষে তাঁর সব রুক্ষতা ধুয়েমুছে যেত।

তবুও অস্বাভাবিক দম্ভ আর বিসদৃশ আচরণের জন্য দিন দিনই জনপ্রিয়তা কমতে থাকে বিটোভেনের। বন্ধুরা প্রতিভাধর শিল্পীকে বুঝতে পারতেন। বেদনাহত হলেও তাঁকে কখনো সাহায্যদানে বঞ্চিত করেননি।

সুরের সাধনায় বিরাম ছিল না বিটোভেনের। কখনো বেহালা, কখনো পিয়ানো—এই ছিল তাঁর রাতের সঙ্গী। নিত্য নতুন সুরের সন্ধানে তন্ময় হয়ে থাকতেন শিল্পী। এভাবে অতিবাহিত হয়েছে কত রাত।

অভিজাত পরিবারগুলির সঙ্গে মেলামেশার ফলে বহু মহিলার সঙ্গেই তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বংশ মর্যাদায় তাদের কারোরই সমকক্ষ ছিলেন না তিনি। তাই কখনোই কোন সম্পর্ক গভীর হতে দিতেন না।

এই সময় আকস্মিক ভাবেই একদিন বিটোভেন লক্ষ্য করলেন, দূরের শব্দ যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। ক্রমে বুঝতে পারেন স্বরের পর্দার প্রভেদও সঠিক ধরতে পারছেন না। প্রথম কিছুদিন ততটা গুরুত্ব দেননি। বধিরতার আশঙ্কা মনে স্থান দিতেন না।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকলে, ডাক্তারের কাছে যেতেই হল। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে হতাশায় মাথা নাড়েন। জানান, অনিবার্য বধিরতা আসছে। এ রোগ তাঁর বংশানুক্রমিক, কিছু করার নেই।

চরম হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন বিটোভেন। বিধ্বস্ত মন নিয়ে পিয়ানোর সামনে বসে শব্দহীন সুরশূন্য এক যন্ত্রণাময় জগতে ডুবে যেতে থাকেন।

এবারে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন বিটোভেন। স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি হলেন। বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করতেন না।

নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দতার জগতে মাস কয়েক বন্দি রইলেন। এই সময়ের মধ্যে আশ্চর্যভাবে বদলে গেলেন সেই দাম্ভিক, উদ্ধত স্বভাবের রুক্ষ মানুষটি। বধিরতার দুর্গে বন্দি অবস্থায় যেন ব্যক্তি মানুষটিকে নতুন করে উপলব্ধি করলেন বিটোভেন। নিজের রুক্ষ ব্যবহারের জন্য, ব্যথিত, অনুতপ্ত হয়েছেন।

তাঁর এই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে ১৮০২ খ্রিঃ লেখা তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠিতে, সেটি তাঁর উইল নামেই পরিচিত।

হৃদয় নিংড়ানো-বেদনাসিক্ত ভাষায় তিনি লিখেছেন, ভাইদের জন্য তাঁর স্নেহ ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। মানুষের প্রতিও কোনও অভিযোগ ছিল না তাঁর। কেবল নিজের দৈহিক প্রতিবন্ধকতার অসনীয় বেদনায় ক্ষিপ্ত হয়ে অকারণে রুক্ষ ব্যবহার করে ফেলেছেন।

ভাইদের তিনি বার বার অনুরোধ করেছেন তারা যেন তাঁর দৈহিক প্রতিবন্ধকতার কথা মনে করে, তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁকে ক্ষমা করে।

নৈঃশব্দের দুর্গে বসে নিজের ভয়ঙ্কর এক পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে বিষাদের মধ্যেই যেন ক্রমশঃ সম্ভাবনার আলো দেখতে পেলেন। উপলব্ধি করলেন, সৃষ্টির মধ্যেই তাঁকে আনন্দের সন্ধান করতে হবে। যে আনন্দ তাঁকে পৌঁছে দেবে অমরতার পথে।

নৈরাশ্যের গ্লানি মুছে ফেলে আবার বিটোভেন তাঁর সুর সৃষ্টির কাজে মন দিলেন। কথায়, সুরে, ব্যঞ্জনায় রচনা করতে বসলেন অমর সঙ্গীত।

এই সময়েই এক ঝলক আলোর মতো আবির্ভূত হয়ে বিটোভেনের বিষাদময় জীবন আশায় আনন্দে উদ্বেল করে তুলল ১৬ বছরের এক কিশোরী গিউলিয়েত্তা গুইসিয়ারদি।

তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য এসেছিল চঞ্চল ছোট্ট এই কিশোরী। তাঁর আয়ত চোখে শিশুর সরলতা মাখানো, মাথাভরা কালো চুল।

এতদিনে এই শিষ্যার কাছে ধরা দিলেন বিটোভেন। মুনলাইট সোনেটা উৎসর্গ করলেন তাঁকে।

অল্পদিনেই গুইসিয়ারদি তাঁর সমস্ত অন্তর দখল করে নিল। সমস্ত হৃদয়

দিয়ে বিটোভেন কামনা করতে লাগলেন তাঁর প্রিয়তমার ভালবাসা, তার নিরন্তর সাহচর্য।

বিটোভেন গুইসিয়ারদিকে জীবনসঙ্গিনী রূপেই পেতে চেয়েছিলেন। একথা জানা যায় গুইসিয়ারদিকে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে। বিটোভেনের মৃত্যুর পর তাঁর লেখার টেবিলের একটা গোপন ড্রয়ার থেকে উদ্ধার করা হয় এই পত্রটি।

গুইসিয়রদি কিন্তু পীড়িত দরিদ্র শিল্পীর প্রেমে সাড়া দেননি। প্রত্যাখ্যাত বিটোভেন মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তাকে অন্তর্মুখী করার জন্য বুঝি এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে সঁপে দেবার দুর্দমনীয় প্রেরণা উপলব্ধি করলেন।

কিন্তু বধির অবস্থার কথাও ভুলে থাকতে পারেন না। দিন দিনই পীড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সময় ডাক্তার নগর কোলাহলের বাইরে কোন শান্ত নির্জন গ্রামে গিয়ে বাস করার পরামর্শ দিলেন। বিটোভেন ভিয়েনা ত্যাগ করলেন। চলে এলেন হেলিজেনস্টেট (Heligenstadt) গ্রামে।

কিন্তু দীর্ঘ চার বছরেও অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। এই অবস্থায় বারবারই মৃত্যু চিন্তায় বিধ্বস্ত হতে থাকেন। সেই তাড়নাতেই ১৮০২ খ্রিঃ তাঁর সমস্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে একটি উইল করেন।

সেখানে তিনি প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, জীবনের সকল প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে মানুষের কল্যাণকর শিল্পসৃষ্টির জন্যই তিনি বেঁচে থাকবেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে অন্তরের সমস্ত অনুভূতিকে সঙ্গীতের মধ্যে রূপ দিয়ে যাবেন।

এর পর ছোট্ট একটা নোটবুক আর পিয়ানোই হল তাঁর প্রায় সারাক্ষণের সঙ্গী। আত্মমগ্ন শিল্পী একের পর এক সিম্ফনি সৃষ্টি করে চললেন। পিয়ানো কনসার্টো, পিয়ানো ফোর্ট সোনাটা, ভায়লিন সোনাটা, দি স্ট্রিং কোয়ার্টেট — তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই সৌন্দর্য আর গভীরতায় অনন্য। যা মানুষকে আজও উদবোধিত, উদবেলিত করে।

ভিয়েনার থিয়েটার মালিক আর তাঁর রচনার প্রকাশকদের মাধ্যমে বিটোভেনের সঙ্গীত ক্রমশই ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লিপজিগ, লন্ডন, প্যারিস শহরে শিল্পীরা তাঁর সঙ্গীত নিয়ে অনুষ্ঠান করতে লাগল।

সঙ্গীত রসিক মহলে হেডেন, মোৎজার্টের পরেই বিটোভেনের নাম উচ্চারিত হতে লাগল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভিয়েনার বল নাচ, অপেরা আর হাল্কা সঙ্গীতের চটুল পরিবেশে বিটোভেনের সঙ্গীতের গভীরতা ও সৌন্দর্য কেউ উপলব্ধি করতে পারল না।

বিরক্ত হয়ে বিটোভেন ভিয়েনা পরিত্যাগ করে অস্ট্রিয়া যাবার সংকল্প নিলেন।

এদিকে অনটনও বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি ইউরোপের নানা শহর থেকে প্রকাশকরা তাঁর রচনা প্রকাশ করার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েকজন গুণমুগ্ধ বন্ধুর সহৃদয়তায় তাঁর আর অস্ট্রিয়া যাওয়া হল না। ধনী বন্ধুরা প্রস্তাব দিলেন, তিনি ভিয়েনা পরিত্যাগ না করলে তাঁকে বছরে ৪০০০ ফ্লোরিন দেওয়া হবে।

এরপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিটোভেন ভিয়েনাতেই অবস্থান করেছেন। যত দিন বেঁচেছিলেন ক্লান্তিহীন ভাবে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন সঙ্গীত রচনার কাজে।

প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য, সুখ, আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, অন্তর্মুখী জীবনে যখন যে আবেগ অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে, তাকেই সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সুরে সুরে।

একদিন এক বন্ধুর বাড়িতে সঙ্গীতানুষ্ঠানে আকস্মিক ভাবে বিটোভেনের সঙ্গে পরিচয় হল বেটিনা নামে অপূর্ব রূপ লাবন্যবতী এক তরুণীর। শিল্পীর গুণমুগ্ধ ভক্ত সে। তাই এসেছে চোখের দেখা দেখতে।

প্রথম পরিচয়েই মুগ্ধ হলেন বিটোভেন। জানতে পারলেন বেটি কবি গ্যেটের প্রণয়ী। কেবল তাই নয় জার্মানীর প্রতিভাবান বিখ্যাত মানুষরা সকলেই তাঁর পরিচিত।

উদ্বেল উল্লসিত বেটিনা গভীর আবেগে নিজের হাতের আংটি খুলে পরিয়ে দিলেন বিটোভেনের হাতে।

নিজের সবচেয়ে প্রিয় কবির প্রণয়ী হলেও অল্পদিনের মধ্যেই বেটিনার প্রেমে আবদ্ধ হলেন বিটোভেন। বেটিনাকে সামনে বসিয়ে তিনি সুর রচনা করেন। বেটিনা তাঁকে আবৃত্তি করে শোনান গ্যেটের কবিতা, কখনো উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে যান নিজের কথা।

একদিন বেটিনার মাধ্যমে গ্যেটের সঙ্গে পরিচিত হলেন বিটোভেন। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ কবি উষ্ণ অভিনন্দনে অভিষিক্ত করলেন জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীকে। উভয়েই ছিলেন উভয়ের গুণমুগ্ধ।

বিটোভেন ছিলেন উচ্ছ্বাসময় উদ্দাম। কিন্তু গ্যেটে ছিলেন উচ্ছ্বাসহীন নিরুত্তাপ। বিটোভেনের সঙ্গীতপ্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করেও গ্যেটে ছিলেন

নিরুচ্চার। তাঁর আচরণের এই শীতলতা মেনে নিতে পারেননি বিটোভেন। তাই তাঁদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায়নি।

১৮১৫ খ্রিঃ অকস্মাৎ এক পারিবারিক সংকট উপস্থিত হল বিটোভেনের জীবনে। তাঁর ভাই কার্ল মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে নয় বছরের শিশু পুত্রকে দিয়ে গেলেন বিটোভেনের দায়িত্বে।

শিশুর অভিভাবকত্বের দাবি নিয়ে কার্লের স্ত্রীর সঙ্গে কিছুদিন পরেই বিরোধ দেখা দিল। তা গড়াল আদালত পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত শিশুর ভরণপোষণ ও প্রয়োজনীয় সব ব্যাপারই বর্তালো বিটোভেনের ওপরে।

নিজের ছন্নছাড়া পীড়িত জীবন নিয়ে ছিলেন বিধ্বস্ত। শিশুর দায় দায়িত্ব তাঁকে আরো বিব্রত অসহায় করে তুলল। শেষে বালকটিকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

কার্লের প্রতি বিটোভেনের ছিল গভীর ভালবাসা। তাই তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন ভাইপোটি মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠুক। তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি কখনো।

কিন্তু তাঁর স্নেহের সুযোগ নিয়ে ভাইপোটি হয়ে উঠেছিল জেদি, উদ্ধত আর অভদ্র। সুযোগ পেলেই জ্যেঠার ড্রয়ার থেকে সে টাকা চুরি করত।

ভাইপোর অধঃপতন দেখে দুঃখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন বিটোভেন। কিন্তু সংসারে দুঃখ ছাড়া আর কীই বা পেয়েছেন তিনি। জীবন ও জগতের প্রতি বিতশ্রদ্ধ বিটোভেন এরপর নিজেকে গুটিয়ে ফেললেন। নীরবে আশ্রয় নিলেন সুরে অঙ্গনে। রচনা করলেন তাঁর জগৎবিখ্যাত মহত্তম নাইনথ সিম্ফনি। যার পরতে পরতে অনুরণিত হয়েছে যন্ত্রণাদীর্ণ হৃদয়ের আকুতি।

শেষদিকে পিয়ানো ছেড়ে বড় একটা উঠতেন না বিটোভেন। ক্বচিৎ বাইরে যেতেন। অবিন্যস্ত এলোমেলো বেশবাস, সর্বদাই বিষণ্ণ বিমনা। ক্রমে সৃষ্টির ক্ষমতাও কমে এলো। বুঝতে পারলেন, শেষের দিন ঘনিয়ে আসছে।

অবশেষে এগিয়ে এল ১৮৭২ খ্রিঃ ২৬শে মার্চ দিনটি। সকালের দিকেই বাইরের আকাশে সুরু হল দুর্যোগ। তুমুল ঝড়ের সঙ্গে নেমে এলো অঝোরে বৃষ্টি।

জানালার বাইরে প্রকৃতির তান্ডব দেখতে দেখতে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন বিটোভেন। তারপর একসময় অর্ধঅচেতন অবস্থাতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি স্বদেশানুরাগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অবদান ছিল অপরিসীম। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে এই পরিবারের প্রতিভাধর পুরুষদের পথিকৃতের ভূমিকা ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র, রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, নাটক, জাতীয় ভাবোদ্দীপক সামাজিক উদ্যোগ, ব্যবসায় সংগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেন।

১৮৪৯ খ্রিঃ ৪মে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য দেবেন্দ্রনাথ বাড়িতেই পাঠশালার বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেখানেই গুরুমশায়ের কাছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ইংরাজি শিক্ষার হাতেখড়িও বাড়িতেই অন্য শিক্ষকের কাছে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ভর্তি করে দেওয়া হয় সেন্ট পলস স্কুলে। সেখান থেকে পরে তিনি মন্টেগু অ্যাকাডেমি ও হিন্দুস্কুলে পড়াশুনা করেন।

সব শেষে ১৮৬৪ খ্রিঃ ক্যালকাটা কলেজ থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

ঠাকুর বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী ছেলেদের লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত শরীর চর্চা ইত্যাদিও করতে হত। ডন-বৈঠক, মুগুর ভাঁজা, সাঁতারকাটা ইত্যাদিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবল উৎসাহ ছিল। তাঁর শরীর স্বাস্থ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ ছিল কবিতা গান অভিনয় প্রভৃতির আনন্দ-কোলাহলে প্রাণবন্ত। সেই পরিবেশের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বাল্যবয়স থেকেই একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন। গান, ছড়া-কবিতা রচনা, অভিনয় সব বিষয়েই তাঁর ছিল প্রবল উৎসাহ।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়েই পারিবারিক জোড়াসাঁকো থিয়েটার সংগঠনের কাজে উদ্যোগী হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ফলে কলেজের পড়াশুনা ইস্তফা দিতে হয়।

ইতিমধ্যে তাঁর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই সি এস পাস করে উচ্চপদস্থ

সিভিলিয়ান হয়ে বিলেত থেকে দেশে ফিরে আসেন। ১৮৬৭ খ্রিঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থান আমেদাবাদে চলে যান।

কলেজের বিধিবদ্ধ পড়াশুনা না থাকলেও আমেদাবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবল উৎসাহে অধ্যয়ন ও বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করেন। বাছাই করা ইংরাজি ও সংস্কৃত বই পড়ার সঙ্গে ফরাসী ও মারাঠী ভাষাও শিক্ষা করতে থাকেন। একজন গুজরাতি মুসলমান শিল্পীর কাছে তিনি নিয়মিত সেতারও শিখেছেন।

কলকাতায় ফিরে এসে সেতারের সঙ্গে পিয়ানো ও হারমোনিয়াম বাজানোও ভালভাবে রপ্ত করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমবয়সী। কোন বিষয়ে ঝোঁক চাপালে দুজনে মিলেই তাতে হাত লাগাতেন। প্রায় সময়েই মজার মজার ছড়া কবিতা লিখে তাঁরা বাড়ির সকলকে চমকে দিতেন।

একবার রোখ চাপল নাটক অভিনয়ের দিকে। অমনি দুই ভাই মিলে বাড়িতেই একটা নাটকের দল করে ফেললেন। নাম দিলেন কমিটি অব ফাইভ।

এই নাটুকে দল ঠাকুর বাড়ির অবৈতনিক মঞ্চেই অভিনয় করত। দর্শক আসনে থাকতেন ঠাকুরবাড়িরই লোকজন। প্রথমে অভিনীত হল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটক। পরে হল একেই কি বলে সভ্যতা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারী নাটকে অহল্যাদেবী ও সার্জেনের ভূমিকায় অভিনয় করে সকলের প্রশংসা পান।

সেইকালে সমাজে কৌলিন্য ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের বহুবিবাহ প্রথাকে ব্যঙ্গ করে লেখা কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক সমাজে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তর্করত্ন মশায়কে অনুরোধ করে লিখিয়ে নিলেন নবনাটক নামের একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক। যথারীতি কয়েকমাসের রিহার্সেলের পর নাটকটি ঠাকুর বাড়ির মঞ্চে অভিনীত হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকে নটীর ভূমিকায় অভিনয় করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন।

পরবর্তীকালে যিনি নাট্যসাহিত্যে অনন্যসাধারণ কীর্তির জন্য স্মরণীয় হবেন, এভাবে চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমেই তাঁর নাটকের জগতে প্রবেশ লাভ ঘটেছিল।

সেইকালে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র প্রমুখ সমাজহিতৈষী ব্যক্তিদের উদ্যোগে বেলগাছিয়ায় আশুতোষ দেবের বাগান বাড়িতে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই মেলা সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশীয় ভাবধারার প্রচার।

দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মেলা প্রাঙ্গণে

চিত্রশিল্প ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্য ও স্ত্রীলোকদের সূচীশিল্পের প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হত। সেই সঙ্গে থাকত, দেশীয় ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন। এই মেলার সংগঠক-উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

১৮৬৮ খ্রিঃ হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে নবগোপালবাবুর উৎসাহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা লেখেন। মেলায় তিনি উদ্বোধন নামের কবিতাটি আবৃত্তি করে সকলের প্রশংসা লাভ করেন।

পরে এই মেলা প্রাঙ্গণেই তাঁর রচিত জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক পুরুষবিক্রম-এর সাফল্য মন্ডিত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হয়। ১৮৭৪-৭৫ খ্রিঃ তিনি এই মেলার যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হন।

সেইকালের রীতি অনুযায়ী মাত্র উনিশ বছর বয়সেই ১৮৬৮ খ্রিঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম কাদম্বরী দেবী। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাদম্বরী দেবীর প্রভাব ও প্রেরণা ছিল অপরিসীম।

রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান হিসাবে প্রথম দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নারী স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। পরে দাদা সত্যেন্দ্রনাথের সাহচর্যে পাশ্চাত্যের উদার চিন্তায় প্রভাবিত হন এবং পরে স্টুয়ার্ট মিলের রচনা পাঠ করে উদারপন্থী নব্যচিন্তার অনুসারী হয়ে ওঠেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছিল স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী কিঞ্চিৎ জলযোগ নামক প্রহসন রচনার মাধ্যমে। এই প্রহসন কলকাতার সমাজে আলোড়ন তুলেছিল।

পরে রক্ষণশীলতার গন্ডী ভেঙ্গে আধুনিক উদার ভাবধারায় প্রবুদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথই হয়ে উঠলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। কিঞ্চিৎ জলযোগ রচনার জন্যও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নারী স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার তাঁর গৃহ থেকেই শুরু করেছিলেন। বিবাহের পর স্ত্রী কাদম্বরিকে শিক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন, ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সকল সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে কলকাতার প্রকাশ্য গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতেন।

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ গুপ্ত স্বদেশী সংগঠন সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই এদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৭ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী নামক এই সভার সভাপতি হন রাজনারায়ণ বসু। সঞ্জীবনী সভার কর্মতৎপরতায় গোড়ার দিকে দেশলাই প্রস্তুত ও দেশী কাপড় বোনার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবল উৎসাহে নীলচাষ ও পাটের ব্যবসায়ে অর্থলগ্নি করে

ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেন। কিন্তু অনভিজ্ঞতার খেসারত গুণতে হল আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিন্তু দমলেন না। তাঁর প্রতিভা ছিল খেয়ালী। যখন যে বিষয়ে ঝোঁক চাপত, তাই নিয়েই মেতে উঠতেন। সাহেবরা নানা ব্যবসার ফাঁদ পেতে দেশীয় লোকেদের শোষণ করছে, তাদের শোষণের হাত থেকে দেশের স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে এই খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এক এক সময়ে এক এক ব্যবসায় নেমে পড়েছেন।

তাঁর উদ্যোগ আয়োজনকে স্বভাবতঃই সাহেবরা পথের কাঁটা বলে বিবেচনা করত। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তারাও নানা অপচেষ্টা অবলম্বন করত।

উৎসাহ উদ্যম উপযুক্ত চেষ্টা ও অর্থবিনিয়োগ সত্ত্বেও প্রধানতঃ অভিজ্ঞতার অভাব ও ইংরাজদের চক্রান্তেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশীয় ব্যবসায়ের চেষ্টা সফল হতে পারেনি।

১৮৮৪ খ্রিঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থির করলেন, নদীপথে দেশী স্টিমার সার্ভিস চালু করবেন, টেক্কা দেবেন সাহেব কোম্পানিগুলির সঙ্গে।

খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত নদীপথে জাহাজ চালাবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটা পুরনো জাহাজ নিলামে কিনে নিলেন। খোল নলচে বদলাতে হবে। সরকারি ইঞ্জিনিয়ার বুশবি সাহেবকে দেখানো হল। দেখেশুনে তিনি সুপারিশ করলেন, কেলসো স্টুয়ার্ট কোম্পানি এই পুরনো জাহাজকে একেবারে নতুন করে তৈরি করে দিতে পারবে। তাঁর পরামর্শ মত সেই কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হল।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়, জাহাজ তৈরির কাজ আর শেষ হয় না। নানা অছিলায় কোম্পানি একের পর এক জাহাজ ডেলিভারি দেবার দিন বদল করতে লাগল।

শেষমেশ ঘন ঘন তাগাদা দিয়ে যে জাহাজটি পাওয়া গেল, তাতে ধরা পড়তে লাগল নানান খুঁত। ইঞ্জিন সারাই হয় তো বয়লার নয়তো কলকব্জা বিগড়োয়। দেশি সারেঙরা তাদের সীমিত জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে যতটা পারে সামাল দেবার চেষ্টা করে।

এভাবে তো আর নিয়মিত স্টীমার সার্ভিস চালানো যায় না। বিরক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একজন ফরাসী কমান্ডার নিয়োগ করলেন। তার চেষ্টায় একদিন জাহাজ জলে ভাসল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর এই জাহাজের নাম রাখলেন সরোজিনী।

ইতিমধ্যে খুলনা বরিশাল রুটে ফ্লোটিল্লা নামে নতুন এক কোম্পানি জাহাজ

চালাতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে টেক্কা দেবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী জাহাজের ভাড়া কমিয়ে দিলেন।

বাঙালী মালিকের জাহাজ জলে নামায় বরিশালের ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হল। তাদের প্রচারে জাহাজে যাত্রীর চাপ দিন দিনই বাড়তে লাগল।

উৎসাহিত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পর পর আরও চারটি জাহাজ কিনে একই রুটে নামিয়ে দিলেন। সরোজিনীর সঙ্গে তারাও নতুন নাম পেল ভারত, স্বদেশী, বঙ্গলক্ষ্মী লর্ড রিপন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঁচখানি জাহাজ সাহেব কোম্পানিগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে লাগল। কম ভাড়ায় হলেও দেশীয় যাত্রীদের সোৎসাহ সহযোগিতায় রমরম করে চলতে লাগল ব্যবসা।

দেখেশুনে প্রমাদ গুণল ইংরাজ জাহাজ কোম্পানিগুলি। তারাও ভাড়া কমাতে বাধ্য হল। তাতেও এঁটে উঠতে পারল না জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে। চলতে লাগল ভাড়া কমানোর প্রতিযোগিতা।

শেষ পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘায়েল হলেন অন্য দিক থেকে। একদিন মালবোঝাই স্বদেশী জাহাজটি জেটিতে ধাক্কা খেয়ে নদীতে ডুবে গেল। জাহাজডুবির ফলে আর্থিক লোকসান এমনই দাঁড়াল যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বাধ্য হয়ে সরে আসতে হল জাহাজের ব্যবসা থেকে।

সঙ্গীত ও নাটক রচনার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করেছেন ইতিহাস, দর্শন ও ভ্রমণ কাহিনী।

তিনি ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ছিলেন। ফরাসী সাহিত্যের বহু উল্লেখযোগ্য গল্প ও উপন্যাস তিনি বাংলায় অনুবাদ করে বঙ্গভারতীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন।

জোতিরিন্দ্রনাথের বহু বিস্তৃত সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিখ্যাত নাটকগুলি হল, পুরুষবিক্রম, স্বপ্নময়ী, সরোজিনী, অশ্রুমতী ইত্যাদি। অনেকগুলি নাটক হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী ভাষাতে অনূদিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করেছে। অলীক বাবু, আর করব না ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রহসন। তাঁর একাধিক নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্যোগে বিদ্বজ্জন সমাগম (১৮৭৪ খ্রিঃ) ও সারস্বত সমাজ (১৮৮২ খ্রিঃ) নামে দুটি সক্রিয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ তাঁর উদ্যোগেই ১৮৭৭ খ্রিঃ ভারতী পত্রিকার জন্ম ও যাত্রা শুরু হয়। ১৯০২-৩ খ্রিঃ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ সভাপতি ছিলেন।

চিত্রাঙ্কনেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পারদর্শীতা ছিল অসাধারণ। তাঁর অঙ্কিত প্রায় দু হাজার চিত্রের অধিকাংশই রবীন্দ্রভারতী সমিতির সংগ্রহে সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। বহু খ্যাত অখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি তিনি খাতাবন্দি করেছেন।

বিখ্যাত ইংরাজ শিল্পী রোদেনস্টাইন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রাবলী দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, ''তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী।''

তাঁরই আগ্রহ ও উদ্যোগে ১৯১৪ খ্রিঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর একটি স্বনির্বাচিত সংগ্রহ বিলাত থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি প্রতিকৃতির মুখের রেখা পর্যবেক্ষণ করে মানুষটির চরিত্রের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ক্ষমতা শিরোমতি বিদ্যা-এর অন্তর্ভুক্ত।

তিনি সাধনা পত্রিকায় প্রায় নিয়মিতই লিখতেন। এখানে তাঁর আধুনিক মস্তিস্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি ও লোকচেনা জাতীয় রচনাদিও প্রকাশিত হয়েছে।

দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, রাজা মহারাজা থেকে অখ্যাত অপরিচিত মানুষের মুখ তাঁর খাতার পাতায় ঠাঁই পেয়েছে।

ফ্রেনলজির চর্চা করে বিলেতে স্পারপিন সাহেব সুখ্যাত হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের মস্তিস্কের গঠন পরীক্ষা করে এক সময় তিনি তাঁকে এক অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন।

স্পারপিন সাহেবের কৃতিত্বের নজির দেখেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফ্রেনলজি বিষয়ে বিশেষ ভাবে আগ্রহী ও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। মানুষের করোটি, মস্তিষ্কের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এমনই মেতে উঠেছিলেন যে আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত জনেরা ঠাকুর বাড়িতে আসতে রীতিমতো শঙ্কা বোধ করতেন।

যাকেই সামনে পেতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে ধরে সামনে বসিয়ে নিবিষ্ট একাগ্রতায় মাথা টিপে টিপে ছবি এঁকে মানুষটির স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি পর পর বলে দিতেন।

একবার গাজীপুরের জেলের ডাক্তার রবার্টসন সাহেবের আগ্রহে ও অনুরোধে তিনি জেলের দাগী খুনে কয়েদিদের মাথার স্কেচ অঙ্কন করে ও মস্তিষ্কের গঠন পরীক্ষা করে তাদের চরিত্র বিচার করে সাহেবকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খেয়ালী প্রতিভা এমনই ছিল যে যখন যেটা মাথায় চাপত তার চূড়ান্ত করে ছাড়তেন। কাজের লাভক্ষতি নিয়ে কখনও বিশেষ মাথা

ঘামাতেন না। তাঁর স্বভাবের এই বিশেষ দিকটিকে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ একবার একটি মজার ছড়া রচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

বেয়ালা কি মিঠে
অমৃতের ছিটে
ঐ হাতটাতে শুনায়।
পিয়ানো চং চং
    চং চং চং
সেতার গুনগুনায়।
মাথার তত্ত্ব খুঁজি,
পুঁথি করেন পুঁজি,
মাথা পেলে আর কিছু চান না,
লন যবে ছবি
    মনে ভাবে কবি
হইয়াছে, থামো—আন্না।
চক্ষে আসিয়াছে মোর কান্না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাংগীতিক অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত শিক্ষক বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা।

বোম্বাইতে দাদার কাছে থাকার সময় তিনি সেতার বাদন শিক্ষা করেছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে পিয়ানো, বেহালা ও হারমোনিয়াম রপ্ত করেন।

পরে সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা এতটাই হয়েছিল যে তিনি নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করতেন। তাঁর সুরে কথা বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করতেন।

কবির প্রথম দিকের অনেক গানই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে গঠিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করেন এবং তাতে নিজেই হিন্দী ধ্রুপদাঙ্গের অনুসরণে সুর যোজনা করেন।

বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মরণীয় অবদান আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন ও প্রচলন। তাঁর রচিত স্বরলিপি 'গীতিমালা' পুস্তক সমসাময়িক কালে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল।

কালীচরণ সেন সঙ্কলিত ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি পুস্তকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক গান স্থান পেয়েছে।

১৮৯৭ খ্রিঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ। তাঁর এই অসামান্য কীর্তি বাংলার সঙ্গীত ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

সঙ্গীত বিষয়ে দুটি মাসিকপত্রও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। পত্রিকা দুটি হল 'বীণাবাদিনী' ও 'সঙ্গীত প্রকাশিকা'।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খেয়ালী প্রতিভা একবার মেতে উঠল সর্বসাধারণের পোশাকের নমুনা নির্বাচন নিয়ে। পায়জামার সঙ্গে একখণ্ড কাপড় পাট করে মালকোচাব মতো ব্যবহার করা যায় কিনা এ নিয়ে মাথা ঘামালেন বেশ কিছুদিন। শেষমেশ ভাবনাচিন্তা করে এক অভিনব টুপি তৈরি করলেন। তা তৈরি হল সোলার টুপি আর পাগড়ি মিলিয়ে।

এই উদ্ভট মস্তক-আচ্ছাদন তৈরি করেই নিরস্ত হলেন না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সে বস্তু নিজেই মাথায় চাপিয়ে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থেএ সম্পর্কে মজাদার বর্ণনা দিয়েছেন—"দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে, এমন বীরপুরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"

এমনি নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। পরমায়ু পেয়েছিলেন পঁচাত্তর বছর। সে জীবন বড় সুখের ছিল না। শোক আর আঘাতে বার বার জর্জরিত হয়েছেন।

যুবা বয়সেই, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর তখন তাঁর বয়স, পত্নী কাদম্বরীর অকাল মৃত্যুতে মর্মান্তিক শোকের আঘাত সইতে হয়েছে তাঁকে। পত্নী বিয়োগের পর নিঃসন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমনই ভেঙ্গে পড়লেন যে নিজেকে স্বেচ্ছায় সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। শেষ জীবন রাঁচিতেই নির্জনে কাটাবেন বলে স্থির করলেন তিনি।

তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী রাঁচীর মোরাবাদী পাহাড়ের ওপরে ১৯১০ খ্রিঃ তৈরি হল শান্তিধাম ও উপাসনা মন্দির। সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

নব্যবাংলার অন্যতম পুরোধাপুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন ১৯২৫ খ্রিঃ ৪ মার্চ।

আত্রেয়

ভারতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জনক রূপে স্বীকৃত ঋষি ভরদ্বাজ। তাঁর শিক্ষাকে প্রথম জনমুখী করে তুছিলেন যে সত্যান্বেষী কল্যাণব্রতী মহাবিদ্রোহী পুরুষ তাঁর নাম পুনর্বসু। তিনি ছিলেন মহাঋষি অত্রির পুত্র। তাই অত্রির পুত্র আত্রেয় নামেই ভারতের ঘরে ঘরে তিনি পরিচিত সংপূজিত হয়েছিলেন। আয়ুর্বেদাচার্য আত্রেয়র স্বীকৃতি জগৎ জুড়ে।

প্রাচীন সভ্যতার পীঠভূমি হিসেবে মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীক ও ভারতের নাম সুবিদিত। মানবসভ্যতার সেই উষালগ্নে উপরোক্ত সকল স্থানেই রোগব্যাধির চিকিৎসা ও নিরাময় ছিল দৈব আশীর্বাদ নির্ভর।

মিশরে মানবের রোগশোকের নিরাময় করতেন দেবতা থাট। গ্রীসে এই দায়িত্ব আরোপিত ছিল অ্যাপলোর ওপরে।

আমাদের ভারতবর্ষে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই নিদান দিতেন রোগ চিকিৎসারও। হিন্দু পুরাণ মতে তিনিই চিকিৎসাবিদ্যার জনক।

পাশ্চাত্য পুরাণ মতে পৃথিবীর আদি মানব হলেন আদম ও আদি মানবী ইভ। আমাদের শাস্ত্রে পৃথিবীর প্রথম মানব হিসাবে পাওয়া যায় প্রজাপতি দক্ষর নাম। সেই হিসাবে প্রজাপতি দক্ষ চিকিৎসাবিদ্যা পেয়েছিলেন ব্রহ্মার কাছ থেকে। তাঁর কাছে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন অশ্বিপুত্রদ্বয়। অশ্বিনীদের কাছ থেকে এই বিদ্যা লাভ করেন দেবরাজ ইন্দ্র।

দেবলোকেই এভাবে চিকিৎসা শাস্ত্র ছিল বিধৃত। মর্তের মানব ঋষি বিজ্ঞানী ভরদ্বাজই তা ইন্দ্রের কাছ থেকে প্রথম মর্তে নিয়ে আসেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্র মতে এই হল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত।

ঐতিহাসিক সত্যও এই যে, ভরদ্বাজই হলেন আয়ুর্বেদের স্রষ্টা বা জনক। তিনিই তরুণ ঋষি পুনর্বসু তথা আত্রেয়কে দিয়েছিলেন আয়ুর্বেদ শিক্ষা। ইতিহাসের প্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে জন্ম হয়েছিল ঋষি আত্রেয়র।

মহাতপস্বী পিতার ন্যায় আত্রেয় কেবল দেবসাধনাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। মর্ত মানবের জীবনচর্চা তাঁকে আকৃষ্ট করত বেশি।

তাদের সুখ দুঃখে তিনি ছিলেন সংবেদনশীল। রোগজর্জর মানব মানবীর আর্তি তাঁর হৃদয়কে পীড়িত করত।

তাই সমকালের দৈবনির্ভরতাকে পরিহার করে মহাবিদ্রোহীর মন নিয়ে তিনিই প্রথম জীবন-সত্যের অন্বেষণে ব্রতী হন এবং মানবকল্যাণের ব্রতকে জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করেন।

খ্রিস্টপূর্ব যুগে গ্রীস দেশে জন্মেছিলেন মহাজ্ঞানী হিপোক্রেটিস। তাঁর হাতেই প্রথম যুক্তি বিচারের নিরিখে প্রচলিত চিকিৎসা সংস্কারমুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের আলোক পেয়েছিল। তাই ওই দেশে তাঁকে বলা হয়ে থাকে চিকিৎসাবিদ্যার জনক।

কিন্তু ভারতবর্ষে হিপোক্রেটিসেরও বহু শত বছর আগে বিবিধ রোগের কারণ, তার নিরাময়ে নানা ভেষজের কার্যকারিতা তথা আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে স্বীয় স্বাধীন দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আত্রেয়। বস্তুত, প্রাচীন পৃথিবীর বিজ্ঞানের অঙ্গনে আত্রেয় ছিলেন এক

স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দ্রুত উন্নতিশীল আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও মাথায় তুলে স্বীকৃতি জানিয়েছে তাঁর অবদানকে।

আয়ুর্বেদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর পঠন-পাঠনে জীবনের সুদীর্ঘ সময় ব্যাপৃত থেকেছেন আত্রেয়। তিনি ছিলেন মর্ত মানবের মাঝে প্রথম শিক্ষাগুরুও। পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্ররাও হয়েছেন খ্যাতকীর্তি।

তাঁদের প্রত্যেকেই, যেমন, ভেলা, জতুকর্ণ, হারীত, অগ্নিবেশ, পরাশর, ক্ষরপাণি প্রমুখ আত্রেয়ের শিক্ষাকে নির্ভর করেই রচনা করেছেন আয়ুর্বেদের নানা মূল্যবান গ্রন্থ।

জীবনের মধ্যলগ্নে আত্রেয় রচনা করেছিলেন আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত মহাগ্রন্থ, যা আত্রেয়সংহিতা নামে বিখ্যাত।

আমরা যে চরক সংহিতার নাম শুনি তা হল আত্রেয়-শিষ্য অগ্নিবেশ রচিত গ্রন্থেরই সংস্কৃত রূপ। সংশোধন ও সংস্কার করেছিলেন পরবর্তীকালের বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ চিকিৎসক চরক এবং গ্রন্থের নাম হয় চরক-সংহিতা। আত্রেয়ের আয়ুর্বেদ শিক্ষা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

চরক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন, বিবিধ রোগ, তার উপযুক্ত কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আত্রেয়ই সর্বপ্রথম আয়ুর্বেদকে শুনিয়েছেন।

আত্রেয়ের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও শিক্ষক হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, তা জানা যায় প্রাচীন নানা গ্রন্থ থেকে। তাঁকে বলা হয়েছে, একজন তাপস অধ্যাপক।

আত্রেয়ের উপযুক্ত শিক্ষাতেই পরিপুষ্ট হয়েছে ভারতীয় আয়ুর্বেদের ইতিহাস। তাঁর যোগ্য শিষ্যগণ অধীত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে বিস্তৃত করে দিয়েছিল হিমালয়ের উত্তরাঞ্চল থেকে পূর্বহিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এমনকি হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছিল আয়ুর্বেদ।

আত্রেয়ের জীবন ছিল বিবিধ ভেষজের গুণাগুণ নির্ণয়ে অবিশ্রাম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধ্যানমগ্ন এক তপস্বীজীবন। তাঁর জ্ঞানলব্ধ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান তথা প্রাচীন বিশ্ববিজ্ঞানের ভাণ্ডার। যা বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছেও হয়ে আছে মহা বিস্ময়।

গ্যালেন

"Here is one physician who is not hide bound by stupid tradition".

১৬৮ খ্রিঃ রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট অরিলিয়াস উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন তৎকালীন প্রাথিতযশা তরুণ চিকিৎসক গ্যালেন সম্পর্কে। এবং বলাই বাহুল্য তাঁর এই প্রশস্তিবচনের মাধ্যমেই বিজ্ঞানী গ্যালেনের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রধান পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকতীর্থ রোমের তৎকালীন প্রাচীনপন্থী চিকিৎসক-বৃন্দের মধ্য গ্যালেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। চিকিৎসাশাস্ত্রের গতানুগতিক ধারার গন্ডি ভেঙ্গে স্বকীয় নতুন চিন্তা ভাবনা ও চিকিৎসাপ্রণালী প্রবর্তনের দিশারী পুরুষ তিনি। রোমের বিশ্বখ্যাত চিকিৎসকদের মধ্যে তিনি সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন "যাঁরা মনে করেন হিপোক্রেটিস বা বিশেষ কারও বিধানই চিকিৎসার শেষ কথা, তাঁদের আমি কৃতদাস বলেই মনে করি।"

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্ধকার যুগে গ্যালেন প্রথম প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন আধুনিকতার দীপবর্তিকা। মাংসপেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের বিস্ময়কর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনিই সূচনা করেছিলেন পরীক্ষামূলক শারীরবিজ্ঞানের।

ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলে কথিত হিপোক্রেটিসের অ-পরীক্ষিত বহুবিধ ভাবনা-কল্পানাকে গ্যালেনই সর্বপ্রথম পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

সেই আদি যুগে গ্যালেন শরীরের পেশী সমূহের যে নামকরণ করেছিলেন, ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা নির্ভর আধুনিক বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির দিনে আজও তার অধিকাংশই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

তবে একথাও সত্যি যে প্রাণিবিদ্যায় গ্যালেনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলই শেষ কথা ছিল না। মাংস ও পেশীর ওপরে তাঁর পরীক্ষার বহুবিধ সিদ্ধান্তই আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তথাপি, সুদীর্ঘকালব্যাপী, সেই খ্রিস্টীয় ১৬ শতক পর্যন্ত শারীরগঠন বিদ্যায় নতুন নতুন তত্ত্ব অবিষ্কারের আগে পর্যন্ত গ্যালেনই ছিলেন শেষ কথা।

সুদীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে অগণিত দুশ্চিকিৎস্য রোগীকে নিরাময় করে গ্যালেন নতুন জীবন দান করেছেন। সেই যুগে মানুষের কাছে তিনি লাভ করেছিলেন দেবতার মর্যাদা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আধুনিক যুগের পথপ্রদর্শক গ্যালেনের ঘটনাবহুল জীবন কাহিনী বড়ই বিচিত্র। দেবতার আশীর্বাদধন্য ছিলেন তিনি। গ্যালেন চেয়েছিলেন

পুরনো সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গন্ডীমুক্ত করে চিকিৎসাবিদ্যাকে সারা বিশ্বের মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে।

তাঁর এই স্বপ্ন অসফল থাকেনি। স্বীয় কীর্তির আলোকেই তাঁর নাম আজও রয়েছে অমলিন, দেদীপ্যমান।

গ্যালেনের জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টীয় ১৩০ অব্দে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এশিয়া মাইনরের রাজধানী পোরগামাস নগরীতে। তাঁর বাবা নিকন ছিলেন রোমের সুখ্যাত ভাস্কর।

শিল্পের সঙ্গে দর্শন, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং অঙ্ক শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। সর্বোপরি নিকন ছিলেন বিদ্যানুরাগী। সেকারণে পুত্রকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেই নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি।

পিতার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণায় ছেলেবেলাতেই অঙ্ক-প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও আকৃষ্ট হন গ্যালেন।

প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ ছিল বালক গ্যালেনের সহজাত। খুব অল্প সময়ই ঘরে থাকতেন তিনি। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে চারপাশের জগতকে দেখতেন কৌতূহলী মুগ্ধ চোখে।

পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদের জীবন ধারা পর্যবেক্ষণ করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতেন।

চোদ্দ বছর বয়স হলে তাঁকে পাঠানো হয় পোরগামাসের বিখ্যাত শিক্ষাগুরুদের কাছে। তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা, ঐকান্তিক প্রেরণা ও উৎসাহেই গ্যালেনের প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

অ্যারিস্টটলের জীবন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে তিনি উপলব্ধি করেন, গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতির অন্তর্লোক পর্যবেক্ষণ করা একজন আদর্শ জীবন-বিজ্ঞানীর কাজ। এর পর থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয় গভীরতর।

যৌবনের প্রারম্ভকালেই যেন ভাগ্যদেবতার যোগাযোগেই এক আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে গ্যালেনের ভবিষ্যৎ জীবনের পথটি নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে পীড়া শেষ পর্যন্ত তাঁকে মরণাপন্ন করে তুলল। নিরুপায় নিকন শেষে একদিন পুত্রকে নিয়ে পোরগামাসের এসকেলেপিয়াসের মন্দিরে গিয়ে হত্যা দিলেন।

একদিন রাতে স্বপ্নে তিনি দেবতা এসকেলেপিয়াসের নির্দেশ শুনতে পেলেন, তাঁর ছেলে যদি ভবিষ্যতে মানুষের কল্যাণ কামনায় চিকিৎসক হবার শপথ নেয়, তবে তার জীবন রক্ষা পাবে।

ঘটনা হল, এই আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শনের পরেই গ্যালেন রোগমুক্ত ও সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এই ঘটনা তরুণ গ্যালেনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি স্থির করেন, পিতার স্বপ্নদৃষ্ট দৈবনির্দেশই হবে তাঁর জীবনব্রত—রোগব্যাধির চিকিৎসার মধ্যেই তিনি পৃথিবীর মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন।

রোমের শাসনাধীন এশিয়া মাইনরের রাজধানী শহর পোরগামাসে বহু জ্ঞানীগুণীর বাস। শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিশেষ করে শিল্পকলায় সুখ্যাত এই নগরী। জ্ঞানতীর্থ আলেজান্দ্রিয়ার পরেই পোরগামাসের স্থান।

হিপোক্রেটিসের উত্তরসূরী বিশিষ্ট চিকিৎসক সাতিরাস এই শহরে বসেই দূরদূরান্তরের ছাত্রদের চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেন। গ্যালেন এবারে তাঁর ছাত্রদলে নাম লেখালেন। এই সময় তাঁর বয়স সতেরো।

এখানে পাঁচ বছর শারীরবিদ্যা ও নানা ভেষজবিদ্যা আয়ত্ত করে তিনি সমসাময়িক চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করলেন।

তাঁর যখন বাইশ বছর বয়স তখন নিকন মারা যান। বাবাই ছিলেন গ্যালেনের আদর্শের মূল প্রেরণা। তাঁকে হারিয়ে মনের দিক থেকে খুবই অসহায় হয়ে পড়লেন তিনি।

জন্মশহর পোরগামাসের সব আকর্ষণই যেন বাবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হয়ে গেল। তিনি চলে এলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। সময়টা ১৫৩ খ্রিঃ, বয়স হয়েছে তেইশ।

আলেকজান্দ্রিয়ায় জগৎবিখ্যাত জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ। তাদের কাছে চার বছর পড়াশুনা করে সমগ্র হিপোক্রেটিস রপ্ত করলেন।

এই চার বছরে এখানকার সুবিখ্যাত সংগ্রহশালার জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহনও সম্পূর্ণ হল।

এই ভাবে সুপ্রাচীনকালের নানা সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে মোড়া অচলায়তন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিল ভাবীকালের যুক্তি-বিচারের আলোকধারায় স্নাত মুক্তদৃষ্টি চিকিৎসাবিজ্ঞানীর।

গ্যালেন ততদিনে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, প্রাচীনপন্থী তথাকথিত চিকিৎসকরা সম্পূর্ণভাবেই ভ্রান্তপথের পথিক। রোগ চিকিৎসা ও সেবার নামে মানুষের সর্বনাশই তারা করছেন। ওই দুর্দৈবের কবল থেকে রোগসন্তপ্ত মানষকে মুক্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে সাতাশ বছর বয়সে চিকিৎসক গ্যালেন ফিরে এলেন তাঁর নিজের শহরে।

ফিরে আসার কিছুদিন পরেই শহর জুড়ে শুরু হল ব্যাৎসরিক পর্বোৎসব। জাতীয় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে প্রতিবছরই আয়োজন করা হয় মল্লযুদ্ধের।

শক্তিপরীক্ষার এই ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করানো হত সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান বন্দি ও ক্রীতদাসদের।

যোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য শহরের নামী চিকিৎসকদের সঙ্গে গ্যালেনেরও ডাক পড়ল সেবারে।

চিকিৎসক হিসাবে তখনও তিনি শহরে সুপরিচিত নন। সবে রোগীপত্তর দেখা শুরু করেছেন। অধীত বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের সূত্রপাতেই হাত-পা ভাঙ্গা, ছেঁড়াখোঁড়া শরীরের মল্লযোদ্ধাদের চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে তা ষোল আনা কাজে লাগলেন।

সেই যুগে অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষার প্রয়োজনে শবব্যবচ্ছেদ করা চলত না। সামাজিক তথা ধর্মীয় বাধাই ছিল প্রধান অন্তরায়। অথচ শারীরবৃত্তিয় গূঢ় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন না হলে দক্ষ চিকিৎসক হওয়া সম্ভব নয়।

সংস্কারমুক্ত ধ্যানধারণার আলোকে চক্ষুষ্মান নবীন চিকিৎসক গ্যালেন লোকপ্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যাকে হিপোক্রেটিসের গন্ডি থেকে মুক্ত করার সঙ্কল্পে ছিলেন বদ্ধপরিকর।

ভ্রান্তপথে পরিচালিত চিকিৎসকদের জ্ঞানদৃষ্টি উন্মোচন করতে না পারলে মানুষের যথার্থ কল্যাণের ব্রতও থাকে অসম্পূর্ণ।

এই পরিস্থিতিতে আহত মল্লবীরদের চিকিৎসার সুযোগটাকেই তিনি মানব শরীরের গঠনতন্ত্রের গোপন খবরাখবর সংগ্রহের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়ে অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন।

এর পর জ্ঞানবিদ্যা প্রয়োগের বৃহত্তর ক্ষেত্র অনুসন্ধান তথা মানবতার সেবার আহ্বানে গ্যালেন চলে এলেন রোমসাম্রাজ্যের রাজধানী রোম শহরে।

নানান বিষয় ও বিভিন্ন প্রণালীর অগণিত চিকিৎসকের ভিড় রোমে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে চিকিৎসকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র, তীব্রতর রেষারেষিও। সেই ভিড়ের মধ্যেই কোনও রকমে একটা ছোট ঘর জোগাড় করে গ্যালেন বসে গেলেন রোগীপত্তর দেখতে।

ঘরের মাথায় একটা কাঠের ফলকে নিজের পরিচয় জ্ঞাপক সাইনবোর্ড ঝোলাতেও ভুললেন না অবশ্য। তাঁর সাইনবোর্ডের লেখাগুলোও ছিল অভিনব। তাতে লেখা হয়েছিল, আমি গ্যালেন, একজন চিকিৎসক। কোনও বিশেষ গুরু-প্রাণালী বা মতবাদ মেনে চিকিৎসা করি না। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়েই আমি সব রোগের চিকিৎসা করে থাকি।

গোঁড়া অন্ধ সংস্কারবদ্ধ সমাজে স্বাধীন মুক্ত চিন্তার এহেন আহ্বান অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হল। কোনও রোগীর মনেই তথাকথিত হাতুড়ে চিকিৎসক ভরসা জন্মাতে পারে না।

কিন্তু দৈব নির্দেশেই চিকিৎসক হবার শপথ নিয়েছিলেন গ্যালেন। তাই যেন দৈব যোগাযোগেই এই সময়ে দুটি ঘটনার মাধ্যমে রাতারাতি সভ্যতার পীঠভূমি রোমে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

প্রাচীন গ্রীসের মহাদার্শনিক ইউডিমিসের রোগ চিকিৎসা নিয়ে সহসা রোমের বিশ্বখ্যাত চিকিৎসকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হল। রাতদিন পরিশ্রম করে জ্ঞানবুদ্ধি উজাড় করে দিয়েও শয্যাশায়ী অসুস্থ দার্শনিককে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হলেন তাঁরা।

একদিন অজ্ঞাত অখ্যাত তরুণ চিকিৎসক গ্যালেন নিজেই উপস্থিত হয়ে ইউডিমিসের রোগ চিকিৎসার অভিপ্রায় জানালেন। এবং শেষ পর্যন্ত সকলকে বিস্মিত স্তম্ভিত করে একদিন তাঁর চিকিৎসার গুণেই ইউডিমিস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এই ঘটনায় একদিকে গ্যালেন লাভ করলেন বৃদ্ধ দার্শনিকের গভীর স্নেহ ও চিকিৎসক খ্যাতি, অন্যদিকে রোমের প্রভাবশালী চিকিৎসকদের অবাঞ্ছিত শত্রুতা। যেহেতু হিপোক্রেটিসের বিধানকেই তিনি চিকিৎসার শেষ কথা বলে মানতেন না এবং ছিলেন নবীন ভুঁইফোঁড় চিকিৎসক, তাই চমকপ্রদ এহেন সাফল্যের পরেও গ্যালেনের রোমে তিষ্টানোই কঠিন হয়ে পড়ল। কিন্তু ইউডিমিসের স্নেহচ্ছায়া লাভ করার সুবাদে এবং তাঁরই সহৃদয় সহায়তায় এবারে প্রকাশ্য স্থানে আরও ব্যাপক ভাবে চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। দিনে দিনে বাড়তে লাগল তাঁর প্রচার ও প্রসার।

কিছুদিন পরেই রোম শহরের পৌরঅধিকর্তা মাননীয় ফ্লেবিয়াসের অসুস্থ পত্নীকেও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে গ্যালেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান-চিকিৎসায় সুস্থ করে তুললেন। এবারেও শহরের নামীদামী চিকিৎসকদের টেক্কা দিলেন গ্যালেন।

এই অসাধারণ সাফল্যের ঘটনার পরে কৃতজ্ঞ পৌরপ্রধানের অকৃপণ অনুকূল্য লাভ করলেন গ্যালেন। তাঁর নতুন চিকিৎসা প্রণালীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ফ্লেবিয়াস উন্নততর গবেষণার লক্ষ্যে রোম শহরের উপকণ্ঠে নির্মাণ করে দিলেন একটি গবেষণাগার এবং আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু। শারীরতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সিংহ থেকে বানর পর্যন্ত সমস্ত কিছু গ্যালেন পেলেন ফ্লেবিয়াসের সাহায্যে ও চেষ্টায়।

অখ্যাত অবজ্ঞাত তথাকথিক হাতুড়ে চিকিৎসক গ্যালেনের চিকিৎসাখ্যাতি এবারে কেবল রোম তথা গ্রীসেই আবদ্ধ রইল না। সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

তাঁকে বৃহত্তর মানবতার সেবার সুযোগ করে দিয়ে দলে দলে রোগীদের ভিড় জমে উঠতে লাগল।

রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি রোমের নির্জন ল্যাবরেটরিতে গ্যালেনের নিত্য নতুন গবেষণার কাজও চলতে লাগল অবিশ্রাম।

মানবশরীরের মাংসপেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন গ্যালেন। সব কাজ শেষ হলে গভীর রাতে বসেছেন বই লিখতে।

এই ভাবে বছরের পর বছর ধরে কঠোর সাধনার মধ্যে দিয়ে গ্যালেনের হাত ধরেই জন্ম নেয় পরীক্ষামূলক আধুনিক শারীরবিজ্ঞান ক্রমে তাঁর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার পথ ধরেই গোড়াপত্তন হয় স্নায়ু ও পেশী সংক্রান্ত আধুনিক চিন্তা ভাবনার।

১৬৮ খ্রিঃ রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট অরিলিয়াস। সেই সময়ে গ্যালেন নিবিষ্ট তাঁর গবেষণা ও রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে।

সহসা বেজে উঠল রণদামামা। দক্ষিণ ইতালিতে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন অরিলিয়াস। প্রচন্ড শীতের মধ্যে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে পর্যুদস্ত হতে লাগল রোমক সেনাবাহিনী। সেই সময় আহত অসুস্থ সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য সম্রাটের তলব পেলেন গ্যালেন।

তাঁর অসাধারণ চিকিৎসায় বহু সৈন্যের প্রাণ রক্ষা পেল, আহতরা ফিরে পেল রণাঙ্গনে অস্ত্র ধারণ করার শক্তি ও উদ্যম।

শীত ঋতু কেটে গেল যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই বিজয়ী রোমকবাহিনীর সঙ্গে রোমে ফিরে আসেন গ্যালেন। কৃতজ্ঞ সম্রাট উপযুক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন নবীন চিকিৎসককে এবং তাঁর নিজস্ব সংস্কারমুক্ত চিকিৎসাপদ্ধতির উচ্চ প্রশংসায় হন মুখর।

গ্যালেনের অবিশ্বাস্য চিকিৎসার ফলাফল দেশবাসীকে জানিয়ে সম্রাট সোচ্ছ্বাসে ঘোষণা করেন. গ্যালেন এমন একজন সফল চিকিৎসক যিনি প্রচলিত ধ্যানধারণার তোয়াক্কা করেন না।

এরপরে সম্রাট গ্যালেনের প্রতিভাকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে অনুরোধ জানান সেনাবাহিনীর প্রধান চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু বিশ্বমানবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ চিকিৎসক গ্যালেন তাঁর সেবাব্রতকে সামান্য চাকরির পরিসরে গন্ডীবদ্ধ করতে চাইলেন না। তিনি সম্রাটকে বিনয়ের সঙ্গে জানালেন তাঁর চাকরি গ্রহণের অপারগতার কারণ।

দেবতা এসকেলেপিয়াসের স্বপ্ন-নির্দেশের বিবরণ জানিয়ে বললেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে চিকিৎসা করার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শপথ ভঙ্গ করলে দৈবনির্দেশে তাঁর মৃত্যু অবধারিত।

বলাই বাহুল্য সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য গ্যালেন কিছুটা অতিশয়োক্তির ছলনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সব কিছু শোনার পর সম্রাটও তাঁকে অব্যাহতি দিলেন।

যশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মধ্য গগনে পৌঁছে গ্যালেন তাঁর গবেষণার কাজে আরও নিবিষ্ট হলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ ত্রিশটি বছর তিনি এভাবে রোমেই অতিবাহিত করলেন।

অসুস্থ মানুষের শরীরের চিকিৎসা ও পশুপাখির দেহব্যবচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে যেসব তথ্য তাঁর দীর্ঘ গবেষণার জীবনে সংগৃহীত হয়েছিল, সেসমস্ত একত্রিত করে এরপর প্রকাশিত হল গ্যালেনের প্রথম বই।

শারীরবৃত্তে মাংসপেশীর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নিয়ত সংকোচন-প্রসারনশীল মাংসপেশীর স্বাভাবিক স্বভাবধর্ম, শরীরে স্নায়ুতন্ত্রের অপরিহার্যতা, জীবদেহে মস্তিষ্কের ভূমিকা ইত্যাদি আভ্যন্তর শরীরের যাবতীয় বিষয়ের ওপর বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে গ্যালেন আধুনিক শারীর বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করলেন।

দীর্ঘ গবেষণালব্ধ ফলাফল সারাজীবনে চারশটিরও বেশি বই লিখে একে একে প্রকাশ করলেন গ্যালেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে আধুনিক যুগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষায় দেড় হাজার বছর পূর্বেকার গ্যালেনের অনেক তথ্য ও ব্যাখ্যাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পরীক্ষামূলক আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বিজ্ঞানী গ্যালেনের হাতেই।

অ্যানাটমি বা শরীর গঠনবিদ্যার ওপর তিনিই প্রথম মুক্তচিন্তা-যুক্তির আলোকপাত ঘটিয়েছিলেন।

সে যুগে সমস্ত বিদ্যাই হাতে লেখা পুঁথিতে ধরে রাখা হত। মুদ্রণশিল্পের আবিষ্কার হয়েছিল বহু শতাব্দী পরে। গ্যালেনের সমস্ত পান্ডুলিপি অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনার সঙ্গে সংরক্ষিত ছিল রোমে এসকেলেপিয়াসের মন্দিরের এক সংগ্রহশালায়। ১৯২ খ্রিঃ রোমে এক বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডের ফলে ওই সংগ্রহশালাটিও সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

সৌভাগ্যক্রমে সেই অভিশপ্ত অগ্নিকান্ড থেকে রহস্যজনক ভাবে রক্ষা পেয়েছিল শারীরগঠনতন্ত্র, শরীরবৃত্ত ও রোগ চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত ত্রিশ-বত্রিশটি বই।

এই বইগুলির মাধ্যমেই যুগন্ধর চিকিৎসা বিজ্ঞানী গ্যালেনের প্রতিভার মহামূল্যবান অবদান সম্পর্কে অবহিত হয়েছে উত্তরকাল।

ভগ্নমন ভগ্নশরীরে, ষাট বছর বয়সে গ্যালেন চিরতরে রোম পরিত্যাগ করে ফিরে আসেন তাঁর জন্মভূমি পেরগামাসে। জীবনের শেষ অধ্যায়টি তাঁর সুখকর যে ছিল না, তা অনুমান করতে অসুবিধ হয় না।

অপরিসীম দুঃখ ক্লেশ ও নৈরাশ্যের বোঝা নিয়ে এর পর মাত্র সাত বছর বেঁচে ছিলেন গ্যালেন। ১৯৯ খ্রিঃ তাঁর জীবনাবসান হয়।

ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপস

মানব সভ্যতার আগ্রগতির ইতিহাসে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিকীর্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে সুয়েজ খাল। এই খাল খননের ফলে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে যে যোগাযোগ তৈরি হয়, তা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মধ্যবর্তী কয়েক হাজার মাইল দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছিল।

পুরাণ বা মহাকাব্যের অমিত শক্তিধরর নায়কদের মতো দূরকে নিকট করবার এমন সুসাধ্য কর্মটি সাধিত হয়েছিল কোনও কল্পনাপ্রসূত বীরপুরুষের বাহুবলে নয়।

গভীর আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং ইস্পাতদৃঢ় সংকল্প, সর্বোপরি অসাধারণ বুদ্ধি বলে বলীয়ান এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ ফার্দিনাদ দ্য লেসেপস সুয়েজখালের সৃষ্টি করে পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছেন।

দীর্ঘ কঠিন প্রতিকূলতার বাধা অতিক্রম করে তিনি মানব জাতির দীর্ঘদিনের এক স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। এই অমিতকীর্তি তাঁকে অসামান্য যশ ও খ্যাতির অধিকারী করেছিল।

কিন্তু নিয়তির এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে পৃথিবীজোড়া যশ গৌরব লাভ করেও চূড়ান্ত অখ্যাতি ও অপযশের বোঝা মাথায় নিয়ে তাঁকে একদিন তাঁর প্রিয় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

সুয়েজ খালের চমকপ্রদ ও অবিশ্বাস্য সাফল্যের পর পানামা খাল খননের ব্যর্থতা তাঁর সমস্ত কৃতিত্বকে অপসৃত করে মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিল কলঙ্কের বোঝা।

উনবিংশ শতাব্দীর অনন্যসাধারণ প্রযুক্তিবিদ ফার্দিনান্দ মারিয়া দ্য লেসেপস-এর জন্ম ১৮০৫ খ্রিঃ ১৯ নভেম্বর ফ্রান্সের ভার্সাই শহরের এক রাজভক্ত পরিবারে। তাঁর পূর্বসূরীদের সকলেই ছিলেন রাজকর্মচারী।

তাঁরা যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রতিপালন করে কীর্তিমান হয়েছিলেন।

শিক্ষাপর্ব শেষ করে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ১৮২৫ খ্রিঃ লেসেপসও ফ্রান্সের ভাইস-কনসাল পদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় লিসবনে। সেখানে কিছুকাল কাজ করার পরে তাঁকে একই পদে বদলি করা হয় আলেকজান্দ্রিয়ায়।

নতুন কর্মস্থলে যাওয়ার পথে জাহাজে আকস্মিক ভাবেই তিনি সুয়েজখালের পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন।

দীর্ঘ যাত্রার একঘেয়েমী দূর করার জন্য একটি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন অলসভাবে। এক জায়গায় এসে থমকে গেলেন। সুয়েজ অন্তরীপকে খনন করে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানোর এক পরিকল্পনার উল্লেখ ছিল সেখানে।

১৭৯৭ খ্রিঃ মিশর অভিযান কালে সম্রাট নেপোলিয়নের নির্দেশে লাপের নামে এক প্রযুক্তিবিদ এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন।

রাষ্ট্রনীতি তাঁর চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়েও লেসেপস উৎসাহী ছিলেন। সেই সূত্রেই সুয়েজখালের পরিকল্পনার বিষয়টি তাঁকে আগ্রহী করে তুলল এবং তিনি এই পরিকল্পনার বাস্তবরূপ দেবার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি অনুধাবন করলেন, অদূর ভবিষ্যতে সংকল্প রূপায়নের সুযোগ তিনি অবশ্যই পাবেন। সেই সুযোগ না আসা পর্যন্ত তাঁকে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা কবতে হবে।

সৌভাগ্যক্রমে কর্মসূত্রেই এই সময়ে তাঁর সঙ্গে মিশরের শাসনকর্তা মেহমেত আলির পুত্র মহম্মদ সৈয়দ পাশার পরিচয় হল।

ক্রমে সেই পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

লেসেপসের অজ্ঞাত ছিল না যে সুয়েজ খাল প্রকল্প রূপ দিতে পারলে বিভিন্ন দিক থেকেই মিশর দেশ উপকৃত হবে।

কিন্তু বিষয়টিকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে সময়ের দরকার। তাই সেই সময়ের অপেক্ষাতেই তিনি দিন গুণতে লাগলেন।

আশায় আশায় কাল গুণে একটি একটি করে বছর অতিবাহিত হতে লাগল। এই ভাবে অতিক্রান্ত হল কুড়িটি বছর।

তারপর একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই উপস্থিত হল সেই সুযোগ। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে তা মোটেই সুখপ্রদ ছিল না।

ইতিমধ্যে কায়রোতে লেসেপস কনসাল পদে উন্নীত হয়েছেন।

উজ্জ্বল কর্মজীবন। কিন্তু স্বদেশের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার ঝাপটা সহসা তাঁকেও

বিধ্বস্ত করল। দেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চক্রান্তের শিকার হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হল লেসেপসকে।

চাকরি থেকে অব্যাহতি পেয়ে এবারে তিনি দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন রূপায়নের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন।

ইতিমধ্যে এক আকস্মিক যোগাযোগে সুযোগও এসে গেল। ১৮৫৪ খ্রিঃ তখন তিনি দেশের বাড়িতে, খবরের কাগজে দেখলেন, মিশরেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর বন্ধু মহম্মদ সৈয়দ পাশা শাসন ক্ষমতা লাভ করেছেন।

এই সংবাদে আশায় বুক বাঁধলেন লেসেপস। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে যে স্বপ্ন তিনি দেখে চলেছেন এবার হয়তো তা বাস্তবায়িত করার সুযোগ পাবেন।

সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিন পরেই মহম্মদ সৈয়দ এক চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে আলেজান্দ্রিয়ায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। এর পর আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না তিনি। সেই বছরই ৭ নভেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছলেন। মিশরে নতুন শাসনকর্তা মহম্মদ সৈয়দ পুরনো বন্ধুকে সাদরে বরণ করে প্রাসাদেই তাঁর বসবাসের বন্দোবস্ত করলেন।

সুয়েজ খালের পরিকল্পনা দীঘদিন মনে পোষণ করছেন লেসেপস। এবারে একদিন সুযোগ মতো তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

কূটনৈতিক কাজে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি। নিজের বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয় প্রভাব এ বিষয়ে হতো তাঁর প্রধান সহায়ক।

সুয়েজখাল প্রকল্প রূপায়ণ যে সম্ভব এবং এর ফলে মিশর নানা দিক থেকেই উপকৃত হবে পাশা তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন।

এরপর এই প্রকল্পটিতে পাশার সম্মতি পেতে বিলম্ব হল না। এই ভাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পরিকল্পনা রূপায়নের প্রথম ধাপ উত্তীর্ণ হলেন লেসেপস।

কিন্তু কাজে নামার আগেই অপ্রত্যাশিত বাধা এল ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে। সেই সময় ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন পামারস্টোন। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভা সুয়েজখাল প্রকল্পের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করলেন। এই খাল খননের প্রস্তাবকে তাঁরা পূর্ব গোলার্ধের সমুদ্র পথে ইংলন্ডের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের অবাঞ্ছিত চক্রান্ত বলেই বিবেচনা করছেন। রাজনৈতিক ভাবেই তাঁরা এই কাজে বাধা দেবার সব রকম চেষ্টা করবেন।

আশ্চর্য এই যে, দুঁদে রাজনীতিক পামারস্টোনের প্রসারিত দূরদৃষ্টিতে সেদিন ঘুণাক্ষরেও এমন আভাস ধরা পড়েনি যে, দুই দশকের মধ্যেই সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ ইংলন্ডের রাজক্ষমতার অধীন হয়ে যাবে।

ইংলন্ডের বিরোধিতার মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে লেসেপস জনমত গঠনের

চেষ্টায় ব্রতী হলেন। তিনি লন্ডনসহ ইংলন্ডের বিভিন্ন শহরে ঘুরে সুয়েজ খাল তৈরির সমর্থনে বক্তৃতা করতে লাগলেন।

তাঁর পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট ব্যাখ্যায় ইংলন্ডের সাধারণ মতামত প্রভাবিত হল। মোটামুটি ভাবে জনসমর্থন লাভ করতে পারলেও ব্রিটিশ সরকার কিন্তু প্রকল্পটি বানচাল করার চেষ্টা করে যেতে লাগল।

মিশরের সার্বভৌম শাসনকর্তা তুরস্কের সুলতানের অনুমতি না পেলে এই প্রকল্প রূপায়ন সম্ভবপর ছিল না। কূটকৌশলী ব্রিটিশরাজ সুলতানকে প্রভাবিত করার জন্য লর্ড স্ট্যাটফোর্ড দ্য রেডক্লিফকে অনুরোধ করল। রেডক্লিফ ছিলেন সুলতানের অতি ঘনিষ্ঠ। অবিলম্বেই তিনি মাঠে নেমে পড়লেন।

লেসেপসও বসে থাকেন নি। মিশরের পাশার মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হলেন এবং সুয়েজ খাল খননের প্রয়োজনীয় অনুমতি তিনি পেয়ে গেলেন। এর পর কর্মক্ষেত্রে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন লেসেপস।

প্রথমে তিনি প্যারিসে একটি কোম্পানি গঠন করলেন। তারপর লিনাঁ বে ও মেটগেল বে নামে দুই ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের সহযোগিতায় পোর্ট সৈয়দে সুয়েজ প্রকল্পের কাজ শুরু করলেন। সময়টা ছিল ১৮৫৯ খ্রিঃ ২৫ এপ্রিল।

ইতিহাসের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিকর্ম সুয়েজ খাল খনন। এই সুবিশাল কর্মকান্ডে দৈনন্দিন সমস্যার অন্ত ছিল না। লেসেপস তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে কোন অবাঞ্ছিত বাধা কাজের অগ্রগতিকে বিঘ্নিত না করে।

কিন্তু তখনও ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্ত অব্যাহত ছিল। নানা উপায়ে তারা প্রকল্পের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগল।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ খ্রিঃ লেসেপসের বন্ধু মহম্মদ সৈয়দ অকস্মাৎ মারা গেলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন মহম্মদ ইসমাইল পাশা। তিনি প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখলেও ততটা উৎসাহী ছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষ বাধা এল ইংলন্ডের মাটি থেকেই। বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধ দেখা দিল সেখানে।

লাঙ্কাশায়ারে অবস্থিত ইংরাজদের কাপড়কলগুলিতে তুলোর অভাবে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের ফলেই বস্ত্র শিল্পে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

ইংরাজরা মিল শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে তুলো উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করতে শুরু করেছিল। এর ফলে সুয়েজ প্রকল্পের ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

কাজ শুরুর গোড়ার দিকে নিয়োগ করা হয়েছিল আট হাজার শ্রমিক। কিছুদিনের মধ্যেই সেই সংখ্যা কুড়ি ছাড়িয়ে চল্লিশ হাজারে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াল আশি হাজার। এদের অধিকাংশই ছিল মিশরীয়। শর্ত অনুযায়ী এদের কাজে যোগ দেওয়াটা ছিল বাধ্যতামূলক।

কিন্তু ইংলন্ডে বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ উপস্থিত হলে, প্রকল্পের শ্রমিকদের মধ্যেও তার প্রভাব সঞ্চারিত হল। বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতির ফলে সুয়েজ খাল কাটার কাজ দু বছর বন্ধ রাখতে হল।

লেসেপস কিন্তু বাধার কাছে হার মানলেন না। অদম্য ছিল তাঁর সাহস ও মনোবল। তিনি যন্ত্রের সাহায্যে খাল কাটার কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখনকার মতো যান্ত্রিক প্রযুক্তি সেকালে এত উন্নত ছিল না। সেদিক থেকে চরম সংকটের মুখে লেসেপসের গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল অতিমানবীয়।

যাইহোক বাধার পর বাধা অতিক্রম করে দশ বছরের সুকঠিন পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে ১৮৬৯ খ্রিঃ সুয়েজখাল খননের কাজ সম্পূর্ণ হল।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন হল খাল উদ্বোধনের জন্য। দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হলেন। এই উপলক্ষে মিশরে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রুশিয়ার যুবরাজ, অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রমুখ।

প্রধান সম্মানীয় অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন তৃতীয় নেপোলিয়নের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী ইউজিন।

বন্দরে উপস্থিত ছিল সুসজ্জিত রাজকীয় নৌবহর। সেই সঙ্গে আমন্ত্রিত দেশগুলির রণতরী।

১৮৬৯ খ্রিঃ ১৬ নভেম্বর মুহুর্মুহু তোপধ্বনি ও অসংখ্য কামানের গর্জনের মধ্যে দিয়ে মিশরের শাসনকর্তা ইসমাইল পাশা সরকারি ভাবে নবনির্মিত সুয়েজ খালের জলপথ উদ্‌ঘাটন করলেন।

পরদিন সম্রাজ্ঞী ইউজিনকে নিয়ে একখানি জাহাজ পেছনে ৬০ টি জাহাজের বহর নিয়ে নির্বিঘ্নে খালপথ অতিক্রম করে প্রথম সুয়েজ যাত্রা সম্পূর্ণ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে আধুনিক প্রযুক্তি কৌশলের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ঘটনা চিরস্মররণীয় হয়ে রয়েছে।

সেই সঙ্গে অমরত্ব লাভ করলেন এই অবিশ্বাস্য প্রকল্পের সার্থক রূপকার হিসাবে ফার্দিনান্দ মারিয়া দ্য লেসেপস।

সুয়েজ খালের সংযুক্তির মাধ্যমে ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগরের ব্যবধান ঘুচল চিরকালের মতো, হাজার হাজার মাইল দূরত্ব ঘুচিয়ে নিকটতর হল পূর্ব ও পশ্চিম দুই গোলার্ধ।

উল্লেখ করা দরকার যে সুয়েজ খাল নির্মিত হওয়ায় ভারতের মুম্বই বন্দর ও ইংলন্ডের দূরত্ব পাঁচ হাজার মাইল কমে গেল।

সুয়েজ খালের সার্থক রূপায়ন লেসেপসকে সম্মান যশ ও খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত করল। দেশে দেশে তাঁর জয় জয়কার ঘোষণা হতে লাগল। গর্বে আনন্দে অভিভূত আপ্লুত হলেন লেসেপস বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ করে।

সুয়েজখালের কাজ শেষ হলে দিগ্‌বিজয়ী বীরের সম্মান প্রশস্তি ও অভিনন্দনের মধ্যে ফ্রান্সে ফিরে গেলেন তিনি।

কিন্তু ভাগ্যদেবতার কুটিল ভ্রূকুটি অচিরেই যে তাঁর খ্যাতির সৌধ চূর্ণবিচূর্ণ করার আয়োজন করেছে, তা যদি তিনি জানতে পারতেন, তাহলে হয়তো জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর অখ্যাতির কলঙ্কে বিষময় হত না।

প্যারিসের জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি পানামা খাল খননের প্রকল্প হাতে নিল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রকল্প রূপায়নের পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল লেসেপসের হাতে।

লেসেপস পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, এবারেও তিনি সফল হবেন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁকে মধ্যমণি করে এই প্রকল্পের জন্য কোম্পানি গঠন করা হল।

গোটা ফ্রান্সের হাজার হাজার বিনিয়োগকারী এই কোম্পানিতে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে এল।

টানা দু বছরের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে ১৮৮১ খ্রিঃ পানামা খাল খননের কাজ শুরু হল। কাজ চলতে লাগল পূর্ণ উদ্যমে।

কিন্তু এবারে লেসেপসের ভাগ্য ছিল বিরূপ। টানা আট বছর কাজের পরে সাফল্য তো দূরের কথা সমস্ত চেষ্টাই বানচাল হয়ে গেল।

এই যাত্রায় লেসেপস যাদের নিয়ে কাজে নেমেছিলেন এই দীর্ঘ ব্যয়বহুল প্রকল্পটিকে তারা অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে রূপান্তরিত করেছিল। বিশেষ করে প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের অবাধ তহবিল তছরূপের ঘটনা গোটা প্রকল্পটির ভরাডুবি ঘটিয়েছিল।

প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের জন্য লাগামহীনভাবে কোম্পানির অর্থ ব্যয় করা হত, তার বেশির ভাগটাই যেত জলে। একবার তো অপ্রয়োজনীয় জেনেও দশ হাজার বরফ সাফাইয়ের বেলচা কেনা হয়েছিল।

ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মীদের কাজে কোনও গাফিলতি ছিল না। তারা সকলেই প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করে গেছেন। কিন্তু সকলের সব পরিশ্রমই ব্যর্থ করে দিয়ে ছিল প্রশাসনিক কর্তারা।

এই প্রকল্পের ব্যর্থতাকে লেসেপসের ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যায়। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর ইত্যাদি নানা রকম রোগের প্রকোপ আকস্মিক ভাবে

কাজের জায়গাতে এতটাই বেড়ে উঠেছিল যে হাজার হাজার কর্মী অকালে প্রাণ হারিয়ে প্রকল্পের কাজে বার বার বাধার সৃষ্টি হল।

এককথায় বলা চলে নজিরবিহীন দায়িত্বহীনতা, অর্থলোলুপতা, শঠতা, নোংরা রোগের প্রকোপ সর্বোপরি নৈতিক নীচতা পানামা প্রকল্পটিকে দুঃখজনক ভাবে বানচাল করে দিয়েছিল।

পানামায় কাজের নামে যা চলছিল সে সম্পর্কে সম্ভবত লেসেপস সঠিক ভাবে খবরাখবর পেতেন না। কেননা, বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে প্যারিসে থেকে অর্থনৈতিক দিকটি সামাল দিতে হত।

পানামার সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখা বা খবর নেবার সময় এক রকম পেতেন না বললেই চলে।

তবে পরিকল্পনার একটি দিকে তাঁর সিদ্ধান্তের ত্রুটিও ছিল মারাত্মক।

পানামা খাল খননের পথে প্রধান বাধা ছিল কুলেব্রা ও কাজরেম নামে দুটি পাহাড় ও নদী। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য লকগেট তৈরি অপরিহার্য ছিল। কিন্তু সুয়েজের সাফল্যে লেসেপস এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করেননি।

শেষ পর্যন্ত 'লক' তৈরির প্রয়োজন বুঝতে পেরেও তিনি নিজের মত বদল করেননি। পরে অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, এই ভুল সিদ্ধান্তের ফলেই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে এবং চিরদিনের জন্য তাঁর সম্মান ধুলোয় লুটিয়েছিল।

১৮৮৮ খ্রিঃ প্রকল্পের কাজ যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন দেনার দায়ে কোম্পানি দেউলিয়া। দেনার পরিরমাণ ছিল আট কোটি পাউন্ড। লেসেপসের সুয়েজ প্রকল্পের সাফল্যের আকর্ষণে যত বিনিয়োগকারী, তাদের সংখ্যা অন্তত কয়েক হাজার, মোটা লাভের আশায় পানামা প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছিল, রাতারাতি পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছিল তারা।

পরে দেখা যায়, যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খাল কাটার কাজে ব্যয় হয়েছিল, তার দুই তৃতীয়াংশই তছরূপ হয়েছে। প্রকৃত কাজে ব্যয় হয়েছিল মাত্র এক তৃতীয়াংশ। দুঃখের বিষয় এটাই যে এমন পুকুর চুরির ঘটনার নজির সারা পৃথিবীতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

এই ব্যর্থ প্রকল্পের জন্য ফরাসী সরকারকে রাজনৈতিক ভাবেই বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল। বিরোধীদলের সদস্যরা সরকারী নীতি ও অর্থ অপচয়ের ঘটনাটিকে দেশবাসীর সামনে এমন ভাবে তুলে ধরতে লাগল যে অপদস্থ সরকার শেষ পর্যন্ত প্রকল্প বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিতে বাধ্য হলেন।

লেসেপস, তাঁর পুত্র এবং সহকারিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানো হল। আদালতের বিচারে অর্থ জরিমানা সহ পাঁচ বছরের জন্য কারাবাসের দন্ড

দেওয়া হল লেসেপসকে। তবে সৌভাগ্য এটুকু যে তাঁকে কারাবাস ভোগ করতে হয়নি শেষ পর্যন্ত।

নানা কারণে দন্ডাদেশ কার্যকর করা স্থাগিত রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৮৯৪ খ্রিঃ ৭ডিসেম্বর আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সুয়েজ খালের মতো পানামা প্রকল্পেও প্রতিভার চমক রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন লেসেপস। পানামায় যতটুকু কাজ তিনি করেছিলেন, গুণগত বিচারে তা ছিল অসাধারণ।

পরবর্তীকালে আমেরিকান প্রযুক্তিবিদদের চেষ্টায় পানামা প্রকল্প সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়েছিল। আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন, লেসেপসের পথ ধরেই তাঁরা এক রকম নির্বিঘ্নে সফল হতে পেরেছেন এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁরা লেসেপসের প্রায়োগিক প্রতিভার প্রশংসা করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে লেসেপস ছিলেন সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ। তাঁর সম্মানবোধ, ব্যক্তিত্ব ও মার্জিত ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করত। সমস্ত মানবিক গুণের সমাবেশে তাঁর চরিত্র ছিল মাধুর্যমন্ডিত।

লেসেপসের জীবনের স্বপ্ন ছিল একটাই—সুয়েজ খাল নির্মাণ করবেন এবং সেই স্বপ্ন তিনি সার্থক ভাবে রূপায়ন করতে পেরেছিলেন।

সুয়েজ প্রকল্পের কাজে প্যারিসের ধনী ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে কোম্পানি গঠন করে অনায়াসেই পাহাড় প্রমাণ অর্থের মালিক হয়ে যাবার সুযোগ তাঁর ছিল। কিন্তু তেমন হীন আত্মস্বার্থ চিন্তার কখনো তাঁর মনে উদয় হয়নি।

দশচক্রে চরম ব্যর্থতার গ্লানি তাঁর নামে কলঙ্ক লেপন করলেও মহাকালের বিচারে অসামান্য প্রতিভাধর কর্মযোগী হিসাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে লেসেপসের নাম চির অমরত্ব লাভ করেছে।

মারসেলো মালপিজি

ইটালির দক্ষিণ অঞ্চলের বোলগনা শহরে এক বিত্তবান পরিবারে ১৬২৮ খ্রিঃ মারসেলো মালপিজির জন্ম। আট ভাইবোনের মধ্যে মারসেলো ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ।

ধনী পরিবারে আদর যত্ন ও শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না। মারসেলো ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে বড় হয়ে ওঠেন। স্নেহ দয়া মায়া ইত্যাদি সব মানবিক গুণ তাঁর চরিত্রকে মাধুর্যমন্ডিত করেছিল।

গরীব দুঃখীর দুঃখকষ্ট দেখলে খুবই বিচলিত হয়ে পড়তেন তিনি এবং যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। পরিচিত মহলে এবং পরিবারে সকলেই অত্যন্ত ভালবাসতো তাঁকে।

মারসেলোর যখন একুশ বছর বয়স, ১৬৪৯ খ্রিঃ মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে মা বাবা দুজনেই আকস্মিক রোগভোগে মারা গেলেন।

শোক সামলে ওঠারও সময় পেলেন না মারসেলো, নিজেই জ্বরে শয্যাশায়ী হলেন। পরে ভাইবোনেরাও একে একে বিছানা নিতে লাগল। তাঁর প্রাণান্ত চেষ্টায় ধীরে ধীরে সকলেই এক সময় সুস্থ হয়ে উঠল।

বাবা-মায়ের অবর্তমানে পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে সব দায়িত্ব চাপল এখন থেকে মারসেলোর কাঁধে। সব দিক সামাল দিতে দিতে এই সময়েই তাঁর মনে ডাক্তারিবিদ্যা শেখার সঙ্কল্প জেগে ওঠে। মা-বাবার ও পরে ভাইবোনেদের অসুস্থতার সময় তিনি উপলব্ধি করেছেন, রোগজ্বালার কাছেই মানুষ সবচেয়ে বেশি অসহায়। ডাক্তারের উপযুক্ত ফি যারা যোগাতে পারে না, রোগের হাতে তাদের প্রাণ হারানো ছাড়া উপায় থাকে না। অসুস্থ মানুষের এই অসহায়তা তাঁর সংবেদনশীল মনে আলোড়ন তুলল। সেই সময়েই মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার বৃহত্তর লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ডাক্তারি পাড়ার সঙ্কল্প নিলেন এবং তেইশ বছর বয়সে ভর্তি হলেন বোলগনা বিশ্বদ্যিালয়ে চিকিৎসা বিভাগে।

সহজাত প্রতিভা বলে অল্প আয়াসেই মারসেলো চিকিৎসা বিদ্যার নানা বিষয় আয়ত্ত করে ফেলতে লাগলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগের দুঁদে অধ্যাপক মাসারি।

সেই সময়ে শারীরবিদ্যার ধন্বন্তরি হিসাবে মাসারির নামডাক সারা ইউরোপ জুড়ে। প্রতিভার বিচার করায়ও তিনি ছিলেন পাকা জহুরী। তাই নিজের সান্নিধ্যে রেখে নানাভাবে তিনি মারসেলোকে সাহায্য করতে লাগলেন।

আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার মূল্যবান সব বইয়ের সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রের বহু প্রাচীন পুঁথিও মাসারির ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। তিনি মারসেলোকে স্বাধীনভাবে সেই লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ দিলেন। মারসেলো ডুবে গেলেন সেসব বইয়ের মধ্যে।

ধীরে ধীরে এক নতুন জগৎ উদ্ভাসিত হতে থাকে তাঁর সামনে। এখানেই তিনি পরিচিত হতে থাকেন ভেসালিয়াস, ফাব্রিজিও, হারভের মতো প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে।

তাঁদের কষ্টসাধ্য গবেষণার ইতিহাসের খুঁটিনাটি পড়ে তাঁর মনেও অঙ্কুরিত হতে থাকে সুপ্ত স্বপ্ন। তিনি স্থির করেন, পূর্বসূরীদের মতো গবেষণা করে

তিনিও চিকিৎসাবিদ্যাকে নতুন নতুন আবিষ্কারে সমৃদ্ধ করবেন, মানব জাতির কল্যাণে উৎসর্গ করবেন সমস্ত সাধনা।

লাইব্রেরীতে যাতায়াতের সূত্রে মারাসেলো পরিচিত হলেন মাসারির ছোট বোনের সঙ্গে। শেষ অবধি এই পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় প্রতিভা মারসেলো, মাসারি তাঁদের বিয়েতে সানন্দে সম্মতি জানান।

মারসেলোর বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁর গবেষক জীবনের সকল পর্বেই প্রেমময়ী স্ত্রী অনির্বাণ প্রেরণার প্রদীপটি নিয়ে তাঁরে পাশে থেকেছেন।

১৬৫৩ খ্রিঃ পঁচিশ বছর বয়সে ডাক্তারি পাস করে মারসেলো বোলগানা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. হলেন।

সেইকালে চিকিৎসাবিভাগের ছাত্রদের শেষ পরীক্ষায় একটা থিসিস জমা দেবার নিয়ম ছিল। যথারীতি মারসেলোও থিসিস জমা দিলেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল মনীষী হিপোক্রেটিসের অবদান ও পরবর্তী যুগে তাঁর প্রভাব।

গ্রীক মনীষী হিপোক্রেটিসকে বলা হয় পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিদ্যার জনক। প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যায় প্রথম তিনিই বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোকপাত করেছিলেন।

ডাক্তার হয়ে বেরবার তিন বছরের মাথায় মাসারির তৎপরতায় মারসেলো পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে লেকচারার পদে কাজ পেয়ে যান।

শিক্ষক হিসেবে অল্প দিনের মধ্যেই ছাত্রমহলে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মারসেলো।

সেই সময়ে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতবিভাগের দায়িত্বে ছিলেন গ্যালিলিওর সাক্ষাৎ ছাত্র গিওভানি বোরেলি। গ্যালিলিওর কাছ থেকেই তিনি শিখেছিলেন নানা প্রকৃতির লেনস ঘষে মসৃণ করে অণুবীক্ষণ হিসেবে ব্যবহার করার কায়দা। এই যন্ত্রটির চিন্তা মাথায় থাকলেও তার সম্পূর্ণ রূপ গ্যালিলিও জীবিতকালে দিয়ে যেতে পারেননি।

গণিত অধ্যাপক বোরেলি গুরুর প্রারব্ধ কাজটি সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে নিভৃতে গবেষণা কাজ চালাচ্ছিলেন। সেই সন্ধিক্ষণেই মারসেলোর আগমন ঘটে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

দুই প্রতিভা কাছাকাছি হতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং লেন্সের কার্যকারিতা বিষয়ে প্রথম জানতে পারেন মারসেলো। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের স্বপ্ন তাঁর মাথাতেও সঞ্চারিত হয়।

তিনি ভাবতে থাকেন, এমন একটি যন্ত্র যদি নাগালে পাওয়া যায় তাহলে

শরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোষগুলিকে সনাক্ত করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর ঘটাতে পারবেন।

ইতিপূর্বে মাসারির লাইব্রেরিতে হারভের গবেষণাপত্র তাঁর চোখে পড়েছিল। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন, শরীরের অণু আকৃতির তন্ত্রগুলোকে পর্যবেক্ষণের অভাবে হারভেকে অনেক গুরুতর সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ রাখতে হয়েছে। বিশেষ করে রক্তের সঞ্চালন আবিষ্কারে সমর্থ হয়েও কি উপায়ে সংখ্যাহীন সূক্ষ্ম প্রণালী-পথে রক্ত সংবাহিত হয় তা তিনি ধরতে পারেননি।

মারসেলোর এই চিন্তার সূত্র ধরেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে শারীর গবেষণার উপায় উদ্ভাবনের সূচনা হল।

মারসেলো যুক্ত হয়ে গেলেন বোরেলির সঙ্গে। লেন্স ঘষে ঘষে মসৃণ করে তা দিয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিস দেখার আনন্দে মেতে গেলেন দুজনে। এভাবে শরীরের বহু সূক্ষ্ম রহস্য তাঁদের চোখে ধরা পড়তে লাগল। হারভের বহু প্রশ্নেরও মীমাংসা এভাবে উদ্ধার হয়ে গেল।

এরপর মারসেলো ও বোরেলি যৌথভাবে হৃদপিণ্ডের পেশীর পরিচয় নির্ধারক একটি অসামান্য গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন।

মারসেলোর জীবনে নতুন নতুন আবিষ্কারের সূত্রপাত এভাবেই ঘটল। পড়ানোর সময়টুকু বাদে দিনরাতের অধিকাংশ সময় তিনি ডুবে রইলেন গবেষণায়।

কিন্তু পরিবার পরিজন থেকে দূরে, বিশেষ করে অভিভাবকহীন ভাইবোন ও প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে করে প্রায়ই উন্মনা হয়ে পড়তেন মারসেলো। জন্মভূমি থেকে দূরে এই একাকীত্ব তাঁকে নির্বাসনের পীড়া দিতে লাগল।

শেষে এতটাই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন যে, বছর তিনেক পরে ১৬৫৯ খ্রিঃ পিসার কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন বোলগনায়। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ি ফেরার একমাসের মাথায়ই বোলগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানাটমির অধ্যাপকের পদে কাজও পেয়ে গেলেন!

এবারে আর পিছুটানের বাধা ছিল না। তাই নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় তিনি পড়ানোর কাজের পাশাপাশি গবেষণার কাজ শুরু করলেন। পিসায় যে কাজ অসম্পূর্ণ রেখে এসেছিলেন, মসৃণ লেন্স ধরে ধরে শরীরের নানা কোষকলার গঠন পর্যবেক্ষণ, এখানে সেই কাজেই নিমগ্ন হলেন।

মারসেলো গ্যালিলিওর দেখানো পথে মসৃণ লেন্স ধরে সূক্ষ্ম জিনিস দেখার যে কাজটা করছিলেন, তা ছিল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ। কিন্তু সূক্ষ্ম জীবাণু পর্যবেক্ষণের উপযোগী অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছিল তারও বহু পরে। তবে একথা সত্যি অণুবীক্ষণকে বিজ্ঞানের কাজে লাগাবার প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন মারসেলো।

একদিন লেন্স ধরে ব্যাঙের ফুসফুস দেখতে বসে একে একে Alveole বা বায়ুথলি, বায়ুথলির ঝিল্লীময় দেয়াল পরীক্ষা করতে করতে এক মারসেলো অদ্ভুত দৃশ্য আবিষ্কার করে বিস্ময়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

তিনি দেখলেন, বায়ুথলির ঝিল্লী বেয়ে রক্তের সঙ্গে ঢুকছে অক্সিজেন আর বেরিয়ে যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড।

প্রাণীদেহের শ্বসন ক্রিয়া বা Respiration-এর এই আকস্মিক আবিষ্কার মারসেলোকে উত্তেজিত করে তোলে।

তারপর থেকে তিনি ফুসফুসের টিসু নিয়ে পরীক্ষা করতে বসে ক্রমে লক্ষ্য করেন রক্তনালীর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম গঠন যা ফুসফুসের বাইরে ও মূত্রথলি ও কিডনিতে প্রসারিত।

১৬২৮ খ্রিঃ হারভে প্রাণপাত করেও রক্তসঞ্চালনের যে কলাকৌশলের সন্ধান পাননি, মাত্র চার বছর পরে মারসেলো তা আবিষ্কার করে ফেলেন সমৃণ লেন্সের কারিকুরি মারফত। জেনে গেলেন কি প্রক্রিয়ায় রক্ত ধমনী থেকে শিরার দিকে প্রবাহিত হয়।

এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটির সংবাদ একটি চিঠি মারফত মারসেলো প্রথম জানালেন পিসায় অঙ্কের অধ্যাপক বোরেলিকে। সময়টা ১৬৬১ খ্রিঃ।

সহৃদয় বোরেলির উদ্যোগে খবরটা ইতালির বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। আলোড়ন উঠল শারীরবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের মধ্যে।

বোরেলির অনুরোধ পেয়ে পিসায় উপস্থিত হলেন মারসেলো। সকলের সামনে পরীক্ষা করে দেখালেন রক্ত সংবহনের অজানা সব নতুন পথ।

মারসেলোর জীবনের সব চেয়ে বড় এই আবিষ্কার তাঁকে রাতারাতি বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে দিল। সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।

নীতিহীন মানুষের নির্লজ্জ নীচতা যে কী মর্মান্তিক হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানী মারসেলোর দুঃখময় জীবন। শারীর বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কারের গৌরবে মারসেলো যখন যশ খ্যাতির শিখরে অধিষ্ঠিত সেই সময়েই অপ্রত্যাশিত আঘাত এল তাঁর জন্মভূমি বোলগনা থেকে। স্বার্থান্ধ ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশীর অসূয়া অভাবিত পথে তাঁর জীবনকে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত করে দিল।

বোলগনায় প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির সূত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল দুটি পরিবার—মালপিজি ও বারাগলিয়। একটি সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে এই দুই পরিবারের বিবাদ গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত। আদালতের রায়ে সেই সম্পত্তির মালিকানা বর্তেছিল মালপিজিদের হাতে।

মামলা নিষ্পত্তি হলেও দুই পরিবারের বিবাদ কিন্তু ধূমায়িতই ছিল। সম্পত্তি হারানোর প্রতিহিংসায় বারাগলিয়রা চরম শত্রুতা সাধনের সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণছিল।

মালপিজি পরিবারের সন্তান মারসেলোর খ্যাতি যখন বোলগনা শহরের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল, সেই সময়ে পুরনো প্রতিহিংসার জের টেনে সক্রিয় হয়ে উঠল দুষ্কৃতিরা। তারা কৌশলে অপপ্রচারে নেমে সারা শহরে মারসেলোর নামে কুৎসা ছড়িয়ে দিতে লাগল।

শহরের মানুষ জেনে গেল বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে মারসেলো একজন ঠগ জোচ্চোর ছাড়া কিছু নয়।

অন্য এক হতভাগ্য বিজ্ঞানীর গবেষণা চুরি করে নিজে তার সুখ্যাতি আত্মসাৎ করেছে। বারাগলিয়রা এতটাই বলে বেড়াল যে দরকার হলে তারা এই ঘৃণ্য চৌর্যের প্রমাণ দাখিল করতে প্রস্তুত।

মিথ্যা রটনা হলেও শহরের মানুষ কিন্তু অবিশ্বাস করল না। তারা বারাগলিয়দের সুরে গলা মিলিয়ে ধিক্কার দিতে লাগল মারসেলোকে।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া একে আর কী বলা যায়। সমস্ত ঘটনাই মারসেলোর কানে পৌঁছল। কিন্তু এই হীন চক্রান্তের জবাব না দিয়ে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করলেন তিনি। স্বভাব লাজুক মানুষটির এই নীরবতাই শত্রুপক্ষের মিথ্যা রটনাকে সত্য করে তুলল। কুৎসা অপবাদ লোকমুখে আরো জোরদার হয়ে উঠল।

এই ঘটনায় মারসেলো মানসিকভাবে এতটাই ভেঙ্গে পড়লেন যে তিনি স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি হয়ে রইলেন। গুরু মাসারির বাড়িতে চার বছর আত্মগোপন করে থাকলেন।

ততদিনে শরীরে বার্ধক্য নেমেছে। বয়স দাঁড়িয়েছে আটাত্তর। শরীরে মনে ক্লান্তি। মাসারি স্বয়ং, সেই সঙ্গে স্ত্রী প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাঁর মনে শক্তি যোগাতে।

চার বছরের মাথায় অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক এলো লন্ডনের রয়াল সোসাইটি থেকে। চিঠি পাঠিয়ে তাঁরা অনুরোধ জানাল, তাঁর আবিষ্কৃত রক্ত বহন সংক্রান্ত বিষয়টি তাদের পত্রিকায় বিশদভাবে তুলে ধরার জন্য।

চিঠি পেয়ে জড়তা ভেঙ্গে আবার জেগে ওঠেন হতভাগ্য গবেষক বিজ্ঞানী মারসেলো। অনতিবিলম্বে তাঁর গবেষণার বিষয় প্রবন্ধের আকারে পাঠিয়ে দিলেন রয়াল সোসাইটিতে। সেই প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল।

সেই সময় নিজের হাতে অণুবীক্ষণ বানিয়ে কিছু কিছু কাজ করছিলেন বিজ্ঞানী রবার্ট হুক। তিনি আবার সোসাইটির একজন গণ্যমান্য সদস্য।

মারসেলোর প্রবন্ধ পাঠ করে অভিভূত হলেন তিনি। বললেন, এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের জগতে এক সুদূরপ্রসারী পথ খুলে দেবে। পঞ্চমুখে প্রশংসা করে তিনি চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন মারসেলোকে।

রবার্ট হুকের পত্র লোকলজ্জায় মুহ্যমান মারসেলোর জীবনে জীবনদায়ী টনিকের কাজ করে। সমস্ত গ্লানি সরিয়ে ফেলে তিনি আবার নতুন প্রাণশক্তিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ চার বছর পরে আবার এসে বসেন গবেষণার টেবিলে।

১৬৬৮ খ্রিঃ মারসেলোর গবেষণাকে প্রথম স্বীকৃতি জানালো রয়াল সোসাইটি। লন্ডন থেকে এক বার্তায় তাঁকে জানানো হল নতুন আবিষ্কারের স্বীকৃতি জানিয়ে সোসাইটি তাঁকে মাননীয় সদস্য নির্বাচিত করেছে। রয়াল সোসাইটি সেবারই সর্বপ্রথম একজন বিদেশীকে সদস্য নির্বাচিত করে সম্মান জানাল। নিঃসন্দেহে মারসেলোর জীবনে এ এক গৌরবময় ঘটনা।

এরপর থেকে দিনে দিনে রয়াল সোসাইটির সঙ্গে মারসেলোর সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছে। সে সম্পর্ক তিনি অটুট রেখেছিলেন আজীবন, প্রতিটি গবেষণার বিষয়ের বিবরণ নিয়মিত তাদের পাঠিয়েছেন।

এরপর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের গঠন ও রূপান্তর নিয়ে এক যুগান্তকারী গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। ১৬৬৯ খ্রিঃ তিনি গুটিপোকার শ্বসনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র নিয়ে দীর্ঘ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার ফলাফল পাঠিয়ে দেন সোসাইটিকে। এই প্রবন্ধে তিনি গুটিপোকার গঠন ও রূপান্তর আলোচনায় তুলে ধরলেন, কিভাবে ট্রাফিয়া বা রুপোলী বায়ুনল বুক ও পেট থেকে বায়ু টেনে নিয়ে শরীরের নানা অংশে ছড়িয়ে দেয়। সেই সঙ্গে তিনি চিত্র সাহায্যে দেখিয়ে দেন. মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র ও উদর সম্পর্কিত স্নায়ুকান্ড এবং এর মাধ্যমে শরীরের বাইরের স্নায়ুতন্ত্রের যোগাযোগে কিভাবে শরীরের নানা অংশে স্নায়বিক শক্তি সঞ্চারিত হয়।

গুটিপোকার পৌষ্টিক নলের বর্ণনার সঙ্গে excretory tubule বা সংযোগকারী নিঃসারক নলটির বিষয়ও তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন যা পরবর্তীকালে তাঁর নামেই চিহ্নিত করা হয় 'মালপিজির নল' নামে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র বাজারে চালু হবার অনেক আগেই অসাধারণ ধৈর্য, বুদ্ধি ও কঠোর পরিশ্রমে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় মারসেলো কীটপতঙ্গের শরীরের অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ তুলে ধরেছেন।

শারীরবিদ্যার বহুতর অজানা রহস্য উদঘাটনের পরে মারসেলো তাঁর গবেষণার দিক পরিবর্তন করেন। উদ্ভিদজীবনের অজানা জগতকে তিনি গবেষণায় ধরবার চেষ্টা করেন।

নানা গাছের নানা আকার আকৃতির পাতা নিয়ে চলে প্রথমে পরীক্ষা। মসৃণ লেন্সের আলোয় ধরা পড়তে থাকে নানা আকারের পাতার গঠনের বৈচিত্র্য।

পাতার উপরত্বকে থাকে পত্ররন্ধ্র, যার মাধ্যমে চলে গাছের সালোকসংশ্লেষ বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ, সর্বপ্রথম মারসেলোই তা সনাক্ত করেন। তাবে সেই সবুজ কণা, যাকে আমরা বর্তমানে ক্লোরোফিল নামে একডাকে চিনতে পারি, দিনের পর দিন তাঁর নিজস্ব পরকলা লেন্সের তলায় ধরেও কিন্তু মারসেলো তার পরিচয় নির্ধারণ করতে পারেননি।

তবে এই সবুজকণার দ্বারাই যে গাছ তার আহার্য প্রস্তুত করে এবং জীবনী শক্তি অটুট রাখে তা তিনি বুঝতে পারেন।

এভাবে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে তিনি লেখেন প্লান্ট অ্যানাটমি নামে একটি বই। তাঁর এই বইটিই আধুনিক উদ্ভিদবিদ্যার পথ প্রথম উন্মোচিত করে।

শরীরের রহস্য নিয়ে গবেষণা করতে করতেই জীবনের জটিল রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হন মারসেলো। প্রকৃতির রাজ্যে জীবনের উৎস কোথায়, কিভাবে তার বিকাশ ঘটে এই চিরন্তন প্রশ্নের সম্মুখীন হন মারসেলোই প্রথম। আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা ডি. এন. এ-র তত্ত্ব দিয়ে জীবনের বিকাশকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু জীবনের উৎস আজও রয়েছে অধরা।

তিনশত বছর আগে মারসেলোও কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধানে কম ক্লান্ত হন নি। মুরগীর ডিমে তাপ প্রয়োগ করে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন জীবনের ক্রমবিকাশের রূপটি।

তারপর ১৬৭৩ খ্রিঃ গবেষণার ফলাফল নিয়ে মারসেলো লেখেন দুটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, ডিমের হলুদ অংশের অস্বচ্ছ গোল দাগগুলোই তাপ পেয়ে ক্রমশ পালক সহ মুরগীর শরীরে রূপান্তরিত হয়। ভ্রূণ ঘটিত আরও যেসব তথ্য প্রবন্ধ দুটিতে তিনি দিয়েছেন, আধুনিক জীব বিজ্ঞানীরাও তা অস্বীকার করতে পারেননি।

বস্তুতঃ মারসেলোর হাত ধরেই সেই সতেরো শতকের মধ্য পর্বে আধুনিক ভ্রূণ বিদ্যার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

ভ্রূণবিদ্যার কাজ নিয়ে মগ্ন থাকার মধ্যেই মারসেলো শরীরের আণুবীক্ষণিক গঠন নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। তারপর ত্বক, জিহ্বা, যকৃৎ ও পিত্ত প্রভৃতির কাজ, মেরুদণ্ডের সংলগ্ন সুষুম্নাকাণ্ডের তন্তুপথ, মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের গঠন প্রভৃতি বিষয়ে একটার পর একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে থাকেন রয়াল সোসাইটিতে।

আণুবীক্ষণিক জীববিদ্যা নিয়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য দিয়ে গেছেন মারসেলো, যা আধুনিক বিজ্ঞান শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েছে। তাঁর আবিষ্কৃত একটি স্তরের আধুনিক বিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছেন, মালপিজিয়ান লেয়ার

নামে। আবার কিডনি ও প্লীহার কিছু জটিল কণারও নামকরণ তাঁর নামে করা হয়েছে।

তাঁর এক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় আর বিজ্ঞানীদের চমক সৃষ্টি করে। দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের প্রশংসা নিয়ে তাঁর কাছে আসতে থাকে একের পর এক চিঠি।

এই সাফল্য, গগনচুম্বী খ্যাতিলাভ করলেও জন্মভূমি বোলগনার কুৎসার জ্বালা তাঁকে অহরহ দগ্ধ করতে থাকে। চরম অশান্তির জ্বালা নীরবেই সহ্য করেন, কোন প্রতিবাদের কথা মনে আসে না। এরই মধ্যে দিয়ে আসে দুর্বার শত্রুপক্ষের চরম আঘাত।

বরাগলিয়দের দল মুখোশে মুখ ঢেকে একদিন তাঁর বাড়িতে ঢোকে ডাকাত হয়ে। গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে,গবেষণার কাগজপত্র, বই, পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ধ্বংস করে আক্রোশ মিটিয়ে বিদায় নেয় তারা। আগন্তুকদের চিনতে ভুল হয় না মারসেলোর।

কিন্তু এ নিয়ে, শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের অনুরোধ সত্ত্বেও অপরাধীদের মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টা করেননি। সব হারিয়েও একটিও প্রতিবাদ কোনদিন উচ্চারণ করেননি তিনি। যা ঘটেছে তাকে মেনে নিয়ে তীব্র অভিমানে ১৬৯১ খ্রিঃ এক গভীর রাতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চিরদিনের মতো জন্মভূমি পরিত্যাগ করে চলে যান রোমে।

ডাক্তারি পাসের সার্টিফিকেটটি সঙ্গেই ছিল। তাই সম্বল করে জীবনে গবেষণার পাট চুকিয়ে বসে যান রোগীর চিকৎসা করতে।

তিন বছর চিকিৎসক জীবন যাপন করে রোমের মাটিতে শান্তির সন্ধান করেছেন মারসেলো। তারপর ১৬৯৪ খ্রিঃ চিরতরে বিদায় নেন পৃথিবী থেকে।

যোসেফ প্রিস্টলি

ইংলণ্ডের ফিল্ড হেড শহরে এক দরিদ্র তন্তুবায় পরিবারে ১৭৩৩ খ্রিঃ ১৩ মার্চ যোসেফ প্রিস্টলি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে বাবা মা দুজনকেই হারান। অনাথ বালকের দায় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন তাঁর এক পিসিমা।

পিসিমার আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল না। তবু তাঁর হৃদয়টি ছিল স্নেহ দয়া মায়ায় ভরা। তাঁরই স্নেহ যত্নে বড় হতে থাকেন প্রিস্টলি।

পিসিরা ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। যে মত প্রবর্তন করেছিলেন মহান চিন্তানায়ক মার্টিন লুথার। খ্রিস্টান সমাজের প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিক সম্প্রদায় ধর্মের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। মার্টিন লুথার প্রবর্তিত মতাদর্শ ছিল উদারপন্থী, প্রাচীন পন্থার বিরোধী। তাঁর অনুগামীরা ছিল আড়ম্বরহীন, সহজ জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং সংস্কারমুক্ত।

এই পরিবেশে লালিত হয়ে বাল্যবয়স থেকে প্রিস্টলিও এই মতাদর্শের অনুবর্তী হয়ে ওঠেন। অন্য বালকদের মতো খেলাধুলোয় বিশেষ আগ্রহ বোধ করতেন না তিনি।

একখানি বই হাতে নিয়ে ঘরের কোণায় বসে থাকতেই তাঁর বেশি ভাল লাগত। বেশি ভালবাসতেন বিজ্ঞানের বই পড়তে। মাঝেমধ্যে ধর্ম আলোচনাতেও আগ্রহ বোধ করতেন। বড়দের ধর্ম বিষয়ের আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

পড়াশুনায় তাঁর এতটাই আগ্রহ ছিল যে একরকম নিজের চেষ্টাতেই ষোল বছর বয়সের মধ্যে গ্রিক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও আরবী ভাষা শিখে ফেলেন।

স্কুলের বিধিবদ্ধ পড়াশুনা বলতে প্রিস্টলি পেয়েছিলেন এক ননফরমিস্ট স্কুলের শিক্ষা। ডার্ভেন্দ্রি শহরে এই আবাসিক স্কুল থেকে পাশ করে ১৭৫২ খ্রিঃ যাজক বৃত্তিকেই তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করলেন।

পুরুতগিরির কাজে টানা বারো বছর এখানে সেখানে ঘুরে যাযাবর জীবন কাটালেন প্রিস্টলি। পরে লিডসের মিলহিল চ্যাপেলে পেলেন যাজকের স্থায়ী কাজ। সেই সময় তাঁর বয়স বত্রিশ বছর।

গ্রাসাচ্ছাদনের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হতে বিয়েও করে ফেললেন।

বিজ্ঞানের বস্তুবাদে ছেলেবেলা থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। সংসারের টানা দারিদ্র্যের মধ্যেও মাঝে মধ্যে বিজ্ঞানের টানে বসে পড়তেন রসায়ন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায়।

পাদ্রী হয়েও তাঁর বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করার অভ্যাসের কথা অনেকেই জেনে গিয়েছিল। তাই লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল সখের বিজ্ঞানী।

লীডস শহরের গীর্জায় চাকরিতে থাকার সময়েই একবার এক বক্তৃতার আসরে গিয়েছিলেন প্রিস্টলি। সেখানে সেদিন বিদ্যুৎবিজ্ঞান নিয়ে জমাটি বক্তৃতা করছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

স্বভাবতঃই বিজ্ঞানমনস্ক পাদ্রী প্রিস্টলি খুব মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞানীর বক্তব্য শুনেছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে দর্শকের আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি ফ্রাঙ্কলিনকে প্রশ্ন করলেন, "Mr. Franklin, I am deeply interested in

your experiments with electricity. How can I findout more about this wonderful force?''

প্রশ্ন শুনে, হতদরিদ্র চেহারার পাদ্রীকে দেখে বিস্মিত হলেও ফ্রাঙ্কলিন সেদিন এগিয়ে এসে সাগ্রহে করমর্দন করে তাঁর পরিচয় জেনে নিলেন। পরে সাগ্রহে জানালেন, ''Very well, Reverend Pristly, if you are still interested in electricity tomorrow visit me at my lodging.''

একজন সাধারণ পাদ্রীর বিজ্ঞানপ্রীতি দেখে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন তড়িৎবিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন। বক্তৃতা ব্যবস্থাপকদের একজনকে তিনি সেদিন বলেছিলেন, ''I have never seen such a clergyman like him who is so deeply interested in science.''

বিজ্ঞান বিষয়ে ফ্রাঙ্কলিনের প্রথাগত কোনও শিক্ষা ছিল না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতটা তিনি করেছেন নিজের চেষ্টাতেই করেছেন। তাই তাঁরই মতো বিজ্ঞানের প্রথাগত শিক্ষাদীক্ষাহীন বিজ্ঞানের প্রতিভাকে দেখে চিনতে বিলম্ব হয়নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই সম্ভাবনাকে গির্জা তার ধর্মের ছায়ায় বেশি দিন আটকে রাখতে পারবে না। বিজ্ঞানের মুক্ত অঙ্গনে তাঁর আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

জাতবিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিনের সেদিনের উপলব্ধি নিকট ভবিষ্যতেই সত্য প্রমাণিত হল।

ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে থেকেই রসায়ন বিজ্ঞানের বইপত্র পড়াশুনা করে নানা রাসায়নিক গ্যাস নিয়ে পরীক্ষায় নেমে পড়েছিলেন প্রিস্টলি।

লীডস শহরে একটি বস্তিতে নোংরা পরিবেশে ঘর নিয়ে সপরিবারে বাস করতেন তিনি। বাড়ির কাছেই ছিল সরকারী মদের ভাটিখানা। সেখানে আশেপাশে পড়ে থাকত বিস্তর খালি পিপে। সেই সব পিপে থেকে গ্যাসের দুর্গন্ধে ভরে থাকত গোটা অঞ্চল।

সেই দুর্গন্ধ গ্যাসে আকৃষ্ট হয়ে প্রিস্টলি একদিন আবিষ্কার করলেন, মদের পিপের তলানির গাঁজলাই হল দুর্গন্ধ গ্যাসের উৎস। একটা অনামা গ্যাসের সন্ধান পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন প্রিস্টলি। তিনি স্থির করলেন, গোপনে এই গ্যাস নিয় পরীক্ষা চালাবেন।

একজন নিষ্ঠাবান পাদ্রীকে মদের ভাটিখানায় ঘোরাঘুরি করতে দেখলে স্বভাবতই লোকে সন্দিহান হয়ে উঠবে একথা অজানা ছিল না প্রিস্টলির। কিন্তু বিজ্ঞানের আকর্ষণে লোকলজ্জার ভয় তুচ্ছ করে তিনি গোপনে পিপের উৎপন্ন

গ্যাস কাচের জারে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। পরীক্ষার জন্য জারের ভেতরে জ্বলন্ত কাঠি ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে গেল। পরে আরো গভীর পরীক্ষার পরে তিনি নিশ্চিত হলেন পিপের মদের গাঁজলায় উৎপন্ন গ্যাস বাতাসী গ্যাস ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রিস্টলি জানতেন, বছর কয়েক আগেই যোসেফ ব্ল্যাক নামে এক রসায়ন বিজ্ঞানী চুনাপাথর পুড়িয়ে ল্যাবরেটরিতেই তৈরি করেছিলেন বাতাসী গ্যাস।

গ্যাস শনাক্তকরণের পরে এবারে তিনি বসে গেলেন তার বিষয়ে আরও কিছু জানার উদ্দেশ্যে।

একদিন তিনি নিজেই তৈরি করলেন বাতাসী গ্যাস। সেই গ্যাস জলে ছাড়তেই দেখলেন সামান্য বুদবুদ তুলে জলে মিশে গেল।

প্রিস্টলি বাতাসী গ্যাস বলে যা জানতেন তা ছিল আসলে কার্বন ডাই-অক্সাইড। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা এই নামকরণ করেছেন। প্রিস্টলির গ্যাস মেশানো জল আমরা জানি সেটা ছিল নির্ভেজাল সোডাজল। কিন্তু প্রিস্টলির সময়ে এসব কিছুই জানা ছিল না।

তবে বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের জানায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের চরিত্র নির্ণয়ের চেষ্টা প্রিস্টলিই প্রথম করেছিলেন। এই পরীক্ষাটিই ছিল প্রিস্টলির বিজ্ঞানী জীবনের প্রথম ধাপ।

এরপর সেই বস্তির সংকীর্ণ নোংরাভরা ঘরে বসেই নানা গ্যাস নিয়ে পরীক্ষায় মেতে ওঠেন প্রিস্টলি। এভাবেই তৈরি হতে থাকে আগামী দিনের রসায়ন বিজ্ঞানের পথ।

গ্যাস ঘটিত পরীক্ষায় বসেই একদিন তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। সাধারণ লবনকে ভিট্রিয়ালিক অম্লের সঙ্গে মিশিয়ে গরম করে তৈরি হল এই গ্যাস।

আধুনিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় যে অ্যামোনিয়া গ্যাস, তাও জন্ম নিয়েছিল এভাবেই একদিন সেই বস্তির ঘরে প্রিস্টলির হাতেই। এই ঝাঁঝালো গন্ধ গ্যাস তিনি আবিষ্কার করেন অ্যামোনিয়া দ্রবণ বা হার্টশোর্ন স্পিরিটকে পারদ পাত্রের ওপরে গরম করে। চোখে জ্বালা ধরানো এই গ্যাসের তিনি নাম দেন ক্ষারীয় গ্যাস বা অ্যালকালাই গ্যাস। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন অ্যামোনিয়া গ্যাস।

এরপর প্রিস্টলির হাতেই আবিষ্কৃত হয় নাইট্রোজেন গ্যাস।

এভাবেই একটার পর একটা গ্যাস আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে প্রিস্টলির বিজ্ঞান সাধনা।

গির্জায় পুরুতগিরির পাশাপাশি বিজ্ঞান গবেষণা নিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি প্রিস্টলি। সমসাময়িক রাজনীতিতেও উৎসাহী ছিলেন তিনি। অসত্য ও অন্যায়ের

প্রতিবাদ করার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন পিসির বাড়ি থেকেই। তাই আমেরিকার মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে তিনি সোচ্চার না হয়ে পারেননি।

ইংরাজদের শাসন-শোষণের প্রতিবাদে সমগ্র আমেরিকায় তখন দেখা দিয়েছে গণজাগরণ। সেই আন্দোলন ক্রমে পরিণত হল সশস্ত্র বিপ্লবের পথে। এই সন্ধিক্ষণে বিজ্ঞানের গবেষণা ছেড়ে স্বাধীনতাকামী মানুষের সঙ্গে পথে নেমে পড়লেন প্রিস্টলি।

কখনো অগ্নিক্ষরা বাণী লেখা প্রচারপত্র বিলি করছেন, কখনো স্বেচ্ছাচারি ব্রিটিশের অত্যাচার নিপীড়নের তীব্র নিন্দা করে চিঠি লিখছেন। কখনো পথে পথে বক্তৃতা করে গণজাগরণের পক্ষে জনমত উজ্জীবিত করছেন, মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন বিপ্লবকে।

বিজ্ঞানী প্রিস্টলির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, কেবল ধর্ম বিষয়েই নয়, বিজ্ঞান বা রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন পরাধীনতার পরিপন্থী। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে স্বাধীনতার পূজারী। তিনি কামনা করতেন, বিশ্বমানবের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন জীবন।

দরিদ্র যাজক প্রিস্টলির জীবনে অকস্মাৎ সুখের আলোর ঝিলিক দেখা দিল ১৭৭২ খ্রিঃ। স্বশিক্ষিত এই মানুষটির বহু ভাষায় দক্ষতার কথা অবিদিত ছিল না। সেই সুবাদেই এই সময়ে একটি চাকরির প্রস্তাব পেয়ে গেলেন।

ইংলণ্ডের স্বনামধন্য অভিজাতদের মধ্যে লর্ড শেলবার্ন ছিলেন অন্যতম। তিনিও ভাষাতত্ত্বে উৎসাহী। তাই একটি চিঠি পাঠিয়ে জানালেন, তিনি প্রিস্টলিকে তাঁর লাইব্রেরিটির তত্ত্বাবধায়ক করতে চান।

তাছাড়া অবসব সময়ে ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেও তিনি আগ্রহী।

বলাবাহুল্য প্রিস্টলি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন এবং লীডস ত্যাগ করে সপরিবারে ১৭৭২ খ্রিঃ চলে এলেন শেলবার্নের প্রাসাদে।

এখানে লাইব্রেরি তদারকের কাজে তিনি ছিলেন ১৭৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত। এই ক'বছরে তাঁর জীবনে এসেছিল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ।

তিনি যখন চাকরি থেকে অবসর নেন, গুণমুগ্ধ শেলবার্ন তাঁর জন্য যৎকিঞ্চিৎ বাৎসরিক ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

শেলবার্নভবনে চাকরির আটটি বছর ছিল প্রিস্টলির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেলবার্নের সহৃদয়তায় তিনি গবেষণার কাজের জন্য পেয়েছিলেন একটি ভাল ল্যাবরেটরিও।

এখানে বসেই তিনি নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা রসায়ন বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার অক্সিজেন ও

অম্লজান গ্যাসকে আলাদা সংগ্রহ করার পদ্ধতি। এ কাজটি তিনি এখানেই করেছেন ১৭৭৪ খ্রিঃ।

একদিন গভীর রাতে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার টেবিলে বসে বকপাত্রে পারদে রাখা লাল অক্সাইড গুঁড়ো গরম করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলেন, লাল অক্সাইড গুঁড়ো গলে বর্ণহীন গ্যাস নির্গত হচ্ছে। তিনি তখন পাত্রের পারদ সরিয়ে সতর্কতার সঙ্গে গ্যাসটিকে গ্রাহক পাত্রে সংগ্রহ করলেন।

সামনেই জ্বলছিল একটি মোমবাতি। আলো দেখতে পেয়ে তাঁর মনে পড়ে গেল ভাটিখানার গন্ধযুক্ত গ্যাস পরীক্ষা করার কথা। পিপের ভেতরে জ্বলন্ত কাঠি ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই পটাপট নিভে গিয়েছিল।

এই নতুন গ্যাসটিকেও সেভাবে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি মোমবাতিটি কাত করে গ্যাসের ফ্লাস্কের মুখে ধরেন। কিন্তু আলো তো নিভল না। পরিবর্তে শিখাটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এরপরে মোমবাতি সরিয়ে ফ্লাস্কে ফেললেন জ্বলন্ত কাঠি। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, কাঠির আলো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। নতুন এক গ্যাস আবিষ্কারের আনন্দে উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন প্রিস্টলি। তিনি এই গ্যাসের নাম দিলেন **dephlogisticated air** বা ফ্লোজিস্টনহীন বাতাস। পরে বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন অক্সিজেন।

এভাবেই একটি মোমের আলোয় রসায়ন জগতের যুগান্তকারী আবিষ্কারটি প্রিস্টলির হাতে পেয়ে গেল বিশ্ববিজ্ঞান।

এই প্রসঙ্গে পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "If I had not happened to have a lighted candle before me, I should probably never made the trial ....."

ফ্লোজিস্টনহীন গ্যাস নিয়ে আরও খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেছেন প্রিস্টলি। বায়ুরুদ্ধ গ্যাস জারে ইঁদুর ফেলে দেখেছেন ইঁদুর বহাল তবিয়তে রয়েছে। কৌতূহলী হয়ে নিজেও ওই গ্যাসে জোরে শ্বাস নেন। উপলব্ধি করলেন, ক্লান্তি ভাব নিমেষে উবে গিয়ে শরীর চনমনে হয়ে উঠল।

চমৎকৃত হয়েছিলেন প্রিস্টলি কিন্তু সেদিন বুঝতে পারেননি এই গ্যাসকে চিকিৎসার কাজে কিভাবে লাগানো যেতে পারে।

ফ্লোজিস্টনবিহীন গ্যাস বা অক্সিজেন যে বায়ুরই এক উপাদান তাও সেদিন বুঝে উঠতে পারেননি তিনি।

কারণ সেকালের বিজ্ঞানীদের তখনো পর্যন্ত অজানা ছিল যে বাতাস হল নানান গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। অক্সিজেনকে একটি বিশুদ্ধতর বায়ু বলেই প্রিস্টলি মনে করেছেন।

তাঁর ফ্লোজিস্টনবিহীন বাতাস নিয়ে প্রথম সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে তার নাম অক্সিজেন রেখেছিলেন ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়া। ফ্রান্সে যখন দুই বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার হয়, ল্যাভয়সিয়া গ্যাসটির কথা জেনেছিলেন প্রিস্টলির কাছে এবং তিনিই পরীক্ষার পরে প্রথম আবিষ্কার করেন বাতাসে রয়েছে একভাগ অম্লজান ও তিন ভাগ নাইট্রোজেনের মিশ্রণ।

লর্ড শেলবার্নের কাজে ইস্তফা দেবার পর প্রিস্টলি চলে আসেন বার্মিংহাম শহরে। ততদিনে তাঁর পরিচয় কেবল একজন দরিদ্র পাদ্রি নয়। একজন সফল বিজ্ঞানী হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছেন তিনি।

তাই শহরের গণ্যমান্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করলেন বিজ্ঞানী। তাঁকে সম্মান জানানো হল, বিদ্বৎসমাজের সংগঠন লুনার সোসাইটির সম্মানীয় সদস্যপদ দিয়ে।

বার্মিংহামের লুনার সোসাইটির তখন খুবই নামডাক। বিখ্যাত সব জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ এখানে। তাদের মধ্যে রয়েছেন বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারক জেমস ওয়াট, বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইনের পিতামহ এরামাস ডারউইন, বিশিষ্ট রসায়নবিদ জেমস কার প্রমুখ।

১৭৮৯ খ্রিঃ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে শুরু হল গণজাগরণ। স্বাধীনতার লক্ষ্যে সেই আন্দোলন রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের রূপ নিল। বিপ্লবীরা গিলোটিনে হত্যা করল সম্রাট ষোড়শ লুই ও সম্রাজ্ঞী আতোয়ানাৎকে। সেই সঙ্গে রাজতন্ত্রের পতনের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের অরুণোদয় হল।

এই সংবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রিস্টলি বার্মিংহাম থেকে গণনেতাদের অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখলেন। ফরাসী বিপ্লবের সমর্থনে ও তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে নানাস্থানে পথসভাও করলেন।

স্বাধীনতার পূজারী প্রিস্টলি আমেরিকা বা ফ্রান্সের গণমুক্তির আন্দোলনকে মুক্তকণ্ঠে সমর্থন জানাতে কখনো কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু এই সমর্থনের ফলে তিনি ব্রিটেনের সরকার ও প্রভাবশালী রাজপুরুষদের রোষদৃষ্টিতে পড়লেন। চার্চের প্রভাবশালী পিতারাও প্রিস্টলির উচ্ছ্বাসকে সমর্থন করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের গণজাগরণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সন্ত্রাসবাদ। ফরাসী বিপ্লবের এই শোচনীয় পরিণতি দেখে বহু ইংরাজ চিন্তানায়ক হতাশ হলেন। অনেকেই বিপ্লবের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেন। কিন্তু প্রিস্টলি রইলেন নির্বিকার। তিনি আশা করেছিলেন অচিরেই সহিংস গণজাগরণের অবসান ঘটবে।

১৭৯১ খ্রিঃ জুলাই মাসের মাঝামাঝি বার্মিংহামের পথে পথে দেখা গেল মারমুখী জনতা শ্লোগান তুলছে, ফরাসী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। উন্মত্ত জনতা

বেছে বেছে বাড়িঘর লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল। নাশকতামূলক এই তাণ্ডবে প্রিস্টলির গবেষণার বহুমূল্যবান নথিপত্র ও প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ভস্মীভূত হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার ও চার্চের কর্তাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা যে এই দুষ্কর্মের প্রেরণা যুগিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জীবনের ওপরেও আঘাত আসতে পারে অনুমান করে প্রিস্টলি অনতিবিলম্বে বার্মিংহাম ছেড়ে লণ্ডনে পালিয়ে যান এবং অতঃপর সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

আশ্চর্যের বিষয়, যে রয়াল সোসাইটি ইতিপূর্বে বিভিন্ন আবিষ্কারের জন্য যে বিজ্ঞানীকে স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানিয়েছে লন্ডনে উপস্থিত থাকা অবস্থাতে তাঁকে তাঁরা সামান্য সহানুভূতি জানানোও প্রয়োজন মনে করেনি। উপরন্তু নানাভাবে সোসাইটির কাছ থেকে প্রিস্টলি তাচ্ছিল্য ও অবহেলাই পেয়েছেন।

ইংলণ্ড তথা সমগ্র ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই সারস্বত সংস্থার ইতিহাসে এমন ঘটনা এক নিন্দনীয় নজির হয়ে রয়েছে।

দুর্ভাগ্য এই যে, লন্ডনেও সুস্থিত হতে পারলেন না প্রিস্টলি। সরকারের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীর দল দিনে দিনে এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে শেষ পর্যন্ত চিরদিনের মতো জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তিনি।

১৭৭৪ খ্রিঃ প্রিস্টলি লণ্ডন ত্যাগ করে চলে এলেন আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে।

মুক্ত চিন্তার অগ্রণী পুরুষ, তথাকথিত অশিক্ষিত বিজ্ঞান সাধক প্রিস্টলি আমেরিকায় পেলেন সাদর অভ্যর্থনা। তাঁর আগমনবার্তা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সর্বাগ্রে প্রিস্টলিকে সাদরে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। কিছুদিনের মধ্যেই পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের কাজটিও জুটে গেল ফ্রাঙ্কলিনের উদ্যোগে।

প্রভাবশালী মার্কিন নাগরিকদের তৎপরতায় আরও নানাভাবেই সম্মান জানানো হল বিজ্ঞানীকে।

এখানেই শেষ হল না, আমেরিকার প্রোটেস্টান্ট চার্চের নেতৃত্বও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। মোটকথা প্রিস্টলি এখানে পেলেন জীবনধারণের উপযোগী আর্থিক নির্ভরতার আশ্রয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যাপনার কাজ।

আধুনিক গবেষণাগার, সর্বোপরি চার্চের সন্ত্রাসমুক্ত স্বাধীন চিন্তার অনাবিল পরিবেশ একজন একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধকের পক্ষে এর বেশি প্রত্যাশা আর কী থাকতে পারে!

বিস্মিত অভিভূত প্রিস্টলি পেনসিলভেনিয়াতেই থিতু হলেন এবং অধ্যাপনা

ও গবেষণার কাজে মগ্ন হলেন। আমেরিকার মাটিতে যেন নবজন্ম হল তাঁর। বয়স তখন ষাটের কোঠায়।

আমেরিকায় বসবাসকালে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ মানুষদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন প্রিস্টলি। তাঁদের মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন প্রমুখ বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিরাও ছিলেন।

নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনে নিবিড় গবেষণায় ১৭৯৭ খ্রিঃ প্রিস্টলি একে একে আবিষ্কার করলেন বিষাক্ত গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড (Co) ও নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস (N_2O)। পরে এই গ্যাসেরই নাম হয় লাফিং গ্যাস।

তারপর এগিয়ে এল কর্মময় জীবনের অন্তিম লগ্ন। ১৮০৩ খ্রিঃ তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি আমেরিকার মাটিতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিজ্ঞানের আশ্চর্য প্রতিভা প্রিস্টলি।

মৃত্যুর পর তাঁর বসতবাড়ি ও গবেষণাগারটিকে সংরক্ষিত করা হয় জাতীয় স্মারক হিসাবে।

কার্ল উইলিয়াম শীলি

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসের আর এক বিস্ময় প্রতিভা কার্ল উইলিয়াম শীলি। অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম ছিলেন তিনি। কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই শীলি বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন। অথচ তিনি জীবন শুরু করেছিলেন সাধারণ এক ওষুধের দোকানের অতিসাধারণ বয় হিসেবে।

যোসেফ প্রিস্টলি অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন ১৭৭৪ খ্রিঃ। অথচ তার দুবছর আগেই ১৭৭২ খ্রিঃ অক্সিজেনের সন্ধান পেয়েছিলেন শীলি। কিন্তু উপযুক্ত যোগাযোগ ও সুযোগ সুবিধার অভাবে তাঁব আবিষ্কারকে বিশ্ববিজ্ঞানের আসরে উপস্থাপিত করতে পারেননি।

প্রথম আবিষ্কারের গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেও, তাঁর পরবর্তী আবিষ্কারগুলো তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল।

সুইডেনের পোমেরানিয়া প্রদেশের অখ্যাত স্ট্রালসুণ্ড শহরে এক দীনদরিদ্র পরিবারে ১৭৪২ খ্রিঃ ৯ ডিসেম্বর কার্ল উইলিয়াম শীলির জন্ম। ছেলেবেলায় স্থানীয় পাঠশালায় সামান্য কিছুদিন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পেটে খিদে নিয়ে কদিন আর স্কুলে যাতায়াত করা যায়? তবে মেধা ও

জ্ঞান তৃষ্ণার কিছু কম ছিল না তাঁর। আর ছিল সব বিষয়েই অসম্ভব কৌতূহল। চোখে দেখা সব কিছু সম্বন্ধেই খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন তিনি।

খিদের আগুনে সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে শীলিকে এক ওষুধের দোকানে ধোয়ামোছার কাজ নিতে হয়েছিল। মালিকের বাড়িতেই এক গোয়াল ঘরে থেকে দিনে রাতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হতো তাঁকে।

সামান্য কিছু পয়সার জন্য এই সময়ে মালিকের সব অন্যায় অত্যাচার সইতে হত মুখ বুজে।

কথায় বলে প্রতিভা দুর্মর। জগতের অনেক প্রতিভবান মনীষীর মতো শীলির জীবনেও এই আপ্তবাক্য সত্য হতে দেখা যায়।

সামান্য শিশি-বোতল ধোওয়া বা ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজের মধ্যে থেকেও শীলি বড় হবার স্বপ্ন দেখতেন। সহজাত তাগিদেই দিনে দিনে দোকানের সব রাসায়নিকের নাম ও কার্যকারিতা তিনি লিখে নিয়েছিলেন।

ওষুধের দোকানের ফাইফরমাস খাটার কাজে দীর্ঘ আট বছর কাটিয়ে ১৭৬৪ খ্রিঃ অর্থকরী অন্য কাজের সন্ধানে চলে আসেন মালামো শহরে। কাজ নিলেন এক ওষুধ কোম্পানির কেমিস্টের অধীনে।

স্কুলে সামান্য যেটুকু লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তারপরে নিজের কৌতূহলের তাগিদেই প্রতিদিনের কাজের অবসরে রাত জেগে শীলি প্রয়োজনীয় পড়াশুনার চর্চা করে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন।

সেই জ্ঞান তাঁর জীবিকার্জনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে যেতেন। টুকটাক পরীক্ষার কাজে হাতেখড়ি এভাবেই হল নতুন কর্মস্থলে।

চারবছর কেমিস্টের সহকারী হিসেবে কাজ করার পর ১৭৬৮ খ্রিঃ মালামো ছেড়ে এলেন রাজধানী শহর স্টকহোমে। এখানে বছর দুয়েক থেকে পাড়ি দিলেন উপশলা শহরে। সময়টা ১৭৭০ খ্রিঃ।

ততদিনে উচ্চাকাঙ্ক্ষী শীলি জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য মোটামুটি নির্ধারণ করে নিয়েছেন। ভাল কোন ল্যাবরেটরিতে কোন রাসায়নিকের পরীক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ না হলেও, রসায়নই হল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

উপশলা শহরেই শীলি স্বাধীনভাবে প্রথম রাসায়নিকের পরীক্ষা নিরীক্ষায় হাত দিলেন।

নানা টকজাতীয় ফল, আঙুর, কমলালেবু ইত্যাদিতে থাকে একপ্রকার জৈব অম্ল, যার নাম টারটারিক অম্ল (Tartaric acid)। এই অম্লটিকে আবার পাওয়া যায় মদের পিপের ভেতরের দেয়ালে জমে থাকা ক্রিমে।

শীলি এই ক্রিম অব টারটার থেকে টারটারিক অ্যাসিডকে পৃথক করার কাজ নিয়ে বসলেন। যথারীতি সফলও হলেন।

তারপর টারটারকে পৃথক করার পদ্ধতি ও টারটারিক অ্যাসিডের গুণাগুণ লিপিবদ্ধ করে ছাপালেন তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র।

এই পত্রে তিনি সংযোজন হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, টারটারিক অ্যাসিডের সাহায্যে পশম রঙ করার পদ্ধতি।

এইভাবে শীলির হাত ধরে টারটারিক অ্যাসিড প্রথম শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করল।

উত্তরকালের বিজ্ঞানীদের হাতে টারটারিক অ্যাসিডের অনেক গুণাগুণ আবিষ্কৃত হয়েছে। কারখানায় রুটি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে, ফটোগ্রাফির কাজে এই জৈব অম্ল টারটারিক অ্যাসিড এক অপরিহার্য উপাদান।

টারটারিক অম্ল আবিষ্কারের সাফল্যের পর চার বছরের মাথাতেই শীলি উদ্ধার করলেন ক্লোরিন গ্যাস।

হলদে-সবুজ বর্ণের এই গ্যাস বর্তমানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রঙ তোলার কাজে, জীবাণুনাশক ব্লিচিং পাউডার তৈরিতে, এমনকি যুদ্ধের অস্ত্র তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজেও ক্লোরিন গ্যাস না হলে চলে না। এছাড়া নানা অক্সিজেন তৈরির কাজেও অনুঘটক হিসাবে এই গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

বর্তমানে কাচ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ধাতুটির সঙ্গেও শীলিই সর্বপ্রথম আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর গবেষণার ফলেই প্রথম জানা যায় ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড একটি কঠিন, স্বভাব-ভঙ্গুর ধাতু।

একের পর এক সাফল্যের মধ্যে দিয়ে শীলির গবেষণা আরও নিবিড় হতে থাকে। ক্রমে তিনি লোহা, তামা ও পারদ ইত্যাদি ধাতুর অক্সিডেশানের অর্থাৎ অক্সিজেন যৌগ দহনের পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন কপার আরসোনাইট বা তামা ঘটিত সেঁকোবিষ ও আর্সিন। আর্সিন হল হাইড্রোজেন গ্যাসঘটিত সেঁকোবিষ।

এই সমস্ত আবিষ্কারের তথ্য সমৃদ্ধ অনুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যথাসময়েই তিনি প্রকাশ করেন।

এসব মূল্যবান গবেষণার স্বীকৃতি পেতেও বিলম্ব হয় না। ১৭৭৫ খ্রিঃ সুইডেনের বিজ্ঞান আকাদেমি শীলিকে ফেলো নির্বাচিত করে সম্মানিত করেন। বিজ্ঞানী তখন তেত্রিশ বছরের যুবক।

এই সম্মানের সূত্র ধরেই জার্মানির সম্রাট ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের কাছ থেকে আসে অভাবিত এক সম্মান। সম্রাট স্বয়ং চিঠি দিয়ে তরুণ বিজ্ঞানীকে জার্মানীতে যাবার সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁকে আরো জানানো হল,

সেখানে রসায়ন বিজ্ঞানীর গবেষণার জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা সম্রাট স্বয়ং করে দেবেন।

বার্লিন যাবার সাদর আমন্ত্রণ দরিদ্র বিজ্ঞানসাধক শীলির কাছে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার মহৎ সুযোগ এনে দিল। কিন্তু এই দুর্লভ সুযোগ হাতে পেয়েও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন শীলি।

তিনি সম্রাটের পত্রের উত্তরে দুঃখের সঙ্গে জানালেন, আপাততঃ জন্মভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা তিনি ভাবছেন না। এখানে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর গবেষণার উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা নেই বটে, তবুও তিনি চান জন্মভূমির আলো বাতাস থেকেই শক্তি আহরণ করবেন। একজন স্বাধীনচেতা স্বদেশপ্রেমিক বিজ্ঞান তাপস হিসেবে প্রলোভনকে জয় করার যে দৃষ্টান্ত শীলি স্থাপন করেছিলেন তার তুলনা জগতে বিরল।

শীলি সুইডেনে বসেই তাঁর গবেষণার মধ্যে ডুবে রইলেন।

ইতিমধ্যে সুইডিস আকাদেমির স্বীকৃতি ও জার্মানীর সম্রাটের আমন্ত্রণপত্রের সুবাদে দেশের জ্ঞানীগুণী শিক্ষিত মানুষেরা শীলির কাজকর্ম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এর ফলে আর্থিক দিকের কিছুটা সুরাহা হল।

এবারে শীলি এলেন থপিং শহরে। নিজস্ব ল্যাবরেটরি তৈরির উপযুক্ত রেস্ত নেই। তাই সাময়িকভাবে খুলে বসলেন একটা ওষুধের দোকান। সেখানে তিনি বিক্রি করতে বসলেন ডাক্তারদের ব্যবহার্য ওষুধপত্র।

ঘিঞ্জি নোংরা অপরিচ্ছন্ন দোকানটির ভেতরের অংশটা অনেকটা সুড়ঙ্গের মতো। সারাদিন সামনের অপেক্ষাকৃত খোলামেলা অংশে বসে বিক্রিবাট্টা করেন। সন্ধ্যার পরে পথঘাটে যখন লোকচলাচল কমে আসে তখন ঝাঁপ বন্ধ করে তিনি গিয়ে বসেন ঘরের সুড়ঙ্গ অংশে।

সেখানে টেবিলে সাজানো থাকে তাঁর গবেষণার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। সেসব নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

লোকচক্ষের অগোচরে সেই সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ ঘরের অপরিসর টেবিলে এইভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকে আগামী দিনের মহাবিজ্ঞানীর বিজ্ঞান সাধনা। উন্মোচিত হতে থাকে বিশ্ববিজ্ঞানের এক একটি অবরুদ্ধ আলোকময় প্রকোষ্ঠ।

১৭৭৭ খ্রিঃ তাঁর সমস্ত গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনা সম্বলিত একটি বই প্রকাশ করেন শীলি। বইটির নাম দেন Chemical Treatise on Air and Fire। এই বইতে বায়ু ও আগুনের রাসায়নিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন।

এই বই থেকেই জানা যায় সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও পদ্ধতির দ্বারা প্রিস্টলির অনেক আগেই শীলি অক্সিজেন গ্যাসের ধারণা লাভ করেছিলেন। প্রিস্টলি অক্সিজেন গ্যাসের নিজস্ব নামকরণ করেছিলেন ফ্লোজিস্টনহীন বাতাস। আর শীলি নাম দিয়েছিলেন আগুনে-বাতাস।

সেইযুগে ফ্লোজিস্টনের ধারণা বিজ্ঞানীমহলে এতটাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে তার দাপটে অনেক আবিষ্কারের গুরুত্ব তারা সঠিক অনুধাবন করতে ব্যর্থ হতেন।

তাই নিজ নিজ পথ ধরে অক্সিজেন আবিষ্কার করেও ফ্লোজিস্টনের ঘোর কাটিয়ে উঠে অক্সিজেন গ্যাসের দহন চরিত্রটি তাঁরা যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসরণ করা ছাড়া প্রিস্টলি বা শীলি উভয়েরই নতুন কোন প্রশ্নতোলা সম্ভব ছিল না। কেননা তাঁরা দুজনেই ছিলেন শিক্ষাদীক্ষাহীন স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানী। স্কুল কলেজের ডিগ্রী বিহীন অতি সাধারণ স্তরের মানুষ। এবং এই বোধ থেকে ছিল স্বাভাবিক হীনমন্যতা। তাই তাঁদের তত্ত্বকে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন করার সাহস তাঁরা পাননি।

যদিও বিশ্বাস করতেন তাঁরা যে ফ্লোজিস্টনের উপস্থিতিই বস্তুর দহনের কারণ, ফ্লোজিস্টন নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দহন ক্রিয়াও শেষ হয়। দহনের ফলে বস্তুর ফ্লোজিস্টন বাতাসে আশ্রয় পায়। ফ্লোজিস্টনের পরিমাণ যত বাড়ে বাতাসও ততই দূষিত হতে থাকে। উদ্ভিদ বাতাস থেকে ফ্লোজিস্টন টেনে নিয়ে বাতাসকে দোষণমুক্ত করে।

শীলি আরও বুঝেছিলেন, জীবজগতের জীবনধারণের জন্য তাঁর আগুনে-বাতাস অপরিহার্য। তিনিই প্রথম উল্লেখ করেছিলেন বাতাসে নাইট্রোজেন গ্যাসের উপস্থিতির কথা।

তিনি সেই গ্যাসের নাম দিয়েছিলেন জ্বালানী-বাতাস যা বাতাসের তিন ভাগ জুড়ে রয়েছে। বাকি একভাগ হল আগুনে-বাতাস।

অপরিচ্ছন্ন জ্ঞান নিয়ে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে না পারলেও পরবর্তীকালে সেই কাজটি বায়ু বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করেছিলেন ইংরাজ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিশ।

ছোটখাট সাধ্যায়ত্ত পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার দ্বারা বিশ্বের বিজ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন শীলি।

আধুনিক ফটোগ্রাফির বিকাশ ও উন্নতির সোপান তৈরি হয়েছিল শীলির পরীক্ষার পথ ধরেই। তিনিই সর্বপ্রথম রৌপ্য ঘঠিত যৌগের ওপর আলোর প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা করেছিলেন।

দুধ টকে যাবার কারণ অনুসন্ধান করতে বসে তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন ল্যাকটিক অ্যাসিডের। আধুনিক কালে এই দুধ গাঁজিয়ে ওঠার প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিত বিষয়টিকে নাম দেওয়া হয়েছে ল্যাকটিক অ্যাসিড ফারমানটেশান।

টারটারিক অ্যাসিডের মতো ল্যাকটিক অ্যাসিডও একটি জৈব অম্ল বা অ্যাসিড। এই দুটি অ্যাসিড আবিষ্কারের পর তাদের গুণাগুণ বিষয়টিও পরীক্ষার মাধ্যমে জেনেছিলেন শীলি।

এগুলো ছাড়াও আরও কয়েকটি যেমন নাইট্রিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড ও বেনজোয়িক অ্যাসিড প্রভৃতি শীলির আবিষ্কার।

এই সব জৈব অম্ল আবিষ্কার ছাড়া যে জৈব যৌগর সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচিত করেন, তা হল গ্লিসারিন।

অজৈব অম্ল প্রুশিক ও ট্যাংস্টিকও শীলির আবিষ্কার। ট্যাংস্টিক অ্যাসিডের তিনি নাম দিয়েছিলেন ট্যাংস্টিক লবন।

তিনিই অক্সিজেন জারিত ট্যাংস্টেট ধাতুর ক্যালসিয়াম লবন প্রথম তৈরি করেছিলেন বলে, এই লবনকে বলা হয় Sheelite।

নানা জাতীয় গ্যাস নিয়ে সারা জীবন পরীক্ষা করেছেন শীলি। শেষ দিকে কপিং শহরের সেই আলো বাতাসহীন সুড়ঙ্গ ঘরে বসে দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছেন অসংখ্য জৈব অজৈবের আবিষ্কারের মধ্যে। তাদের প্রত্যেকটিকেই স্বাদ জানার জন্য জিভে ঠেকিয়ে যাচাই করতেন। পরিণাম সম্পর্কে কোন ধারণালাভ না করেই নির্বিচারে এই স্বাদগ্রহণের অভ্যাসটি করে গেছেন। এমনকি অতি মারাত্মক সেঁকো বিষেরও স্বাদ নিয়েছেন তিনি।

এছাড়া বিষাক্ত ক্লোরিন সহ নানান গ্যাসের মধ্যে থেকে কাজ করেছেন, শ্বাস নিয়েছেন দিনের পর দিন।

রসায়নের বৃহত্তর স্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন থেকে প্রিস্টলি জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যেতেন। ফলে রাসায়নিক বিষের সংস্পর্শে শরীরে সঞ্চারিত হয়েছে বিষক্রিয়া, তা থেকে জীবনীশক্তির হ্রাস।

শরীরে বিষের প্রতিক্রিয়া যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন আর কিছু করার থাকল না। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই এই অনন্যসাধারণ বিজ্ঞানপুরুষের সম্ভাবনাময় জীবনের ছেদ পড়ে যায়। সময়টা ছিল ১৭৮৬ খ্রিঃ ২১ মে।

সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানী শীলির অসামান্য অবদান সমূহের বলতে গেলে কোন স্বীকৃতিই তিনি তাঁর জীবদ্দশায় পাননি। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার সাকুল্যে স্বীকৃতি সেই সুইডিশ বিজ্ঞান আকাডেমির সদস্যপদ আর জার্মানীর সম্রাটের চিঠি।

শীলি স্বভাবতঃই ছিলেন প্রচারবিমুখ, বিজ্ঞানের নীরব সাধক। পরীক্ষার

সাফল্যের আনন্দই ছিল তাঁর প্রাণশক্তি, সবচাইতে বড় পুরস্কার। সেই পুরস্কারের সমকক্ষ হতে পারে বাইরের কোন স্বীকৃতি বা পুরস্কারের সাধ্য কি! শীলি নিজেই একজায়গায় বলেছেন .... to watch new phenomena—this is my desire.

এই অধরাকে ধরার, আজানাকে জানার আনন্দ নিয়েই বিশ্ববিজ্ঞানের পথ অনুসন্ধানের ব্রতে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন শীলি।

জার্মান সম্রাটের কাছ থেকে উজ্জ্বল সম্ভাবনার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে জন্মভূমির টানেই কঠোর দুঃখ দারিদ্র্যের জীবন মেনে নিয়ে সুইডেনে পড়েছিলেন শীলি।

তাঁর আজীবন সাধনায় সমৃদ্ধ গৌরবদীপ্ত হয়েছে সুইডেনের ইতিহাস। কিন্তু সারাজীবনে জন্মভূমির কাছ থেকে তিনি যা পেয়েছেন তা হল বঞ্চনা আর অবহেলা।

অপুষ্টিতে ভুগেছেন, অর্থকষ্টে গবেষণার কাজ বিলম্বিত হয়েছে, তবু পাননি স্বদেশের কাছ থেকে একটুকু নিশ্চিন্ততার আশ্বাস, আর্থিক সহযোগিতা কিংবা একটি সুপরিসর সজ্জিত পরীক্ষাগার। তবুও একটিও অভিমানের ক্ষোভের বাক্য উচ্চারণ না করে প্রিয় জন্মভূমির কোলেই মাথা রেখে ১৭৮৬ খ্রিঃ ২১ এপ্রিল জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শীলি।

জাঁ বাপৎ লামার্ক

জীববিজ্ঞানের অনন্ত সম্ভাবনার কাজটি বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যিনি প্রথম রোপন করেছিলেন তাঁর নাম জাঁ বাপৎ লামার্ক। অতি বিচিত্র তাঁর জীবন-কাহিনী। জীবন শুরু করেছিলেন একজন সৈনিক হিসাবে এবং একজন দক্ষ সমর নায়ক হিসাবে হয়তো সারা জীবন তাঁর কেটে যেত রণাঙ্গনেই। কিন্তু নিয়তির এমনই বিচিত্র খেলা যে মর্মান্তিক এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে চিরদিনের জন্য তাঁর সৈনিক জীবনে ছেদ পড়ে গেল।

তার পরেই বিশ্ববিজ্ঞানের আলোয় অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লামার্কের বিজ্ঞানপ্রতিভা।

আধুনিক জীববিজ্ঞানের জনকরূপে আবির্ভূত হলেন লামার্ক। প্রাণী বিজ্ঞানের যে শাখাটির পরীক্ষায় নিয়োজিত হয়েছিলেন তিনি, তার বায়োলজি (Biology) নামকরণ তিনিই প্রথম করেছিলেন।

বায়ো অর্থ সজীব পদার্থ, আর লজি হল বিদ্যা। দুয়ে মিলে যে বায়োলজি তাই হলো জীববিদ্যা।

ফ্রান্সের এক অখ্যাত শহরে ১৭৪৪ খ্রিঃ লামার্কের জন্ম। স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনায় খুব উল্লেখযোগ্য ছাত্র না হলেও ছেলেবেলা থেকেই নানা বিষয়ে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর অসাধারণ। খোলা আকাশের তলায় ঝোপজঙ্গলে ঘুরে ফুল পাখি পাতা লতা দেখায় তাঁর উৎসাহ ছিল খুব বেশি।

এইভাবেই প্রকৃতির পাঠশালায় শিক্ষা নিয়ে আর নানান বিষয়ের বই পড়ে অতিবাহিত হয় তাঁর শৈশবকাল।

১৭৬৬ খ্রিঃ ফ্রান্সের সীমান্তে জার্মান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ ঘটলে দুই দেশের মধ্যে আরম্ভ হয়ে যায় যুদ্ধ। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে দীর্ঘ দিন—টানা সাত বছর। তবুও সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয় না।

এই দীর্ঘমেয়দী যুদ্ধের সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে ফ্রান্সের যুবকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করানো শুরু হয়। যুবক লামার্কও বাদ গেলেন না। সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে নাম লিখিয়ে একদিন পুরোপুরি সৈনিক হয়ে গেলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই সাহস, বুদ্ধি স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে সৈন্যবাহিনীতে পদোন্নতি ঘটে লামার্কের। ক্রমে এক কোম্পানি সৈন্যদলের সেনাপতির পদ পেলেন।

সেই সময়েই একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই পড়ে থাকেন। পরে সেই আহত শরীর নিয়ই প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে মূল বাহিনীতে ফিরে গেলেন তিনি।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁর নেতৃত্বে এক আকস্মিক ঝটিকা আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করল জার্মান বাহিনী।

সীমান্ত যুদ্ধে এই বিজয়ের পর লামার্কের বুদ্ধি ও বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ফ্রান্সে। সামরিক বাহিনীতেও পেলেন সম্মান ও পদোন্নতির পুরস্কার।

লামার্কের জীবনের সৈনিকের ভূমিকার এর পরেই ঘটল রূপান্তর। নিতান্তই এক আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেই নতুনতর সংগ্রামী ভূমিকায় প্রবেশ করতে হল তাঁকে।

সেখানে তিনি যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন তা হল প্রচলিত সংস্কার অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে যুক্তি ও বিজ্ঞান চিন্তার সংগ্রাম।

সামরিক ব্যারাকে খেলাধুলোর সময় একদিন লামার্ক প্রচণ্ডভাবে আহত হলেন। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল হাসপাতালে। ডাক্তার

পরীক্ষা করে জানালেন লামার্কের লসিকা গ্রন্থি ছিঁড়ে গেছে। শারীরিক ভাবে অর্ধপঙ্গু অবস্থায় থাকতে হবে তাঁকে সারা জীবন।

এভাবেই সামরিক জীবনে চিরতরে ছেদ পড়ল লামার্কের। তিনি ফিরে এলেন গ্রামের বাড়িতে।

বাড়িতে তখন সংসারি বাবা তাঁর দশটি সন্তানকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। নিত্য অভাবের তাড়না সংসারে, তার সঙ্গে এসে জুটলেন অক্ষম-প্রায় লামার্ক।

মাইনে থেকে যা কিছু সঞ্চয় ছিল লামার্কের, অল্পদিনের মধ্যেই তা উড়ে গেল। বাধ্য হয়েই তাঁকে কাজের সন্ধানে ছুটতে হল প্যারিসে। খুঁজে পেতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা ব্যাঙ্কে করণিকের কাজ জুটিয়ে নিলেন।

মাইনের সামান্য টাকার বেশির ভাগটাই পাঠাতে হত বাড়িতে বাবাকে ছোট ভাইবোনদের করুণ মুখগুলির কথা ভেবে। নামমাত্র ভাড়ায় নিজে আস্তান নিলেন প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারসে।

আলোবাতাসহীন নোংরা নরকসদৃশ পরিবেশে ছোট্ট একটা কুঠুরিতে থেকে দিন কাটতে থাকে লামার্কের।

বাড়ি থেকে আরো টাকার তাগিদ আসতে লাগল ক্রমাগত। তাই বাধ্য হয়েই বেশি রোজগারের আশায় ব্যাঙ্কের কাজ ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলেন ভাড়াটে সাংবাদিকের কাজ।

ছেলেবেলায় ভাল গাইতে পারতেন। এই সময় প্যারিসের রাস্তায় গান শুনিয়েও রোজগার করতে হয়েছে তাঁকে কিছুদিন।

এত কিছুর মধ্যেও স্বপ্ন দেখতেন লামার্ক। জীবনে বড় হবার স্বপ্ন—দুঃখী মানুষদের দুঃখ দূর করার স্বপ্ন।

সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নাতেই একদিন সবকিছু ছেড়ে ভর্তি হয়ে গেলেন ডাক্তারি ক্লাশে।

এই সময়েই যেন ভাগ্যেব চাকা অকস্মাৎ মোড় ঘুরল লামার্কের জীবনে। ডাক্তারি পড়ার সময়েই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ফরাসী দার্শনিক ও জীববিজ্ঞানী জ্যাকুইশ রুশোর। তাঁর প্রভাবেই ধীরে ধীরে লামার্কের সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ ঘটল। লামার্ক আকৃষ্ট হলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রতি এবং তিনি উপলব্ধি করতে পারেন এতদিনে জীবনের সঠিক পথে পা দিতে পেরেছেন। এতদিনের লক্ষ্যহীন জীবনে এভাবেই পেলেন তিনি স্থিতি ও আত্মবিশ্বাস।

রুশোর প্রেরণায় উদ্ভিদ জগতের বিষয়ে যতই পড়াশুনা করেন লামার্ক বুঝতে পারেন, এক অন্তহীন প্রকৃতি, সুন্দর অরণ্য-পথ তাঁর সম্মুখে বিস্তৃত। সেই পথের মোড়ে মোড়ে রহস্যের হাতছানি। আনন্দ তৃপ্তিতে এই নতুন পথেই পদচারণা শুরু করেন লামার্ক।

তাঁকে পথ দেখাতে থাকে রুশোর উপদেশ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পূর্বসূরী মহাবিজ্ঞানীদের সাধনা।

উদ্ভিদ জগতের নানা গাছপালা, লতাপাতা ফুলফলের একটা বৈজ্ঞানিক ছক তৈরি করেছিলেন কার্ল লিনিয়াস। তাদের নতুন নামকরণও তিনিই করেছিলেন। কিন্তু অসংখ্য উদ্ভিদের মধ্যে কোনো শ্রেণীবিভাগ তিনি করে যেতে পারেননি। প্রথমে লিনিয়াসের সেই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করার সংকল্প নিলেন লামার্ক।

এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে উদ্ভিদ জগতের অন্তঃসঞ্চারী জীবন-স্পন্দনটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে লামার্ক উদ্ভিদ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বইপত্র নিয়ে ডুবে গেলেন।

কিন্তু কেবল কেতাবি অভিজ্ঞতা হলেই তো চলবে না। চাই প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা।

ইতিপূর্বে অরণ্য পর্বত ঘুরে দেখার সুযোগ তাঁর জীবনে ঘটেনি। তখনও যে পর্যটনে বেরিয়ে পর্যবেক্ষণে নামবেন তেমন অর্থ তাঁর কোথায়? তাই ভেবে ভেবে এক উপায় বার করলেন।

তিনি দেশের ও বিদেশের পর্যটকদের সঙ্গে মিশে দেশ-বিদেশের গাছপালা ফুলফল ও উদ্ভিদ ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নানা বিষয় জানার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এভাবে খুব একটা সুবিধা যে হল তা নয়। বেশির ভাগ পর্যটকই তাঁর সব উদ্ভট প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে নিত, অনেকে তাঁকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতে লাগল।

বাধ্য হয়ে লামার্ক নিজেই এবারে প্যারিসের উপকণ্ঠে বনজঙ্গলে ঘোরা আরম্ভ করলেন। নদীর ধারে, বনে বাদাড়ে গাছপালার নমুনা দেখে দেখে দিন কাটতে লাগল তাঁর। খুঁজে খুঁজে তিনি সংগ্রহ করতে লাগলেন বিচিত্র সব নমুনা।

অনেক সময়, যাঁরা প্যারিসের বাইরে বেড়াতে যেত লামার্ক তাদের বিশেষ উদ্ভিদের নমুনা নিয়ে আসার অনুরোধ জানাতেন। এভাবে সংগৃহীত নমুনা জড়ো করা হতে লাগল তাঁর চিলেকোঠায়। দিনে দিনে সংগৃহীত হয়ে চলল দেশ বিদেশের নানা জানা-অজানা বিচিত্র উদ্ভিদের সঞ্চয়।

ক্রমে ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ওপর নিজস্ব একটা অভিজ্ঞতা গড়ে উঠল লামার্কের। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এরপরে তিনি লিখে ফেললেন একটি বই। নাম দিলেন Flare francaise বা উদ্ভিদের কথা।

বইটি প্রকাশিত হবার পরে সমাদৃতও হল। বিক্রি হতে লাগল হু হু করে। বই বিক্রির টাকা থেকে লেখকের প্রাপ্তিযোগও মন্দ হল না।

অনেকদিন পরে ইচ্ছে মতো খরচ করার উপযুক্ত বেশ কিছু টাকা পেয়ে উল্লসিত হন লামার্ক। সবার আগে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন বাড়িতে। অবশিষ্ট টাকায় নিজের গবেষণার কাজ চালাতে লাগলেন।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে বইটির সুবাদে প্যারিসের বিদগ্ধ মহলেও পরিচিতি লাভ করলেন লামার্ক। এবারে সুযোগও আর অধরা থাকল না। সৌভাগ্যগুণে যেন নিজে থেকেই ধরা দিতে লাগল।

প্যারিসের এক বিশিষ্ট অভিজাত হলেন কাউন্ট বাফুন। প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের কথাও সুবিদিত। লামার্কের বইটির প্রশংসা শুনে তিনি একদিন লেখককে ডেকে পাঠালেন প্রাসাদে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লামার্ক জানতে পারেন, বাফুন তাঁর ছেলেকে পাঠাতে চান ইউরোপের অরণ্য পর্বত ঘুরে দেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। তাঁর ইচ্ছা, লামার্ক গাইড হিসাবে সহযাত্রী হন তাঁর ছেলের।

বাফুনের প্রস্তাবে লামার্ক যেন হাতে স্বর্গ পান। মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধনীর দুলালকে ইউরোপের নানা দেশ ঘুরিয়ে দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বিশাল উদ্ভিদ জগতের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের এমন রথ দেখা ও কলাবেচার মতো মওকা কি সহজে পাওয়া যায়? এককথায় রাজি হয়ে গেলেন লামার্ক।

যথাসময়ে বাফুনের ছেলেকে নিয়ে ইউরোপ পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন এবং একদিন তাঁরা ফিরেও এলেন প্যারিসে।

ততদিনে লামার্কের সান্নিধ্যে নিসর্গ বিষয়ে বাফুনের ছেলে যথেষ্ট সচেতনা লাভ করেছে। সন্তুষ্ট হন বাফুন। খুশি হয়ে তিনি মোটা অঙ্কের ফ্রাঙ্ক পুরস্কার হিসাবে তুলে দেন লামার্কের হাতে।

এখানেই ক্ষান্ত হলেন না বাফুন। ততদিনে তিনি লামার্কের গুণমুগ্ধ সহযোগীতে পরিণত হয়েছেন। নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে প্যারিসের বিজ্ঞান আকাদেমিতে লামার্ককে জুটিয়ে দিলেন সদস্যপদ।

বাফুনের চেষ্টায় উৎসাহে অভিজাত মহলেও লামার্কের নাম ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হল না।

ক্রমে লামার্কের উদ্ভিদ বিষয়ে প্রতিভার খ্যাতি এতটাই বিস্তৃত হল যে সম্রাট ষোড়শ লুই স্বয়ং তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর প্রিয় পুষ্পোদ্যান জার্ডিন ডুবয়-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লামার্কের হাতে তুলে দিলেন।

তাঁর প্রত্যক্ষ তদারকিতে অল্প দিনেই ফুলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠল রাজকীয় উদ্যান। শোভায় সৌন্দর্যে অতুলনীয় জার্ডিন ডুবয় উদ্যানের খ্যাতি প্যারিসের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল।

লামার্ক যেই সময়ে সম্রাটের বাগানের দায়িত্বে কর্মরত সেই সময়েই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল মুক্তিকামী ফরাসী জনগণের বজ্রকণ্ঠ।

সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে উদ্ভূত গণজাগরণের পরিণতিতে সংঘটিত হল ফরাসী বিপ্লব। দেশে প্রতিষ্ঠিত হল ফরাসী গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার।

এই বিধ্বংসী বিপ্লব পর্বে সর্বহারাদের নতুন মারণাস্ত্র গিলোটিনে প্রাণ দিতে হল বহু অভিজাত, রাজপুরুষ ও নির্দোষ নাগরিকদের। দেশের বহু প্রতিভাবান পুরুষকেও গিলোটিনের বলি হতে হল।

বেগতিক বুঝতে পেরে জার্ডিনের রাজোদ্যান ছেড়ে সর্বহারাদের দলে সামিল হলেন লামার্ক। ফরাসী প্রজাতন্ত্রী সরকার ইতিমধ্যে জার্ডিন ডুবয় উদ্যানের নাম বদল করে নতুন নামকরণ করলেন জার্ডিন দেৎপ্লান্টেস।

সেই সঙ্গে লামার্ককেও নতুন সরকারের অধীনে নতুন কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করে প্রতিভার স্বীকৃতি জানানো হল। তিনি হলেন জাতীয় ইতিহাস সংরক্ষণশালার প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক।

এই প্রতিষ্ঠানে সেই সময়ে স্বমহিমায় বিরাজ করছিলেন প্রাণিবিদ্যার অন্যতম প্রতিভাবান গবেষক জিওফ্রে সেঁৎ হিলারী। লামার্ক নিলেন কীটপতঙ্গ ও আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের দায়িত্ব। এই সময়েই লামার্ক তাঁর গবেষণার নিজস্ব শাখাটির নামকরণ করলেন Biology।

এখানে ইতিহাস সংরক্ষণশালার প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারেই লামার্ক তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের সন্ধান পান। তাঁর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যকে কাজে লাগিয়ে এই সময়ে তিনি যাবতীয় জীবকুলকে শ্রেণীবদ্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করলেন।

জীবজন্তুদের বৈজ্ঞানিক নাম নির্দিষ্ট করতে বসে তিনি জীবজন্তু পশুপাখীদের জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের চরম সত্যের সন্ধান লাভ করেন। এই সূত্রেই মানবসৃষ্টির প্রাকৃতিক রহস্যটির উৎস-মুখ তথা বিবর্তনকে প্রাণিবিদ্যার এক সম্পূর্ণ মৌলিক তত্ত্ব হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম প্রচার করেন।

তাঁর এই বিবর্তন তত্ত্বেরই ব্যাখ্যাকার হিসাবে পরবর্তীকালে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন চার্লস ডারউইন।

লামার্ক দেখলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত পরিবেশে জীবনের ভারসাম্য অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে জীবদেহ ও স্বভাবে ঘটে রূপান্তর। জীবদেহের নির্দিষ্ট কোন অঙ্গের বহুল ব্যবহার সেই অঙ্গটিকে করে তোলে সবল, দেয় প্রায়োজনানুগ গঠন। এই ভাবে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট সেই অঙ্গের রূপান্তরক্রিয়া চলতে থাকে।

একইভাবে নির্দিষ্ট কোন অঙ্গের দীর্ঘদিনের অব্যবহার বা কম ব্যবহারের

ফলে ক্রমে অঙ্গটি হয়ে পড়ে নিস্তেজ এবং সর্বশেষে ঘটে অবলুপ্তি। পরিবর্তনের এই ধারাটিই হল জীবদেহের বিবর্তন যা অব্যাহত গতিতে বহমান থাকে বংশ পরম্পরায়।

লামার্ক আরও বলেছেন, জীবদেহের পরিবেশানুগ এই পরিবর্তনের গতি কিন্তু ধীর—অতি ধীরে তা সঞ্চারিত হয় বংশ পরম্পরায় এবং অঙ্গের আকার ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই নিরূপিত হয় দেহের গঠন ও অভ্যাস।

বস্তুতঃ জীবজন্তু পশুপাখির শরীর ও অঙ্গের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই প্রকাশ পায় তাদের পূর্বপুরুষের অভ্যস্ত জীবনধারা, অভ্যাস ও পরিবেশের পরিচয়।

লামার্ক তাঁর এই মৌলিক তত্ত্বের নামকরণ করেছেন Theory of Acquered characteristics। এই তত্ত্বের স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ ও ব্যাখ্যাসহ রচনা করলেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত বই Philosophic Zoologique। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮০৯ খ্রিঃ।

এই বইতে তাঁর সম্পূর্ণ তত্ত্বটিকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন লামার্ক। প্রথমভাগে তিনি বলেছেন, পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা থেকেই উদ্ভিদ ও পশুপাখির দেহের গঠনের বংশানুক্রমে পরিবর্তন ঘটে যায়। উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন, নির্দিষ্ট অভিমুখে ধাবিত বাতাস যদি কোন গাছকে ক্রমাগত অবনমিত করতে থাকে তবে কালক্রমে বায়ুর গতি সামাল দেবার প্রয়োজনে গাছটি বেঁকে যাবে।

একইভাবে, বরফঢাকা সুমেরু অঞ্চলে বসবাসকারী জন্তুজানোয়ার প্রত্যেকের দেহেই দেখা যায় ঘন লোমের চাদর। বরফাচ্ছন্ন অঞ্চলের হিমশীতল পরিবেশে এই লোমের চাদরই প্রাণীদের শরীরের উত্তাপ ধরে রেখে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখে।

দ্বিতীয় ভাগে তিনি বলেছেন, জীবের কোনও নির্দিষ্ট অঙ্গগঠনের রূপান্তর বা পরিবর্তন নির্ভর করে সেই অঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহারের ওপরে। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে দেখা যায় ব্যালে নর্তক-নর্তকীদের পায়ের পেশী যথেষ্ট উন্নত ও বলিষ্ঠ। পেশার কারণেই কামারদের হাতের পেশী এমন শক্ত ও সুগঠিত হয়ে থাকে।

লামার্ক তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বলেছেন, অভ্যাস ব্যবহারের ধারায় প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য জীবদেহে অতি ধীর গতিতে দীর্ঘ সময় ধরে বংশধারায় আত্মপ্রকাশ করে। গাছের উঁচু ডালের কচিপাতা খাবার ক্রমাগত প্রচেষ্টা প্রবণতা রূপে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে জিরাফকে অস্বাভাবিক লম্বা গলাওয়ালা প্রাণীতে রূপান্তরিত করেছে।

লামার্কের উপস্থাপিত প্রথম দুইটি তত্ত্ব সম্পর্কে সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা কোন প্রশ্ন তোলেননি। তাঁরা মেনে নিয়েছেন, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

কিন্তু, পরিবেশের অনুবর্তী হয়ে চলায় প্রাপ্ত প্রবণতা যে বৈশিষ্ট্য রূপে বংশ ধারায় প্রবাহিত হয় এই তত্ত্বটিকে তাঁরা অবৈজ্ঞানিক ও ভুল সিদ্ধান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁদের যুক্তির স্বপক্ষে ইঁদুরের ওপরে একটি পরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরলেন।

কিছু স্ত্রী ও পুরুষ ইঁদুর ধরে তাদের লম্বা লেজ কেটে দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বসবাস করার কিছুদিন পরে স্ত্রী ইঁদুরদের যেসব শাবক জন্মাল তাদের লেজের গঠনে কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি।

এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন, লামার্কের তত্ত্ব যদি নির্ভুল হত তাহলে মুষিক শাবকদের লেজহীন হয়ে জন্মাতে দেখা যেত। পিতামাতার কর্তিত লেজের বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি বলেই স্বাভাবিক দীর্ঘ লেজ তারা জন্ম থেকেই লাভ করেছে।

সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা কিন্তু কেউই লক্ষ্য করেননি যে লামার্ক স্পষ্টই তাঁর তৃতীয় তত্ত্বাংশে বলেছেন, অভ্যাস ব্যবহারে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য বংশধারায় বহু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উত্তর পুরুষের স্বভাবে প্রকটিত হয়। আকস্মিক অঙ্গহানি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে পারে না।

সমসাময়িক জীববিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হলেও লামার্কের Theory of Adaptation বা অভিযোজন তত্ত্ব আবিষ্কার ব্যর্থ হয়নি।

বর্তমান জীব প্রযুক্তির ক্রমোন্নতির মূলে জীবতাত্ত্বিকদের পথ প্রদর্শক বলে যদি স্বীকার করতে হয় ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিশিষ্ট ভাবনা, তাহলে স্বীকার করতেই হয়, লামার্কের তত্ত্বই ছিল ডারউইনের বিবর্তনবাদের মহৎ ভাবনার পথপ্রদর্শক।

প্রকৃত প্রস্তাবে, লামার্কই সর্বপ্রথম তাঁর জীবদেহে প্রাপ্ত-বৈশিষ্ট্যের বিশিষ্ট ভাবনাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিশ্লেষণের পথে সঞ্চারিত করেছিলেন উত্তরকালের জীববিজ্ঞানে। সংশোধিত হয়েছিল তাঁর অভিযোজনবাদের ভুল-ত্রুটি সমূহও।

জীববিজ্ঞানের গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ লামার্কের ব্যক্তিগত জীবন ছিল দুঃখময়, একের পর এক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত। দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণা ও স্বজন হারানোর বেদনা তাঁকে পীড়িত করেছে জীবনভোর।

বার বার পত্নীবিয়োগের কারণে জীবনে চারবার বিবাহ করতে হয়েছে তাঁকে। ফলে মাতৃহারা সন্তানদের ক্রমবর্ধমান চাপ তাঁকে সামলাতে হয়েছে

সীমিত উপার্জন থেকেই। একারণে গবেষণার কাজেও বিঘ্ন ঘটেছে। দুই দিকের সমতা বিধান করতে গিয়ে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হয়েছেন। তবুও ভেঙ্গে পড়েননি। অসামান্য মনোবল ও প্রতিভার সাহায্যে সমস্ত প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে নতুন নতুন ভাবনা ও আবিষ্কারের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানী, তারপর জীববিজ্ঞানী।

অন্নহীন বস্ত্রহীন জীর্ণদেহ বিজ্ঞানীর সম্বল বলতে ছিল কাউন্ট বাফুনের বদান্যতা। এছাড়া দেশের অভিজাত মহলের সামান্য স্বীকৃতিও জোটেনি তাঁর ভাগ্যে। আর শেষ জীবন পর্যন্ত একমাত্র কন্যা কর্নেলির সেবা-যত্নই ছিল তাঁর বাঁচার অবলম্বন। গীর্জার কাজে সামান্য উপার্জন কর্নেলি অকাতরে পিতার সেবায় ব্যয় করেছেন।

অন্যান্য সন্তানেরা ডানা গজাবার পরেই ডানা মেলে ত্যাগ করেছিল তাদের হতভাগ্য পিতাকে। পিতৃভক্ত কর্নেলির সাহায্যেই লামার্ক শেষ করতে পেরেছিলেন তাঁর প্রাণিবিদ্যার ওপরে ষষ্ঠ বইটি লেখার কাজ এবং তার পরে পরেই ১৮২৯ খ্রিঃ ছেদ পড়ে তাঁর মরজীবনের।

রেভারেন্ড লালবিহারী দে

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে নিজ নিজ চিন্তা ও কর্মকৃতিত্বের মাধ্যমে যেসকল মনীষী ভারতে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ও প্রসার ঘটিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রেভারেন্ড লালবিহারী দে অন্যতম।

স্বদেশকল্যাণব্রতী এই মনীষীর প্রশস্তি রচনা করে কবি দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধুনী কাব্যে লিখেছেন—খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বী, ধর্মসুধা পান,

অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।

বর্ধমান জেলাব সোনাপলাসী গ্রামে এক সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্ম হয় লালবিহারীর। তাঁর পিতার নাম রাধাকান্ত দে। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। রাধাকৃষ্ণের সেবা-পূজাতেই দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন। আরাধ্য দেবতার স্মরণে তাই বালক পুত্রের নাম রেখেছিলেন কালা গোপাল।

পিতার তত্ত্বাবধানে লালবিহারী ছেলেবেলায় গ্রামের পাঠশালাতেই লেখাপড়া শুরু করেন। তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল গোপীকান্তের পাঠশালায়। সেখানে তিনি বাংলা ও অঙ্ক শিক্ষা করেন।

গোঁড়া বৈষ্ণব রাধাকান্তের বাস্তববুদ্ধির অভাব ছিল না। তাই ছেলেকে যুগোপোযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় নিয়ে আসেন। সেই সময় লালবিহারীর বয়স নয় বছর।

এ দেশের লোকেদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইংরাজ খ্রিস্টান মিশনারি ডাফ সাহেব ১৮৩০ খ্রিঃ কলকাতায় একটি স্কুল খুলেছিলেন। এই স্কুলের নাম হয়েছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলি। এই স্কুলে যেসব ছেলে পড়তে আসত তাদের মাইনে দিতে হত না।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের সুপারিশে লালবিহারীকে ডাফ সাহেবের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়।

লেখাপড়ার প্রতি বালক লালবিহারীর ছিল গভীর আগ্রহ ও অধ্যবসায়। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এখানে ছাত্র শিক্ষক সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ডাফ সাহেবের স্কুলে পড়বার সময়ে লালবিহারী ইংরাজী ভাষা সাহিত্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন।

১৮৩৮ খ্রিঃ পিতার মৃত্যু হলে তাঁর পড়াশুনা চালানো দুষ্কর হয়ে ওঠে। কলকাতায় থাকা ও বই খাতা কেনা ইত্যাদির খরচা নিয়ে তাঁকে খুবই সঙ্কটে পড়তে হয়।

শেষ অবধি এক জ্ঞাতি ভাইকে ধরে তার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে থেকেই নিয়মিত পড়াশুনার কাজ চলতে লাগল।

সেই কালে ডেভিড হেয়ার সাহেবের হিন্দু স্কুলের খুবই নামডাক। হেয়ার সাহেব ঈশ্বর, ধর্ম এসব আমল দিতেন না। খ্রিস্টান মিশনারিদের ক্রিয়াকলাপও পছন্দ করতেন না।

তিনি বলতেন, দেশের হিন্দু ছেলেদের খ্রিস্টান করার উদ্দেশ্যেই মিশনারিদের যত কিছু জনহিতমূলক তৎপরতা। হেয়ার সাহেব ছিলেন দয়ালু, উদারচেতা ও যথার্থ শিক্ষাব্রতী পুরুষ। তাঁর স্কুলে যারা পড়ত তারা সহজেই হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ পেত।

লালবিহারী একদিন হেয়ার সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর স্কুলে নেবার অনুরোধ জানালেন।

হেয়ার সাহেব যখন শুনলেন যে লালবিহারী মিশনারি ডাফ সাহেবের স্কুলে পড়ছেন, তখন সরাসরি বলে দিলেন, তুমি তো নিউ টেস্টামেন্ট পড়, আধা খ্রিস্টান হয়ে গেছ। এখানে এলে তুমি আমাদের ছেলেদের নষ্ট করবে।

এরপর লালবিহারীর আর হেয়ার স্কুলে পড়ার সুযোগ হল না।

এদিকে কলকাতায় একটা আশ্রয়ের সুরাহা হলেও পয়সার অভাবে বইপত্র কেনা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু চিরকালই উদ্যোগী পুরুষের সুযোগের অভাব হয়

না। চেষ্টাচরিত্র করে লালবিহারীও শেষ পর্যন্ত এক মুসলমান বই ফেরিওয়ালার সঙ্গে রফা করে নিলেন, বদলা বদলি করে তাঁর কাছ থেকে বই ধার নেবেন।

এই ভাবে লালবিহারী পাঠ্যবই ছাড়াও বিদেশের বিখ্যাত লেখক মনীষীদের বহু বই পড়ে ফেললেন।

স্কুলের পরীক্ষাতে ফলাফলও ভাল হতে লাগল। ভাল ফলাফলের জন্য তিনি স্বর্ণপদক পুরস্কারও পেয়েছেন।

১৮৪৩ খ্রিঃ উনিশ বছর বয়সে লালবিহারী রেভারেন্ড ডাফ কর্তৃক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এই বছরেই আর একজন ইতিহাস বিখ্যাত বঙ্গসন্তানও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ধর্মান্তরিত হবার পর খ্রিস্টরীতি অনুযায়ী লালবিহারী নিয়মিত ডাফ সাহেবের গির্জায় যেতে লাগলেন। তিন বছর পরে ১৮৪৬ খ্রিঃ তিনি ধর্ম প্রচার ও যাজকতা শিক্ষার ক্লাশে ভর্তি হন।

১৮৫১ খ্রিঃ লালবিহারী খ্রিস্টধর্ম প্রচারক-উপদেশকের পদ লাভ করেন। ১৮৫৫ খ্রিঃ হন রেভারেন্ড।

১৮৬০ খ্রিঃ সুরাটের এক পার্সি খ্রিস্টান পরিবারের বিদুষী কন্যাকে বিবাহ করেন লালবিহারী। তাঁর স্ত্রীর নাম বাচুভাই। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন।

বিবাহের পর সস্ত্রীক কলকাতায় এসে লালবিহারী বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় চার্চে ধর্ম উপদেশক পদে যোগ দেন।

ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটলেও লালবিহারী ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙ্গালী। স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি উপলব্ধি করতেন, দেশের লোককে মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তাদের উন্নতি সম্ভব নয়।

এই উদ্দেশ্যে নতুন কর্মস্থলে আসার পরে তিনি অরুণোদয় নামে একটি বাংলা পাক্ষিক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন। বস্তুত এই ভাবেই তাঁর প্রথম সাংবাদিকতা ও সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হয়।

অরুণোদয়ের বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তিনি নানা শিক্ষণীয় বিষয় প্রচার করতে থাকেন।

মাতৃভাষা শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে তিনি লিখেছেন, 'মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে কখনওই বিদেশী রাজভাষা শিক্ষা সহজ হয় না। স্বদেশীয় মাতৃভাষা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রতিটি বঙ্গসন্তানের কর্তব্য।'

সেই কালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা অবজ্ঞা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান লাভকে সামাজিক ও কর্মজীবনে কৌলীন্য অর্জনের চাবিকাঠি বলে বিবেচনা করত।

এই সামাজিক পরিস্থিতির তীব্র প্রতিবাদ করে লালবিহারী লিখেছেন, ‘‘সাহিত্যের প্রকৃত উপাদানের জন্য আমাদের পরদেশী ইংরাজী বা সংস্কৃতের দ্বারস্থ হবার দরকার করে না। প্রকৃত সাহিত্যের সামগ্রী আমাদের ঘরেই রয়েছে। সাহিত্যের দ্বারা বাংলাদেশের উন্নতি করতে হলে বাংলা দেশের নিজস্ব সামগ্রী নিয়েই সাহিত্য রচনা করতে হবে।’’

লালবিহারী ইংরাজি ভাষাতেও বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু অরুণোদয় পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষার গুরুত্ব বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন ও সজাগ করার চেষ্টা করেছেন। এই পত্রিকাটি ১৮৬২ খ্রিঃ পর্যন্ত চলেছিল।

১৮৬৭ খ্রিঃ লালবিহারী সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং মুর্শিদাবাদে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন।

পাঁচ বছর স্কুলে শিক্ষকতার পরে তিনি হুগলী মহসীন কলেজে ইংরাজির অধ্যাপকপদে যোগ দেন। কলেজে ইংরাজী ছাড়াও ইতিহাস দর্শন বিষয় পড়াতেন।

কলেজে পড়াবার সময়েই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বেঙ্গল ম্যাগাজিন। ১৮৭৭ খ্রিঃ তিনি ভারতে ইংরাজী সাহিত্য চর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ফেলো নির্বাচিত হন।

লালবিহারী সরাসরি ইংরাজ শাসনের বিরোধিতা না করলেও ইংরাজদের বর্ণ বৈষম্য নীতির তীব্র সমালোচনা করতেন।

রো ও ওয়েব সাহেব ১৮৭৪ খ্রিঃ তাঁদের লেখা Hints on the study of English বইয়ের ভূমিকায় ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীদের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছিলেন, বাঙ্গালীরা শুদ্ধ ইংরাজি লিখতে পারে না। তারা যা লেখে তা হল Babu English.

সাহেবদের এই মন্তব্যে জাত্যাভিমানে গর্বিত লালবিহারী যথাসময়ে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। তিনি Hints on the study of English বইটি জোগাড় করে অদ্যোপান্ত পড়ে প্রতি পাতায় ইংরাজি লেখার ভুল খুঁজে খুঁজে বার করলেন। পরে লিখলেন যে বাঙ্গালীদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষিত এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁদের পায়ের কাছে বসে রো ও ওয়েবসাহেব ইংরাজি লেখা শিখতে পারেন।

অধ্যাপক হিসাবে হুগলী কলেজে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন লালবিহারী।

কিন্তু সরকারী চাকরিতে ইংরাজদের বর্ণবৈষম্য নীতির জন্য তিনি কলেজের অধ্যাপকপদ লাভ করেন নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে লালবিহারীর অবদান স্মরণীয়। বেথুন সোসাইটির অন্যতম সক্রিয় সদস্য রূপে তিনি অসাধারণ কয়েকটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধগুলি হল, Primary Education of Bengal(১৮৫৮), Vernacular Education in Bengal(১৮৫৯), English Education in Bengal (১৮৫৯), Compulsory Education in Bengal(১৮৬৯), Teaching of English Literature in the College of Bengal(১৮৭৪) প্রভৃতি।

এই সকল প্রবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বরাবরই মাতৃভাষার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাধারণের শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। অবহেলিত স্ত্রী শিক্ষার প্রতিও তিনি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

এই সব প্রবন্ধে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকার সচেতন হন এবং এই বিষয়ে পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব দেন লালবিহারীর ওপর।

জনশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেও সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় নির্বাহের জন্য জমির ওপর অতিরিক্ত কর বসাতে চেয়েছিলেন।

লালবিহারী বিশ্বাস করতেন, সমাজের প্রতিটি মানুষেরই শিক্ষালাভের অধিকার আছে এবং শিক্ষাদান সরকারেরই কর্তব্য। তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সরকারের মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করেন।

লালবিহারী হিন্দুসমাজের বিভিন্ন কু-প্রথা বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথার যেমন কঠোর সমালোচনা করতেন, তেমনি জমিদারের রায়ত শোষণ ও সরকারের ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যের বিরোধিতাও করতেন।

১৮৭১ খ্রিঃ উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। রচনার বিষয় ছিল Social and Domestic life of the Rural Population and Working Class in Bengal.

লালবিহারী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি গোবিন্দ সামন্ত বা History of a Bengal Raiyat নামক অসাধারণ উপন্যাস রচনার জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার পান।

এই রচনায় তিনি একদিকে যেমন জমিদারেদের অত্যাচার ও শোষণের পাশাপাশি সমাজপতিদের নির্দয় ব্যবহার ও হিন্দু বিধবাদের নির্যাতীত জীবন, সতীদাহ, হিন্দু বিবাহ ইত্যাদির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তেমনি গ্রামসমাজের শিক্ষাহীনতা, কুসংস্কার এবং মহাজন, জোতদার সরকারী কর্মচারী, নীলকুঠির

সাহেবদের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মতামত স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন।

বর্ধমান জেলার গ্রামের দরিদ্র চাষী গোবিন্দ সামন্তের জীবন কেন্দ্রিক কাহিনী তিনি দুই খন্ডে সম্পূর্ণ করেন। পুস্তকাকারে প্রকাশের পর এই রচনা তৎকালীন সমাজে প্রবল আলোড়ন তোলে। ১৮৭৮ খ্রিঃ গ্রন্থটির নতুন সংস্করণে নামকরণ করা হয় Bengal Peasent life.

প্রাণিজগতে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন লালবিহারীর এই অতি বিখ্যাত উপন্যাসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এক চিঠিতে তিনি বইটির প্রকাশককে লেখেন, ''I shall be glad if you would tell him with my compliments how much pleasure and instruction, I derived from reading a few days ago, his novel Govinda Samanta.''

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে লালবিহারী সমধিক খ্যাত তাঁর Folk tales of Bengal গ্রন্থের জন্য। গ্রামের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত উপকথা রূপকথা সংগ্রহ করে তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

বস্তুত এই দুটি গ্রন্থের মধ্যেই বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর একটি গ্রন্থ Relloctions of Alexander Duff লন্ডন থেকে ১৮৭৯ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।

লালবিহারী ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা পুরুষ। স্বজাতির মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোসহীন। তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন মিশনারি ডাফ সাহেব। তাঁর প্রতি লালবিহারীর ছিল পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা ভক্তি। অথচ দেশীয় চার্চগুলির উচ্চতর পরিচালন সমিতি মিশন কাউন্সিলে কোনও ভারতীয় খ্রিস্ট উপাসক, এমন কি রেভারেন্ড পদাধিকারী ব্যক্তিদেরও নেওয়া হবে না বলে ডাফ সাহেব মন্তব্য করলে, তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেন নি। ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদমূলক নীতির জন্য তিনি মর্মপীড়া বোধ করতেন এবং এই নীতির প্রতিবাদে শেষ জীবন পর্যন্ত সোচ্চার ছিলেন।

১৮৮৯ খ্রিঃ লালবিহারী হুগলী কলেজের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কলকাতায় বেনেপুকুর অঞ্চলে এসে বসবাস করতে থাকেন।

স্বদেশহিতৈষী উদার হৃদয় এই কৃতী বঙ্গসন্তানের শেষ জীবন সুখের ছিল না। ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়ে তাঁর বড় ছেলে খ্রিস্টান সন্ন্যাসী হয়ে যান। এই ঘটনায় তাঁকে তীব্র মানসিক যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। বেনেপুকুরের বাসাতেই ১৮৯৪ খ্রিঃ ২৮ অক্টোবর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মুষ্টিমেয় যে কয়জন সমাজ সচেতন ভারতীয় সংগ্রামী মানুষের হাতে ব্রিটিশ ভারতে রাজনীতির গোড়াপত্তন হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ডবলিউ. সি. বোনার্জি (W.C. Bonnerjee) নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর কৃতি বঙ্গসন্তান উমেশচন্দ্রের প্রধান পরিচয়, তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রথম সভাপতি।

উমেশচন্দ্রের জীবনকাহিনী বস্তুতঃ কুসংসর্গে বিপথগামী এক বালকের আত্মোন্নয়নের সংগ্রামের ইতিহাস। তাঁর জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে।

আদ্যন্ত সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী এমনই এক বিশিষ্ট পরিবারে উমেশচন্দ্রের জন্ম। কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে সোনাই বাটি নামক পৈতৃক ভবনে ১৮৪১ খ্রিঃ ২৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম সরস্বতী দেবী।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। কোন এক সময়ে সেখান থেকে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বাগান্ডা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

গিরিশচন্দ্রের পিতা পিতাম্বর বালক বয়সেই কর্ম সন্ধানে জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় নিমতলা অঞ্চলে অভিরাম মিশ্রের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করেন।

পরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত বালক পিতাম্বরের লেখাপড়া শেখার বিশেষ সুযোগ ছিল না। তথাপি প্রবল অধ্যবসায় থাকায় একরকম নিজের চেষ্টাতেই তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন।

খাগ বা পালকের কলম কেনার সামর্থ ছিল না। তাই নিমতলা ঘাট থেকে শকুনের পালক কুড়িয়ে, তা দিয়ে কলম বানিয়ে কাঠের পিঁড়ি পেতে তিনি লেখা অভ্যাস করতেন।

এই ভাবে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে পিতাম্বর ভবিষ্যতের সংগ্রামী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন।

উপযুক্ত পরিশ্রম কখনো বিফল হয় না। দরিদ্র পিতাম্বরও পরবর্তীকালে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করেছিলেন।

প্রচন্ড দুঃখ কষ্টের মধ্যেও কখনও তিনি ধর্ম বিশ্বাস হারাননি। আজীবন সৎভাবে জীবনযাপন করেছেন। বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের অলঙ্কার। এই

গুণাবলীর প্রভাবে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

একজন মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ান হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন পিতাম্বর। কালে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। অর্থবিত্তের অধিকারী হয়েও নিজের কষ্টের দিনগুলির কথা ভুলে যাননি। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষালাভ ও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন।

তাঁর বদান্যতার খ্যাতি এমনই ছিল যে লোকের মুখে মুখে তিনি রাজা পিতাম্বর আখ্যা পেয়েছিলেন।

পিতাম্বর তাঁর পরিবারের বসবাসের জন্য খিদিরপুর অঞ্চলে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। এই ভবনের নাম দিয়েছিলেন সোনাই বাটী। এই বাড়িতেই উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়।

উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পিতাম্বরের প্রথম পুত্র। পিতার প্রেরণায় তিনি কলকাতায় আইন ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সুপ্রিম কোর্টের প্রসিদ্ধ অ্যাটর্নি হিসাবে তিনি যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

উমেশচন্দ্র ছিলেন পিতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর অগ্রজ কৈলাসচন্দ্র শৈশবেই মারা যান। তাই পিতার অত্যধিক স্নেহ ও প্রশ্রয়ে তিনি লালিত হয়েছিলেন।

পৈত্রিক সূত্রে উমেশচন্দ্র যেমন এক অসাধারণ সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকার লাভ করেছিলেন তেমনি মাতৃসূত্রেও এক মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের বিভিন্ন সদগুণাবলী লাভ করেছিলেন।

পরবর্তী কালে এই দুই পরিবারের সম্মিলিত ধারা তাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত ও সার্থকতা লাভ করতে দেখা যায়।

উমেশচন্দ্রের মাতমহ ত্রিবেণীর জগন্নাথ পঞ্চানন ছিলেন হিন্দু স্মৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন সাত্ত্বিক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পন্ডিত। স্বীয় বিদ্যাবত্তা, চরিত্রমাধুর্য ও বিচক্ষণতা প্রভাবে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হিন্দু আইন বিষয়ে পরামর্শদাতা বা আদালতে জর্জ পন্ডিতের পদ লাভ করেছিলেন।

তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে সেকালে অনেক কাহিনী লোকমুখে শোনা যেত। এই সূত্রে তাঁর জর্জ পন্ডিতের পদ লাভ করার কাহিনীটি স্মরণ করা যেতে পারে। মাতামহ সূত্রে উমেশচন্দ্রকেও অসামান্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে দেখা যায়।

একবার ত্রিবেণীর গঙ্গার ঘাটে জগন্নাথ সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন, এমন সময় সেখানে দুইজন নেশাগ্রস্ত ইংরাজ নাবিকের মধ্যে ঝগড়া মারামারি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ঝগড়া মীমাংসার জন্য দুই পক্ষই আদালতের দ্বারস্থ হয়।

মামলায় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তৃতীয় পক্ষের সাক্ষীর প্রয়োজন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র জগন্নাথ। কাজেই সন্ধান করে তাঁকে সাক্ষীদানের জন্য আদালতে উপস্থিত করা হয়।

জগন্নাথ ইংরাজি ভাষা জানতেন না। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অকপটে জানান, দুই ইংরাজের কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারেননি। তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে যে বাদবিতন্ডা হয়েছিল, তিনি তা হুবহু বলে দিতে পারবেন।

বিচারকের নির্দেশে সেই সময় জগন্নাথ দুই ইংরাজের তর্ক-বিতর্কের অবিকল পুনরাবৃত্তি করলে বাদী-প্রতিবাদী উভয়েই সবিস্ময়ে স্বীকার করে পন্ডিতজির প্রতিটি কথাই যথাযথ।

জগন্নাথের সাক্ষ্যের ওপরেই বিচারক মামলার নিষ্পত্তি করে অপরাধীর দন্ডবিধান করেন।

এই ঘটনায় জগন্নাথের অসামান্য স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে ইংরাজ সরকার তাঁকে সম্মানিত জজ পন্ডিতের পদে নিয়োগ করেন।

উমেশচন্দ্রের নিজের এবং মাতার উভয় পরিবারই ছিল সমাজে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন। তাই ছেলেবেলা থেকেই তিনি সাহেবিয়ানায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেই ভাবেই জীবনযাপন করেছিলেন।

পশ্চিমী শিক্ষার আলোকে তিনি লাভ করেছিলেন উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস। কিন্তু কুলীন হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হিসাবে ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন অবিচল।

শৈশবে উমেশচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চল-স্বভাব ও দুরন্ত। পড়াশুনার চেয়ে খেলাধুলো নিয়েই থাকতে ভালবাসতেন। কিন্তু অসাধারণ মেধা লাভ করেছিলেন জন্মসূত্রে। তাই দেখা যেত পরীক্ষার আগে অল্প সময় পড়াশুনা করেই ভাল ফল করতেন, পুরস্কারও পেতেন।

আদরে আব্দারের মধ্যে লালিত হওয়ায় উমেশচন্দ্র পিতামাতার শাসনের বড় একটা পরোয়া করতেন না। তাই কিশোর বয়সে একবার বাড়িতে অশান্তি করে পালিয়ে রানীগঞ্জে চলে যান। পরে খুঁজে খুঁজে এক কয়লা খনির কুলি মহল্লা থেকে তাঁকে বাড়ির লোকেরা নিয়ে আসে।

বাড়িতে ফিরেও লেখাপড়ায় মন বসাতে পারলেন না। সবসময়ই উড়ু উড়ু ভাব। এর মধ্যে দলবল জুটিয়ে নাটক অভিনয়ে মেতে উঠলেন।

তাঁকে প্রথমে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে। পরে হিন্দুস্কুল থেকে তাঁর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু প্রস্তুত না হওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারেননি।

বিরক্ত হয়ে পিতা গিরিশচন্দ্র ছেলেকে এক অ্যাটর্নির অফিসে আর্টিকল ক্লার্কের শিক্ষানবিশিতে ঢুকিয়ে দেন।

কিন্তু এখানেও কাজে মন বসল না কিশোর উমেশচন্দ্রের। কুসংসর্গের প্রভাবে পড়ে যখন তখন অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন, কাজের হাজিরাও ছিল অনিয়মিত।

অ্যাটর্নি গিলেন্ডার সাহেব ছিলেন গিরিশচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয়। বন্ধুপুত্রকে এভাবে উচ্ছন্নে যেতে দেখে একদিন তিনি উমেশচন্দ্রকে প্রচন্ড তিরস্কার করলেন। সাহেবের গালাগাল খেয়ে মর্যাদাবোধে প্রচন্ড আঘাত লাগল। আত্মধিক্কারের গ্লানিতে রাতারাতি নিজেকে যেন উপলব্ধি করতে পারলেন উমেশচন্দ্র। বুঝতে পারলেন, কুসঙ্গের সংস্পর্শে তিনি যেমন পিতার, পরিবারের মর্যাদা হানির কারণ হয়ে উঠেছেন তেমনি নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতও ধ্বংস করতে বসেছেন। এই্ জীবন তাঁর কাম্য হতে পারে না।

প্রবল আত্মবিশ্বাস ও কঠিন সঙ্কল্পের বলে উমেশচন্দ্র কুসংসর্গ পরিত্যাগ করলেন। মনস্থ করলেন, এদেশে আর নয়, বিলেতে গিয়েই পড়াশুনা করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুতও করতে লাগলেন। দিনরাত পড়াশুনা করে ইংরাজি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করলেন।

সংকল্প রূপায়নের উপযুক্ত সুযোগ পেতেও বিলম্ব হল না।

দেশীয় মেধাবী ছাত্রদের বিলেতে পড়াশুনা করার জন্য বর্তমান মুম্বই-এর এক ধনাঢ্য পার্সি রুস্তমজী জিজিভাই ১৮৬৪ খ্রিঃ বাংলা মুম্বই ও মাদ্রাজ (চেন্নাই) তিন প্রদেশে তিনটি মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। বৃত্তিপ্রার্থী ছাত্রদের একটি নির্বাচন কমিটির সামনে মৌখিক পরীক্ষায় বসতে হত।

যথাসময়ে উমেশচন্দ্র বৃত্তির জন্য আবেদন জানালেন এবং মৌখিক পরীক্ষায় ১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে সবৃত্তি বিলাত যাবার সুযোগ লাভ করলেন।

লন্ডনে মিডল টেম্পল ব্যারিস্টারি পাঠকালে উমেশচন্দ্র ১৮৬৫ খ্রিঃ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। যত্নসহকারে পড়াশুনা করে তিনি ১৮৬৮ খ্রিঃ ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। পিতৃবন্ধুদের চেষ্টায় উমেশচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেলেন। সেই কালে হাইকোর্টে ইংরাজ ব্যারিস্টারদেরই প্রাধান্য ছিল।

উমেশচন্দ্রের ছিল সহজাত মেধা, স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তার বলে ব্যারিস্টারি শুরু করার অল্প দিনের মধ্যেই পসার জমে উঠল। একের পর এক মকদ্দমায় সাফল্য লাভ করে তিনি অচিরেই হয়ে উঠলেন হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ

ব্যারিস্টার। সেকালের হিসাবে আইন ব্যবসায় তাঁর মাসিক আয় ছিল পর্বত প্রমাণ। মাসে অন্ততঃ কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার টাকা। এই বিপুল পরিমাণ টাকার অঙ্কই তাঁর পেশাগত সাফল্য প্রমাণ করে।

দেওয়ানি ও ফৌজিদারি মামলা পরিচালনায় উমেশচন্দ্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৮৭১ খ্রিঃ তিনি হিন্দু উইলস অ্যাক্ট সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ওই বছরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল ফ্যাকালটির প্রথম প্রেসিডেন্ট হন।

ব্যক্তিগত জীবনে সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী হলেও দেশের পরাধীনতার চিন্তা তাঁকে পীড়িত করত। এ কারণে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন।

সেই সময়ে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র পাল, শিশির ঘোষ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বমহিমায় বিরাজিত রয়েছেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম সাহেব ছিলেন ভারত সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারি। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি এদেশে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক দল সংগঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তাঁর উৎসাহে ও উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রিঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বোম্বাই শহরে। এই অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন।

বোম্বাই অধিবেশনেই প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেস দলের সভাপতি পদে বরণ করেন। উমেশচন্দ্রের এই সম্মান বাঙালী জাতির পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়।

উমেশচন্দ্র পরে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দেও এলাহাবাদ কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৮৯৩-৯৫ খ্রিঃ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে উমেশচন্দ্র ছিলেন সৎ উদার বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী। বাংলার দুর্ভাগ্যপীড়িত কবি মাইকেল মধুসূদনের দুঃসময়ে উমেশচন্দ্র যেভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি নিয়ে কবির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর জন্য কবি ও কবিপত্নী হেনরিয়েটা আমৃত্যু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

উমেশচন্দ্রের পত্নী হেমাঙ্গিনী দেবী ছিলেন নানা মহৎগুণের অধিকারী। তাঁর হৃদয় ছিল কোমল, দয়ায় পূর্ণ। গরীব মানুষদের তিনি দু'হাত ভরে দান করতেন।

বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাবার আগে মাত্র ১৫ বছর বয়সে উমেশচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন। তখন হেমাঙ্গিনীর বয়স ছিল দশ। উমেশচন্দ্র পত্নীকে ইংরাজি শিক্ষা ও চালচলনে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। হেমাঙ্গিনী ছিলেন দয়াবতী উদার স্বভাবের মহিলা। অপরের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি সহজেই কাতর হয়ে পড়তেন। অনেক দরিদ্র পরিবারকে তিনি সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে নিয়মিত সাহায্য করতেন।

স্বামীর সঙ্গে বিলাতে বসবাসকালে তিনি খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং খিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে স্বামীর অনুমতি নিয়ে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন।

উমেশচন্দ্র পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় অভ্যস্থ হলেও নিজের ধর্মবিশ্বাস কখনও পরিত্যাগ করেননি। এমনকি হিন্দু ধর্মকে সমালোচনা করে কেউ কথা বললেও তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। অথচ এই মানুষই স্ত্রীকে ধর্মান্তর গ্রহণে অনুমতি দিতে দ্বিধা করেননি। এই ঘটনা উমেশচন্দ্রের হৃদয়ের উদারতার পরিচয় বহন করে। অপরের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানাবার শিক্ষা তিনি নিজের ছেলেমেয়েদেরও দিতেন।

শেষ বয়সে শারীরিক অসুস্থতার জন্য উমেশচন্দ্র আইন ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রিঃ তিনি সপরিবারে বিলেত চলে যান এবং লন্ডনের নিকটে ক্রয়ডনে স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। সেই সময় তিনি প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। খ্যাতনামা আইনজীবী হিসেবে উমেশচন্দ্র বিলেতেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। নিজের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাবিক প্রতিভাবলে তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করে গৌরবের অধিকারী হয়েছেন এবং একজন ভারতবাসী হিসাবে স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

১৯০৬ খ্রিঃ লন্ডনে নিজের বাড়িতে উমেশচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

ক্যামিলো গলগি

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন সংক্রান্ত কাজের স্বীকৃতিতে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত বিজ্ঞানী ক্যামিলো গলগির জন্ম ইতালির কর্টেনো শহরে ১৮৪৩ খ্রিঃ ৭ জুলাই।

প্রকৃতির রহস্য ও সৌন্দর্যের প্রতি সহজাত আকর্ষণের বশে ছেলেবেলাতেই তাঁর মনে উদয় হয়েছিল জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চিন্তা। অসাধারণ মেধা ছিল তাঁর আর ছিল দিগন্তপ্রসারী কৌতূহল।

প্রকৃতির কোলে যা কিছু দেখতেন, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তার সবটুকু না দেখা অবধি স্বস্তি পেতেন না।

ফলে পুষ্পে সুশোভিত উদ্ভিদ, নানান রঙের নানা গঠনের কীটপতঙ্গ, কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর সব কিছু নিয়েই তাঁর ভাবনার অবধি থাকত না। তাঁর মনে দেখা দিত প্রশ্ন, এই বিচিত্র জীবনের উৎস কোথায়? জীবনের পরিণতি যে মৃত্যু তারই বা সঠিক পরিচয়টি কি?

নিজের এই চিন্তা নিয়েই বিভোর থাকেন বালক গলগি। স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে তাঁকে কখনো দেখা যেত না খেলার মাঠে বা অন্য ভাবে সময় কাটাতে। স্কুলের পড়াশুনার বাইরে যেটুকু সময় তা ব্যয় হত প্রকৃতির পাঠশালায়।

স্কুলের পড়াশুনার পাট সাঙ্গ হলে গলগি চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ নিতে ভর্তি হলেন পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে শবব্যবচ্ছেদের টেবিলে এসেই যেন তিনি জীবনের রহস্যময় ইতিহাসের সন্ধান পান। শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুগ্রথিত সজ্জা ও বিন্যাস তাঁকে মুগ্ধ করে। স্থির করেন অ্যানাটমির জটিল রহস্য ভেদ করেই উদ্ধার করবেন জীবনের ইতিহাস।

এর পরে একদিন চিকিৎসাবিদ্যায় পাস করে ডাক্তার হলেন। চিকিৎসকের চাকরিও জুটে গেল সঙ্গে সঙ্গেই পাভিয়ার এক ছোট হাসপাতালে।

এখানে চাকরির সূত্রে একে একে কেটে গেল সাতটি বছর। কিন্তু চাকরি ছাড়া আবাল্য লালিত চিন্তাভাবনার নাড়াচাড়া করবার সামান্য সুযোগও এই দীর্ঘ সময়ে পাওয়া গেল না। তাই মানসিক অতৃপ্তি তাঁকে চঞ্চল করে তুলতে লাগল।

এমনি অবস্থাতেই ডাক পেলেন আবিয়াতেগ্রাসো শহরের হাসপাতালের। প্রধান চিকিৎসকের চাকরি নিয়ে চলে এলেন। এখানে চিকিৎসার কাজের ফাঁকে সীমিত ব্যবস্থার মধ্যেই নিজের গবেষণার কাজে হাত দিলেন।

একদিকে চলে তাঁর রোগীর চিকিৎসা অপরদিকে সকলের অগোচরে নানা জটিল রোগ নিয়ে চলল পরীক্ষা নিরীক্ষা।

এভাবেই ১৮৭৩ খ্রিঃ তিনি আবিষ্কার করলেন—সিলভার নাইট্রেট রাসায়নিক দ্বারা স্নায়ুতন্তু রঞ্জনের এক বিস্ময়কর পদ্ধতি। একাজে যে রাসায়নিকটির সাহায্য তিনি নিলেন তা হল সিলভার নাইট্রেট।

গলগির এই প্রথম আবিষ্কারই তাঁকে বিশ্ববিজ্ঞানের জগতে সফল বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি এনে দেয়। তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটির সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় কোষতাত্ত্বিকদের গবেষণায়।

বর্তমানকালেও স্নায়ুসংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর এই পদ্ধতির ভূমিকা রয়েছে অপরিবর্তিত।

স্নায়ুতন্ত্র রঞ্জনের পদ্ধতি অনুসরণ করেই ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সামগ্রিক গঠনটি স্পষ্ট ধরা পড়ে গলগির গবেষণায়। পরে তাঁর নামানুসারেই ওই স্নায়ুকোষের নামকরণ হয় গলগি কোষ। এই গলগি কোষের গঠনটি অনেকটা উদ্ভিদের প্রসারিত শাখাপ্রশাখার মতো। নানা স্নায়ু কোষের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করাই এটির কাজ।

১৮৭৪ খ্রিঃ গলগির এই আবিষ্কার বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।

জার্মানির বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ শবব্যবচ্ছেদ বিশারদ ভিলিয়াম এন ভালদেয়ার গলগির গবেষণাপত্রটি পাঠ করে রাতারাতি স্নায়ু-সংক্রান্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর গবেষণাকে আশ্রয় করেই পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয় স্নায়ুকোষ, যা কিনা স্নায়ুতন্ত্রের মূল গঠনগত এককের নাম।

এইভাবে গলগির আবিষ্কার ঘটিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতেই স্নায়ুকোষের আবিষ্কারের দ্বারা চিকিৎসাবিজ্ঞানে আধুনিক স্নায়ুবিদ্যার সূত্রপাত হয়।

দুই দুইটি বিশ্বখ্যাত আবিষ্কার গলগি করলেন তাঁর বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে।

এই সময়, ১৮৭৫ খ্রিঃ গলগি যোগ দিলেন তাঁর প্রাক্তন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্টোলজি বিভাগের অধ্যাপকের পদে।

শরীরের কলাতন্ত্র সংক্রান্ত বিদ্যা হল হিস্টোলজি। এই পদে অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি পেলেন পরীক্ষা নিরীক্ষার ঢালাও সুযোগ। স্বভাবতঃই উল্লসিত গলগি কাজ শুরু করতেও বিলম্ব করলেন না।

কিন্তু তখনও যে মনের সঙ্গোপন কোণে নিভৃতে সঙ্গুপ্ত ছিল একটি স্বপ্ন সে সম্পর্কে বুঝি নিজেও গলগি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। তাঁর সুপ্ত চেতনা জাগরিত হল কাগজে একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়তে।

সিয়েনার মেডিকেল কলেজ তাদের অ্যানাটমি বিভাগে অধ্যাপক চেয়ে বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন।

অ্যানাটমি বিভাগে শবব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণেরই কাজ। এই কাজেই তাঁর সর্বাধিক উৎসাহ ও আকর্ষণ। তাই পত্রপাঠ পাভিয়ার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সিয়েনায় চলে এলেন।

নতুন কাজে যোগ দেওয়ার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যিক ছিল না। তাই নিয়োগপত্র পেতে তাঁর কোনও অসুবিধা হল না।

এখানে শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজ নিয়ে যে এগার বছর তিনি ছিলেন তার মধ্যেই তিনি লাভ করেছেন ইউরোপ জোড়া খ্যাতি।

নতুন কর্মস্থলে স্নায়ুতন্ত্রের গভীরতর গবেষণায় গলগি আবিষ্কার করেন স্নায়ুতন্ত্রের শাখা আকৃতির বিস্তৃতি যা প্রবেশ করেছে পেশী ও অস্থির সংযোগরক্ষাকারী পেশীবন্ধ বা কন্ডরায়।

এই দুই অসাধারণ আবিষ্কারের বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের বিস্তৃত পরিচয়-জ্ঞাপক একটা বই তিনি প্রকাশ করলেন ১৮৮৫ খ্রিঃ। তাঁর এই বই স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের বিস্তৃত পরিচয় কোষতাত্ত্বিকদের সামনে উন্মোচিত করে দেয়। ভলদেয়ার প্রমুখ চিকিৎসা বিজ্ঞানী বিস্তৃততর গবেষণায় যেন নতুন পথ দেখতে পান।

পরবর্তীকালে কন্ডরায় প্রবিষ্ট শাখা আকৃতিতে বিস্তৃত সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুতন্ত্রকে গলগির নামানুসারেই নাম রাখা হয় গলগি পেশীবন্ধ জীবাঙ্গ।

পরবর্তী বছরে, ১৮৮৬ খ্রিঃ স্নায়ু কোষের বিস্তৃততর গবেষণায় গলগি আবিষ্কার করেন দুটি জিনিস। একটি হল স্নায়ুকোষের ভেতরে ফোস্কার আকারের কোষ ও অপরটি ছোট ছোট দানা বসানো একপ্রকার বিশৃঙ্খল জালি। এই জালিটিকে বর্তমানে নাম দেওয়া হয়েছে গলগি অ্যাপারেটাস।

কোষ মাত্রেই এই বস্তুটির অবস্থান চোখে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম ব্যাকটেরিয়া শ্রেণীর জীবাণুর কোষ। এতে থাকে না গলগি অ্যাপারেটাস।

কোষের পর্দা নির্মাণ, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের সংরক্ষণ ও নানা কণা পরিবহন ইত্যাদি কাজে গলগি অ্যাপারেটাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

এই সকল গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে যশ ও খ্যাতির পাশাপাশি গলগি সম্মানিত হলেন দেশ বিদেশের নানা সম্মান ও পুরস্কারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন ভাষণের আমন্ত্রণ।

পদক ও পদবীর এই স্বীকৃতির মধ্যেই একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসাবে এবারে তাঁর গবেষণার বিষয়ে পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি আরম্ভ করলেন মানবেতিহাসের আতঙ্ক কালব্যাধি ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণা। দীর্ঘকাল থেকেই ম্যালেরিয়ার কবলে নির্বিচারে মানুষের প্রাণ সংহার হচ্ছিল। এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে অসহায় মানব জাতিকে রক্ষার মানবিক প্রেরণায় এগিয়ে না এসে পারেননি গলগি।

১৮৮৫ খ্রিঃ এই রোগটির উচ্ছেদ সাধনের গবেষণায় তৎপর হলেন। ১৮৮৫ খ্রিঃ থেকে ১৮৯৩ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর নিবিড় গবেষণার পর একটি মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যতিক্রম তাঁর চোখে ধরা পড়ল। এই ব্যতিক্রম অবস্থাকে তিনি দুইভাগে ভাগ করলেন। সবিরাম ম্যালেরিয়া অর্থাৎ

দুদিন অন্তর যে জ্বর আসে তার নাম টার্শন (Tersian) এবং চারদিন অন্তরের জ্বরকে নাম দিলেন কোয়ার্ট্যান।

তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করলেন এই দুই প্রকৃতির জ্বরের কারণ হল প্লাসমোডিয়াম নামের দুই ভিন্ন প্রজাতির পরজীবী জীবাণু। এই পরজীবী জীবাণু যখন রোগীর লোহিত রক্তকণিকা বা কোষের মধ্য থেকে রক্তপ্রবাহে সংক্রামিত হয় তখনই রোগীর দেহে উচ্চ তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে গিয়ে শীত ও কাঁপুনি দেখা দেয়।

১৮৯২ খ্রি ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণাটি গলগি প্রকাশ করলেন। এতে তিনি দেখালেন পরজীবী জীবাণু দুই শ্রেণীর সবিরাম ম্যালেরিয়াতেই তাদের জীবনচক্র রোগীর রক্তের মধ্যে সম্পূর্ণ করে।

যখন এই জীবাণুরা শরীরের নির্দিষ্ট কোষকলায় বিশেষ করে মস্তিষ্কের কোষকলায় আশ্রয় করে তখনই রোগটি মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। এই ম্যালেরিয়া জীবনহানির কারণ হয়ে ওঠে।

ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণার সূচনাপর্বেই ১৮৮৬ খ্রিঃ গলগি সিয়েনা মেডিকেল কলেজের কাজ ছেড়ে ফিরে এলেন পাভিয়া। এখানে হিস্টোলজি বিভাগে বিভাগীয় প্রধানের পদে যোগ দেন এবং আমৃত্যু পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন।

ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণায় গলগি চিকিৎসাশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার পথ নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত পথনির্দেশ অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে জন্মসূত্রে ভারতীয় ইংরাজ বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়ার পরজীবী জীবাণু ও তার জীবনচক্র আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই কৃতিত্বের জন্য গলগির বিশ্বের সেরা চিকিৎসা বিজ্ঞানীর স্বীকৃতি পাবার আগেই ১৯০২ খ্রিঃ রস নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

অবশ্য স্নায়ুতন্ত্রের গঠন সংক্রান্ত কাজের জন্য গলগি নোবেলের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন আরও চার বছর পরে ১৯০৬ খ্রিঃ ৫৩ বছর বয়সে।

এর পরেও পাভিয়ার নির্দিষ্ট গবেষণাগারটিতে আরও কুড়ি বছর গবেষণার কাজে ডুবে ছিলেন তিনি। এখানেই কর্মরত অবস্থায় ১৯২৬ খ্রিঃ ২১ জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

চার্লস আলগার্নন পারসন্স

বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করার কৌশল আবিষ্কারের দ্বারা কারিগরিবিদ্যায় এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন চার্লস আলগার্নন পারসন্স। বিজ্ঞানের ইতিহাসে একজন সফল আবিষ্কারক বিজ্ঞানী রূপে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৮৫৪ খ্রিঃ ১৩ই জুন লন্ডনে এক ঐতিহ্যশালী পরিবারে পারসন্সের জন্ম। তাঁর বাবা উইলিয়াম পারসন্স ছিলেন সমকালীন ইংলন্ডের একজন খ্যাতিমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর অন্যতর পরিচয়, একজন সমাজকল্যাণব্রতী মহানুভব ব্যক্তি হিসাবে।

উদারচেতা ও মুক্তমনের মানুষ হিসাবেও সমকালীন সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। অসাধারণ জ্ঞানী এই মানুষটি পার্লামেন্টের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

চার্লসের মা মেরিফিল্ডও ছিলেন এক অভিজাত ঘরের কন্যা। স্বামীর মতোই বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি।

এমন মহৎ পিতামাতার চরিত্র প্রভাব যে চার্লসের জীবনকেও প্রভাবিত করবে তা বলাই বাহুল্য। উত্তরাধিকার সূত্রেই পিতার বিজ্ঞান প্রতিভা লাভ করেছিলেন তিনি।

ছয় ভাইবোনের মধ্যে চার্লস ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। আয়াল্যান্ডের বির শহরের প্রাসাদে পিতার কঠোর শাসনে ছয় ভাইবোনের শিক্ষা শুরু হয়েছিল। বাড়িতে সকলের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

যেহেতু চার্লসের বাবা স্কুলের প্রথাগত শিক্ষায় নির্ভরশীল ছিলেন না, সেকারণে শহরের নামী শিক্ষকদেরই তিনি সন্তানদের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করতেন।

ছেলেবেলায় পারসন্স সব চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর এক গৃহ শিক্ষক রুপার্ট বেল-এর দ্বারা। তিনি ছিলেন সমসাময়িক ইংলন্ডের একজন খ্যাতিমান জোতির্বিদ। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল।

নিয়ম করে ঘড়ি ধরে খেলাধুলো শরীরচর্চা ও পড়াশুনার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন চার্লস। তবে ভাইবোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন খানিকটা ব্যতিক্রম। বাবার মতো যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করার স্বভাব ছিল তাঁর। নিজে থেকেই মাথা খাটিয়ে ছোটখাট জিনিস বানাবার চেষ্টা করতেন। এ কাজে মাঝে মাঝে এমনই তন্ময় হয়ে যেতেন যে খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন।

ছেলের প্রবণতা লক্ষ করে বুঝি ভবিষ্যতের আভাস পেতেন উইলিয়াম পারসন্স। তাই চার্লসকে নিজের যন্ত্রপাতির কৌশল বুঝিয়ে দিয়ে উৎসাহিত করতেন।

বাবার একটা প্রতিফলিত দূরবীক্ষণের কাচ মাঝে মাঝেই পরিষ্কার করার দায়িত্ব পড়ত চার্লসের ওপর। বাবার নির্দেশে দাদাদের নিয়ে এই কাজটা করতে হত চার্লসকে।

কাচটাকে হাতে ঘষামাজা করতে অনেক সময় লাগত। চার্লস তাই একদিন মাথা খাটিয়ে সেই ছেলেবেলাতেই দাদাদের নিয়ে বানিয়ে ফেললেন একটা বাষ্পীয় ইঞ্জিন।

সেই ইঞ্জিনের সাহায্যে খুব কম সময়েই পালিশের কাজটা হয়ে যেত। ছেলের কান্ড দেখে মুগ্ধ বাবা চার্লসের মধ্যে আগামী দিনের কারিগরী বিদ্যার নতুন যুগের প্রবর্তককে প্রত্যক্ষ করেন।

চার্লসের যখন ১৩ বছর বয়স, ১৮৬৭ খ্রিঃ পারসন্স পরিবারে ঘটল এক দুর্ঘটনা। অকস্মাৎ মারা গেলেন চার্লসের বাবা। কিন্তু বাবার অনুপস্থিতিতেও পারিবারিক নিয়মশৃঙ্খলার কোন নড়চড় হল না। চার্লসের দিনগুলো তাঁর ভাইবোনদের সঙ্গে একই ভাবে কাটতে লাগল।

একবার চার্লস তাঁর দাদাদের নিয়ে বানিয়ে ফেললেন একটা বাষ্পচালিত শকট। ঘন্টায় তার গতি সাত মাইল। সেই যুগে এমন যান এক অভিনব কান্ড। কেননা তখনো মোটর গাড়ি বাজারে আসেনি। এসেছে আরও ত্রিশ বছর পরে।

সেই শকট নিয়ে অতি উৎসাহে চার্লসের মেজদা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতেন। সেই সময় বিরের প্রাসাদে সস্ত্রীক বেড়াতে এলেন চার্লসের কাকা। বাষ্পীয় গাড়ি দেখে খুশি হয়ে সেটা নিয়ে তাঁরা বেরুলেন ঘুরতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের। কিছুদূর যাবার পরেই ইঞ্জিনে বিকট শব্দ তুলে গাড়িটা কাত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ে প্রাণ হারালেন কাকীমা।

অল্প দিনের ব্যবধানে পর পর দুটি শোকাবহ ঘটনা চার্লসের মনে গভীর রেখাপাত করে।

তাঁদের ছয় ভাইয়ের মধ্যে তিনজনের ইতিপূর্বেই অকাল মৃত্যু হয়েছে। বাকি তিন ভাই বাবার মৃত্যুর পর ভর্তি হলেন ডাবলিন শহরের ট্রিনিটি কলেজে। একবছর পরে ১৮৭৩ খ্রিঃ চার্লস চলে গেলেন কেমব্রিজের সেন্ট জনস কলেজে। সেখানে তখন অঙ্কের দিকপাল অধ্যাপক ই. জে. রাউত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ছাত্রদের মুখে মুখে তাঁর অসাধারণ অধ্যাপনার খ্যাতি। দিন কয়েক ক্লাশ করার পর মুগ্ধ চার্লসও অধ্যাপক রাউতের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। তিনি যেন এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন।

কলেজের পড়াশুনায় চার্লসের ছিল গভীর মনোযোগ। ফলাফলও হল তেমনি। ১৮৭৭ খ্রিঃ কলেজের শেষ পরীক্ষায় তিনি পেলেন একাদশ স্থান।

অধ্যাপক রাউতের উপযুক্ত শিক্ষায় উচ্চতর গণিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন চার্লস। যন্ত্রের কাজে অঙ্ককে প্রয়োগ করার কৌশলও তিনি শিখেছিলেন তাঁর কাছে। এই শিক্ষা পরবর্তীকালে নতুন নতুন ইঞ্জিন তৈরির কাজেও তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

আশ্চর্যের কথা হল, অঙ্কের যাদুস্পর্শেই যেন চার্লসের কারিগরি বিদ্যার চিন্তাভাবনা প্রখরতর হয়ে উঠেছিল। সেই অসামান্য ক্ষমতা বলে একদিকে যেমন তিনি আবিষ্কার করেছেন নতুন নতুন যন্ত্র, তেমনি নতুন কলাকৌশলে চালু ইঞ্জিনকে উন্নততর রূপ দিতে সক্ষম হন।

জটিল কারিগরি সমস্যাকে অনায়াসে তিনি অঙ্কে মেপে এঁকে সমাধান করে ফেলতে পারতেন। এমন কি তাপের ফলাফলকেও তিনি অঙ্কের নিরিখে যাচাই করে নিতেন।

কেমব্রিজে কারিগরিবিদ্যার কোনও পৃথক বিভাগ সেকালে ছিল না। তাই যন্ত্রবিদ্যায় গভীর জ্ঞান লাভের জন্য এর পর চার্লস শিক্ষানবিসি আরম্ভ করলেন নিউকাসল-আপন-টাউনের আর্মস্ট্রং ওয়ার্কস কারখানায়।

আধুনিক যন্ত্রবিদ বিজ্ঞানী আর্মস্ট্রং প্রতিষ্ঠিত এই কারখানায় যন্ত্রবিদ্যার বিস্তারিত জ্ঞানলাভের সুযোগ পেলেন।

এই সময়েই তিনি সঙ্কল্প নেন ভবিষ্যতে আর্মস্ট্রং-এর মতো সকল সুবিধাযুক্ত কারখানা তাঁকেও গড়ে তুলতে হবে।

পরবর্তীকালে তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, যন্ত্রবিদ্যার পাকাপোক্ত জ্ঞান আর্মস্ট্রং-এর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

এর পর থেকে চার্লসের ধ্যান জ্ঞান নিয়োজিত হল যন্ত্রের মধ্যে। নিউকাসল থেকে চলে এলেন লিডস শহরে। যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পেয়ে গেলেন লিডসের কারখানায়। সময়টা ১৮৮১ খ্রিঃ।

বছর দুই পরে ১৮৮৩ খ্রিঃ বিয়ে করলেন ক্যাথারিন বেট হেল নামে ইয়র্কশায়ারের এক বিত্তবান পরিবারের মেয়েকে।

কেমব্রিজে থাকতেই একটা নতুন ধরনের ইঞ্জিন তৈরির চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকেছিল। এবং সেই চেষ্টায় সফলও হয়েছিলেন। তিনি এমন এক ঘূর্ণায়মান ইঞ্জিন তৈরি করলেন যা প্রয়োজন মতো সামনে পেছনে যেতে পারে এবং স্থান পরিবর্তন করেও প্রচন্ডবেগে ঘুরতে থাকে। এই ইঞ্জিনে কোনপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটারও সম্ভাবনা কম।

চার্লস আলগার্নন পারসন্সের এই নতুন ইঞ্জিন নির্মাণ এক ঐতিহাসিক

ঘটনা। নতুন বিদ্যুৎ শিল্পযুগের গোড়া পত্তন হয়েছিল এই ইঞ্জিনের প্রবর্তনের ফলেই।

বিয়ের পরে পরেই চার্লস রকেট টর্পেডো নিয়ে গবেষণায় ডুবে গেলেন। এই সময় গেটসহেডের এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায়ের সূত্রে যুক্ত হলেন। নেমে পড়লেন অংশীদারী ব্যবসায়। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম হল চ্যাপমান অ্যান্ড কোম্পানি।

প্রায় একই সময়ে ভ্যাকুয়াম ইঞ্জিন পাম্প তৈরির চুক্তিতে ক্লাক নামক অপর এক কোম্পানির সঙ্গেও চার্লস ব্যবসায় হাত দিলেন। এই ভাবে তাঁর হাত দিয়েই বিশ্বের বাজারে বিদ্যুতের ব্যবহার প্রচারিত হল।

ঘূর্ণমান ইঞ্জিনের কাজ করতে করতেই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ভাবনা তাঁর মাথায় আসে। কিছুদিন পরেই তৈরি করলেন বাষ্পীয় চাকা বা টারবাইন।

চার্লসের বায়ুকল টারবাইন ছিল বাষ্পচালিত। কলের সঙ্গে একটি চাকা এমন ভাবে যুক্ত যে বাষ্পের ঊর্ধ্বমুখী গতিশক্তির বলে আপনা থেকে তা ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণায়মান চাকা থেকেই উৎপন্ন হয় প্রয়োজনীয় শক্তি।

চার্লসের আগেও টারবাইন তৈরির চেষ্টা অনেক যন্ত্রবিদই করেছেন। হিরো নামে আলেকজান্দ্রিয়ার এক বিজ্ঞানী প্রথম টারবাইন নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তা নানা কারণে কার্যোপযোগী হয়নি। ওতে যতটা শক্তি উৎপন্ন হত তার বেশির ভাগ অংশই অপচয় হত।

যন্ত্রবিদ্যার গবেষণাকালে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উদ্ভাবক জেমস ওয়াটও টারবাইন তৈরি করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তিনি টারবাইনের কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

চার্লস তাঁদের প্রারব্ধ কাজ সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে টারবাইনের চিন্তা বাস্তবায়িত করে চার্লস এক সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিলেন।

টারবাইনের পেটেন্ট নেবার পরে পরেই বছর দুয়েকের মধ্যে চার্লস প্রথমে এক কন্যা ও পরে এক পুত্রের জনক হন। তাঁর পুত্রের নামে আগার্নন জর্জ।

টারবাইনের অতন্দ্র চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই উন্নত কারিগরির টারবাইন বাজারে চালু হয়ে গেল।

ইউরোপের শিল্প কারখানাগুলোতে টারবাইনের ব্যবহার শিল্প ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করল। ফলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল চার্লসের খ্যাতি।

নিজের তৈরি যন্ত্রের উন্নততর সংস্কার কাজে চার্লসের তৎপরতা ছিল বিস্ময়কর। যন্ত্রকে সম্পূর্ণ আধুনিক রূপ না দেওয়া পর্যন্ত যেন স্বস্তি পেতেন না। এজন্য প্রতিনিয়ত চলত যান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষা।

টারবাইনেরও আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ করলেন তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার সঙ্গে ডায়নামো যুক্ত করে।

ততদিনে আবার নতুন চিন্তার চাপ এসে গেল মাথায়। ভাবতে লাগলেন ডায়নামো চালিত টারবাইনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা। সেকাজেও সফল হলেন।

১৮৮৫ খ্রিঃ যন্ত্রবিদ হিসাবে বিশ্বখ্যাতির প্রথম যুগেই টারবাইনের ব্যবহারকে শিল্পে অধিকতর কার্যকরী ও লাভজনক করে তুলতে পেরেছিলেন চার্লস। কোন প্রকার যান্ত্রিক অসুবিধার দরুণ যাতে তাপের বৃথা অপচয় না হয় সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন।

টারবাইনের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যন্ত্র ও কারিগরি ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন ঘটতে লাগল। সেই সূত্রেই ইউরোপের নানা দেশের কারখানায় তৈরি হতে লাগল ছোট ছোট আকারের মজবুত সর্বাধুনিক টারবাইন।

টারবাইনকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে উন্নতি ঘটল ডেনমার্কের দুগ্ধজাত শিল্পে। সেখানে Milk Seperator যন্ত্র হিসাবে টারবাইনকে কাজে লাগানো হয়েছিল।

এরপর হেলিকপ্টারের মতো আকাশে উড়তে পারে এমন এক ধরনের ইঞ্জিনও তৈরি করেছিলেন চার্লস। এর বয়লারে তিনি জলের পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলেন মেথিলেটেড স্পিরিট।

১৮৯৮ খ্রিঃ বিশ্বের বাজারে সব সেরা টারবাইন চালু করার আগে চার্লস নানা কারণে তাঁর ব্যবসার অংশীদারদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল ক্লার্ক ও চ্যাপমানদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করতে তিনি বাধ্য হলেন এবং একাই নতুন কোম্পানি তৈরি করলেন। নিজের নামেই কোম্পানির নামকরণ করলেন চার্লস আলগার্নন পারসন্স অ্যান্ড কোং। এখান থেকেই বাজারে ছাড়লেন নতুন মডেলের টারবাইন।

তারপর চার্লস টারবাইন নিয়ে নেমে পড়লেন এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা রূপায়নে এবং বলা বাহুল্য সার্থকও হলেন। টারবাইনে চলতে লাগল জাহাজ।

সেই সময় সবে বাজারে চালু হয়েছে সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্রটি। চার্লস এই যন্ত্রেও নতুন গতি সঞ্চার করলেন তাঁর আবিষ্কৃত টারবাইন ব্যবহার করে। ফলে সিনেমা জগতের চলচ্চিত্র ক্ষেপক এই যন্ত্রটি যন্ত্রকারিগরী গবেষণাতেও বিশেষ ভূমিকায় গৃহীত হল।

এর ফলিত ব্যবহার প্রদর্শিত হল ১৮৯৭ খ্রিঃ রানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের হীরকবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সাগরে যুদ্ধযাহাজের মহড়া উপলক্ষে।

ইংলন্ডের ভয়ঙ্কর যুদ্ধজাহাজগুলোর সঙ্গে চার্লসের তত্ত্বাবধানে সাগরজলে নামল টারবাইন মুক্ত জাহাজ। দেখা গেল চার্লসের জাহাজ ইংলন্ডের রাজকীয় জাহাজকে পেছনে ফেলে সাগরে দাপিয়ে ছুটছে। এই ঘটনার পর থেকেই ইংলন্ডের যুদ্ধজাহাজে টারবাইন যুক্ত করার জন্য তৎপরতা শুরু হয়। ১৯০১ খ্রিঃ মধ্যেই জলে নামল ইংলন্ডের টর্পেডোবাহী সর্বাধুনিক যুদ্ধজাহাজ Drednought চার্লসের টারবাইন সংযুক্ত হয়ে। পরের পর নেমে পড়ল Destroyerও—কোবরা ও ভাইপার।

অবশ্য ১৯০১ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই চালকদের অসতর্কতার কারণে কোবরা ও ভাইপার দুইস্থানে আকস্মিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে সলিলসমাধি লাভ করে। ফলে বেশ কিছু সামরিক কর্মচারীর প্রাণহানি ঘটে।

এই দুর্ঘটনার পর থেকে সরকার যুদ্ধ জাহাজে টারবাইন ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

কোবরা ও ভাইপার ডেস্ট্রয়ার দুটির ধ্বংস হবার পেছনে চার্লসের টারবাইনের কোনও ত্রুটি ছিল না। তাঁর সতর্কবাণী অমান্য করার ফলেই ঘটেছিল দুর্ঘটনা। তবুও চার্লস এই ঘটনার মানবিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারলেন না।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিহতদের পরিবারবর্গকে তাঁর কোম্পানি থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন এবং সরকারকেও যুক্তি প্রমাণ সহ বুঝিয়ে দিলেন দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ।

ডেস্ট্রয়ার ভেঙ্গে পড়ার কারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও ভাবেই চার্লসের টারবাইনের দায়িত্ব নেই তা অনুধাবন করতে পেরে সরকারও তাঁদের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন।

এরপর থেকে ইংলন্ডের বড় যুদ্ধ জাহাজগুলোতেই কেবল টারবাইন ব্যবহার করা হতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইংলন্ডের আশি হাজার টন মালবাহী দুই যুদ্ধ জাহাজ কুইন এলিজাবেথ ও কুইন ম্যারি আমেরিকা থেকে নানা যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলাচল করে। হিটলারের নাৎসি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে মিত্রশক্তির যুদ্ধ জয়ের পেছনেও ছিল চার্লসের টারবাইনের প্রধান ভূমিকা।

১৯১৮ খ্রিঃ পর থেকে চার্লস চিন্তাভাবনা আরম্ভ করলেন আলোক বিজ্ঞান ও লেন্সের ব্যবহার নিয়ে। ১৯২১ খ্রিঃ নাগাদ তিনি একটি কাচ তৈরির কারখানা কিনে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিতে ছিল বাবার প্রতিফলিত দূরবীক্ষণের কাচ পালিশ করার অভিজ্ঞতা।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজের কারখানায় চশমায় ব্যবহারের উপযোগী নানা ধরনের লেন্স তৈরি আরম্ভ করলেন।

চার্লস সারাজীবনে তাঁর কারিগরি প্রতিভাকে বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করে বিশ্বের শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের বেগ সঞ্চার করেছেন। চার্লসের অসাধারণ অবদান বিশ্ববিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নিত্য নতুন কাজের মধ্যে সর্বদা ডুবে থাকতেন কর্মবীর চার্লস। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি শব্দ-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে আরও উন্নত পর্যায়ের ত্রুটিমুক্ত লাউডস্পিকার তৈরি করেন।

তাঁর আবিষ্কৃত লাউড স্পিকারে বক্তার অবিকল কণ্ঠ ধ্বনিত হত। শব্দের কোনও প্রকার বিকৃতি ঘটত না।

নিজের জীবনব্যাপী কাজের মধ্যদিয়ে বিশ্বের নতুন শিল্প বিপ্লবের পথ সুগম করেছিলেন বিজ্ঞানী চার্লস আলগার্নন পারসন্স। তাঁর বিজ্ঞান সাধনার স্বীকৃতিও কিছু কম পাননি তিনি সমকালে। প্রতিভা ও পরিশ্রমের গুণে লাভ করেছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও যশ। পেয়েছেন অজস্র সম্মান। পেয়েছেন কপলে পদক, নাইট উপাধি ও অর্ডার অব মেরিট। হয়েছিলেন রয়াল সোসাইটির সদস্য।

অভিজাত পরিবারে জন্মেও অতি সাধারণভাবে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি রেখে গিয়েছিলেন বিশাল কারখানা ও বারো লক্ষ চোদ্দহাজার তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ডের সঞ্চয়।

কারখানার কর্মীদের সঙ্গে তিনি তাদেরই একজন হয়ে কাজ করতেন। তাঁর আন্তরিকতা ও অমায়িক ব্যবহার এমনই ছিল যে কর্মীরা তাঁকে ভালবাসত আপনজনের মতো।

শেষ জীবনে তিনি তাঁরই আবিষ্কৃত টারবাইন সমৃদ্ধ জাহাজে চড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করে আনন্দ পেতেন।

একবার সস্ত্রীক ক্যারিবিয়ান দেশগুলি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাহাজ জামাইকার কিংস্টন বন্দরে পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সময়টা ছিল ১৯৩১ খ্রিঃ ১১ ফেব্রুয়ারী।

জুলিয়াস ওয়াগনার ভন যোরেগ

১৯৫৯ খ্রিঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ের পূর্বে এক অতি অদ্ভুত আবিষ্কারের ঘোষণা জানিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানী মহলকে চমৎকৃত করেছিলেন জুলিয়াস ওয়াগনার যোরেগ।

ঘোষণা শুনে প্রথমে তাঁকে সকলে বিকৃতমস্তিষ্ক বিজ্ঞানী বলে উপহাস করতেও কসুর করেনি। কিন্তু একের পর এক পরীক্ষার মধ্যে তাঁর তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ হতেই নিন্দামন্দর হাওয়া ভরে ওঠে অভিনন্দনের সৌরভে।

বিষ দিয়ে বিষ নাশ করার সত্যটিকেই নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। মস্তিষ্ক-পক্ষাঘাত জনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি এক নিরাময়-অসম্ভব রোগ। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু।

দুঃসাধ্য এই রোগের নিদান আবিষ্কাব করেছিলেন যোরেগ। আর তাঁর অত্যাশ্চর্য ওষুধটি ছিল ম্যালেরিয়া রোগের সিরাম।

ভন যোরেগের জন্ম অস্ট্রিয়ার ওয়েলস শহরে এক সাধারণ পরিবারে। স্থানীয় স্কুলেই পড়াশোনা করেন তিনি। সেই সময়েই মানুষের নানা প্রকার বিকৃত আচরণের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বিষয়টা মনোরোগের অধীন। কিন্তু এই জটিল বিষয়টির সম্বন্ধে কিশোর বয়সেই কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর অঞ্চলে কিছু বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের অস্বাভাবিক অদ্ভুত আচরণ দীর্ঘদিন তাঁর চোখে পড়ে থাকবে। সেকারণেই মানুষের মানসিক বিকৃতির কারণ ও নিরাময়ের ভাবনা তাঁর মাথায় ঢুকেছিল।

স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই এবিষয়ে কিছু পড়াশুনার চেষ্টা করেছিলেন। তা থেকে তিনি জানতে পারেন ভয়াবহ যৌন রোগ সিফিলিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের মস্তিস্কে পক্ষাঘাত ও পরিণতিতে মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়ে থাকে। নিরাময়যোগ্য নয় এই ব্যাধি। রোগ শেষ পর্যন্ত রোগীর প্রাণ সংহার করে থাকে।

মাথায় এই চিন্তার বোঝা নিয়েই স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে ভিয়েনায় এলেন ভন যোরেগ। ভর্তি হলেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাশে।

যথাকালে চিকিৎসায় স্নাতক হলেন সসম্মানে। তারপর আত্মনিয়োগ করলেন মনোরোগ ও স্নায়ু সংক্রান্ত গবেষণায়।

ভন যোরেগ যখন ভিয়েনায় মনোরোগ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিক্ষণাগারে দিকপাল মনোবিশারদ চিকিৎসকগণ

নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে সাইকিয়াট্রি অর্থাৎ মনোসমীক্ষণ বিদ্যার অবয়ব রচনা করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন স্বনামধন্য সিগমুন্ড ফ্রয়েড, ভিলহেলম স্টেকেল, আলফ্রেড অ্যাডলার প্রমুখ চিকিৎসক-গবেষক। তাঁদের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের সাফল্যে ক্রমেই সাধারণ মনোবিদ্যা বা সাইকোলজি চিকিৎসা গবেষণার উপজীব্য হয়ে উঠছিল। রূপ লাভ করছিল একটি নতুন শাস্ত্র যার নাম মনোসমীক্ষণ বা সাইক্রিয়াট্রি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সুখ্যাত মনোসমীক্ষক আলফ্রেড বিনে ও টমাস সাইমন মানুষের নানা বয়সে মনের নানা গতি, যৌন মানসিকতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যৌন সমীক্ষণের আলো ঘুরিয়ে ধরেছেন নরনারীর দিকে। বলাইবাহুল্য, এই স্নায়ু-বিজ্ঞানীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত মনোবিৎ সিগমুন্ড ফ্রয়েড।

এঁদের সকলের চেষ্টায় ক্রমেই মানুষের মনের গহনে লুকানো প্রবৃত্তি সমূহের পরিচয় এমন ভাবে উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল যে ইউরোপের প্রভাবশালী রক্ষণশীল সমাজ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

এর প্রতিফল এতটাই গভীরে পৌছেছিল যে সারাজীবনে ফ্রয়েড নোবেল পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হননি।

যাইহোক সেইকালে ভিয়েনার মনোবীক্ষণাগারে স্নায়ু বিজ্ঞানীদের কাছে শরীরের অস্থিরতা, স্নায়বিক বৈকল্য ইত্যাদি উপসর্গ উপশমের আশায় উপস্থিত হত যৌন রোগে আক্রান্ত রোগীরা।

ভন যোরেগ এসব রোগীদের পরীক্ষা করতে গিয়ে একটা চমকপ্রদ বিষয় উদ্ধার করে ফেললেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, যেসব রোগী অকস্মাৎ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে, তারা একটু সুস্থ হযে ওঠার পরেই তাদের স্নায়বিক গোলযোগ আশ্চর্যজনক ভাবে কমে যাচ্ছে।

বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে তাঁর ধারণা হল, প্রবল জ্বরের সঙ্গে রোগীদেহের উন্মত্ততার হ্রাসের একটা রহস্যময় যোগাযোগ রয়েছে।

ধারণার সত্যাসত্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ভন যোরেগ স্থির করলেন রোগটি যেমন ভয়াল সিফিলিস জনিত স্নায়বিক বৈকল্য তেমনি সমান মারাত্মক কোন জ্বরের বিষই রোগীর শরীরে ঢুকিয়ে দেখা যেতে পারে। আর তখনকার দিনে মারাত্মক জ্বর বলতে একবাক্যে ম্যালেরিয়ার নামই উচ্চারিত হত।

হাতেনাতে পরীক্ষায় নামার আগে ভন যোরেগ কিছু প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের বইপত্র নাড়াচাড়া করলেন।

একটি প্রাচীন পুঁথিতে দেখতে পেলেন, প্রাচীন যুগে আরবে পাগলের চিকিৎসায় ওইধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। এবিষয়ে আরবীয়

চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনসিনা তাঁর কোয়ানাম উল ফিত তিবি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আকস্মিক জ্বরভোগের পরে পাগলের উন্মত্ততা হ্রাস পায়।

এই আকস্মিক জ্বর কিভাবে পাগলের শরীরে সঞ্চার করা হত সেসম্পর্কে কোনও আলোকপাত বইতে করা হয়নি। অবশ্য এই কৃত্রিম পদ্ধতিটি অনেক চিন্তাভাবনার শেষে উদ্ভাবন করলেন ভন যোগের নিজেই।

স্নায়বিক বৈকল্য দমনের কারণে শরীরে যতটা জ্বরের প্রয়োজন তার অতিরিক্ত প্রকোপ প্রশমনের উপায়টিও জানা না থাকলে কৃত্রিম উপায়ে সঞ্চারিত জ্বর যে হিতে বিপরীত ফল সৃষ্টি করবে এ সম্পর্কে আগেই সজাগ হয়েছিলেন ভন যোরেগ। সেকারণেই ওষুধ-সাধ্য ম্যালেরিয়াকে তিনি তাঁর পরীক্ষার কাজে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করলেন। কেননা তিনি জানতেন প্রয়োজনাতিরিক্ত জ্বরের রেশ কুইনাইন প্রয়োগ করে বিদুরিত করা সম্ভব হবে। তাহলে জ্বর থেকে শরীরে কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু বিষয়টি নিয়ে ঠিক ভাবে পরীক্ষায় বসার আগেই জীবিকার্জনের প্রয়োজনে তাঁকে ভিয়েনা ছাড়তে হল। চলে এলেন গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোসমীক্ষণ ও স্নায়ুবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে।

নতুন কর্মস্থলে একটু গুছিয়ে বসার পরে শুরু করলেন নিজস্ব পরীক্ষা নিরীক্ষা। স্নায়বিক বৈকল্যগ্রস্ত রোগীদের দেহে এখানে তিনি প্রথমে ক্ষয়রোগের জীবাণুর কালচার প্রয়োগ করলেন।

কিন্তু আশানুরূপ ফল তাতে পাওয়া গেল না। তবু দমলেন না ভন যোরেগ। অধ্যাপনার সঙ্গে গবেষণাও চালিয়ে যেতে লাগলেন।

বছর কয়েক গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে ১৯১৭ খ্রিঃ তিনি আবার চলে এলেন ভিয়েনায। মনোসমীক্ষণ বিভাগে অধ্যাপনার সঙ্গে স্নায়বিক ও মানসিক রোগ সংক্রান্ত গবেষণাগার পরিচালনার দায়িত্বও নিজের হাতে নিলেন।

এখানেই তিনি সিফিলিস রোগগ্রস্ত রোগীর স্নায়বিক উন্মত্ততা প্রশমনের সফল পরীক্ষাটি সন্তোষজনকভাবে সম্পূর্ণ করলেন।

রোগীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর কালচারেব টিকা প্রয়োগ করে কৃত্রিম ভাবে টার্শন ফিভার উৎপন্ন করলেন। টার্শন ফিভার হল সবিরাম জ্বর। এতে তিনদিন জ্বরের পর জ্বর ছেড়ে যায়। সাময়িক উপশমের পর আবার জ্বর চলে তিন দিন। এভাবেই চলতে থাকে জ্বরের ধারা।

জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ততার মাত্রাও কমতে থাকে। কমতে কমতে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

দীর্ঘ গবেষণার এই সাফল্য অনতিবিলম্বেই ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানী মহলে। উঠল আলোড়ন। যথাকালে ভন যোরেগের নামও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল চিকিৎসাবিজ্ঞানে।

তাঁর এই অভিনব আবিষ্কার তথা চিকিৎসাপদ্ধতি তাঁর সমকালের নিরিখে যথেষ্টই যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু উত্তরকালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আরও উন্নততর গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে বহু রোগ চিকিৎসা পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছে।

বর্তমানে সিফিলিস রোগীর দেহে ম্যালেরিয়ার সিরাম প্রয়োগের আর প্রয়োজন হয় না। তার জন্য তৈরি হয়েছে উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক। তার ফলে সিফিলিসের ভয়াবহতাও কমেছে অনেক, দূর হয়েছে জীবন হানির ভয়।

কিন্তু, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভন যোরেগের আবিষ্কারই উত্তরকালের মনোসমীক্ষক ও স্নায়ুবিশেষজ্ঞদের স্নায়ুসংক্রান্ত গবেষণায় নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। মানুষের আচরণের অস্বাভাবিকতা নিরসনের নিদান আবিষ্কৃত হয়েছে।

স্বাভাবিক সভ্য মানুষের সমাজে থেকে মানুষের অস্বাভাবিকতা দূর করার সাধনা করে গেছেন ভন যোরেগ। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই ১৯১৪ খ্রিঃ ও ১৯৩৯ খ্রিঃ দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে লোভ ও হিংসার বশবর্তী সভ্য মানুষের স্নায়বিক গোলযোগঘটিত অস্বাভাবিক, অমানবিক আচরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। কিন্তু মানুষের হীন প্রবৃত্তির মানসিকতার কোন নিদান জানা ছিল না তাঁর। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে অগণন অসহায় মানুষের হাহাকারে জর্জরিত মর্ম-বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি নিশ্চয় প্রার্থনা করে গেছেন, বিকৃতমানস সভ্যমানুষের জন্য নবতম কোনও মনোসমীক্ষকের। কাল থেকে কালান্তরে আজও উচ্চারিত হয়ে চলেছে বিজ্ঞানী ভন যোরেগের সেই মানবিক আকুতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার একবছর পরে ১৯৪০ খ্রি ২৭ সেপ্টেম্বর ভিয়েনা শহরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জুলিয়াস ওয়াগনার ভন যোরেগ।

ত্যাগরাজ

ভারতীয় সঙ্গীত জগতের অন্যতম মহান পুরুষ ত্যাগরাজ তাঁর অসামান্য প্রতিভাবলে ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্লীন মাধুর্যকে পৌছে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে। সঙ্গীতের সঙ্গে ধর্ম ভাবনা তাঁর মহিমান্বিত জীবনকে সাধনার উচ্চমার্গে পৌছে দিয়েছিল।

এই ক্ষণজন্মা সঙ্গীতশিল্পীর জন্ম ১৭৬৭ খ্রিঃ ৪মে দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলার তিরুভারর অঞ্চলে।

ত্যাগরাজের পিতা রাম ব্রহ্মণ ছিলেন ধর্মপ্রাণ সৎ ও বিদ্বান। দেবপূজার মধ্যে তাঁর দিন শুরু হত। একবার দেবতা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানান, অচিরেই তিনি এমন এক পুত্র সন্তান লাভ করবেন, যাঁর অসামান্য কীর্তি সঙ্গীত ও সাহিত্য জগতকে উদ্ভাসিত করবে।

এই দৈব স্বপ্ন দর্শনের কিছুদিন পরেই জন্ম হয় ত্যাগরাজের। জন্মের পর থেকে পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বধান ও শিক্ষাতেই বড় হয়ে উঠতে থাকেন ত্যাগরাজ। পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি লাভ করেছিলেন ধর্মভাব। ছেলেবেলাতেই পিতার সঙ্গে প্রতিবছর রামনবমী উৎসবের সময় মন্দিরে গিয়ে রামায়ণ পাঠ করতেন।

নিজের বিদ্বাবত্তা ও সততার গুণে রাম ব্রহ্মণ তৎকালীন তাঞ্জোর রাজ্যের রাজার শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেছিলেন। কিছু চাষযোগ্য উৎকৃষ্ট জমি ও বাড়ি রাজা তাঁকে ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ দান করেছিলেন। তা থেকেই চলত পরিবারের সম্বতসরের ভরণপোষণের খরচ।

ত্যাগরাজের মা সীতাম্মা ছিলেন ভক্তিমান স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিনী। ত্যাগ ও দানশীলা স্বামীপরায়ণা এই নারীর চরিত্রপ্রভাব ত্যাগরাজের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সীতাম্মার সঙ্গীত প্রতিভা পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার হাতেখড়িও মায়ের কাছেই।

বাড়িতে বাবার কাছে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ত্যাগরাজকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় সংস্কৃত স্কুলে। সেই বালক বয়সেই ত্যাগরাজের মধ্যে কবি প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি নিজে নিজেই নিভৃতে বসে কবিতা রচনা করতেন। যখন তিনি মাত্র ছয় বছরের বালক সেই সময় একদিন প্রথম কবিতা রচনা করেন।

তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত কবিতা লিখতে থাকেন। শিশুসুলভ সরলতা ও বিষয়ভাবনা থাকলেও তাঁর বাল্য বয়সের এইসব কবিতার মধ্যে প্রতিভার পরিচয় ধরা পড়ত। ত্যাগরাজের কবিতা পাঠ করে তাঁর স্কুলের শিক্ষকরাও মুগ্ধ হতেন।

ভগবৎপূজায় বসে বাবা প্রতিদিনই ভজন গান করতেন। ত্যাগরাজও বাবার সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতেন। মাতার অপূর্ব কণ্ঠ সম্পদ পেয়েছিলেন মায়ের সূত্রে। তাই তাঁর কণ্ঠে ভজনগান মাধুর্য লাভ করত।

দুটি বিখ্যাত ভজন ত্যাগরাজ তাঁর শিশুবয়সেই রচনা করেছিলেন যেগুলো পরবর্তীকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

তাঞ্জোরের বিখ্যাত সঙ্গীতগুরু বেংকটরমনাইয়ার-এর বাড়ি ছিল ত্যাগরাজের বাড়ির নিকটেই। বাবার পূজার ফুল তুলতে তিনি প্রতিদিনই যেতেন একটি

বাগানে। পথে পড়ত সঙ্গীতগুরুর বাড়ি। সেখানে ছাত্রদের নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষার তালিম দিতেন বেঙ্গটরমনাইয়ার। যাতায়াতের পথে ত্যাগরাজ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সঙ্গীতগুরুর গান শুনতেন তন্ময় হয়ে।

সঙ্গীতে পুত্রের অনুরাগের পরিচয় পেয়ে রাম ব্রহ্মণ বেঙ্কটরমনাইয়ার-এর কাছে ত্যাগরাজের সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর থেকে ত্যাগরাজ নিয়মিত গুরুর কাছে তালিম নিতে থাকেন।

কবিপ্রতিভার সঙ্গে সঙ্গীতেও সহজাত প্রতিভা ছিল ত্যাগরাজের। তাই অল্পদিনের মধ্যেই গুরুর সমস্ত বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করতে সক্ষম হলেন।

সঙ্গীত বিষয়ে যথোপযুক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা বাবা মা উভয়ের কাছ থেকেই পেয়েছেন ত্যাগরাজ। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিলেন বাবার কাছে।

বাল্য ও কিশোর বয়সেই ভারতীয় পুরাণ মহাকাব্য ও ভক্তি সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এভাবে পারিবারিক পরিবেশেই ত্যাগরাজের সঙ্গীত ও সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে।

কিশোর বয়সেই ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের নানা বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন ত্যাগরাজ। তাঁর কালে স্বভাবশিল্পীরা সঙ্গীতের শাস্ত্রগত দিক নিয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। তাই তাদের গানে শাস্ত্রীয় রীতি নিয়মের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ত। উত্তরকালে ত্যাগরাজই প্রথম রাগসঙ্গীতকে নিয়মবদ্ধ নির্দিষ্টতা দান করেছিলেন।

কৈশোর উত্তীর্ণ হবার আগেই সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে ত্যাগরাজের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

তখনকার তাঞ্জোররাজ্য ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। বহু মহান সঙ্গীতশিল্পীর জন্ম হয়েছিল তাঞ্জোরে। তাঁদের সাধনায় গৌরবান্বিত হয়েছিল তাঞ্জোর, ভারতীয় সঙ্গীত লাভ করেছিল সমৃদ্ধি।

এখানকার রাজারাও স্ববাবতঃই সকলেই ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। ত্যাগরাজের কাছেও একদিন আহ্বান এলো তাঞ্জোরের রাজার। তিনি তাঁকে সভাগায়ক নিযুক্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সেই সময় ত্যাগরাজের বয়স আঠারো। কিছুদিন আগেই বিবাহ করেছেন। ত্যাগরাজের যোগ্য সহধর্মিনী হবার সব গুণই তাঁর স্ত্রীর মধ্যে ছিল। তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল।

পিতৃসূত্রে বসত বাড়ির সামান্য অংশ মাত্র পেয়েছিলেন ত্যাগরাজ। তাই সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট করে সামান্য জমি সংগ্রহ করতে

হয়েছিল। শিষ্যদের ভরণপোষণের ব্যয়ও বহন করতে হত তাঁকেই। তাই সপ্তাহে দুই একদিন ভিক্ষায় বের হতে হত তাঁকে।

এই কৃচ্ছ্রতার জন্য কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করেননি ত্যাগরাজ। সহজ সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ ছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে সহধর্মিনীর ত্যাগ ও সহযোগিতা ছিল অতুলনীয়।

সঙ্গীত চর্চায় উৎসর্গীতপ্রাণ ত্যাগরাজ পিতার অনাড়ম্বর ঈশ্বরনির্ভর আদর্শকেই মনেপ্রাণে অবলম্বন করেছিলেন। তাই কখনোই তিনি রাজপরিবারের দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী ছিলেন না। নিজেই নিজের ভার বহনের চেষ্টা করতেন।

এই অবস্থায় সভাগায়কের পদের প্রস্তাব কম লোভনীয় ছিল না। কিন্তু অর্থ বা স'চ্ছলতার প্রতি আসক্তি বশত কোনও দিনই তিনি তাঁর সাধনার আদর্শচ্যুত হননি। তাই তাঞ্জোররাজের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতেও দ্বিধান্বিত হলেন না ত্যাগরাজ।

এই নীরব সঙ্গীত সাধককে অন্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তি করত তাঞ্জোরের মানুষ। তাই শিষ্যবর্গ ও অভ্যাগত অতিথি পন্ডিত গুণীজনদের ভরণপোষণের প্রয়োজনে যেদিন ত্যাগরাজ ভিক্ষায় বেরুতেন, গুণমুগ্ধ তাঞ্জোরবাসীরা দুহাত উজাড় করে দিত। সেই দুই একদিনের ভিক্ষা থেকেই তাঁর সপ্তাহের খরচ নির্বিঘ্নে নির্বাহ হত।

ভিক্ষায় বেরিয়ে কোন বাড়ির দুয়ারে উপস্থিত হতেন না ত্যাগরাজ। উদাত্ত কণ্ঠে ভজন গান করতে করতে তিনি পথ চলতেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠে গীত সঙ্গীত ঝংকারে চারপাশের পরিমন্ডলে এমন মধুর পবিত্র ভাব সৃষ্টি হত যে মুগ্ধ আবিষ্ট গৃহস্থরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসত তাঁদের সামর্থ্যানুযায়ী দ্রব্য নিয়ে। তাঁদের স্বতঃস্বেচ্ছ শ্রদ্ধার দানে ভরে উঠত তাঁর ঝুলি।

ত্যাগরাজের ঈশ্বরভক্তি ছিল অনাবিল বিশ্বাসে ভরপুর। এই একনিষ্ঠ ঈশ্বর বিশ্বাস তিনি পেয়েছিলেন পিতামাতার কাছ থেকে। মনুষ্যজীবনকে তিনি ঈশ্বরের করুণার দান বলেই বিশ্বাস করতেন।

একবার কাঞ্চিপুরমের হরিদাস নামে এক ব্যক্তি ত্যাগরাজকে ৯৬ কোটি বার রামনাম জপ করার কথা বলেন। ঈশ্বরের আদেশ মনে করে তিনি হরিদাসের পরামর্শ শিরোধার্য করে নেন। এর পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিয়মিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার রামনাম জপ করতে থাকেন। এভাবে দীর্ঘ একুশ বছর নিরবচ্ছিন্ন জপ করেছেন তিনি।

তাঁর সাধ্বী স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে জপ করতেন। জপে বসে ত্যাগরাজ প্রায়শই এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে মনে হত স্বয়ং রামচন্দ্রকে তিনি সামনে প্রত্যক্ষ করছেন।

এভাবে ঈশ্বর সান্নিধ্যের পবিত্র অনুভূতি থেকে এসময় রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ভজনগীতি, কানু গোন্টিনি...

ঈশ্বরদর্শনের স্বর্গীয় আনন্দে আপ্লুত সাধকের অন্তর নিংড়ানো ভক্তি ও আত্মনিবেদনের অসাধারণ অভিব্যক্তি সেই গান। শোনা যায়, মাঝে মাঝে যখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেতেন না, সেই সময় অশ্রুসিক্ত হত তাঁর নয়নযুগল। ভারাক্রান্ত হত হৃদয়।

এমনি এক বিরহকাতর অবস্থাতেই তিনি লিখেছেন—''এলা নিদাইয়া রাহু''।—কেন আমার প্রতি নিদয় হলে।

দিনে দিনে খ্যাতির সঙ্গে ত্যাগরাজের রচিত গানও গায়কদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল দূরদূরান্তরে। আদর্শ সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবেও ত্যাগরাজ ছিলেন সকলপ্রকার সংস্কার ও সংকীর্ণতা মুক্ত।

সেকালের সঙ্গীতশিক্ষকরা তাঁদের বিদ্যাকে নিজেদের সন্তানসন্ততি আর শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে অভ্যস্থ ছিলেন। তাই সঙ্গীতকলা সাধারণ মানুষের কাছে অধরাই থাকত। ত্যাগরাজ শিক্ষার ব্যাপারে কোনও দিনই এমনতর সংকীর্ণতার বশবর্তী হননি। সঙ্গীতের সৌন্দর্য থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত রাখেননি তিনি।

দূর দূর অঞ্চল থেকে সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁর কাছে আসতেন। তাঁর গৃহে তাদের আতিথেয়তার ত্রুটি কোনও দিন হয়নি। ত্যাগরাজ সাগ্রহে তাদের সেবাযত্ন করতেন, নিজের রচিত গান নির্দ্বিধায় শিখিয়ে দিতেন।

গানের সঙ্গে একটি বীণাযন্ত্র বাজাতেন ত্যাগরাজ। সেটি থাকত তাঁর পূজার ঘরে। দেবপূজার সময় সেই বীণাটিরও তিনি নিত্য পূজা করতেন।

সঙ্গীত সাধনা আর ঈশ্বরের সেবা পূজার মাধ্যমে ত্যাগরাজের জীবনও স্বর্গীয় পবিত্রতায় মন্ডিত হয়েছিল।

প্রাচীনকালের ঋষিদের মতোই শান্ত স্নিগ্ধ ছিল তাঁর চেহারা ও ব্যবাহার। সর্বদা একটা পবিত্র জ্যোতি যেন তাঁর মুখে মাখানো থাকত।

তাঁর সান্নিধ্যে মানুষ মুগ্ধ শান্ত নম্র হয়ে যেত। সত্যের পথে দৃঢ় অবিচল ছিল তাঁর চিত্ত। কোনও অবস্থাতেই তাঁর উদার ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটত না। তিনি সকলকে বলতেন, সত্যের পথে অবিচল থাকো, ঈশ্বরের করুণালাভে একদিন তুমি নিশ্চয়ই ধন্য হবে।

ত্যাগরাজের পবিত্র জীবনকে কেন্দ্র করে বহু আলৌকিক কাহিনী প্রচলিত। বলা হয়, তাঁর বিখ্যাত স্বরার্ণব গ্রন্থটি স্বয়ং নারদ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থে ত্যাগরাজ শিব পার্বতীর কথোপকথন বর্ণনার মধ্যে সঙ্গীত বিষয়ের নানান আলোচনা করেছেন।

প্রচলিত কাহিনীটি হল এরকম, এক সন্ন্যাসী ত্যাগরাজের গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কিছু পুঁথি দিয়ে যান। রাতে স্বপ্নযোগে দেবর্ষি নারদ দর্শন দিয়ে ত্যাগরাজকে বলেন, তোমার গানে তৃপ্ত হয়ে পুঁথিগুলো তোমাকে উপহার দিলাম। এর থেকে তুমি নতুন গ্রন্থ রচনা কর। ত্যাগরাজের স্বরার্ণব গ্রন্থটি সেইসব পুঁথি থেকে রচিত হয়।

এই রকম দেবানুগ্রহ জীবনে বহুবার লাভ করেছেন তিনি। বহুবার সংকট থেকে এভাবে ঈশ্বরীয় শক্তিবলে তিনি রক্ষা পেয়েছেন।

ত্যাগরাজের মহৎ জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করলে বোঝা যাবে কত অতলস্পর্শী ছিল তাঁর উদারতা!

একবার এক দারোয়ান ত্যাগরাজের কাছে এল একটি ভজন শেখার জন্য। খুশি হয়ে তাকে গান শেখাতে বসলেন ত্যাগরাজ। সেই লোকটির কণ্ঠস্বর ত্যাগরাজের রচিত গান গাইবার উপযুক্ত ছিল না। তিনি তাকে কিন্তু হতাশ করলেন না। নিজে নতুন করে অত্যন্ত সহজ সুরের একটি ভজন রচনা করলেন তার জন্য এবং তা শিখিয়ে দিলেন। ত্যাগরাজের এই—নীদয়াচে (তোমার করুণায়) ভজনটি তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় গান।

ত্যাগরাজের বীণাটি থাকত তাঁর পূজার ঘরে। কেউ তা স্পর্শ করত না। কুপ্পায়ার নামে তাঁর এক শিষ্য বীণাবাদনে খুবই দক্ষ ছিল। যদিও সেকথা ত্যাগরাজ জানতেন না।

কুপ্পায়ার-এর একদিন ইচ্ছা হল গুরুর বীণায় তিনি সুর তুলবেন। ইচ্ছাপূরণের জন্য সুযোগ খুঁজে নিতেও অসুবিধা হল না। একদিন, ত্যাগরাজ যখন বাড়ির বাইরে গেছেন, সেই সুযোগে কুপ্পায়ার পূজার ঘরে ঢুকে গুরুর বীণা তুলে নিয়ে বাজাতে বসলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে সুরের মায়াজালে তন্ময় হয়ে গেলেন তিনি। বুঝতেই পারলেন না কখন গুরু এসে দাঁড়িয়েছেন পূজার ঘরে।

যখন সম্বিত ফিরল, বিস্মিত গুরুকে দেখতে পেয়ে বীণা নামিয়ে রেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন অনুমতি না নিয়ে তাঁর বীণাযন্ত্র স্পর্শ করার জন্য।

ত্যাগরাজ কোন ভর্ৎসনা করলেন না শিষ্যকে। তিনি কেবল স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বললেন, তুমি যে বীণা বাজাতে শিখেছ আমাকে তো বলনি। এবার থেকে প্রতিদিন বীণা বাজাবে।

এমনিতর মহত্ত্ব উদারতায় মণ্ডিত ছিল ত্যাগরাজের চরিত্র। আদর্শনিষ্ঠা ও ঈশ্বরভক্তি মহিমান্বিত করেছিল ত্যাগরাজের চরিত্রকে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমকালে অন্যতম বিখ্যাত কবি নরসিংহ দাস বলেছিলেন, রামভক্ত ত্যাগরাজের কোন তুলনা হয় না।

তামিল ভাষায় বিখ্যাত গীতিকার গোপালকৃষ্ণ ভারতী একবার দর্শন মানসে ত্যাগরাজের গৃহে আসেন। অতিথি মায়াভরম থেকে এসেছেন জানতে পেরে ত্যাগরাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের ওখানকার গোপালকৃষ্ণ ভারতীকে নিশ্চয়ই জানেন। অপূর্ব সব ভজন তিনি রচনা করেছেন।

তখনো পর্যন্ত গুটিকতকমাত্র ভজন রচনা করেছেন গোপালকৃষ্ণ। নিতান্তই অখ্যাত নগণ্য এক কবিমাত্র তখন তিনি। ত্যাগরাজের মতো মহান শিল্পী যে এভাবে তাঁকে সম্মান জানাবেন তা ছিল অকল্পনীয়। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাঁর মাথা নত হল ত্যাগরাজের চরণে। সবিনয়ে তিনি আত্মপরিচয় নিবেদন করলেন।

ত্যাগরাজের সেদিনের প্রশংসার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে আমৃত্যু স্মরণ করেছেন গোপালকৃষ্ণ। পরবর্তীকালে তিনি তামিল ভাষায় বহু অসাধারণ ভজন রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

একবার শতোর্ধ বয়সের প্রাচীন এক পিতৃবন্ধুর চিঠি পেলেন ত্যাগরাজ। বৃদ্ধের নাম উপনিষ ব্রহ্মণ। থাকেন কাঞ্চিপুরমে। চিঠিতে যথাযোগ্য আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ত্যাগরাজের অসাধারণ সঙ্গীতসৃষ্টি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাই বন্ধুপুত্রকে একবার দেখার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছে। বয়সের ভারে অশক্ত বলে নিজে তিরুভাইয়ারে যেতে পারছেন না, তাই ত্যাগরাজকেই তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

পিতার সহপাঠী বন্ধুকে কখনো দেখেননি ত্যাগরাজ। তবুও তিনি পত্র পাওয়া মাত্র শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে কাঞ্চির পথে যাত্রা করলেন।

পথেই পড়ে তিরুপতি দেবতা বেংকটেশ্বরের মন্দির। সাতমাইল পাহাড়ি চড়াই ভেঙ্গে পাহাড়চূড়ায় মন্দিরে পৌঁছতে হয়। ত্যাগরাজ যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন দেবতার সামনে পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে।

ত্যাগরাজ পর্দার বাইরে বসেই তাঁর স্বরচিত গান গাইতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সেই গানের ছত্রে ছত্রে বাঙ্ময় হয়ে উঠল দেবতার দর্শন লাভের আকুতি। শোনা যায়, তাঁর গান শেষ হবার আগেই দেবতাকে আড়াল করে রাখা পর্দা সকলের সামনে আপনা থেকেই সরে গিয়েছিল।

সেখানে বসেই তিনি সেদিন আর একটি গান রচনা করে কল্যাণী রাগে গেয়ে দেবতাকে শুনিয়েছিলেন।

বৃদ্ধ অশক্ত পিতৃবন্ধুকে দর্শন করার পর ত্যাগরাজ যখন গৃহে ফিরে চলেছেন তখন তাঁর এক প্রিয় শিষ্য অগোচরে পাল্কীতে রেখে দিয়েছিল একহাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি। সঙ্গী শিষ্যদের দু-এক জন মাত্র ঘটনাটি জানত।

চলাব পথে সেই অর্থের কথা জানতে পেরে ত্যাগরাজ বললেন, ভালই হল, এই অর্থে রামনবমী উৎসবে গরীব দুঃখীদের সেবা করা যাবে।

কিন্তু পথে নাগলাপুরম নামে একস্থানেই ঘটল বিপত্তি। সেই অঞ্চলে ছিল ভয়ানক ডাকাতের উপদ্রব। একসময়ে তাঁদের পথ আগলে দাঁড়াল একদল ডাকাত।

তখন ত্যাগরাজ এক শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন সঙ্গের হাজার স্বর্ণমুদ্রা ডাকাতদের দিয়ে দেবার জন্য।

অন্য এক শিষ্য বললেন, আপনি যে এই স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে রামনবমী উৎসব করার মানস করেছেন।

ত্যাগরাজ বলেলেন, তাঁর পূজার ভাবনা তিনিই করবেন। আমরা ভাববার কে?

একথা বলে ত্যাগরাজ তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীরামের উদ্দেশ্যে গান শুরু করলেন, হে রাম, তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে এসে আমাদের উদ্ধার কর।

ভক্তের অধীন ভগবান। ভক্তের ভক্তি বিশ্বাসের আকর্ষণে তাঁর আসন টলে। সেদিন দুর্ধর্ষ ডাকাত দল সহসা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখল, কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর তাদের দিকে ছুটে আসছে। সভয়ে তারা দূরে পালিয়ে গেল, কিন্তু অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করতে লাগল কোথা থেকে কে তীর ছুঁড়ছে।

রাতটা নিরাপদেই কাটল। সকালে ত্যাগরাজ এসে পৌঁছলেন এক মন্দিরে। কিছুক্ষণ পরে আত্মগোপন করে থাকা ডাকাতরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে ত্যাগরাজের পায়ের কাছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রেখে সকাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করল এবং জানতে চাইল তারা দেখেছে দুটি বালক দূর থেকে তীর ছুঁড়ে তাদের বাধা দিচ্ছিল, সেই বালক দুটি কারা?

ডাকাতদের মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে ভক্ত-কবি ত্যাগরাজ অশ্রুসজল চোখে ডাকাত সর্দারকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, ভাই, তোমরাই ভাগ্যবান, আমার প্রভু বালক শ্রীরামের দর্শন পেয়েছ তোমরা।

এই বলে তিনি বার বার অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

ত্যাগরাজের চরিত্র প্রভাবে সেদিন থেকে ডাকাতরা তাদের দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে নতুন জীবনে প্রবেশ করল। চাষবাসের কাজ করেই তারা বাকি জীবন কাটিয়েছে।

গীতিকার ও গায়ক ত্যাগরাজের ঈশ্বর ভাবনা তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার মতোই ছিল সহজাত। এই দুই ধারাই তাঁর জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত সার্থকতা লাভ করেছিল। ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে তিনি তাঁর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। একদিকে তিনি যেমন ভারতীয় সঙ্গীত ধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তেমনি তাঁর সহজ সরল ভাষায় রচিত সুললিত সঙ্গীত গৌরবান্বিত করেছে তামিল সাহিত্যকে। তাঁর সৃজনশীল সঙ্গীত প্রতিভার

দীপ্তি ধর্মসঙ্গীত, কীর্তন, নাট্যসঙ্গীত, কলাসঙ্গীত ইত্যাদি সঙ্গীতের সকল ধারাকেই উদ্ভাসিত করেছে।

তাঁর রচিত প্রতিটি সুরেই ছিল মাধুর্য ও গভীরতা। একমাত্র টৌড়ি রাগেই ত্রিশটি গানে তিনি সুর দিয়েছেন। ভক্তির সংমিশ্রণে তাঁর সুর হয়েছে হৃদয়গ্রাহী।

বিশেষ করে তাঁর ভজন গানে কেবল সাধক ভক্তই নয়, প্রতিটি সঙ্গীত পিপাসু মানুষই মুগ্ধ ও আপ্লুত হত। এক অনির্বচনীয় দিব্য আনন্দে তাঁদের হৃদয় উদ্বেল হত।

ত্যাগরাজের সঙ্গীত ধারা তাঁর যোগ্য শিষ্যমন্ডলীর মাধ্যমে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বেঙ্কটরমন ত্যাগরাজের সমস্ত রচনা সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর লেখা থেকে ত্যাগরাজের জীবনের বহু ঘটনার কথা জানা যায়।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ত্যাগরাজ নিজস্ব রীতি অনুসরণ করতেন, সমসাময়িক কালের সঙ্গীতগুরুদের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী বা রীতির নির্বিচার পক্ষপাতিত্ব কখনোই করেননি।

শিষ্যদের প্রত্যেককেই তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা যোগ্যতা ও প্রতিভা বিচার করে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। প্রয়োজনে শিষ্যের উপযুক্ত সঙ্গীত রচনা করতেন। এভাবে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন রাগাশ্রয়ী অসংখ্য গান রচনা করেছেন। এসকল গান প্রথমে কয়েকজন কৃতি ছাত্রকে শিখিয়ে দিতেন। পরে তাঁরাই অন্যদের শিক্ষা দিতেন। এভাবে শিষ্য পরম্পরায় ত্যাগরাজের সঙ্গীত আজও পর্যন্ত পরিবাহিত হয়ে চলেছে ভারতের লোকজীবনে।

সঙ্গীতসাধক ত্যাগরাজ আশি বছর পরমায়ু লাভ করেছিলেন। মৃত্যুর দুবছর আগে ১৮৪৫ খ্রিঃ তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি কর্মসংবরণ করে ঈশ্বর আরাধনাতেই কালাতিপাত করেন। শেষ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণও করেছিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মহাসমাধিতে প্রবেশের আগে ধ্যানমগ্ন হন ত্যাগরাজ। আগের দিন থেকেই গুরুর নিদের্শে শিষ্যরা নামগান আরম্ভ করেছিলেন। সেই স্বর্গীয় পরিবেশে গুরুর বিচ্ছেদ বেদনা উপলব্ধি করারও সুযোগ পাননি শিষ্যকুল। নির্দিষ্ট ক্ষণে এক স্বর্গীয় দ্যুতি তাঁর মরদেহ থেকে নির্গত হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। মহাপ্রয়াণ ঘটে সঙ্গীতগুরু ও সাধক ত্যাগরাজের। সময়টা ছিল ১৮৪৭ খ্রিঃ ৬ জানুয়ারী।

লু সুন

চীনা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও আধুনিক চীনেব সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জনক, মহান বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক লু সুন-এর প্রকৃত নাম চৌ শুন জেন। সমসাময়িক সামন্ততান্ত্রিক অপশাসনের প্রতিবাদে কলম চালনা করবার প্রয়োজনে তাঁকে লু-সুন ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এই নামেই তিনি চীনে ও বহির্বিশ্বে পরিচিত।

চীন দেশের শাওসিং প্রদেশে ১৮৮১ খ্রিঃ ২৫ সেপ্টেম্বর লু সুন-এর জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে উঠতে হয়েছে।

সেই সময় চীনে মাঞ্চু রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত। লু'র দাদু ছিলেন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। কিন্তু একসময় রাজরোষে সরকারী পদ থেকে বরখাস্ত হন এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।

এই ঘটনায় লু সুনদের পরিবারে নেমে আসে বিপর্যয়। তীব্র মানসিক আঘাতে তাঁর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন ও পরে মারা যান। লু সুন-এর মা পিতৃহারা সন্তানকে নিয়ে চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েন।

লু সুন-এর বাবা ছিলেন বিদ্যানুরাগী পন্ডিত মানুষ। পড়াশুনা নিয়েই তাঁর জীবন কাটত। অর্থোপার্জনের বিষয়ে তেমন মনোযোগী ছিলেন না। তাই এই সঙ্কট সময়ে সংসারের সমস্ত দায় দায়িত্ব লু সুন-এর মাকেই বহন করতে হয়। তিনি ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের মহিলা। প্রবল অভাব অনটনের মধ্যেও বালক পুত্রের পড়াশুনা কখনও তিনি বিঘ্নিত হতে দেননি। ছ'বছর বয়সে পুত্রকে তিনি স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।

লু সুন-এর প্রকৃতি ছিল শান্ত। পড়াশুনার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন সংবেদনশীল সচেতন মন। নিজে অভাব অনটনের মধ্যে মানুষ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের গরীব-দুঃখী-মানুষদের অভাব অনটন ঘেরা দুঃখময় জীবন তাঁকে পীড়িত করত। সমাজের ধনী সম্প্রদায়ের সম্পর্কে এই সময় থেকেই তাঁর মনে তীব্র ক্ষোভ জমে উঠতে থাকে।

তাঁর সময়কালে মাঞ্চু সরকারের অপশাসনে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন ছিল শোষণ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ। সবচেয়ে দুরবস্থা ছিল দেশের কৃষক শ্রেণীর। হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে ফসল ফলিয়েও সেই ফসল তারা ভোগ করতে পারত না। ধনী সম্প্রদায় ও অত্যাচারী রাজপুরুষদের অনুগ্রহের ওপরেই বেঁচে থাকতে হত তাদের। অপর দিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশের সমস্ত সম্পদ নির্বিচারে লুণ্ঠন করছে। তাদের বাধা দেবার শক্তি কারো নেই। এই

পরিবেশের মধ্যে থেকে লু সুন বাল্য বয়সেই তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

লু সুনদের আত্মীয়পরিজনেরা ছিলেন সম্পন্ন, বিত্তশালী। তাদের জীবনযাত্রা আচার ব্যবহার ছিল দেশের সাধারণ মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি স্বভাবজাত বিতৃষ্ণা বশতঃ আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মিশতে পারতেন না দরিদ্র লু সুন।

দরিদ্র চাষী পরিবারের ছেলেমেয়েদের তিনি বন্ধু করে নিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গেই মিশতেন, খেলাধুলো করতেন।

স্কুলের পড়া শেষ হলে মা লু সুনকে পাঠালেন নানকিং। মায়ের দেওয়া মাত্র আট ডলার সম্বল করে তিনি ভর্তি হলেন নানকিং-এর নৌ বিদ্যালয়ে। সেখানে একবছর পড়াশোনা করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে ভর্তি হলেন সেনা বিভাগের রেল ও খনি বিদ্যালয়ে।

ছাত্রজীবনে কেবল পাঠ্যবই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না লু সুন। সেই সঙ্গে তিনি নিয়মিত পড়তেন চীনের প্রাচীন সাহিত্য, মনীষীদের রচনাবলী, দেশবিদেশের ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ের বই। চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ ছিল।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ার পর তাঁর ধারণা হয়, প্রকৃতির পরিবর্তন ধারার স্বাভাবিক গতিতে দেশের বর্তমান দুর্বিষহ অবস্থারও একদিন পরিবর্তন ঘটবে। দুঃখী দরিদ্র মানুষদের জীবনের অভাব ও দুঃখ কষ্ট দূর হবে।

লু সুন-এর অন্তস্থিত বিপ্লবী চেতনা এভাবে তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

কিশোর বয়সের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লু সুনের মনে সদা জাগরুক ছিল। সেই সময় তাঁর বাবা শয্যাশয়ী, রোগযন্ত্রণায় কাতর। ওষুধের জন্য প্রায়ই তাঁকে যেতে হত ডাক্তারের কাছে। সেই সময় লু সুন ডাক্তারদের অমানবিক ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে বিচলিত হতেন।

তিনি দেখেছেন, রোগভোগে সাধারণ মানুষ অর্থের অভাবে সামান্য চিকিৎসার সুযোগটুকু পর্যন্ত পায় না। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি সঙ্কল্প করেন, ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়ে তিনি গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করবেন।

এই সঙ্কল্প রূপায়নের সুযোগ এলো ১৯০১ খ্রিঃ গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে। সরকারী বৃত্তি পেয়ে তিনি জাপানে এলেন ডাক্তারি পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে।

টোকিও-এর কো ব্লন কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে।

এখানে পড়তে আসার পরেই একদিনের এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে লু সুনের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়।

সেই সময় সিনেমার প্রচলন হলেও আধুনিক ব্যবস্থাদির কিছুই ছিল না। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে পর্দার ওপরে ছবি দেখানো হত।

একবার টোকিও মেডিকেল কলেজে এই রকম একটি সিনেমা শো অনুষ্ঠান দেখার জন্য সমবেত হয়েছিল জাপানী ছাত্রদের সঙ্গে কিছু চীনা ছাত্রও। তাদের মধ্যে ছিলেন লু সুন।

সেদিন যে ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছিল তার বিষয় ছিল রুশ-জাপান যুদ্ধ। একটি চীনা ছেলেকে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে জাপানী সেনারা প্রকাশ্য রাস্তার ওপরে গুলি করে হত্যা করে।

উপস্থিত জাপানী ছাত্রদের সঙ্গে সমবেত চীনা ছাত্ররাও এই মৃত্যুদণ্ড দৃশ্য উপভোগ করল।

বিদেশীদের হাতে একজন স্বদেশবাসীকে নিহত হতে দেখে তাদের কাউকেই বিচলিত হতে দেখা গেল না। কিন্তু লু সুন নিস্পৃহ থাকতে পারলেন না। একটি গুপ্তচরের মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করেনি ঠিকই, কিন্তু একজন চীনা লোকের ওপর বিদেশীদের অত্যাচার তাঁর মনকে তীব্র অপমানবোধে জর্জরিত করল। সেই ক্ষণে সেদিন লু সুন উপলব্ধি করলেন, চীনা জনগণের মানসিক চেতনা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ভাববার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে নিতান্তই স্থবির প্রাণীতে পরিণত হয়েছে তারা।

সেই দিনই দরিদ্র স্বদেশবাসীর শারীরিক চিকিৎসার সঙ্কল্প নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া লু সুন তাঁর জীবনের পথ বদল করে ফেললেন। তিনি স্থির সঙ্কল্প নিলেন, শারীরিক নয়, দেশবাসীর মানসিক চিকিৎসার কাজেই জীবন উৎসর্গ করবেন। আর এ কাজে সাহিত্য হবে তাঁর প্রধান অবলম্বন।

সামান্য একটি ঘটনার কী অসামান্য প্রভাব: লু সুন-এর সমগ্র সত্তা জুড়ে ঘটে গেল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নতুন চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন তিনি।

মৃতপ্রায় দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলবার সঙ্কল্পে রাতারাতি স্টেথো ছেড়ে তিনি হাতে তুলে নিলেন কলম। জন্ম হল আধুনিক চীনা সাহিত্যের জনক তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার লু সুন-এর।

ততদিনে মাঞ্চু সরকার-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন জাপানে প্রবাসী চীনা ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে পড়েছিল। লু সুন এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন। গোড়ার দিকে, বলা যায়, তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল এই পত্রিকায়, বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদ, চীনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রবন্ধাদি রচনার মধ্য দিয়ে।

১৯০৮ খ্রিঃ বিপ্লবী রাজনৈতিক দল কুয়াং ফু লুই-এর সদস্য হলেন লু সুন। এই সংঘ নিষিদ্ধ ঘোষণা হলে তিনি লু সুন ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতে লাগলেন। এই সময় সমাজ সাহিত্য ইতিহাস বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। বিদেশী কবিদের কিছু কবিতাও এই সময় তিনি অনুবাদ করেন।

টোকিওতে আট বছর থাকার পর ১৯০৯ খ্রিঃ দেশে ফিরে এলেন লু সুন। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করার উদ্দেশ্যে তিনি জাং চাও নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই এই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হলেন।

দেশে ফিরে আসার বছর দুয়েকের মধ্যেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সাধারণ মানুষের অনুকূলে মোড় নিল। সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে প্রবল গণজাগরণের মাধ্যমে মাঞ্চু রাজবংশের পতন হল। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে চীনে প্রতিষ্ঠিত হল প্রজাতন্ত্র।

১৯১১ খ্রিঃ লু সুন সেই সময়ে শাও জিঙ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তাঁকে আশান্বিত করে তুলল।

তিনি আশা করলেন, প্রজাতন্ত্র দেশের বঞ্চিত দুঃখী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়ে এক নতুন চীনের উদ্বোধন ঘটাবে। দেশের এই নব অভ্যুদয়ে নিজেকে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত করার সুযোগও লু সুন পেয়ে গেলেন অবিলম্বে। অস্থায়ী চীনা সরকারের অনুরোধে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে যোগ দিলেন লু সুন। এই কাজে তাঁর দায়িত্ব ছিল শিক্ষা বিষয়ে নীতি নির্ধারণে সরকারকে উপযুক্ত উপদেশ নির্দেশ দেওয়া।

প্রজাতন্ত্রের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আশা নিয়ে প্রবল উৎসাহে কাজে আত্মনিয়োগ করলেন লু সুন। এই সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন।

তাঁর গঠনমূলক চিন্তার প্রসার ও ব্যাপ্তি এই রচনাগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন, তা হল, প্রাচীন বর্ণমালার সংস্কার, শিশুশিক্ষা, গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

নতুন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাময়িক উত্তেজনা প্রশমনের পরেই দেশের যে বাস্তব অবস্থা প্রকট হয়ে উঠল, তাতে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন লু সুন। প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

তিনি লক্ষ্য করলেন মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষিত হলেও সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের শোষণ থেকে দেশবাসীর মুক্তি ঘটেনি। সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে নেতাদের হাতে। তারা চীনের নানা

অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করে একই ধারায় শাসন শোষণ চালিয়ে চলেছে। কোন দিকেই সমাজের কোনও পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

নতুন সরকারের অপদার্থতায় মর্মাহত হলেন লু সুন। তিনি অনুভব করলেন, এদের দ্বারা সমাজের কোনও উন্নতি সম্ভব নয়।

মর্মাহত, নিরাশাক্লিষ্ট লু সুন সরকারী শিক্ষাবিভাগের কাজে ইস্তফা দিয়ে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তথাকথিত শিক্ষিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের সাধারণ মানুষ—কৃষক শ্রমিক জনতার মধ্যেই নিহীত রয়েছে পরিবর্তনের বীজ। এই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, জাগিয়ে তুলতে হবে শিক্ষা আর বিপ্লবের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে। অচলায়তন ভেঙ্গে বিপ্লবের বহ্নিশিখায় তবেই কেবল সম্ভব হবে নতুন অভ্যুদয়ের সোপান রচনা।

বিপ্লবের স্বপ্নকে রূপায়নের লক্ষ্য নিয়ে লু সুন চীনের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে ডুব দিলেন। সুদূর অতীতে যেসব মনীষী-সাহিত্যিক সমাজকে শোষণ অত্যাচার, অন্যায় থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন. তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধার করতে লাগলেন প্রেরণার রসদ।

ইতিমধ্যে ১৯১৭ খ্রিঃ রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল সমাজতন্ত্র। পতন ঘটেছে জারতন্ত্রের। এই ঘটনায় গভীর ভাবে প্রভাবিত হলেন লু সুন। মার্কস ও লেনিনের আদর্শ সামনে রেখে সাহিত্য রচনার নতুন প্রেরণা লাভ করলেন তিনি।

নিজের জনমুখী রচনাকে সাধারণের হাতে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে এই সময় চীনের চিরাচরিত ভাষায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করলেন লু সুন।

সেইকালে চীনাভাষার দুটি ধারা প্রবাহিত ছিল শিক্ষিত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কথ্য ভাষা পাই হুয়া। আর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হত সাধুভাষা ওয়েন লি। এই ভাষার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যে আকৃষ্ট হয়ে লেখকরা তাঁদের সাহিত্য রচনা করতেন সাধুভাষায়। সাধারণতঃ শিক্ষিত মানুষরাই এই ভাষা ব্যবহার করত।

লু সুন তাঁর সাহিত্য রচনার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা পাই হুয়াকে।

স্বাভাবিক ভাবেই ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বিশুদ্ধতার প্রশ্নে লু সুনের প্রচেষ্টা চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ল। কিন্তু কোনও নিন্দাবাদ লু সুনকে লক্ষচ্যুত করতে পারেনি। নিজের আদর্শে অবিচল থেকে তিনি গতিশীল সাধারণ মানুষের ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করতে লাগলেন।

অচিরেই তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্পর্শে সাধারণের ভাষাই প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। তাঁর রচিত গল্প চীনা সাহিত্যে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার করল।

১৯২৩ খ্রিঃ লু সুন-এর প্রথম ছোট গল্পসংকলন 'না হান' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রবল আলোড়ন দেখা দিল। এই গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে লু সুন চীনের সমাজে সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনা বঞ্চনা ও নিপীড়নের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিলেন। ইতিপূর্বে সমাজের প্রকৃত রূপ এমন ভাবে কেউ উন্মোচিত করার সাহস পায়নি।

লু সুন-এর না হান গল্প গ্রন্থের অনেকগুলি গল্পই আগে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিল আ কিউর কাহিনী। এতে তিনি দেখিয়েছেন যুগ যুগ ধরে অত্যাচার শোষণে স্থবিরতা প্রাপ্ত, মানুষগুলোই যখন চেতনা ফিরে পায় তখন তাদের মধ্যে জেগে ওঠে এক অজেয় শক্তি। সেই শক্তিবলে তারা হয়ে ওঠে নির্ভীক সংগ্রামী মানুষ। সমাজের বন্ধন-শৃঙ্খল মোচন করার সংগ্রামে অকাতরে তারা জীবনপাত করতে পারে।

সমকালীন সমাজে সামন্ত্র শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাবকে ছিন্ন করার ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী চেতনাকে ভাষা দিয়েছেন লু সুন তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে।

এই সঙ্গেই তিনি আরও একটি জরুরী কাজ করেছেন, তা হল সমাজের প্রভু ও তথাকথিত বিপ্লবী নায়কদের ভন্ডামি ও মেকি বিপ্লববাদের মুখোস খুলে ধরেছেন। যারা ক্ষেতমজুর, চাষী, নিরক্ষর সাধারণ মানুষকে বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর রেখে নিজেদের ক্রমশ ক্ষমতাশালী করে তুলছে, তাদের তিনি যেন আঙুল তুলে চিনিয়ে দিয়েছেন।

লু সুন বিশ্বাস করতেন, তরুণরাই সমাজের ভবিষ্যৎ। তাদের হাতেই রয়েছে ঘুণ ধরা জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার হাতিয়ার। বাস্তবকে যেদিন তারা উপলব্ধি করতে পারবে সেদিন তারাই নতুন সমাজের করবে গোড়াপত্তন। তরুণদের সম্পর্কে আশাবাদী লু সুন তাই শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করেননি। শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি তাঁদের সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার বাণী শোনাতেন। তিনি বলতেন, বাস্তবকে বুঝতে শেখো—সংগ্রামী মনোবল সঞ্চার করো। যারা সমাজের শত্রু তাদের কোনও ভাবে ক্ষমা করো না।

শিক্ষাকতার সঙ্গে সাহিত্যে সৃষ্টির কাজও সমান ভাবে করে চলেন লু সুন।

গল্প বা প্রবন্ধ যাই তিনি রচনা করেছেন, তার প্রত্যেকটি লেখার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের জাগরণ ঘটানো। এই সময়ে তাঁর লেখনী ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল কতগুলি প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে। যারা প্রাচীন পন্থার ধুয়ো তুলে সমাজের প্রগতিপন্থী নতুন যুগের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করছিল, তাদের তিনি শাণিত ভাষায় তীব্র আক্রমণে ফালাফালা করেছেন।

যুক্তি ও আবেগের মিশ্রণে তাঁর এই সব আক্রমণাত্মক রচনা ছিল অমোঘ। যাতে সকলেই বুঝতে পারে সেই কারণে প্রবন্ধগুলির জন্য তিনি অবলম্বন করেছিলেন অতি সহজ সরল ভাষা।

তাঁর রচনারীতি সম্পর্কে লু সুন নিজেই বলেছেন, আমি লিখেছি চাষী, মজুর, খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষদের ভাষায়।

একদিকে সাহিত্য রচনা, অপরদিকে শিক্ষকতার কাজ—কোন কিছুতেই ক্লান্তি ছিল না তাঁর। তার ওপরে তরুণ প্রতিভাবান লেখকদের উৎসাহিত করার জন্য, সমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনের গুরুদায়িত্বও বহন করেছেন।

নিজের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তরুণ লেখকদের রচনা সংশোধন করে দিতেন তিনি। তাদের দিতেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ উপদেশ। এই ভাবে নতুন চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ হয়ে উঠলেন লু সুন।

অচিরেই তিনি তরুণ শিল্পী সাহিত্যিকদের সংগঠিত করে এক নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুললেন। প্রাচীনের নিগড় ভেঙ্গে নতুন চীনের জাগরণকে ত্বরান্বিত করার তাঁর এই প্রয়াস চীনের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক ইতিহাস রচনা করে।

লু সুন-এর এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯১৯ খ্রিঃ ৪মে। আগামী দিনের চীনের ইতিহাসে এই ৪ঠা মে-এর আন্দোলন এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তাঁর এই আন্দোলনের হাত ধরেই এক নবজাগ্রত জনশক্তি সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল চীনে। এই আন্দোলনের প্রভাব ও শক্তি এমনই প্রবল ছিল যে বিপ্লবের প্রাণবন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়েছিল। এই আন্দোলনই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল বিপুল সংখ্যক চীনা মানুষের সমবেত সমর্থনে। আর এই বিপুল শক্তির প্রাণপুরুষ ছিলেন লু সুন।

৪ঠা মের গুরুত্ব ও লু সুন-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে মাও জে দং বলেছেন, "চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক লু সুন কেবল একজন মহান সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহান বিপ্লবী ও সুমহান চিন্তানায়ক। আদর্শ ও সততার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও অনমনীয় মনোবল ছিল সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব চীনের ইতিহাসে দ্বিতীয় কেউ নেই। চীনের যে নতুন সাংস্কৃতিক ধারা তা লু সুন-এরই প্রবর্তিত।"

৪ঠা মের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে লু সুন নব জাগ্রত চীনে যে নতুন সংস্কৃতির ধারার প্রবর্তণ করলেন তারই প্রেরণায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হয়ে উঠল উজ্জীবিত।

দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ছাত্র ও যুব সমাজ শুধুমাত্র প্রাচীন সামাজিক কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত থাকল না, তাঁদের সম্মিলিত সহযোগে দুর্বার হয়ে উঠতে লাগল গণ-আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

প্রতিটি সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সামিল হলেও তখনো পর্যন্ত লু সুন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরেই রেখেছেন।

তাঁর নেতৃত্বে সামাজিক আন্দোলনগুলো এমনই দুর্বার হয়ে উঠছিল যে অচিরেই সরকার তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে ১৯২৫ খ্রিঃ সরকার চীনের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অধিকার ছিনিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র করল। সরকারী ঘোষণায় পিকিং মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হল।

সরকারের এই অপপ্রয়াসের তীব্র প্রতিবাদ জানাল দেশের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। লু সুনের নির্ভীক কণ্ঠে গর্জে উঠল জোরালো প্রতিবাদ। আন্দোলনকারী ছাত্র-শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষায়।

আন্দোলন ক্রমশই তীব্রতর আকার পরিগ্রহ করছে বুঝতে পেরে সরকার আর ঝুঁকি নিল না। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে জনজাগরণের গতিরুদ্ধ করার চেষ্টা করল। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাল কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

সরকারের এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্ররা দলে দলে পথে নেমে পড়ল। তাদের সমর্থনে এগিয়ে এল দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন লু সুন।

লু সুনের প্রতিবাদী ভূমিকা সহ্য করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হল না। অচিরেই তাঁর ওপরে নেমে এল নিষেধাজ্ঞার অস্ত্র। পিকিং ত্যাগের হুকুম জারি হল। বাধ্য হয়ে অ্যাময়ে চলে এলেন লু সুন।

পিকিং থেকে নির্বাসনের কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। এই সংকলনের গল্পগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশপ্রেমী ও মানবতাবাদী লু সুনের আন্তর পরিচয়।

সমাজের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার এক নির্মম বাস্তব আলেখ্য তিনি গভীর মমতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

অ্যাময়ে আসার অব্যবহিত আগে থেকেই লু সুনের বিভিন্ন রচনায় তাঁর চিন্তাজগতের পালাবদলের আভাস ফুটে উঠছিল। মার্কসীয় দর্শন-চিন্তার প্রতি ক্রমশই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন তিনি।

ভাবনার জগতের এই পরিবর্তন সম্পর্কে লু সুন নিজেও যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। যুগ ও সমাজের প্রয়োজনে মানুষের ভাবনার জগতের বিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী, লু সুন এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

আর সেই কারণেই পুরাতন চীনের আবহে দাঁড়িয়ে নতুন যুগের অগ্রপথ রচনা করতে পেরেছিলেন তিনি।

জীবদ্দশায় বহুবার প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে লু সুনকে। কিন্তু কোন বাধার কাছেই তিনি কখনো নতি স্বীকার করেননি। অদম্য প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত তাঁর সংগ্রামী সত্তা সকল প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে নিজেকে গতিশীল রেখেছে।

অ্যাময়ে অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যেও, জীবিকার কোন সংস্থান তো ছিল না, তাঁর সাহিত্য চর্চা ছিল অব্যাহত। সাহিত্য সৃষ্টির নিশ্চয়তার প্রয়োজনেই এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিতে হল তাঁকে।

পিকিং ছেড়ে এলেও চিয়াং কাইশেকের শ্যেনদৃষ্টি অ্যাময়ে তাঁকে নানাভাবেই উত্যক্ত করেছে মাঝে মাঝে। উত্তরোত্তর নানা বাধানিষেধ আরোপিত হচ্ছিল তাঁর ওপর।

উত্যক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অ্যাময় ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নিতে হল তাঁকে। সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই সময়েই ক্যান্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান এল। কালবিলম্ব না করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপকপদে যোগ দিলেন।

এই সময়ে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে অক্লান্ত পরিশ্রমও করেছেন লু সুন। নিজের সৃষ্টির পাশাপাশি দেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের পরিপুষ্টির জন্য দেশবিদেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ অনুবাদের কাজেও ব্যাপৃত থেকেছেন।

দেশে, চিয়াং কাইশেকের শাসনাধীন চীনে যখন কমিউনিস্ট দমনের নামে চলেছে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সেই সময় ১৯২৮ খ্রিঃ লু সুন নিজের উদ্যোগে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির নাম ছিল পেন লিউ। এই পত্রিকায় তিনি সরকারী নীতি ও কাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে একের পর এক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন।

কঠোর ভাষায় সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা করলেও ঘাতক কুয়োমিনটাং বাহিনী এই সময় তাঁকে কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত করতে পারেনি।

আসলে মার্কসীয় আদর্শের পক্ষপাতি হলেও পার্টির সদস্যপদ কখনো নেননি তিনি। প্রত্যক্ষভাবে পার্টির কাজকর্মের সঙ্গেও তাঁর কোন সংযোগ ছিল না। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও দলীয় মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটাননি কখনো। ফলে যখন দেশজুড়ে কমিউনিস্ট ছাত্র লেখক বুদ্ধিজীবীদের চিহ্নিত করে জেলের

সেলে পাঠানো হচ্ছে, কোন আঘাতই এল না লু সুনের ওপর। কমিউনিস্ট দলের বাইরেই গণ্য হলেন তিনি।

কিন্তু সরকারের কমিউনিস্ট নিধন প্রক্রিয়ার নিন্দা না করে পারলেন না তিনি। কিন্তু তাঁর প্রাতিবাদ সরকারী কর্মচারীরা আমলেই আনল না।

কিছুদিনের মধ্যেই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে সান ইয়াৎসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে হত্যা করা হল। মর্মাহত লু সুন এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে পদত্যাগ করলেন।

লু সুন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু কমিউনিস্টদের সমর্থনে বারবারই সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর এই ভূমিকা সরকার বরদাস্ত করল না। পুলিশ বাহিনীর রোষনজরে পড়ে গেলেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, যে কোনও মুহূর্তে গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কা দেখা দিল। হিতৈষীদের তৎপরতায় তিনি সদাসতর্ক পুলিশবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন সাংহাইতে। সাহিত্য রচনাই হয়ে উঠল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

অল্পকিছুদিনের মধ্যেই তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল বামপন্থী লেখক সংঘ। সংঘের মুখপত্র হিসেবে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করল দুটি সাহিত্য পত্রিকা। লু সুন-এর কলম এবার হয়ে উঠল অগ্নিক্ষরা। জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি সমাজের সমস্ত দিকের স্খলনের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে লাগলেন।

এই সময় সামাজিক অন্যায়, কুসংস্কার, কূটরাজনীতি ও বিপথগামী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। মূলতঃ সামাজিক সংগ্রামের সমর্থনে একদেশদর্শী বিষয়ের রচনা হলেও তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধই ছিল সাহিত্যগুণ সম্পন্ন। ফলে এসকল লেখার প্রভাবও হয়েছে ব্যাপক। ফলতঃ গতিশীল হয়েছে চীনের নবজাগরণের আন্দোলন।

পরবর্তীকালে মাও জে দং লু সুনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, একজন সাহিত্যস্রষ্টা হয়েও লু সুন সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন চীনের জাতীয় আন্দোলনের একজন আপোসহীন নির্ভীক যোদ্ধা। সমস্ত বাধা ও প্রতিকূলতাকে তিনি অকুতোভয়ে প্রতিরোধ করেছেন। তাঁর সংগ্রাম ও সংগ্রামী জীবন জাতীয় আন্দোলনের দিকনির্দেশ করেছে।

সামাজিক সংগ্রামের কাজে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্ত বারবার তাঁর জীবনকে বিপন্ন করেছে। তিনি সুকৌশলে আত্মগোপন করে নিজেকে রক্ষা করেছেন; তেজোদৃপ্ত মহিমায় স্বীয় আদর্শের পতাকা রেখেছেন উড্ডীন।

কথাশিল্পী লু সুন কাহিনী গল্প যেমন সৃষ্টি করেছেন, পাশাপাশি সাহিত্যরসপুষ্ট প্রবন্ধও রচনা করেছেন, যা সংখ্যায় তাঁর লিখিত গল্পের তুলনায় যথেষ্টই বেশি। অথচ গল্পকার হিসেবেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি তাঁর। বিশ্বের মুষ্টিমেয় সংখ্যক ছোট গল্পলেখকদের মধ্যে লু সুন অন্যতম।

জীবনের শেষ দিকে তাঁর জীবনে বলতে গেলে সুস্থিরতা ছিল না। ফলে অনিয়ম ও অত্যধিক পরিশ্রমে অতি দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশয়ী হতে হল। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাঁর লেখনীর বিরাম ছিল না।

বস্তুতঃ লু সুন ছিলেন আজন্ম সংগ্রামী সৈনিক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সংগ্রাম ছিল অব্যাহত—মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পাশবিকতার বিরুদ্ধে মনবিকতার সংগ্রাম।

মহান সংগ্রামী লেখক লু সুন রোগশয্যাতেই ছাপ্পান্ন বছর বয়সে ১৯৩৬ খ্রিঃ ১৯শে অক্টোবর মৃত্যুর কোলে চির বিশ্রাম লাভ করেন।

বেগম রোকেয়া

উনবিংশ শতাব্দীটিকে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সময় পরাধীন দেশের সমাজ সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনেরই সবশেষ পরিণতি আমরা দেখতে পাই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের মাধ্যমে ভারতবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়।

শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, কুসংস্কারমুক্তি, সামাজিক মুক্তচিন্তার বিকাশ, দেশাত্মবোধ, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় এক নতুন ভারত।

নবজাগ্রত ভারতের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রণী পথপ্রদর্শকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেগম রোকেয়া। অশিক্ষা কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পশ্চাদপদ বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন রোকেয়া।

তৎকালীন সময়ে ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলিম দুই সমাজই ছিল সমানভাবে পীড়িত। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটলেও এই দুই পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর স্থান ছিল প্রধানতঃ অন্তঃপুরিকা হিসাবেই। শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রাখা হত তাদের। তদুপরি মুসলিম সমাজে

বোরখা প্রথার প্রচলন সেই সমাজের নারীদের শিক্ষা ও সকল প্রকার সামাজিক অধিকার থেকে রেখেছিল বঞ্চিত করে।

এমনি এক দুঃসহ পরিবেশেই আবির্ভূত হয়েছিলেন রোকেয়া। তিনি সমাজে বোরখাপ্রথার বিরুদ্ধে নারীশিক্ষার প্রচলনের মধ্যদিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার শোপান রচনা করেন একক প্রচেষ্টায়।

এদেশের মহান সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে তাই স্বীয় কর্মকৃতিত্বমহিমায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে বেগমের নাম।

বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। যে পরিবারে জন্মেছিলেন, শতাধিক বছর আগে রংপুরে সেই পরিবার সাবের পরিবার নামে পরিচিত ছিল।

রোকেয়ার পূর্বপুরুষ ছিলেন বাবর আলী। তিনি নিজ কর্মকুশলতায় মুঘল সম্রাট ও ইংরাজদের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে অর্থ ও বিত্তে সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল তাঁর পরিবার।

বলাবাহুল্য ইংরাজদের সাহচর্যে আসার ফলে সাবের পরিবারে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো প্রবেশের সুযোগ ঘটেছিল।

এই পরিবারেই ১৮৮০ খ্রিঃ ৯ ডিসেম্বর রোকেয়ার জন্ম। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী। মায়ের নাম রাহাতুন্নিসা সাবের চৌধুরী।

পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় পরিবারই ছিল শিক্ষার আলোকে আলোকিত। রোকেয়ার পিতা জহিরুদ্দীন সাহেব তাঁর মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও আরবি, ফারসি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষাতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। অপব্যয়ী ও বিলাসী পূর্বপুরুষদের সূত্রে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন দারিদ্র্য। জহিরুদ্দীনের ছিল অভাব অনটনের সংসার। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক আগ্রহ। তাই দৈনন্দিন কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি তিনি সজাগ দৃষ্টি বাখতেন।

উপযুক্ত লেখাপড়া শিখে তারা যাতে মানুষ হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তাঁর চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। দুই ছেলেকে তিনি উচ্চশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠিয়েছিলেন।

মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়েও জহিরুদ্দীন ছিলেন সমান আগ্রহী। এবিষয়ে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ায় জহিরুদ্দীনকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

রোকেয়ার মা ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের মেয়ে। পর্দাপ্রথার অন্তরালে থাকলেও সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন মুক্তমনা। তাঁর

উৎসাহেই তাঁর মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল।

পরিবারের গতানুগতিক রীতি অনুযায়ী বাল্য বয়সে রোকেয়ার আরবী ও ফারসীতে সামান্য জ্ঞানলাভ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মন ওইটুকুতেই তৃপ্ত হতে পারেনি।

পড়াশুনার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর দুই সহোদর। মায়ের পরামর্শে তাই তাঁরা রোকেয়ার লেখাপড়ার জন্য বাড়িতেই একজন মেম নিয়োগ করলেন।

কিন্তু বেশিদিন এই সুযোগ পেলেন না রোকেয়া। বাধা এল তখনকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের দিক থেকে। অন্তঃপুরে বিদেশিনীর যাতায়াতে পর্দাপ্রথা বিনষ্ট হচ্ছে এই আপত্তি উঠল।

মেমের কাছে লেখাপড়া বন্ধ হলেও দমলেন না রোকেয়ার দুই সহোদর। বিশেষ করে তাঁর বড় ভাই রুকু নিজেই রোকেয়াকে বাড়িতে ইংরাজি শেখাতে শুরু করলেন গোপনে। আর বড় বোনের কাছে তিনি শিখতে লাগলেন বাংলা। এভাবেই আট-ন বছর বয়সে রোকেয়ার ইংরাজি ও বাংলা শিক্ষালাভ শুরু হয়।

রোকেয়ার জীবনের এক বিশেষ পরীক্ষার কাল তাঁর এই লেখাপড়া শেখার বাল্য অধ্যায়টি। পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে এসময় তাঁকে অশেষ গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। তাঁদের অত্যাচার অপমান অনেক সময় শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করলেও ধৈর্যময়ী রোকেয়া কখনো নিজের অভীষ্ট পথ থেকে সরে আসেননি।

সমস্ত বাধাবিপত্তি মুখবুজে সহ্য করে একাগ্র নিষ্ঠায় তিনি বিদ্যাচর্চায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন।

আসলে পড়া আর বোরখার অন্তরালের বদ্ধ জীবনে শিক্ষার আলোর ইশারায় রোকেয়া সেই নয়-দশ বছর বয়সেই পেয়েছিলেন মুক্তির আহ্বান। সেই আহ্বান তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল সমাজের অন্ধকার কোণগুলির প্রতি। বিশেষ করে মেয়েদের জীবনের কঠোর সীমাবদ্ধতার কুফলগুলি তখন থেকেই উপলব্ধি করতে থাকনে মহীয়সী রোকেয়া

রোকেয়ার বড় দিদি করিমুন্নিসার বিয়ে হয়েছিল মাত্র তেরো বছর বয়সেই। সেইকালে ওরকম বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছা পরিবারের লোকেদের কাছেও কোনও মূল্য পেত না। স্বাধীন মতামত প্রকাশেরও কোনও সুযোগ ছিল না।

বড়দিদি রোকেয়াকে খুবই স্নেহ করতেন। লেখাপড়ার প্রতি তাঁরও ছিল প্রবল আকর্ষণ। তাই রোকেয়াকে তিনি আত্মীয়স্বজনের চোখের আড়ালে যত্ন

নিয়ে বাংলা শেখাতেন। তাঁর লেখাপড়ার যাতে উন্নতি হয় সেবিষয়ে সজাগ থাকতেন।

করিমুন্নেসা নিজের দুই ছেলেকে সমাজের ও নিজ পরিবারের প্রবল সমালোচনার মধ্যেও লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বড়দিদির স্নেহ ও বিদ্যানুরাগের কথা আজীবন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখেন রোকেয়া। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, পরবর্তিকালে তিনি তাঁর ইংরাজি পুস্তিকা Sultana's Dream ও বাংলাগ্রন্থ মতিচুর (২য় খণ্ড) বড় দিদিকে উৎসর্গ করেন।

রোকেয়ার যখন ষোল বছর বয়স, সেই সময় তাঁর বিবাহ হয় বিহারের ভাগলপুর নিবাসী সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে।

সাখাওয়াৎ ছিলেন এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু তিনি ছিলেন উদার ও প্রগতিশীল ধ্যানধারণার মানুষ। হিন্দি ও উর্দু ভাষায় সমান দক্ষতা ছিল তাঁর। বাংলা ভাষার প্রতিও তাঁর ছিল গভীর মমতা। তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের অন্যতম ছিলেন হুগলীর শিক্ষাব্রতী মাজহারুল আনোয়ার এবং সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সাখাওয়াৎ নিজেও ছিলেন নারীশিক্ষার পক্ষপাতী।

এই মুক্তমনা উদারপন্থী মানুষটির সহধর্মিণী হয়ে এসে রোকেয়া তাঁর ধ্যান-ধারণার অনুকূল পরিবেশই লাভ করলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় ও স্বামীর সহযোগিতায় এই সময় ইংরাজি ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ, সাহিত্য ও সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ পান। এছাড়া শিশুপালন, গার্হস্থ্য, অর্থনীতি ও জীববিজ্ঞান সহ রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়েও বিস্তৃত জ্ঞানলাভের সুযোগ পান।

রোকেয়ার দাম্পত্য জীবন মাত্র দশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। নিঃসন্তান অবস্থায় অকালেই স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর পরে শ্বশুরালয় ভাগলপুরে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে ১৯১০ খ্রিঃ রোকেয়া কলকাতায় চলে আসেন।

এই সময় তিনি তাঁর ছোটবোন হোমায়রার শিশুকন্যা নুরীকে নিজেব কাছে এনে কন্যাস্নেহে লালন করেন।

রেকোয়ার জীবন ছিল নানা বিষাদময় ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত। নানা উপায়েই তাঁর কাছের মানুষেরা রোকেয়ার শিক্ষানুরাগ, প্রগতিশীল সমাজভাবনা স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছে। বাইরের ও ভেতরের এই দুমুখীন বাধা সত্ত্বেও রোকেয়া ভেঙ্গে পড়েননি। অদম্য প্রাণশক্তি বলে তিনি নিজের এবং স্বামীর ইচ্ছাপূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে গেছেন।

দেশের অবহেলিত নিপীড়িত নারীসমাজের মুক্তির স্বপ্ন রূপায়িত করার

উদ্দেশ্যে রোকেয়া প্রথম উদ্যোগ নেন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। একান্তভাবেই যেটি হবে মেয়েদের স্কুল।

সম্পূর্ণ একার চেষ্টায় মাত্র ৮টি মেয়ে নিয়ে কলকাতা আসার প্রথম বছরেই ১৯১১ খ্রিঃ ১৫ মার্চ তারিখে তৎকালীন কলকাতার ১৩ ওয়ালি উল্লাহ্ লেনে একটি ভাড়া বাড়িতে তাঁর সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টি বাংলার শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয়গুলির অন্যতম।

মাত্র ৮টি মেয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ক্রমেই ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে লাগল। তাই স্কুলপরিচালনার আনুষঙ্গিক খরচও বেড়ে চলল। রোকেয়া সরকারী সাহায্যের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর ১৯১২ খ্রিঃ তিন বছরের জন্য যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থ ছিল খুবই কম। বাধ্য হয়ে নিজের সঞ্চিত অর্থ এই সময় তাঁকে স্কুলের কাজে ব্যয় করতে হয়।

স্বামীর নামাঙ্কিত স্কুলটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওযাই এই সময় হয়ে উঠেছিল রোকেয়ার ধ্যানজ্ঞান। ফলে স্কুলের সুনাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীসংখ্যাও দিন দিনই বৃদ্ধি পেয়ে চলল।

তৎকালীন সমাজে রোকেয়ার এই কাজটি যে খুবই সহজসাধ্য ছিল না তা বলাই বাহুল্য। কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে জর্জরিত সমাজের মানুষদের নানান বিদ্রুপ অপমান ও নানা প্রকার বিরূপতার সম্মুখীন হওয়া তাঁর ক্ষেত্রে এই সময় প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্কুলটি বন্ধ করে দেবারও নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে রোকেয়া সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন স্রোতের বিপরীতে চলতে হলে তাঁকে সুদৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির বলে এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে।

রোকেয়া সেই কঠিন ব্রত উদযাপনে সার্থক সফল হয়েছিলেন। তাঁর সমাজের মহিলাদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল করে তোলার স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলটি আরও বার দুয়েক বাড়ি পরিবর্তন করার পর ১৯১৫ খ্রিঃ লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

রোকেয়ার আন্তরিক চেষ্টায় ১৯৩১ খ্রিঃ প্রথমবারের মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে রোকেয়ার স্কুলের ছাত্রীরা এবং বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের সেই গৌরব আজও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে এখানকার ছাত্রীরা।

শিশুশিক্ষার প্রয়োজনের দিকটিও রোকেয়া মনে রেখেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে এই স্কুলে কিন্ডারগার্টেন শাখাও চালু হয়েছিল।

গ্রামের ও শহরের বয়স্ক মহিলারাও যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না থাকেন, সেবিষয়েও সজাগ ছিলেন রোকেয়া। ১৯১৬ খ্রিঃ এই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন আনজুমান-ই-খাওয়াতীন-ই-ইসলাম।

সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ ও সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন রোকেয়া এবং বলাই বাহুল্য, সেসব ক্ষেত্রেও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতেন। তাঁর প্রেরণায় ও উৎসাহে সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে আসতেন।

রোকেয়া বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে নারী সমাজের উন্নতিকল্পে কাজ করে গেছেন। ১৯২৫ খ্রিঃ আলিগড়ে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম মহিলা সমিতির বার্ষিক সম্মেলন। রোকেয়া এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে তাঁর বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া তিনি বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল কনফারেন্স-এর সদস্যাও ছিলেন।

ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রমে রোকেয়ার শরীর ক্রমশই ভেঙ্গে পড়তে থাকে। নানান রোগে শরীর শীর্ণ হতে থাকে। এ সত্ত্বেও নিজের কাজে তিনি ছিলেন একজন নিরলস কর্মী।

জীবনের শেষ অংশ তিনি অতিবাহিত করেন তাঁর প্রিয় স্কুলেরই এক কক্ষে। ১৯৩২ খ্রিঃ ৯ ডিসেম্বর এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিরন্তর সংগ্রামী নারীপ্রগতির পথিকৃৎ মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া মাত্র ৬২ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে নিজের চেষ্টায় যে কর্ম সম্পাদন করেছেন, এক কথায় তা অতুলনীয়।

বেগমের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় কলকাতার কাইজার স্ট্রিটের মসজিদে। সেখান থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সোদপুর। সেখানে বি. টি. রোডের ধারে গোরস্থানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

অনুতাপের বিষয় যে, তাঁর কবরের ওপরে আজও পর্যন্ত কোনও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়নি। বাঙালী জাতির পক্ষে এ এক অতি অগৌরবের বিষয়। মানুষের কল্যাণে সারা জীবন ব্যয় করেছেন যিনি, তাঁর প্রতি জাতির পক্ষ থেকে কোনও কর্তব্যই করা হয়নি। তাঁর স্মৃতি রক্ষাতেও আত্মবিস্মৃত জাতির এই অবহেলা বড়ই মর্মান্তিক।

মোজেস

যীশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইহুদী জাতির প্রতিষ্ঠাতা ও ধর্মগুরু মোজেস বা মোশির জন্ম। তিনি পরাধীন যাকোবের বংশধর ইহুদী সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে এক শক্তিশালী জাতিরূপে গড়ে তুলেন। ধর্মের উপদেশ দান করে ইহুদীদের মধ্যে নীতি ও সত্যপরায়ণতার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহুদীদের নিজেদের কোন দেশ ছিল না, মোজেস তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একটি দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রাচীন পৃথিবীর ধর্মগুরুদের মধ্যে একেশ্বরবাদী মোজেস অন্যতম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত ইহুদীগণ অদ্যাবধি অনুসরণ করে চলেছেন।

মিশরে ফ্যারাও রামেসিসের রাজত্বকালে ইহুদীরা রাজধানীর উপকণ্ঠে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করত। এই জাতি ছিল স্বাস্থ্যবান ও পরিশ্রমী। তাদের নিজেদের কোনও দেশ ছিল না। তাই তারা মিশর দেশে এসে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল।

ইহুদীরা ফ্যারাও-এর জন্য মাটি কাটত, ইট প্রস্তুত করত, চাষবাস করত। তাছাড়া নানা শ্রমসাধ্য কাজ করত। মোট কথা মিশরের সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল ইহুদীদেরই কঠোর পরিশ্রমের ফলে।

কিন্তু রাজকর্মচারীরা ইহুদীদের সঙ্গে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করত। কারণে অকারণে তাদের ওপর অন্যায় ও নির্যাতন করত।

নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলার অভাব থাকায় মিশরীয়দের সমস্ত অত্যাচার ইহুদীরা মুখবুজে সহ্য করতে বাধ্য হত।

সেইকালে মিশর ছিল পুরোহিততন্ত্রের অধীন, নানা দেবদেবীর উপাসক। সমাজের ওপর রাজার চেয়েও পুরোহিতদেরই প্রাধান্য ছিল অধিক। পুরোহিতরা এতটাই প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল যে স্বয়ং ফ্যারাওকেও তাদের আদেশ নির্দেশ মান্য করে চলতে হত।

মিশরে ৪৩০ বছর বসবাসকালের মধ্যে ইহুদীদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে ফ্যারাও-এর ভয় হল, একদিন হয়তো তারাই মিশর দেশ দখল করে নেবে। তাই তাদের জন্মহার রোধ করার জন্য ফ্যারাও আদেশ দিলেন, ইহুদী পরিবারে নবজাতক শিশু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নদীতে বিসর্জন দিতে হবে।

ফ্যারাও-এর আদেশে গুপ্তচরেরা ইহুদীদের ওপর সতর্ক নজর রেখে চলল। যখনই কোন পরিবারে সন্তান জন্মাবার সংবাদ পেত, তারা গিয়ে সেই শিশুকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

ফ্যারাও-এর অত্যাচারে ইহুদীদের সুখ-শান্তি নষ্ট হল। ভয়ে ভয়ে তাদের দিন কাটতে লাগল।

গোশন প্রদেশে ইহুদী মহল্লায় আসরাম ও জোশিবেদ নামে এক দম্পতি বাস করতেন। একসময় তাঁদের একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হল।

জোশিবেদ স্নেহবশতঃ অত্যন্ত গোপনে শিশু সন্তানকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। তিন মাস পর যখন তিনি দেখলেন শিশুটিকে আর লুকিয়ে রাখা চলে না তখন তিনি তাকে একটি পেটিকায় শুইয়ে রেখে নীল নদের এক ঘাটের কাছে শরবনে রেখে এলেন।

জোশিবেদ জানতেন ফ্যারাও-এর কন্যা প্রতিদিন ওই ঘাটে স্নান করতে আসেন। তাই শিশুপুত্রকে ঘাটের কাছে রেখে নিজে লুকিয়ে রইলেন গাছের আড়ালে।

যথাসময়ে রাজকুমারী সুন্দর বাচ্চাটিকে পেয়ে তুলে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। তারপর নতুন নিযুক্ত এক ধাত্রীর হাতে শিশুটিকে লালন পালনের ভার দিলেন। আর শিশুটির নাম রাখলেন মোজেস বা মোশি। মোশি শব্দের অর্থ টেনে তোলা।

বলাবাহুল্য এই নতুন ধাত্রীটি হলেন জোসিবেদ। তিনি নিজের পরিচয় গোপন করে রাজপ্রাসাদে শিশুপুত্রকে প্রতিপালন করেন।

মোজেসেব জীবনের ভবিষ্যতের নির্দেশ তাঁর এই নামকরণের মধ্যেই নিহীত ছিল। বস্তুতঃ পরাধীন ও নিপীড়িত ইহুদী জাতির উদ্ধারকর্তা রূপেই মোজেসের জন্ম হয়েছিল। ফ্যারাও-কন্যার অজ্ঞাতেই নিতান্ত দৈবযোগে মোজেস যথার্থ নামকরণ লাভ করলেন।

রাজপ্রাসাদে নিজের মায়ের কোলেই বড় হয়ে উঠলেন শিশু মোজেস। শিশুপুত্র একটু বড় হলে জোসিবেদকে নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে হল।

তবে তিনি মাঝে মাঝে এসে সন্তানকে দেখে যেতেন। মোজেস তাঁকে তাঁর ধাইমা বলেই জানতেন।

দিনে দিনে মোজেসের বয়স বাড়তে লাগল। কৈশোর কাল পার হয়ে ক্রমে তিনি যুবক হলেন।

এদিকে ইহুদীদের ওপরে ফ্যারাও-এর অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। শ্রমসাধ্য যাবতীয় কঠিন কাজ তাদের দিয়ে করানো হত। চুন থেকে পান খসলেই তাদের পিঠে পড়ত প্রহরীদের চাবুকের আঘাত।

ইহুদীদের প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার মোজেস সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু প্রতিবাদ করারও সুযোগ পেতেন না।

মোজেসের মনোভাব বুঝতে পেরে জোসিবেদ একদিন গোপনে তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর স্বজাতির লাঞ্ছনায় মোজেসের অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

তিনি সংকল্প গ্রহণ করলেন, যেমন করেই হোক, ইহুদীদের ওপরে মিশরীয়দের এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

একদিন মোজেস দেখলেন, একজন মিশরীয় রাজকর্মচারী একজন ইহুদীকে নির্মমভাবে প্রহার করছে। এই অত্যাচার তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তখনই সেই রাজকর্মচারীকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেললেন।

কিভাবে এই সংবাদ জানতে পেরে ফ্যারাও মোজেসকে বধ করার আদেশ দিলেন।

প্রাণভয়ে মোজেস নগর ত্যাগ করে মিডিয়ায় চলে এলেন। এখানে এক যাজক রুয়েনের কন্যা সিপ্পোরাকে বিয়ে করে শ্বশুরালয়েই বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি রুয়েনের মেষপাল চরানোর কাজ করতেন।

এখানে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। এক এক করে বছর কাটে, আর মোজেস ব্যথিত হৃদয়ে ভাবতে থাকেন কিভাবে ইহুদীদের অন্যায় অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু কোন পথ তিনি খুঁজে পান না।

একদিন এক নির্জন পাহাড়ে ভেড়া চরাতে গিয়ে মোজেস দেখতে পেলেন একটা ঝোপের ওপর আগুন জ্বলছে। কিন্তু ঝোপটি পুড়ছে না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে কৌতূহলী হয়ে তিনি ঝোপের দিকে অগ্রসর হলেন।

কিছুদূর গিয়েছেন, এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন সেই আগুনের মধ্যে থেকে এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছে, মোজেস, মোজেস, তুমি ঝোপের নিকটে এসো না। তুমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছ তা পবিত্র স্থান। তোমার পায়ের জুতো খুলে ফেল।

মোজেস তাড়াতাড়ি পায়ের জুতো খুলে ফেললেন এবং ভয়ে ভয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পুনরায় সেই অলৌকিক দৈববাণী হল—আমি আব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব প্রভৃতি তোমার পূর্বপুরুষগণের ঈশ্বর। মিশরে ইহুদীরা চরম নির্যাতন উৎপীড়ন ভোগ করছে। আমি অত্যাচারী ফ্যারাও-এর কবল থেকে তাদের উদ্ধার করব এবং তাদের সকলকে এক রমণীয় দেশে নিয়ে যাব। তুমি মিশরে গিয়ে তাদের সকলকে আমার কথা বল ও সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

মোজেস মাটিতে নতজানু হয়ে বসে বললেন, প্রভু, ইহুদীরা আমার কাছে আপনার কথা জানতে চাইলে আমি আপনার কী পরিচয় দেব? তারাই বা আমার কথায় মিশর ত্যাগ করবে কেন?

দৈববাণী বলল, আমি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ইজরাইল সন্তানগণের রক্ষাকর্তা জেহোবা। তোমার মধ্যে আমার শক্তি কাজ করবে। আমার হয়ে তোমাকেই সব করতে হবে। তোমার কথা ইহুদীরা অমান্য করবে না।

মোজেস এবারে অনুভব করতে পারলেন, ঈশ্বরের কাজ করার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে। তিনি পরমেশ্বর জেহোবা প্রেরিত নির্দিষ্ট ব্যক্তি। আর জেহোভাই তাঁর একমাত্র ঈশ্বর।

ঈশ্বরের আদেশলাভের পর মোজেস স্ত্রী-সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিশর অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তাঁর ভাই হারোনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। হারোন ছিলেন শক্তিশালী যাদুকর। মোজেস তাঁকে সঙ্গে করে গোপনে মিশরে এসে ইহুদীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মোজেস তাদের সকলকে দৈববাণীর কথা বললেন।

মোজেসের আন্তরিক ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বে ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হল। কেউই তাঁর কথা অবিশ্বাস করতে পারল না। মোজেস সকলকে বললেন, মিশর ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও, আমি ফ্যারাও-এর নিকট দেশত্যাগ করার অনুমতি চাইব।

ততদিনে মিশরের সিংহাসনে বসেছেন নতুন ফ্যারাও। তিনি মোজেসকে চিনতেন না। ঈশ্বরের আদেশে মোজেস একদিন হারোনকে সঙ্গে করে ফ্যারাও-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি ফ্যারাওকে বললেন, সম্রাট, আমরা আমাদের দেবতা জেহোভার উদ্দেশ্যে মিডিয়ার প্রান্তরে গিয়ে পুজো ও যজ্ঞ করব স্থির করেছি। আপনি দয়া করে আমাদের সকলকে কয়েক দিনের জন্য সেখানে যাবার অনুমতি দিন।

ফ্যারাও মোজেসের অনুরোধ কানেই তুললেন না। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, তোমাদের দেবতাকে আমি মানি না। তোমরা মিশর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।

মোজেস বারবার ফ্যারাওকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। তিনি ফ্যারাওকে এমন কথা পর্যন্ত বললেন যে, তাঁদের জিহোভার পুজো দিতে যেতে না দিলে মিশরের এবং ফ্যারাওয়ের ক্ষতি হবে।

ব্যর্থ হয়ে মোজেস ফিরে এলেন। কিন্তু জিহোভার নির্দেশে কয়েকদিন পরেই আবার হারোনকে সঙ্গে নিয়ে ফ্যারাওয়ের দরবারে উপস্থিত হলেন।

এবারেও ইহুদীদের মিশর ত্যাগ করে যেতে দিতে ফ্যারাও কিছুতেই সম্মত হলেন না। ইহুদীদের শ্রমের ওপরেই প্রধানতঃ মিশরের সমৃদ্ধি নির্ভর করত। তাছাড়া রাজকর্মচারীদের ওপরেও যে ইহুদী সম্প্রদায়ের অসন্তোষ রয়েছে সেকথাও ফ্যারও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল ইহুদীরা একবার

দেশত্যাগ করলে আর কখনোই মিশরে ফিরে আসবে না। তাই কোনও রকম ঝুঁকি তিনি নিতে চাইছিলেন না।

ফ্যারাও যখন কিছুতেই সম্মত হচ্ছেন না তখন হারোন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, সম্রাট, আমাদের দেবতা জেহোভা ক্রুদ্ধ হলে কেবল ইহুদিরাই নয়, সমগ্র মিশরই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এই বলে তিনি তাঁর হাতের যাদু-দণ্ডটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাদুদণ্ড একটি অতিকায় সাপে পরিণত হল।

ফ্যারাও তখন তাঁর দরবারের গুণীনদের আহ্বান করলেন। গুণীনরা এসে রাজার আদেশে নিজ নিজ যাদুদণ্ড মাটিতে নিক্ষেপ করল। সেগুলিও এক একটা সাপে পরিণত হল।

কিন্তু দেখা গেল, হারোনের যাদুদণ্ড থেকে যে সাপ উৎপন্ন হয়েছিল, সে অপর সাপগুলিকে চোখের পলকে গিলে ফেলল।

ফ্যারাও কিন্তু এই দৃশ্য দেখেও বিচলিত হলেন না। তিনি ইহুদিদের বিষয়ে তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তও বদল করলেন না।

বিমর্ষ ও ব্যর্থ মনোরথ মোজেস ফিরে এলেন। তিনি জেহোভার কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন। এরপর মিশরে পর পর দশটি উৎপাতের সৃষ্টি হল।

একদিন ফ্যারাও নদীতীরে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন, মোজেস ও হারোন এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং ইহুদীদের জন্য পুনরায় ছুটি প্রার্থনা করলেন। ফ্যারাও তাঁর একই সিদ্ধান্ত জানালেন।

জেহোভার নির্দেশ মতো তখন মোজেস নদীর জলে তাঁর হাতের লাঠিটি স্পর্শ করলেন। মুহূর্তমধ্যে জল রক্তে পরিণত হল এবং সমস্ত জলজ প্রাণী মারা পড়ল। মানুষ বা গবাদিপশু, কোন প্রাণীই নদীর জল পান করতে পারল না। মাছ ইত্যাদি জলজপ্রাণীদের পচা গন্ধে মিশরীয়গণ অতিষ্ঠ হল।

দ্বিতীয়বারে দেখা দিল ব্যাঙের মহামারী। নদী খাল বিল প্রভৃতি জলাশয়ে, এমনকি লোকের বাড়িতে সমস্ত ব্যাঙ মরে পচা দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। সেই গন্ধে লোকের প্রাণান্তকর অবস্থা হল।

ফ্যারাও তখন মোজেশকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুমি ব্যাঙের মড়ক বন্ধ কর। আমি তোমাদের মরুভূমিতে গিয়ে পুজো দেবার অনুমতি দেব।

মোজেসের প্রার্থনায় জেহোভা ব্যাঙের মড়ক বন্ধ করলেন। কিন্তু ফ্যারাও তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। নানা অজুহাতে তিনি তাদের পুজো দিতে যেতে দিলেন না।

নিরুপায় হয়ে মোজেস আবার জেহোভার কাছে প্রার্থণা জানালেন। জেহোভার কোপে মিশরময় লোকের মাথায় উকুনের উৎপাত আরম্ভ হল।

চতুর্থবারে মিশরবাসীদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশার আক্রমণ হল। পঞ্চমবারে দেখা দিল মহামারী।

ষষ্ঠবারে মোজেস এবং হারোন একমুষ্টি ছাই আকাশে ছুঁড়ে দিলেন। সেই ছাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে লোকের শরীরে স্ফোটকের সৃষ্টি করল। ফ্যারাও থেকে পশু পর্যন্ত সকলেই স্ফোটকের যন্ত্রণা ভোগ করল।

সপ্তমবারে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাতে সমগ্র মিশরের শস্য বিনষ্ট হল। অষ্টমবারে পালে পালে পঙ্গপাল উড়ে এসে মিশরের অবশিষ্ট শস্য নিঃশেষ করে দিল।

নবমবারে, মিশরের আকাশ জুড়ে নেমে এল নিবিড় অন্ধকার। তিন দিন মিশরীয়গণ কেউ কাউকে দেখতে পেল না।

দশমবারে মিশরীয়দের প্রথম পুত্র-সন্তান এবং প্রথম জাত পশু মারা পড়ল। ঘরে ঘরে উঠল কান্নার রোল।

এইবার ফ্যারাও ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ইহুদিদের দেবতা জেহোভাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। এর পরও যদি জেহোভার কোপে আরও ক্ষতি হয় তাহলে দেশজুড়ে গণবিদ্রোহ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

নিরুপায় হয়ে ফ্যারাও মোজেস ও হারোনকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আমি অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা মরুভূমিতে গিয়ে দেবতার পুজো দিয়ে এসো। যদি মনে করো তোমাদের গবাদি পশু বা অন্যান্য জিনিসপত্র সঙ্গে নেবে, তাও নিয়ে যেতে পার।

মিশর ত্যাগের অনুমতি পেয়ে ইহুদিগণ মুক্তির আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। বহু বছর আগে থেকেই তারা ফ্যারাও-এর নিষ্ঠুর শাসনে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছিল। পরাধীন বন্দিজীবনকেই তারা তাদের নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিল।

এতবছর পরে মোজেসই ইহুদিদের জন্য মুক্তির পথ করে দিলেন। সাময়িক হলেও স্বাধীনতা তো বটে। মিশরের সমস্ত ইহুদি এরপর মোজেসকেই তাদের নেতা বলে স্বীকার করে নিল।

সেই রাতেই ইহুদিগণ, সপরিবারে, এমন কি তাদের গৃহপালিত পশুগুলিকে পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে মোজেস ও হেরোনকে অনুসরণ করে মরুভূমির পথে যাত্রা করল।

মিশরীয়দের অধীনতার পাশ ছিন্ন করে নিস্তার পেয়েছিল বলে ইহুদিগণ এই দিনটিকে স্মরণ করে এখনো পর্যন্ত প্রতিবছর পালন করে থাকে নিস্তার পরব। নিস্তার অর্থ হল মুক্তি বা পরিত্রাণ।

মোজেস চলেছেন জেহোভা নির্দিষ্ট নতুন দেশ প্যালেস্টাইন নগরের উদ্দেশ্যে। এই যাত্রায় আপাততঃ তাঁর লক্ষ্য সিনাই পর্বত। মোজেসের মনে আশঙ্কা ছিল,

ফ্যারাও নানা উৎপাতের ভয়ে ইহুদিদের দেশত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাদের যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারেন। এই কারণে প্রতিপদক্ষেপেই তাঁকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে কাতারে কাতারে ইহুদি জনতা। কয়েকদিন ক্রমাগত চলার পর তাঁরা এসে পৌঁছলেন লোহিত সাগরের তীরে।

মোজেসের আশঙ্কা অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই। পেছনে দিগন্তরেখা বরাবর ছুটে আসতে দেখা গেল বিশাল সৈন্যবাহিনীকে।

মিশরের সুখ-সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে। ফ্যারাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, দেশত্যাগী ইহুদিগণকে বলপূর্বক দেশে ফিরিয়ে এনে ক্রীতদাস করে রাখতে না পারলে দেশের সমূহ ক্ষতি। সেকারণে ইহুদিদের বন্দী করবার জন্য তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী।

দূর থেকে মিশরীয় সৈন্যদের দেখতে পেয়ে তাঁর দেবতা জেহোভাকে স্মরণ করলেন মোজেস। সঙ্গে সঙ্গেই দৈবনির্দেশ তাঁর অন্তরে জেগে উঠল। তিনি তাঁর হাতের দণ্ডটি সামনে তুলে ধরে সমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাৎ উত্তাল জলরাশি দু'পাশে দেয়ালের মতো সরে গিয়ে প্রশস্ত চলাচলের পথ তৈরি হল। মোজেস তাঁর অনুগামী জনতাকে নিয়ে সমুদ্রগর্ভের সেই পথ দিয়ে হেঁটে নিরাপদে পরপারে পৌঁছলেন।

ইহুদিদের সমুদ্র অতিক্রম করতে দেখে তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী মিশরীয় সৈন্যগণও সমুদ্রগর্ভের পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল।

এই দৃশ্য দেখে মোজেস পুনরায় তাঁর হাতের দণ্ড সমুদ্রের দিকে তুলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুপাশে সরে দাঁড়ানো জলরাশি বিপুল গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিশরীয় সৈন্যদের উপর। মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সমুদ্রগর্ভে।

এই ঘটনা ইহুদিদের মনে গভীর রেখাপাত করল। তাদের সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল, মোজেস সামান্য মানুষ নন। তিনি ভগবান জেহোভার কৃপাধন্য শক্তিমান মহাপুরুষ। আনন্দে উল্লাসে সকলে নৃত্যগীত করতে লাগল। মোজেসের বোন মরিয়ম অন্যান্য নারীদের সঙ্গে নিয়ে সেই আনন্দ কোলাহল আরও মুখরিত করে তুললেন।

সেই অবস্থায় মোজেস সকলকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে এসে পড়লেন উন্মুক্ত উষর প্রান্তরে। তার যতদূর দৃষ্টি চলে, কোথাও লোকালয় বা জনমানবের চিহ্ন নজরে পড়ে না।

দিগন্ত বিস্তারী মরুভূমির বুক চিড়ে চলতে চলতে মোজেস তাঁর অনুগামীদের আশ্বস্ত করে বললেন, তোমরা জিহোভার অনুগ্রহে বিশ্বাস স্থাপন করে এগিয়ে

চলো। তাঁর কৃপায় পথের কোনও বাধাই আমাদের যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

ঈশ্বরের শক্তিতেই চালিত হচ্ছিলেন মোজেস। তাই সেই মরুভূমির বুকে অলৌকিক উপায়ে পানীয় এবং আহার্য দিয়ে তিনি ইহুদিগণকে রক্ষা করতে লাগলেন। মোজেসের প্রতি ভক্তিতে কৃতজ্ঞতায় ইহুদিদের হৃদয় ভরে উঠল। ভগবান জেহোভার প্রতিও তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তারা সকলে মিলে এই শপথ নিল যে সকল অবস্থাতেই মোজেসের আদেশ নির্দেশ মান্য করে চলবে। তিনিই তাদের নেতা ও ধর্মগুরু।

ক্রমে মরুভূমি অতিক্রম করে এক নতুন দেশে উপস্থিত হলেন মোজেস। সে দেশে বাস করত আমালেক নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি। তারা শত্রু মনে করে ইহুদিদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হল।

এই নতুন দেশের অদূরেই ছিল প্যালেস্টাইন নগরী। জেহোভার নির্দেশে মোজেস ইহুদিদের জানালেন, আক্রান্ত হলে আমাদেরও প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হবে। তার জন্য তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। জেনে রেখো; এই দেশের পরেই আছে আমাদের জেহোভানির্দিষ্ট নতুন দেশ প্যালেস্টাইন। এই প্যালেস্টাইনেই আমরা গড়ে তুলব আমাদের নিজস্ব বাসভূমি। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আমরা সেখানে বসবাস করতে পারব।

এখানে আমালেক জাতির সঙ্গে ইহুদিদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। বীরবিক্রমে লড়াই করে যুদ্ধে জয়ী হল ইহুদিরা। তাদের পথ হল নিষ্কন্টক। পরাজিত বিধ্বস্ত আমালেকরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন মোজেস। তাঁর সংগঠন ক্ষমতা ও যুদ্ধকৌশল কেবল শত্রুদেরই বিতাড়িত করল না, দুরন্ত মনোবল ও ঐক্য শক্তিতে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে তুলল ইহুদিদের। পরাধীন ক্রীতদাসজীবনের হীনমন্যতার অন্ধকার দূর হল তাদের মন থেকে। ভবিষ্যতে এক শক্তিশালী জাতিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষার উদগম হল সকলের হৃদয়ে।

মোজেস এরপর এসে পৌঁছলেন সিনাই পর্বতের পাদদেশে। সকলকে সেখানেই শিবির স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন তিনি।

এখানে অবস্থানকালে একদিন মোজেস শুনতে পেলেন জেহোভার অলৌকিক কণ্ঠস্বর, হে আমার প্রিয় মোজেস, আমি তোমার মাধ্যমে ইহুদিদের জগতে এক শক্তিশালী জাতি রূপে গড়ে তুলতে চাই। তার জন্য ইহুদিদের অবশ্য পালনীয় দশটি নির্দেশ লেখা প্রস্তর ফলক আমি রেখে দিয়েছি সিনাই পর্বতের শীর্ষদেশে। তুমি সেই প্রস্তর ফলক সংগ্রহ করে আমার নির্দেশগুলি সকলকে জানিয়ে দাও।

আমার নির্দেশ, তোমরা সকলে সর্বদা এই দশটি নিয়ম মেনে চলবে। তাহলে আমার আশীর্বাদ সদাসর্বদা ইহুদিদের রক্ষা করবে।

জেহোভার দৈবনির্দেশ পাবার পর মোজেস একা ধীরে ধীরে উঠে গেলেন পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে জেহোভার নির্দেশ খোদাইকরা প্রস্তর ফলক দেখতে পেয়ে সেটি নিয়ে নেমে এলেন নিচে। তারপর সমস্ত ইহুদিদের সমবেত করে শোনালেন ঈশ্বরের দশটি নির্দেশ ঃ

(১) তোমরা জেহোভাকেই একমাত্র ঈশ্বর বলে জানবে। জেহোভা ছাড়া তোমাদের অপর কোন উপাস্য নেই।

(২) জেহোভার প্রতিটি নির্দেশ তোমাদের প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে।

(৩) সপ্তাহের ছয় দিন কাজ করবে। সপ্তম দিন হল স্যাবাথ বা পবিত্র বিশ্রামের দিন।

(৪) পিতামাতাকে ভক্তি করবে, মান্য করবে। তাঁদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করবে না।

(৫) নরহত্যা করবে না।

(৬) ব্যভিচার করবে না।

(৭) কখনও পরের দ্রব্য অপহরণ করবে না।

(৮) সর্বদা সত্য কথা বলবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

(৯) বলপূর্বক অপরের অধিকারের কোনও দ্রব্য গ্রহণ করবে না।

(১০) উপাসনাস্থলে বেদী নির্মাণ করে জেহোভার উদ্দেশ্যে পশুবলি দেবে।

জেহোভার এই দশটি নির্দেশকে বলা হয় টেন কম্যান্ডমেন্টস। বাইবেলের প্রাচীন অংশ ওল্ড টেস্টামেন্টে এই নির্দেশগুলি এবং মোজেসের পবিত্র কাহিনী পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের নির্দেশ লেখা পবিত্র প্রস্তর ফলক শ্রদ্ধার সঙ্গে মোজেস স্থাপন করলেন পাহাড়ের গায়ে। সমবেত ইহুদিদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিদর্শন হল এই পবিত্র পাথর। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জানাবার জন্য সেটি এই পাহাড়ের গায়ে স্থাপন করা হল।

মোজেসের মাধ্যমে এভাবে ঈশ্বরের করুণালাভ করে ইহুদিরা আনন্দে আহ্লাদে অভিভূত হল। মোজেসকে তারা তাদের মুক্তিদাতা ও ধর্মীয় গুরু রূপে স্বীকৃতি জানাল। এরপর মোজেস ইহুদিদের নিয়ে প্যালেস্টাইনের পথে যাত্রা করলেন। একটা স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য সকলের মনই তখন উতলা হয়ে উঠেছিল।

পাহাড়, বন, মরুপ্রান্তেরের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তারা অতিবাহিত করেছে। এবারে নিজস্ব বাসভূমিতে না পৌঁছনো পর্যন্ত স্বস্তি আসবে না।

তিনদিন চলার পর জেহোভার দয়ায় মোজেস জর্ডন নদীর পূর্বতটে পৌঁছলেন। এখানে পরাক্রান্ত রাজাদের পরাস্ত করে তিনি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন। এই দেশের নাম মোয়াব দেশ।

একদিন পার্শ্ববর্তী নবেপর্বতের ওপরে মোজেস যখন ধ্যান করছিলেন, তখন জেহোভা তাঁকে জর্ডনের পশ্চিম তটের দেশগুলি দেখিয়ে বললেন, প্রিয় মোজেস, ওই দেখ সামনেই আমার প্রতিশ্রুত দেশ। তুমি সেখানে যেতে পারবে না বলে দুঃখ করো না। তোমার বংশধরদের আমি ওই দেশে নিয়ে যাব।

মোজেস জেহোভাকে কোন প্রশ্ন করলেন না, কোনও অনুরোধ করলেন না। কেবল বললেন, প্রভো, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

মোজেস সেই মোয়াব দেশেই ইহুদিদের সংগঠিত করে এক শক্তিশালী জাতি রূপে গড়ে তুললেন। জীবনের ১২০ বৎসর পর্যন্ত তিনি শাসন নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে ইহুদি জাতির শক্তি বৃদ্ধি করলেন। দীর্ঘ জীবন তিনি সরল অনাড়ম্বর ভাবে অতিবাহিত করেছেন। ধর্মের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছেন। তাঁর সৎ সরল জীবনযাত্রা ইহুদিদের অনুপ্রাণিত করেছে।

অবশেষে একদিন জেহোভার নির্দেশে মোজেস পাহাড়ের ওপরে উঠে ধ্যানে বসলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল তাঁর নিশ্চল নিথর ধ্যানমগ্ন দেহ থেকে এক উজ্জ্বল আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

শোককাতর ইহুদিরা মোজেসের প্রাণহীন দেহ পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে সমাহিত করল। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিসম্প্রদায় ইহুদিদের এভাবে পরাধীনতার অন্ধকার থেকে মুক্তি বিধান করে চিরন্তন সত্যের পথের সন্ধান জানিয়ে মোজেসের মহাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

রঘুনাথ শিরোমণি

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশিলা, নালন্দা প্রভৃতির খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। দেশের প্রতিভাধর শিক্ষাবিদ পণ্ডিতগণ এসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।

তাঁদের পদপ্রান্তে বসে বিভিন্ন শাস্ত্রে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে দেশবিদেশের জ্ঞানান্বেষী বিদ্যার্থীরা এখানে সমবেত হতেন।

গুরুকুলের ঐতিহ্যবাহী ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হত বিশেষ বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের কেন্দ্র করে, তাঁদের

প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাশ্রমে। এমনি একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বাংলার নবদ্বীপে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণিকে কেন্দ্র করে।

তাঁর এই শিক্ষাকেন্দ্রের সুনাম ব্যাপ্ত ছিল ভারতবর্ষ জোড়া। গুণবত্তায় তা ছিল অদ্বিতীয়। প্রধানতঃ তাঁরই প্রতিভাগুণে সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গদেশের স্থানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল গৌরবের উচ্চতম শিখরে।

রঘুনাথ শিরোমণি কেবল ন্যায় দর্শনে ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাই নয়। ন্যায় শ্যাস্ত্রের ওপরে নানা আকর গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের সৌরভ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সমগ্র ভারতজুড়ে। তাই দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা নবদ্বীপে আসতেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য।

রঘুনাথ শিরোমণির পিতার নাম ছিল গোবিন্দ চক্রবর্তী। মাতা সীতাদেবী।

গোবিন্দ চক্রবর্তীর আদি নিবাস ছিল তৎকালীন বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট জেলায়। তাঁর পরলোকগমনের পর ঘটনাচক্রে সীতাদেবী দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথকে নিয়ে নবদ্বীপে চলে আসেন।

সেই সময়ে সুবিদনারায়ণ নামে এক প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন শ্রীহট্টের রাজা। তাঁর একটি কন্যাসন্তান ছিল খঞ্জ। অর্থ ও ভূ-সম্পত্তির লোভে সেই খঞ্জ কন্যাকে রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করেন।

এই ঘটনায় মাতা সীতাদেবী এতটাই মর্মাহত হন যে অল্পবয়স্ক শিশুপুত্র রঘুনাথকে নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় গৃহত্যাগ করেন।

শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমগ্র বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে নবদ্বীপ তখন অন্যতম প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। নবদ্বীপের এই প্রতিষ্ঠার সংবাদ বিদ্যানুরাগিনী সীতাদেবীও বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন।

বালক রঘুনাথের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে এই ভরসায় গৃহত্যাগ করে সপুত্র চলে আসেন নবদ্বীপে। তিনি আশ্রয় নিলেন দেশবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের বাড়িতে।

পণ্ডিতের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ গ্রহণ করে সীতাদেবী পুত্রের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিলেন। সেই সময় রঘুনাথের বয়স মাত্র পাঁচ বছর।

বাল্যশিক্ষার পর্বেই পণ্ডিত বাসুদেব বালক রঘুনাথের অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন। বিচক্ষণ জ্ঞানবৃদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন প্রতিভাধর বালক ছাত্রটি কালে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

বর্ণমালা শিখতে বসে রঘুনাথ একদিন তাঁর শিক্ষক বাসুদেবকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে চমকে দিয়েছিলেন। রঘুনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, বর্ণমালায় ক অক্ষর আগে কেন হল? খ কেন আগে হল না?

এই প্রশ্নের মাধ্যমে বালক ছাত্রের অসাধারণ মেধা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত বাসুদেব অতি যত্নের সঙ্গে তাকে শিক্ষা দান করতে লাগলেন।

রঘুনাথের বালককালের আর একটি ঘটনা অতি চমৎকার। এই ঘনটায় তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কথা প্রসঙ্গে একদিন বাসুদেব তাঁর ছাত্রদের বলেছিলেন, দেবতার জন্য ফুল চয়ন করার সময় আঁজলায় করে নিতে নেই। ফুল সাজিতে তুলে রাখতে হয়। আঁজলায় নিলে স্পর্শদোষে পূজার ফুলের পবিত্রতা নষ্ট হয়।

বাসুদেবের টোলের নিয়ম অনুয়ায়ী ছাত্রদের মধ্যে একজন করে প্রতিদিন প্রভাতে পূজার ফুল সংগ্রহ করত। পর্যায়ক্রমে রঘুনাথের যেদিন পালা এল তিনি সাজির বদলে দু'হাতের আঁজলা ভরে ফুল নিয়ে এলেন।

দেখে গুরুদেব বললেন, তোমাদের তো বলেছি, আঁজলাভরে পূজার ফুল তুলতে নেই। তাতে স্পর্শ দোষে ফুলের পবিত্রতা নষ্ট হয়।

রঘুনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, গুরুদেব আঁজলার নিচের ফুলগুলোর ওপরেই তো ওপরের ফুলগুলো রয়েছে। এগুলোতে স্পর্শদোষ ঘটেনি। ওপরের ফুলগুলো পবিত্রই রয়েছে।

বালক ছাত্রের কথা শুনে চমকিত বিস্মিত হন বাসুদেব। ইতিপূর্বে বহু ছাত্রকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। কিন্তু রঘুনাথকে দেখছেন সকলের থেকে স্বতন্ত্র। সহজাত প্রতিভা তাঁর প্রতি কাজে কথায় প্রকাশ পায়।

গুরুর তত্ত্বাবধানে ও উপযুক্ত শিক্ষায় একদিন টোলের পাঠগ্রহণ শেষ হয় রঘুনাথের। বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে সেই সময় রঘুনাথের সহপাঠী ছিলেন শ্রীচৈতন্য। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তিও ছিল অসাধারণ।

ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হবার বাসনা ছিল রঘুনাথের। কিন্তু একদিন তিনি দেখেন এবিষয়ে চৈতন্য একটি পুঁথি রচনা করেছেন। সখেদে তখন তিনি সতীর্থকে বলেন, তোমার এই পুঁথি আমার আশাকে নির্মূল করল।

প্রিয় সতীর্থের আক্ষেপ শুনে চৈতন্য তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় তাঁর রচিত পুঁথি বিসর্জন দেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য যে বৈষ্ণব শাস্ত্রের গবেষকদের মধ্যে দুটি মত দেখা যায়। অনেকের মতে রঘুনাথ যেই সার্বভৌমের নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিখ্যাত সার্বভৌম নন।

তাঁদের আরও মত এই যে, ভারতবিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি চৈতন্যদেবের সতীর্থ ছিলেন না।

এসকল মতভেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। যাইহোক, টোলের পাঠ সাঙ্গ করে রঘুনাথ মনস্থ করেন মিথিলায় যাবেন।

সেইকালে মিথিলার পক্ষধব মিশ্রের নাম ভারতজোড়া। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর

সমকক্ষ পণ্ডিত সমগ্র ভারতে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। নব্যন্যায়ের স্বরচিত ভাষ্য কেবল তিনি তাঁর ছাত্রদেরই শিক্ষা দিতেন। পুঁথি কাউকে নকল করতে দিতেন না।

বিদ্যার্জনের অদম্য অভিলাষ নিয়ে রঘুনাথ একদিন বঙ্গদেশ ছেড়ে সুদূর মিথিলায় উপস্থিত হলেন। শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন পক্ষধর মিশ্রের।

অল্পদিনের মধ্যেই রঘুনাথের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে পক্ষধর মিশ্র এবং তাঁর টোলের ছাত্ররা চমকিত হলেন।

নিজের টোলে পক্ষধর তাঁর ছাত্রদের আসনে বসার একটা নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। ছাত্রদের বসার জন্য যে মঞ্চ ছিল সেখানে তাদের বসার ব্যবস্থা ছিল গুণানুক্রমে।

নিম্নশ্রেণীর ছাত্ররা মঞ্চের একেবারে পাদদেশে বসে পাঠ গ্রহণ করত। উচ্চশ্রেণী ক্রমে ছাত্ররা মঞ্চের উচ্চতর আসনে বসে অধয়ন করত। মঞ্চের সবচেয়ে উঁচু আসনে বসতেন পক্ষধর মিশ্র। সেখানে বসেই তিনি ছাত্রদের বিদ্যাভাস করাতেন এবং নিজস্ব গ্রন্থ রচনা করতেন।

এই নিয়ম অনুযায়ী রঘুনাথকে প্রথমে বসতে হয়েছিল মঞ্চের নিম্নতম আসনে।

কিন্তু দেখা গেল, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অর্জিত বিদ্যা ও প্রতিভার প্রভাবে মঞ্চের উচ্চতম আসনে বসার উপযুক্ততা প্রমাণ করেছেন।

এই ঘটনা পক্ষধর মিশ্রকে রঘুনাথের প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তুলল। রঘুনাথের অগাধ জ্ঞান ও কবিত্বশক্তির পরিচয় লাভ করে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর গৌরবের শীর্ষাসন একদিন রঘুনাথই টলিয়ে দেবে।

রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের টোলে মাত্র তিন বছর অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল এমনই যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই মিথিলার টোলের নব্যন্যায়ের সমস্ত পুঁথি কণ্ঠস্থ করে নিয়েছিলেন।

অনিবার্যভাবেই একদিন গুরুশিষ্যের মতভেদ চরম আকার ধারণ করল। পক্ষধর মিশ্রের অন্যান্য শিষ্যবর্গও রঘুনাথের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। ত্যক্ত বিরক্ত রঘুনাথ এরপর মিথিলার পাট চুকিয়ে ফিরে আসেন নবদ্বীপে। খুলে বসলেন নিজস্ব টোল।

এতাবৎকাল নব্যন্যায়ের চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল পক্ষধর মিশ্রের মিথিলার টোল। স্মৃতিধর রঘুনাথ সেখানকার সমস্ত পুঁথি কণ্ঠস্থ করে এসেছিলেন। ফলে বহু ছাত্রের সমাগমে তাঁর নবদ্বীপের টোল অচিরেই নব্যন্যায়ের চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিলুপ্ত হয় মিথিলার প্রাধান্য।

রঘুনাথের টোলে ভারতের নানাপ্রান্ত থেকে জ্ঞানান্বেষী ছাত্ররা এসে জড়ো হতে লাগল। তাঁর উপযুক্ত শিক্ষায় তাঁদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

হিন্দু ষড় দর্শনের অন্যতম হল ন্যায়শাস্ত্র। ঋষি গৌতম রচিত ন্যায়শাস্ত্রের পাঁচটি অধ্যায় এবং ৫৩৮টি সূত্র।

ভারতীয় ঋষিরা বিশুদ্ধ এবং ভ্রমশূন্য জ্ঞান অর্জনের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। জগৎ ও জীবনের যাবতীয় রহস্য উদঘাটনের একমাত্র পথ হল জ্ঞান। একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান বলেই মানুষ জীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারে। এই বিশ্বাসে, ন্যায়শাস্ত্রে ঋষিরা শিখিয়েছেন কিভাবে অনুকূল এবং প্রতিকূল তর্কের দ্বারা ভ্রমশূন্য জ্ঞান অর্জন করা যায়।

রঘুনাথ শিরোমণি কালে নব্যন্যায়ের চর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ইতিহাস আমাদের রঘুনাথ শিরোমণির বিদ্যাবত্তার গৌরবের কথা জানায় বটে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। কেবল এটুকুই জানা যায় যে তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল রামভদ্র। রঘুনাথের পরিবারের অন্য অন্য সদস্যদের সম্পর্কে ইতিহাস থেকে কিছুই জানার উপায় নেই।

ন্যায় দর্শনের ওপরে রঘুনাথ শিরোমণি রচিত গ্রন্থগুলির খ্যাতি ভারতজোড়া। তাঁর অসাধারণ মনীষা, জ্ঞান ও উপলব্ধিজাত গ্রন্থগুলি হল, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি, পদার্থ-খন্ডন, আত্মতত্ত্ব-বিবেক টীকা, ব্রহ্মসূত্র-বিভূতি, লীলাবতী-বিভূতি প্রভৃতি। এছাড়াও বহু গ্রন্থ ও টীকা-ভাষ্য তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু তার অধিকাংশই কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়েছে।

নিজের কালেই রঘুনাথ শিরোমণি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পন্ডিত রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তিনি ভূষিত হয়েছিলেন শিরোমণি উপাদিতে। তাঁর মনীষা ও প্রজ্ঞার দীপ্তিতে কেবল বঙ্গদেশ নয় উদ্ভাসিত হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষ।

মাত্র ৬৯ বৎসর পরমায়ু পেয়েছিলেন রঘুনাথ শিরোমণি। এই সময়ের বেশির ভাগ কালই তিনি ব্যয় করেছেন তাঁর ছাত্রদের পাঠদানের কাজে। অবশেষে ১৫৪১ খ্রিঃ বঙ্গজননীর এই কৃতী সন্তান লোকান্তরিত হন।

লালন ফকির

কিছু বাউল গানের প্রেক্ষিতে লালন ফকিরের নাম আমাদের পরিচিত। কিন্তু ফকির লালন কেবল একজন বাউল সাধকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অসামান্য প্রতিভাধর গীতিকার ও মানবতাবাদী সাধক।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের অনুরাগী ছিলেন। এই গানের আকর্ষণে তিনি লালনের আখড়া থেকে তাঁর রচিত গান সংগ্রহ করে আনেন এবং প্রবাসী পত্রিকায় সেগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

তাঁর এই উদ্যোগের পর থেকেই আধুনিক বাংলার শিক্ষিত মহল লালন সম্বন্ধে আগ্রহী ও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

বাউলশ্রেষ্ঠ লালন হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই স্বাভাবিক মিলনের সেতু রচনা করেছিলেন। তিনি নিজে না ছিলেন হিন্দু, না মুসলমান। ধর্মের সঙ্কীর্ণতা তিনি স্বীকার করতেন না। মানুষের মধ্যে জাতের বিভেদ তিনি মানতেন না।

তাঁর গানে আছে—

সব লোকে কয়
লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জাতের কী রূপ
দেখলেম না এই নজরে।

লালন পূজা করতেন না, রোজাও রাখতেন না। তিনি কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। অথচ তাঁর সাধনায় হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়েরই সমান অধিকার ছিল। সেই বিচারে লালনকে সহজেই ভারতীয় জাতীয় সংহতি ও জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষরূপে অভিহিত করা চলে।

যতই দিন যাচ্ছে, লালনের গান ও সাধনার প্রাসঙ্গিকতাও এতই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক রূপে তাঁকে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

আমরা হীন বুদ্ধির মানুষ। ফকির লালনের জাতি সম্প্রদায় নির্ণয়ের জন্য উৎসাহ আমাদের কমেনি। তাঁকে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে আজও আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না।

লালনের জন্ম সময়, জন্মস্থান, জীবনচর্যা—এসব নিয়ে মতভেদ এখনও ঘোচেনি। কাঙাল হরিনাথ থেকে এখনও পর্যন্ত লালন সম্পর্কে আলোচনা যত হয়েছে, তার মধ্যে লালনের প্রকৃত পরিচয় এখনও উদঘাটন করা সম্ভবপর হয়নি।

তবে লালন তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই, তাঁর রচিত গানের মধ্যেই স্বমহিমায় বিরাজিত রয়েছেন। তাঁর জীবনদর্শন বিধৃত মরমীয়া গানগুলোই তাঁকে কালজয়ী

করেছে। তাঁর পরিচয়ের অন্যতর সন্ধান ভিন্ন জায়গায় করা বৃথা চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

লালন সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্যের সূত্র হিসাবে ধরা হয় ১৮৭২ খ্রিঃ আগস্ট মাসে প্রকাশিত গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধকে।

নিবন্ধকার লালন সম্পর্কে লিখেছেন—"লালন শাহ্ নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। ৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করে না সে কথা বলা বাহুল্য। এখন পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, এদিকে ব্রাহ্মধর্ম জাতির পশ্চাতে খোঁচা মারিতেছে, ওদিকে গৌরবাদীরা তাহাকে আঘাত করিতেছে, আবার সেদিকে লালন সম্প্রদায়িরা, ইহার পরেও স্বেচ্ছাচারের তাড়না আছে। এখন জাতি তিষ্ঠিতে না পারিয়া, বাঘিনীর ন্যায় পলায়ন করিবার পথ দেখিতেছে।"

লক্ষ্য করবার বিষয় হল, উক্ত নিবন্ধে লালনকে কায়স্থ বলা সত্ত্বেও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে, ১২৯২ বঙ্গাব্দে কাঙাল হরিনাথ লালনের গান প্রকাশকালে লিখেছেন, "হৃদয় নির্ম্মলা হইলে ভগবানের ভাব প্রস্ফুটিত হয়, ইহারই নাম তাঁহার আকার, প্রকাশ, আবির্ভাব, দর্শন প্রভৃতি শব্দে সঠিক ও ভক্তগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত এই প্রকার দর্শন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। লালন ফকীর নামে জনৈক ভক্ত এই সম্বন্ধে যে একটি গান প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমরা নিচে প্রকাশ করিলাম।

কে বোঝে সাঁইয়ের লীলা খেলা,
সে যে আপনি,
গুরু হয় আপনি চেলা।"

এই গানটিই লালনের প্রথম প্রকাশিত গান। এটি প্রকাশিত হয়েছিল লালনের জীবিতকালে। কাঙাল হরিনাথ তাঁর ব্রহ্মাণ্ডবেদ গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে এটি প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংখ্যায় তিনি লিখেছেন, "নূরনবী হজরৎ মহম্মদের পরে মোশল্মানকুলে আর কোন ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেহ পাছে ওরূপ মনে করেন, সেই আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি যে মহম্মদের পরে অনেক ভক্ত মোশল্মানকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। অনেক ভক্ত ফকীরের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। .... মোশল্মান যোগিগণের মধ্যে যাহারা ভৌতিক দেহে অবস্থান করিয়াছেন, তাহাদিগের শিক্ষা সাধন হিন্দু যোগতন্ত্রেরই অনুরূপ।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া বিভাগের নিকটবর্ত্তী ঘোড়াই গ্রামে লালন সাঁই নামে যে ফকীর বাস করেন, তিনিও পরম ভক্তযোগী। তাঁহার গুরু সিরাজ সাঁই সিদ্ধযোগী ছিলেন।" লালন গবেষণায় হরিনাথের মন্তব্যগুলি প্রামাণিক বলে স্বীকৃত।

লালনের মৃত্যুর চোদ্দদিন পরে কুষ্ঠিয়া থেকে প্রকাশিত হিতকরী পত্রিকায় মহাত্মা লালন ফকির নামে একটি সংবাদ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ খ্রিঃ ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত এই নিবন্ধে লালনের জীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়।

হিতকরীর সংবাদ অনুযায়ী লালন ১৮৯০ খ্রিঃ ১৭ অক্টোবর, শুক্রবার কুষ্ঠিয়ার অদূরে ছেঁউড়িয়া গ্রামে তাঁর নিজ আখড়াতে লালনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর।

হিতকরী লিখেছে, "লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুশলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুশলমান মনে করিত। বৈষ্ণব ধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে, কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। ..... ইনি নোমাজ করিতেন না। সুতরাং মুশলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে, বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ইহার অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ সাধনার কথা ইহাঁর মুখে শোনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। .... ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিযাছি, আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। ..... ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছু বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়তো তাঁহার নিষেধক্রমে না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছু বলিতে পারে না। তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্ঠীয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহার জ্ঞাতি। ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই।"

এই নিবন্ধ থেকে আশ্চর্য যে বিষয়টি ধরা পড়ে তা হল, নিবন্ধকারের লালনের সঙ্গে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি লালনের জীবিতকালে তাঁর সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করেননি। এই সকল কারণে পরবর্তীকালে, লালন গবেষণায় জনশ্রুতি, অনুমান নির্ভর করে লালনের জীবনী তৈরি করতে হয়েছে।

হিতকরী পত্রিকার নিবন্ধ প্রকাশিত হবার পর থেকে সরলা দেবী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দুর্গাদাস লাহিড়ী, অনাথকৃষ্ণ দেব, কুমুদনাথ মল্লিক, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, জলধর সেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বসন্তকুমার পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লালন জীবনী সম্পর্কে আলোচনা ও তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন।

লালন আলোচনায় বসন্তকুমার পালের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৩৩২ ও ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর রচিত মহাত্মা লালন ফকির গ্রন্থে লালনের জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করেছেন।

প্রধানতঃ লোকশ্রুতি ও লালনের শিষ্যদের দেওয়া বিবরণ থেকে বসন্তবাবু লালনজীবনীর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

বসন্তবাবু শৈশবেই তাঁর পিতামহের কাছে লালনের জীবনী শুনেছিলেন। সেই স্মৃতি স্মরণ করেই পরবর্তীকালে তিনি লালনের জীবনী সংগ্রহে উৎসাহিত হন। তিনি লিখেছেন ‘‘শৈশবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী শুনিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করি। ইহার জন্য প্রথম আলোক পাই তদানিন্তন ফকির ওয়াছিমউদ্দীন সাহেবের নিকট হইতে। তাহার পর সাঁইজীর সহিত যাঁহাদের চাক্ষুষ পরিচয় ছিল একত্রে ও প্রতিবেশী হিসাবে যাঁহারা তাঁহার সহিত বসবাস করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবৃতি লইয়া ....।’’

বসন্তবাবু পরে লিখেছেন, ‘‘আমাদের দেশে মহাত্মা লালন ফকীর সাধকরূপে সর্বসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন। কাঙাল হরিনাথের গানের আখড়ায় তাঁহার সহিত বিদ্যার্ণবের আলাপ আলোচনা হয়। ইহার পর উভয়ের সহিত অনেকবার ভাবের আদান-প্রদান হয়। ইহার বিশদ বিবরণ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। বয়সে জ্যেষ্ঠ হইলেও ফকির বিদ্যার্ণবকে দাদাঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিতেন।’’

দেখা যায়, লালনের রহস্যাবৃত জীবন বৃত্তান্ত উদ্ধারের চেষ্টা এযাবৎ কিছু কম হয়নি। এখনও চলছে অনুসন্ধান। সে যাই হোক, এখন পর্যন্ত লালন সম্বন্ধে জানা যাচ্ছে যে, লালনের প্রকৃত নাম ছিল লালন শাহ্ দরবেশ। পরে লালন সাঁই দরবেশ নামে তিনি পরিচিত হন।

লালনের পিতার নাম সিরাজশাহ্ দরবেশ। লালনের গানে যে সিরাজ সাঁই নাম পাওয়া যায়, ইনিই সেই সিরাজ শাহ্। অনুমান করা হয়, লালন ছিলেন তাঁর পিতারই শিষ্য। বাউল ফকিরেরা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বলে পিতৃনাম করেন না। তাঁরা প্রধানতঃ গুরুনামেই পরিচিত হন। সিরাজ সাঁই-এর লালনের গানে উপস্থিতি এই কারণেই ঘটেছে।

সিরাজ সাঁই-এর জন্মস্থান ছিল তৎকালীন বঙ্গদেশের নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার কুমারখালি থানার ভাঁড়ারায়।

লালনের পিতৃপরিচয় ও বংশ পরিচয় বিষয়ে সঠিক তথ্য কোনও গবেষকই উদ্ধার করতে পারেননি।

কুষ্টিয়ার অদূরে কালীগঙ্গার কাছে ছেঁউড়িয়ায় লালন আখড়া স্থাপন করে সস্ত্রীক সেখানে বসবাস করতেন। ফকির সম্প্রদায়ের ধর্মমত অনুযায়ী লালনের কোন সন্তান হয়নি।

আখড়ায় লালনের যে শিষ্যবর্গ বাস করতেন, তাঁদেরও কারোর সন্তান ছিল না। তাঁরা সকলেই ছিলেন সর্বত্যাগী ভিক্ষাজীবী ফকির। এই ফকির সম্প্রদায় সাংসারিক গণ্ডির মধ্যে বাস করেও ছিলেন বন্ধনহীন, মায়ামমতার উর্ধ্বে। এযাবৎ উদ্ধারকৃত তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে লালনের জন্ম হয় হিন্দু পরিবারে। পরবর্তিসময়ে তিনি ইসলামের অন্তর্গত সুফী মত গ্রহণ করেন।

এই সুফী মতবাদের আদর্শে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে ঈশ্বরের সাধন ভজন করে থাকেন। ফলে হিন্দু বা মুসলিম কোনও বিশেষ সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলে তাঁরা গণ্য হন না। জাতি বা সম্প্রদায় নিয়ে সুফী ফকির দরবেশদের কোন কালে মাথাব্যথা থাকে না।

লালন নিজেই তাঁর গানে বলেছেন,

রাম কি রহিম সে কোন জন,
ক্ষিতি জল কি বায় হুতাশন,
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না।
হাতের কাছে হয় না খবর,
কী দেখতে যাও দিল্লী লাহোর,
সিরাজসাঁই কয় লালন রে তোর
সদায় মনের ঘোর গেল না।

সুফীমার্গের সাধকগণ কোনও বিশেষ ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতেন না। হিন্দু ভক্তগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও সুফিমার্গে সাধনভজন করেছেন। তেমনি বহু মুসলমান নিজের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি রক্ষা করেই হিন্দুদের ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। এঁরা সহজিয়াপন্থী মরমী সাধক রূপে চিহ্নিত হয়েছেন।

লালনের শিষ্য ছিল অগণন। তাঁরা সর্বত্যাগী ফকির হলেও সাধন সঙ্গিনী রূপে স্ত্রী গ্রহণ করে গৃহী জীবন যাপন করতেন। সংসারের নানা কাজে ব্যাপৃত থেকেও তাঁরা সাধনভজন নিষ্ঠা সহকারে করতেন।

লালন ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, অক্ষরজ্ঞানহীন লালন যেসব গান রচনা করেছেন, গানের মধ্য দিয়ে তিনি সাধনার যে সকল দুরূহ তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, তা সাধারণের বোধগম্য হবার নয়। লালনের গানের কথার স্বাভাবিক আকর্ষণ বশতঃ সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁর গানের গূঢ় রহস্য ভেদ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। একজন শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের মতোই লালন তাঁর দর্শন ও ধর্মাচরণ বিষয় গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এখানেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার প্রকাশ।

সাধনালব্ধ বোধ এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি তথা দিব্যজ্ঞান লালনকে সমস্ত শাস্ত্রপাঠের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। এসকল কারণে অনেক গবেষকই মনে করেন লালন নিরক্ষর ছিলেন না।

জনশ্রুতি অনুযায়ী লালনের চেহারার একটা আদল পাওয়া যায়। লালন ছিলেন দীর্ঘদেহী। তাঁর শরীরের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল, চওড়া কপাল, মাথায় ছিল বাবরী চুল, মুখে লম্বা দাড়ি। তাঁর একটি চোখ ছিল দৃষ্টিহীন, মুখে অস্পষ্ট বসন্তের দাগ। অনুমান হয় জীবনের কোনও একসময় দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি একটি চক্ষুর দৃষ্টিক্ষমতা হারিয়েছিলেন।

জনশ্রুতি অবশ্য বলছে, একসময় লালন তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। পথে তিনি হঠাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত হন।

রোগাক্রান্ত লালনকে তাঁর সঙ্গীরা পথে ফেলে রেখে চলে যান। একজন মুসলমান মুমূর্ষু লালনকে উদ্ধার করে নিজগৃহে আশ্রয় দেন এবং তাঁর সেবাশুশ্রূষাতেই লালন ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কোন কোন গবেষক মনে করেন, এই মুসলমান ত্রাণকর্তার প্রভাবে লালন সুফী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। লালন তাঁকেই সিবাজ সাঁই নামে তাঁর গুরু রূপে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন।

এই মতামতের সত্যতা অবশ্য এখনও পর্যন্ত নির্ধারণ হয়নি।

লালন দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। ১৮৯০ খ্রিঃ ১৭ই অক্টোবর তিনি লোকান্তরিত হন। তাঁরই অন্তিম ইচ্ছা ছিল, মোল্লা বা পুরোহিত কাউকে দিয়ে যেন তাঁর শেষকৃত্য না হয়। তবে তাঁর স্বর্গত আত্মার তৃপ্তির জন্য আখড়ায় সেই সময় হরিনাম কীর্তন হয়েছিল।

ছেঁউড়িয়ার আখড়ার একটি ঘরেই লালনের মরদেহ সমাহিত করা হয়। শ্রাদ্ধাদি বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু হয় নি তাঁর মৃত্যুর পরে। তবে সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ভাণ্ডারা উৎসব হয়েছিল। তাতে বাউল সম্প্রদায়ের লোকজন অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মৃত্যুর আগের দিন অধিক রাত পর্যন্ত লালন ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে গান

করেছেন। রাত শেষ হবার মুখে, পাঁচটা নাগাদ তিনি শিষ্যদের বলেন, আমার সময় হয়েছে, চললাম এবারে। এই ছিল সাধক গায়ক লালনের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত।

সর্বত্যাগী ফকির হয়েও লালন ছিলেন গৃহী। জানা যায় এক মুসলমান রমনীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব কিছু জমিজমাও ছিল। মৃত্যুকালে সঞ্চিত দুই হাজার টাকা ও ভূসম্পত্তি তিনি তাঁর স্ত্রী, ধর্মকন্যা ও প্রিয় শিষ্য শীতল সাহাকে দিয়ে যান।

লালনের জীবনদর্শন উদার মতবাদ ধরা রয়েছে তাঁর রচিত বাউল সঙ্গীতের মধ্যে। এই গানগুলির ভাব ভাষা তাঁকে কালজয়ী প্রতিভারূপে স্বীকৃতি দান করেছে। তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। বলা চলে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর রহস্যঘেরা সাধনজীবনের ওপর যতটুকু আলোকপাত হয়েছে, তা থেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

লালনের সঠিক পরিচয় লাভের প্রশ্নে শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, লালনের সঠিক পরিচয় বিধৃত রয়েছে সুদূর অতীতের গর্ভে—লালন-মানসের উৎস অতিপ্রাচীন। তিনি বলেছেন, "....... বাংলার অতীতে, ভারতের অতীতে, আরব ও ইরানের অতীতে" ধরা রয়েছে লালনের সঠিক পরিচয়। "..... শ্রেষ্ঠ হয়েও লালন একমাত্র বাউল বা মারফতী কবি নন। মদন বাউল, গগন হরকরা, বিশা ভুঁইমালী, পাগলা কানাই, গঙ্গারাম প্রভৃতির থেকে আলাদা করে দেখাটা ঠিক নয়। এঁদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাটাই ঠিক দেখা। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে শিক্ষিত মহলে যেমন একটা রোশনাই চলছিল, যাকে বলে বাংলার রেনেসাঁ, তেমনি অশিক্ষিত স্তরেও চলছিল অন্ধকার স্রোতের বুকে দীপের ভেলা ভাসানো। ...."

বস্তুতঃ বাউল গীতিকার লালন সাধারণ হয়েও ছিলেন অসাধারণ। বাংলার সর্বকালের সঙ্গীত রচয়িতাদের সঙ্গে উচ্চারিত হবে লালনের নাম। তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও জীবন-সাধনার প্রভাবে বাংলার বাউল গান ও বাউল সাধনা কালজয়ী আবেদন লাভ করেছে। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে লালন ফকির তাই এক চিরস্মরণীয় নাম।

উইলিয়াম সমারসেট মম

একাধারে অসাধারণ গল্প উপন্যাস এবং প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সামাজিক নাটক রচনা করে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় যে কয়জন সাহিত্য স্রষ্টা অমরত্ব অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম উইলিয়াম সমারসেট মম।

মমের জন্ম ১৮৭৪ খ্রিঃ ২৫ জানুয়ারি। তাঁর পিতা প্রিন্স রবার্ট মম ছিলেন প্যারিসের ব্রিটিশ দূতাবাসের সলিসিটর। ছয় ভাইবোনের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

স্বচ্ছল সুখী পরিবারে জন্মেছিলেন উইলিয়াম। কিন্তু দুর্ভাগ্য ছিল তাঁর আবাল্যের সঙ্গী। মাত্র আট বছর বয়সেই তিনি মাতৃহারা হন। দুবছর পরেই হারান বাবাকে। রবার্ট মম মারা যান দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে।

উইলিয়ামের যখন দশ বছর বয়স সেই সময় তাঁর সবচেয়ে বড় ভাই চার্লস তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠানেই ছিলেন কর্মরত। মেজোভাই ফ্রেডরিক পড়াশুনো করছেন কেমব্রিজে। তার পরের ভাইও কেমব্রিজেই পড়ছিলেন। ফলে উইলিয়াম হয়ে পড়েছিলেন প্রকৃত অর্থেই অনাথ। শেষ পর্যন্ত তাঁর এক কাকা বালক উইলিয়ামের লালনপালনের দায়িত্ব নিলেন। এই কাকা হলেন কেন্টের হুইট স্টোবলের যাজক রেভারেন্ট হেনরি মম।

মধ্যবয়স্ক হেনরি মম ছিলেন নিঃসন্তান। ফলে তিনি বা তাঁর স্ত্রী কারোরই শিশু সন্তান লালনের অভিজ্ঞতা ছিল না। এই দম্পতির দিন কাটত বাইবেল ও শাস্ত্র চর্চায়। ফলে এই নিরানন্দময় পরিবেশে উইলিয়ামের বাল্যকাল কেটেছে নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আর মানসিক অবসাদের মধ্যে।

পরিবেশের এই প্রতিকূলতা তাঁর মনে এতটাই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল যে শরীর স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার ওপর উইলিয়ামের কথা বলায় ছিল তোতলামি। সেকারণে সঙ্কোচে কথাও বলতেন কম।

শারীরিক এই ক্রটিগুলিকে উইলিয়ামের কাকা এবং তাঁর স্ত্রী নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে তাঁকে একগুঁয়ে ও বদমেজাজী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। ফলে কারণে অকারণে তাঁকে সইতে হত নানা গঞ্জনা ও শাসন।

এই অসহনীয় পরিবেশ থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেলেন উইলিয়াম ক্যান্টারবেরীর কিংস স্কুলে ভর্তি হবার পরে।

স্কুলে সঙ্গীসাথীর সঙ্গে হাসি আনন্দ, খেলাধুলোর পরিবেশ ছিল। কিন্তু সেখানে তিনি উত্যক্ত হতেন তোতলামির জন্য। সহপাঠী এমন কি শিক্ষকদেরও ঠাট্টা বিদ্রূপ তাঁকে সইতে হত।

ছেলেবেলা থেকেই এমনিভাবে এক নির্দয় সহানুভূতিহীন পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন উইলিয়াম।

সেই সময়ে অভিজাত ঘরের ছেলেরা স্কুলের পড়া শেষ করে বিদেশে পড়াশোনা করতে যেত। স্কুলের পাঠ শেষ হলে উইলিয়ামও তাঁর অভিভাবক কাকাকে অনুরোধ জানান তাঁকে বিদেশে পাঠাবার জন্য।

কাকার ইচ্ছা ছিল উইলিয়াম অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করে তাঁর মতই যাজকত্ব বৃত্তি গ্রহণ করবে। কিন্তু উইলিয়াম বিদেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি আর উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি উইলিয়ামকে পাঠিয়ে দিলেন জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এখানে একবছর পড়াশোনা করেছেন উইলিয়াম। এই সময়টায় প্রকৃত আনন্দ ও স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন তিনি। সহপাঠীরা কেউই তাঁর তোতলামি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত না। ফলে মনের মতো পরিবেশ পেয়ে উইলিয়াম শিল্প সাহিত্য নাটক অভিনয় চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন।

উইলিয়ামের সৃষ্টিশীল প্রতিভা ছিল সহজাত। তাই এই সময়েই তাঁর মধ্যে সাহিত্য রচনার প্রেরণা অঙ্কুরিত হতে থাকে। স্বভাবতঃ স্বল্পবাক হওয়ায়, কোন বিষয় খুঁটিয়ে দেখার অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তিনি।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়েই অবকাশ সময়গুলোতে দেশভ্রমণে বেরোতেন উইলিয়াম। জার্মানি, ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডের বহু জায়গায় ভ্রমণ করে তাঁর ভ্রমণতৃষ্ণা এমনই বেড়ে গিয়েছিল যে সারাজীবন তিনি নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একবছর পড়াশোনা করার পর কাকার অভিপ্রায় অনুসারে উইলিয়াম ভর্তি হলেন সেন্ট টমাস মেডিকেল স্কুলে। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর।

চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করলেও সাহিত্য রচনার যে স্বপ্ন তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা ক্রমশ সিদ্ধান্তে পরিণত হল। এবং এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের জন্য নিজেকে ক্রমেই প্রস্তুত করে তুলাতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। সেই সঙ্গে চলতে লাগল লেখার চর্চা।

চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করা কালেই উইলিয়াম সেন্ট টমাস কলেজের বহির্বিভাগে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হলেন।

এই কাজে সবশ্রেণীর মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হল তাঁর। রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, আশা নিরাশার দোলায় বিভ্রান্ত মানুষের দুঃখ, ভীতি আবেগ ইত্যাদি জীবনের সমস্ত বিচিত্র দিকগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি।

এভাবে নিজের অজ্ঞাতেই উইলিয়াম তাঁর ভবিষ্যৎ লেখক জীবনের রসদ সঞ্চয় করে চললেন।

পরিবেশই যোগাল প্রেরণা। উইলিয়াম লিখলেন লিজ অব ল্যামবেথ নামে তাঁর প্রথম উপন্যাস। তাঁর যখন তেইশ বছর বয়স, মেডিকেল স্কুলের শেষ বৎসরের ছাত্র, সেই সময় তাঁর এই উপন্যাস প্রকাশিত হল।

মেডিকেল পড়া শেষ হলে উইলিয়াম ডাক্তারি করার যোগ্যতা লাভ করলেন। ডাক্তার হিসাবে তিনি অনুমোদন পেলেন রয়্যাল কলেজ অব সার্জনস এবং রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ সংস্থা থেকে।

ডাক্তার হলেন উইলিয়াম মম। কিন্তু তিনি স্থির করলেন এবারে পুরোপুরি লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। যথাসময়ে নিজের দাদাদের এবং বন্ধুবান্ধবকেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তর কথা জানিয়ে দিলেন। এবিষয়ে সকলেই নিরুৎসাহিত করল মমকে। তাঁরা সকলে জানালেন, লেখক বৃত্তি তাঁকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারবে না। দ্রারিদ্য হবে চিরসঙ্গী।

মম তাঁর হিতৈষীদের এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বাৎসরিক যে ভাতা তিনি পান তাতেই তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কেবল লেখার ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে না।

লেখক জীবনে দেশভ্রমণের আবশ্যকতা বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মম। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি গেলেন স্পেন ভ্রমণে। সেখান থেকে ইতালির ইতহাস বিখ্যাত দর্শনীয় সমূহ দেখার পর এলেন প্যারিসে। এখানে শিল্পী ও লেখকদের সঙ্গে পরিচয় ও কিছুদিন মেলামেশা করে নতুন করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করলেন।

দেশভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মমের লেখার কাজেও বিরাম ছিল না। প্যারিসে কয়েক বছর ছিলেন তিনি। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রিঃ থেকে ১৯০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত লেখা থেকে তাঁর উপার্জন ছিল যৎসামান্য।

বছরে গড়ে মাত্র ১০০ পাউন্ড। অবশ্য তারপর থেকেই ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

মম ফ্রান্সের রেডক্রশ ইউনিটের কাজে যোগ দেন ১৯১৪ খ্রিঃ। এখানে তাঁর প্রধানতঃ কাজ ছিল আহতদের ড্রেসিং তদারক করা ও অ্যাম্বুলেন্স চালানো।

কিন্তু এই কাজে মন বসাতে পারলেন না মম। কয়েকমাস পরেই একটা সুযোগ পেয়ে অন্য কাজে ঢুকে পড়লেন।

সেই সময় গোয়েন্দা বিভাগ থেকে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছিল। মম নাম লেখালেন গোয়েন্দা বিভাগে। তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সুইজারল্যাণ্ডে।

এই কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই মম পরবর্তীকালে রচনা করেছেন বহু চমকপ্রদ গুপ্তচর কাহিনী।

সুইজারল্যান্ড থেকে মম বদলি হলেন প্রথমে আমেরিকায়। পরে এক গোপন কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে।

মমের এই গোপন কাজটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাজ ছিল, রাশিয়ার সরকারকে প্রভাবিত করা যাতে তারা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

এই কাজে থাকার সময় থেকেই মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন মম। ডাক্তারদের পরীক্ষায় তাঁর যক্ষ্মারোগ ধরা পড়ল। বাধ্য হয়ে মমকে ফিরে আসতে হল ইংলন্ডে। চিকিৎসার জন্য তিনি ভর্তি হলেন স্কটল্যান্ডের নরডাকট নার্সিংহোমে।

আরোগ্য নিকেতনে চিকিৎসাধীন থাকার সময়ে মম রচনা করলেন এক অসাধারণ কৌতুকধর্মী মিলনান্তক কাহিনী হোম অ্যান্ড বিউটি। মমের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলোর মধ্যে এই রচনাটিও অন্তর্ভুক্ত।

ফরাসী শিল্পী পল গগ্যাঁর বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের ছায়া নিয়ে একটি প্লট অনেকদিন থেকেই মমের ভাবনায় ঘুরছিল। এই কাহিনী রচনার সূত্রপাতও তিনি এখানে থাকতে করেন।

মম বিবাহ করেন ১৯১৬ খ্রিঃ। তাঁর স্ত্রী ছিলেন প্রখ্যাত এক চিকিৎসকের কন্যা এবং পেশায় একজন গৃহসজ্জা শিল্পী।

মমের এই বিবাহ সুখের হয়নি। তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল অশান্তিময়। এই অশান্তিকে এড়িয়ে থাকার জন্য তিনি দেশ ভ্রমণ করে বেড়াতেন।

একদিক থেকে এই দেশ ভ্রমণ ছিল মমের সাহিত্যিক সত্তার পরিপুষ্টির খোরাক। সাহিত্যের নানা উপকরণ তিনি তাঁর দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করতেন। এবং এইসব উপাদানই মমের সৃষ্ট সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবার পর নরডাক স্যানেটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে মম চলে গেলেন আমেরিকায়। সেখান থেকে পুনরায় যান দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে।

তাঁর এবারের ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, গগ্যাঁর জীবনকেন্দ্রিক কাহিনীর তথ্যাদি সংগ্রহ করা। যথাসময়ে এই কাহিনী সম্পূর্ণ করেন তিনি এবং উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রিঃ।

মমের লেখক জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ধরা হয়ে থাকে ১৯২১ খ্রিঃ থেকে ১৯৩১ খ্রিঃ এই দশ বছর। এই সময় একদিকে যেমন তিনি অনবরত নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তেমনি সৃষ্টিও করেছেন দুহাতে।

ইংরাজি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মমকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে যে তিনটি অসাধারণ নাটক, দ্য ব্রেডউইনার, দ্য সার্কল, দ্য কনস্ট্যান্ট ওয়াইফ, সেগুলো এই সময়েই

রচনা করেছেন তিনি। কেবল তাই নয়, ফলপ্রসূ দশবছরের ফসলের মধ্যে রয়েছে তাঁর বিখ্যাত কিছু ছোট গল্প, একটি ভ্রমণ কাহিনী দ্য জেন্টলম্যান ইন দ্য পার্লার, কিছু অসাধারণ নক্সাধর্মী রচনা এবং আত্মজীবনীমূলক তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস কেকস অ্যান্ড এল।

অর্থ যশ খ্যাতি কোন কিছুরই অভাব ছিল না মমের জীবনে। তাই প্রয়োজন বোধ করছিলেন স্থায়ীভাবে বসবাসের একটা আস্তানার। ১৯২৮ খ্রিঃ ক্যাবাফেরাট-এ তিনি খরিদ করলেন একটা সুদৃশ্য বাগানবাড়ি। জীবনের অবশিষ্ট অংশটা তিনি এই বাড়িতেই অতিবাহিত করেন। তিনি তাঁর এই বাগান বাড়ির নাম দিয়েছিলেন ভিলা মৌরেস্ক।

মম ছিলেন শিল্পরসিক সমঝদার। নতুন বাড়িতে আসার পর অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু মূল্যবান চিত্র এখানে সংগ্রহ করেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা এই সকল চিত্রকর্ম তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করত। প্রতিবছরেই একটা নির্দিষ্ট সময়ে মম দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। তখন তাঁর খ্যাতি জগৎজোড়া। যখন যেখানে গেছেন, বিশিষ্ট লেখক ও গুণমুগ্ধদের সমাদর ও সম্মান তিনি লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের অনুরোধে মম আমেরিকায় যান প্রচার ও শুভেচ্ছা সফরে। তখনো পর্যন্ত আমেরিকা যুদ্ধরত কোন পক্ষেই যোগ দেয়নি। কিন্তু মম আমেরিকায় পৌঁছানোর কিছুদিন পরেই যুদ্ধের গতি মোড় নিল। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হল। ফলে তাঁর আর দেশে ফিরে আসা সম্ভব হল না।

যুদ্ধ শেষ হলে ১৯৪৬ খ্রিঃ মম আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন তাঁর দক্ষিণ ফ্রান্সের বাগান বাড়িতে।

যুদ্ধের সময়ে বাড়িটির অনেক অংশই বিধ্বস্ত হয়েছিল। মম অল্পদিনের মধ্যেই বাড়ি মেরামতির কাজ শেষ করে নিয়ে নিশ্চিন্তে তাঁর লেখার কাজে মনোনিবেশ করেন।

এরপর একে একে প্রকাশিত হয় তাঁর জীবনের শেষ তিনটি উপন্যাস। তার মধ্যে তাঁর সাহিত্যকর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃত হয় দ্য রেজরস এজ।

১৯৫০ খ্রিঃ থেকে পরবর্তী দশ বছর তিনি যেসব প্রবন্ধ রচনা করেন তার অধিকাংশই ছিল সাহিত্য সমালোচনা।

১৯৫৮ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ পয়েন্টস অব ভিউ। এটিই ছিল তাঁর প্রকাশিত সর্বশেষ বই।

দেশভ্রমণ একজন লেখকের অভিজ্ঞতা উপলব্ধিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে, তাঁর সৃষ্টিতে আনে গভীরতা ও বৈচিত্র্য। এই সত্য মনে প্রাণে অনুধাবন করতে

পেরেছিলেন মম। সেকারণে জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই তিনি কাটিয়েছেন ভ্রমণ করে।

ভাবীকালের লেখকদের দেশভ্রমণের কার্যকারিতা উপলব্ধি করাবার জন্য জীবনের শেষ পর্বে মম তরুণ লেখকদের জন্য এক অভিনব পুরস্কার প্রবর্তন করেছিলেন।

পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ছিল ৫০০ পাউন্ড। দেওয়া হত ৩০ বছরের কম বয়সী এমন একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখককে যিনি অন্ততঃ একটি উন্নতমানের গ্রন্থ রচনা করেছেন। পুরস্কারের সঙ্গে শর্ত থাকতো যে, সম্পূর্ণ টাকাটা খরচ করতে হবে দেশভ্রমণের জন্য।

জীবনের শেষ পর্বে শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন মম। লেখাপড়া নিয়ে বড় একটা বসতে পারতেন না। ১৯৫৯ খ্রিঃ ডিসেম্বরে ফ্রান্সে তাঁর মৃত্যু হয়।

উইলিয়াম কেরি

বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন ডঃ উইলিয়াম কেরি। এদেশে উনিশ শতকে ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প-বিজ্ঞান, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বিপুল জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছিল, তার পেছনে উইলিয়াম কেরির অবদান ছিল অসামান্য। এদেশের উন্নয়নের সর্ব ক্ষেত্রেই রয়েছে কেরির অতি গভীর প্রভাব। বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান, তার জন্য বাঙালী মাত্রই কেরির কাছে ঋণী। তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের রূপকার।

রবীন্দ্রনাথ কেরি প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কেরি ওয়াজ দ্য পাইওনিয়ার অব দ্য রিভাইভড ইনটারেস্ট ইন দ্য ভারনাকুলার।"

কেরি ভারতবর্ষে এসেছিলেন মানবসেবা ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এখনকার খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের নিরীখে কেরিকে বিচার করা চলে না। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ, উদারচেতা, সংস্কারমুক্ত এক মহান সমাজবাদী ব্যক্তি।

আর্ত ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসীর সেবাকার্যে এসে কেরি এ দেশকে এ দেশের মানুষকে আপনার করে নিয়ে সর্ব অর্থেই একজন ভারতবাসী হয়ে

গিয়েছিলেন। ভারতের উন্নতিই হয়ে উঠেছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ঐতিহাসিকদের মতে উইলয়াম কেরি ছিলেন ভারতের মানসপুত্র।

ইংলন্ডের নর্দামটনশায়ারের অন্তর্গত এক অখ্যাত গ্রাম পলারস্পুরি। এই গ্রামে ১৭৬১ খ্রিঃ ১৭ই আগস্ট উইলিয়াম কেরির জন্ম। তাঁর বাবার নাম ছিল এডমন্ড। মা এলিজাবেথ।

এডমান্ড ছিলেন একজন দরিদ্র তাঁতি। বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও চার সন্তান নিয়ে তাঁর পরিবার নেহাত ছোট ছিল না। কঠোর পরিশ্রমে তিনি পরিবারের সকলের ভরণপোষণ করতেন। সামান্য লেখাপড়াও তিনি জানতেন। একসময় গ্রামের একটি বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতার কাজও করেছেন।

ছেলেবেলা থেকেই কেরি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও কৌতূহলী। যা কিছু নতুন দেখতেন, তার সম্পর্কেই জানার জন্য অস্থির হতেন। তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ এই সময় থেকেই কেরির মধ্যে ফুটে উঠত। কোন কিছু একবার শুরু করলে তা শেষ না করে ছাড়তে চাইতেন না। এই অধ্যবসায়, উদ্দেশ্য সাধনে লেগে থাকার স্বভাব—পরবর্তী জীবনে কেরিকে জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে সমধিক সহায়তা করেছিল।

গ্রাম্য পরিবেশে প্রকৃতির পাঠশালাতে কেরির বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল বলা চলে। তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁর চারপাশের গাছপালা, মাঠ, শস্যক্ষেত্র, পশু, পাখি, পর্যবেক্ষণ করতে ভালবাসতেন। নানান বিষয় নিয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে বাবামাকে অস্থির করে তুলতেন। তাঁরা যথাসাধ্য পুত্রের কৌতূহল ও আগ্রহ মেটাবার চেষ্টা করতেন।

একটু বয়স বাড়লে কেরিকে ভর্তি করে দেওয়া হল গ্রামের স্কুলে। পড়াশুনায় কখনো অমনোযোগী হতেন না কেরি। তাঁর শেখার আগ্রহ দেখে স্কুলের ছাত্র শিক্ষক সকলেই তাঁকে ভাল না বেসে পারতেন না।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই বালক কেরি এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন। নানান কীটপতঙ্গ, পাখি, পাখির ডিমের খোলস, রংবাহারি প্রজাপতি, পাখির পালক এসবের নমুনা সংগ্রহ করে পড়ার ঘরে নিজস্ব একটি সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন।

বাবার কাছে বালক কেরি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গল্প শুনেছিলেন। তারপর থেকেই নিজস্ব সংগ্রহশালা তৈরির কাজে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। সংগৃহীত নমুনাগুলি নিয়েই বেশিরভাগ সময় কাটত বালক কেরির। সেগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কাজে যথেষ্ট সময় ব্যয় হলেও স্কুলের পড়াশুনায় তার জন্য বাধা পড়ত না।

পিটার কেরি নামে কেরির এক কাকা ছিলেন। তিনি যখন খামারে চাষের

কাজ করতেন, বালক কেরি তাঁর সঙ্গে থাকতেন। এইভাবে কৃষিকাজের নানা বিষয় রপ্ত করেছিলেন কেরি।

গ্রামের স্কুলে খবরের কাগজ আসত নর্দাম্পটন মারকারি। এগারো বছর বয়স হবার আগেই কেরি খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস করেছিলেন। সেইকালে আমেরিকায় ইংরাজদের উপনিবেশ, দাসপ্রথা এসব বিষয়ে নানা খবর কাগজে ছাপা হত। এছাড়া পৃথিবীর নানা প্রান্তের অনেক বিষয় খবরের কাগজ পড়েই তিনি জানতে পারতেন। এভাবে তাঁর জ্ঞানস্পৃহা বেড়েছে। বারো বছর বয়সে কেরি লাতিন ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন।

দরিদ্রের সংসারে অভাব প্রতিভাকে গ্রাস করে। প্রতিভার বিকাশের সুচারু পরিবেশ কেরিও পাননি। তাই বছর চোদ্দ হতে না হতে পড়াশুনা ছেড়ে তাঁকে কাজের সন্ধান করতে হয়।

এসময় কেরিকে সংসারের প্রয়োজনে কিছুদিন খেতমজুরের কাজও করতে হয়েছে।

কাকার যোগাযোগে কিছুদিনের মধ্যেই পিডিংটনে একটা জুতোর কারখানায় কেরি শিক্ষানবিশের কাজ পান। এখানে কাজ করতে করতেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় হেকেলটনের ব্যাপটিস্টদের।

জুতোর কোম্পানির মালিক ক্লার্ক নিকোলাস সহসা অসুস্থ হয়ে মারা গেলে কেরিকে সেখানকার কাজ ছেড়ে দিতে হল। তিনি কাজ নিলেন হেকেলটনের এক খামার বাড়িতে।

এভাবে নানান কাজের মধ্যে দিয়ে কেরি যুবক হয়ে উঠলেন। কুড়ি বছর বয়সে ১৭৮১ খ্রিঃ তিনি ডরোথি প্ল্যাকেট নামে এক মহিলাকে বিয়ে করলেন।

খামারবাড়ির কাজে জীবনে যৎসামান্য সুস্থিরতা এসেছিল। তাই ঘরে বউ আনার বল ভরসা পেয়েছিলেন। কিন্তু কেরির ভাগ্য ছিল বিরূপ। বিয়ের পর বছব তিন কাটতে না কাটতেই খামার বাড়ির মালিক মারা গেলেন। ব্যবসার সমস্ত দায়িত্ব তখন চাপল কেরির কাঁধে। বাড়তি কাজের চাপে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও, কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন কেরি, তাই অল্পদিনেই নিজেকে কাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলেন।

লাতিন ভাষাটা আগেই শিখেছিলেন। এবারে কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিখতে আরম্ভ করলেন গ্রিক ও হিব্রু ভাষা। কিছুদিন পরে ফরাসি ও ডাচ ভাষাও তিনি শেখেন।

খামারের ব্যবসার কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি নতুন নতুন ভাষা শেখার জন্য কেরিকে কতটা পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় বলে সব কাজেই উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি।

হেকলটনের ব্যাপটিস্টদের সঙ্গে মেলামেশার সূত্রে ইতিমধ্যে ফেরির চিন্তাভাবনায় একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। এখন থেকেই কেরির জীবন নতুন পথে মোড় নিতে থাকে।

আর্ত পীড়িত মানুষের সেবার কাজকেই কেরি জীবনের চরম সার্থকতা বলে উপলব্ধি করলেন। তিনি তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করে নিলেন—মানুষের সেবাই হবে তাঁর জীবনের ব্রত।

সঙ্কল্প একসময়ে সিদ্ধান্তে রূপ নিল। বিদেশে মিশনারি হয়ে কাজ করার জন্য তিনি সুযোগের সন্ধান করতে লাগলেন।

কিন্তু বাধা আসতে লাগল পরিচিত পরিবেশের লোকজনদের কাছ থেকে। মিশনারির ক্লেশময় জীবন নিয়ে কেরি বিদেশে পাড়ি দেন, এ ব্যাপারে কেউই তাঁকে সমর্থন জানাল না।

কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতা কেরিকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারল না। তিনি হেকলটন ছেড়ে চলে এলেন লিজস্টারে। এখানে এসে উঠে পড়ে লেগে নিজে উদ্যোগ নিয়ে গড়ে তুললেন মিশনারি সোসাইটি। সময়টা ১৭৯২ খ্রিঃ ৩০ শে মে।

এই সময় কেরির ভাগ্য কিছুটা প্রসন্ন ছিল। তিনি একজন সহমর্মী বন্ধু পেয়ে গেলেন, জন থমাস তাঁর নাম। তিনি কেরিকে মিশনারি হিসাবে ভারতে যাবার জন্য উৎসাহিত করলেন।

থমাস ইতিপূর্বে কিছুকাল ভারতে ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সোসাইটিতে তিনি বাংলায় আসার প্রস্তাব দিলেন।

সোসাইটির অনুমোদন পেতেও বিলম্ব হল না। ১৭৯৩ খ্রিঃ জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে কেরি ও থমাস কোরন প্রিন্সেস মারিয়া জাহাজে করে ইংলন্ড থেকে ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি জমালেন।

থমাস বঙ্গদেশে থাকার সুবাদে বাংলাটা ভালই জানতেন। যাত্রাপথে জাহাজে কেরি তাঁর কাছ থেকে বাংলা ভাষা রপ্ত করে নেন।

কেরি কলকাতায় পদার্পণ করলেন যাত্রার পাঁচ মাস পরে ১৭৯৩ খ্রিঃ ১১ নভেম্বর। কিন্তু কলকাতার জীবনের শুরুটা তাঁর সুখময় ছিল না। একটা কাজের সন্ধানে তাঁকে কম নাজেহাল হতে হয়নি। পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ তিনি কোনওকালেই ছিলেন না। কিন্তু এখানে সামান্য একটা কায়িক শ্রমের কাজও তিনি প্রথমে জোটাতে পারেন নি।

বঙ্গদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে এই সময় কেরি এতটাই বিচলিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন যে ঘটনার গতিতেই জড়িয়ে পড়লেন এদেশের লোকজীবনের স্রোতে।

সাময়িক একটা অবলম্বনের জন্য চাকরি খুঁজতে লাগলেন কেরি। এদেশের তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুরা এই সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারেননি।

ঘটনাচক্রে এই সময় তাঁর পরিচয় হল মুন্সী রামরাম বসুর সঙ্গে। সদয় মুন্সী কেরিকে সুন্দরবনের দীনহাটা অঞ্চলে কিছু আবাদ জমি দিয়ে সহায়তা করলেন।

ভারত তথা বঙ্গদেশে সূত্রপাত হল কেরির কর্মজীবনের। ছেলেবেলায় ইংলন্ডে কাকার কাছ থেকে চাষাবাদের নানা খুঁটিনাটি শেখা ছিল তাঁর। সেই অভিজ্ঞতা সম্বল করে এদেশে জীবনের শুরুতেই তিনি শুরু করলেন চাষের কাজ।

সেই সময় জর্জ উডনি নামে এক সাহেবের মালদহের মদনাবতীতে একটা নীলকুঠি ছিল। ১৭৯৪ খ্রিঃ নীলকুঠি তত্ত্বাবধানের জন্য উডনি সাহেব আহ্বান জানালেন কেরিকে। মাসিক দুইশত টাকা বেতনে নীলকুঠি তদারকির কাজ নিলেন কেরি। দীনহাটার বাস উঠিয়ে তিনি মদনাবতীতে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন।

এই নতুন কাজে কেরি কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারলেন না। হঠাৎ করেই উডনি সাহেব তাঁর কুঠি বিক্রি করে দেশে চলে গেলেন। ফল হল, কেরি আবার বেকার হলেন।

সেইকালে শ্রীরামপুর ছিল ডেনিশ শাসসনাধীন। আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নির্দেশ জারি করেছিল, কোন মিশনারি তাদের অধিকৃত এলাকায় থাকতে পারবে না। এই অবস্থায় কেরি মালদহ ছেড়ে সরাসরি চলে এসেছিলেন ডেনিশ শহর শ্রীরামপুরে। সময়টা ১৮০০ খ্রিঃ।

ততদিনে কিছু অর্থ সঞ্চয় হয়েছিল হাতে। তা দিয়ে গঙ্গার ধারে জমি কিনে কেরি গড়ে তুললেন শ্রীরামপুর গার্ডেন। একজন দক্ষ উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর মতো বেছে বেছে নানা প্রজাতির গাছ তিনি তাঁর বাগানে রোপন করতে লাগলেন।

ইতিপূর্বে বার দুয়েক ভুটান ঘুরে এসেছিলেন। সেই সময় সেখান থেকে বেশ কিছু নতুন প্রজাতির গাছ সংগ্রহ করেছিলেন।

বাগান তৈরির নেশার বশেই ১৭৮৭ খ্রিঃ তিনি আরেকটি কাণ্ড করে বসেছিলেন। শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লেফটানান্ট কর্নেল রবার্ট কিড। ১৭৮৭ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যুর পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্য একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সংবাদ জানতে পেরে একজন কর্মপ্রার্থী হিসেবে কেরি চলে এসেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু ততদিনে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাজে উইলিয়াম রক্সবার্গ নামে একজন বহাল হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যর্থ মনোরথ কেরিকে ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁর পূর্বতন কর্মস্থল মদনাবতীতে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের নবনিযুক্ত বোটানিস্ট রুক্সবার্গের সঙ্গে কেরির পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। তিনি মালদহের মদনাবতী থেকে শিবপুর গার্ডেনে বীজ ও গাছের নমুনাদি পাঠাতেন। সেই সূত্রেই দুজনের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। এখন শ্রীরামপুরে আসার পর রুক্সবার্গের সঙ্গে গাছের নমুনা আদান প্রদানের যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পেল।

কেরি সাহেবের শ্রীরামপুর গার্ডেন ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোটানিক্যাল গার্ডেন দুটোই ছিল গঙ্গার ধারে। ফলে রুক্সবার্গ ও কেরির দেখাসাক্ষাৎ জলপথে প্রায়ই ঘটত। রুক্সবার্গ কেরির সম্মানার্থে একসময় একটি শাল গাছের নামকরণ করেছিলেন কেরিয়া স্যালুয়া।

১৮১৩ খ্রিঃ রুক্সবার্গ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে চলে গেলে কেরি সাহেবকে এক বছরের জন্য বোটানিক্যাল গার্ডেনের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল।

উদ্ভিদবিদ্যায় কেরি সাহেবের বিলক্ষণ দখল ছিল। শ্রীরামপুর গার্ডেনে তিনি ৪২৭টি প্রজাতির গাছের চাষ করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল ক্যাপশিকাম, পাম্পকিন, ক্যালবাশ, মালাও প্রভৃতি দুর্লভ গাছও।

এই সময় কেরি অনেক অনাবাদী জমিতে চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে বনভূমি সংরক্ষণ বিষয়েও তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন।

পরবর্তীকালে তাঁর পরামর্শেই কোম্পানি ১৮৪৬ খ্রিঃ মৃত্তিকা সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেছিল।

একজন সুদক্ষ উদ্ভিদবিদ হিসাবে কেরি সাহেবের অন্যতম কীর্তি কলকাতার আলিপুরে এখনো বর্তমান। এখানকার এগ্রিহর্টিকালচার গার্ডেন তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮২০ খ্রিঃ। আরও তিন বছর পরে তিনি লণ্ডনের হর্টিকালচার সোসাইটির সদস্য হয়েছিলেন।

এদেশে কেরি সাহেবের মূল কর্মযজ্ঞের সূচনার তখনো বাকি ছিল। বহুধা বিস্তৃত সেই কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃই তাঁর সামনে উন্মুক্ত হতে লাগল।

সেইকালে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি বিলাত থেকে ভারতে আসা ইংরাজ সিভিলিয়ান বা রাইটারদের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও হিন্দু এবং মুসলিম আইন শিক্ষা দেবার জন্য কলকাতায় ১৮০০ খ্রিঃ ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

২৪ নভেম্বর থেকে এই কলেজে পঠনপাঠন আরম্ভ হয়। ১৮০১ খ্রিঃ কেরি এই কলেজে বাংলা ভাষায় অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পান।

পরবর্তীকালে তিনি এখানে সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষাও শিক্ষা দান করতেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে অনায়াসে এই ভাষায় বক্তৃতা কবতে পারতেন।

এই সময়েই কেরি শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা খোলেন। কয়েকমাস পরেই মিশন প্রেসে যোগ দেন হরফ নির্মাণশিল্পী পঞ্চানন কর্মকাব। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে পরে বিভিন্ন ভাষার বই প্রকাশিত হয়।

কেরি প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম কীর্তি হল, মথী-রচিত 'মিশন সমাচার' নামে প্রথম বাংলা গদ্য পুস্তক প্রকাশনা, সেটি এখানেই ছাপা হয়। কেরির সহকারী টমাস, রামরাম বসু ও কেরি স্বয়ং এই তিনজনের নাম প্রথম বাংলা ছাপা পুস্তকের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বাংলায় প্রথম বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন কেরি এবং সেই বই শ্রীরামপুর প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম অনুবাদক হিসাবেও কেরির নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৮০১ খ্রিঃ থেকে ১৮৩১ খ্রিঃ পর্যন্ত কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপক জীবনে তিনি বাংলা ও ভারতীয় শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বাংলা ভাষায় ব্যাকারণ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতেও বাইবেলের অনুবাদ এবং ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করে প্রকাশ করেন।

এছাড়াও তাঁর লোকহিতৈষণা নানাভাবে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে অগ্রগতির পথে সহায়তা করেছে। কেরির বাংলায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল নিউ টেস্টামেন্ট, বাংলা ব্যাকরণ, কথোপকথন, ওল্ড টেস্টামেন্ট, ইতিহাসমালা ও বাংলা-ইংরাজী অভিধান।

বহুবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে কেরি যখন ব্যতিব্যস্ত সেই সময় তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ডরোথি রোগভোগে মারা যান। কেরি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ১৮০৮ খ্রিঃ। তাঁর দিনেমার পত্নীর নাম চারলোতা রুমার। কর্মসাধক কেরির জীবনে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী রুমার হয়ে উঠেছিলেন কর্মপ্রেরণার উৎস।

কোন জাতির অগ্রগতি নির্ণয় করে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতি। এই দুই ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের কাজটি করেছিলেন কেরি উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে। তাঁর বিভিন্নমুখী অসামান্য অবদান পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে এদেশের চিন্তা ও চেতনাকে বিশেষ ভাবে জনশিক্ষার ক্ষেত্রটিকে। পরবর্তীকালে যে কাজের দায়িত্ব সপূর্ণভাবে বহন করে গেছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়।

সুদূর ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে এসে বাংলাকেই কর্মক্ষেত্র করেছিলেন উইলিয়াম কেরি। কেবল তাই নয়, একজন খিস্টধর্ম প্রচারক হয়েও তিনি মনেপ্রাণে ভারতের জল হাওয়া মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

১৭৯৩ খ্রিঃ কলকাতায় প্রথম পদার্পণের পর কেরি আর দেশে ফিরে যাননি। ১৮৩৪ খ্রিঃ ৯ জুন তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনের বাসভবনে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রেরণাদাত্রী পত্নী চারলোতা রুমার-এর সমাধির পাশেই তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।

তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী সমাধির প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে এই কথা কয়টি—

পুওর রেচেড ওর্ন
অন দ্য কাইণ্ড আর্মস আই ফল।

মার্টিন লুথার

জগতের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে জার্মানীর বিদ্রোহী সন্ন্যাসী মার্টিন লুথার নামটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। রোমের পরাক্রমশালী ধর্মগুরু মহামান্য পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একসময়ে তিনি সমস্ত খ্রিস্টান জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন।

যে সময়ে লুথারের জন্ম হয়েছিল, তখন খ্রিস্টীয় ধর্মজগতের এক শোচনীয় অবক্ষয়ের কাল। বাইবেলের যে আদর্শ ও যীশুর পবিত্র জীবনের আলোকে খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, সেইকালে সন্ন্যাসী ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভোগবিলাসলিপ্ত অনৈতিক জীবন ও পাপাচার সেই আদর্শকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। বাইবেলের মনগড়া ব্যাখ্যা করে, নিত্য নতুন নিয়ম নীতির প্রবর্তন করে, তারা মানুষকে নিজেদের ইচ্ছামতো চালিত করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিল। ধর্মাচরণকে তারা করে তুলেছিল অর্থোপার্জন ও ক্ষমতাপ্রাতিষ্ঠার হাতিয়ার। প্রচার করা হয়েছিল, পোপকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যারা দেবে মহামান্য পোপ তাদের সব পাপ ক্ষমা করে স্বর্গের পথ নিরাপদ করে দেবেন।

ধর্মের এই অবক্ষয়ের কালে র্জামানীর লোয়ার স্যাকসনির অন্তর্গত ইসলবেন নামে এক ছোট্ট শহরে ১৪৮৩ খ্রিঃ ১০ নভেম্বর এক রোমান ক্যাথালিক পরিবারে মার্টিন লুথারের জন্ম।

লুথারের বাবা জন হানস লুথার ছিলেন একটি খনির মালিক। মা মার্গারেট ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ পরিবারের মেয়ে ও বহু সদগুণের অধিকারিনী।

মার্টিন জন্মসূত্রে তাঁর মায়ের সদগুণাবলী লাভ করেছিলেন। কথিত আছে, মার্টিনের জন্ম সময়েই তাঁকে তাঁর পিতা ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

খ্রিস্টধর্মের প্রথা অনুযায়ী জন্মের পরদিনই শিশু মার্টিনকে চার্চে নিয়ে গিয়ে তাঁর নামকরণ করা হয়। ওই দিনে যাঁকে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাঁরই নামানুসারে শিশুর নাম রাখা হয় মার্টিন লুথার।

শৈশবেই মার্টিনের মধ্যে প্রবল ধর্মভাবের উন্মেষ দেখা যায়। ধার্মিক পিতামাতা তাই পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সীমিত আর্থিক সামর্থ্য সত্ত্বেও মার্টিনকে তাঁরা শহরের সবচেয়ে ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন।

কিছুকাল পরে জন লুথারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লে মার্টিনের পড়াশুনার অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে সেই সময় এক দয়াবতী মহিলা মার্টিনের প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বালক মার্টিনের স্কুলজীবন নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হয়।

পুত্রকে আইনশিক্ষা দেবেন এই ইচ্ছা ছিল জন লুথারের। তাই স্কুলের পরে ১৭ বছর বয়সে মার্টিনকে ভর্তি করে দেওয়া হল এরফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তিনি দর্শন ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জার্মান ভাষা ছাড়া, লাটিন ও ইংরাজি ভাষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন।

ছাত্র হিসাবে মার্টিন ছিলেন মেধাবী ও বুদ্ধিমান। জ্ঞানলাভের গভীর আগ্রহ নিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। বিশেষ করে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ের পুঁথি তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন। এই সময় একদিন তাঁর হাতে পড়ল লাতিন ভাষায় লেখা একটি বাইবেল। এই একটিমাত্র বই যা মার্টিনের অন্তরজগতে সহসা বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হল এক নতুন চেতনার।

লাতিন বাইবেল পড়ে মার্টিন উপলব্ধি করলেন, ধর্মের সুমহান আদর্শ বিধৃত রয়েছে যীশুর পবিত্র জীবন ও তাঁর ধর্ম-উপদেশেব মধ্যে। একমাত্র বাইবেলই পারে মানুষকে সত্য পথের সন্ধান জানাতে।

কিন্তু খ্রিস্টান যাজকরা গির্জায় যে উপদেশ নির্দেশ দেন তার মধ্যে বাইবেলের সত্য- সন্ধান নেই। ধর্মের নামে তারা ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে যা জানাচ্ছে প্রতিদিন তার সঙ্গে বাইবেলের শিক্ষার ব্যবধান দুস্তর।

আবাল্য ধর্মীয় পরিবেশে লালিত ও ধর্মভাবনায় ভাবিত মার্টিনের হৃদয় গভীর বেদনা ও ক্ষোভে আলোড়িত হল। তিনি স্থির করলেন মূল বাইবেল জার্মান ভাষায় অনুবাদ করবেন, যাতে সাধারণ মানুষ পবিত্র বাইবেলের সত্য স্বরূপ অবগত হয়ে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে।

কুড়ি বছর বয়সে মার্টিন দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক হলেন। একই সময়ে আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন।

তেইশ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন।

ইতিপূর্বেই মনস্থির করে নিয়েছিলেন, খ্রিস্টান ধর্মজগতের অন্ধ কুসংস্কার দূর করবেন। তার জন্য গ্রহণ করবেন পবিত্র ধর্মযাজকের পবিত্র জীবন।

এক রাত্রে তরুণ মার্টিন গৃহত্যাগ করলেন। তিনি এলেন অগস্টাইনদের সন্ন্যাসীনিবাসে। সেখানে তাঁকে সাদরে সদস্য করে নেওয়া হল।

তাঁর সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশের সংবাদ জানতে পেরে, মার্টিনের বাবা মা অতিশয় ব্যথিত হলেন। তাঁরা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাটিনকে কিছুতেই সংকল্পচ্যুত করা গেল না।

সাধু অগাস্টিনের নামঙ্কিত ও স্মৃতিপূত আশ্রমের জীবন মাটিনকে খুশি করতে পারল না। আশ্রমের নিয়ম নীতির কঠোরতা সর্বোপরি সন্ন্যাসীদের ধর্মবিরোধী জীবনযাত্রা ও হীন আচরণ অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলল।

সেই সময়ে যুবরাজ ফ্রেডরিকের উদ্যোগে সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর আহ্বানে লুথার আশ্রম-জীবন ত্যাগ করে এখানে যোগ দিলেন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে। এইভাবে ভবিষ্যতের ধর্মসংস্কারক লুথারের জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।

উটেনবার্গে অধ্যাপনাকালে এই সময়ে তিনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করার শিক্ষাও গ্রহণ করেন এবং এক বছরের মধ্যেই প্রকাশ্যে ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা দেবার ছাড়পত্র লাভ করেন।

লুথার বক্তৃতা দিতেন সহজ সরল বোধগম্য ভাষায়। খ্রিস্টের বাণীর মর্মকথাকে তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে তাঁর প্রতিটি কথা শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করত।

লুথার ছিলেন খ্রিস্টের আদর্শে বিশ্বাসী। তাই ধর্ম উপদেশ প্রচারকে তিনি লোককল্যাণের কর্ম বলেই মনে করতেন। এর বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না।

খ্রিস্টীয় সমাজের মহান ধর্মগুরু মহামান্য পোপের বাসস্থান রোম খ্রিস্টান ধর্মের পবিত্র তীর্থভূমি। একজন ধার্মিক নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান হিসাবে লুথারের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি আনত ছিল পোপের প্রতি।

তিনি মনে করতেন পোপ হচ্ছেন সুমহান ধর্মের নির্মল আদর্শ পুরুষ। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। তাই পোপের পবিত্র সান্নিধ্যলাভের স্বপ্ন আশৈশব লালিত হয়েছে তাঁর মনে। ১৫০৯ খ্রিঃ লুথার এলেন রোমে।

কিন্তু রোমে এসে, এখানকার ধর্মজীবনের, পোপের অধীন যাজক ও

সন্ন্যাসীদের জীবনচর্যার যে কদর্য পরিচয় তিনি পেলেন, তার সমস্ত অন্তর তীব্র ঘৃণায় ও ক্ষোভে আলোড়িত হল।

লুথার দেখলেন, এখানে ধর্মের মূল আদর্শের চর্চা কোথাও নেই, আছে ধর্মের নামে ভোগ বিলাস, ব্যভিচার আর লালসা। পোপ ও তাঁর অনুচরেরা ডুবে আছেন ধর্মের পরিপন্থী এক কদর্য জীবন অনুশীলনে।

পোপ স্বয়ং এবং তাঁর অনুচর সন্ন্যাসী যাজকদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বাইবেলের আদর্শের কোনও সঙ্গতি নেই। এমনকি তাঁরা ধর্মের ব্যাখ্যাও করছেন নিজেদের পছন্দ মতো, নিজেদের প্রয়োজনের দাবি মতো। প্রচার করা হচ্ছে, পোপকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান করলে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এ যেন ধর্মের নামে এক খোলা ব্যবসা।

লুথার নিজে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। রোমে, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের এই অধঃপতন লুথারের অন্তর্জগতে আলোড়ন তুলল। এখান থেকেই তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে নিলেন।

মর্মাহত লুথার ফিরে এলেন রোমে। এতকাল বাইবেলের নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। এবার থেকে শুরু করলেন ধর্মসংস্কার আন্দোলন। প্রকাশ্যেই রোমের গির্জার তীব্র সমালোচনা করে ঘোষণা করলেন বিদ্রোহ।

সেই যুগে ধর্মগুরু পোপের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। তাঁর বিন্দুমাত্র সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস পেত না কেউ। তাই লুথার বুঝতে পেরেছিলেন প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্ম তাঁকে বর্জন করতে হবে। এই ধর্মের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ সংস্কার আনা সম্ভব হবে না। লুথার বর্জন করলেন গির্জার সংস্রব।

লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রেরণার উৎস ছিল প্রধানতঃ সাধু পিটারের উপদেশ। সেখানে সেন্ট পিটার বলেছেন, অর্থ, সম্মান বা কোন কিছুই নয়, একমাত্র গভীর বিশ্বাসের বলেই মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। আত্মার মুক্তির জন্য চাই অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাস। আর অবশ্যই ভাল কাজ। ঈশ্বর সর্বদাই মানুষকে সকল পাপ থেকে পরিত্রাণ করে থাকেন।

সাধু পিটারের উপদেশবাণীর আলোকে উদ্দীপ্ত ছিল লুথারের বিদ্রোহী সত্তা। তাই দেখা গেল ১৫১৭ খ্রিঃ ১লা নভেম্বর তিনি জার্মানীর একটি গির্জার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিলেন তাঁর পঁচানব্বইটি প্রস্তাব সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র।

এই ঘোষণাপত্রে তিনি পোপের ধর্মবিরুদ্ধ কার্যকলাপের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। অর্থের বিনিময়ে পাপমুক্তি বিক্রয় করার বর্ণনা দিয়ে লুথার বলেছেন, পোপ যদি পাপীকে পরিত্রাণের ক্ষমতা রাখেন তবে মহাপ্রাণ যীশু যে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন সেই মতো তিনিও সব পাপীকে মুক্তি দিচ্ছেন না কেন?

লুথারের এই ঘোষণাপত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের ধর্মজগতে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। তার ফলে কেঁপে উঠল পোপের আসন।

তখন রোমের পোপ দশম লিও। তাঁর কাছে লুথারের বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছতে বিলম্ব হল না। তিনি লুথারের আচরণকে এক জঘন্যতম অপরাধ বলে নির্দেশ করে ঘোষণা করলেন, এই অন্যায় আচরণের জন্য লুথারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। আগামী ষাট দিনের মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত অভিমত প্রত্যাহার করে নেবেন। নচেৎ ক্যাথলিক সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করা হবে তাঁকে।

লুথারের হৃদয় ছিল সুমহান ধর্মের আদর্শে উদ্দীপ্ত, নিবিড় বিশ্বাস-দৃঢ় প্রত্যয়ে সুপবিত্র। তিনি পোপের আদেশপত্র প্রকাশ্যে অগ্নিদগ্ধ করে পোপের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন ''Pope has no Divine right to excommunicate anyone.''

এই ঘটনার পর থেকেই সংস্কার আন্দোলন গতি লাভ করল এবং ক্রমশই তীব্র আকার ধারণ করতে লাগল। আর একা লুথারই তার নেতৃত্ব দিতে লাগলেন।

লুথার দোর্দন্ডপ্রতাপ পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এমন এক যুগে যখন পোপের সামান্যতম সমালোচনা যারা করত পোপ অনুরাগীরা তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করত।

লুথার জানতেন, তাঁর সম্ভাব্য পরিণতির কথা। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সমর্থনের প্রশ্নে মৃত্যুভয়কে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন।

কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন লুথারের অনুগামীরা। তাঁর মতবাদের প্রধান সমর্থক ও বন্ধু ছিলেন স্যাক্সনির প্রশাসক ফ্রেডরিক। তিনি লুথারের নিরাপত্তার আশঙ্কায় নিজের দুর্গে তাঁকে নিয়ে এলেন। সেখানেই বাস করতে লাগলেন লুথার।

এদিকে লুথারের আকস্মিক অদর্শনে চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। জনরব ছড়িয়ে পড়ল, লুথারকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর অনুগামী ও সমর্থকদের মধ্যে দেখা দিল তীব্র ক্ষোভ। তারা রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচার আরম্ভ করল।

প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ না করলেও বন্ধু ফ্রেডরিকের দুর্গে বসবাসকালে লুথারের কাজের বিশ্রাম ছিল না। গভীর ধ্যান, অধ্যয়ন আর অনুবাদের কাজে তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।

এই সময় তিনি ইহুদী ভাষা থেকে মূল বাইবেল জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলেন। এছাড়া ধর্মসম্বন্ধে ব্যাখ্যামূলক অনেক পুস্তিকা রচনা করেন। যেগুলো সাধারণ মানুষের ধর্মের বোধকে সজাগ ও পুষ্ট করতে সহায়তা করেছে।

তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ধর্মবিষয়ে সকলপ্রকার কুসংস্কার ও প্রাচীন ধ্যানধারণা বর্জন করতে হবে। ভোগবিলাসে নিমজ্জিত পোপের জীবন আধ্যাত্মিক ভাবধারার পরিপন্থী।

পোপের আধ্যাত্মিক শক্তিও প্রশ্নাতীত নয়। লুথার যাজকদের অবিবাহিত থাকার যুক্তিকেও খণ্ডন করে তাঁদের স্ত্রী গ্রহণে সমর্থন জানিয়েছেন।

লুথারের সংস্কার আন্দোলন কেবল জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ রইল না। ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের দেশে দেশে। অনেকেই সমর্থন জানাল লুথারের নতুন মতবাদকে।

সমর্থন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন থেকে চার্চের অত্যাচারের ভয়ও সরে যেতে লাগল। এভাবে দিনে দিনে সংগঠিত হয়ে উঠল রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিবাদী সংগঠন।

ইতিমধ্যে জার্মান রাজকুমার ফিলিপ লুথারের নতুন মতবাদের প্রতি তাঁর আস্থার কথা ঘোষণা করলেন। এরপর লুথারও আর প্রকাশ্যে আসতে দ্বিধা করলেন না। তিনি জার্মানবাসীদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে আবেদন জানিয়ে বললেন, তাঁরা যেন সর্বতোভাবে সংস্কারের কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের স্বাধীন কাজে চার্চের হস্তক্ষেপের অধিকারকে অস্বীকার করে তিনি জানালেন, একজন শাসক খ্রিস্টান হোন বা যাজক হোন, তাঁর শাসনকার্যের জন্য তাঁকে দায়ী থাকতে হবে কেবল ঈশ্বরের কাছে, কোনও চার্চের কাছে কখনই নয়।

শাসকদের প্রতি আবেদন জানিয়ে লুথার তাঁদের সমাজের প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলির বিষয়ে সজাগ হতে বলেন। ছুটি কমিয়ে তাঁরা যেন উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হন। জনশিক্ষা বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন স্কুল খোলার ব্যবস্থা করেন। করবৃদ্ধি বা অন্য কোনও ক্ষেত্রেই যেন চার্চের হস্তক্ষেপ সহ্য না করেন।

সেইকালে চার্চের শোষণ উৎপীড়ন ও নানা কাজে অহেতুক হস্তক্ষেপের বাড়াবাড়ির জন্য বহু সাধারণ মানুষ ও অভিজাত সমাজের উদার মানসিকতার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ জমে উঠেছিল। এই দফায় লুথারের সংস্কারমুক্ত নব ধর্মমত চার্চ-বিরোধী ক্ষুব্ধ জনতার সমর্থন-পুষ্ট হয়ে দ্রুত প্রসারলাভ করল।

লুথারের এই পোপ-বিরোধী আন্দোলনই অচিরে আত্মপ্রকাশ করল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মরূপে। এই নবধর্মমতের মূল বাইবেল এবং খ্রিস্টের বাণী।

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম আন্দোলনকে সফল করার জন্য লুথার তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার ফলে

১৫২৩ খ্রিঃ থেকে ১৫৪০ খ্রিঃ-এর মধ্যে ইউরোপের একাংশে এই নবধর্ম মত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

লুথার উটেনবার্গে ফিরে আসেন ১৫২৫ খ্রিঃ। এই সময়েই তিনি ক্যাথেরিন ভন বোরা নামে এক সন্ন্যাসিনীকে বিবাহ করেন। তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল।

সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনেই লুথার ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট গ্রন্থের অনুবাদ সংস্কার করেন। এছাড়া এই সময়ে রচিত তাঁর অন্যান্য পুস্তকগুলি জার্মান সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ রূপে স্বীকৃত। তাঁর একটি বিখ্যাত বই হল Table Talks।

দীর্ঘ পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। অবশেষে ১৫৪৬ খ্রিঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি তেষট্টি বছর বয়সে লুথারের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুশয্যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন, তার প্রতি এখনো কি তাঁর বিশ্বাস আছে?

উত্তরে লুথার বলেছিলেন, আছে। এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

ইউরোপের সংস্কার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব লুথার প্রকৃতপক্ষে ছিলেন এক নবযুগের উদগাতাপুরুষ। জার্মানী তথা মধ্যযুগের ইউরোপকে তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার ও পুরোহিততন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করে আধুনিক যুগের আলোয় পৌঁছে দিয়েছিলেন।

প্যারীচরণ সরকার

বাংলার আরনল্ড নামে খ্যাত প্যারীচরণ সরকার মুখ্যতঃ শিক্ষাব্রতী মনীষী রূপে পরিচিত হলেও তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বহুধা বিস্তৃত।

বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রচার, নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, মদ্যপান নিবারণ, শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, পত্রিকা সম্পাদনা প্রভৃতি সমাজ সংস্কার ও জন-হিতৈষণামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে প্যারীচরণ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের গতি বৃদ্ধি করেছিলেন।

এককালে বাঙালী ছেলেমেয়েদের অক্ষর পরিচয় হত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় বই দিয়ে। সেই বই-এর সমাদর এখনও কিছুমাত্র কমেনি। এখনও বাঙালী পড়ুয়াদের হাতেখড়ি হয় বর্ণপরিচয় দিয়ে।

একই সময়কালে বাঙালী ছেলেমেয়েদের ইংরাজীর প্রথম পাঠ নিতে হত প্যারীচরণের দি ফাস্ট বুক অব রিডিং দিয়ে। ঘরে ঘরে পড়ানো হত এই বই।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে লিখিত প্যারীচরণের দি ফাস্ট বুক অব রিডিং আজকাল আর পড়ানো হয় না। সস্তা প্রচারের যুগে সেই বই-এর স্থান নিয়েছে যত বস্তাপচা অক্ষম অপটু কেতাব।

প্যারীচরণ তাঁর জীবনের অধিকাংশকাল ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনে নিযুক্ত ছিলেন। বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ডেনিং সাহেবের অনুসৃত ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি লিখেছিলেন ছয় খন্ডে দি ফার্স্ট বুক সিরিজ। ইংরাজি ভাষার সুদক্ষ শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও লেখক হিসেবেই, দ্য ফাস্ট বুকের কল্যাণে তাঁর পরিচিতি ছিল সমধিক।

ইংরাজি বিদেশী ভাষা। সেই ভাষায় বাঙালী ছেলেমেয়েদের পারদর্শী করে তুলেছিলেন প্যারীচরণ একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে। অক্ষর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের প্রাথমিক নিয়মগুলিও তিনি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। ইংরাজি শব্দভান্ডারের সঙ্গে সাবলীলভাবে পড়ুয়াদের পরিচিত করে দেন।

প্যারীচরণের দ্য ফার্স্ট বুক সিরিজের ছটি বইই, ১৮৭৩ খ্রিঃ লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক স্থাপিত স্কুল বুক রিভিশন কমিটির রিপোর্টে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পুস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বই বলে বিবেচিত হয়।

সেইকালে ভারতীয়দের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই আসত বিলেত থেকে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ছেলেমেয়েদের ইংরাজি বইপত্রও। প্রাথমিক শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষার বইপত্র যা আসত তা সবই ইংরাজদের লেখা। সেগুলি লেখা হত বিশেষ করে ওই দেশের অর্থাৎ ইংলণ্ডের ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

আমাদের জাতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতির পক্ষে সে সব বই ছিল অনুপযুক্ত। ফলে এদেশীয় ছেলেমেয়েরা বই-এর লেখার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে উঠতে পারত না।

একজন শিক্ষক হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা অনুধাবন করে প্যারীচরণ তাঁর ফার্স্ট বুক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর ফার্স্ট বুক সিরিজের বইতে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা স্বদেশীয় পরিবেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেত। ফলে এই বই-এর মাধ্যমে অতি সহজেই তারা বিদেশী ইংরাজি ভাষা রপ্ত করতে পারত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৪-৫৫ খ্রিঃ। তার বেশ কয়েক বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল প্যারীচরণের ফার্স্ট বুক।

প্যারীচরণের জন্ম হয়েছিল কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলে ১৮২৩ খ্রিঃ

২৩শে জানুয়ারী। তাঁর পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র সরকার। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার এড়াগ্রামে।

প্যারীচরণের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা ইংলিশ স্কুলে। পরে তিনি পড়াশুনা করেন হিন্দু কলেজে। ছাত্র হিসেবে বরাবরই তিনি ছিলেন মেধাবী। প্রায় প্রতিবারেই পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে প্যারীচরণ সহপাঠী হিসেবে যাঁদের পেয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠ ছাত্র এবং পরবর্তী জীবনে তাঁদের অনেকেই জাতীয় জীবনে কীর্তিমান পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

প্যারীচরণের হিন্দু কলেজের কৃতী সহপাঠীরা হলেন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, চণ্ডীচরণ সেন, গোবিন্দচন্দর ড্যাট (দত্ত) প্রমুখ।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। প্যারীচরণ তাঁর ইংরাজী ভাষার দক্ষতাগুণে রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

শুধুমাত্র ইংরাজিতেই নয়, অঙ্কশাস্ত্রেও প্যারীচরণের বিলক্ষণ দখল ছিল। এ জন্য তিনি বহু স্বর্ণপদক ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন। পড়াশুনায় সামগ্রিক বিচারে শ্রেষ্ঠ ফলাফলের জন্য প্যারীচরণ চল্লিশটাকা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর মাসিক সরকারী বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্য রচনার চর্চা করতেন প্যারীচরণ। সাহিত্য বিষয়ক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সকলের প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

তিনি যখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ পরবর্তী সময়ে বার্ষিক এডুকেশন রিপোর্টে মুদ্রিত হয়েছিল।

প্যারীচরণ তাঁব কর্মজীবন শুরু করেন হুগলী স্কুলে শিক্ষক পদে ১৮৪৩ খ্রিঃ। তিন বছর পরে তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৮৫৪ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এখানে কর্মরত ছিলেন এবং শিক্ষাবিদ রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

বারাসত স্কুলে শিক্ষকতা কালেই ১৮৪৭ খ্রিঃ এখানে তিনি নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ মিত্রের সহায়তায় ভারতীয় পরিচালিত প্রথম বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সেইকালে সবে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের সূত্রপাত হয়েছে। সমাজহিতৈষী উদ্যোগী ব্যক্তিদের সহায়তায় শিক্ষাবিস্তারের কাজ প্রসারিত হচ্ছে। এই সময়ে একজন প্রকৃষ্ট শিক্ষাবিদরূপে প্যারীচরণ এ দেশে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি শিক্ষারও বন্দোবস্ত করেন।

বারাসত স্কুলে শিক্ষকতা কালেই প্যারীচরণের ফার্স্ট বুক প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর স্কুলে নিজের লেখা বই পাঠ্য করলেন। ছাত্ররাও মনের মতো বই পেয়ে আনন্দিত হল।

সেই সময় কলকাতা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন একজন ইংরাজ সাহেব। তিনি তাঁর স্কুলে বাঙালীর লেখা ইংরাজি বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করতে আপত্তি প্রকাশ করলেন। সাহেবের লেখা ইংরাজি বই পাঠ্য করার জন্য জেদ ধরলেন।

এই নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ হল। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দুটি বইই পড়ানো হবে। পরীক্ষার ফলাফল দেখে বই-এর উৎকর্ষ এবং গ্রহণযোগ্যতা বিবেচিত হবে।

তাই করা হলো। অর্ধেক ছাত্রকে পড়ানো হল বাঙালীর লেখা ইংরাজি বই। আর বাকি অর্ধেক ছাত্রকে পড়ানো হল সাহেবের লেখা ইংরাজি বই।

জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল, যে সকল ছাত্র ফার্স্ট বুক পড়েছিল তারাই পেয়েছে সব চেয়ে বেশি নম্বর। গুণ বিচারে ফার্স্ট বুকের জয়জয়কার এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ দেশে।

পরবর্তীকালে এই বই-এর সমাদর ও চাহিদা এতই বৃদ্ধি পায় যে এদেশে প্যারীচরণের বই ছাপিয়ে কুলিয়ে ওঠা যেত না। বিলেত থেকেই ছাপিয়ে আনতে হত। বই বিক্রি থেকে তিনি সেইকালে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন।

এখন যেই শিক্ষায়তনের নাম হেয়ার স্কুল। সেসময়ে তার নাম ছিল কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। প্যারীচরণ এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন ১৮৫৫ খ্রিঃ। এখানে তিনি আট বছর কর্মরত ছিলেন।

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে হেয়ার সাহেবের অবদান অপরিসীম। তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন স্কচ। কিন্তু কর্মসূত্রে বাঙালীর আপনজন ছিলেন। হেয়ার সাহেব মনেপ্রাণে এ দেশকে স্বদেশ ভাবতেন।

কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলের প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল মহামতি হেয়ার সাহেবের হাতে। প্যারীচরণ যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র সেই সময়েই, ১৮৪২ খ্রিঃ হেয়ার সাহেব প্রয়াত হন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্মভার গ্রহণ করার পর তিনি হেয়ার সাহেবের পুণ্য স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ নিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় এই স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে হেয়ার স্কুল হয়।

প্যারীচরণ প্রধানতঃ প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকই রচনা করেছেন। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েও জাতির ভবিষ্যৎগঠনের উদ্দেশ্যে কোমলমতি পড়ুয়াদেরই তিনি উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

ফার্স্ট বুক ছাড়াও চাইল্ড ফার্স্ট গ্রামার ও কয়েকটি ভূগোল বই তিনি

লিখেছিলেন। বড়দের জন্য তিনি লিখেছিলেন একটিমাত্র বই The tree of intemperance. তবে এ বই সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

১৮৬৩ খ্রিঃ প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজিভাষা ও সাহিত্যের অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খ্রিঃ ওই পদে স্থায়ী হয়ে আমৃত্যু কাজ করেছেন।

সুযোগ্য অধ্যাপক হিসেবেও প্যারীচরণের খ্যাতি এতটাই প্রসারলাভ করেছিল যে বাইরে থেকেও অনেক ছাত্র তাঁর ক্লাশে যোগদান করতে আসত।

কেবল অধ্যাপনা বা গ্রন্থরচনাতেই প্যারীচরণের কর্মজীবন সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে নানাভাবেই তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখে ছিলেন।

১৮৬৬ খ্রিঃ প্যারীচরণ সরকারী সংবাদপত্র দি এডুকেশন গেজেট-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনা ও পরিচালনায় এডুকেশন গেজেট সেকালের শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্ররূপে বিখ্যাত হয়েছিল। এই কাগজে নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সেই সময়ে সমাজের নানাবিধ সংস্কারকর্মের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। নবজাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজ জীবন। শিক্ষাবিস্তার, নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, ধর্মীয় কুসংস্কার সর্বোপরি ডিরোজিওপন্থী প্রগতিবাদী ইয়ংবেঙ্গল দলের অতিউৎসাহী কদাচার ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে এসেছে পাদপ্রদীপের আলোয়।

প্যারীচরণ সমাজের নানাবিধ ত্রুটি, সমাজপতিদের প্রগতিবিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় নিয়মিত লিখতেন। নিরলসভাবে তিনি কলম চালনা করেছেন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও হিন্দু বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে। বিধবা বিবাহ প্রচারেও তিনি বিদ্যাসাগরের সহযোগী ছিলেন।

বিধবা বিবাহ প্রচার কার্যে বিদ্যাসাগর মশাই অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। ফলে তিনি একসময় ঋণজালে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ভার লাঘব করার উদ্দেশে সেই সময় প্যারীচরণই এডুকেশন গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন।

একজন প্রতিভাবান সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করলেও এডুকেশন গেজেটের সঙ্গে প্যারীচরণ বেশি কাল যুক্ত থাকতে পারেন নি।

১৮৬৮ খ্রিঃ মে মাসে সেকালের ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনের নিকট এক সাংঘাতিক রেল দুর্ঘটনা ঘটে। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় বহু যাত্রী হতাহত হয়। একজন দায়বদ্ধ সাংবাদিক হিসাবে, সরকারী কর্তাব্যক্তিদের ন্যায় প্যারীচরণ এই ঘটনায় নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি

কঠোর ভাষায় রেল কর্তৃপক্ষের নানা ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা করলেন। দুর্ঘটনার সত্য বিবরণ প্রকাশ করে সরকারী তরফে সঠিক তথ্য জনসাধারণের নিকট গোপন করার তীব্র সমালোচনা করলেন।

সরকারী মুখপত্রে এরূপ সরকার বিরোধী সমালোচনা প্রকাশ করায় প্যারীচরণকে সরকারের রোষ নজরে পড়তে হয়। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে তখনকার লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর মতবিরোধ ঘটল। প্রতিবাদে প্যারীচরণ ছোটলাটের নিকট পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন।

সেইকালে এই কাজে প্যারীচরণ বেতন পেতেন সহস্রাধিক টাকা। তখনকার দিনে যথেষ্ট লোভনীয় মাহিনা। কিন্তু স্বাধীনচেতা, আদর্শচরিত্র ও স্পষ্টবক্তা প্যারীচরণ সেই অর্থের বিনিময়ে নিজের ব্যক্তিসত্তা বিকিয়ে দেননি।

এডুকেশন গেজেট ছাড়াও ওয়েল উইশার ও হিতসাধক নামে আরও দুখানি সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন প্যারীচরণ।

ইংরাজি শিক্ষা ও হিন্দু কলেজের তরুণ মুক্তবুদ্ধি শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাবে নব্য বাংলার ইয়ং ডিরোজিয়ান যুবকদের বিপথগামিতা রোধ করা ও তাদের সুপথে আনার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ মনীষীর উদ্যোগে ১৮৬৪ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি। এই সমিতি হিন্দু যুবকদের খ্রিস্টান হওয়া, মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি নানা কদাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করত। ওয়েল উইশার ও হিতসাধন পত্রপত্রিকা দুটি ছিল এই সমিতিরই মুখপত্র।

মদ্যপান নিবারণ সমাজ নামে প্যারীচরণ নিজে একটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্যারীচরণের কর্ম-কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়। নারীশ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য তিনি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কৃষি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেন। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব ইডেন হিন্দু হোস্টেল প্রতিষ্ঠা।

সেইকালে যে কোনও শিক্ষিত ইংরাজের চাইতে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে প্যারীচরণের ব্যুৎপত্তি ছিল অধিক। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আলোকে আলোকিত তাঁর মন ও মনন ছিল উদার ও আধুনিক। কিন্তু আচার আচরণে ও জীবনচর্যায় তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙ্গালী। এ বিষয়ে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে কেবল তাঁকে তুলনা চলতে পারে।

এ দেশে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্যারীচরণের অবদান আমাদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। ১৮৭৫ খ্রিঃ ৩০ সেপ্টেম্বর শিক্ষাব্রতী মনীষী প্যারীচরণের কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

স্যার জেমস হোপউড জিন্স

বিশ্ববিজ্ঞানের মহৎ জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম স্যার জেমস হোপউড জিন্স। তাঁর একের পর এক গবেষণার সাফল্যে উন্মোচিত হয়েছে মহাবিশ্বের রহস্যময় অর্ন্তলোক, পৃথিবীর সৃষ্টি তত্ত্বের ইতিকথা। তেমনি বিজ্ঞানকে জনমুখী করার দুরূহ কর্ম প্রচেষ্টাতেও তিনি ছিলেন অক্লান্তকর্মা পুরুষ। বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের জন্য—এই আদর্শের রূপায়নেই আমৃত্যু তিনি ব্যাপৃত রেখেছেন নিজেকে।

বিজ্ঞান সাধানার একনিষ্ঠ ব্রতচারী হয়েও জেমস মানুষের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের স্বীকৃতি জানিয়েছেন অকুণ্ঠ দৃঢ়তায়।

জেমস জিন্সের জন্ম লণ্ডনের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৭৭ খ্রিঃ ১১ সেপ্টেম্বর। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী ও বুদ্ধিমান। ফলে ভাল স্কুলের ভাল ছাত্র হিসেবে লাভ করেছেন শিক্ষক ও সহপাঠীদের স্নেহভালাবাসা।

জিন্সের ভাললাগা বিষয় ছিল গণিত। গণিতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন স্কুলের শেষ পরীক্ষাতেও। স্কুলের পরে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ। সেখান থেকে স্নাতক হলেন ১৮৯৮ খ্রিঃ।

উচ্চতর গণিতে প্রতিভার স্বীকৃতি পেতেও বিলম্ব হল না। স্মিথ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন জিন্স দু বছরের মধ্যে।

দুর্ভাগ্য এমনই যে গণিতের গবেষণায় যখন আত্মনিয়োগ করবেন স্থির করলেন, সেই সময়ই জিন্স দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন। যক্ষ্মা হল রাজরোগ, দুশ্চিকিৎস্য। তাই ভাল একটি স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁকে।

টানা দুটি বছর সেখানে রইলেন। উপযুক্ত যত্ন ও সতর্কতার মধ্যে থাকায় যক্ষ্মার আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হল। সুস্থ হয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন জিন্স।

১৯০৪ খ্রিঃ কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। ক্যামব্রিজেই গণিতের অধ্যাপকের চাকরি পেলেন। সেই সঙ্গে গবেষণার ঢালাও সুযোগ। গণিতের অনুরাগী জিন্স গণিতনির্ভর বিজ্ঞান নিয়েই আরম্ভ করলেন গবেষণা।

পদার্থ বিদ্যার গ্যাসীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর তাঁর গবেষণার ফলাফল কয়েক মাসের মধ্যেই প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করলেন। প্রবন্ধের নাম ডাইনামিক থিয়োরি অব গ্যাসেস।

এই প্রবন্ধে গ্যাসের গতিবিদ্যার ওপর বিশেষ আলোচনা করে জিন্স প্রমাণ করলেন যে, যে কোনও পদার্থের অণুগুলি সর্বদা এক স্থির গতি বজায় রাখে।

ইতিপূর্বে গ্যাসীয় অণুর গতিবেগ সংক্রান্ত সূত্র প্রকাশ করেছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল। জিন্স তাঁর প্রথম গবেষণাপত্রে এই সূত্রকেই তাত্ত্বিক রূপ দিলেন অর্থাৎ গাণিতিক উপায়ে প্রমাণ করলেন। এই অসাধারণ কাজটি মাত্র এক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করে বিজ্ঞানী মহলে পরিচিতি লাভ করলেন তিনি।

প্রায় একই সময়ে, ১৯০৫ খ্রিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপনার আহ্বান পেলেন জিন্স। সানন্দে এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। প্রায়োগিক গণিত বিভাগে প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগ দিলেন তিনি।

এখানে একাধারে অধ্যাপনা ও গবেষণার মধ্যে চার বছর সসম্মানে কাজ করলেন জিন্স। এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় গবেষণা নিবন্ধ—দ্য ম্যাথামেটিক্যাল থিওরি অব ইলেকট্রিসিটি।

দ্বিতীয় গবেষণাপত্র প্রকাশের আগেই অবশ্য ১৯০৬ খ্রিঃ জিন্স গাণিতিক পদার্থবিদ্যায় কৃতিত্বের স্বীকৃতি লাভ করেন। লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন তিনি। সুবিখ্যাত বিশ্ববিজ্ঞান সংস্থার এই সম্মানজনক পদ জিন্স লাভ করেন মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে।

প্রিন্সটনে চার বছর কাজ করার পর ১৯০৯ খ্রিঃ জিন্স ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। কাজও জুটে যায় কেমব্রিজে। প্রায়োগিক গণিত বিভাগে অধ্যাপকের পদ।

অধ্যাপনার সঙ্গে আবার গবেষণা আরম্ভ করলেন তিনি। এবারে আর গ্যাসীয় তত্ত্বের বিষয় নয়। তাঁর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি প্রসারিত হল রেডিয়েশান বা বিকিরণের সম্ভাবনাময় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে।

বিকিরণ হল পদার্থের পরমাণুশক্তি, বিজ্ঞানের এক অতি কঠিন বিষয় যা আলো বা তাপের নিঃসরণ ও প্রসারণের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এই বিকিরণের জগতের রহস্যময় পরিচয় ইতিপূর্বে বহু পদার্থ বিজ্ঞানীকে নিয়োজিত করেছে গভীর গবেষণায়।

ধরা পড়েছে ইউরেনিয়াম, পোলনিয়াম রেডিয়াম প্রভৃতি ভারী রাসায়নিক মৌলের অন্তর্লোকে বিকিরণের তেজস্ক্রিয়তা।

জিন্স তাঁর গবেষণায় বিকিরণের অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত লাভ করলেন। কেবল তাই নয়, তিনি প্রণোদিত হলেন এই কঠিন বিষয়টিকে সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য করে তোলার কাজে। যে বিষয়টি ছিল কেবল মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর গবেষণার অন্দর মহলে গণ্ডিবদ্ধ, জিন্স তাকে সাধারণের মাঝে সরল ভাষায় প্রকাশের কাজে ব্রতী হলেন। কঠোর দীর্ঘ পরিশ্রমে রচনা করলেন পরমাণুশক্তির সহজ ভাষ্য।

১৯১৪ খ্রিঃ জিন্সের বিকিরণের ওপরে প্রথম বই রেডিয়েশান অ্যাণ্ড দ্য কোয়াণ্টাম থিওরি প্রকাশিত হল। অসাধারণ লিপিকুশলতা ও সহজ সরল বর্ণনার গুণে বিজ্ঞানের এক কঠিন তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বোধগোচব হয়ে উঠল।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় বিজ্ঞানগ্রন্থ হিসাবে বইটি পৃথিবীর দেশে দেশে স্বীকৃতি লাভ করল।

১৯১৪ খ্রিঃ পর থেকে জিন্সের গবেষণার বিষয় আবার পরিবর্তিত হল। ১৯২৮ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি ডুবে রইলেন মহাজাগতিক গবেষণায়। সৌরবিশ্বের উৎপত্তি, তার আয়ুষ্কাল, পরিণতি এসব প্রশ্নের সমাধানের খোঁজে গণিতের সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগলেন তিনি।

মহাবিশ্বের অজানা রহস্য যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তার মনে জন্ম দিয়েছে নানা প্রশ্নের। এই যে রূপ ও অরূপের লীলানিকেতন ধুলোর ধরণী, মহাবিশ্বের কোন নিয়মে তার উৎপত্তি? কবে, কখন? পরিণতিই বা কি? নানা যুগের বিভিন্ন বিজ্ঞানী মহাজগতের রহস্যটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন নিজেদের ধ্যানালোকে। দিয়েছেন নানা তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা। কিন্তু তত্ত্বমীমাংসার শেষকথা কেউই শোনাতে পারেননি।

জিন্স তাঁর গণিতের সিঁড়ি ভেঙ্গেই নাগাল ধরলেন প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়মের। বিজ্ঞানের ভাষায় এই গাণিতিক নিয়মের নাম স্টেলার ডাইনামিকস বা নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব। এই গতিতত্ত্বের পথ ধরেই বেরিয়ে এল সৌরবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য।

মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তির স্বীকৃত ব্যাখ্যাটি হল ঃ কোনও এক আদিকালে জ্বলন্ত এক সৌরপদার্থের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে যায় এক নক্ষত্র। সেই নক্ষত্রের আকষর্ণে গনগনে সেই সৌর পদার্থের মধ্যে ঘটে বিস্ফোরণ। ফলে তার ছিন্নভিন্ন অংশ মহাশূন্যের অন্তহীন শূন্যে ছিটকে পড়ে। সেই জ্বলন্ত বিচ্ছিন্ন অংশগুলোই সময়ের ব্যবধানে অপেক্ষাকৃত শীতলতা পেয়ে রূপ নেয় এক একটি গ্রহ, নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জের।

মহাজাগতিক জটিল প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট নক্ষত্রগুলোর পারস্পরিক ব্যবধান আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানীরা আলোকবর্ষের হিসাব কষেন। প্রতি সেকেণ্ডে আলোর গতি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এক বছরে আলো যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তা হল এক আলোকবর্ষের মাপ।

যে তত্ত্বের সাহায্যে জিন্স মহাকাশের গ্রহনক্ষত্রদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন তার নাম হল টাইডাল থিওরী। এই তত্ত্বের সাহায্যে জিন্স প্রমাণ করেন,

সৌরবস্তুর সৃষ্টির মূলে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হল বিকিরণ অর্থাৎ এক মহাবিস্ফোরণ।

মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়াকে আশ্রয় করে নক্ষত্রদের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই নির্দিষ্ট হয়েছে তাদের প্রকৃতি। তাদের কোনওটি একক, কোনওটি বহুর সমষ্টি, কেউ পেঁচাল কেউ বা বামনাকার। কোনও একটি অতি বৃহৎ আকারের নক্ষত্রের পাশে আবার রয়েছে কেবল গ্যাসের বলয়।

মহাবিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিশিষ্ট ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী লাপলাস তাঁর গাণিতিক তত্ত্বে বলেছেন, মহাকাশে ভাসমান নীহারিকাপুঞ্জের সঙ্কোচনের ফলেই হয়েছে গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি।

কিন্তু জিন্স তাঁর নিজের তত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রমাণ করেন, গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টিতে নীহারিকার কোনও স্থান ছিল না। তাঁর জ্যোতির্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নক্ষত্রের গতির ওপর মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে জিন্সের আরও এক অসামান্য আবিষ্কার হল নক্ষত্রদের গতি সম্পর্কিত তত্ত্ব। তিনি জানালেন যে, অভিন্ন শক্তির গতিতে প্রতিটি নক্ষত্রই ধাবমান। তবে অতিকায় নক্ষত্রের চলার বেগে রয়েছে মন্থরতা আর ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্র চলে দ্রুত।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে জিন্সের জ্যোতির্গবেষণা এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে। তাঁকে এনে দেয় বিশ্বপরিচিতি। অচিরেই রয়াল সোসাইটির প্রধান কর্মসচিবের পদে মনোনীত হলেন তিনি। সময়টা ছিল ১৯১৯ খ্রিঃ। একই সময়ে প্রকাশিত হয় তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান ভাবনার অসামান্য গ্রন্থ—কসমোগনি অ্যান্ড স্টেলারডাইনামিক্স।

এই সময়ে একদিকে যেমন তিনি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন সংস্থার প্রশাসনিক কাজকর্ম, সমান্তরালভাবে চলেছে তাঁর গবেষণার কাজও। অনায়াস দক্ষতায় তিনি সম্পন্ন করেছেন দুটি দায়িত্বই। সোসাইটির সচিবের পদে টানা দশ বছর সমান দক্ষতার সঙ্গে সসম্মানে আসীন ছিলেন জিন্স।

১৯২৪ খ্রিঃ তিনি বিখ্যাত রয়াল ইনসটিটিউশনের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে একাধারে অধ্যাপনা ও গবেষণা চলে পাঁচ বছর। প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর একের পর এক গবেষণামূলক চমকপ্রদ প্রবন্ধ।

১৯২৯ খ্রিঃ জিন্স আবার পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। তাঁর ডাক আসে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্বখ্যাত মাউন্ট উইলস অবজারভেটরি থেকে। সেখানে নিযুক্ত হলেন সহযোগী গবেষক হিসেবে। একাদিক্রমে পনের বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণায় এক যুগান্তকারী ইতিহাস রচনা করলেন।

বিজ্ঞানের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে জীবনের সুরু থেকেই জিন্স ছিলেন পূর্ণ সজাগ। তাই বিজ্ঞানী হিসেবে কেবল গবেষণা ও আবিষ্কার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি তিনি। গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞানকে জনমুখী করার উদ্দেশ্যে সরল সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণ মানুষের জন্য লিখেছেন একের পর এক বই।

ক্যালিফোর্নিয়ার উইলসন মান মন্দিরে আসার পর থেকেই তিনি প্রধানতঃ এ বিষয়ের ওপরে জোর দেন। কখনও তিনি লিখেছেন তরঙ্গ বলবিদ্যার ওপরে, কখনও বিকিরণ অথবা আপেক্ষিকতা বা বিশ্বের উৎপত্তিতত্ত্ব নিয়ে।

তাঁর জগদ্বিখ্যাত বইগুলো হল ইউনিভার্স অ্যারাউন্ড আস, দ্য স্টারস ইন দেয়ার কোর্সেস, দ্য নিউ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব সায়েন্স, সায়েন্স অ্যাণ্ড মিউজিক, ফিজিকস অ্যাণ্ড ফিলসফি, দ্য মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স।

আশ্চর্য এই যে, জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থ লেখার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানী থেকে দার্শনিক মনীষায় উত্তরণ ঘটে তাঁর। ধর্ম আর বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বকে অনায়াসে মুছে দিয়ে ঘোষণা করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। ঈশ্বরকে তিনি স্বীকার করেছেন এক পরমা শক্তি বলে, যে শক্তি থেকে সৌরবিশ্বের উৎপত্তি। বস্তুত স্যার জেমস জিন্স এক ব্যতিক্রমী বিজ্ঞান প্রতিভা। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে যাঁর তুলনা পাওয়া ভার।

জিন্সের বিজ্ঞান সাধনার মূল প্রেরণা ছিল মানব কল্যাণের মহান আদর্শ। এই আদর্শের রূপায়নেই আজীবন কাজ করে গেছেন তিনি। কোনও আন্তর্জাতিক সম্মান বা পুরস্কারের মোহ ছিল না তাঁর। স্বদেশের স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন। ১৯২৮ খ্রিঃ জিন্স নাইট হুডে সম্মানিত হন। ১৯৩৯ খ্রিঃ পেয়েছেন অর্ডার অব মেরিট।

রয়াল ইনসটিটিউটে অধ্যাপক পদে কর্মরত অবস্থাতেই ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৭ সেপ্টেম্বর মহাবিজ্ঞানী জেমস জিন্স-এর মৃত্যু হয়।

লিজ মিটনার

পরমাণু বিজ্ঞান গবেষণার এক বিরল প্রতিভার নাম লিজ মিটনার। তাঁর প্রতিভার দ্যুতি বিশ্ববিজ্ঞানের অঙ্গনকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করেছে।

১৮৭৮ খ্রিঃ অস্ট্রিয়ার এক ইহুদি পরিবারে মিটনারের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন ভিয়েনার প্রখ্যাত আইনজীবী।

শিশু বয়সে ছোট্ট মেয়ে মিটনারের সময় কাটতো বাবার নিজস্ব লাইব্রেরিতে নানা বিষয়ের বইপত্র ঘেঁটে।

নানা বইয়ের সান্নিধ্যে থেকে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন রচনা করতে শিখেছিলেন মিটনার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন রূপায়ণের পথ খুঁজতে থাকেন। সহজাত আকর্ষণে বিজ্ঞানকেই বেছে নেন তিনি। তাঁর মন জুড়ে স্থান করে নেন মাদাম কুরী। কুরীর মতো বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারের স্বপ্ন বুকে নিয়ে স্কুল কলেজের পড়া সাঙ্গ করে ভর্তি হন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পদার্থ বিদ্যায় সেই সময়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের স্রষ্টা নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের নাম জগৎজোড়া। তাঁর তত্ত্বাবধানে পরমাণু নিয়ে গবেষণার সঙ্কল্প নিয়ে মিটনার পদার্থ বিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সাঙ্গ করেন। বাবাকে বলে বার্লিনে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কাছে পাঠালেন আবেদনপত্র। মহাবিজ্ঞানীর সাড়া পেতেও বিলম্ব হয় না। মিটনার চলে এলন বার্লিনে। স্বপ্ন রূপায়নের প্রথম ধাপ উত্তীর্ণ হলেন মিটনার।

উনিশ শতকের শেষ পর্বে ন্যাচারল রেডিও অ্যাক্টিভিটি বা প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে চলেছে তুমুল আলোড়ন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, বিশেষ কিছু পরমাণু কেন্দ্রকে রয়েছে এমন তেজ-নিঃসরণ, যার ফলে মুহুর্মুহু সৃষ্টি হচ্ছে নানা তেজস্ক্রিয় মৌলের। এই বিষয়টি নিয়েই মিটনার আরম্ভ করলেন তাঁর গবেষণা।

পরমাণুর কেন্দ্রক থেকে নিঃসরিত তেজস্ক্রিয় মৌলের অনুসন্ধানে নেমে মিটনার সন্ধান পেলেন অ্যাক্টিনিয়াম নামের মৌলটির। যে তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে অ্যাক্টিনিয়ামের উদ্ভব তার নাম দেওয়া হল প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম।

এরপর মিটনার আরম্ভ করলেন এক জটিল গবেষণা। বিটা কণার উৎস ও প্রকৃতি নির্ণয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন তিনি। তাঁর এই গবেষণা জার্মানীর পরমাণু বিজ্ঞানীদের মধ্যেও প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করে। ফলে ফলতে থাকে পরমাণু বিজ্ঞানের নতুন নতুন ফসল।

১৯৩০ খ্রিঃ মধ্যে মিটনারের গবেষণার পথ ধরেই বিশ্ববিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে এল তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়াম।

ততদিনে ল্যাবরেটরির বাইরে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। মিটনারের সহকর্মীদের অনেকেই গবেষণা ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে লাগলেন। জার্মান পুলিশের গেস্টাপোবাহিনীর গোপন আনাগোনা মিটনারেরও চোখ এড়াল না।

জার্মানীতে তখন কাজ করছেন অসংখ্য ইহুদি বিজ্ঞানী। দেশের উন্নতির

কাজে তাঁরা আত্মনিবেদিত হলেও বিজ্ঞানী নয়, তাঁদের বড় পরিচয় ইহুদি। হিটলারের ইহুদিবিদ্বেষের বিষ-বাষ্প কাউকেই রেহাই দিচ্ছে না। হাজারে হাজারে ইহুদিকে নিয়ে জড়ো করা হচ্ছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। কুখ্যাত গ্যাস চেম্বারগুলো তখনও তেমন ভাবে চালু হয়নি।

মিটনার সব কিছুরই আভাস পাচ্ছেন। গবেষণায় আর মন বসাতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন বিপদ আর বেশি দূরে নেই।

তাঁর পরমাণু গবেষণার ফলাফলের জন্য আশা নিয়ে বসে প্রহর গুণছে কর্তৃপক্ষ। গবেষণার কাজ শেষ হলেই, তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর জীবনের মেয়াদও ফুরোবে। জার্মানীর হাজার হাজার হতভাগ্য ইহুদিদের জীবনের নির্মম পরিণতি লহমায় নেমে আসবে তাঁরও জীবনের ওপর।

গবেষণা শেষ করার জন্য ওপরওয়ালার তাগিদ আসছে ঘন ঘন। সবই বুঝতে পারেন মিটনার। কিন্তু পালাবার পথ চিন্তা করে পান না তিনি। কাউকে মনের আশঙ্কা খুলে জানাবারও উপায় নেই। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। একজন অসহায় পঞ্চাশোর্ধ ইহুদি নারীর পক্ষে এ যে কতবড় সঙ্কট সময় ভাবলেও শিহরিত হতে হয়।

মিটনারের কর্মস্থল বার্লিনের কাইজার উইনহেলম ইনসটিটিউটের প্রধান একজন খাঁটি জার্মান। নাৎসিদের গোঁড়া সমর্থক তিনি। মিটনার দিন কতকের ছুটির আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত পাঠালেন তার কাছে। কর্মক্লান্তির অবসাদ অপনোদনের জন্য দিনকতক হল্যান্ডে অবসর যাপন করার ইচ্ছা তাঁর।

নির্দোষ ছুটির আবেদন মঞ্জুর হতে দেরি হয় না। মিটনার অনতিবিলম্বে রাতের অন্ধকারে হল্যান্ডের ট্রেনে চেপে বসলেন।

হল্যান্ড পৌঁছে গোপনে সুইডেনের ভিসা জোগাড় করে রাতারাতি পাড়ি জমালেন স্টকহলম।

তাঁর এই পলায়নের খবর জার্মানিতে পৌঁছতেও বিলম্ব হয় না। কিন্তু পাখি খাঁচাছাড়া—তাদের আর কিছুই করার ছিল না।

মিটনারের জার্মানী পরিত্যাগের এই ঘটনার মধ্য দিয়েই বিশ্ব ইতিহাসের এক বিধ্বংসী অধ্যায়ের পট পরিবর্তনেব সূচনা করল।

সেদিন যদি ইহুদি নিধনে উন্মত্ত নৃশংস নাৎসি বাহিনীর শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে মিটনার পালাতে না পারতেন তাহলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত।

পরমাণু বোমা তৈরির মোক্ষম পরিকল্পনাটি মিটনারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জুগিয়েছিলেন।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র—এনরিকো ফের্মির পরমাণু

তত্ত্বের নিট ফল, তৈরি হয়েছিল মিটনারেরই প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। যুদ্ধে পর্যুদস্ত জার্মানী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

স্টকহলম থেকে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন। সেখানে মিটনারের ভাগনে প্রতিভাবান পদার্থবিজ্ঞানী অটো ফ্রিৎখ পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণা করছিলেন জগৎবিখ্যাত ডেন বিজ্ঞানী নীলস বোরের তত্ত্বাবধানে। তিনি সাগ্রহে আশ্রয় দিলেন মিটনারকে।

১৯৩৪ খ্রিঃ ইতালিয় পদার্থবিদ এনরিকো ফের্মি ইউরেনিয়াম ও মৌলকণা নিউট্রনের কৃত্রিম সংঘাত ঘটিয়ে নানা তেজস্ক্রিয় শক্তির আবিষ্কার ঘটালেন।

ল্যাবরেটরিতে ইচ্ছামতো নতুন মৌল সৃষ্টির এই অবিশ্বাস্য গবেষণায় পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করল।

অটো হ্যান ও ফ্রেডরিক স্ট্রাবসম্যান এই দুই প্রতিভাবান জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী জার্মানীর গবেষণাকেন্দ্রে ছিলেন মিটনারের সহযোগী গবেষক।

মিটনার জার্মানী ছেড়ে চলে আসার পরে তাঁরা তাঁদের গবেষণার কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। একসময় গবেষণার ফলাফল তাঁরা গোপনে পাঠিয়ে দিলেন মিটনারের কাছে।

নাৎসি সরকারের গেস্টাপো বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি চতুর্দিকে। জাতে জার্মান হয়ে হ্যান ও স্ট্রাবসম্যান এক ইহুদি মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। সেই কারণেই গোপনীয়তা অপরিহার্য ছিল।

দুই বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞানীব গবেষণার ফলাফলটি কি ছিল?

হ্যান ও স্ট্রাবসম্যান পরমাণু বিভাজনের প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ ইউরেনিয়াম মৌলকে বিশেস গতিশীল নিউট্রনের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দুই মৌলের দুটি আইসোটোপ বা সমস্থানিক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

সমস্থানিক দুটির মোট ভরের যে ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছিলেন, তাতেই ছিল অসম্পূর্ণতা। কেননা সমস্থানিক দুটির ভরের হিসাবে ইউরেনিয়ামের হিসাবের হদিশ পাওয়া গেলেও নিউট্রনের ভর ছিল অনুপস্থিত।

গবেষণার ফলাফলের ব্যাখ্যার এই অসম্পূর্ণতার উল্লেখ হ্যান ও স্ট্রাবসম্যানের চিঠিতেও ছিল। স্বভাবতঃই তা পড়ে মিটনার ভাবিত হলেন।

গোটা বিষয়টা তিনি আবার নতুন ভাবে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন।

মিটনারের পরীক্ষায় অচিরেই ধরা পড়ল এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস। তিনি দেখলেন যে ইউরেনিয়ামের বিভাজনের ফলে যে দুই মৌল সৃষ্টি হচ্ছে তা বেরিয়াম ও ক্রিপটন ছাড়া কিছু নয়।

তিনি দেখে রোমাঞ্চিত হলেন যে, ওই দুই মৌল বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণ পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে। নিউট্রনের ভরই রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে এমন অস্বাভাবিক পরিমাণের শক্তি যা হল কিনা দু'লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট।

এভাবে মিটনারের বিস্ময় উৎপাদন করে তাঁর সহ গবেষকদের গবেষণার অসম্পূর্ণ ফলাফল সম্পূর্ণতা পেল এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিজ্ঞানে রেখাপাত ঘটল সভ্যতার সবচেয়ে চমকপ্রদ ইতিহাসের।

এই অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক আবিষ্কারের মুহূর্তটিব বর্ণনা অসম্ভব। বিখ্যাত কথাকার উইলিয়াম লরেন্স আবেগময় ভাষায় এই মুহূর্তটির অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন, "She was experiencing sensations Ehat must have been akin to those of Columbus."

১৯৩৯ খ্রিঃ প্রথম মাসেই লণ্ডনের ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত নেচার পত্রিকায় মিটনারের গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হল।

এই বিবরণে মিটনার গতিশীল নিউট্রনের আঘাতের ফলে ইউরেনিয়ামের বিদারণকে উল্লেখ করলেন Fision নামে।

ইতিমধ্যে গবেষণাগারের বাইরের জগতও হয়ে উঠেছে অশান্ত। বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে বারুদের গন্ধে।

১৯৩৯ খ্রিঃ পয়লা সেপ্টেম্বর নাৎসি নায়ক হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্যে দিয়ে সূচনা করলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। ইউরোপে শুরু হয়ে গেল মৃত্যুর মিছিল।

সমগ্র বিশ্বকে আবার অস্তিত্বের সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। বিপন্ন হল মানব জাতির স্থিতি।

এই চরম মুহূর্তে মিটনারের নবতম আবিষ্কার পারমাণবিক শক্তির উৎস Fision মিত্র বাহিনীকে নতুন ভাবে উজ্জীবিত করে তুলল। বলদর্পী হিটলারের গতিরোধ করার অনিবার্য বিধানের সন্ধান নিয়ে ডেন পদার্থবিদ নীলস বোর চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বলাবাহুল্য, লিজ মিটনারের উদ্ভাবিত অস্বাভাবিক পরিমাণ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কৌশলটিই ছিল নীলস বোর-এর অমোঘ বিধান।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের তৎপরতায় তাঁর সঙ্গে আইনস্টাইন ও এনরিকো ফের্মির মতো জগৎবিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীদের গোল টেবিল বৈঠক সম্পন্ন হল রাতারাতি।

সেই বৈঠকেই আগ্রাসী জার্মান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছকে ফেলা হল।

অচিরেই গড়ে উঠল ম্যানহাটন প্রোজেক্ট। আর সেখানে শুরু হল বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমা তৈরির গোপন কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি।

তারপরের ইতিহাস অতি ভয়াবহ। লিজ মিটনারের পদার্থবিদ্যার গবেষণার ফলাফল এমনই ভয়ঙ্কর ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল যে তার ভয়াবহ রূপ পৃথিবীর মানুষকে অপরিসীম আতঙ্ক-শিহরণে স্তব্ধ করে দিল।

১৯৪৫ খ্রিঃ জুন মাসে আমেরিকার পরমাণু বোমার পর পর বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল জাপানের সমৃদ্ধ দুটি শহর—হিরোসিমা ও নাগাসাকি। আকাশ আচ্ছন্ন করে ছড়িয়ে পড়ল মারাত্মক তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি। প্রাণ হারাল হাজার হাজার অসহায় মানুষ।

যাঁরা বোমার তেজস্ক্রিয় বিকীরণে বিকলাঙ্গ, বিকৃত শরীরে এই বিস্ফোরণের স্মৃতি ধারণ করে বেঁচে রইল, নারকীয় যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে একদিন তাদেরও জীবন শেষ হল। কে জানে হয়তো দু-চারজন হতভাগ্য অন্তিম দিনের প্রতীক্ষায় এখনও বেঁচে রয়েছেন।

মানব সভ্যতার এই কলঙ্কময় ঘটনার মধ্যে দিয়ে মিটনারের ভয়ঙ্কর আবিষ্কার বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মরণ-খেলা স্তব্ধ হল।

হিরোসিমা নাগাসাকি ধ্বংসের কয়েক দিন পরেই সারা বিশ্বে প্রচারিত হল রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও মিটনারের এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ। রুজভেল্ট সেদিনই উচ্ছ্বসিত উল্লাসে মিটনারকে মাদাম কুরির সমকক্ষ প্রতিভা বলে ঘোষণা করলেন।

প্রকারান্তরে এক নরমেধ যজ্ঞের হোতা হয়েও মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রশংসা লাভ করে সেদিন নিরতিশয় লজ্জা, ঘৃণা ও হতাশায় মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছিলেন মিটনার।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রশংসার উত্তরে বেদনাভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, "Women have a great responsibility and they are obliged to try, so far they can, to prevent another war, I hope that the construction of the atom bomb not only will help to use this great energy that has been released for peaceful work."

মিটনারের পীড়িত ক্লিষ্ট মানবিকতাবোধ অকুণ্ঠিতভাবে সেদিন স্বীকার করেছিল, বিজ্ঞান ধ্বংস নয়, মানবকল্যাণেরই জন্য, তাঁর সমস্ত গবেষণাও তাই উৎসর্গীত হবে মানবকল্যাণের লক্ষ্যে।

মিটনারের বিজ্ঞানসাধনা কিন্তু তাঁকে বঞ্চিত করেনি। প্রতিভার স্বীকৃতি তিনি লাভ করেছেন। ১৯৪৫ খ্রিঃ ফের্মি পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে সম্মান জানান হল। তিনি লাভ করলেন সুইডিস বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্যপদও।

বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসে লিজ মিটনার নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ প্রতিভা। পরমাণু গবেষণায় তাঁর মানবপ্রেম চিরন্তন দীপশিখা হয়ে আগামী দিনের বিজ্ঞানকে পথ দেখাবে।

১৯৪৫ খ্রিঃ ২৭ অক্টোবর কেমব্রিজে তাঁর জীবনাবসান হয়।

আলব্রেখট ডুয়ার

জার্মানীর নুরেমবার্গ শহরে ১৪৭১ খ্রিঃ জন্ম হয় শিল্পী ডুয়ারের। তাঁর বাবা সিনিয়ার আলব্রেখট ডুয়ার এখানে একটি পুরনো বাড়িতে বাস করতেন তাঁর বৃহৎ সংসার নিয়ে।

দক্ষ স্বর্ণশিল্পী হিসেবে শহরে নামডাক ছিল তাঁর।

আঠারো জন ভাইবোনের মধ্যে ডুয়ার ছিলেন দ্বিতীয়।

একজন স্বর্ণশিল্পী হিসেবে ডুয়ারের বাবার ইচ্ছা ছিল পুত্রকেও স্বর্ণশিল্পের কাজে দক্ষ করে তুলবেন। তাই বাল্য বয়স থেকেই ডুয়ারকে বাবার সঙ্গে থেকে তাঁর কাজে সহযোগিতা করতে হত।

পড়াশুনোর প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল বালক ডুয়ারের। বাবার কাজকর্ম চুকিয়েও সময় করে তিনি বই নিয়ে বসার চেষ্টা করতেন।

ছেলের আগ্রহ দেখে বাবা একদিন তাঁকে ভর্তি করিয়ে দিলেন স্কুলে। কিন্তু মনে মনে তিনি খুশি হলেন না। ডুয়ার যখন লিখতে ও পড়তে শিখলেন তখনই তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে আসা হল। বাবা তাঁকে সোনার কাজে তালিম দিতে লাগলেন।

কিন্তু সোনার পাতের ওপর কারুকাজের চাইতে ডুয়ারের আগ্রহ বেশি কাগজের ওপর ছবি আঁকায়।

প্রকৃতির পাঠশালাতেই তাঁর ছবি আঁকার হাতেখড়ি। যখনই সময় পান, কাগজের ওপরে আপন মনে নকশা আঁকেন, প্রকৃতির কোনও দৃশ্য ফুটিয়ে তোলেন।

বলাবাহুল্য বাবা ছেলের এই ছবি আঁকার বিষয়ে কিছুই জানতে পারতেন না। গোপনে চলত এই সাধনা।

ডুয়ারের আঁকা ছবির ভক্ত হয়ে উঠেছিল তাঁরই দুই সমবয়সী বন্ধু। কাগজের ওপরে রেখার পর রেখার বিন্যাসে ডুয়ার কি করে ফুটিয়ে তোলেন নিসর্গচিত্র কিংবা কোনও প্রতিকৃতি তা ছিল তাদের কাছে তীব্র কৌতূহলের বিষয়।

বাড়ির সকলে যখন বিশ্রাম নিত, তারা তখন ডুয়ারকে নিয়ে গোপনে চলে যেত ছাদের ছোট্ট ঘরে।

কাগজ কলম রং-তুলি বিছিয়ে ডুয়ার বসে যেতেন ছবি আঁকতে।

এভাবে সময় অপচয়ের কথা বাড়ির বড়রা জানতে পেলে, বিশেষ করে বাবার নজরে পড়লে, শাস্তিভোগ অবধারিত।

হয়তো ছবি আঁকাই বন্ধ হয়ে যাবে চিরতরে। তাই তিন জনকেই থাকতে হত সজাগ সতর্ক।

ডুয়ার ছবি আঁকতেন আর তাঁর দুই বন্ধু দরজায় দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত থাকত।

এই ভাবেই ছেলেবেলায় বাবার চোখ এড়িয়ে ছবি আঁকা চলত বালক ডুয়ারের।

তাঁর এই সময়ে আঁকা অনেক ছবি বর্তমানে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।

বাবা ডুয়ারকে যে কাজের দায়িত্ব দিতেন তা যথাযথ এবং যথাসময়ে সমাধা করে রাখতেন কিশোর ডুয়ার।

সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত তাঁর শিল্পের চর্চা। নিজের কাজের প্রতি এভাবেই দিনে দিনে আস্থাবান হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি।

বন্ধুরা তাঁর ছবির মুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছিল। বন্ধুদের সন্তুষ্ট করার জন্য প্রায়ই তাঁদের বাড়ি গিয়ে চাহিদা মতো ছবি এঁকে দিয়ে আসতে হত।

ডুয়ারের শিল্প প্রতিভার প্রশংসা বন্ধুদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। একদিন তাঁর বাবার কানেও পৌঁছল। ডুয়ার আর নিজের শিল্প চর্চার কথা গোপন রাখতে পারলেন না। বাবাকে তাঁর অঙ্কন শিল্পের প্রতি আগ্রহের কথা খুলে বললেন।

ডুয়ারের স্বর্ণকার বাবা কিন্তু খুশি হলেন না। তবে ভিন্ন মাধ্যমের হলেও তিনিও ছিলেন শিল্পী। তাই ছেলেকে হতাশ করলেন না। তাঁকে ছবি আঁকা শেখার জন্য একজন শিল্পীর কাছে শিক্ষানবিস করে দিলেন।

সেইকালে নুরেমবার্গের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন মাইকেল ওলগামুথের। তামার ওপর নকশা কাজের শিল্পসৃষ্টির জন্য তিনি দেশবিখ্যাত হয়েছিলেন। এই শিল্পচর্চার প্রসারের ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল অগ্রণীর ভূমিকা।

পনেরো বছর বয়সে ১৪৮৬ খ্রিঃ ডুয়ার ওলগামুথের-এর কাছে শিক্ষানবিসের কাজ আরম্ভ করলেন।

একাগ্র নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহায়ে চার বছরের মধ্যেই তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করলেন।

ওলগামুথের-এর উচ্চপ্রশংসা ও শুভেচ্ছা নিয়ে ডুয়ার তাঁর শিক্ষানবিসের কাজ শেষ করলেন।

তখনকার দিনের প্রচলিত রীতি ছিল, শিক্ষানবিস শিল্পীদের দেশের বিভিন্ন শিল্পীর শিল্পভবনে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হত। এই পর্যটনের মাধ্যমে তাঁদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ লাভের ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হত।

শিক্ষানবিসের কাজ শেষ হলে ডুয়ারও রীতি অনুযায়ী নগরে নগরে ঘুরে শিল্পীদের ডেরায় কাজ করতে লাগলেন।

এই পর্যটনের ফলে তাঁর ঝোঁক বাড়ল প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের দিকে। শিল্পের ভাষায় যাকে বলা হয় ল্যান্ডস্‌কেপ।

ডুয়ার প্রকৃতির রূপকে যথার্থরূপে ফুটিয়ে তোলার চর্চায় নিজের চেষ্টা ও সাধনা নিয়োজিত করলেন।

এই পর্যটন-পর্বে ডুয়ার কোনমারের বিখ্যাত শিল্পী মার্টিন স্কোনগুয়ার-এর সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করেছিলেন।

চার বছরের পর্যটন শেষ হলে তিনি আবার নুরেমবার্গে ফিরে আসেন এবং প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনে মনোনিবেশ করেন।

এই সময়ে বাবার আগ্রহে ডুয়ার বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম অ্যাগনেস ফ্রে। তাঁদের এই বিবাহ সুখের হয়েছিল।

১৫০২ খ্রিঃ ডুয়ারের বাবার মৃত্যু হয়। বাবার মৃত্যুর পর তিনি বাড়িতেই স্থায়িভাবে তাঁর শিল্পসাধনার কাজ আরম্ভ করেন।

প্রকৃতির সবকিছুকেই নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার কাজে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ডুয়ার।

তাঁর পর্যবেক্ষণের অসামান্য ক্ষমতাই ডুয়ারকে এই শিল্পরীতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। বস্তুতঃ তাঁর হাতেই আধুনিক প্রতিরূপ অঙ্কনশিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

পর্যটন-পর্বে বিভিন্ন নগরের বহু শিল্পকীর্তি, ভাস্কর্য, প্রাসাদ ও দুর্গের প্রতিরূপ অঙ্কন করেছিলেন ডুয়ার।

অসাধারণ সেসব শিল্পকর্ম শিল্পরসিক ও শিল্পসমালোচক মহলের সমাদর ও প্রশংসা লাভ করেছিল।

বিবাহের পর নিজের স্টুডিওতে বসে যেসব বিখ্যাত চিত্র তিনি অঙ্কন করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল পাতলা কাপড়ের ওপরে নানারঙে আঁকা ছবি। এই শিল্পকর্মটি পরে ড্রেসডেনের চ্যাপেলের পূজাবেদির ওপরে স্থাপন করা হয়।

বুমগার্টেনের পূজাবেদির পেছনে শোভিত ছবিটিও ডুয়ারের স্বহস্তে আঁকা।

এসব ছবির মধ্যে শিক্ষানবিসদের কিছু কিছু কাজও সংযোজিত হয়েছে। তবে প্রধান কাজগুলো ডুয়ারের নিজের হাতের।

প্রতিকৃতি-চিত্রকরদের চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা সেইকালে প্রধানতঃ করতেন দেশের ধনীসম্প্রদায়। কেননা ব্যয়সাধ্য এসব চিত্রের জন্য অর্থখরচ করা সাধারণ লোকের সাধ্যে কুলোত না। তাই চিত্রশিল্পের প্রসারও ছিল সীমাবদ্ধ। দেশের শিল্পরসিক ও শিল্পবোধসম্পন্ন সাধারণ মানুষের হাতে বিখ্যাত চিত্র শিল্পগুলি পৌঁছতে পারত না।

শিল্পরসগ্রহণে আগ্রহী সাধারণ মানুষও যাতে শিল্পকর্ম উপভোগ ও ব্যবহারের সুযোগ পায় সেজন্য এই সময়ে একটি নতুন চিত্র ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। তা হল খোদাই শিল্প। এই পদ্ধতি ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করছিল।

খোদাই শিল্প এমনই এক সহজ মাধ্যম, যার দ্বারা প্রতিকৃতি, চিত্রকাহিনী বা পুরা বিবরণ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। জনশিক্ষার প্রসারেও এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। একারণে খোদাই পদ্ধতির দিকে শিল্পীদের আগ্রহ আকৃষ্ট হয় এবং কাঠের ওপর নানান বিষয়ের শিল্পমণ্ডিত রূপায়ণ ঘটতে থাকে।

ডুয়ারও খোদাই শিল্পে আকৃষ্ট হলেন এবং ১৪৯৫ খ্রিঃ থেকে এই পদ্ধতিতে কাজ করতে থাকেন।

তাঁর সহজ শিল্পদক্ষতার স্পর্শে খোদাই শিল্পে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। শিল্পকর্মের সূক্ষ্ম বিন্যাসে তিনি ক্রমে এই মাধ্যমকে উচ্চতর মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

ডুয়ারের কাঠখোদাই শিল্পকৃতি ‘অ্যাপোক্যালিপস’ শিল্পরসিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পনেরোটি কাঠখোদাই মিলিয়ে এটি গ্রথিত।

তাঁর অপর বলিষ্ঠ ও বিখ্যাত কাঠখোদাই হল ‘চার অশ্বারোহী’। সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম ও কল্পনার মিশ্রণে জাত এই কাঠখোদাইটি বিশ্বের শিল্প ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

খোদাই চিত্র মুদ্রণের ক্ষেত্রেও ডুয়ার তাঁর শিল্পপ্রতিভার প্রয়োগ ঘটিয়ে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। কেবল আলো ও আঁধারের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি ছবিতে এমন ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলেন যে ছবিতে আর রং ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

ডুয়ারের শিল্পকৃতির মূল সর্ত ছিল প্রকৃতির যথাযথ প্রকাশ। তিনি যখন নগ্নমূর্তি পর্যবেক্ষণের কাজ করেছেন, এই সর্ত তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

এক পূর্ণবয়স্কা জার্মান মহিলার মাংসল কদাকার অবয়ব তিনি রচনা করেন ১৫০৩ খ্রিঃ। মানবদেহে প্রকৃতির অপ্রতিহত প্রভাব যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় সেই প্রতিকৃতির দেহে।

‘নেমেসিস’ নামের পর্যবেক্ষণ-নির্ভর এই কাজের মধ্যদিয়ে তাঁর শিল্পীসত্তা মানবশরীর সম্পর্কে এক নতুন বোধে উত্তীর্ণ হয়। তাঁর এই অভিজ্ঞতার যথার্থ প্রকাশ ঘটে ‘অ্যাডোরেশন অব ম্যাগির’-এ।

১৫০৪ খ্রিঃ তিনি তামার ওপর সেন্ট ইউস্টেস নামে বিরাট এক খোদাই কাজ সমাপ্ত করেন।

ভেনিসে জার্মান কলোনিতে প্রতিষ্ঠিত একটি গির্জার প্রার্থনাবেদীর চিত্রমালা অঙ্কনের জন্য ডুয়ারকে আহ্বান জানানো হয় ১৫০৫ খ্রিঃ।

বর্ণবৈচিত্র্যে মণ্ডিত অপরূপ চিত্রমালার এই কাজ সম্পূর্ণ করে শিল্পী নিজেও পরিতৃপ্ত হন।

ডুয়ার ক্রমাগত খোদাইয়ের কাজে নিয়োজিত থাকায় এবং রং তুলির ব্যবহার থেকে সরে থাকার ফলে ইতিমধ্যে চিত্রসমালোচক মহলে ধারণা তৈরি হয়েছিল যে রং-বর্জিত খোদাই শিল্পেই তাঁর নৈপুণ্য সীমাবদ্ধ। বর্ণবিন্যাসের দক্ষতা তিনি অর্জন করতে পারেননি।

কিন্তু জার্মান গির্জার প্রার্থনা বেদীর চিত্রমালার বর্ণবিন্যাস সমালোচকদের সেই ধারণা নস্যাৎ করে দেয়। এই কাজের মাধ্যমে তাঁর শিল্পপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

রসজ্ঞমহলের বিবেচনায় এই চিত্রমালা চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়।

'ফিস্ট অব রোজ গারল্যাণ্ড' ও 'দি অ্যাডোরেশন অব দি ভার্জিন' নামের এই চিত্রকর্মটি ভেনিস থেকে ভিয়েনায় নিয়ে আসেন দ্বিতীয় রুডলফ।

সমগ্র ইতালিতে তখন খ্যাতির শীর্ষে ডুয়ার। সম্মান, সম্পদ, সমাদর ও সম্বর্ধনার মধ্যে ভেনিসে দুটি বছর কাটিয়ে নুরেমবার্গে ফিরে আসেন ডুয়ার।

এবারে তিনি বিখ্যাত ইতালিয় চিত্রকরদের ধারায় চিত্রাঙ্কনে মেতে ওঠেন। ১৫০৭ খ্রিঃ তিনি অঙ্কন করেন 'আদম ও ইভ'।

এই চিত্রে তাঁর নগ্ন দেহের রূপারূপ ছিল এমনই বাস্তব ও যথাযথ যে সেই সময়ের সমস্ত বাস্তবধর্মী চিত্রকরদের শিল্পসৃষ্টিকে তা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

১৫০৮ খ্রিঃ আগেই ডুয়ার ম্যাক্সনির ফ্রেডারিকের জন্য প্যানেল আঁকার কাজ শেষ করেন এবং ওই বছরে ট্রিনিটির নক্সাটিরও কাজ করেন। এই কাজ শেষ হতে তিন বছর সময় নেয়। পরের বছরেই তিনি ছোট আকারে তৈরি করেন ম্যাডোনা উইথ পিয়ার।

ভেনিসে যাবার আগে 'লাইফ অব ভার্জিন' নামে কিছু খোদাইয়ের কাজে হাত দিয়েছিলেন। কাজগুলি অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁকে ভেনিসে চলে যেতে হয়।

ভেনিস থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে অসম্পূর্ণ খোদাইয়ের কাজগুলি পুনরায় শুরু করেন।

কাঠখোদাই এবং অন্য খোদাইয়ের ২০টি কাজের মধ্যে চারটি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই কাজ শেষ হলে ১৫১১ খ্রিঃ সেটি প্রকাশিত হয়।

পরের বছরেই 'প্যাশন' পর্যায়ের ১৬টি কাজ সম্পূর্ণ করেন ডুয়ার। সবগুলোই ছিল তামা খোদাইয়ের প্লেট।

১৫১০ খ্রিঃ থেকেই ডুয়ার খোদাই শিল্প নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে তামার ওপর কাজের জন্য প্রধানত ছেনি বাটালি ইত্যাদিই ব্যবহার করা হত। সরু ছুঁচলো সূঁচের ব্যবহার হত না। ডুয়ারই এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেন।

খোদাই কাজে আরও একটি নতুন পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। তা হল, তামার প্লেটে প্রথম নাইট্রিক অ্যাসিড প্রয়োগের কাজ।

পরবর্তীকালে ডুয়ারের এই নতুন আবিষ্কার খোদাই শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে গোড়ার দিকে ডুয়ার তামার প্লেটেই কাজ করেছেন। পরে তিনি লোহার প্লেটের ওপরেও পরীক্ষা চালান এবং সফল হন।

কয়েক বছর পরে খোদাই পদ্ধতিতে ডুয়ার ছেনি-বাটালির সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ ঘটিয়ে অনেক কাজ করেন।

এই পর্বে তাঁর বিখ্যাত খোদাই কাজগুলি হল 'দি নাইট', 'মেলাঙ্কলিয়া', 'ডেথ এণ্ড ডেভিস' এবং 'সেন্ট জেরম ইন দি সেন'।

নতুন নতুন মাধ্যম প্রয়োগের কাজ করতে থাকলেও ডুয়ার তাঁর কাঠখোদাইয়ের কাজগুলোকে বিস্মৃত হননি। ১৫১১ খ্রিঃ পর্যন্ত করা তাঁর সমস্ত কাঠখোদাই কাজ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। পুস্তক মুদ্রণের জন্য তিনি বাড়িতেই একটি মুদ্রণ যন্ত্র বসিয়েছিলেন।

'গ্রেট প্যাশন'-এর ১২টি খোদাই, 'লিটল প্যাশনের' ৩৭টি খোদাই-এর কাজ তাঁর বইতে স্থান পেয়েছিল।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই চিত্রাবলী সমাদৃত হয়।

১৫১২ খ্রিঃ ডুয়ারের শিল্পীজীবনের এক উল্লেখযোগ্য পর্ব। এই সময়ে তাঁর আহ্বান আসে সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়নের দরবার থেকে। তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় 'ট্রাম্প অব ম্যাক্সিমিলিয়ন' বইটি চিত্রায়িত করার।

৯২টি আলাদা আলাদা প্লেটে কাজটি করেন ডুয়ার। সব মিলিয়ে বিরাট এক পূর্ণাঙ্গ কাঠখোদাইয়ের কাজ।

সবকটি প্লেট একত্রিত করলে তার পরিমাপ হয় ১০ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু এবং ৯ ফুট চওড়া।

এই বিশাল কাজটি তিনি চার বছরে সম্পূর্ণ করেন। বইয়ের চারপ্রান্ত সূক্ষ্ম রেখায় চিত্রিত করা হয়। অনবদ্য এই কাজটি ডুয়ারের শিল্পদক্ষতার এক অনন্য নিদর্শন।

শিল্পীসত্তার সৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্মরেখার সুচারু বিন্যাস মিলিতভাবে যে কী মোহময় রূপ-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে পারে এই কাজটি তার প্রকৃষ্ট নির্দশন।

একই সময়ে ডুয়ার করেছেন নুরেমবার্গের সরকারি ভবনগুলির দেওয়াল চিত্রের নক্সার কাজ এবং কিছু ধর্মীয় চিত্রাবলীর পোর্ট্রেট।

১৫২০ খ্রিঃ নুরেমবার্গে আকস্মিকভাবে প্লেগের প্রকোপ দেখা দেয়। রোগের আতঙ্কে লোকে সহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এই সময় ডুয়ারও স্ত্রী এবং এক পরিচারিকাকে নিয়ে নেদারল্যান্ডি সফরে বেরিয়ে পড়েন।

এই সময়ে তিনি যেখানে গেছেন পেয়েছেন বিপুল সম্বর্ধনা ও সম্মান।

আশ্চেনে সম্রাট পঞ্চম চার্লসের অভিষেক উৎসবেও তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পরে সেখানে তিনি সম্রাটের দরবারের রাজচিত্রকর পদে নিযুক্ত হন।

১৫২১ খ্রিঃ ভ্রমণপর্ব শেষ করে নুরেমবার্গে ফিরে আসেন ডুয়ার এবং বিরাট পরিমাপের একটি ধর্মীয় চিত্রাবলী অঙ্কনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পরিকল্পনা মতো কাজও শুরু করেন। কিন্তু চিত্রের স্কেচ তৈরির কাজ চলা অবস্থাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

তারপর আর সুস্থ হয়ে এই অসম্পূর্ণ কাজে হাত দেবার সুযোগ পাননি ডুয়ার। তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর যে স্কেচগুলি পাওয়া যায় তা থেকে যে বিরাট কাজটির পরিকল্পনা ধরা পড়ে নিঃসন্দেহে তা বিস্ময়কর। এই সঙ্গে আরও এমন সব খসড়া পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যায়, খোদাই কাজের বিভিন্ন তত্ত্ব, দুর্গনির্মাণবিদ্যা, অনুপাত ও জ্যামিতি বিষয়ে বই লেখারও পরিকল্পনা ছিল । চিত্রাঙ্কন বিষয়ে একটি কোষগ্রন্থ রচনার প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন তিনি। রূপায়নের সময় আর তিনি পাননি।

ভ্রমণ থেকে অসুস্থতা নিয়েই ফিরেছিলেন ডুয়ার। নেদারল্যাণ্ডে একবার জ্বরে পড়েছিলেন। তারপর থেকেই জ্বরজারি লেগে ছিল। অসুস্থ অবস্থাতেও সেই বয়সের কিছু আত্মপ্রতিকৃতি তিনি এঁকেছিলেন।

এর মধ্যে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থার একটি রঙিন চিত্র আছে। চিত্রে বামদিকে একটি হলুদ দাগের দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, দেখানো হয়েছে। খুব স্বাস্থ্যবান কোনও কালেই ছিলেন না ডুয়ার। কিন্তু সুদর্শন পুরুষ ছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি যে যথেষ্টই সচেতন ছিলেন তা তাঁর প্রতিকৃতি চিত্র থেকেই বোঝা যায়।

একটি প্রতিমূর্তিতে কৃশকায় ডুয়ারের শরীর যেন কাঁধ থেকে বেঁকে রয়েছে। চুল দাড়ি হাল্কা, দুঃস্থের মতো চেহারা তাঁর।

অজস্র কাজের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে অকস্মাৎ ১৫২৮ খ্রিঃ প্রকৃতিপ্রেমিক শিল্পী ডুয়ার মারা যান।

বার্নার্ড প্যালিসি

াপী নিরন্তর কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সাফল্যের জয়তিলক লাভ করা এক জগৎ-বরেণ্য পুরুষ বার্নার্ড প্যালিসি। পর্বতপ্রমাণ বাধা, দুস্তর প্রতিকূলতা ও নৈরাশ্য তাঁকে কখনও নিরস্ত করতে পারেনি। চলার পথে তিনি ছিলেন অদম্য, দুর্বার পথিক।

প্রকৃতপক্ষে কোনও বিজ্ঞানী বা আবিষ্কর্তা নন প্যালিসি। কিন্তু এনামেল করার বিদ্যাকে জনমুখী করার সাধনায় তাঁর অবদান আজও বিশ্বের সর্বপ্রান্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

প্যালিসি যে সময়ে ফ্রান্সে জন্মেছিলেন তখন ইউরোপে, ইটালি, জার্মানীতে এনামেল করার কাজ প্রচলিত ছিল। মুষ্টিমেয় লোকই এই বিদ্যা জানতেন। কিন্তু তাঁরা সে বিদ্যা কাউকেই শেখাতেন না।

কে কি জিনিস ব্যবহার করেন, কিভাবে এ কাজ করতেন, এই মন্ত্রগুপ্তি নিজেদের মধ্যেই তাঁরা গোপন রাখতেন। কোনও শিক্ষার্থীকে জানানো তো দূরের কথা।

প্যালিসির জীবনের অসাধারণত্ব এই যে তিনি নিজের চেষ্টায় সংগুপ্তরাখা এনামেল করার বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর এই সাফল্যের সংগ্রাম-কাহিনীই তাঁর জীবনকে মহত্ত্ব দান করেছে।

প্যালিসির সঠিক জন্মতারিখ জানা যায় না। অনুমান করা হয় ১৫০৯ বা ১৫১০ খ্রিঃ কাছাকাছি কোনও সময়ে ফ্রান্সের পেরিগো প্রদেশে এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়।

তাঁর জন্মের সময় পরিবারটির বংশমর্যাদার কিছুটা অবশেষ থাকলেও সেই মর্যাদা রক্ষা করার মতো বিত্ত-ঐশ্বর্য কিছুই ছিল না।

ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে প্রবল ঝোঁক ছিল প্যালিসির। পরে এই কাজকেই তিনি জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন।

সেই সময়ে ফ্রান্সে কাচের ওপরে আঁকা রঙিন ছবি ধনীগৃহে খুবই আদৃত ছিল। তার জন্য শিল্পীরা ভাল দক্ষিণা পেতেন।

অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে প্যালিসি এই কাজ শিখলেন এবং কাজ পাবার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ঘুরতে লাগলেন।

কাচের ওপর রঙীন ছবির কাজ এতই খরচ সাপেক্ষ-ছিল যে ধনীব্যক্তি ছাড়া কেউ বড় একটা করাতেন না। সেই জন্য শিল্পীদের নগরে নগরে ধনীগৃহে ঘুরে বেড়াতে হত।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে প্যালিসি কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। এক শহর থেকে আর এক শহরে পথ চলা। কোথাও কোনও কাজ জুটলো তো সেখানে দিন কতকের জন্য থাকা। কাজ শেষ হলে আবার নতুন কাজের সন্ধানে পথ চলা।

এই চলার পথে প্যালিসির শিল্পীমনের একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছিল বহিঃপ্রকৃতি। নিবিড়ভাবে তিনি এসময়ে প্রকৃতিকে তার সমস্ত রূপ রস সৌন্দর্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান।

এভাবে উদরান্নের সংস্থানের জন্য একটি করে বছর গত হয়েছে, আর প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়তর হয়েছে প্যালিসির আন্তর সম্পর্ক। এভাবে ফল-ফুল, পাতা-লতা, পশু-পাখি সকলের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় লাভ করেছেন তিনি।

প্রকৃতির আকাশে বাতাসে, গাছপালা, তৃণ-গুল্মে যে সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, প্যালিসি নিজের ধমনীতে তার অনুরণন অনুভব করতে পারতেন।

এভাবে প্রকৃতি সম্বন্ধে রীতিমত বিশেষজ্ঞের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন প্যালিসি। তিনি হয়ে উঠেছিলেন ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতিবিদ।

প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে যে বিদ্যা তিনি অর্জন করেছিলেন, তা পুঁথিঘাঁটা বিদ্যার চাইতেও ছিল গভীর ও ব্যাপক। তাই সেইকালে ফ্রান্সের বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে দেখা যেত, প্যালিসির কুটিরের দুয়ারে। তাঁরা আসতেন তাঁর কথা শোনার জন্য।

যাইহোক, কাজের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ক্রমে বারোটি বছর গত হল। এই সময়টা কোনরকমে গুজরান হয়েছে তাঁর। তাই এই দুঃসহ যাযাবর জীবনের অবসান চাইছিলেন তিনি।

একযুগ পরে ফিরে এসে স্যাঁতে শহরে একটা বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন।

এই সময়ে বিয়ে করে সংসার পাতলেন। আশা ছিল, কাচের ওপর রঙিন ছবি আঁকার কাজ করে সংসারে সচ্ছলতা আনবেন। কিন্তু কয়েক বছরের চেষ্টাতেও তা সম্ভব না হওয়ায় চিন্তায় পড়লেন প্যালিসি।

ততদিনে সংসার বড় হয়েছে। আরও দু'জন সদস্য বেড়েছে। নিজেদের ভরণ-পোষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছেলেমেয়ের চিন্তা।

কেবল ছবি আঁকার কাজ করে যে সংসারের অনটন দূর করা যাবে না হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন প্যালিসি। কিন্তু জীবিকার্জনের অন্য কোনও পথ তো তাঁর জানা নেই।

এই সময়ে একদিন প্যালিসির হাতে পড়ল এনামেল করা একটা মাটির পাত্র। ঝকঝকে পাত্রটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন তিনি।

তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল, এমন এনামেলের কাজ করতে পারলে অতি সহজেই অনেক দ্রব্য শিল্প মণ্ডিত করে তোলা যায়।

কিন্তু মুশকিল হল, এনামেল তৈরি করার রহস্য তো তাঁর অজানা। এ কাজ শেখা যায় কোথায়?

প্যালিসি স্থির করলেন, যে করেই হোক এনামেল তৈরি করার কাজ তাঁকে জানতেই হবে।

আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে, ইউরোপে রসায়ন বিজ্ঞান বলে কিছু ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী প্রতিভার সাহায্যে যাঁরা যেটুকু জানতে পারতেন, তা সংগুপ্ত রাখতেন।

জার্মানী ও ইতালিতে কয়েকজন কারিগর এনামেলের কাজ জানতেন। কিন্তু সেই বিদ্যার গোপন রহস্য তাঁরা কাউকে প্রকাশ করতেন না। সেই বিদ্যা ভাঙ্গিয়েই তাঁরা জীবিকার্জন করতেন।

ধনী জমিদার বা রাজরাজড়া ভিন্ন ব্যয়সাধ্য এনামেলের কাজ করাবার সাধ্য কারও হত না। চড়ামূল্যে সেকাজ ওই মুষ্টিমেয় কারিগরদের দিয়েই করাতে হত।

কিছুই অজানা ছিল না প্যালিসির। তাই তিনি ভাবলেন, শিল্পী হিসেবে নানা দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর যেটুকু ধারণা রয়েছে তার দ্বারাই তিনি এনামেল তৈরির পদ্ধতি অবিষ্কারের চেষ্টা করবেন। চেষ্টায় কি না হয়!

আর একবার এই সন্ধান পেয়ে গেলে অসাধারণ সব কাজ তিনি এনামেলের ওপর করতে পারবেন। ইউরোপের রাজরাজড়ার প্রাসাদে সেইসব শিল্পকাজ সমাদৃত হবে, সাদরে স্থান পাবে।

দেশে দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের মুখে মুখে ফিরবে তাঁর অক্ষয় কীর্তির কথা—স্বপ্ন দেখতেন প্যালিসি।

প্যালিসির ছবি আঁকার কাজ পড়ে রইল অবহেলায়। তিনি মেতে উঠলেন এনামেল তৈরি করার কাজে।

নানান দ্রব্যের সংমিশ্রণে এমন জিনিস তাঁকে তৈরি করতে হবে যা আগুনে পোড়ালে শক্ত সাদা আর ঝকঝকে হয়ে উঠবে। জলে ধুলে, তাপ লাগলে কখনো উঠে যাবে না বা নষ্ট হবে না।

নিজের ধারণা মতো বহু প্রকারের জিনিস কিনে আনলের প্যালিসি। সেসব ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আগুনের আঁচে গরম করলেন। রাশিকৃত মাটির পাত্র ভেঙ্গে ভেঙ্গে জড়ো করলেন এক জায়গায়। এরপর এক একটি

মশলা আগুনের আঁচে তৈরি হয় আর তার প্রত্যেকটা দিয়ে মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোর ওপরে পরীক্ষা চলে।

এ যেন কোনও অন্ধের অন্ধকারে পথের সন্ধান হাতড়ে বেড়ানোর মতো। অসম্ভবকে সম্ভব করার দুঃসাধ্য প্রয়াস।

চিত্রকর প্যালিসি নিজের খেয়ালে, প্রকৃতির বুকে ঘুরে ঘুরে অদৃশ্য শিল্পীর বিস্ময়কর সৃষ্টিরহস্য দেখে বেড়িয়েছেন। এবারে তিনি হলেন একজন আবিষ্কারক —বৈজ্ঞানিক। যাঁকে নিজে হাতেকলমে অনুশীলন করে তথ্য আবিষ্কার করতে হবে।

অসংখ্য জানা অজানা দ্রব্যের দ্রব থেকে তাঁকে আসল বস্তুটি খুঁজে বার করতে হবে।

বড় দুঃসাধ্য সুকঠিন এ কার্জ। একবার কোথাও সামান্য ভুল হলে ফের গোড়া থেকে নতুন করে শুরু করত হবে। শ্রম ও অর্থের অপচয়ের এক নিষ্ঠুর খেলা যেন।

প্যালিসি এসব কাজে একেবারেই আনকোরা মানুষ। তাই গোড়া থেকেই সামান্য সামান্য ব্যাপারেও এমন ভুল হতে লাগল যে তা সংশোধন করার জন্য একই কাজ দুবার তিনবার করে করতে হতে লাগল।

কিন্তু হা হতোহস্মি! পরীক্ষার পর দেখা গেল যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তা পাওয়া গেল না।

প্যালিসি নিজেই তাঁর গোড়ার দিককার কাজের কথা লিখেছেন, "প্রথম প্রথম ভুল হত বড় বেশি বেশি। মশলা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন কড়াতে। তা থেকে নিয়ে বিভিন্ন পাত্রের গায়ে লাগিয়ে আগুনে পোড়াতে দিতাম। কিন্তু কোন কড়া থেকে কোন মশলা কোন পাত্রে দিয়েছি সে-কথাই মনে থাকত না।

আবার পাত্রগুলো আগুনে দেবার কথাও অনেকসময় খেয়াল থাকত না। ফল হত, সব ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে মশলা তৈরি করতে বসতে হত। এমনি করে সারাদিন ভর, উনুন ভাঙ্গছি আর গড়ছি।

তার সঙ্গে রয়েছে মশলা গুঁড়ো করা। একটার পর একটা গুঁড়ো করতে হচ্ছে। এটার সঙ্গে ওটা, আন্দাজে আন্দাজে মিশিয়ে গলিয়ে মাটির পাত্রের গায়ে পরীক্ষা করছি.....।"

এমন বিনা লাভের কাজ কত দিন করে যাওয়া সম্ভব একজন ছা-পোষা সামান্য চিত্রকরের পক্ষে?

নিজের খেয়ালের আর খেসারতের কড়ি গুণতে গুণতে অবস্থা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকল একসময়। তাঁর নিজের কথায় "একসময় দেখি একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।"

প্যালিসির কাজটা সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রীর কোনই ধারণা ছিল না। এতসব

সাজসরঞ্জাম নিয়ে স্বামীকে এমন কর্মব্যস্ত দেখে প্রথম প্রথম তাঁর ধারণা হয়েছিল, প্যালিসি এমন মূল্যবান কিছু তৈরি করবেন যা থেকে তাঁদের দৈনন্দিনের অভাব অনটন মিটবে।

পুত্র-কন্যাদের নিয়ে তাঁরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারবেন। তাঁদের দুঃসহ অভাব ঘুচবে। সেই আশায় আশায় তিনি স্বামীর কথামতোই অসহনীয় অভাবের কামড় সয়ে ধৈর্য ধরে ছিলেন।

স্বামী ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনের অর্থ দিয়ে তাঁর কড়ায় গরম করার উনুনের জন্য কাঠ কিনে আনছেন, নিজেরা কখনও অর্ধভুক্ত, কখনও অভুক্ত থাকছেন।—ভবিষ্যতের সুখের আশায় বুক বেঁধে সব সয়ে থেকেছেন তিনি।

কিন্তু এ ভাবে কতদিন সইবেন? দিন মাস বছর করে সময় গড়িয়েই চলে। বছরের পর বছর অবিরাম চলেছে প্যালিসির কাজ। একদিনের জন্যও বিচ্ছেদ নেই।

উনুনের পর উনুন জ্বলছে, জিনিসের পর জিনিস গুঁড়োচ্ছেন, মেশাচ্ছেন, মাটির পাত্র টেনে টেনে পরখ করছেন।

সবই চলেছে ঠিকঠাক কিন্তু অসহায় শিশুগুলির মুখে খাবার উঠছে না। তাদের খাবারের টাকায় কাঠ কেনা হচেছ। মার মনে কত সয়?

এদিকে একদিন কাঠ কেনার রসদও ফুরিয়ে যায়। তখন প্যালিসি ছ মাইল দূরের এক কুমোর বাড়ির সঙ্গে গিয়ে রফা করলেন।

তাদের কাজের ফাঁকে উনুন তিনি ব্যবহার করবেন। বিনিময়ে সামান্য অর্থ তাদের তিনি দেবেন।

ঘরের সামান্য জিনিসপত্র একে একে বন্ধক দিতে শুরু করলেন। সেই অর্থ দিয়ে একসঙ্গে তিনশো চারশো পাত্র তৈরি করে কুমোরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে লাগলেন।

বোঝা পাঠিয়েই যদি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন তো হত। সারারাত তাঁর কাটে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায়।

ভাবেন, সকালে উঠেই হয়তো দেখবেন একটা পাত্রের গায়ে চকচক করছে সাদা শক্ত এনামেল।

আশায়-আশঙ্কায় রাত কাটে। কিন্তু সকালে কুমোর বাড়ি গিয়ে দেখেন, রোজকার রুটিনের কোন নড়চড় হয়নি। এনামেল ধরা পড়েনি কোনও পাত্রের গায়ে।

এনামেল খুঁজতে বসে সংসার একেবারে বেহাল হয়ে পড়ল। তাই এবারে বাধ্য হয়ে প্যালিসি কিছুদিনের জন্য তাঁর এনামেল তৈরির কাজ বন্ধ রাখলেন। হাত দিলেন ছবি আঁকার কাজে।

সংসার আবার সচল হল। কিছুদিনের মধ্যে সামান্য অর্থও সঞ্চয় হল।

অমনি আবার পড়লেন উনুন, কাঠ আর ফুটন্ত কড়াই নিয়ে। আবার তাঁর দিনরাত কেড়ে নেয় এনামেল।

বছরের পর বছর ব্যর্থ হয়ে হয়ে একসময় প্যালিসির ধারণা হল, তাঁর উনুনে তিনি যথেষ্ট উত্তাপ তৈরি করতে পারছেন না। নতুন করে পোড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আবার নতুন করে নানা রকম মশলা কেনা হল। তিন ডজন মাটির পাত্র কিনে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে তাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তৈরি মশলা মাখিয়ে নেওয়া হল।

এবারে সেগুলো পোড়াবার জন্য নিয়ে গেলেন এক কাচওয়ালার কাছে। কেননা কাচওয়ালাদের উনুন চড়া আঁচের।

প্যালিসি এবারে আশায় আশায় থাকেন। এতদিনে নিশ্চয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে চলেছে।

কাচওয়ালার বাড়ি থেকে পাত্রগুলো ফিরে এলে দেখা গেল দু'একটার গায়ে ছিটেফোঁটা সাদা শক্তমতন কি লেগে আছে।

এনামেল?

হাঁ, তাই বটে।

সবটা না হোক ছিঁটেফোঁটা তো ধরা দিয়েছে। তাতেই উল্লসিত প্যালিসি। স্ত্রীকে জানালেন, দুঃখের দিনের শেষ হতে চলেছে। আর বেশিদিন কষ্ট করতে হবে না।

ইতিমধ্যে দুটি সন্তান অসুখে মারা গেছে। উপযুক্ত ওষুধ পথ্য জোগান দেওয়া যায়নি অর্থের অভাবে। তবুও কোনও বিকার নেই মানুষটার।

স্ত্রী দেখেন আর আগামী দিনের আরও ভয়াবহ অবস্থার কথা চিন্তা করে নীরবে চোখের জল ফেলেন।

মানুষটা এনামেল এনামেল করে শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে গেল কিনা বুঝতে পারেন না।

এদিকে কাচওয়ালার বাড়ি থেকে সামান্য আশার ইঙ্গিত পাবার পর প্যালিসি এতই উতলা হয়ে উঠেছেন যে তাঁর দিন সেখানেই কাটতে লাগল। কাচওয়ালার উনুনের ধার থেকে নড়েন না।

এমনি করে আরও একবছর কাটল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

তাঁর এই সর্বনাশা পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য স্ত্রী এবারে কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন। ঘরে খাদ্যের অভাবে দিন দিন কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর কথা না বলাই ভাল।

নির্বিকার প্যালিসি উতলা স্ত্রীকে শান্ত করে আশ্বাস দেন, এই সর্বশেষ, একবার মাত্র চেষ্টা করেই বন্ধ করবেন এনামেল খোঁজা।

এই শেষ বার!

ঘরে বিক্রি করার বা বন্ধক দেবার কিছু অবশিষ্ট নেই। ধারই বা কে দেবে? সেই অবস্থাতেই মরিয়া হয়ে প্যালিসি অনেক কষ্টে কিছু টাকা ধার করে তিনশো রকমের বিভিন্ন মশলা তৈরি করলেন। মাটির পাত্রের গায়ে মাখানো হল সেই মশলা।

এরপর সেই পাত্রগুলো নিয়ে প্যালিসি উপস্থিত হলেন কাচওয়ালার বাড়ি। জ্বলন্ত উনুনের ধারে বসে নিজ হাতে এক এক করে তিনশো পাত্র উনুনের আঁচে পুড়িয়ে চললেন।

আহার নিদ্রা ভুলে, একটা একটা করে পাত্র আগুন থেকে তোলেন, ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকেন।

তারপর পরীক্ষা করে দেখেন মশলা গলে সাদা চকচকে কিছু পাত্রর গায়ে লেগেছে কিনা।

এভাবেই কাটতে লাগল সময়।

হঠাৎ একসময় প্যালিসি দেখেন একটা পাত্রের পুরো মশলা গলে গেছে। পাত্র ঠাণ্ডা হতে দেখা গেল সম্পূর্ণ মশলা পাত্রের গায়ে শক্ত হয়ে লেগে রয়েছে! সাদা চকচক করছে সমস্ত পাত্রটা।

আনন্দে উত্তেজনায় চিৎকার করার শক্তি আর ছিল না শরীরে। দীর্ঘ তপস্যার ফল ফলতে চলেছে। সাফল্যের এই আনন্দ সংবাদ নিয়ে তিনি পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলেন।

সাগ্রহে স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন, এত দিনে আমাদের সকল দুঃখকষ্টের অবসান হল। আর ভয় নেই।

কাচওয়ালার উনুনে নিয়ে যাবার মতো টাকা আর ছিল না। তাই এবারে প্যালিসিকে বাড়িতেই উনুনের ব্যবস্থা করতে হল।

উনুন তৈরির জন্য ইট নিজে মাথায় করে বয়ে নিয়ে এলেন গ্রামের প্রান্তে এক ইটখোলা থেকে। বাড়ির একধারে তৈরি করলেন এক বড়সর উনুন।

উনুন তো হল। কিন্তু এই উনুনে উপযুক্ত আঁচ তৈরি করার জন্য যে চাই প্রচুর কাঠ। এত কাঠ কেনার পয়সা পাবেন কোথায়? উন্মাদকে যে আর ধার কেউ দিতে চায় না।

চেনাজানা বহু মানুষের হাতেপায়ে ধরে বহু কষ্টে তবু কিছু ধার জোগাড় করলেন প্যালিসি। তা দিয়ে জ্বালালেন উনুন। চলল একইভাবে পাত্র আর মশলার পরীক্ষা।

এক এক করে দিন বয়ে চলে। চলে ধৈর্যের পরীক্ষা কিন্তু মশলা যে আর গলে না।

প্যালিসির সন্দেহ হয়, ঠিক ঠিক আঁচ তৈরি হচ্ছে না, আরও বেশি কাঠের দরকার। আগুনে জোর না হলে আঁচ উঠবে কেমন করে?

কিন্তু কাঠ!

প্যালিসি যেন এবারে উন্মাদ হয়ে গেলেন। কাঠের অভাবে তিনি ঘরের দরজা জানালা, আসবাবপত্র ভেঙ্গে উনুনে ফেলতে লাগলেন।

উন্মাদকে কে সামলাবে? স্ত্রী কাছে এসে বাধা দেবেন, ভয়ে সেই সাহস পান না। শেষে তিনি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে প্রতিবেশীদের ডেকে নিয়ে এলেন।

গ্রামের লোকজন জড়ো হল। সকলে মিলে প্যালিসিকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। প্যালিসি নীরবে সকলের উপহাস শোনেন। কোনও প্রতিবাদ করেন না। কেবল তাকিয়ে থাকেন উনুনের দিকে। আঁচ কমে যায় কিনা।

প্যালিসিকে বাধা দেয় কার সাধ্য! তিনি উনুনের আগুন নিভতে দেন না। দরজা জানালা শেষ হলে, বিছানা মাদুর যা হাতের কাছে পান তাই পোড়াতে থাকেন।

দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রমে আর মানসিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কঙ্কালসার হয়েছে শরীর। কতদিন ছেলেমেয়েদের মুখ দেখতে পান না। তাদের খবরাখবর নেবার কথাই ভুলে গেছেন।

সবই ভুলে আছেন তিনি এক এনামেল নিয়ে। এনামেল তাঁকে যে পেতে হবে।

কঠোরতপা মহামনীষীদের সাধনা বুঝি এমনই হয়। নিজে তাঁরা সর্বস্ব নিংড়ে দিয়ে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হয়ে যান। তাঁদের সাধনার ধন ভোগ করে পৃথিবীর মানুষ।

সর্বশেষে প্যালিসির দীর্ঘ ষোল বছরের কঠোর সাধনার ফল ফলল। সার্থক হয় তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষা।

শিল্পী প্যালিসির হাতে এনামেল যেন ফুল ফোটাতে লাগল। অপূর্ব সেই কারুকাজের প্রশংসা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তেও দেরি হয় না।

ধনী, জমিদারদের কাছ থেকে আসতে লাগল কাজের বরাত। রাজারা তাদের প্রাসাদসজ্জার জন্য তাঁকে সাদরে ডেকে নিয়ে যেতে লাগলেন।

দেশ-বিদেশের জ্ঞানী, বিজ্ঞানীর সমাদরও অভিষিক্ত করল শিল্পীসাধক প্যালিসিকে। তাঁরা বিজ্ঞানের কথা, জ্ঞানের কথা শোনার জন্য ভিড় করতে লাগলেন তাঁর দরজায়।

নিঃস্ব রিক্ত প্যালিসি পেলেন যশ, খ্যাতি, সম্মান, অর্থ।

দীর্ঘ আয়ুলাভ করেছিলেন প্যালিসি। ফ্রান্সের সিংহাসনে তিনি একে একে প্রথম ফ্রান্সিস, দ্বিতীয় হেনরী, নবম চার্লসকে বসতে দেখেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই মান মর্যাদা সমাদর পেয়েছেন তিনি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সাধারণতঃ ভাষাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক রূপেই তাঁর পরিচিতি ব্যাপক। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল বিচিত্রগামী ও বিস্ময়কর।

শহীদুল্লাহ জ্ঞানানুশীলনকেই তাঁর জীবনের পবিত্রতম ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উক্ত হয়েছিলেন জ্ঞানবৃক্ষ অভিধায়। তাঁর অধ্যাত্মমনীষা, বিজ্ঞানমনস্ক উদার চেতনা তাঁকে করে তুলেছিল জ্ঞান প্রেম ও শক্তির সংহত প্রতিরূপ।

জ্ঞানতাপস শহীদুল্লাহ্র পৈতৃক বাসভূমি ছিল পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মুনশী মফিজউল্লাহ। মাতা হুরুন্নেসা।

গ্রামের সম্ভ্রান্ত এই মুনশী পরিবারে ১৮৮৫ খ্রিঃ ১০ জুলাই শহীদুল্লাহ্র জন্ম। নাম রাখার অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ আকিকার সময় নবজাতকের নাম রাখা হয় মুহম্মদ ইব্রাহিম।

কিন্তু নামটি মাতার মনোমতো না হওয়ায় তিনি পুত্রের নতুন নামকরণ করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই নাম বদলের সূত্রপাত। এই ধারা ভবিষ্যতেও তাঁকে নতুন নতুন নামকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিশেষিত করেছে।

সুদর্শন গৌরবর্ণ বালক শহীদুল্লাহ্ পল্লীপ্রকৃতির উদার অঙ্গনে হেসে খেলে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁর স্বভাব এমনি মধুর মন-কাড়া ছিল যে গাঁয়ের মানুষ তাঁকে ভাল না বেসে পারত না। তাঁরা ভালবেসে শহীদের নাম দিয়েছিল সদানন্দ।

বিদ্যাশিক্ষার সময় হলে পিতা মফিজউল্লাহ শহীদকে ভর্তি করিয়ে দেন স্থানীয় পাঠশালায়। পড়াশুনায় তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। অল্পদিনেই ক্লাশের সেরা ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁকে ভালবেসে স্কুলের পণ্ডিতমশাই শহীদকে ডাকতেন সিরাজদৌল্লাহ নামে।

উত্তরকালে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সারস্বত অঙ্গনে প্রসারিত হল, শ্রদ্ধাপ্লুত মুগ্ধ সুধীজন তাঁকে অভিষিক্ত করলেন, 'চলন্ত জ্ঞান বৃক্ষ' অভিধায়।

পেয়ারাগ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ হলে শহীদ ভর্তি হন মধ্য ইংরাজি স্কুলে। তারপর ১৮৯৯ খ্রিঃ চলে আসেন হাওড়া জেলা স্কুলে।

সেই সময়ে স্কুলে বাংলা ও ইংরাজির সঙ্গে একটি অতিরিক্ত ভাষাও শিক্ষার্থীদের শিখতে হত। শহীদ তৃতীয় ভাষা হিসাবে বেছে নিলেন সংস্কৃত।

তাঁর বাড়ির পরিবেশ ও মানসগঠন ছিল শিক্ষার আলোকে আলোকিত। এই উদার ও মননশীল পারিবারিক পরিমণ্ডলের প্রভাব শহীদকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মুনশী মফিজউল্লাহ সেইকালের দিনে চার-পাঁচটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। পিতার উৎসাহে বাল্য বয়স থেকেই শহীদ আরবি, ফারসি, ওড়িয়া ও হিন্দি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

পিতার কাছ থেকে লাভ করা নতুন নতুন ভাষা শিক্ষার প্রেরণা সেই বাল্য বয়সেই শহীদের মধ্যে উপ্ত করে দিয়েছিল জ্ঞানের উৎস সন্ধানের দুর্মর চেতনা।

সহজাত আকর্ষণেই স্কুলপড়ুয়া শহীদ নানাস্থান থেকে বইপত্র জোগাড় করে শিখতে আরম্ভ করলেন তামিল, গ্রীক, লাতিন বর্ণমালাও।

জ্ঞানতীর্থের অভিযাত্রী-জীবনের এভাবেই হল যাত্রা শুরু। যে যাত্রার পরিসমাপ্তি হয়েছে বিশ্বের যাবতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মিল-অমিল-বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য নিরূপণের নিরলস চেষ্টায়। তাঁর জীবনচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল আগ্রহ, নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রম।

শহীদুল্লাহ এন্ট্রান্স পাশ করেন ১৯০৪ খ্রিঃ। এরপর ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে এফ. এ. পাস করে ১৯১০ খ্রিঃ সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ স্নাতক হন।

১৯১০ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়। শহীদুল্লাহ হন এই বিভাগের সর্বপ্রথম ছাত্র। সর্বপ্রথম এবং একমাত্র ছাত্র। ১৯১২ খ্রিঃ তিনি এম. এ পাস করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তীক্ষ্ণধী তরুণ শহীদকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনিই তাঁকে জার্মানিতে গিয়ে সংস্কৃতে উচ্চতর গবেষণা করার সুযোগ করে দিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য শহীদের জার্মানী যাওয়া হল না। বাধ্য হয়ে তাঁকে কলকাতার এক মুসলিম এতিমখানার ম্যানেজারের চাকরি নিতে হল।

এই চাকরি করাকালীনই তিনি পড়াশুনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৪ খ্রিঃ আইন পাশ করলেন।

পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকেই বরাবর আদর্শ মনে করতেন শহীদুল্লাহ। তাই তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন আরম্ভ হয় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে।

কিন্তু চাকরি থেকে যে মাইনে পেতেন তাতে তাঁর পরিবারের আর্থিক

প্রয়োজন মিটত না। বাধ্য হয়ে একবছরের মাথায়ই চাকরি ছেড়ে তিনি বসিরহাট চলে আসেন এবং বসিরহাট কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন।

ভাষা ও সাহিত্যের রূপ, রস, রহস্য উদঘাটনের সহজাত প্রেরণা যাঁর মধ্যে সদাজাগ্রত, ভাগ্যের পরিহাসে অর্থের প্রয়োজনে তিনি এলেন আইনব্যবসার মতো জটিল ও কুটিল এক পেশায়।

কিন্তু জ্ঞানপিপাসু শহীদুল্লার সারস্বত সাধনার বিরাম ছিল না। পেশা তাঁর জ্ঞানচর্চার বিঘ্ন হয়ে ওঠেনি।

কলেজে পড়ার সময়েই তৎকালীন ভারতী পত্রিকায় শহীদুল্লাহর 'মদনভস্ম' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা ও মননশীলতার গভীরতার পরিচায়ক এই প্রবন্ধ বিভিন্ন মহল থেকে উচ্চ প্রশংসিত হয়। তাঁর রচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে কোহিনূর, প্রতিভা, আল এসলাম প্রভৃতি পত্রিকায়।

সাহিত্য রচনার সঙ্গে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনার কাজও কৃতিত্বের সঙ্গে করেছেন তিনি। তাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা।

এই পত্রিকাতেই কাজী নজরুল ইসলামের রচিত প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয় (১৩২৬ সন, শ্রাবণ সংখ্যা)।

নজরুল করাচি ক্যান্টনমেন্টে ৪৯ নং বাঙালী পল্টনের হাবিলদার থাকা কালীন কবিতাটি প্রকাশের জন্য পাঠান। কবিতা প্রকাশের পর তিনি শহীদুল্লাহকে লেখেন, "আমার নগণ্য কবিতা আপনাদের সাহিত্য পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি বেশি। ..... by the by, আপনারা যে 'ক্ষমা' বাদ দিয়ে 'মুক্তি' নাম দিয়েছেন, তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকম দোষগুলি সংশোধন করে নিবেন।"

শহীদুল্লাহ ওকালতি করতেন বটে, কিন্তু জ্ঞান ও অধ্যাত্মচেতনায় উদ্ভাসিত ছিল তাঁর অন্তর্লোক। মিথ্যা মামলার ওকালতি পেশাকে তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন।

তাই অচিরেই অর্থকারী পেশাটি হয়ে গেল অকিঞ্চিৎকর। তিনি আত্মনিয়োগ করলেন ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে।

স্যার আশুতোষ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথমশ্রেণীর জজ্। তাঁর সঙ্গে একদিন কলকাতায় সাক্ষাৎ হয় শহীদুল্লাহর। প্রিয় ছাত্র ওকালতি করছেন শুনে তিনি বললেন, 'শহীদুল্লাহ, ওকালতি তোমার জন্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসো। আমি চাকরি দেব।'

অতঃপর শহীদুল্লাহ যোগ দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ড. দীনেশচন্দ্র

সেন ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি শহীদুল্লাহকে শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক নিযুক্ত করলেন। সময়টা ১৯১৯ খ্রিঃ।

স্বক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হবার পর শহীদুল্লার হৃদয়-কোরক যেন শতদলে বিকসিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গভীরতর অনুশীলনে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন।

শহীদুল্লাহ ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাংলা ভাষা ছিল তাঁর প্রাণস্বরূপ। এই ভাষার ঐশ্বর্য সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য তাঁকে মুগ্ধ করত।

তাঁর সারাজীবনের ভাষা-সাধনায় সঞ্চালনী শক্তি স্বরূপ ছিল মাতৃভাষার প্রতি অগাধ প্রীতি ও শ্রদ্ধা। ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিধি ছিল অগাধ ও অপার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মারম্ভের অব্যবহিত পরেই ১৯২০ খ্রিঃ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সচিত্র শিশু মাসিক পত্রিকা 'আঙুর'।

এই পত্রিকার সৌজন্য সংখ্যা হাতে পেয়ে ১৯২০ খ্রিঃ ৭ নভেম্বর রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন শহীদুল্লাহকে এক পত্রে লেখেন, "আপনার মতো এত বড় পণ্ডিত, যাঁহার বিদ্যার পরিধি আয়ত্ত করিবার সাধ্য আমাদের নাই, যিনি বেদ-বেদাঙ্গের অধ্যাপক, ফারসী ও আরবী যাঁহার নখদর্পণে, যিনি জার্মান ব্যাকরণের জটিল ব্যূহ ভেদ করিয়া অবসর রঞ্জন করেন তিনি একটি আঙুর হাতে করিয়া উপস্থিত ?"

অসামান্য জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী শহীদুল্লাহর অন্তরে ছিল না কৃত্রিমতা কিংবা অহংবোধ। নিষ্কলুষ চির আনন্দময় একটি সুকোমল সুকুমার 'সদানন্দ' শিশু সর্বদা তাঁর অন্তর জুড়ে বিরাজ করত। তারই প্রেরণায় তিনি বাংলার সুকুমারমতি শিশুদের নিজ ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণসম্পদের বিচিত্র উপকরণের সঙ্গে পরিচিত করাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন 'আঙুর' পত্রিকার মাধ্যমে।

তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্যুতি ছিল স্বয়ংপ্রকাশ। একবার স্যার আশুতোষের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছেন শহীদুল্লাহ। বহু বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সুধীজনের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল সেই সমাবেশ। সেদিন সেখানে একমাত্র শহীদুল্লাহই সংস্কৃত ভাষায় তাৎক্ষণিক মৌখিক ভাষণ দিয়ে সমবেত বুধ মণ্ডলীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিলেন।

কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে শহীদুল্লাহ বলেন, 'আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্তার, ভয়-ভালবাসার, চিন্তা-কল্পনার ভাষা বাংলা. তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ...... আমাদের ঘর ও বার, আমাদের সুখ ও দুখ, আমাদের আশা ও ভরসা,

আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য তাই আমাদের সাহিত্য। ...... এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই হিন্দু-মুসলমানের চেনা-পরিচয় হবে। চেনা হলেই ভাব হবে। To Know is to love''.

ঢাকা শহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ খ্রিঃ। বাংলায় সারস্বত সাধনার এক নতুন তীর্থক্ষেত্রের দ্বার উন্মোচিত হল। দেশ-বিদেশের কৃতী পণ্ডিতদের সমাবেশে অচিরেই এই সারস্বত প্রতিষ্ঠান জমজমাট হয়ে ওঠে। কারা ছিলেন সেখানে?

ইংরাজিতে ছিলেন সি. এল. রেন, গণিতে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সংস্কৃতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পদার্থ বিজ্ঞানে সত্যেন বসু, দর্শনে জি. এইচ. লেলী ও হরিদাস ভট্টাচার্য, ইতিহাসে রমেশচন্দ্র মজুমদার, আইনে নরেশচন্দ্র ঘোষ—এমনি স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কীর্তিমান সব পুরুষ।

এঁদের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একমাত্র অধ্যাপক ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

১৯২১ খ্রিঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন শহীদুল্লাহ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা তেইশ বছর কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনা করেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও স্বদেশানুরাগী সমাজসেবক রূপেও শহীদুল্লাহকে আমরা পেয়েছি। তাঁর সম্পাদনায় Peace পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রিঃ। ১৯৩৭ খ্রিঃ পর্যন্ত এই পত্রিকাটি চালু ছিল।

১৯২৬ খ্রিঃ শহীদুল্লাহ ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর গবেষণার জন্য প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান।

এখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর স্বরূপ বিশ্লেষণ ছাড়াও তিব্বতী ও বৌদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত সাহিত্যকর্ম ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়।

১৯২৮ খ্রিঃ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাযার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাচর্য বিনিশ্চয় তথা চর্যাপদাবলী বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

চর্যাপদ যে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় রচিত তা শহীদদুল্লাহই প্রথম প্রমাণ করেন। চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব নিয়েও তিনিই প্রথম আলোচনা করেন।

চর্যাপদের ভাষারূপ, ধ্বনিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তিনি ফরাসী ভাষায় গবেষণা গ্রন্থ লেখেন, তার নাম দেন Les chants Mystiques—লে শাঁ মিস্তিক। যার বাংলা অর্থ 'মর্মবাদীর গান'। গ্রন্থটি প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

ফরাসী ভাষায় রচিত শহীদুল্লাহর আর একটি মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থ লে শনস বেঙ্গলি—le sonsdu Bangali.''। এই গ্রন্থের জন্য তিনি ফাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ খ্রিঃ ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা লাভ করেন।

ভাষার সূক্ষ্ম বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ শহীদুল্লাহর আগে এমন দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে কোনও এশিয়াবাসী করেননি। এই ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র পথিকৃৎ।

১৯২৮ খ্রিঃ দেশে ফিরে আসেন শহীদুল্লাহ। ইতিমধ্যে দেশবিদেশ থেকে তাঁর সংগ্রহে সঞ্চিত হয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, দুর্লভ পুঁথি ও ফলক। প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক সমস্ত যুগের মহামূল্য এই সম্পদ তিনি নিয়োজিত করলেন স্ব-ভাষার ভাণ্ডার ও গৌরব বৃদ্ধির লক্ষ্যে। তিনি নিজেও রচনা করলেন বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও অনুবাদ।

দীর্ঘ দিনের অনলস সাধনায় বহু ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন শহীদুল্লাহ। একটি জীবনের পক্ষে এমন কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ ও দুঃসাধ্য।

বহুভাষা চর্চার সুবাদে স্বাভাবিক ভাবেই নানা ভাষা সাহিত্য, সামাজিক নানা সমস্যা এবং বিভিন্ন ধর্মালোচনার সঙ্গেও যুক্ত থাকতে হয়েছিল তাঁকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিদেশেও এই অনুরোধে তাঁকে ছুটে যেতে হয়েছে বহুবার।

একজন স্বদেশানুরক্ত আদর্শ শিক্ষকরূপে শহীদুল্লাহ বিশ্বাস করতেন সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত শিক্ষা অপূর্ণ। তাই বিভিন্ন সূত্রে নিজ নিজ সমাজের সঙ্গেও সংযোগ রক্ষার জন্য তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিতেন। উদ্বুদ্ধ করতেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯২৮ খ্রিঃ ১৩ ও ১৪ অক্টোবর কলকাতা অ্যালবার্ট হলে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণটি উল্লেখনীয়। তিনি বলেছেন, "লম্বা ছুটির সময় তোমরা কি চাষীদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে পার না? স্বদেশপ্রীতি কি কেবল মুখের কথা হয়ে থাকবে? মনে রাখতে হবে, যে পর্যন্ত না দেশের সাড়ে পনেরো আনা এদের অবস্থা ফিরবে, এরা নিজেদের দাবী-দাওয়া কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে পারে, সে পর্যন্ত প্রকৃত স্বরাজ হবে না। ...... সকলের চেয়ে বড়ো স্বত্ব তো স্বাধীনতা; সে-যে আমাদের জন্মগত স্বত্ব। অন্য স্বত্ব সব তারই ছায়া।"

রবীন্দ্রসাহিত্য অনুশীলনে শহীদুল্লাহর অনুরাগ ছিল গভীর ও আন্তরিক। কবিগুরুর সঙ্গে একাধিকবার তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে।

১৯২৩ খ্রিঃ শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন ডক্টর শহীদুল্লাহ।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রাজা চরিত্রের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাতে সম্পৃক্ত হয়েছে শহীদুল্লাহর অধ্যাত্ম মনীষার স্ফুরণ।

তিনি লিখেছেন ঃ 'পারস্য কবি কি সুন্দর কথাটি বলিয়াছেন--

বনামে আঁকে হেচ নামে নদারত

বহর নামে কে খানী সব্‌বর্‌ আরদ।

অর্থাৎ তাঁর নামে শুরু করি, যাঁহার কোন নাম নাই। যে নামে তাঁহাকে ডাক, সেই নামেই তিনি মাথা তোলেন। এই অনামীর নাম কবি দিয়াছেন রাজা। নূতন সংস্করণে রাজা হইয়াছেন অরূপরতন।"

জ্ঞানতাপস শহীদুল্লাহর চরিত্রের অশেষ গুণাবলীর মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই আচরণ করতেন। তিনি ছিলেন যথার্থ আচার্য।

ছাত্রদের তিনি সর্বদা মানুষ হবার শিক্ষা দিতেন। অধীত জ্ঞানকে জীবনে ও কর্মে প্রয়োগ করার উপদেশ নির্দেশ দিতেন তিনি। তাঁর আদর্শ চরিত্রের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায় তাঁর জীবনের ঘটনা থেকেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তিনি তখন। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন বাংলার ছোটলাট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্যার আর্থার জন হারবার্ট।

ঘটনাচক্রে সেই দিনই কোনও উপলক্ষে ছাত্ররা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ফাঁকা। অফিসেও কর্মীদের অনুপস্থিতি। দেখেশুনে লাটসাহেবের মেজাজ চড়েছে। তিনি ধমকের সুরেই অধ্যাপকদের কাছে জানতে চান, ছাত্ররা এভাবে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে, আপনারা প্রতিরোধের কোনও ব্যবস্থা নেননি?

একজন অধ্যাপক বলেন, কি ব্যবস্থা নেব, আমাদের একজন সহকর্মীর পুত্রই যে ছাত্রদলেব নেতা।

শুনে অবাক সাহেব জানতে চান সেই অধ্যাপকটি কে?

এ প্রশ্নের উত্তরে কেউই কোনও কথা বলেন না। কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন শহীদুল্লাহ্। দৃঢ়স্বরে তিনি জানালেন, ছাত্রদলের নেতা আমারই ছেলে।

লাটসাহেব বলে উঠলেন, একী আশ্চর্য কথা। যিনি নিজের ছেলেকে শাসনে রাখতে পারেন না, তিনি কি করে অন্যের ছেলেদের শাসন করবেন?

শহীদুল্লাহ বললেন, মাফ করবেন। আমার ছেলে এখন বড় হয়েছে। তার স্বাধীন মতামত আছে। তাতে তো আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

শহীদুল্লাহর সহজ সরল স্বীকৃতিতে চমৎকৃত হলেন চ্যান্সেলার। তবুও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার প্রশ্নে নির্দেশ দিলেন, শহীদুল্লাহর ছেলের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তিদানের উদ্যোগ নিলেন। এই সময়

হরিদাস ভট্টাচার্য ও সত্যেন বসু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করলেন যে কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। শাস্তি আর দেওয়া হল না।

এই ঘটনার পর শহীদুল্লাহ তাঁর ছেলেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরামর্শ দিলেন। পিতৃঅনুগত ছেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন।

শহীদুল্লাহও এর পর আর বেশিদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রইলেন না। স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করলেন।

এরপর বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ। আহ্বান পেয়ে শহীদুল্লাহ সেখানে অধ্যক্ষের পদে যোগ দিলেন।

দেশজুড়ে সে সময় চলছিল স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন। অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মদান ও ত্যাগে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করল। একদেশ ভাগ হয়ে দু টুকুরো হল—ভারত ও পাকিস্তান। দুটি রাষ্ট্র।

দেশভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি যোগ দিলেন বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক পদে। পরে তিনি অধ্যক্ষ ও কলা বিষয়ের ডীন হন।

পাকিস্তানের দুটি অংশ। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। বাঙালী প্রধান পূর্বপাকিস্তানে অচিরেই রাষ্ট্রীয় সমস্যা দেখা দিল সেখানকার ভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তানের অদূরদর্শী শাসকবর্গ একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ নিয়েছে। আরবী হরফে বাঙালীদের শিখতে হবে বাংলা ভাষা।

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ পূজারী শহীদুল্লাহ দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন সরকারের সিদ্ধান্তের। তিনি বললেন, "পাকিস্তান শুধু মুসলমানের দেশ নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এখানে বসবাস করেন। তাদের মাতৃভাষার অমর্যাদা করা চলে না।"

শহীদুল্লাহ এতেই ক্ষান্ত হলেন না। কোরআনশরীফ থেকে বয়াত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'মাতৃভাযার মর্যাদার কথা কোরানেও বলা হয়েছে।'

পাকিস্তানের ছয় কোটি নব্বই লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক বাংলায় কথা বলে। বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালী জাতির হাজার হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি জড়িত।

সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে পাকিস্তান সৃষ্টির নায়কগণ সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের জিগির তুলে ইসলাম, উর্দু ও পাকিস্তানকে একাকার করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত আগেই শহীদুল্লাহ লেখেন যে, নবীন রাষ্ট্রের

রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। অথবা হওয়া উচিত দুটি রাষ্ট্র ভাষা বাংলা ও উর্দু। তিনি আরবি হরফে বাংলা লেখার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

সরকার তাঁর প্রতিবাদের কোন মূল্যই দিল না। উপরন্তু সরকারী নীতির বিরোধিতা করার অপরাধে শহীদুল্লাহর দুই পুত্রকে কারারুদ্ধ করা হল।

মাতৃভাষা ও বাঙালী জাতির মর্যাদারক্ষার প্রত্যয়ে শহীদুল্লাহ কিন্তু নিজ মতে রইলেন অবিচল অটল।

ভাষার প্রশ্নে ১৯৪৮ খ্রিঃ থেকেই স্বাভাবিকভাবে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে লাগল। তারই মূর্ত প্রকাশ ঘটল ১৯৫২ খ্রিঃ ২১ ফেব্রুয়ারী।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল পূর্ববাংলা। পুলিশের বন্দুকের সামনে রুখে দাঁড়াল দেশের তরুণ ছাত্রদল।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই শ্লোগান মুখে নিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন রফিক, জব্বর, সালাম, বরকত।

ছাত্রহত্যার সংবাদে ক্ষোভে শোকে দুঃখে পাথর হলেন শহীদুল্লাহ। আগামী দিনের নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাময় বিপ্লবকে যেন নীরবে প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। নিজের কালো আচকানের ফালি কেটে হাতে শোকচিহ্ন ধারণ করে শহীদদের প্রতি সম্মান জানালেন।

সেইদিন থেকেই শহীদুল্লাহ মনে মনে বাঙালিত্বের সংগ্রাম, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আপন মহিমায় বিকশিত করার সংগ্রামের শপথ নিলেন।

পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি যে ১৯৫৯ খ্রিঃ জন-অভ্যুত্থান ও ১৯৫৯ খ্রিঃ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম, তার প্রথম ও প্রধান উদ্‌গাতা ছিলেন মাতৃভাষার অক্লান্ত সেবক শহীদুল্লাহ।

রাজশাহীতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হল ১৯৫৪ খ্রিঃ। শহীদুল্লাহ হলেন অধ্যাপক-অধ্যক্ষ ও কলা বিভাগের প্রধান। চার বছর এখানে থাকলেন।

১৯৫৯ খ্রিঃ করাচি থেকে এল উর্দু উন্নয়ন সংস্থার আহ্বান। উর্দু অভিধান সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে। দু বছরের কঠোর পরিশ্রমে সম্পূর্ণ করলেন এই কাজ।

এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Buddhist Mystic Songs রচনা ও প্রকাশ করেন।

দু বছর পর ঢাকায় ফিরে এসে শহীদুল্লাহ হাতে নিলেন বাংলা একাডেমীর আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনার দায়িত্ব।

তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় তিনখণ্ডে প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে

প্রায় পঁচাত্তর হাজার শব্দ সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে অর্থ, উদাহরণ ও প্রাসঙ্গিক টীকা।

এই উপমহাদেশের ভাষার ইতিহাসে শহীদুল্লার আগে আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে এমন সুবৃহৎ কাজ কেউ করেননি। আঞ্চলিক ভাষা ছিল গুরুত্বহীন, উপেক্ষিত। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে নানা মৌলিক কাজের সূত্রে ১৯৬৫ খ্রিঃ পর্যন্ত শহীদুল্লাহ বাঙলা একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ইসলাম প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা সাহিত্যের কথা ইত্যাদি।

১৯৬৫ খ্রিঃ আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে জ্ঞানতাপস ও ভাষাবিজ্ঞানী শহীদুল্লাহর সম্মানে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের ভাষাসাহিত্যের বুধমণ্ডলীর রচনা নিয়ে প্রকাশ করে সংবর্ধনা গ্রন্থ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৭ খ্রিঃ প্রফেসর এমেরিটাস পদে বৃত করে তাঁকে সম্মান জানায়। দেশের বিভিন্ন সারস্বত সংস্থার পক্ষ থেকেও তাঁকে বিপুল ভাবে সংবর্ধিত করা হয়।

শেষ জীবনে আকস্মিক অসুস্থতায় ডান অঙ্গ পড়ে যায়। বিরাশি বছরের শেষ জন্মদিন প্রতিপালিত হয় দেশবাসীর অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে।

তিনদিন পর ১৯৬৯ খ্রিঃ ১৩ জুলাই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি নিবেদিত-প্রাণ ঋষিপ্রতিম মহম্মদ শহীদুল্লাহ চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

শরৎচন্দ্র দাশ

এক সময়ে তিব্বতকে বলা হত 'নিষিদ্ধ দেশ'। তিব্বতে বিদেশী লোকের প্রবেশাধিকার ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সেই দেশের এই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। একজন মাত্র বাঙালী পরিব্রাজক উনবিংশ শতাব্দীতেই হিমালয়ের অন্তর্গত 'নিষিদ্ধ দেশে' অতি সন্তর্পণে বিপজ্জনক পথে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন এবং সেখানকার প্রাচীন পুঁথিপত্র এবং ধর্ম ও পৌরাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

তিব্বতী ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে তিনি তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্য মহামান্য ত্রয়োদশ দলাই লামার প্রভূত প্রশংসাও লাভ করেছিলেন।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিব্বতের বহু অজানা ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করে তিনিই প্রথম বহির্বিশ্বে প্রচার করেন।

তিব্বতী গবেষণা বা ভোটবিদ্যার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ রূপে বাঙালী কৃতিপুরুষদের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রখ্যাত পরিব্রাজক ও আবিষ্কারক এই কীর্তিমান দুঃসাহসী বাঙালীর নাম শরৎচন্দ্র দাশ।

শরৎচন্দ্রের জন্ম অবিভক্ত ভারতের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আলমপুর গ্রামে ১৮৪৯ খ্রিঃ ১৮ জুলাই। তাঁর পিতার নাম দীনদয়াল দাশ।

বাল্যকাল থেকেই শরৎচন্দ্র ছিলেন ধীর স্থির ও শান্ত প্রকৃতির। পড়াশুনাতেও ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। চট্টগ্রাম ইংরাজী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে এসে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন।

এই সময় থেকেই তিনি শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌টের সুনজরে পড়েন। সদাশয় আলফ্রেড সাহেবের সময়ানুগ সাহায্য ও উৎসাহ শরৎচন্দ্রকে তাঁর জীবনের সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

১৮৭৪ খ্রিঃ ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেল, দার্জিলিং-এ তিব্বতী বোর্ডিংস্কুল খোলেন। শরৎচন্দ্র প্রেসিডেন্সির পাঠ অসমাপ্ত রেখেই এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এখানেই তিনি অতি অল্প সময়ে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করেন।

সেই সময়ে সিকিম ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য। সিকিমের রাজাই দেশ শাসন করতেন।

শরৎচন্দ্র ১৮৭৫ খ্রিঃ প্রথম সিকিম যান এবং রাজ্যের রাজা ও অন্যান্য জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে পরিচিত হন।

সেখানে তিনি কয়েকটি বৌদ্ধ মঠও পরিদর্শন করেন। পরে ১৮৭৮ খ্রিঃ তিনি আরও দুবার সিকিম যান।

ওই বছরেই দার্জিলিঙের তিব্বতী বোর্ডিং স্কুলে তিব্বতী ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের শিক্ষক নিযুক্ত হন সিকিমের পেমিয়াংসে মঠের লামা উগিয়েন গিয়াৎসো। বিশেষতঃ শরৎচন্দ্রের আগ্রহেই তিনি এই পদ গ্রহণ করেছিলেন।

একই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। গিয়াৎসোকে পেমিয়াংসে মঠ থেকে তিব্বতে যাবার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

নিষিদ্ধদেশ তিব্বত। স্বভাবতঃই সে দেশে যাবার তীব্র আগ্রহ বোধ করতেন

শরৎচন্দ্র। এই সুযোগে তিনি তিব্বত দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করে একটি আবেদনপত্র গিয়াৎসোর হাতে দিয়ে দেন।

বাঙালী বৌদ্ধ সাধক ও পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বৌদ্ধের অবতার রূপে পূজিত হন। সেই হিসাবে বাঙালী শরৎচন্দ্রের সেই দেশ পরিদর্শনে অধিকার লাভের সহজ সম্ভাবনা থাকলেও তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল তিনি একজন ভারতীয়।

সেই সময়ে ভারত ছিল সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টান ইংরাজদের অধীন। সেই কারণে প্রতিটি ভারতীয়কেই তিব্বতে ইংরাজের চর হিসাবে দেখা হত। স্বভাবতঃই উগিয়েন শরৎচন্দ্রের ব্যাপারে লাসায় কোনও রকম সবুজ সংকেতের ব্যবস্থা করতে পারেননি।

এরপর অবশ্য উগিয়েন ত্রয়োদশ দলাই লামার দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের তিব্বত ভ্রমণের ছাড়পত্র সংগ্রহ করেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে তাশিলুন্‌পোর প্রধান মঠে ছাত্র হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র দেন এবং সেই পত্র হস্তগত করে উগিয়েন দার্জিলিং ফিরে আসেন।

স্যার ক্রফটই তখন নিজে উদ্যোগী হয়ে শরৎচন্দ্রের তিব্বতভ্রমণের সমস্ত সুযোগ করে দেন।

সেই সময় কলকাতায় বাস করতেন পর্যটক নয়ন সিংহ। শরৎচন্দ্র কলকাতায় এসে তাঁর কাছে জরীপ সংক্রান্ত কাজের খুঁটিনাটি শিক্ষা করেন। এইভাবে তিনি আসন্ন তিব্বত ভ্রমণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেন।

১৮৭৯ খ্রিঃ ১৭ জুন, শরৎচন্দ্র ও উগিয়েন দার্জিলিং থেকে তিব্বত রওনা হলেন। এই যাত্রায় তাঁরা সঙ্গী হিসাবে নিলেন দুজন মালবাহককে। আর ছিল একটি ক্যামেরা, একটি পকেট সেক্সট্যান্ট, একটি প্রিজম্যাটিক কম্পাস, দুটি হিপসোমিটার, একটি থার্মোমিটার, ফিল্ডগ্লাস এবং একটি পিস্তল। আর পথখরচের জন্য দেড়শত টাকা ও মঠের জন্য কিছু উপহার সামগ্রী। লক্ষ্যণীয় যে তুষারাবৃত হিমালয়ে দীর্ঘ পদযাত্রায় ব্যবহারের জন্য কোন তাঁবু বা শীতবস্ত্র তাঁরা সঙ্গে নেননি।

তিব্বতের পথে প্রথমে তাঁরা বিরাম নেন জোংরীতে। এখান থেকে গিউন্‌সা নামে একজন গাইড তাঁরা সঙ্গে নেন।

১৯শে জুন জেংরী থেকে তাঁর রওনা হন প্রচন্ড তুষার ঝড় মাথায় নিয়ে। তাঁদের পথ ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫১১ মিঃ উচ্চতায়।

তুষারাবৃত পাহাড়ি পথে রাথং নদী পার হয়ে তাঁরা বেলা শেষে আশ্রয় নেন এক গুহায়। পরদিন সেখান থেকে কাংলা গিরিপথ পার হয়ে নেপালে প্রবেশ করেন।

নেপালের একটি গ্রাম্য পাঠশালায় রাত কাটিয়ে ২২শে জুন তাঁরা দীর্ঘ চড়াই অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে লাগলেন। পথে পড়ল, ছুনজেরমা গিরিবর্ত্ম, মাতারচু নদী এবং মির্কেনলা, পাঙ্গোলা, সোনানলা ও তামালা নামে চারটি চড়াই। চড়াই পার হয়ে তাঁরা পৌঁছলেন কাংচান নদীর তীরে গাইড গিউনসার গ্রামে। সেখানে এক শেরপার বাড়িতে 'আশ্রয় লাভ করেন তাঁরা।

গ্রামবাসী নেপালীরা শরৎচন্দকে নেপালী মনে করে 'পাবুলামা' বলে ডাকতেন। পাবুলামার অর্থ হল নেপালী লামা। শরৎচন্দ্র নেপালে এই নামেই পরিচিত হন।

এই গ্রামে ছিল তাশিচোংডি মঠ। পরদিন তিনি সেই মঠ পরিদর্শন করেন। এখান থেকেই গিউনসার মালবাহকদের নিয়ে ফিরে যাবার কথা। সামনে অজানা বন্ধুর তুষারাবৃত পথ। শরৎচন্দ্রকে সেই পথে চলতে হবে একা।

শরৎচন্দ্র মঠের লামাদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস পেলেন। দ্বিতীয় লামা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মঠেরই এক কর্মী ফুরচংকে গাইড হিসাবে দিয়ে দেন এবং এর পর থেকে তিনিই ছিলেন এই পর্যটকের নিত্যসঙ্গী। এখান থেকে নতুন করে দুজন মালবাহকও নিয়োগ করা হল।

২৫শে জুন সকালে আবার পথে নামলেন তাঁরা। বিকেলে পৌঁছান কাংবাচেন নামক গ্রামে।

এখানে পৌঁছানোর কিছু সময় পরে গিউনসার গ্রামের মঠের প্রধান লামার একটি চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র জানতে পারেন, চীনা রাজকর্মচারীরা ওই পথেই আসছেন। চীনারা তাঁকে তিব্বতে যেতে বাধা দিতে পারে। তিনি যেন চেনমোর গিরিপথ ধরে না যান।

পত্রের নির্দেশ মতো শরৎচন্দ্র ঘুরপথে অম্বুর নদীর বাম তীর বরাবর চড়াই পথ ধরলেন। তাঁর ডাইনে রইল কাঞ্চান পর্বশ্রেণী আর বাঁয়ে কাংবাচেন শৃঙ্গ। এর উচ্চতা ৭৯০২ মি.।

এই পর্বতশ্রেণীর কয়েক কিলোমিটার দূরেই খানদুমচো নামে এক পবিত্র জলপ্রপাত। স্থানীয় লোকেরা একে বলে পরীদের জলধারা। হাজার ফুট উঁচু থেকে নিচে গড়িয়ে পড়েছে এই জলধারা। শরৎচন্দ্র এই জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে এগিয়ে রামথং গ্রাম পার হয়ে পৌঁছালেন জোরগু-ওগোতে। এখানে রাত কাটান এক শেয়ালের গুহায়।

পরদিন, ৫৯৭১ মিঃ উচ্চতায় পথ চলতে শরৎচন্দ্রের খুবই কষ্ট হতে লাগল। অতি কষ্টে মাইল তিনেক পাহাড় ভাঙ্গার পর তাঁর আর চলার ক্ষমতা রইল না। বরফের ওপরেই বসে পড়লেন। অগত্যা ফুরচং তাঁকে পিঠে তুলে নিল।

এভাবে এক মাইল পথ পার হয়ে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে এক শিলাস্তূপের কাছে, বরফের ওপরে কম্বল বিছিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। তারপর ফুরচং আবার একমাইল পথ পিছিয়ে গিয়ে মালপত্র নিয়ে এল।

পরদিন সকাল থেকেই আবার যাত্রা শুরু হল। বরফাচ্ছন্ন পথে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলেন না শরৎচন্দ্র। ফুরচংই তাঁকে আবার পিঠে তুলে নিয়ে চলতে লাগল।

তাঁরা এসে পৌঁছলেন জংসংলা-তে। এখানেই নেপালের শেষ সীমা অতিক্রম করে শরৎচন্দ্র আবার প্রবেশ করলেন সিকিমে।

প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে দিনভর পথচলে সন্ধ্যায় তিনি আশ্রয় নিলেন এক গুহায়।

পরদিন আবার উৎরাই ভাঙ্গার পালা। দুপুর নাগাদ একটা নদী পার হয়ে তাঁরা পৌঁছলেন গিয়ামী-থোথো গ্রামে।

সেখান থেকে জেমুর ধারা অতিক্রম করে পাওয়া গেল সমতল প্রান্তর। এই প্রান্তরে রাত কাটিয়ে পরদিন, ৩০শে জুন প্রায় ১৩কিমি পথ হাঁটা পথে পার হয়ে শরৎচন্দ্র পৌছলেন তিব্বতে।

সেখানে ৫১৮২ মিঃ উচ্চতায় রয়েছে ভারতীয় শ্রমণদের তৈরি সূর্যদেবের মন্দির। মন্দিরের ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন শরৎচন্দ্র।

গত তিনদিন আগুন জ্বালিয়ে রান্না করার মতো অবস্থা ছিল না। তাই সঙ্গের সামান্য শুকনো খাবারই ছিল সম্বল। তিনদিন পরে ধর্মশালায় পৌঁছে তিনি রান্নাকরা খাবার খেলেন।

তখনো সামনে প্রসারিত অজানা বন্ধুর পথ। বিরাম নেবার অবকাশ নেই। সন্ধ্যাবেলাই আবার ধর্মশালা থেকে যাত্রা শুরু করতে হল। মধ্যরাত্রে এসে পৌছলেন থিবংগ্রামে।

এই সুদীর্ঘ দুস্তর বরফাচ্ছন্ন পথে সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্রই ছিলেন প্রথম বিদেশী অভিযাত্রী। বিখ্যাত পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক স্মাইথ, শরৎচন্দ্রের এই পদযাত্রাকে বলেছেন ''One of the boldest journey on record.''

নিমা নদী অতিক্রম করে ১লা জুলাই শরৎচন্দ্র পৌঁছলেন এক গ্রামে। গ্রামের নাম থিকং।

সামনের পথ ঘোড়া না হলে চলার উপায় নেই। কিন্তু থিকংগ্রামে ঘোড়া ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন পার্শ্ববর্তী টাংলাং গ্রামে। সেখানে এক গ্রামবাসীর সঙ্গে পরিচয় ছিল ফুরচং-এর। তার বাড়িতেই ভাড়া ঘর পাওয়া গেল। জন প্রতি এক টাকা হিসাবে ভাড়া।

টাংলাং গ্রাম থেকে তিনটি ঘোড়া সংগ্রহ করা হল। তরপর থেকে তাঁকে আর বিশেষ হাঁটতে হয়নি।

২রা জুলাই রওনা হয়ে কয়েকটি গ্রাম ও দুটি নদী পার হয়ে শরৎচন্দ্র টারগে গ্রামের ধর্মশালায় আশ্রয় নেন। সেখানেই রাত কাটান। পরদিন দুপুর নাগাদ পৌঁছান দেকপা শহরে।

এখান থেকে আর চড়াই নয়, এবারে উৎরাই পথ। ক্রমাগত পাহাড় বেয়ে নিচে নামা। ঘণ্টাখানেক চলার পর পাওয়া গেল খানিকটা সমতল ভূমি। ততক্ষণে আরম্ভ হয়েছে তুমুল ঝড়বৃষ্টি। তার মধ্যে দিয়েই তিনি পৌঁছলেন লুকরী গ্রামে। আশ্রয় পেলেন এক গোয়াল ঘরে।

শরৎচন্দ্র তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে লিখেছেন, এপথে সেই কালে খুব ডাকাতের উপদ্রব ছিল।

৪ জুলাই প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র পৌঁছলেন নাম্বুভংলা নদীর তীরে। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। আসার পথে দূর থেকে দেখতে পান তামাং শহর ও রিগোম্পা বিহার।

এখানে নিচে নামার পথ স্থানে স্থানে এমনই খাড়া ছিল যে শরৎচন্দ্রকে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে হেঁটে নামতে হয়েছে।

সন্ধ্যার দিকে চুথাচু নদী পার হয়ে তিনি এসে পৌঁছান লাজং গ্রামে। রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে পৌঁছান গয়ানা শৃঙ্গের কাছে। এই পথে অনেক মঠের পাশ দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে।

গয়ানা শৃঙ্গের নিচে পিনাম-নিয়াংচু নদী, পশ্চিমে নার্থাং মঠ আর সামনে সমতল ভূমি। তার শেষে সিগাৎসে ও তাশিলুনপো। যাকে তিব্বতীরা বলে পর্বতশ্রেষ্ঠ।

এখানে মঠে পাঞ্চেন লামার অতিথি হয়ে শরৎচন্দ্র ছয় মাস ছিলেন। মঠের সংগ্রহশালায় তিব্বতী পুঁথির সঙ্গে অসংখ্য সংস্কৃত পুঁথিও ছিল। দুই ভাষারই বেশ কিছু পুঁথি তিনি এখান থেকে সংগ্রহ করেন।

এখানে ছয় মাস থাকার পরে শরৎচন্দ্র রাজধানী সহর লাসা যান। সেখানে থাকেন তিন মাস।

শরৎচন্দ্রের তিব্বতী ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে লামারা বিস্মিত হন। তাঁকে তাঁরা 'পুন্ডিবলা' অর্থাৎ পণ্ডিতমশাই বলে সম্বোধন করতেন।

১৮৮১ খ্রিঃ দেশে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র ভারত সরকারের তিব্বতী ভাষার অনুবাদক নিযুক্ত হন। ওই বছরই শেষ দিকে তিনি দ্বিতীয়বার তিব্বত যান। এই দ্বিতীয় যাত্রায়ও উগিয়েন ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

এবারে তিব্বতে তাঁরা প্রবেশ করেন অন্য পথে। কাংবাচেন গ্রামের উত্তরে

নাংগোলার মধ্য দিয়ে। ৫৮০৬ মিঃ উচ্চতায় এই পথ। ৯ই ডিসেম্বর তাঁরা সিগাৎসে দুর্গে পৌঁছান এবং এক তান্ত্রিক লামার অতিথি হন।

সেই সময়ে পাঞ্চেন লামার সঙ্গে বৎসরান্তিক সাক্ষাৎকারের জন্য একদল চীনা রাজকর্মচারী এসে ছিলেন সিগাৎসে দুর্গে। এখানে চীন সম্রাটের অভিষেকের যে বাৎসরিক স্মারক শোভাযাত্রা হয় তা শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন লামার বাড়িব ছাদ থেকে। সেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার জাঁকজমক এমনই রাজকীয় ছিল যে, শাসক সম্রাটের প্রতাপ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

তাশিলুনপো থেকে লাসা রওনা হয়ে পথে ইয়ামডাক হ্রদের কাছে শরৎচন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানকার মঠের প্রধান লামা ছিলেন একজন তরুণী। তাঁরই ওষুধে ও পরিচর্যায় শরৎচন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এখান থেকে তিনি পৌঁছান পালটি হ্রদে। সেই অঞ্চল তিনি জরিপ করেন। তাঁর জরিপকার্য এমনই নির্ভুল ও নিখুঁত ছিল যে পরবর্তী কালেও তাঁর সমস্ত তথ্যই অপরিবর্তিত থাকে। শরৎচন্দ্র মানস সরোবরের কাছে লোব্রাক উপত্যকাও জরিপ করেন।

পালটি হ্রদ এমনই দুর্গম অঞ্চল যে কোনও বিদেশীর পক্ষে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হত না। শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম সেখানে পৌঁছান।

তিনি লাসায় পৌঁছান ৩০শে মে। এখানে তিনি ত্রয়োদশ দলাই লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ে দলাই লামার বয়স ছিল আট বছর।

লাসার অভ্যন্তরীন শাসন ব্যবস্থা ছিল তিব্বতীদেরই হাতে। কিন্তু যেহেতু সৈন্যাধক্ষ ছিলেন চীন সম্রাটের নিযুক্ত, সুতরাং শাসন ব্যবস্থায় চীনা রাজকর্মচারীরাই প্রধানতঃ ক্ষমতা ভোগ করত। এ কারণে তিব্বতীরা চীনাদের ঘৃণা করত। সুযোগ পেলে চীনা কর্মীদের হত্যা করতেও তারা পিছপাও হত না। এমন কয়েকজন নিহত চীনাকে পথের পাশে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র যখন দ্বিতীয়বার লাসা যান, সেই সময় আকস্মিকভাবে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেই কারণে দু'সপ্তাহের বেশি তিনি সেখানে থাকেননি। এই সময়ের মধ্যেই লাসার সমস্ত দ্রষ্টব্য তিনি দেখেন।

তিব্বতী সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে ইয়ারলুং-এ। ফেরার পথে তিনি সেখানেও অবস্থান করে আসেন। তিনি যে ইংরাজ সরকারের রাজকর্মচারী সেখানে একথা কেউ জানতো না। তিনি চলে আসার পরে এ সংবাদ আর গোপন থাকেনি। তাঁকে যারা সাহায্য করেছিল, এমন কয়েকজনকে শাস্তি পেতে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র দার্জিলিং ফিরে আসেন ১৮৮৩ খ্রিঃ জানুয়ারী মাসে। দুবছর পরেই

তাঁর তিব্বত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সরকারী উদ্যোগে ছাপা হয়। বই দুটির নাম Narrative of a Journey Round Lake Patti and in Lhoka, Yarlung and Satya.

বই দুটিতে কিছু গোপনীয় দলিল স্থান পাওয়ায় ছাপা হয়েও ১৮৯০ খ্রিঃ পর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকে। তবে বই দুটির কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডনের Contemporary Review পত্রিকায়। লন্ডনের অপর একটি পত্রিকা Nineteenth Century-তেও কিছু অংশ ছাপা হয়। তিব্বতের নৃতত্ত্ব, ভাষা, সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে শরৎচন্দ্রের লেখা থেকেই বহির্বিশ্বের মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারে।

শরৎচন্দ্রের তিব্বত অভিযান অনেক অজানা তথ্যের উদঘাটন করেছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভৌগোলিক বহু অজানা তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন।

দুটি অভিযানেই তিনি এভারেস্টের ৬৪ থেকে ৭২ কিমির মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। এই পথের যে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন তা ছিল নিখুঁত এবং নির্ভুল। বহু বছর পরে যখন এভারেস্ট অভিযান হয়, তখন শরৎচন্দ্রের পথের বিবরণ অভিযাত্রীদের প্রভূত সহায়তা করে।

১৯২২ খ্রিঃ এভারেস্ট অভিযান প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন জে. বি. এল নোয়েল লিখেছেন, 'I planned the route from the writing of Sarat Chandra Das', তিনিই শরৎচন্দ্রকে আখ্যা দিয়েছিলেন The hardy son of soft Bengal.

১৮৮৪ খ্রিঃ বাংলা সরকারের অন্যতম সেক্রেটারী কোলম্যান মেকলে সিকিমের মধ্য দিয়ে সসৈন্যে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত যান। উপদেষ্টা হিসেবে সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন শরৎচন্দ্র।

পরের বছর তিব্বত প্রবেশের বিষয়ে আলোচনার জন্য মেকলের সঙ্গে কূটনীতিক হিসাবে শরৎচন্দ্রও চীনে যান। সেখানে তিনি, বেজিং-এর কাছে লামাদের সী হুয়াং সু মঠে কয়েক মাস অবস্থান করেন।

চীনে অবস্থানকালে চীনা লামাদের মতোই পোশাক পরতেন শরৎচন্দ্র। সেজন্য চীনারা তাঁকে 'বাচেন লামা' বা কাশ্মীরী লামা অর্থাৎ কাশ্মীর থেকে আগত লামা আখ্যা দিয়েছিল।

১৮৮৬ খ্রিঃ দেশে ফিরে আসার পর ইংরাজ সরকার শরৎচন্দ্রকে সি. আই. ই. উপাধি দেয়।

পরের বছর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য শরৎচন্দ্র শ্যামদেশে যান। শ্যামদেশের রাজা তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তুষিতমত' পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

ওই বছরেই লণ্ডনের রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি শরৎচন্দ্রকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করেন।

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের চর্চার জন্য ১৮৯২ খ্রিঃ শরৎচন্দ্র কলকাতায় প্রথম Buddhist Text and Anthropological Society স্থাপন করেন। বহু বছর পর্যন্ত তিনি এই সংস্থার বার্ষিক মুখপত্র সম্পাদনা করেন। এই সংস্থা থেকে তাঁর অনূদিত ও সম্পাদিত কয়েকটি পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

নেপাল; সিকিম ও তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে তাঁর লেখা থেকেই প্রথম জানা যায়।

১৮৯৬ খ্রিঃ ইংরাজ সরকার শরৎচন্দ্রকে রায়বাহাদুর খেতাব দিয়ে সম্মানিত করে। ১৮৯৯ খ্রিঃ লন্ডনের রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁর রচিত Journey to Lhasa and Central Tibet গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও তিনি ওই সোসাইটি কর্তৃক পুরস্কৃত হন।

তাঁর রচিত অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে Indian Pandits in the Land of Snow, বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা প্রভৃতি।

১৮৮১-১৯০০ খ্রিঃ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র বাংলা সরকারের তিব্বতি ভাষার অনুবাদক ছিলেন। ১৯০২ খ্রিঃ তিনি Tibetan-English Dictionary গ্রন্থ রচনা শেষ করেন।

দু বছর পরে তিনি সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতায় বিশিষ্ট সারস্বৎ প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শরৎচন্দ্র তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ ছিল।

১৯১৫ খ্রিঃ শরৎচন্দ্র জাপান ভ্রমণে যান। দু'বছর পরে ১৯১৭ খ্রিঃ ৫ জানুয়ারী চট্টগ্রামে তিনি নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীর্থভূমি মেদনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার চণ্ডীভেটি গ্রামে ১৮৮১ খ্রিঃ বীরেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পিতার নাম বিশ্বম্ভর শাসমল, মাতা আনন্দময়ী। তিন ভাইয়ের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন মধ্যম। তাঁর দাদা বিপিনচন্দ্র ও ছোটভাই যোগেন্দ্রনাথ।

চণ্ডীভেটি গ্রামের শাসমল পরিবার সুপরিচিত জমিদার হলেও প্রচুর

দানধ্যানের জন্য তাঁদের সবিশেষ সুখ্যাতি ছিল। প্রায় আড়াইশো বছর আগের এই পরিবারের পূর্বপুরুষ করুণাকর বৃন্দাবনে দেবমন্দির ও তীর্থযাত্রীদের জন্য পান্থশালা নির্মাণ করেছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের জ্যেঠামশাই রামধন শাসমল কাঁথি কোর্টে ওকালতি ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন কীর্তিমান ব্যক্তি। মেদিনীপুর জেলায় তিনি প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

তাঁর একান্ত চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিঃ কাঁথির মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

ছেলেবেলায় বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। কোনও বিষয়ে একবার জেদ ধরলে, সহজে তাঁকে নিরস্ত করা যেত না।

ছেলেবেলার এই একগুঁয়েমি স্বভাব পরিণত বয়সে তাঁকে প্রচণ্ড তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা করে তুলেছিল।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবের ফলে বীরেন্দ্রনাথের পরিবারে স্বাভাবিক উদার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। জাতিভেদ বা ধর্ম নিয়ে কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না।

বীরেন্দ্রনাথের দাদা বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মমত মানতেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁর মাতা আনন্দময়ী হিন্দু রীতিনীতি মেনে চলতেন। ব্রাহ্মমতের প্রতি তাঁদের কোনরূপ বিরূপতা ছিল না।

পরিবারের এই মুক্ত পরিবেশ বালক বীরেন্দ্রনাথকে বিশষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

গ্রামের স্কুলেই বিদ্যারম্ভ হয় বীরেন্দ্রনাথের। লেখাপড়ায় তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। মেধাবী ও বুদ্ধিমান বীরেন্দ্রনাথ স্কুলে বরাবর ভাল ফল করে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভালবাসা অর্জন করেছিলেন।

সহপাঠীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন দলপতি। সহজেই সকলে তাঁর অনুগামী হত। লেখাপড়ার মতো খেলাধুলোতেও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ হলে বীরেন্দ্রনাথকে কাঁথি হাইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই স্কুল থেকেই তিনি ১৯০০ খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০১ খ্রিঃ তিনি কলকাতায় তৎকালীন মেট্রোপলিটন কলেজে, এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন।

সেইকালে স্কুলে পড়াশুনার সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্রগঠনের দিকেও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হত। তাছাড়া শিক্ষকদের চরিত্র ও শিক্ষা ছাত্রদের জীবন গঠনে প্রভূত সহায়ক হত।

হাইস্কুলের দুইজন শিক্ষকের দ্বারা বীরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রভাবিত

হয়েছিলেন। তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা সাহচর্য ও প্রেরণায় বীরেন্দ্রনাথের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও জীবনে বড় হবার প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল।

দেশপ্রেমিক ও বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব বীরেন্দ্রনাথের ওপর এতটাই ছিল যে তিনি সেই কিশোর বয়সেই স্বপ্ন দেখতেন সুরেন্দ্রনাথের মতো একজন বড় বাগ্মী হওয়ার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে তিনি দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলবেন।

জীবনের এই মহান আদর্শ ও লক্ষ্যই বীরেন্দ্রনাথের জীবনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই তাঁর পড়াশুনা সীমাবদ্ধ ছিল না। অবসর সময়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের প্রচুর বই পড়তেন। বিশেষ করে দেশ বিদেশের ইতিহাস জানার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি ইংরাজি ও বাংলা রচনা লেখা ও ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লেখা অভ্যাস করতেন।

ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে হলেও পরিবারের উদার পরিবেশে গঠিত হয়েছিল বীরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি। স্কুলে সকল শ্রেণীর ও অবস্থার ছাত্রদের সঙ্গেই তিনি সহজভাবে মেলামেশা করতেন।

তাঁর সহমর্মিতা ও বন্ধুপ্রীতি এমনই অকপট ছিল যে কারো বিপদ দেখলে সকলের আগে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করতেন।

দরিদ্র ছেলেদের তিনি অকাতরে বই কিনে দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে সর্বদা সাহায্য করতেন। আবার নিজেই খরচখরচা করে বন্ধুদের নিয়ে প্রায়ই কাঁথির সমুদ্রতীরে বনভোজনে মেতে উঠতেন।

হাইস্কুলে পড়ার সময়েই বীরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু ঘটে। কলকাতায় ছাত্রাবাসে থেকে তিনি পড়াশুনা করতে থাকেন।

সেইকালের সমাজে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার খুবই প্রবল ছিল। এতটাই যে ছাত্রাবাসগুলিও তার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। কিন্তু এসব বিষয়ে পারিবারিক শিক্ষার গুণেই বীরেন্দ্রনাথের মন ছিল সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউটের ছাত্রাবাসে জাতপাতের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হত না। এখানে তথাকথিত উচ্চ ও নিম্ন জাতির ছাত্ররা একত্রে বাস ও আহার করতে পারত।

একবার একটি উচ্চবর্ণের ছাত্রের অভিভাবক ছাত্রাবাসে আসেন। সেখানে সকল জাতির ছাত্রদের একসঙ্গে বসে আহার করার ব্যবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন।

তিনি এবিষয় নিয়ে যথেষ্ট জল ঘোলা করে তোলেন এবং ছাত্রাবাস থেকে উচ্চ জাতির ছাত্রদের সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেন।

বীরেন্দ্রনাথ কিন্তু তেজের সঙ্গে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করলেন। তিনি কিছুতেই ছাত্রাবাস পরিত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন উচ্চজাতির সকল ছাত্র ছাত্রাবাস ছেড়ে গেলেও তিনি এখানে নিম্নজাতির ছাত্রদের সঙ্গেই থাকবেন এবং নিয়ম অনুযায়ী এক পংক্তিতে বসেই আহার করবেন।

বীরেন্দ্রনাথের প্রবল প্রতিবাদ ও সিদ্ধান্তের ফলে উক্ত অভিভাবকটির সকল উদ্যোগই ব্যর্থ হ'ল, কোনও ছাত্রই আর ছাত্রাবাস ছেড়ে যাবার চেষ্টা করল না।

বীরেন্দ্রনাথের মাতা আনন্দময়ী নিজে গ্রাম্য মহিলা হলেও তাঁর মন ছিল সংকীর্ণতামুক্ত। জাতিভেদের কুসংস্কার তিনি মানতেন না। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় বাস করত কয়েকজন বিভিন্ন জাতির দরিদ্র ছাত্র। বীরেন্দ্রনাথকে ছেলেবেলা থেকেই তাদের সকলের সঙ্গে বসে আহার করতে হত। জননীর সেই শিক্ষা বীরেন্দ্রনাথের জীবনে ব্যর্থ হয়নি। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পা দিয়েই তিনি সেই পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

১৯০১ খ্রিঃ মেদিনীপুরে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সেই সময় বীরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের কলেজের ছাত্র। তিনি উক্ত অধিবেশনে মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধি হিসাবে যোগাদান করেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হন।

বর্তমানে যেই কলেজের নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সেইকালে কলেজের নাম ছিল রিপন কলেজ।

সুরেন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কলেজে ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতেন। তাঁর প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও অধ্যাপনায় নিজেকে তৈরি করার প্রবল বাসনায় বীরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন কলেজে কিছুদিন ক্লাশ করার পর রিপন কলেজে ভর্তি হন।

তাঁর আবাল্যের স্বপ্ন নিজেকে একজন প্রকৃত দেশসেবকরূপে গড়ে তোলা এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করা।

কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন বীরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন, দেশের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হলে দেশের আইনকানুন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। তিনি স্থির করলেন, ইংলণ্ড গিয়ে আইন শিক্ষা করবেন।

বীরেন্দ্রনাথের বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার অভিলাষ জানতে পেরে তাঁর মাতা ও আত্মীয়স্বজনগণ অত্যন্ত বিচলিত হলেন।

সেইকালে যেসকল ভারতীয় ছাত্র ইংলন্ড যেত তাদের অনেকেই সেদেশে গিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, ইংরাজের মেয়ে বিয়ে করে নিষিদ্ধ খাদ্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ত। এই আশঙ্কা থেকেই বীরেন্দ্রনাথের মাতা পুত্রকে বিলাতে পাঠাতে সম্মত হলেন না।

মাতার আশঙ্কা দূর করার জন্য বীরেন্দ্রনাথকে গ্রামের বাড়িতে মাতা ও আত্মীয়স্বজনের সামনে ঈশ্বরের নামে শপথ করতে হল।

এফ. এ. পড়া অসম্পূর্ণ রেখেই বীরেন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করলেন এবং তিন বৎসর সেখানে আইন পড়াশুনা করে সসম্মানে ব্যারিস্টারি পাস করেন।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি সেখানে নির্মল ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন। সর্বদা নিজের পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন এবং কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার হয়, বন্ধুদের সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করতেন।

ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাপান পরিদর্শন করেন। তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৯০৪ খ্রিঃ।

এই সময় থেকেই আরম্ভ হয় তাঁর কর্মজীবন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন।

দুই বৎসর কলকাতায় থাকার পর বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে ফিরে যান এবং জেলাকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

আইন ব্যবসায় বীরেন্দ্রনাথ অচিরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি এই সময় থেকেই জেলার নানাবিধ কল্যাণকাজের সঙ্গেও যুক্ত হন। তিনি ক্রমে মেদিনীপুর জেলা বোর্ড ও পৌরসভারও সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

লর্ড কার্জনের বঙ্গদেশকে ভাগ করার প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রিঃ দেশব্যাপী বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে যোগদান করে স্বদেশী পণ্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করেন।

বছর ছয়েক মেদিনীপুরে থাকার পর ১৯১৩ খ্রিঃ বীরেন্দ্রনাথ পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। সেই বছরই বাংলা সরকার মেদিনীপুর জেলা দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেই সময় জেলাবাসীদের পক্ষ থেকে তাদের মনোভাব জানাবার জন্য গভর্নরের কাছে যে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়, বীরেন্দ্রনাথ সেই দলের সভ্য ছিলেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। সেই ঢেউ এসে পৌঁছায় ভারতেও। যুদ্ধের ডামাডোলে সরকারের মেদিনীপুর জেলা বিভাগের বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়।

১৯২০ খ্রিঃ কলকাতায় ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে

গান্ধীজী দেশবাসীকে অহিংসভাবে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাবার আহ্বান জানান।

বীরেন্দ্রনাথ জাতীয় নেতার আহ্বানে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং সম্পূর্ণ রূপে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য আইন ব্যবসায় ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সেই সময় কলকাতায় তিনি খ্যাতিমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার। বাংলার বাইরেও তাঁর নাম সুপরিচিত। এই অবস্থায় ১৯২১ খ্রিঃ তিনি আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। সেই সঙ্গে তাঁর গাড়ি ও ঘোড়া বিক্রয় করে দেন।

নিজের জেলা মেদিনীপুরই হল বীরেন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্র। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার কার্য আরম্ভ করলেন।

একই সময়ে মেদিনীপুরের আর একটি গণআন্দোলনের সঙ্গেও বীরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হন। তা হল ইউনিয়নবোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলন।

১৯১৯ খ্রিঃ এই বোর্ড চালু করার জন্য যথারীতি আইন পাশ হয়েছিল। কিন্তু সরকারের এই উদ্যোগ ছিল জেলার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। তাই জেলাবাসীদের সঙ্গে বীরেন্দ্রনাথও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হলেন।

আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি মহকুমা শাসককে এক প্রতিবাদ পত্রে জানিয়ে দিলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কোন ট্যাক্স জমা দেওযা হবে না।

এরপর বীরেন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে ঘুরে সভা করে অধিবাসীদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন বোর্ড গঠনের ক্ষতিকর দিকগুলি। তাঁর যুক্তির সঙ্গে একমত হয়ে সকলেই ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করল। ফল হল, সরকারী লোকজন ট্যাক্সের দায়ে গ্রামবাসীদের জিনিসপত্র গরুবাছুর ক্রোক করে নিতে লাগল। কিন্তু তাদের কেউ বাধা দিল না।

সরকারী নিয়ম হল, ক্রোক করা জিনিস বিক্রয় করে ট্যাক্সের টাকা তুলতে হয়। আটক জিনিসপত্র থানায় নিয়ে নিলাম ডাকা হয়।

ক্রোককরা জিনিস কনস্টেবলরাই নিজেরা বয়ে থানায় নিয়ে গেল এবং ঢোল সহরত সহযোগে নিলামের ব্যবস্থা করল।

কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আন্দোলন এতটাই সার্থকতা অর্জন করেছিল যে, পুলিসের ডাকা নিলামের জিনিস কেনার জন্য একজনও ক্রেতা মিলল না।

পুলিস সকলের কাছে চূড়ান্ত অপদস্থ হল। শেষ পর্যন্ত তারা সব বস্তুই পুনরায় মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

বীরেন্দ্রনাথের সক্রিয় আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুর জেলায়২৩৫টি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন রদ হয়ে গেল। পুলিস যাদের গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের সকলকে বিনা বিচারে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

ভারতের আর কোনও অঞ্চলে দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে ব্রিটিশ সরকারকে সম্ভবত এভাবে অপদস্থ হতে হয়নি।

১৯২১ খ্রিঃ বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় কংগ্রেসের সম্পাদক হন। সম্পাদকদের মাসিক বৃত্তি দেওয়া হত একশত টাকা। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ তাঁর পারিশ্রমিক বাবদ কোন টাকা কংগ্রেস দপ্তর থেকে নিতেন না।

ইংলন্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসেন ১৯২১ খ্রিঃ ১৭ নভেম্বর। এই উপলক্ষে দেশব্যাপী প্রতিবাদ হরতলের আহ্বান জানানো হয়। একজন কংগ্রেস সম্পাদক হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ দক্ষতার সঙ্গে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেন।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। একই দিনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁদের ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

কারাগার থেকে মুক্ত হবার পর বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে যান। এই সময় মেদিনীপুরবাসীগণ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেন এবং এই সময়ই তাঁকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে দেশপ্রাণ আখ্যা দেওয়া হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই সময় দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলে যোগদান করেন।

১৯২৩ খ্রিঃ বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সরকার পক্ষের বিরূপতা সত্ত্বেও এই দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি নানাভাবে জেলার উন্নয়নের কাজ করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পুকুর খনন, নলকূপ স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণের ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপক কর্মসূচী তিনি সুচারুরূপে রূপায়িত করেন।

তাঁর পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত জেলার জনগণ জেলাবোর্ডের কাজকর্ম সম্পর্কে কোন খবরই জানতে পেতেন না।

বাংলাদেশের ছোট লাট লর্ড লিটন একবার মেদিনীপুর সফরে আসেন। বীরেন্দ্রনাথ তখন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান। ছোটলাটের উপযুক্ত সম্বধর্নার বিষয়ে আলোচনার জন্য জেলাশাসক মিঃ গ্রেহাম বীরেন্দ্রনাথকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন।

পত্রের উত্তরে স্বাধীনচেতা বীরেন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় জেলাশাসককে জানিয়ে দেন, লাটসাহেবের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়।

কারণ সরকার তাঁকে বিনা প্রমাণে জেলবন্দী করেছিলেন, এই পরিস্থিতিতে তাঁর কাছ থেকে তাঁরা কোনও প্রকার সহযোগিতার আশা করতে পারেন না।

এরপর অন্য কোনও এক উপলক্ষে জেলাশাসক জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রনাথকে তাঁর বাংলোয় ডেকে পাঠান। কিন্তু জেলাশাসক ডেকেছেন বলেই বীরেন্দ্রনাথ বিনীতভাবে উপস্থিত হবার পাত্র ছিলেন না। তিনি পত্র লিখে জানালেন যে প্রয়োজন বোধ করলে জেলাশাসক চেয়ারম্যানের অফিসে এসে কাজের সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

একজন ভারতবাসী হিসেবে বীরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল এমনই প্রবল। জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তাঁর এই তেজোদীপ্ত প্রকৃতির পরিচয় পরিস্ফুট ছিল। তিনি জীবনে কারও কাছে মাথা নত করেননি, নীতির ক্ষেত্রে আপোস করেননি।

বীরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের পক্ষে ১৯২৩ খ্রিঃ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেই সময় তাঁকে চরম অর্থসঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছিল। বঙ্গীয় সরকার তাঁকে বিরোধী পক্ষ ত্যাগ করে মন্ত্রীপদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন।

সেইকালে একজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর মাসিক বেতন ছিল পাঁচ হাজার টাকারও বেশি। নির্লোভ বীরেন্দ্রনাথ কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে সরকারের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি বরং কঠোর ক্লেশ স্বীকার করেছেন কিন্তু কখনও নীতিভ্রষ্ট হবার কথা মনেও স্থান দেননি।

সরকার পক্ষের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯২৫ খ্রিঃ বীরন্দ্রেনাথ দ্বিতীয়বার মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এতে সরকার পক্ষ বিচলিত হয়ে পড়ে।

বীরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার জেলার কল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব লাভ করলে জনগণের মনে স্বাধীনতাব আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হবে, এই আশঙ্কায় সরকার এবারের চেয়ারম্যান নির্বাচন অন্যায়ভাবে বাতিল করে দেন।

১৯২৯ খ্রিঃ কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন মেদিনীপুরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন দমনের জন্য নিরস্ত্র জনগণের ওপরে চলে নির্বিচার পুলিশী নির্যাতন। বহু ঘরবাড়ি ও ধানের গোলা তারা পুড়িয়ে দেয়।

সেই সময় বীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করছেন। পুলিশী নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে তিনি কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুরে যান। গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুলিশের অত্যাচারের তদন্ত করেন।

বীরেন্দ্রনাথ জেলায় এলে প্রলয়কান্ড ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় মেদনীপুরের

জেলা শাসক জেলায় বীরেন্দ্রনাথের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারি করেন।

কিন্তু এত করেও গণনেতা বীরেন্দ্রনাথকে সরকার নিরস্ত করতে পারেনি। নির্ভীক ও তেজস্বী বীরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টে আবেদন করে অতিরিক্ত জেলাশাসকের আদেশ বাতিল করে দেন এবং মেদিনপুরে নির্বিঘ্নে তদন্তের কাজ করেন।

এরপর আরও একবার বীরেন্দ্রনাথের সিংহ বিক্রম প্রকাশ পায় মেদিনীপুরের অঙ্গচ্ছেদের উদ্যোগ হলে। ১৯৩১ খ্রিঃ ওড়িশার নেতৃবর্গ দাবী তোলেন মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেবল মেদনীপুর বলে নয়, যেকোনও ভাবে বঙ্গভূমির অঙ্গচ্ছেদ হলে সমগ্র জাতির পক্ষেই ক্ষতি এই বিবেচনায় বীরেন্দ্রনাথ উক্ত দাবীর প্রচণ্ড বিরধিতা করেন।

তিনি একাই প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করেন এবং তাঁর প্রবল প্রতিরোধের ফলে সরকার মেদিনীপুর বিভাগের প্রশ্ন বাতিল করতে বাধ্য হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে সিংহবিক্রম এই তেজস্বী মানুষটি ছিলেন পরদুঃখকাতর, উন্নত হৃদয় ও মহৎপ্রাণ। তাঁর হৃদয়ের প্রসারতা এমনই ছিল যে রাজনীতিক্ষেত্রে কোনও বিরোধীর বিপদ উপস্থিত হলে নির্দ্বিধায় তিনি তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন।

দুঃখে পড়ে সাহায্যের জন্য কেউ তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন।

বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়েছেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা এবং ১৯৩২ খ্রিঃ ডগলাস হত্যা মামলায় তিনি আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন। মামলার স্বার্থে নিজ অর্থব্যয় করে তিনি কলকাতার বাইরে গিয়েও অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ থেকেছেন।

১৯৩৪ খ্রিঃ বীরেন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনের কাজে সমগ্র বর্ধমান জেলায় ঘুরে ঘুরে তাঁকে সভা করতে হয়েছে। এইসময় অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯শে নভেম্বর নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়। ২৪শে নভেম্বর তিনি সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

একসময় বীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমি জীবনে যে শির কাহারও নিকট নত করি নাই, মরণের পরেও তাহা যেন অবনত করা না হয়। আমাকে যেন উর্ধ্বশিরেই দাহ করা হয়।"

তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ীই বীরেন্দ্রনাথের শবদাহ করা হয়েছিল কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। তাঁর শব চিতায় উপবিষ্ট অবস্থায় রেখেই মুখাগ্নি করা হয়েছিল।

রামনাথ বিশ্বাস

পরাধীন ভারতবর্ষে একজন বাঙালী সন্তান সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় উপযুক্ত কোনও রকম আয়োজন ছাড়াই পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত পর্যটন করেছিলেন। এই গৌরবদীপ্ত বঙ্গসন্তানের কীর্তিকথা স্মরণ করে বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্ব অনুভব হবে।

সাধারণতঃ পর্যটক বা অভিযাত্রী বলতে আমরা বুঝি, তাঁদের সঙ্গে থাকবে দামী ক্যামেরা, রঙচঙ্গে জামা, পকেট বোঝাই থাকবে টাকা, আর দূতাবাসের সহযোগিতা। কিন্তু ভূ-পর্যটক রামনাথের এসব কিছুই ছিল না।

পাড়াগাঁয়ের একজন সাদামাটা বাঙালী, নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায়, কেবল অদম্য সাহস আর প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্বল করে পথের সহস্র বিপদবাধাকে তুচ্ছ করে যে অক্ষয় কীর্তি জাতির সম্মুখে রেখে গেছেন, যুগ যুগ ধরে তা বাঙালী তথা ভারতীয় তরুণদের মনে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

রামনাথের জন্ম অবিভক্ত ভারতের শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৯৪ খ্রিঃ ২২শে মার্চ। তাঁর পিতার নাম বিরজানাথ, মাতা গুণময়ী দেবী।

বিরজানাথ ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। তিনি সরকারী চাকরি করতেন। একবার অফিসে সরকারী নির্দেশ জারী হয়, অফিসে কোনও কর্মীকে দেশীয় পোশাকে আসা চলবে না।

ওপরওয়ালার আদেশ হলেও বিরজানাথের কাছে তা অত্যন্ত অমর্যাদাকর মনে হয়। তিনি পত্রপাঠ কাজে ইস্তফা দেন। এই পারিবারিক পরিবেশ থেকেই রামনাথ লাভ করেন জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও মর্যাদাবোধের শিক্ষা।

বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলমোচনের আহ্বান তখন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। গড়ে উঠছে বিপ্লবী সমিতি। সেখানে সমবেত হচ্ছে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী তরুণের দল।

শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ গ্রামের শহীদ সুশীল সেনের নাম বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। সুশীল সেন ছিলেন রামনাথের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। তাঁরই প্রেরণা ও উৎসাহে রামনাথও কৈশোরেই অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন এবং অবিলম্বেই হয়ে ওঠেন বিপ্লবী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী।

মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার যে আহ্বান তাঁর কিশোর প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল,

তারই প্রেরণায় দেশের তরুণ হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করার তাগিদে পরবর্তীকালে তিনি নেমে পড়েছিলেন দুঃসাহসিক বিশ্বপরিক্রমার পথে।

বানিয়াচঙ হাইস্কুলে পড়াশুনা বেশি দিন করতে পারেননি রামনাথ। ইতিমধ্যে ১৯১৪ খ্রিঃ প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ সরকার। এখানে গঠিত হয় বাঙালি পল্টন ও লেবার কোর। কিশোর রামনাথ স্কুলের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে নাম লেখালেন বাঙালী পল্টনে। পল্টনের সঙ্গে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যান।

১৯২৪ খ্রিঃ সামরিক বিভাগের কাজ ছেড়ে তিনি চলে যান মালয়ে। সিঙ্গাপুরে জাহাজী আদালতে দোভাষীর কাজ গ্রহণ করেন।

সেই সময়ে মালয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের মানুষ কর্মসূত্রে বসবাস করত। বাংলার বহু পলাতক বিপ্লবীও মালয়ে আত্মগোপন করেছিলেন।

এঁদের সকলের সঙ্গেই সহজভাবে মেলামেশা করতেন রামনাথ। এই সময়ে বিভিন্ন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান।

মালয়ে রামনাথের প্রবাসজীবন ছয় বছর, ১৯৩১ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের অজানা থাকে না। তিনি সরকারের সন্দেহভাজন ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হন এবং চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন।

ততদিনে বহুজাতি ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রামনাথের মনে নতুন এক সঙ্কল্প অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

সুদূরের আহ্বান তাঁকে হাতছানি দিয়েছে। তিনি স্থির করলেন, আর গৃহবন্ধনে নয়, বেরিয়ে পড়বেন পৃথিবীর পথে।

সঙ্কল্প কার্যকরী করতেও বিলম্ব করলেন না। একদিন, ১৯৩১ খ্রিঃ ৭ জুলাই তিনি যাত্রা শুরু করলেন সিঙ্গাপুর থেকে। পথের সঙ্গী হল সামান্য একটি সাইকেল আর একটি মানচিত্র বই।

ভূ-পর্যটক রামনাথের এভাবেই আরম্ভ হল পৃথিবীর পথে বিরামহীন পথচলা। সাইকেলে তিনি সমগ্র মালয়, শ্যামদেশ ইন্দোচীন ভ্রমণ করলেন।

গত শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশক এমন একটা সময় যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্যয়কর রাজনৈতিক অস্থিরতা। মালয়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। নানান অশুভ শক্তি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের দিকে দিকে।

মালয়ের রাবার বনের ভেতর দিয়ে চলার সময় একাধিকবার রামনাথকে ডাকাতের কবলে পড়তে হয়। সঙ্গে তাঁর লুণ্ঠিত হবার মতো সম্বল বলতে কিছুই ছিল না। ফলে প্রাণে বেঁচে যান।

মালয় সীমান্ত অতিক্রম করে পর্যটকের দ্বিচক্রযান প্রবেশ করল চীনে।

সেই সময়ে চীনে চলছে কুয়োমিনটাং শাসন। মুষ্টিমেয় ধনীক শ্রেণীর শোষণে নিস্পিষ্ট হচ্ছে দেশের নিঃসম্বল দরিদ্রশ্রেণীর মানুষ। সারা দেশ জুড়ে পীড়ন, অত্যাচার দুর্নীতি আর অরাজকতা। ফলে নানা দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বিদ্রোহ।

এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নির্ভীক রামনাথের সাইকেল পার হয়ে চলল গ্রামের পর গ্রাম।

অনাহারক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এই সময়ে সাহায্য বলতে তিনি পেয়েছেন অতি সামান্যই। প্রায়ই তাঁকে কাটাতে হয়েছে অনাহারে। আশ্রয় নিতে হয়েছে বনে, জঙ্গলের মধ্যে।

কয়েকবার তাঁকে পড়তে হয়েছে বিদ্রোহী গ্রামবাসী ও সৈনিকদের সংঘর্ষের মাঝখানে, ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছেন।

তবে অনেক শহরে ও গ্রামে রামনাথকে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছেন অভ্যর্থনা ও সহযোগিতা।

তিনি তাঁদের কাছে বলেছেন পরাধীন ভারতবাসীর দুঃখ বেদনার কথা, সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন ভারতের গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মানবতার বাণী।

এমনিভাবে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি একসময় পৌঁছলেন কমিউনিস্ট মুক্তাঞ্চল চালিন সোভিয়েট। নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য সেখানে। মুগ্ধবিস্ময়ে তিনি দেখেছেন, আগামী দিনের স্বাধীন সুখী জীবনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ কী অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ করে চলেছে।

জাপান অধিকৃত চীনের রাজধানীর নাম ছিল মুকদেন। রামনাথ এবার পৌঁছলেন সেখানে। পথে পথে বেয়নেটধারী জাপানী সৈনিক। তাদের কাছেও বার বার বাধা পেতে হয়েছে তাঁকে।

মাঞ্চুরিয়া পার হয়ে অভাব-অনটনের দেশ কোরিয়া, সেখান থেকে পৌঁছলেন জাপান। এই দীর্ঘ পথের সর্বত্রই তিনি দেখেছেন মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর প্রতিপত্তি।

তাদের শাসনে শোষণে নির্যাতিত অত্যাচারিত হচ্ছে সাধারণ শ্রমজীবী

মানুষ। সর্বত্রই সাধারণ শ্রেণীর মানুষের একই চিত্র। মানুষের লাঞ্ছনা অবমাননা দেখে গভীর বেদনায় মুহ্যমান হন রামনাথ।

ভারতের পলাতক বিপ্লবী-গুরু রাসবিহারী ছিলেন জাপানে। রামনাথের সাক্ষাৎ হল তাঁর সঙ্গে। অভিভূত হলেন বিপ্লবী নেতার চাঞ্চল্যকর জীবনকাহিনী শুনে।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ও জাপানী গোয়েন্দার নজরে এসে গেছেন রামনাথ। ফলে অবিলম্বে তাঁকে জাপান ত্যাগ করতে হল।

জাপান থেকে রামনাথ জাহাজে দীর্ঘ সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছলেন কানাডা। কিন্তু জাহাজ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে একমাস জেল খাটার পর মুক্তি পেলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে ফেরত পাঠানো হল জাপানে।

জাপানের কাছেও রামনাথ অবাঞ্ছিত। তাই স্থান হল না সেখানে। ফেরত জাহাজেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল চীনে।

সাংহাই বন্দরে অবতরণের পর রামনাথ চলে যান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ঘুরে ঘুরে উপস্থিত হলেন বলীদ্বীপে।

বলীদ্বীপের অধিকার তখন ডাচদের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হলেন রামনাথ। কপালে জুটল আবার কারাবাস।

কিছুদিন কয়েদ রাখার পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সিঙ্গাপুরে।

এইভাবেই রামাথের প্রাচ্য পরিভ্রমণের প্রথম পর্ব শেষ হল। এরপর স্থির করলেন ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য হয়ে পৌঁছাবেন ইউরোপ।

শুরু হল যাত্রা। পিনাং মারগুই বন্দর হয়ে তিনি প্রবেশ করলেন ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। সেখান থেকে পাহাড়, অরণ্য নদী নালা অতিক্রম করে পৌঁছলেন উত্তর-পশ্চিম অংশে।

সামনেই স্ব-ভূমি ভারতের মনিপুর। মনিপুরের পথ বেয়ে তাঁর অভিযাত্রা চলল পেশোয়ারের মধ্য দিয়ে।

পার হলেন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, পরে বিন্ধ্য হিমাচল পাঞ্জাব। অতিক্রম করলেন ভারত সীমান্ত। তারপর দুর্গম খাইবার গিরিপথ হয়ে পৌঁছলেন আফগানিস্তান।

ক্লান্তিহীন পথচলার বিরাম নেই। আফগানিস্তান থেকে পাহাড় কন্দর সহর-নগর অতিক্রম করে একে একে পার হলেন ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন এবং সর্বশেষ তুরস্ক।

দ্বিচক্রযান যে সময় যেদিক দিয়ে গিয়েছে, সেই জায়গার মানুষের জীবনযাত্রার

পরিচয় জেনেছেন রামনাথ। কত ধরনের মানুষের যে সাহচর্যে এসেছেন তিনি এই সময়, তাঁর সঞ্চয়ের থলিতে জমেছে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা।

ভ্রূক্ষেপ করেননি খর রৌদ্রের তাপ, অজানা পথের প্রতিকূলতা, ঝঞ্ঝা, তুষারপাত, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা। সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে তাঁর সাইকেল।

কতবার পথে আক্রান্ত হয়েছেন অসুখে। পথের পাশে গাছতলাই হয়েছে তাঁর আশ্রয়। সেই অবস্থায় ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দেরও কোনও প্রকার সাহায্য জোটেনি তাঁর ভাগ্যে।

তীব্র দাবদাহে একবার আফ্রিদি মুলুকে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলেন পথের পাশে। সেই সময় দুর্ধর্ষ পাঠান যুবকরা সেবাশুশ্রূষা করে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছে।

মানুষের বিচিত্র রূপ তিনি দেখেছেন তাঁর পর্যটনের পথে পথে। পথের সব সঞ্চয় সযত্নে রক্ষা করেছেন তিনি তাঁর ডায়েরীর পাতায়।

তুরস্কের পরে রামনাথ প্রবেশ করলেন ইউরোপে। একে একে গেলেন বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে। ফ্রান্স থেকে পৌঁছলেন ইংলন্ডে।

রামনাথ যে সময় ইউরোপ পরিভ্রমণ করেছেন, সেই সময় জার্মানীর নাৎসী নেতা হিটলারের উগ্র জাতিদম্ভের উন্মাদনা মহাদেশের আকাশে অশুভ ছায়া বিস্তার করেছে।

এই অস্থির ও উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে শহরে ও গ্রামে ইউরোপের সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁচেছেন রামনাথ। অনুভব করেছেন তাদের জীবনের স্পন্দন, পরিচিত হয়েছেন তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে, শিখেছেন তাদের ভাষা।

নাৎসি দলের কার্যকলাপ খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে রামনাথের। সুচতুর কৌশলে সেখানে শিশুদের মনে ঘৃণার বীজ রোপন করা হচ্ছিল, ইহুদি, অনার্য স্লাভ ও নাস্তিক কমিউনিস্টদের প্রতি যাতে তারা নির্মম ও ক্ষমাহীন হয়ে উঠতে পারে।

সেই সর্বনাশা ভয়ঙ্কর দিনগুলির অভিজ্ঞতার বিবরণে ভরে উঠেছে রামনাথের ডায়েরীর পাতা।

পথক্লান্ত পর্যটক ইংলন্ডে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন দেশে।

মাস ছয়েক পরেই আবার রওনা হলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকার পথে। সেখানে তখন শ্বেতাঙ্গদের রাজ্যপাট। তাদের নির্মম নির্যাতন, পীড়ন শোষণে সহজ সরল কালো মানুষদের জীবন বিধ্বস্ত।

জাহাজে মোম্বাসা পৌঁছে তিনি একে একে ভ্রমণ করলেন কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা। উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া হয়ে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকা। সর্বত্রই তিনি কালো মানুষদের কাছে পেয়েছেন সরল আন্তরিক ব্যবহার। মিশেছেন তাদের সঙ্গে আপনার জনের মতো।

অরণ্যসঙ্কুল আফ্রিকা পরিভ্রমণের সময় রামনাথকে বহুবার গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে।

কিন্তু হিংস্র বন্য প্রাণীর ভয়ে তাঁকে কখনও শঙ্কিত হয়ে পথচলা বন্ধ করতে হয়নি। নির্ভয়ে পথ চলেছেন।

কিন্তু রামনাথ শিহরিত হয়েছেন আফ্রিকা জুড়ে সভ্যতাভিমানী শ্বেতাঙ্গদের অমানবিক বর্ণবিদ্বেষ দেখে।

তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হয়েছে তাঁর হৃদয়, ধিক্কার দিয়েছেন মানুষের বর্বরতাকে।

আফ্রিকার পরে আমেরিকা। সেখানে তিনি লাভ করলেন সম্বর্ধনা। ততদিনে পর্যটক হিসেবে পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর নাম। তাই সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় তাঁর পথের কৃচ্ছ্রতা অনেক কমেছে, মিটেছে অর্থের অভাবও।

রামনাথ যখন যে দেশে গেছেন, সাধারণ খেটেখাওয়া অবহেলিত মানুষদের মধ্যেই নিজের স্থান করে নিয়েছেন। দেশের প্রকৃত অবস্থাটি তিনি তাদের মধ্যেই প্রতিফলিত হতে দেখেছেন।

এই বঞ্চিত মানুষদের রক্তাক্ত জীবনের কথাকেই পরে তিনি তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

একবার রবীন্দ্রনাথ রামনাথকে বলেছিলেন, নিগ্রোদের মধ্যে অনেক ভাল জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি যেন সেসব সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন।

রামনাথ তাঁর আফ্রিকা ও আমেরিকা ভ্রমণের সময় কবিগুরুর উপদেশ স্মরণে রেখেছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রমণ কাহিনীগুলি পড়লে।

আমেরিকায় বহু প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে রামনাথ তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনিয়েছেন। সর্বত্র তিনি রক্তঘামে সিক্ত পরাধীন মানুষের করুণ জীবনের কথা তাঁর ভ্রমণ বিবরণের সঙ্গে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পশ্চিমের আকাশ জুড়ে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে তার লেলিহান শিখা।

এই সর্বনাশা অবস্থার মধ্যেই রামনাথ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলেন কানাডায়। বিশ্বপর্যটকের সম্মানেই তিনি অভ্যর্থিত হন সেখানে। স্বচ্ছন্দেই কানাডা ভ্রমণ শেষ করলেন তিনি।

যুদ্ধের আগুনের তাপ ততদিনে এতটাই বেড়ে গেছে যে রামনাথের পক্ষে প্রবাসে থাকা আর সম্ভব ছিল না। কানাডাতেই তাঁর বিশ্বভ্রমণের সমাপ্তি টানতে হল। ১৯৪০ খ্রিঃ তিনি ফিরে এলেন দেশে।

বিশ্ব পর্যটকের উপস্থিতি তাঁর দেশের মানুষের মনে স্বাভাবিক ভাবেই পৃথিবীর নানা দেশ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছিল। তাই ক্রমাগত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণ তাঁর কাছে আসতে লাগল। সানন্দে সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন তিনি।

শুরু হল রামনাথের ব্যস্ততায় ভরা এক নতুন জীবন। দেশের নানাপ্রান্তে ঘুরে ঘুরে তিনি স্কুলে কলেজে সভায় সমিতিতে তাঁর বিশ্বভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা দেশের মানুষকে শোনাতে লাগলেন।

বিশেষ করে তরুণদের তিনি দেশ-বিদেশের মরণজয়ী সংগ্রামী মানুষের কথা শুনিয়ে তাদের মধ্যে মানুষের প্রতি মমত্ব, দেশের প্রতি ভালবাসা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

একই সময়ে তিনি কলম ধরেছেন তাঁর বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতার কাহিনী রচনায়। অসংখ্য বই লিখেছেন তিনি।

তাঁর রচনা ছিল সহজ সবল মনোগ্রাহী। কোনও তত্ত্ব আলোচনা বা বাগাড়ম্বর তিনি তাঁর লেখায় প্রশ্রয় দেননি। যেসব দেশ ঘুরেছেন, যেসব মানুষকে দেখেছেন, কেবল সেই অভিজ্ঞতাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর লেখায় সমসাময়িক কাল ও মানুষ যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, "প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা, পাহাড় সমুদ্র অরণ্যের কথা লিখতে আমি আসিনি, এসব কথা মানুষ অনেক পড়েছে, পরেও পড়বে। আমি এসেছি, মানুষের কথা লিখতে, কারণ যে মানুষকে আজ দেখছি, পরে তো তাকে পাব না।"

বস্তুত রামনাথ রচনা করেছেন কাহিনী-বিহীন পথের পাঁচালী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিরাড়ম্বর বাহুল্যবর্জিত সহজ ভাষায়।

এটা সত্য যে আজকের দিনে তাঁর এই সব রচনা আধুনিক পাঠক সমাজের সমাদর লাভ করবে না। কিন্তু কালের ইতিহাস, মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস

যাঁদের আগ্রহের বিষয় তাঁদের কাছে রামনাথের বইগুলোর মূল্য কোনও দিনই কমবে না।

পৃথিবীর দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের জীবনেতিহাস পাঠ করে আমরা বিস্মিত চমৎকৃত হই। ভূ-পর্যটক রামনাথের পর্যটক জীবন তাঁদের তুলনায় কোনও অংশেই কম রোমাঞ্চকর নয়।

পৃথিবীর অজানা সব দেশ তিনি ঘুরেছেন একটি সাইকেল মাত্র সম্বল করে, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায়।

পথে পথে সম্মুখীন হয়েছেন নানা বাধার। তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে, অপমান, লাঞ্ছনা, এমন কি দৈহিক নিগ্রহ পর্যন্ত। পড়তে হয়েছে হিংস্র শ্বাপদের সামনে. সম্মুখীন হয়েছেন লুণ্ঠন, অত্যাচার হত্যাকাণ্ডের ঘটনার।

রোমহর্ষক সেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই নির্ভীক পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হয়েছেন।

পথকে সঙ্গী করে বেরিয়েছিলেন রামনাথ. পথই ছিল তাঁর আশ্রয়। পথে-প্রান্তরে, জঙ্গলে গাছতলায় রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। সভ্য মানুষের হোটেলে তাঁর ঠাঁই হয়নি।

একমাত্র নির্ভর সাইকেলটিকে সঙ্গে নিয়ে কখনও খেয়ে কখনও না খেয়ে, চলতে হয়েছে তাঁকে। যেখানে যেটুকু পেয়েছেন হাসিমুখে সকৃতজ্ঞতায় গ্রহণ করেছেন।

ব্রিটিশ ভারতের নাগরিক ছিলেন রামনাথ। ব্রিটিশের দেওয়া পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়েই ঘুরেছেন তিনি। তবুও ইংরাজের গোয়েন্দাদের পীড়ন তাঁকে সইতে হয়েছে বারবার।

তাঁকে বারবার নানা অছিলায় নিবস্ত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দুঃসাহসী এই পর্যটকের পৃথিবীকে জানার আগ্রহ এতই প্রবল ছিল যে সব বাধাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন।

ভ্রমণকালে কোনও বিপদ-আপদ হলে, এমন কি মৃত্যু হলেও তার জন্য সরকার দায়ী হবে না, এমনি মুচলেকা দিয়ে বিপদসঙ্কুল অজানা পথে চলতে হয়েছে রামানথকে।

আজকের সহজসাধ্য পর্যটনের যুগে এমন এক দুঃসাহসী নিঃস্ব মানবদরদী বাঙালী পর্যটকের কাহিনী আমাদের রোমাঞ্চিত বিহ্বল করে বৈকি।

কলকাতায় ১৯৫৫ খ্রিঃ ১লা নভেম্বর রামনাথ পরলোকের পথে অভিযাত্রা করেন।

উদয়শঙ্কর

ভারতের নৃত্য ও সঙ্গীতকে বিশ্বের দরবারে সর্বপ্রথম সার্থকভাবে উপস্থাপন করে স্মরণীয় হয়ে আছেন নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে ভেঙ্গে নতুন নতুন নৃত্যভঙ্গি রচনা করে ভারতীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টিশীল এক জাগরণ ঘটিয়েছিলেন।

উদয়শঙ্করের স্বকীয় সমস্ত উদ্ভাবনার প্রেরণা ছিল স্বদেশের ধ্রুপদী নৃত্য ও লোকনৃত্য। পাশ্চাত্যে তিনি ছিলেন প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অন্যতম দূত।

উদয়শঙ্করের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার কালিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা শ্যামশঙ্কর চৌধুরী, মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী। তাঁদের পারিবারিক পদবী চট্টোপাধ্যায়। চৌধুরী হল খেতাব।

বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত, আইনবিদ ও সৌখিন সঙ্গীতশিল্পী শ্যামশঙ্কর ছিলেন উদয়পুরে কালোয়ার রাজার দেওয়ান। সেখানেই ১৯০০ খ্রিঃ উদয়শঙ্করের জন্ম।

শ্যামশঙ্করের চার পুত্রের মধ্যে উদয়শঙ্কর জ্যেষ্ঠ। পিতার সঙ্গীত প্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন তিনি।

উদয়শঙ্করের স্কুলের শিক্ষা শুরু হয়েছিল কালিয়াতে। তারপর মাতুলালয় গাজিপুরে ও কাশীর বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন।

কৃষ্টি সম্পন্ন পরিবারের পরিবেশ বাল্য বয়স থেকেই উদয়কে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাছাড়া ছবি আঁকার দিকেও ছিল তাঁর সহজাত ঝোঁক।

গাজীপুরে ও কাশীতে শৈশব কৈশোরের দিনগুলোতে রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। লোক-সঙ্গীতের প্রাণ মাতানো সুর ও নৃত্যের ছন্দে তাঁর হৃদয়ে দোলা লাগত। কোন সুদূরের হাতছানি যেন তিনি অনুভব করতেন এসবের মধ্যে।

পড়াশুনার চাইতে ছবি আঁকাতেই উদয়ের ছিল বেশি উৎসাহ। তাই তাঁকে ভর্তি করা হয় বর্তমান মুম্বই-এর জে. জে. স্কুল অব আর্টস-এ।

সেই সময় কর্মসূত্রে শ্যামশঙ্কর বাস করছিলেন লণ্ডনে। মুম্বই-এর আর্ট স্কুলে কিছুদিন ক্লাশ করার পরে উদয় পিতার কাছে চলে যান এবং ১৯১৯ খ্রিঃ লণ্ডনে রয়াল কলেজ অব আর্টসে ভর্তি হন।

সেই সময় ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী উইলিয়াম রদেনস্টাইন।

লণ্ডনে অবস্থান কালে তরুণ উদয়শঙ্কর আকৃষ্ট হন ইউরোপীয় আধুনিক পেইটিং-এর দিকে। তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করে একদিন রদেনস্টাইন উদয়কে ভারতীয় শিল্পরীতি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, 'ভারতের বিস্ময়কর শিল্প সম্ভার আমি দেখেছি। তুমি ভারতীয় রীতি গ্রহণ করে তার উন্নতি কর।....'

রদেনস্টাইন উদয়কে পাঠান ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কিউরেটরের কাছে। সেখানে ভারত শিল্প সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েক শো বই তাঁকে দেওয়া হয়। রদেনস্টাইনের পরামর্শ মতো সেইসব বইয়ের মধ্যেই ডুবে গেলেন উদয়।

এই প্রথম যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন তিনি। শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্য বিষয়ে এর আগে তাঁর বিশেষ ধারণা ছিল না। রদেনস্টাইনের প্রেরণায় তিনি নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেন।

ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক বই উদয়ের এতটাই সাহায়ক হল যে কলেজের পাঁচ বছরের কোর্স তিনি তিন বছরেই সম্পূর্ণ করলেন এবং এ. আর. সি. এ ডিগ্রি ও কম্পোজিশনে ডিপ্লোমা পেলেন।

এই সময় কল্পনাশ্রয়ী চিত্র অঙ্কনের জন্য স্পেনসার পুরস্কারও উদয়কে দেওয়া হয়।

চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে উদয়শঙ্করকে বিধিমাফিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু নৃত্যকলায় রীতিসঙ্গত কোনও শিক্ষাই তিনি পাননি।

শৈশবে ও যৌবনে গ্রাম্য ও দেশীয় নৃত্যগুলোই তাঁর মধ্যে সঞ্জীবিত ছিল। সেই পুঁজি সম্বল করে কলেজে এক অনুষ্ঠানে একটি নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন উদয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেডি দোরাবজী টাটা।

উদয়ের নৃত্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি তাঁকে ওয়েম্বলি একজিবিশন থিয়েটারে ভারত দিবসে নাচতে অনুরোধ করেন। উদয় সেখানে শিবনৃত্য পরিবেশণ করে সকলের প্রশংসা লাভ করেন।

ছিলেন চিত্রশিল্পের জগতে। কিন্তু নৃত্যকলা যেন এক অদৃশ্য আকর্ষণে উদয়কে ক্রমে ক্রমে নিজের দিকে টেনে নিতে লাগল।

এরপর আর এক বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর অনুষ্ঠানে নাচের সুযোগ পেলেন উদয়। ১৯২১ খ্রিঃ ৩০ জুন একটি উদ্যান সম্মেলনে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সামনে তরবারি নৃত্য ও অন্য কয়েকটি নৃত্য পরিবেশন করে উচ্চ প্রশংসা পান। উদয়ের সঙ্গে করমর্দন করে সম্রাট তাঁর প্রশংসা করেন।

উদয়ের সৃষ্টিশীল প্রতিভাই তাঁকে নৃত্যের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। রীতি মাফিক নৃত্যের শিক্ষা তত ছিল না। কিন্তু যেসব দেশীয় লোকনৃত্য তাঁর স্মৃতিতে ছিল, সেগুলোকে ভেঙ্গেই তিনি নতুন আঙ্গিকে নৃত্যভঙ্গি রচনা করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

লণ্ডন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ রদেনস্টাইনের মাধ্যমে বিখ্যাত রুশ নৃত্যশিল্পী অ্যানা পাভলোভার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন উদয়। তিনি উদয়কে তাঁর জন্য ভারতীয় বিষয়ে দুটি ব্যালে রচনা করে দিতে বলেন।

উদয় রচনা করলেন 'হিন্দু বিবাহ' ও 'রাধাকৃষ্ণ নৃত্য' নামে দুটি ব্যালে। এই ব্যালেতে ষাট জন তরুণ-তরুণীকে উদয় কঠোর পরিশ্রম করে নাচ শিখিয়েছেন।

'রাধাকৃষ্ণ' নৃত্যে উদয় হন কৃষ্ণ আর পাভলোভা রাধা। দুটি ব্যালে প্রদর্শিত হয় রয়াল অপেরা হাউসে এবং দর্শকদের বিপুল প্রশংসা লাভ করে।

পাভলোভার সঙ্গে নৃত্যে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উদয়শঙ্করের নৃত্যশিল্পী জীবনের পালা শুরু হয়।

এরপর পাভলোভার আমন্ত্রণে উদয় তাঁর নৃত্যদলের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করেন। নয় মাস ধরে কানাডা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, মেকসিকো এবং আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে সফর করেন।

পাশ্চাত্য নৃত্যদলের সান্নিধ্যে এসে তাদের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, উপস্থাপন রীতি ও প্রদর্শন দক্ষতা, সর্বোপরি সকলের কর্মনিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা দেখে বিস্মিত হন উদয়। এই অভিজ্ঞতা পরে তাঁর নিজস্ব দল গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল।

পাভলোভা উদয়কে পশ্চিমী নৃত্যকলার অনুসরণ না করে প্রাচ্যের শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেন। উদয়কে তিনি এক সময় বলেছিলেন, "আমি তোমাদের দেশে গিয়েছি। সেখানে সুন্দর সুন্দর নৃত্য দেখেছি।... সেই আশ্চর্য ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের দল নিয়ে তুমি এ দেশে আসবে। এটাই হবে তোমার ভবিষ্যতের কাজ"।

বিদেশিনী পাভলোভার এই উপদেশ ও পরামর্শ পরে উদয়ের নিজস্ব কর্মপন্থা রূপায়নের ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ করেছিল, তা বলাই বাহুল্য।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর পাভলোভার দল ছেড়ে দিয়েছিলেন উদয়। এবার লণ্ডনে নিজেই একটা দল গড়বেন মনস্থ করলেন। কিন্তু নতুন নাচের দল করবার উপযুক্ত কোনও প্রস্তুতিই ছিল না তাঁর। সব চেয়ে আগে যেটা দরকার সেই টাকাতেই টান ধরেছিল তাঁর।

শ্যামশঙ্কর পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন চিত্রবিদ্যা শেখার জন্য। চিত্রবিদ্যা ছেড়ে পুত্র পাভলোভার নাচের দলে যোগ দিয়েছে শুনে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হন। পুত্রের মতিগতি তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন। উদয়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বিদেশ বিভূঁয়ে টাকার জন্য কার কাছে হাত পাতবেন? এই সংকট সময়ে জীবিকার্জনের পন্থা বলতে নৃত্যই হয়ে উঠল তাঁর একমাত্র সম্বল।

এই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে, প্রেক্ষাগৃহে নৃত্য প্রদর্শন করতে থাকেন। নাচ কখনও বা যাদু প্রদর্শন, সবই এই সময় করেছেন তিনি।

কিন্তু এত করেও অর্থ সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হল না। অভাব দিন দিনই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল।

প্রতিটি নতুন দিনই যেন অধিকতর কঠিন হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত নিরাশা গ্রাস করল তরুণ উদয়ের সমস্ত স্বপ্ন-কল্পনাকে। একদিন মনস্থির করে নিলেন, ভবিষ্যৎ যার অন্ধকার ঘেরা তার পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কী লাভ? বরং টেমসের জলে আত্মবিসর্জন করে সকল বেদনা হতাশার অবসান ঘটানোই শ্রেয়।

এক সন্ধ্যায় অন্ধকারে টেমস নদীতে ডুবে মরার পরিকল্পনা নিয়ে উদয় উঠে গেলেন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের ওপরে। সৌভগ্যবশতঃ টহলদার লণ্ডন পুলিস সেদিন দেখতে পেয়ে উদয়কে ব্রিজ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। উদয়ের আর আত্মহত্যা করা হয় না।

ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো এক ইতালীয় বন্ধু উদয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এই দুঃসময়ে। তিনি তাঁকে প্যারিসে যাবার পরামর্শ দেন। প্যারিস হল ইউরোপের শিল্পসংস্কৃতির পিঠস্থান। সেখানেই তিনি তাঁর প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবেন।

ইতালীয় বন্ধুটি কিছু অর্থ তুলে দিলেন উদয়ের হাতে। আর অনুষ্ঠানে সাহায্য করার জন্য তাঁর দুই মেয়েকেও দিয়ে দিলেন সঙ্গে।

প্যারিসে এসে উদয় জীবন আরম্ভ করলেন ক্যাবারে নর্তক হিসেবে। বন্ধুর মেয়ে দুটি হল তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী।

এভাবেই কাটতে লাগল দিন। ততদিনে বুঝি দুর্ভাগ্যের মেঘও কাটতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতের সোপান তৈরিয় একটা সুযোগ আকস্মিকভাবেই পেয়ে গেলেন তিনি।

প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক সংকৃতি মেলার আয়োজন হয়েছিল। সেখানে ফরাসী প্রেসিডেন্টের সামনে নৃত্যানুষ্ঠান করলেন উদয়। অভিনন্দন আর প্রশংসা তাঁর মনের সমস্ত গ্লানি মুছে দিল।

আশায় আনন্দে নতুন করে বুক বাঁধলেন তিনি। ভবিষ্যতের পথ যেন আবার দৃশ্যমান হল। প্যারিস প্রদর্শনীর দিনটি প্রসঙ্গে উদয় পরে নিজেও বলেছেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে সফল ও মধুর ছিল সেই ক্ষণটি.... সত্য বলতে প্যারিসই আমাকে করে তুলেছিল উদয়শঙ্কর।'

ইতালীয় বন্ধুর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। উদয় তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি পেলেন প্যারিসে। সেই বন্ধুর স্মৃতি সারা জীবন তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

এরপর আর উদয়কে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। নৃত্যের তালে তালে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার দোলায় দুলে দুলে ইউরোপের মাটিতে পার হয়ে গেল একে একে এগারটি বছর।

এই সময়ে তিনি রচনা করেছেন নতুন নতুন নৃত্যভঙ্গি। কঠোর অনুশীলনের মধ্যে তৈরি করেছেন এক একটি অধ্যায়। তাঁকে সঙ্গীত রচনা করতে হয়েছে ইউরোপীয় অর্কেস্ট্রার জন্যও। প্রতিটি দিন ছিল ছকে বাঁধা। তেরো-চোদ্দ ঘণ্টা করে খাটতেন নিরলস ভাবে।

ইউরোপ প্রবাসের এগারো বছরে প্যারিস ছাড়াও সমগ্র ইউরোপ তিনি ঘুরেছেন নৃত্যদল নিয়ে। তাঁর দলের প্রধান মহিলা শিল্পী ছিলেন ফরাসী মেয়ে সিমকি।

একদিন অর্থের অনটনের জ্বালা সইতে না পেরে টেমসের জলে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, সাফল্যের প্রাপ্তির পরে সেই অর্থ আর অধরা রইল না। অর্থ সম্পদ সবই পেলেন তিনি।

এলিস বোনারে ছিলেন একজন সুইডিস চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। ভারতীয় নৃত্যের বিপুল ঐতিহ্যের বিষয়ে অবহিত করে তিনিও উদয়কে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নানাভাবেই উদয়কে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সহায়তা করেছেন।

এগার বছর পরে দেশে ফিরে তাঁর সঙ্গেই উদয় কাশ্মীর থেকে মালাবার হিলস পর্যন্ত ভ্রমণ করেন।

এই ভ্রমণে নিজের দেশের জীবনধারা ও নৃত্যকলার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন উদয়।

এক বছর ধরে সারা ভারত ঘুরেছেন তিনি। অজন্তা, ইলোরা, বাঘ ও এলিফ্যান্ট গুহা, কোনারক, মহাবলীপুরমের প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির লীলায়িত ভঙ্গিমার মধ্যে তিনি পেলেন নতুন নতুন নৃত্য রচনার প্রেরণা। দেশীয় নৃত্যগুলি তিনি দেখলেন নতুন দৃষ্টি নিয়ে।

নৃত্য হল এক সজীব সৌন্দর্য। হৃদয়ের বিচিত্র আবেগ অভিব্যক্ত হয় নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে। উদয়ের মনে হল, ভারতীয় নৃত্যরীতির মধ্যে একমাত্র কথাকলির মাধ্যমেই সমস্ত আবেগের অভিব্যক্তি প্রকাশ সম্ভব। তিনি শঙ্করন নাম্বুদ্রির কাছে কথাকলি নৃত্য শিক্ষা করলেন।

পরে গুরু শঙ্করন তাঁর অনুরোধে কথাকলি আঙ্গিকে 'কার্ত্তিকেয় নৃত্য' রচনা করে দেন। উদয় নিজেও অসংখ্য নৃত্য সৃষ্টি করেছেন কথাকলির আঙ্গিককে ভাঙ্গাগড়া করে। তাঁর নৃত্যকলা কোনও বিশেষ আঙ্গিকের বন্ধনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।

এই সময়কালে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দেশীয় নানা সঙ্গীত-যন্ত্র, পোশাক ও অলঙ্কার সংগ্রহ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এই সময় দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন উদয়।

ভারতে উদয় তাঁর প্রথম নৃত্য প্রদর্শন করেন কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে। বিপুল প্রশংসায় অভিনন্দিত হন তিনি।

এরপর তিনি ফিরে গেলেন প্যারিসে। তাঁর সঙ্গে ইউরোপে এলেন তিন ভাই রাজেন্দ্রশঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর, রবিশঙ্কর, কাকা কেদারশঙ্কর ও তাঁর কন্যা কনকলতা, তিমিরবরণ, বিষ্ণুদাস শিরালি। এখানে উদয়ের নৃত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিলেন সিমকি।

প্যারিসে একটা বাড়ি ভাড়া করে সম্প্রদায়ের নাম ঝোলানো হল—উদয়শঙ্কর্স কোম্পানি অব হিন্দু ডানসার্স অ্যান্ড মিউজিশিয়ানস।

নিজের সম্প্রদায়ের জন্য নৃত্য রচনা ও শিক্ষাদানের কাজে এ সময় প্রায় সারাদিনই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর নতুন ধরনের নৃত্যের উপযোগী সঙ্গীত রচনা করতেন দলের সঙ্গীত শিল্পীরা। রবিশঙ্কর সঙ্গীত সৃষ্টির কাজে শিল্পীদেরও সাহায্য করতেন।

লোকসঙ্গীতের যেসব বাদ্যযন্ত্র তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন, সেই যন্ত্রগুলোকে সব সময় প্রচলিত ভঙ্গিতে ব্যবহার করতে চাইতেন না তিনি। সেসব যন্ত্র ব্যবহার করার নতুন নতুন ধরন আবিষ্কার করতেন।

জাতশিল্পী উদয়ের ঝোঁক ছিল সব সময়ই নতুন কিছু করার। তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা এভাবে নতুন সৃষ্টির মধ্যেই তাঁকে ডুবিয়ে রাখত।

নৃত্যই ছিল উদয়শঙ্করের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু বিশেষ কোনও রীতির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন নি। প্রয়োজন মতো বিভিন্ন রীতি থেকে সাহায্য নিয়ে রচনা করতেন নৃত্যের নতুন ভঙ্গি ও বিন্যাস।

প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে পরিবেশনাটুকুও পরিপাটি হওয়া চাই। সেক্ষেত্রেও উদয়শঙ্করের নিজস্ব চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁর মঞ্চসজ্জা ও আলোক্ষেপন ইত্যাদি হত সম্পূর্ণ আলাদা।

পাশ্চাত্যে নিজস্ব সম্প্রদায় নিয়ে উদয়শঙ্কর প্রথম অনুষ্ঠান করেন প্যারিসে, ১৯৩১ খ্রিঃ। নিখুঁত অনুষ্ঠানের উচ্চ প্রশংসা ছাপা হল প্রথম শ্রেণীর কাগজগুলোতে।

রাতারাতি তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল চর্তুদিকে। একের পর এক সফল অনুষ্ঠানের মাধ্যামে বৃদ্ধি পেল সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা।

এরপর আর থামতে হয়নি উদয়শঙ্করকে। ১৯৩১ খ্রিঃ থেকে ১৯৩৮ খ্রিঃ

পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর তিনি ইয়োরোপ, আমেরিকা ও কানাডার বহু স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করলেন। সর্বত্রই তিনি দর্শকদের বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন।

সেই সময়ে ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যের বিষয় পাশ্চাত্যে অপরিচিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর কর্মকৃতিত্বের গৌরবের মধ্যেই তা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এশিয়ার এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের যশোগাথা তখন ব্যাপ্ত বিশ্বজুড়ে। এমনি সময়ে ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীতের পরিচয় বহির্বিশ্বের মানুষ প্রথম লাভ করে উদয়শঙ্করের মাধ্যমে।

তাঁর বিখ্যাত নাচের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্ত্তিকেয় নৃত্য, অসিনৃত্য, নটরাজ, ইন্দ্র নৃত্য, হরপার্বতী নৃত্য। তিনি মঞ্চে কখনও একক কখনও সিমকির সঙ্গে নেচে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন।

অনবদ্য নৃত্যের সৌন্দর্যের সঙ্গে সাবলীল সুরলহরী ছিল উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্পদ। দুয়ে মিলে মঞ্চে স্বর্গীয় সুষমা সৃষ্টি হত।

তাঁর সম্প্রদায়ে স্বদেশের সেই সময়ের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত শিল্পী যোগ দিয়েছিলেন। শচীন দেববর্মণ, আলাউদ্দীন খাঁ, তিমিরবরণ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, আলি আকবর খাঁ প্রমুখ তাঁর সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১৯৩৩ খ্রিঃ রবিশঙ্কর বিশ্বভারতীতে আসেন। এখানে তিনি তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে ইন্দ্রনৃত্য ইত্যাদি প্রদর্শন করে মুগ্ধ কবির আশীর্বাদ লাভ করেন।

প্যারিসে উদয়শঙ্করের সঙ্গে পরিচয় হয় অমলা নন্দীর। তিনি প্রথমে নৃত্য গুরুর কাছে নৃত্য শিক্ষা করেন এবং পরে উদয়ের নৃত্য সম্প্রদায়ে যোগ দেন। আরও পরে ১৯৪২ খ্রিঃ অমলার সঙ্গে উদয়শঙ্কেরের বিবাহ হয়।

দীর্ঘ প্রবাসবাসের পর ১৯৩৯ খ্রিঃ উদয়শঙ্কর দেশে ফিরে আলমোড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন উদয়শঙ্কর কালচার সেন্টার। এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন।

এখানে সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে নাট্র শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। সঙ্গীত ও নৃত্যের বিশিষ্ট গুরুগণের সমাবেশে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিবেশ হয়ে উঠেছিল শিল্প ও শিল্পীমনের সুষ্ঠু বিকাশের অনুকূল।

আবাসিক এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কথাকলি শিক্ষা দিতেন শঙ্করণ নাম্বুদ্রি, ভারত নাট্যমের ও মণিপুরী নৃত্যের গুরু ছিলেন যথাক্রমে কন্দপ্পন পিল্লাই ও আমোরি সিং। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

আলমোড়া সংস্কৃতি কেন্দ্রের জন্য ইংলণ্ডের দুটি কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারের আর্থিক সাহায্যও আসত। এলমহার্স্ট পরিবার ও বিয়াত্রিচে স্ট্রেট পরিবার এই সাহায্য পাঠাতো।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এলমহার্স্ট কিছুকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং শ্রীনিকেতনের উন্নয়নের কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। পরে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে স্ত্রী মিসেস ডরোথী স্ট্রেট-এর সঙ্গে ডিভনশায়ারে শ্রীনিকেতনের আদর্শে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

আলমোড়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে উদয়শঙ্কর নিজে নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন। শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীদের মনের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার উন্মোচনে ও বিকাশের প্রতি তিনি বিশেষ সজাগ ও যত্নবান থাকতেন। নাচ, গান, সঙ্গীত ও মূকাভিনয় শিল্পের এই বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণের মধ্যে অন্তর্লীন যে ঐকতান তা অবিষ্কার ও নিজেদের মধ্যে উপলব্ধির প্রেরণা উদয়শঙ্করের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা লাভ করত।

আলমোড়া কেন্দ্রেই সৃষ্টি উদয়শঙ্করের Rhythm of Life; Labour and Machine নামে বিখ্যাত দুটি ব্যালে ভারতীয় নৃত্য জগতে এক অনন্য অবদান। এই দুটি নৃত্যে মূর্ত হয়েছে আধুনিক জগৎ ও জীবনের বাঙ্ময় রূপ।

উদয়শঙ্করের আর এক অনন্য সৃষ্টি ছায়ানাট্য। পুতুলের বদলে মানুষকেই ছায়ানাট্যের কুশীলব করেছেন তিনি। মঞ্চের সামনে পর্দার পেছনে শিল্পীরা নাচতেন। তাদের ছায়া পড়ত পর্দায়।

তাঁর প্রথম ছায়ানাট্য রামলীলা। ছায়ানাট্য প্রদর্শনের জন্য আলমোড়ায় গ্রীক অ্যামফিথিয়েটারের আদলে বিশেষভাবে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল।

বুদ্ধদেবের জীবনী নিয়েও উদয়শঙ্কর একটি ছায়ানাট্য রচনা করেছিলেন। সেই সময় লাল চীনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চৌ-এন-লাই। তাঁর আমন্ত্রণে উদয়শঙ্কর বুদ্ধদেব ছায়ানাট্য সুদূর চীনেও দেখিয়ে আসেন।

আলমোড়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্র দীর্ঘায়ু হয়নি। ১৯৪৩ খ্রিঃ এটি বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বময় যে প্রবল আলোড়ন ঘটে তার ফলে দেশে দেশে অনেক কিছুরই ভাঙ্গা গড়াব পালা ঘটে যায়।

ইংলণ্ডের অর্থানুকূল্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আলমোড়া সংস্কৃতি কেন্দ্রও বন্ধ করে দিতে হয়।

উদয়শঙ্কর কিন্তু বসে থাকলেন না। সৃষ্টিশীল প্রতিভার ধর্মই এই যে প্রতিনিয়ত প্রকাশের মাধ্যম অনুসন্ধান করে। উদয়শঙ্কর এবার তাঁর শিল্পের মাধ্যম করলেন চলচ্চিত্রকে।

চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে তাঁর কোনও পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। ক্যামেরার প্রয়োগ-পদ্ধতিও ছিল অজানা।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাঁর তৈরি ‘কল্পনা’ সব দিক থেকেই এক নিখুঁত শিল্পসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র হিসাবে বিস্ময়কর সৃষ্টি।

সাড়ে তিন বছর লেগেছিল ছবিটি সম্পূর্ণ করতে। মুক্তি পায় ১৯৪৮ খ্রিঃ। মূলতঃ নৃত্যকে উপজীব্য করে ছবির কাহিনী পল্লবিত। তার মধ্যে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন।

অসাধারণ সব নৃত্যের ভঙ্গিকে যেভাবে তিনি রূপালি পর্দায় তুলে এনেছেন, তার মধ্যে একজন দক্ষ ক্যামেরাম্যানের কৃতিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' ভারতের অসামান্য নৃত্য সম্পদের এক চিরকালীন সঞ্চয় বলেই গণ্য হয়ে থাকে।

ব্রাসেলস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এ ছবি শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের স্বীকৃতি ও সম্মান পায়।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের বছরে, ১৯৬১ খ্রিঃ 'সামান্য ক্ষতি' কবিতা অবলম্বনে করে একটি বিশিষ্ট নৃত্যনাট্য দেশবাসীকে উপহার দেন উদয়শঙ্কর। মঞ্চ সফল ওই নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত রচনা করেছিলেন উদয়শঙ্করের অনুজ বর্তমানের দেশবরেণ্য সেতারশিল্পী রবিশঙ্কর।

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' অবলম্বনে ১৯৬৬ খ্রিঃ উদয়শঙ্করের নিজস্ব রীতিতে করা প্রকৃতি ও আনন্দ নৃত্যনাট্য দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

১৯৬০ খ্রিঃ স্থায়ীভাবে তিনি কলিকাতায় চলে আসেন। সাত বছর পরে, ১৯৬৮ খ্রিঃ উদয়শঙ্কর শেষবারের মতো তাঁর সম্প্রদায়ের পুরানো ও নতুন শিল্পীদের নিয়ে কানাডা ও আমেরিকা সফরে যান।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সফর তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণের ফলে আকস্মিকভাবে সানডিয়াগোতে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দেশে ফিরে আসেন।

নানা কারণে শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়েছিল। নতুন সৃষ্টির প্রেরণা থাকলেও আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন সেসব কার্যকরী করে উঠতে পারেনি।

জীবনের শেষ দিকে অশক্ত শিল্পীকে সম্মান জানায় বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী বহুরূপী। তাঁর সম্মানে একাডেমী হলে যে নাটকের অভিনয় হয়েছিল তার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা সম্মানের সঙ্গে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্বদেশে শিল্পীকে বহুরূপীই প্রথম স্বীকৃতি জানান।

প্রদীপ নিভবার আগে যেমন একবার প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, তেমনি উদয়শঙ্করের সৃষ্টিশীল প্রতিভার সর্বশেষ বিচ্ছুরণ ঘটে 'শঙ্করস্কোপ' নামে এক অভিনব সৃষ্টির মধ্যে। সিনেমা মঞ্চ ও নৃত্যকে একই সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তিনি তাঁর শঙ্করস্কোপে।

রবীন্দ্রভীরতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই উদয়শঙ্কর নৃত্যশাখার ডীন হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় উদয়শঙ্কর সেন্টার অব ড্যান্স।

ভারত সরকারের পদ্মবিভূষণ সম্মান তিনি লাভ করেন জীবন সায়াহ্নে, ১৯৭১ খ্রিঃ। ১৯৭১ খ্রিঃ বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন।

উদয়শঙ্কর সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ফেলো নিযুক্ত হয়েছিলেন। অকাশবাণীর সঙ্গেও কর্মসূত্রে যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৭১ খ্রিঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর এই মহান শিল্পী পরলোকগমন করেন।

আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ

শ্যামল বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে, নদীর বাটে ছড়িয়ে থাকা পল্লীগীতি তথা লোকগীতিকে বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শিল্পী আব্বাসউদ্দীন।

লোকগীতিকে তিনি যেমন বিনোদনের প্রচলিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখননি, তেমনি গানে গানে তিনি দেশবাসীর দেশাত্মবোধ ও আত্মসচেতনা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

বিশেষ করে বাঙালীর পিছিয়ে থাকা এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে অন্ধ কুসংস্কার থেকে আলোর মুক্ত অঙ্গনে পৌঁছে দেবার পথ রচনা করেছেন। অর্থহীন ধর্মীয় গোঁড়ামী ও মিথ্যা ফতোয়ার বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর গানের সুরঝঙ্কারের প্রতিবাদের মাধ্যমে।

বাংলা পল্লীগীতির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের জন্ম কোচবিহার জেলার বলরামপুর গ্রামে, ১৯০১ খ্রিঃ। তাঁর পিতা মৌলভী জাফর আলী আহ্‌মদ পেশায় আইনজীবী হলেও প্রভূত বিত্ত সম্পদের অধিকারী ছিলেন।

প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা প্রজাপত্তনী জমি ও দেড়শো বিঘা আবাদী জমির মালিকানা নিয়ে সেকালে একটা ছোটখাট জমিদারী তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত। সরকার পাইক বরকন্দাজ নিযুক্ত ছিল এজন্য।

কিন্তু এত বড় সম্পত্তি সামাল দেওয়া বেতনভুক কর্মচারীদের পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। তাই জমিদারী দেখাশোনার জন্যই শেষ পর্যন্ত তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতের ওকালতি ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে এসেছিলেন জাফর আলী।

সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান হয়েও তিনি ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্ত। তাঁর হৃদয় ছিল প্রকৃত শিক্ষার আলোয় আলোকিত। ধর্মীয় মিথ্যাচার তাঁর মানবিক চেতনাকে কখনও প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই যে সময়ে মোল্লা মৌলভীদের ফতোয়া ছিল, মুসলমানের গান-বাজনা নিষিদ্ধ সেই সময় ধর্মভীরু মৌলভী

জাফর আলীর পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছিল আব্বাসউদ্দীনের মতো স্মরণীয় সুরশিল্পী।

সঙ্গীতের প্রতি সহজাত আকর্ষণ আর কণ্ঠসম্পদ নিয়েই জন্মেছিলেন আব্বাস। গ্রামে ভাওয়াইয়া গানের পরিবেশে লালিত হয়েছিলেন তিনি। যা তাঁর বিকাশোন্মুখ প্রতিভাকে করে তুলেছিল পরিপুষ্ট।

ছেলের প্রতিভা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন মৌলভী জাফর আলী। তাই স্বসমাজের ধর্মীয় ফতোয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও পুত্রের গানবাজনার আগ্রহকে কখনও গলা টিপে ধরেননি।

তিনি চেয়েছিলেন, ছেলে উচ্চশিক্ষিত হবে, ভবিষ্যতে আইন পড়ে ব্যারিস্টার হবে। আবার তার গানের প্রতিভা অপ্রকাশ থাকুক এটাও তাঁর অভিপ্রায় ছিলনা।

সত্য হল যে, পিতা ও মাতার সস্নেহ প্রশ্রয়েই সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দীন বড় হয়ে উঠেছিলেন। উত্তরকালে বাংলার পল্লীগীতিকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে।

কুসংস্কার আর অন্ধ গোঁড়ামী ছিন্ন করার ডাক দিয়ে জাগিয়েছিলেন মুসলমান সমাজকে।

আব্বাসউদ্দীনের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল গ্রামের পাঠশালায়। সম্পন্ন ঘরের ছেলে হয়েও আর দশটি সাধারণ পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

খেলাধুলো, দস্যিপনায় পাড়া মাত করতেন। কিন্তু লেখাপড়ায় রীতিমতো মনোযোগী ছিলেন আব্বাস। স্কুল কামাই দিতেন না, ক্লাসের পরীক্ষাতেও বরাবর প্রথম হয়েছেন।

এজন্য ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। স্কুলের ভাল ছেলে হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন।

গ্রামে ছিল ভাওয়াইয়া গানের আবহাওয়া। খোলা আকাশের আলো বাতাসের মতোই গানের সুর অনুরণিত হত তাঁর চারপাশে। এই পরিবেশে আপনা থেকেই তৈরি হয়েছে তাঁর সুরের কান, গানের রুচি।

প্রকৃতিরাজ্যে সুর ও গানের যে বিরাট বিপুল অফুরন্ত আয়োজন, সেখান থেকে তাঁব সহজাত প্রবণতা সাবলীল বিধানে কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল সুর। খুব ছোটবেলায় যখন ঝোপ জঙ্গলে ফড়িং বা প্রজাপতির পেছনে দৌড়েছেন, শুনেছেন, পায়রা, ঘুঘু, কোকিল, দোয়েলের সুর। বাড়ির চৌহদ্দিতে ছিল, কাক, মোরগের ডাক। রাতের অন্ধকারে ঝোপঝাড়ে উঠত শেয়ালের ডাক, জলার ধারে বাজত ব্যাঙের ডাক।

আব্বাস এসব শুনতেন, আর নকল করবার চেষ্টা করতেন। এভাবে চারপাশে সুর শুনে শুনেই তাঁর গলায় সুর উঠে এসেছিল।

একটু যখন বড় হলেন, তখন গাঁয়ের লোকশিল্পীদের গান তাঁকে টেনেছে। তাঁদের কাছে বসে তিনি গান শুনেছেন, আবার প্রাণের আবেগে নিজেই গান লিখেছেন।

কুমার সরোজেন্দ্র দেব রায়কত, পাগারু, রাজেশ রায়, সুশীল রায়, সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়া, জিতেন মৈত্র, সত্যনারায়ণ শুকুল প্রমুখ শিল্পীর সাহচর্যে এসে তাঁর মনে একদিন বাসা বাঁধল সুরশিল্পী হবার বাসনা।

এক্ষেত্রে তাঁর বাবা ও মায়ের নীরব প্রেরণা ও উৎসাহ জাগানোর কথাও উল্লেখনীয়।

গলা খুলে গান গাইবার ইচ্ছা হলেও পাড়ার লোকজনের, বিশেষ করে মুরুব্বীদের নিন্দামন্দ শোনার ভয়ে তা সম্ভব হত না। মুসলমানদের তো গান-বাজনা করতে নেই।

সুযোগ পাওয়া যেত স্কুলে যাওয়া আসার পথে। ফাঁকা মাঠে সঙ্গীসাথীরাও আব্বাসের গান শুনতে চাইত।

স্কুলে যাওয়ার পথে যখন গলা ছেড়ে গান ধরতেন, কোনও সময় যদি বড় মামার সামনে পড়তেন, কপালে জুটত জোর ধমক।—ওকী করছিস পাজী ছোঁড়া, মুসলমানের গান গাইতে নেই জানিস না?

বাবার সঙ্গেও মাঝে মধ্যে দেখা হয়ে যেত। তাঁর গান শুনে বাবা কিন্তু কখনও ধমকধামক দিতেন না। কেবল স্নেহমাখা গলায় জানতে চাইতেন, ভাত খেয়ে এসেছো তো বাবা? যাও স্কুলে যাও।

এমনি নীরব সম্মতি পেয়েছেন মায়ের কাছ থেকেও। অথচ ধর্মভীরু পরিবারের গৃহিণী ছিলেন তিনি।

বলরামপুরে পাঠশালায় পড়া শেষ হলে আব্বাসউদ্দীন কুচবিহার ও রাজশাহী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু গানের জগতের আকর্ষণে কলকাতায় চলে আসায় বি. এ. ডিগ্রি আর নেওয়া হয়নি।

কৈশোরে এক কিশোরীর প্রেমের উদ্দীপনার কথা বলেছেন তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে। কিশোরী মজে ছিলেন তাঁর গান শুনে। একদিন প্রেমের টানে গানের জগতকে খাটো করে কথা বলায়, সেই কিশোরী বলেছিলেন, 'বড় জিনিস লাভ করতে হলে বড় ত্যাগ আর সাধনা চাই।'

এই একটি কথা আব্বাসের জীবনে এমনই আলোড়ন তোলে যে কিশোরী প্রেমিকার সুপ্ত সাধ পূর্ণ করার জন্য তিনি সুব সাধনাকেই ধ্যানজ্ঞান করে তোলেন। নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রার্থিত পাত্রিটির সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

তবে সাধনার প্রেরণা করে বুকে ধরে রাখলেন প্রেমিকার স্মৃতিকে। তিনি নিজেই লিখেছেন এ বিষয়ে, "ত্যাগ আমি করলাম কিনা জানি না, তবে সাধনার পথে পা বাড়ালাম তার স্মৃতিকে আমার ধ্রুবতারা করে।"

সেই অজ্ঞাতনামা কিশোরীর পবিত্র ভালবাসা আব্বাসউদ্দীনকে সুরের জগতে একদিন পরিয়েছিল প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের অমলিন মালিকা।

কোচবিহার কলেজে বি. এ. ক্লাশের ছাত্র আব্বাসউদ্দীন। সেই সময় মিলাদ মহফিল উপলক্ষে ছাত্রদের মধ্যে একদিন উপস্থিত হয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম।

তখন নজরুল বাংলার বিদ্রোহী কবি, গানের বুলবুল। অনুষ্ঠানে আব্বাসের কণ্ঠে পল্লীসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হলেন কবি।

বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা লোকগীতি তখনো শহুরে জীবনে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়নি। শিক্ষিত সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় পল্লীগীতি। তবুও কবি আব্বাসকে এই গান রেকর্ড করার জন্য উৎসাহিত করলেন।

নজরুল নিজেই পরে কণ্ঠশিল্পী আব্বাসকে উৎসাহিত করার জন্য কলকাতায় এনে প্রথম তাঁর গান গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করান।

সেবার বন্ধু জিতেন মৈত্রর বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন আব্বাস। এই সময়েই গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। শৈলেন রায়ের লেখা 'কোন বিরহীর নয়ন জলে বাদল ঝরে গো; এবং স্মরণ পারের ওগো প্রিয় গান দুটি প্রথম রেকর্ড করেন। প্রথম গানটিতে আব্বাস এবং শৈলেন রায় যুগ্মভাবে সুর দেন।

এরপর পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন তিনি। উকিল ওসকিন আহমদের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। উকিল সাহেবের ছেলেমেয়েদের দুবেলা পড়াতে হত এখানে।

ইতিমধ্যে একটা সরকারী চাকরির ব্যবস্থাও হয়ে যায় পরিচিতদের সহযোগিতায়। বাংলা সরকারের কৃষিদপ্তরে কাজ পেয়ে যান আব্বাস।

চাকরির সঙ্গে চলল গানের চর্চা। ধীরে ধীরে কলকাতায় পরিচিতি বাড়তে লাগল তাঁর। শহুরে জীবনে পল্লীগীতিকে জনপ্রিয় করে তোলার কৃতিত্ব আব্বাসেরই।

গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে আরও রেকর্ড বের হল। সভাসমিতিতেও নিয়মিত অনুষ্ঠান করতে লাগলেন, এভাবেই মহানগর কলকাতায় প্রতিষ্ঠা পেলেন আব্বাসউদ্দীন। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।

দেশের মাটির সম্পদ লোকসঙ্গীত, লোকসাহিত্য। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এই সম্পদ সেইকালে ছিল অবহেলিত। কোনও জাতিকে

জানতে হলে, বুঝতে হলে তার জীবনপ্রবাহ—সেইজাতির লোকসাহিত্যই পারে তা সঠিকভাবে জানাতে।

তাই রবীন্দ্রনাথও দেশের নিজস্ব এই সম্পদের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, গুরুসদয় দত্ত, জসীমউদ্দীন প্রমুখের সঙ্গে আব্বাসউদ্দীনের নামও এক পংক্তিতে উচ্চারণ করা চলে, যাঁরা বাংলার প্রাণের লোকসম্পদের প্রচারেই আজীবন কাজ করে গেছেন।

আজ লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্য সংস্কৃতির জগতে যে মর্যদার আসন লাভ করেছে, লোক সঙ্গীতের চর্চা সমাদৃত হচ্ছে, তার পেছনে এই মনীষীদের অবদান স্মরণযোগ্য।

পল্লীবাংলার হৃদয়ের সুবাসে সঞ্জীবিত জসীমউদ্দীনের লেখা ও আব্বাসের গাওয়া 'আমার গহীন গাঙের নাইয়া', 'ও দরদী আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না', এবং অজ্ঞাত পল্লীকবির লেখা, 'ও কি গাড়িয়ানা ভাই', 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে' প্রভৃতি গান আজ বাংলার সকল প্রান্তে সমান সমাদৃত।

আব্বাসের ডাক আসতে লাগল বিভিন্ন স্থান থেকে, স্কুল-কলেজের অনুষ্ঠানেও। আব্বাস প্রচার করে চললেন পল্লীগীতি—বাংলার চিরন্তন প্রাণসম্পদকে। ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারি সারি—গানের সুরে সুরে বাংলার আকাশে বাতাসে যেন নতুন সাড়া জেগে উঠল।

বাঙালী যেন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করার সুযোগ পেল। দেশকে জানা এবং জানাবার প্রেরণা জাগল মানুষের মনে।

দেশপ্রেম সঞ্চারের মহান কাজটিই করেছিলেন আব্বাসউদ্দীন তাঁর লোকগানের মাধ্যমে। দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রমে। এই কাজে তিনি সময়ানুগ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, দীনেশচন্দ্র সেন ও গুরুসদয় দত্তের মতো শ্রেষ্ঠ মানুষদের।

বাঙলী জাতির দুটি অংশ। হিন্দু আর মুসলমান, দুয়ে মিলে বাঙালীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ। 'মোরা এক বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মসলমান' এই সত্যটিকে আব্বাসউদ্দীন তাঁর গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

সেইকালে সমাজে শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। সামাজিক নানা কারণে মুসলমান সম্প্রদায় ছিল অনেক পশ্চাদপদ। সব মিলিয়ে, এই অসফল সামাজিক পরিমণ্ডল নিয়ে অসম্পূর্ণ বাঙালী জাতিসত্তা।

পল্লীগীতির পসরা নিয়ে আব্বাস গ্রামে গ্রামে ঘুরে জাতির এই দুর্বলতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন।

তিনি নিজে একজন পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজের মানুষ হিসাবে

অনুভব করতেন—ত্রুটি কোথায়। তিনি বলেছেন, "এক তো শিক্ষার অভাবে সকলে নুয়ে আছে, তার ওপর জগদ্দল পাথরের মতো এই সমাজের বুকে বসে আছে কাঠমোল্লার দল। ধর্মের নামে তাদের জারি করা মনগড়া সব ফতোয়া গোটা সমাজের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে। মুসলমান সমাজের একটা বিরাট অংশকে সরিয়ে রাখা হয়েছে গান-বাজনা থেকে। গান-বাজনা তাদের কাছে হারাম। এই সমাজকে জাগাবার পক্ষে এমনি নানা বাধা।"

আব্বাস কিন্তু কোনও বাধাকেই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি শিল্পী, মানুষের গভীরতম অনুভূতিতে সাড়া জাগাবার চাবিকাঠি রয়েছে তাঁর হাতে। সঙ্গীত—সঙ্গীতকে মাধ্যম করেই সমাজের তরুণ শক্তিকে জাগিয়ে তুলবার সংকল্প নিয়েছিলেন তিনি।

নজরুল তখন খ্যাতির মধ্য গগনে। তিনি সাহিত্য লেখেন, গান-বাজনা করেন। তাই মুসলমান সমাজের একটা অংশ তাঁকে মনে করে ধর্মদ্রোহী—কাফের।

কিন্তু ইসলামের যে মহান আদর্শ সাম্য—নজরুল সেই মৈত্রী সাম্যের পূজারী। তাঁর প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাঁর নামে বাঙালীর প্রাণে মাতন লাগে।

আব্বাস তাঁকে দিয়েই লেখাতে লাগলেন গান, সেই গান গেয়ে গেয়ে মুসলমান সমাজে সাড়া তুললেন তিনি। তরুণ সমাজে জাগল উদ্দীপনা।

এই সময় একদিকে তিনি গেয়েছেন ইসলামী গান, নাম মোহম্মদ বোল রে মন নাম আহমদ বোল, আল্লা আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়, ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়, জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান, প্রভৃতি। আবার সভায় সভায় বক্তৃতা করেছেন। এইভাবে তিনি বাঙালীদের পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকে সংস্কারের বাঁধনমুক্ত করে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন।

এই কাজে নজরুলের অকৃত্রিম সাহায্য যেমন তিনি পেয়েছিলেন, সেই কালের অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-এ-বঙ্গাল ফজলুল হক সাহেবও তাঁর পাশে ছিলেন।

সভায় দাঁড়িয়ে আব্বাস বলতেন, "শিক্ষার অভাবে আমরা কোনও উন্নত চিন্তা করতে পারি না। তার উপর নিরক্ষর গ্রামবাসীকে ইসলামের নামে এতকাল সস্তা বুলি দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। ইসলাম মানে নামাজ, রোজা, হজ্জ আর জাকাত, এর বাইরে সারা দুনিয়াটাই মুসলমানের দৃষ্টির বাইরে। আমি বললাম, নামাজ রোজা করতে পয়সা লাগে না, কিন্তু হজ, জাকাত দুটোই অর্থসাপেক্ষ। কাজেই পুরা মুসলমান দাখিল হতে হলে চাই টাকা। টাকা রোজগার করতে গেলে মূর্খ হয়ে থাকলে চলবে না; সুতরাং চাই শিক্ষা।"

এখানেই থেমে থাকেননি সুরশিল্পী আব্বাস। সমাজে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি রক্ষা করে জাতিসত্তাকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেবার বৃহত্তর লক্ষ্যেও কাজ করেছেন অক্লান্তভাবে।

দেশবাসীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ ও আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তুলবার জন্য তিনি গেয়েছেন, ভারতের দুই নয়নতারা হিন্দু মুসলমান, ও ভাই হিন্দু মুসলমান। ভুল পথে চলে দোঁহারে দুজনে করো নাকো অপমান, হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর, প্রভৃতি গান। বাঙালি জাতি গঠনের ইতিহাসে আব্বাসউদ্দীনের এই অবদান খুব সামান্য নয়।

আব্বাস বাংলার পল্লীগীতিকে কেবল প্রচারের আলোতে নিয়ে এসেছেন তাই নয়, এই গানকে অবলম্বন করে বাঙালীর হৃদয়ে দেশপ্রীতি সঞ্চারের পবিত্র কর্তব্যও নিষ্ঠাভরে প্রতিপালন করেছেন।

দেশকে জানা এবং জানাবার সুমহান বার্তা পল্লীগীতির মাধ্যমে বাংলার ঘরে ঘরে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। এই সবই তিনি করেছেন দেশ ও জাতির বৃহত্তর মঙ্গলের লক্ষ্যে।

আব্বাসের পল্লীগীতির রেকর্ড অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মুনাফার অঙ্ক ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় গ্রামোফোন কোম্পানিরও আগ্রহ বাড়ে। এই সুযোগে আব্বাস কোম্পানিকে কোচবিহারের আঞ্চলিক ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড করার প্রস্তাব দিলেন।

নিতান্তই একটি আঞ্চলিক ভাষার গানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করে কোম্পানি ভাওয়াইয়া গানের রেকর্ড করাল। কিন্তু দেখা গেল, রেকর্ডে গানের অনেক কথাই বদলে দেওয়া হয়েছে।

গানের বাণীর বিকৃতি একজন আদর্শ সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে আব্বাস মেনে নিতে পারলেন না। তদুপরি তিনি নিজেও কোচবিহারের মানুষ।

ক্ষুব্ধ ব্যথিত আব্বাসউদ্দীনের জোরালো প্রতিবাদে এরপর পল্লীকবির গানের বাণী অবিকৃত রেখে রেকর্ড করতে গ্রামেফোন কোম্পানি বাধ্য হল। আব্বাস রেকর্ড করলেন হুবহু গ্রাম্য ভাষার "ওকি গাড়োয়ান ভাই' এবং 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে' গান দুটি।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানি ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে তাদেরে প্রচারপুস্তিকায় লিখল, "পল্লীগীতি রাজ্যের দুয়োরানী এই ভাওয়াইয়া গানকে সর্বপ্রথম আব্বাস সাহেবই আদর করে রাজঅন্তঃপুরে ডেকে আনলেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখলাম উপেক্ষিত দুয়োরানীর রূপশ্রী সুয়োরানীর চেয়ে তো কম নয়। তারও চেয়ে মুগ্ধ হলাম তার নিতান্ত সরল হৃদয়ের মাধুরীতে।"

আব্বাসের ঐকান্তিক চেষ্টায় লোকগীতির ধারায় সমমর্যাদায় সংযোজিত হল ভাওয়াইয়া গান।

ভারত ভাগ হল ১৯৪৭ খ্রিঃ। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে বাঙালীর জাতীয় জীবনে দুরপনেয় বিপর্যয় ঘটে গেল।

নানা কারণে বাধ্য হয়ে আব্বাসউদ্দীনকে পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় চলে যেতে হল। সেখানেও নিজের ক্ষেত্রে তিনি যথাযোগ্য সম্মান মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পেলেন।

১৯৫৫ খ্রিঃ ফিলিপিনে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আব্বাস পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে পল্লীবাংলার চিরকালের সম্পদ ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, মারফতি, মুর্শিদী, কীর্তন ও দেহতত্ত্ববিষয়ক গানের মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন এবং গেয়ে শোনালেন।

আব্বাসউদ্দীনের জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এভাবে রচিত হল। ভারতের বাইরে তিনিই প্রথম বাংলার পল্লীগীতিকে পরিচিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

পরের বছর আব্বাসকে দেখা গেল বৃহত্তর ভূমিকায়। তিনি তাঁর সঙ্গীত জীবনের কর্ম-কৃতিত্বের গৌরবদীপ্ত বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন।

১৯৫৬ খ্রিঃ ৩১শে জুলাই জার্মানীতে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত সম্মেলনে আব্বাস বাংলার পল্লীগীতিকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিলেন।

লোকসঙ্গীত শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের এই অবদান বাঙালী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

শিল্পী হিসাবে আব্বাসউদ্দীনের ব্যক্তিমানসের পরিচয় দেবার জন্য তাঁর জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে মনে করি।

আজকের দিনে সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে শিল্পীসুলভ উদারতার অভাব এবং পারস্পরিক পেশাগত বিদ্বেষ রেষারেষি এমনই প্রবল ও সংক্রামক হয়ে উঠেছে যে তার ফলে সামগ্রিকভাবে আমাদের সঙ্গীত জগতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। এই আবহাওয়ায় আব্বাসউদ্দীনের জীবনের আদর্শ দেশের সুরশিল্পীদের আত্মচেতনা উদ্বোধনে প্রাণিত করবে।

লোকসঙ্গীতের গায়ক হিসাবে আব্বাসউদ্দীন তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশজোড়া খ্যাতি তাঁর। সেই সময় তিনি কোচবিহার থেকে ভাওয়াইয়া গানের শিল্পীদের কলকাতায় এনে গান রেকর্ড করাতে লাগলেন।

নতুন শিল্পীদের এভাবে পরিচিতি লাভের সুযোগ করে দিতে দেখে প্রখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্ত একদিন আব্বাসকে বললেন, "তুমি এমন বোকা কেন?

তুমি তো ভাওয়াইয়া গানে সম্রাট। দেশ থেকে অন্য লোককে নিয়ে এসে তোমার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানো ঠিক কাজ হচ্ছে কি?"

উত্তরে আব্বাসউদ্দীন বললেন, "বিশাল এই বাংলাদেশে গায়কগায়িকা কত ছড়িয়ে আছে। অনাঘ্রাত পুষ্পের মত গাঁয়ে গাঁয়ে নামহারা হয়ে তারা গেয়ে চলেছে। আদর তো তাদের আমরাই করব ভাই। নাম, যশ, স্বীকৃতির পথে তো আমরাই তাদের নিয়ে আসব।"

শেষবয়সে রোগশয্যায় থেকে আব্বাস আত্মজীবনী লেখেন 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'। এই গ্রন্থে তিনি লেখেন, "......... নজরুলের ইসলামী গান দিয়ে যদি বাংলার মুসলমানকে জাগিয়ে থাকি, হৃতসর্বস্ব চাষী ও মাঝির কণ্ঠের গানকে যদি ভদ্রসমাজে পরিবেশন করে তাদের পাংক্তেয় করে থাকি, সর্বশেষে যদি আমার পল্লীমায়ের মেঠোসুরকে বিশ্বসঙ্গীত সভায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে থাকি, তাহলে দেশ, জাতি, জনগণ কিছুতেই আমাকে ভুলবে না।"

বস্তুতঃ কেবল একজন অসাধারণ সুরশিল্পী রূপেই নয় বাংলার লোকসঙ্গীতচর্চার প্রধান পুরোহিত রূপে আব্বাসউদ্দীনের নাম বাঙালীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৫৯ খ্রিঃ ৩০শে ডিসেম্বর পল্লীমায়ের দুলাল আব্বাসউদ্দীন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হরিনাথ দে

ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রথম পথিকৃৎ এবং বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার আড়িয়াদহে ১৮৭৭ খ্রিঃ ১২ই আগস্ট। তাঁর পিতার নাম ভূতনাথ দে। মাতা এলোকেশী।

রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে ছিলেন বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই সি এস। তাঁর কর্মস্থল ছিল রায়পুর, সেখানে তিনি আইন ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন।

হরিনাথের মাতা এলোকেশীও ছিলেন যথার্থ শিক্ষিতা মহিলা। বাংলা ছাড়াও তিনি হিন্দী, মারাঠী ও ইংরাজী ভাষা শিখেছিলেন। পিতা ও মাতা উভয়ের সূত্রেই হবিনাথ লাভ করেছিলেন ভাষার প্রতি অনুরাগ।

শিশু হরিনাথের বাংলা অক্ষর পরিচয়ের ঘটনাটি চমকপ্রদ। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যবয়সে বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসার পথে, মাইল ফলকের লেখা দেখে দেখে ইংরাজী সংখ্যা গুণতে শিখেছিলেন। আর শিশু হরিনাথ একদিনেই রান্না ঘরে খেলতে খেলতে সমস্ত বাংলা অক্ষর শিখে গিয়েছিলেন।

একদিন এলোকেশী দেবী রান্নাঘরে রান্না করছেন। পাশেই খেলা করছিলেন হরিনাথ। শিশুকে ভুলিয়ে রাখার জন্য খেলাচ্ছলে তিনি কাটা সবজির খোসাগুলো দিয়ে বাংলা অক্ষরমালা রান্নাঘরের মেঝেতে তৈরি করেছিলেন। মা ছেলেকে কাছে ডেকে অক্ষরগুলোর নাম ও উচ্চারণ বলে দেন। ওই দিনেই শিশু হরিনাথ মায়ের সঙ্গে উচ্চারণ করে করে বাংলা অক্ষরগুলি চিনে ফেললেন। এমনি অসাধারণ মেধা নিয়ে জন্মেছিলেন হরিনাথ।

মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর হরিনাথকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল রায়পুর সরকারী মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে।

ছাত্র হিসাবে হরিনাথ যেমন অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন, তেমনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁর সহজাত।

ছাত্রাবস্থায় ভারতবর্ষ এবং ইউরোপে যতগুলি পরীক্ষা তিনি দিয়েছেন, সবগুলিতেই প্রথম শ্রেণী পেয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন।

রায়পুর স্কুল থেকে শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯০ খ্রিঃ স্কলারশিপ পান। এরপর তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে।

এখান থেকে ১৮৯২ খ্রিঃ এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ খ্রিঃ এই কলেজ থেকেই ইংরাজি ও ল্যাটিন ভাষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর এবং ডাফ বৃত্তি নিয়ে এফ. এ. পাস করেন।

এরপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ক্লাসে। ১৮৯৬ খ্রিঃ ল্যাটিন ও ইংরাজিতে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে বি. এ এবং ওই বছরেই এম. এ. পরীক্ষায় ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন।

পরের বছরেই ইচ্চশিক্ষার জন্য হরিনাথ সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। ভর্তি হন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজে।

একই বছরে ১৮৯৭ খ্রিঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষাও দেন এবং যথারীতি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুর্লভ Classical Tripos-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে হরিনাথ তাঁর কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার এবং চ্যান্সেলরের স্বর্ণ পদক পান।

ট্রাইপোসে তাঁর বিষয় ছিল প্রাচীন ভাষা—মধ্যযুগীয় ইংরাজী ও আধুনিক ভাষা। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কৃতিত্বের জন্য তিনি পুরস্কৃত হন।

বিলাতে থাকাকালে হরিনাথ ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।

তিনি যখন যেখানে গেছেন সেই দেশের প্রাচীন ও অপ্রচলিত ভাষাগুলি শিক্ষা করেন এবং সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাস করেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হরিনাথ সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন। ইউরোপের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সর্বমোট ১৪টি ভাষায় তিনি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

বিভিন্ন এবং বিচিত্র ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ বোধ করতেন হরিনাথ। ভাষা শিক্ষায় তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা তাঁকে উত্তরোত্তর জ্ঞানার্জনে আগ্রহী করে তুলেছিল।

যে ভাষা তিনি আয়ত্ত করতেন, তা প্রাচীন বা আধুনিক যাইহোক না কেন, সেই ভাষার সাহিত্যও তিনি পাঠ করতেন। ভাষার ব্যুৎপত্তি থেকে প্রয়োগ পর্যন্ত, ভাষার যাবতীয় চর্চা তিনি অনায়াসে আয়ত্ত করতেন। ভাষা দক্ষতাকে অবলম্বন করে তিনি জ্ঞানচর্চার জগতে অবাধে বিচরণের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

গ্রীক, ল্যাটিন, মধ্যযুগীয় জার্মান ভাষা, মধ্যযুগীয় ফরাসী ভাষা, আধুনিক জার্মান ও ফরাসী ভাষা, ইটালীয়, স্প্যানিস, পর্তুগীজ, প্রাচীন ও আধুনিক আরবী, পারসী, চীনা ও জাপানী প্রভৃতি ভাষায় তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। উচ্চতর আরবী, সংস্কৃতি ও উড়িয়া ভাষার পরীক্ষায় হরিনাথ এম. এ পাস করেন।

ভাষা শিক্ষার কৃতিত্বের জন্য প্রতিটি এম. এ. পরীক্ষায় হরিনাথ দুটি অথবা তিনটি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। ৫,০০০ এবং ১০,০০০ টাকার বৃত্তি পেয়েছেন একাধিক। তাঁর প্রাপ্ত বৃত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় এক লক্ষ টাকা।

এদেশীয়দের মধ্যে হরিনাথই সর্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে নিয়োগপত্র পান এবং মাত্র ২২ বছর বয়সেই ঢাকা সরকারী কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রিঃ হরিনাথ ঢাকা কলেজে যোগদান করেন।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি যেমন লাভ করেছিলেন অনায়াস দক্ষতা তেমনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও তিনি ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের আগ্রহ ও প্রেরণা সঞ্চার করতে পেয়েছিলেন।

তাঁর প্রেণামূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে ছাত্রমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

ঢাকায় চার বছর অধ্যাপনা করেন হরিনাথ। ১৯০৫ খ্রিঃ তিনি ঢাকা কলেজ থেকে বদলি হয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেন।

পরের বছরেই তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক ভ্রমণে ইউরোপে যান। এই সময়ে তিনি ইউরোপের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গে ভারততত্ত্ব বিষয়ে আলোচনায় যোগদান করেন।

একই বছরে হরিনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরসী, ইংরাজি, আর্মেনিয়া, হিব্রু, সংস্কৃত, বৈদিক সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষার বিষয়ে স্নাতকোত্তর বোর্ডের সদস্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলি বিষয়েরই প্রশ্নপত্র তাঁকে রচনা করতে হত।

কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৯০৭ খ্রিঃ অধ্যাপনা জগৎ থেকে বিদায় নেন হরিনাথ। এরপর তিনি বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরী অথবা তৎকালীন ইম্পেরিয়্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দেন। এই পদে হরিনাথই ছিলেন প্রথম বাঙালী।

আবাল্য জ্ঞানচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ হরিনাথ ভারতের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত জ্ঞানানুশীলন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি বিভিন্ন সারস্বত প্রতিষ্ঠানের কর্মধারাতেও তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে হত।

হরিনাথ ১৯০১ খ্রিঃ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ডের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯০৩ খ্রিঃ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। এখানকার লাইব্রেরি কমিটি, ফিললজিক্যাল কমিটি ও কাউন্সিল সদস্যের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল।

১৯০৫ খ্রিঃ জলকাতার মুসলিম ইনসটিটিউটের সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত হন। পরের বছর সদস্য হন জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির। কলকাতার হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিল সদস্য হন ১৯০৭ খ্রিঃ।

হরিনাথকে এই সকল সংস্থার কাজকর্মে সর্বদাই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হত।

১৯০৭ খ্রিঃ থেকে ১৯১১ খ্রিঃ পর্যন্ত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে কর্মনিযুক্ত ছিলেন হরিনাথ। বিস্ময়কর প্রতিভা ও অসাধারণ মনীষার সঙ্গে দুর্লভ দূরদৃষ্টি ও কর্মদক্ষতারও অধিকারী ছিলেন তিনি। লাইব্রেরীর গ্রন্থসম্পদ যাতে পাঠক ও গবেষকদের জ্ঞানচর্চার সহায়ক হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কঠোর শ্রম স্বীকার করে তিনি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বই-এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় সদ্য প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহ করেন।

বিপুল গ্রন্থসংগ্রহের বিষয় বিন্যাস করে একটি বিষয়সূচীও তিনি সংকলন ও প্রকাশ করেন। এর ফলে লাইব্রেরীর গ্রন্থ সম্পদের পরিচয় সহজলভ্য হওয়ায় পাঠক গবেষকদের জ্ঞানচর্চারও অবাধ সুযোগ হয়েছিল।

গ্রন্থাগারিক পদে কর্মরত অবস্থায় তিনি বৌদ্ধদর্শন সম্পাদনা করেন। চীনাভাষা থেকে নাগার্জুনের লজিক এবং আরও অন্যান্য বহু গ্রন্থ ইংরাজিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল ফরাসীতে অনুবাদ করেন। এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির নানা গ্রন্থ রচনারও দায়িত্ব বহন করেন।

লাইব্রেরিয়ান পদে মাত্র চার বছরের কর্মজীবনে তিনি যে বিপুল কর্মকাণ্ডের উজ্জ্বল স্বাক্ষর এদেশের জ্ঞান জগতে রেখে যান তা এক কথায় বিস্ময়কর।

হরিনাথের জীবনকাল খুবই সীমিত ছিল। ত্রিশ বছর বয়সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কর্মভার হাতে নিয়েছিলেন। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সেই পরলোক গমন করেন। ১৯১৮ খ্রিঃ ৩০শে আগস্ট। হরিনাথের বিস্ময়কর প্রতিভা পূর্ণবিকশিত হওয়ার আগেই ভারতের সারস্বত মণ্ডলের অপূরণীয় ক্ষতি করে অকালে ঝরে যায়।

আবাল্য জ্ঞানচর্চায় অক্লান্তকর্মা হরিনাথ মৃত্যুর কিছুদিন আগে আরবী ভাষার ব্যাকরণ, তিব্বতী ও ফরাসী ভাষায় অভিধান এবং তিনটি ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণিক নিদর্শন হিসাবে তিনি নির্বাণব্যাখানশাস্ত্রম ও লঙ্কাবতরসূত্র সম্পাদনা করেন।

স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে বিচিত্র বিষয়ে অসাধারণ কাজ করেছেন হরিনাথ। তথাপি বলতে হয় তাঁর প্রতিভা ও মনীষার পরিচয়জ্ঞাপক যথেষ্ট লিখিত প্রমাণ তিনি রেখে যেতে পারেননি।

হরিনাথ ছিলেন ছাত্রপ্রিয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। তাঁর বহুমুখী বিদ্যানুশীলন ও বিপুল সারস্বত কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততার মধ্যেও তাই ছাত্রদের কথা স্মরণে না রেখে পারেননি।

এদের সহায়তার জন্য তিনি সেকালের 'এসে অন মিল্টন' এবং 'প্যালগ্রেভস গোল্ডেন ট্রেজারি' চতুর্থ খণ্ড বই দুটির সটীক সম্পাদনা করেন। দ্বিতীয় বইটির আলোচনায় তিনি ভাষা ও সাহিত্য সমালোচনার এক নতুনধারা প্রবর্তন করেন।

প্রতিটি রচনার বিশ্লেষণে গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, সংস্কৃত, আরবীয়, পারসিক প্রভৃতি ভাষা সাহিত্যের তুলনামূলক প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন যার মধ্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়েছে।

হরিনাথ কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের কাব্যানুবাদ করেছিলেন। ইবন-

বতুতার বঙ্গদেশ ভ্রমণ এবং মহম্মদ হাফিজের সুলতান গিয়াসুদ্দিনের আরবীয় ও পারসিক পুঁথির অনুবাদ করেছিলেন।

এছাড়াও আরবীয়, পারসিক ও সংস্কৃত প্রাচীন বহু দুষ্পাপ্য রচনারও অনুবাদ করেন। এইসব রচনা প্রকাশিত হয়েছিল মুসলিম ইনসটিটিউট জার্নাল ও ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায়।

বাংলা থেকেও অনেক রচনার তিনি ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম, মুচিরাম গুড়, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিদ্যাপতির পদাবলী, গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজউদ্দৌলা, অমৃতলাল বসুর বাবু ও রাজাবাহাদুর প্রভৃতি।

বিভিন্ন ভাষায় বিচিত্র বিষয়ের অনুবাদ করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে আছে ইটালিয়ান ভাষায় লিওপার্ডির কবিতা, ফরাসীতে রেনে গিলের রচনা, আবরীতে কাব-এর বয়াত সু-আদ ও রাশিয়ানে পুসকিন এবং লারমনোটফ-এর অনুবাদ।

হরিনাথের জ্ঞানচর্চার আগ্রহ যেমন ছিল বিপুল ও বহুমুখী তেমনি ছিল পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা। তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর বহু বিচিত্র বিষয়ের সম্পাদিত গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, অনুবাদ এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে।

জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে হরিনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা।

তিনি আরবী ব্যাকরণ, তিব্বতী-ল্যাটিন অভিধান প্রণয়ন ও ইংরাজি-পারসী অভিধান সঙ্কলন করেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়েও হরিনাথ অনেক রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বুদ্ধঘোষের ধনিয় সূত্ত, নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকা, তারানাথের ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, আত্মা প্রসঙ্গে নাগার্জুন, ক্ষুদ্দনিকায় ও থেরিগাথা প্রভৃতি। বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত চীনা পুঁথি তিনি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছিলেন। আরবী ভাষায় তাম্রশাসন অনুবাদ করেছিলেন।

প্রিয়নাথ বসু

আধুনিক ভারতের নবজাগরণের অগ্রপথিক হল বঙ্গদেশ। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান ব্যবসা খেলাধূলা, রাজনীতি—জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবশিষ্ট ভারতের অগ্রযাত্রার পথ রচনা করেছে বাংলার বীর সন্তানগণ। নব ভারতের রূপকারদের সেই ঐতিহ্য ধারায় স্মরণীয় হয়ে আছে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা প্রিয়নাথ বসুর নাম।

বাংলার দৈহিক শক্তি ও খেলোয়াড়ী কৌশলের প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে তাঁর নাম।

প্রফেসর বোস নামে খ্যাত প্রিয়নাথ বসুই সর্বপ্রথম বাঙালী যিনি পিরামিড অ্যাঙ্ক, জাগলিং অ্যাকট, প্যারালাল বার, হোরাইজন্টাল বার ও ঘোড়ায় চড়ায় দক্ষতা অর্জন করে ভারতের প্রথম প্রকৃত সার্কাস দল গঠন করেছিলেন এবং ভারতে ও বহির্ভারতে চমকপ্রদ সার্কাসের খেলা প্রদর্শন করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

প্রিয়নাথের সার্কাসে পরিচালক, খেলোয়াড়, অশ্বারোহী, পশু শিক্ষক সকলেই ছিলেন বাঙালী। বোসেস সার্কাস প্রকৃত অর্থেই ছিল বাঙালী সার্কাস।

প্রিয়নাথ বসুর জন্ম ১৮৬৫ খ্রিঃ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। সেকালের বিশিষ্ট কবি নাট্যকার এবং বিখ্যাত হিন্দুমেলার অন্যতম উৎসাহী ও উদ্যোগী কর্মী মনোমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়নাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মনোমোহন বসু সম্পর্কে লিখেছেন, "..... তিনি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লোকের মধ্যে জাতীয়ভাব উদ্দীপন করতেন। তাঁর বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল। বাংলায় অমন সহজ ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে কাহাকেও শুনি নাই।"

মনোমোহন তাঁর কর্মক্ষেত্র কলকাতায় বর্তমান বিধানসরণী ও বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে নিজের বাড়িতে সপরিবারে বাস করতেন। প্রিয়নাথের স্কুলের শিক্ষা আরম্ভ হয় গ্রামের স্কুলে। তারপর তিনি কলকাতায় মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউশানে শিক্ষা লাভ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনার চাইতে খেলাধুলোর দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর। গ্রামের মুক্ত আলোবাতাসে খোলামাঠে দৌড়ঝাঁপ করে, পুকুরে সঙ্গীদের সঙ্গে সাঁতার কেটে মজবুত শরীর তৈরি হয়েছিল। কলকাতায় আসার পর আহিরীটোলায় গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের কাছে জিমন্যাসটিক শেখেন। পরে নিজের বাড়িতেই বন্ধুদের নিয়ে একটি ব্যায়ামের আখড়া খোলেন।

স্বামী বিবেকান্দ তাঁদের সিমলার বাড়ি থেকে ছেলেবেলায় এই ব্যায়ামাগারে কিছুদিন ব্যায়াম শেখেন। তিনি প্রিয়নাথের মেজদা মতিলালের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন।

নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা প্রিয়নাথ নিজে যেমন করতেন তেমনি সমবয়সী কিশোর ও তরুণীদের ব্যায়মে উৎসাহিত করতেন।

গোড়ার দিকে নিজের ছোট গ্রাম জাগুলিয়াতে মাঝে মাঝে গিয়ে তিনি গ্রামের ছেলেদের ব্যায়াম শেখাতে আরম্ভ করেন। পরে কলকাতায় নানান পাড়ায় এবং আগরপাড়া, পানিহাটি প্রভৃতি অঞ্চলেও ছেলেদের ব্যায়াম শেখাতে যেতেন।

প্রিয়নাথ জিমন্যাসটিকে এতটাই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে কৈশোর বয়সেই প্রফেসর খেতাব পেয়ে যান। পরে এই খেতাব তাঁর নামের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে যায়। দেশে ও বিদেশে প্রফেসর বোস নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

প্রিয়নাথের প্রফেসর খেতাব পাওয়ার পেছনে একটি মজার ঘটনা আছে। তখন বাংলার বড়লাট লর্ড ডাফরিন। একবার প্রিয়নাথ আলিপুরে চিড়িয়াখানার মাঠে এক অনুষ্ঠানে তাঁর দল নিয়ে জিমন্যাসটিকের নানারকম কসরৎ দেখান। বড়লাট সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রিয়নাথের জিমন্যাসটিক দেখে তিনি খুশি হয়ে প্রিয়নাথকে প্রফেসর বোস নামে সম্বোধন করে আলাপ করেন।

তারপর থেকে প্রিয়নাথ বড়লাটের দেওয়া নাম নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে নেন। অবশ্য পেশাগত কারণেই তিনি একাজ করেছিলেন।

সেই সময়ে সার্কাস বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু এদেশে ছিল না। হিন্দুমেলার বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র ঘোড়ার নানারকম খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই খেলাকে বলতেন খোঁড়া ঘোড়ার সার্কাস।

কিছু পরে নবগোপাল মিত্রের আত্মীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বন্ধুদের নিয়ে একটি ছোটখাট সার্কাস দল করার চেষ্টা করেন। সেই দলে দেশী বিদেশী খেলোয়াড়গণ খেলা দেখাতেন।

বিদেশেও এই সার্কাসের দল খেলা দেখিয়ে প্রশংসা লাভ করেছিল। অবশ্য বছর দুয়েক মাত্র আয়ু পেয়েছিল এই সার্কাস দল।

প্রিয়নাথের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস প্রতিষ্ঠার আগে বোম্বাইতে গজিয়ে উঠেছিল ছাতেরির সার্কাস। সে অবশ্য নামেই সার্কাস, পথেঘাটে বেদেরা যেসব খেলা দেখিয়ে বেড়ায় তারই একটু উন্নত সংস্করণ মাত্র। সার্কাসের খেলার বৈচিত্র্য, নৈপুণ্য ও প্রদর্শনশৈলী তাতে ছিল না।

ভারতের সার্কাসের ইতিহাসে প্রিয়নাথের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক সার্কাস দল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রিঃ।

একটি সংগঠিত সার্কাসদল তৈরি করার পরিকল্পনা সম্ভবতঃ আগাগোড়াই প্রিয়নাথের মাথায় ছিল। কেননা নানান ব্যায়ামগারে তিনি বাছাই করা কিছু তরুণকে বিশেষ বিশেষ খেলা ও কসরতের শিক্ষা দিয়ে দক্ষ করে তুলেছিলেন। তাদের নিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে তিনি গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের পত্তন করেন। সেই হল ভারতীয় সার্কাসের সূত্রপাত।

এক বছরের মধ্যেই প্রিয়নাথের সার্কাস দল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাঙালী তরুণ দলের শক্তি ও কৌশলের নানান কসরৎ দেখে দর্শকরা চমৎকৃত হত।

১৮৮৮ খ্রিঃ গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস, রাজবাড়ি, কাকিনা, রংপুর, ময়নসিংহ ইত্যাদি জায়গায় খেলা দেখিয়ে প্রশংসা লাভ করে।

প্রিয়নাথের মেজদা মতিলাল বসু ছিলেন সঙ্গীত রসিক ও লেখক। ভাইয়ের সার্কাস দলের রমরমা দেখে তিনিও দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। ১৮৮৮ খ্রিঃ সার্কাসে ঢুকে আয়-ব্যয়ের হিসেবের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।

অবশ্য দুই ভাই বেশি দিন এক সঙ্গে থাকতে পারেননি। ১৯০৯ খ্রিঃ মতিলাল দল ছেড়ে নতুন দল গঠন করেন। তখন প্রিয়নাথ তাঁর সার্কাসের নতুন নামকরণ করেন প্রফেসর বোসেস গ্র্যাণ্ড সার্কাস।

যাই হোক প্রিয়নাথ বাঙালীর সার্কাস নিয়ে ১৮৮৮ খ্রিঃ প্রথমবার উত্তর ভারতে যান। হাতেয়া, ফয়জাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, কোয়েটা, করাচী, রাজকোট, জামনগর, জুনাগড়, চরখারি, গোয়ালিয়ড়—যখন যেখানে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, দর্শকের ভিড় উপছে পড়েছে।

সার্কাসে মানুষের নানান খেলার বৈচিত্র্যের সঙ্গে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল পশুর খেলা। সেসব দেখে লোকের তাক লেগে যেত।

প্রিয়নাথ তারপর বছরের পর বছর উত্তর ভারতে তাঁর দল নিয়ে গেছেন। প্রতিবারেই প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে সার্কাসের খেলা দেখে দর্শকরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

সার্কাস দেখতে কেবল সাধারণ মানুষের ভিড় হত তাই নয়। তাবড় সাহেবদের সঙ্গে রাজা-মহারাজারাও গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সুখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথও পঞ্চমুখে এই সার্কাসের প্রশংসা করেছেন।

গোড়ার দিকে সার্কাসে কুকুর আর বানর দিয়ে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন প্রিয়নাথ। ১৮৯৬ খ্রিঃ রেওয়ার মহারাজা সার্কাস দেখে খুশি হয়ে প্রফেসর বোসকে একজোড়া বাঘ উপহার দেন।

পরে এরাই লক্ষ্মী আর নারায়ণ নামে বোসের সার্কাসের দর্শক আকর্ষণের অন্যতম সম্পদ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর সার্কাসের ইতিহাসে প্রিয়নাথই সর্বপ্রথম বাঘের সঙ্গে খেলা চালু করেন। রেওয়ার রাজার প্রীতি উপহার বাঘ দুটির সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছিল শুম্ভ নিশুম্ভ নামের দুটি বাঘ ও বারোটি বাঘিনী।

বাঘেদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রিয়ানথ নিজেই করেছিলেন। আবার সুশীলাসুন্দরী ও বাদলচাঁদ নামে দুজন খেলোয়াড়কেও তিনি তৈরি করেছিলেন বাঘ নিয়ে খেলা দেখাবার জন্য। তাঁরা রীতিমতো খালি হাতে বাঘের সঙ্গে খেলতেন। প্রিয়নাথ এভাবে সার্কাসের জগতে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

এমন এক যুগে প্রিয়নাথ মেয়েদের দিয়ে বাঘের খেলা দেখিয়েছেন, যখন বাঙালী মেয়েদের গৃহবন্দী জীবনে আবদ্ধ থাকতে হত। মেয়েদের সংসারের গণ্ডীর বাইরে বেরনো সামাজিকভাবেই নিষিদ্ধ ছিল। প্রিয়নাথ অসাধ্য সাধন করেছিলেন। বাঙালী মেয়েদের সাহস ও কলাকৌশল দেখে অনন্দে গর্বে লোকেরা ধন্য ধন্য করত।

সেইকালে বিদ্যাবুদ্ধিতে বাঙালীর ভারত জোড়া নাম। বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ব বিজয়ের পর সারা ভারতে বাঙালীর ক্ষমতার জয়জয়াকার। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে।

শারীরিক শক্তি ও নানা কসরতেও যে বাঙালী অগ্রগণ্য তা বোসেস সার্কাস প্রমাণ করেছিল।

ভারতে ও ভারতের বাইরে সম্মানের সঙ্গে খেলা দেখিয়ে প্রিয়নাথ স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

১৯০১ খ্রিঃ পর প্রিয়নাথ তাঁর সার্কাস নিয়ে দক্ষিণ ভারত ও সিংহল যান। সর্বত্রই তাঁরা দর্শকদের দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্থিত হন।

পরের বছর ভারতের বাইরে গেল বোসেস সার্কাস। রেঙ্গুন হয়ে দূর প্রাচ্যে খেলা দেখিয়ে রীতিমতো এক বিজয় অভিযান করে।

পরে বর্তমানের মায়ানমার বা বার্মা, মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশেও বহুবার বোসেস সার্কাস সফর করে।

দূরপ্রাচ্যে যতবার বোসেস সার্কাস গেছে, তাঁবুতে দর্শকদের ভিড় উপছে পড়েছে। প্রিয়নাথ তাঁর রোমাঞ্চকর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন, 'সেখানে আমাদের দেশের রথের মেলার মতো দর্শক ভিড় হত।'

জাভার লোকেরা সার্কাসের জন্তু জানোয়ারের খেলা স্তম্ভিত হয়ে দেখত। তারা প্রথম উট দেখে সার্কাসের পশুশালায়।

বোসেস সার্কাসের খেলার বাহাদুরি এমনই ছিল যে বিদেশী সুসজ্জিত সার্কাস দলও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না।

একবার, সেটা ১৯০৫ খ্রিঃ হবে, বিলাতের বিখ্যাত হারমস্টোনস সার্কাস গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলল। তাদের দলেও বাঘের খেলা দেখানো হত।

সেই শীতকালে অন্য অন্য বারের মতো প্রিয়নাথও গড়ের মাঠে সার্কাসের তাঁবু ফেলে খেলা দেখাচ্ছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিখ্যাত সার্কাসের তাঁবু প্রায় পাশাপাশি পড়েছে—দর্শকদেরও ভিড় হচ্ছে। রীতিমতো এক অলিখিত প্রতিযোগিতা জমে উঠল দুই দলের মধ্যে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সাহেবদের তাঁবুতে আর লোক ঢুকছে না। যত ভিড় বোসেস সার্কাসে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে বিলিতি হারমস্টোনস সার্কাস তাঁবু গুটিয়ে দূরপ্রাচ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়।

বাঘের খেলাতেই বোসেস সার্কাস বাজি মাত করেছিল। এমন চমকপ্রদ আর দুঃসাহসিক খেলা সংগঠন করা বিলিতি নামী সার্কাসদলের পক্ষেও সম্ভবপর হয়নি।

তাছাড়া এই সার্কাসের খেলোয়াড়রা তাঁদের দলের প্রতি ছিল নিবেদিতপ্রাণ। দলের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাঁরা স্ব স্ব বিষয়ে অত্যন্ত মনোযাগী ছিল।

তাঁর দলের সঙ্গে কর্মীদের এই আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রিয়নাথের চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য। তাঁর ব্যক্তিত্ব সহমর্মিতা ও সংগঠন ক্ষমতা ছিল এমনই যে কাজের সঙ্গে কর্মীদের আত্মিক সম্পর্ক আপনা থেকেই গড়ে উঠত।

তদুপরি তাঁর রুচি, বুদ্ধি ও খেলা শেখাবার দক্ষতা সকলের মন জয় করে নিত। তিনি ছিলেন সহৃদয় ও সুরসিক। খেলোয়াড় ও সার্কাসের কর্মীদের তিনি যেমন ভালবাসতেন তেমনি দলের পশু-পাখির প্রতিও তাঁর মমত্ব ও যত্ন ছিল অপরিসীম।

তাঁর নিজের হাতে গড়ে তোলা খেলোয়াড়েরা দেশে বিদেশে কলাচাতুর্য দেখিয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফলে মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে সকল খেল্লোয়াড় তাঁর অনুগত থেকে সমগ্র দলটিকেই একটি পরিবারে রূপ দিয়েছিল। আর এই পরিবারের সুখ্যাতি অম্লান রাখার চেষ্টাকে তাঁরা কর্তব্য বলে মনে করত।

যাকে বলে টিম ওয়ার্ক, এভাবেই তা বোসেস সার্কাসে গড়ে উঠেছিল এবং এই টিম ওয়ার্কই ছিল বোসেস সার্কসের অসামন্য সাফল্যের অন্যতম মূলধন।

কৃতি মানুষদের জীবনী আলোচনায় তাঁদের কর্মকৃতিত্বের পরিচয়ই প্রাধান্য পায়। প্রিয়নাথ বোসের গৌরবময় জীবনের বড় কাজ তাঁর দলের শিল্পীদের তৈরি করা। সেই শিল্পীদের গৌরবের মধ্যেই মিশে আছে তাঁর সত্যকার পরিচয়। সার্কাসদলের ইতিহাসে যে কৃতিত্ব ও গৌরবের স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন, সর্বোপরি ভারতের সার্কাসের ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন, এই সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে মিশে আছে যাদের কলাচাতুর্য ও আত্মিক সংযোগ তাদের পরিচয় না জানলে প্রিয়নাথের পরিচয়ই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই সংক্ষেপে বোসেস সার্কাসের কয়েকজন শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরছি।

বাঘের খেলা ছিল বোসেস সার্কাসের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। এই খেলা দেখাতেন 'রূপসী বোম্বেটে' সুশীলাসুন্দরী। সার্কাসে যোগ দেবার পর তিনি গোড়ার দিকে সিঙ্গল ডবল ট্রাপিজ ইত্যাদি সহ আরও কিছু খেলা দেখাতেন।

রেওয়ারে রাজার বাঘ উপহার পাবার পর ১৯০১ খ্রিঃ থেকে তিনি দুঃসাহসিক বাঘের খেলা দেখাতে শুরু করেন।

আধঘণ্টা ধরে তিনি খালি হাতে বাঘের সঙ্গে থেকে নানাভাবে খেলা

করতেন, তাদের আদর করতেন। সব শেষে বাঘের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে খেলা শেষ করতেন।

খাঁচার ভেতরে একজন মহিলাকে এমন সাবলীল নির্ভীক ভাবে বাঘের সঙ্গে খেলা করতে দেখে পুরুষ দর্শকরাও নিস্পন্দ হয়ে যেত। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত মহিলা দর্শকদের মধ্যে।

সুশীলাসুন্দরীর জন্ম ১৮৭৯ খ্রিঃ। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯২৪ খ্রিঃ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একবার বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাবার সময় একটি অর্ধ-শিক্ষিত বাঘ তাঁকে জখম করেছিল। তারপরেই তিনি খেলা ছেড়ে দেন। কিন্তু দুঃসাহসিকা সুশীলাসুন্দরীর কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত।

সুশীলার বোন কুমুদিনীও বোসেস সার্কাসে মহিলা শিল্পীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ট্র্যাপিজের খেলায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর। সেজন্য তাঁকে বলা হত 'উড়ন্ত পরী'।

ঘোড়ার খেলা দেখাতেন কুমুদিনী। সুকুমারী, মৃন্ময়ী, সুলতান বালা দেখাতেন হাতীর খেলা।

প্রফেসর বোসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তাঁর সার্কাস দলে বাঘের খেলা সংযোজন। সুশীলাসুন্দরী ও বাদলচাঁদ নামে এক মুসলমান যুবককে তিনি এই খেলার জন্য নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন।

বাদলচাঁদ ছিলেন ভারতের সেরা বাঘের খেলোয়াড়। তিনি খালি হাতে বাঘের সঙ্গে কুস্তি, ঘুঁসোঘুসি করতেন।

বাঘ নিয়ে তাঁর রক্ত-হিম-করা খেলা ছিল, একটি বাঘের পিঠে শুয়ে অন্য একটি বাঘের মুখের মধ্যে নিজের মাথা ঢোকানো। আধঘণ্টা ধরে তিনি এ সব খেলা দেখাতেন।

বোসেস সার্কাসের অন্য এক বিশিষ্ট খেলোয়াড় ওড়িশাবাসী পবনচাঁদ। ট্র্যাপিজের খেলায় তাঁর দক্ষতার প্রশংসা করেছেন ঐতিহাসিক ভিনসেট স্মিথ। ভারতে তো বটেই বিলাতেও ট্র্যাপিজের খেলায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

ট্র্যাপিজ ও প্যারালাল বারের খেলায় বোসেস সার্কাসের পান্নালাল বর্ধন বিদেশেও প্রশংসা লাভ করেছেন।

১৯০০ খ্রিঃ প্যারিসে ইউনিভার্সাল এক্সপোজিশনে তাঁর অসামান্য বারের খেলা দর্শকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

পুরুষদের মধ্যে ঘোড়ার নানা খেলায় দক্ষ ছিলেন গৌরগোপাল সেন, ফণীন্দ্রনাথ, মন্মথনাথ দে, হীরেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ। গৌরগোপাল রিং আর ডবল ট্র্যাপিজেও সমান দক্ষ ছিলেন।

সবরকম বারের খেলায় ওস্তাদ ছিলেন কৃষ্ণলাল বসাক ও রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রামচন্দ্র প্রথম জীবনে ক্লাউন সাজতেন।

দলের জন্তু-জানোয়ারদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রফেসর বোস নিজ হাতে গড়ে-পিটে তৈরি করেছিলেন কয়েকজন ট্রেনার। তাদের মধ্যে মতিলাল মিত্র ও ভূতনাথ বসু দেশজোড়া নাম করেছিলেন।

ভীম ভবানীর নাম আমরা আজকাল অনেকেই ভুলে গেছি। অসাধারণ দৈহিক শক্তির পরিচয় প্রদর্শন করে তিনি দেশে ও বিদেশে প্রশংসা লাভ করেন। লোক ভর্তি গরুর গাড়ি বা মোটর গাড়ি বুকের ওপর দিয়ে চালানো, বুকে হাতি তোলা, বুকের ওপর বিশ মণ ওজনের পাথর ভাঙ্গা ইত্যাদি খেলা দেখিয়ে তিনি দর্শকদের স্তম্ভিত করে দিতেন।

ভীম ভবানীর সাগরেদ মহেন্দ্রনাথ দাস ও কে ডি পাল, তাঁরাও শক্তিমত্তায় কম বাহাদুর ছিলেন না।

সার্কাসের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য প্রিয়নাথ যেমন জন্তু-জানোয়ার নিয়ে বিপজ্জনক খেলা আমদানী করেছিলেন তেমনি তিনি তাঁর সার্কাসের খেলায় সংযোজন করেছিলেন যাদুবিদ্যা। শেষ দিকে ওই যাদুবিদ্যা হয়ে উঠেছিল বোসেস সার্কাসের অন্যতম আকর্ষণ।

গণপতি চক্রবর্তী বোসেস সার্কাসে ঢুকেছিলেন একজন পেনটার হিসেবে। প্রফেসর বোস তাঁর মধ্যে একজন যাদুকরের সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায় গণপতি পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিলেন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ যাদুকর। তাঁকে বলা হত প্রাচ্যের হুডিনি।

আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর হ্যারি হুডিনিকে কোনও কিছু দিয়েই বেঁধে বা আটকে রাখা যেত না। গণপতিও এক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর বিখ্যাত ভৌতিক বাক্সের খেলা দেখার জন্য সার্কাসের তাঁবুতে দর্শকের ভিড় উপচে পড়ত।

হাত পা বেঁধে বস্তায় পুরে একটা বাক্সে গণপতিকে তালা বন্ধ করে মঞ্চের সামনে রেখে দেওয়া হত। বাক্সের ওপরেও থাকত দড়ির বাঁধন। কী অলৌকিক কৌশলে সেই বাঁধন খুলে বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দর্শকদের কাছ থেকে রুমাল, আংটি, ঘড়ি কলম ইত্যাদি চেয়ে নিয়ে একটা কালো পর্দার পেছনে চলে যেতেন।

এরপর দড়ি তালা-চাবি এবং বাক্সের ভেতরে বস্তা খুলে দেখা যেত যাদুকর গণপতি হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছেন। দর্শকদের কাছ থেকে নেওয়া সমস্ত জিনিস রয়েছে তাঁর কাছে।

প্রিয়নাথের মেজদা মতিলাল বসু ভাইয়ের সার্কাসে হিসাব নিকাশ রাখতেন। ১৯০৯ খ্রিঃ তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ হলে মতিলাল নিজে একটি সার্কাস দল গড়েন। কিন্তু এক বছর পরেই তিনি মারা যান। তখন তাঁর তৈরি দল চালাতে লাগল ছেলে মণিলাল।

দল ভাঙ্গার পরেই প্রিয়নাথ তাঁর গ্রেস্ট বেঙ্গল সার্কাসের নাম বদল করে বোসেস গ্র্যাণ্ড সার্কাস রাখেন।

ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে ভারতের জনজীবনেও অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই অবস্থাতেও প্রিয়নাথের সার্কাস বেশ ভালভাবে চলেছে।

যুদ্ধের শেষ দিকে মণিলালের দল বোসেস সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সেই বিরাট দল পোষণের সমস্ত দায়িত্ব পড়ল প্রিয়নাথের কাঁধে। তিনি আবার দূর প্রাচ্যে সফরের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভাইপো মণিলাল দেশের বাইরে যেতে রাজি হল না। তখন প্রিয়নাথ একাই সেই বিরাট দল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং মালয়, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি স্থানে খেলা দেখাতে লাগলেন।

দীর্ঘ তিন বছর পর প্রিয়নাথ একবার দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু ভাইপো মণিলাল তাঁর সঙ্গে করল বিশ্বাসঘাতকতা। অন্যায়ভাবে সার্কাসের সত্ত্ব ও টাকাকড়ি কেড়ে নিল মণিলাল।

প্রিয়নাথ তাঁর দলকে মালয়ে রেখে এসেছিলেন। কপর্দকহীন অবস্থাতেই বাধ্য হয়ে তাঁকে আবার মালয়ে ফিরে যেতে হল।

এই ঘোর সঙ্কটকালে এক বন্ধুর ছেলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কাজী কাদের দাদ তাঁর নাম। তাঁর সঙ্গে মিলে প্রিয়নাথ আবার নতুন করে দল করলেন।

প্রফেসর বোসেস গ্র্যাণ্ড সার্কাস পূর্ণ উদ্যমে সিঙ্গাপুরে খেলা দেখাতে শুরু করল।

সেই সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে মালয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক গোলযোগের শিকার হল বোসেস সার্কাস। চীন ও জাপানের তীব্র রেষারেষির মধ্যে বোসেস সার্কাসে যোগ দেয় ভিলাস্কো ট্রুপ নামে একদল খোলোয়াড়। ভিলাস্কোর দলকে জাপানী মনে করে চীনারা বোসেস সার্কাসের বিরুদ্ধে বয়কট জারি করল।

ফলে সার্কাসের দর্শক সংখ্যা হঠাৎ করে এমন কমে গেল যে দলের অস্তিত্ব রাখাই দায় হয়ে পড়ল।

সৌভাগ্যক্রমে মাস তিনেকের মধ্যে এই সংকট কেটে গেল। প্রমাণ হল যে ভিলাস্কোর দল ফিলিপিনো, জাপানী নয়। চীনাদের বয়কট উঠে গেল, বোসেস সার্কাসের প্রদর্শনীতেও আবার চীনা দর্শকদের ভিড় জমে গেল।

সার্কাস চলতে লাগল রমরম করে। মালয়ের নানান জায়গায় ঘুরতে লাগল সার্কাস।

ভাইপো মণিলালের বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকেই শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল প্রিয়নাথের। নতুন করে দল গড়ে পরিশ্রমও বেড়ে গিয়েছিল অত্যধিক। প্রিয়নাথ কঠিন অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য কাদের দাদ প্রিয়নাথকে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ মালয় ছেড়ে গেলে দলের সমূহ ক্ষতি। তাতে লোকসানে পড়বেন অসময়ের বান্ধব কাদের দাদ। তাই প্রিয়নাথ কিছুতেই দেশে ফিরে যেতে সম্মত হলেন না।

শেষ পর্যন্ত বিদেশে প্রিয়জনদের থেকে বহু দূরে সিঙ্গাপুরেই ১৯২০ খ্রিঃ ২১শে মে প্রিয়নাথ রোগশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আঁতে লরেৎ ল্যাভয়সিয়ার

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ, ল্যাভয়সিয়ার বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর বিচার বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রচনা করেছে।

১৭৪৩ খ্রিঃ ফ্রান্সের এক অভিজাত পরিবারে ল্যাভয়সিয়ারের জন্ম। প্রচুর জমিজমার মালিক ছিল তাঁদের পরিবার, তার ওপর বাবা ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। মাও ছিলেন এক আইনজীবী পরিবারের কন্যা।

পাঁচ বছর বয়সেই পিতৃহারা হন ল্যাভয়সিয়ার। মামার মাড়িতেই মানুষ হন তিনি। পড়াশুনো করেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ স্কুল মাজারিনে। সেখান থেকে আইন পড়বার জন্য তাঁকে ভর্তি করা হয় মাজারিন কলেজে।

জন্মসূত্রেই আইনের জগতের সঙ্গে পরিচয়। তাই একজন আইনজীবী হওয়ার স্বপ্নই তাঁকে বাল্যাবধি দেখতে হয়েছে।

পড়াশুনায় বরাবরই ছিলেন মনোযোগী। কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে শিক্ষক ছাত্র সকলেরই ভালবাসা লাভ করেন।

আইনের ছাত্র হলেও কলাবিভাগের নানা বিষয়েও গভীর আগ্রহ ছিল ল্যাভয়সিয়ারের। সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের বই নিয়মিত পড়তেন তিনি। আইনের বই পড়ার ফাঁকেই চলত অন্য বিষয়ের চর্চা।

ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। আইন

কলেজে পড়ার সময় স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন বিজ্ঞান শাখার দিকে, বিশেষ করে রসায়ন বিষয়ে।

কলেজের দুজন বিজ্ঞান শিক্ষকের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর অন্তস্থিত সুপ্ত বিজ্ঞান প্রতিভা বিকাশ লাভের সুযোগ পায়।

রুয়েল এবং গুটার্ড দুজনেই ছিলেন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান জার্ডিন ডুরয়ের শিক্ষক-ডেমনেস্ট্রেটর। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশগুলোতে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করতেন।

রুয়েল রসায়ন বিভাগ দেখতেন। ক্লাস নেবার সময় তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা যোগাতেন। তিনি বলতেন, কেবল বই মুখস্থ করলেই হবে না। বইর পড়া কতটা ঠিক তা দেখতে হবে হাতে কলমে পরীক্ষা করে। পরীক্ষার আলোতেই তোমরা দেখতে পাবে নতুন নতুন আবিষ্কারের পথরেখা।

রুয়েলের উপদেশে গভীরভাবে প্রভাবিত হন ল্যাভয়সিয়ার। তাঁর যাতায়াত বাড়তে থাকে ল্যাবরেটরিতে।

গুটার্ডে নিতেন ভূ-বিজ্ঞান ও খনিবিদ্যার ক্লাশ। তাঁর কাছ থেকে ল্যাভয়াসিয়ার শিখেছিলেন পর্যবেক্ষণ—কিভাবে কোন জিনিস দেখতে হয়।

এই দুই বিজ্ঞান শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসে জেগে ওঠে ল্যাভয়সিয়ারের বিজ্ঞান প্রতিভা, আইনের জটিল জগৎ ছেড়ে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য নিয়ে মেতে ওঠেন তিনি।

গুটার্ডে ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রায়ই চলে যেতেন গ্রামে। গ্রামের মেঠো পথ, বন পাহাড় ঘুরে ঘুরে তিনি ক্লাশ নিতেন, বুঝিয়ে দিতেন প্রকৃতির রহস্য।

দিনের পর দিন তাঁর দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে ল্যাভয়সিয়ার লাভ করলেন প্রখর বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। ভাবীকালের মহাবিজ্ঞানীর প্রস্তুতিপর্ব এভাবেই সম্পন্ন হয়।

আইনজীবী বাবা দেখে বিস্মিত হন, আইনের বই ছেড়ে তাঁর ছেলে মেতে উঠেছে বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষায়।

সেইকালে প্যারিসে জিপসামের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। উন্নত শিল্পের দেশে নানাভাবেই ব্যবহার করা হত বস্তুটিকে। জিপসামের বিশেষত্ব হল, এটি গুঁড়ো করে জলে মিশিয়ে লেই তৈরি করলে, সেই লেই ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যায়। তা দিয়ে জোড়া যায় সবকিছু। এই জমাটবাঁধা বস্তুটিরই নাম প্লাস্টার অব প্যারিস। নামের সঙ্গেই বস্তুটির ইতিহাস জড়ানো—এই প্লাস্টার প্রথম ব্যবহার হয় প্যারিসে।

যুবক ল্যাভয়সিয়ার, তখন তাঁর বয়স সবে পঁচিশ, এই জিপসামের রাসানিয়ক গঠন নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। তিনি জানালেন বস্তুটি আর কিছুই নয়, ক্যালসিয়াম সালফেট, লবন জলের সঙ্গে যুক্ত হলেই তা কঠিন আকার ধারণ করে।

ওই বয়সেই আরও একটি চমকপ্রদ কাজ করে ফেললেন ল্যাভয়সিয়ার। সেই যুগে রাজধানী প্যারিসে পথেঘাটে আলোর ব্যবস্থা ছিল খুবই কম। যেটুকু আলো রাস্তায় দেওয়া হত তাও ছিল খুবই নিস্তেজ। তাতে পথের অন্ধকার দূর হত না।

ল্যাভয়সিয়ার উদ্যোগী হয়ে সেই সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। তাঁর চেষ্টা ও ব্যবস্থাপনায় পথের নিস্তেজ আলোতে ঔজ্জ্বল্য বাড়াল। পথ হল আলোকিত।

তরুণ ল্যাভয়সিয়ারের এই কাজ প্যারিসের বিজ্ঞান আকাদেমি দেৎ সায়েনসেস-এর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অচিরেই বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ দেবার জন্য তাঁকে আকাদেমির সদস্যপদ দেওয়া হল।

বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য ভুক্ত হওয়ায় ওই তরুণ বয়সেই ল্যাভয়সিয়ার পেলেন বিজ্ঞানীর স্বীকৃতি ও সম্মানজনক পরিচিতি। এর পরেই ভসেজ পাহাড়েব ভূ-সমীক্ষার কাজ করলেন ল্যাভয়সিয়ার। তাঁর পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন বিজ্ঞান পত্রিকা জার্নাল দেৎ সারভেন্ট-এর পাতায়। তাঁর এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য ফ্রান্সের সম্রাটের স্বর্ণপদক লাভ করলেন ল্যাভয়সিয়ার।

প্যারিসের বিজ্ঞান আকাদেমির সম্মানীয় সদস্যপদটি ছিল অবৈতনিক কিন্তু সদস্যদের সুযোগ ছিল বিজ্ঞান বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার।

রাজধানীর নাগরিক জীবনের নানান সমস্যা সমাধানের জন্য ডাক পড়ত আকাদেমির সদস্যদের। বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য মাথা ঘামাতে হত বিজ্ঞানীদেরই।

নাগরিকদের ঘরে ঘরে সহজে জল কি করে পৌঁছে দেওয়া যায়, হাইড্রেনগুলোর দুর্গন্ধ ছড়ানো কি কবে রোধ করা যায়, কিংবা প্রবল ঠাণ্ডায় সরকারী অফিসগুলোতে তাপ সংরক্ষণের ভাল ব্যবস্থা কি করা যায়, এসব বিষয় নিয়ে আকাদেমির বিজ্ঞানীদের মাথা ঘামাতে হত।

বাহ্যিক সুখসুবিধাদিই কেবল নয় নাগরিকদের মানসিক সমস্যা ইত্যাদি নিয়েও মাথা ঘামাতে হত আকাদেমির মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের।

ল্যাভয়সিয়ার প্যারিসের নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের সন্ধানের মধ্যেই পেয়ে যান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার রসদ।

একবার ফরাসী মেয়েরা এক গুরুতর সমস্যার কবলিত হল। ঠোঁট রঞ্জনের জন্য এরা ব্যবহার করত রুজের লাল রঙ। হঠাৎ দেখা গেল সেই রঙ থেকে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে নানা রকম, কারো ঠোঁট ফুলছে, কারও ঠোঁট জ্বালার সঙ্গে আছে ফোলা।

মেয়েরা সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হল আকাদেমিতে। ল্যাভয়সিয়ার দায়িত্ব নিলেন ফরাসী ললনাদের প্রসাধনের সমস্যা ঘোচাবার।

কয়েকদিনের মধ্যেই আকাদেমি থেকে মেয়েদের রূপচর্চার জন্য দিয়ে দেওয়া হল নতুন রুজ। তা হল সম্পূর্ণ নিরাপদ, কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়াহীন।

ল্যাভয়সিয়ারের গবেষণার ফলে ফরাসী মেয়েদের রূপচর্চার দুর্ভাবনা ঘুচল।

এমনি নানান রকম বৈজ্ঞানিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল দিন। ল্যাভয়সিয়ারের নামও ছড়িয়ে পড়তে লাগল বিজ্ঞানী মহলে।

এই সময়েই ল্যাভয়সিয়ার এমন এক হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসলেন যে তার মূল্য দিতে তাঁকে বরণ করতে হয়েছিল মর্মান্তিক অকালমৃত্যু।

জ্যাঁকুইজ পালজ ছিলেন প্যারিসের এক অভিজাত ব্যক্তিত্ব। অগাধ বিত্ত সম্পদের মালিক তিনি। কোনও এক সূত্রে এই ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল ল্যাভয়সিয়ারের।

পরিচয় কিছুটা ঘনিষ্ঠ হলে জ্যাঁকুইজ একদিন ল্যাভয়সিয়ারকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন, আপনার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ফ্রান্সের জনগণ আগ্রহের সঙ্গে আপনার গবেষণা লক্ষ্য করছে।

ল্যাভয়সিয়ার সবিনয়ে জানালেন, কিন্তু গবেষণার খরচখরচাই তো জোগাতে হিমসিম খাচ্ছি। এই অবস্থায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভরসা তো পাচ্ছি না।

জ্যাঁকুইজ সুবিধার লোক ছিলেন না। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি আলোচনার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উথাপন করেছিলেন। তাই এবারে মোক্ষম কথাটা প্রকাশ করলেন।

জ্যাঁকুইজ পরামর্শ দিলেন, ল্যাভয়সিয়ার যদি তাঁর পথ অবলম্বন করেন তাহলে অতি সহজেই গবেষণার চাহিদা মতো অর্থের যোগান পেয়ে যাবেন। কাজটা হল, বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে চাষজমির পত্তন নেয়া। তাহলে চাষীদের কাছে থেকে চাপ দিয়ে ইচ্ছেমতো টাকা আদায় করার কোনও অসুবিধা থাকবে না।

গরীব চাষীদের শোষণ করার এই অভিসন্ধি স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু সুচতুর জ্যাঁকুইজের কথার যাদুতে

ল্যাভয়সিয়ারের মাথায় ঢোকে, বিজ্ঞানসাধনার বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে একটু আধটু অন্যায় ততটা দোষনীয় নয়। বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। উপযুক্ত অর্থের যোগান দিতে পারলে বিজ্ঞানের গবেষণা অব্যাহত রাখার কোন বাধা থাকেব না।

স্বার্থান্ধ লোকের কথার জালে জড়িয়ে মোহগ্রস্ত হন বিজ্ঞানী। বিবেকের বিরুদ্ধেই তিনি শেষ পর্যন্ত জ্যাঁকুইজের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। দরিদ্র মানুষকে নিপীড়ন ও শোষণের নীল যডযন্ত্রে সেই দিন থেকেই যুক্ত হয়ে যায় বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ারের নাম।

এই বিষবৃক্ষের ফল ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই অনিবার্য পরিণতি নিয়ে দেখা দিয়েছিল ল্যাভয়সিয়ারের জীবনে। দরিদ্র প্রজাদের শোষণ পীড়নের অপরাধে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল তাঁকে জনগণের আদালতে এবং অকালে গিলোটিনে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছিল বিজ্ঞানী জীবনের সমস্ত সম্ভাবনার ইতি ঘটিয়ে।

রবার্ট অ্যানড্রুজ মিলিক্যান

গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট অ্যানড্রুজ মিলিক্যান। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত তিনিই করেছিলেন।

১৮৬৮ খ্রিঃ ২২শে মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের মরিসন শহরে বিজ্ঞানী রবার্ট মিলিক্যানের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সামান্য পাদ্রী। নিত্য অনটনের সংসার। তার মধ্যে পরিবারটিও নেহাৎ ছোট ছিল না। ভাই বোন মিলে রবার্টরা ছিলেন সাতজন। নিতান্ত কায়ক্লেশেই দিন গুজরান হত তাঁদের।

ভাইবোনদের মধ্যে রবার্ট ছিলেন বড়। তাই সংসারের অভাবের টানে শিশু বয়সেই তাঁকে রোজগারে নামতে হয়েছিল।

রবার্টের যখন সাত বছর বয়স, তখন মিলিক্যান পরিবার ইলিনয় ছেড়ে চলে আসে আয়োয়া রাজ্যে। সেখানে মাকুকেটা নামে নতুন শহরটি সবে গড়ে উঠেছে। এখানেই এক নোংরা বস্তি এলাকায় ঠাঁই করে নেয় দরিদ্র পরিবারটি।

বাল্য বয়স থেকেই রবার্ট তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই অন্ধকার বস্তি এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কখনও তাঁকে বিপথগামী করতে পারেনি।

যখন যেখানে সুবিধা পেয়েছেন, ছোটখাট কাজ করেছেন, পাশাপাশি প্রাণপণ চেষ্টায় লেখাপড়া শেখার চেষ্ট করেছেন।

গোটা শহরে সবেধন স্কুল বলতে একটি মাত্র। লেখাপড়ার প্রবল আগ্রহ নিয়ে সেখানেই নাম লেখান রবার্ট। বিজ্ঞান, অঙ্ক, ভাষা সবই শিখতে হয় সেখানে।

তাঁর যত ঝোঁক অংক আর ভাষা শিক্ষার দিকে। বিজ্ঞানের পাশ মাড়াতে মন সায় দেয় না।

যাইহোক, একদিকে সংসারের প্রয়োজনে কাজ অন্যদিকে স্কুলের পড়া। কঠোর পরিশ্রমে দুইদিক সামাল দিতে হয়েছে তাঁকে। এভাবেই কোনও রকমে স্কুলের পাঠ শেষ করেন।

কঠিন জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে করে নেওয়া সুযোগটাকে কখনও ব্যর্থ হতে দেননি রবার্ট। পূর্ণ মাত্রায় তার সদ্ব্যবহার করেছেন।

কলেজে ভর্তি হতে তাঁকে কোনও বেগ পেতে হয়নি। আঠারো বছর বয়সে ওহিও শহরে ওবার্লিন কলেজে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষার পড়া আরম্ভ করলেন। বিষয় নিলেন ভাষা ও গণিত।

দুঃখী রবার্ট ছিলেন মেধাবী ও বিনয়ী। কলেজের পড়াশুনাতেও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাপকদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে গ্রিক ভাষা ও গণিতে তিনি অসামান্য ফল করতে লাগলেন।

এই সময় খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াশুনা করবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে।

কলেজে নিচু ক্লাসে ছেলেদের পদার্থবিদ্যা পড়ানোর কোনও শিক্ষক ছিলেন না। একদিন গ্রিক ভাষার অধ্যাপক তাঁকে নিচু ক্লাসে পদার্থবিদ্যা পড়ানোর কাজটি নেবার পরামর্শ দেন।

স্নেহময় অধ্যাপকের এই প্রস্তাবের মধ্যে একটা নিশ্চিত অর্থ রোজগারের ব্যবস্থা ছিল। অভাবী রবার্টের কাছে যা ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। কিন্তু শিক্ষকতার ওই কাজে পড়াতে যে হবে পদার্থবিদ্যা।

স্কুলজীবনে নেহাৎ পড়তে হবে বলে বিজ্ঞান পড়েছেন। তাঁর সমস্ত আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল গণিত ও ভাষা শিক্ষার দিকে। তবুও হতাশ হলেন না রবার্ট। অপ্রত্যাশিত সুযোগটিও হাতছাড়া করলেন না। ভেবেচিন্তে চাকরির প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

কলেজের গ্রীষ্মাবকাশে নিজেকে অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি করে নিলেন রবার্ট। পদার্থবিদ্যার নানান বই পড়ে বিষয়টিকে একেবারে সড়গড় করে নিলেন। ইচ্ছাশক্তি আর আগ্রহ বলবতী হলে অসাধ্য কিছুই থাকে না। রবার্টের জীবনে তাই নতুন করে প্রমাণ হল।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর পদার্থবিদ্যার ক্লাশ রীতিমতো জমে উঠল। ফলিত বিজ্ঞানের দুরূহ সব তত্ত্ব ছাত্রদের কাছে একেবারে জলের মতো সহজ সরল হয়ে উঠল।

ছাত্রদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির সঙ্গে ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক হিসাবে রবার্টও চিহ্নিত হলেন।

শিক্ষকতার কাজটি করে হতদরিদ্র পরিবারের দুঃখী রবার্ট প্রতিমাসে পেতেন ৫০ ডলার মাইনে। এই রোজগার রবার্টকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দিল।

ওবার্লিন কলেজ থেকে ১৮৯১ খ্রিঃ সসম্মানে স্মাতক ডিগ্রি পেলেন রবার্ট। ততদিনে শিক্ষকতার সুবাদে পদার্থবিদ্যার অর্ন্তলোকের সন্ধান পেয়ে গেছেন তিনি।

এককালের বিজ্ঞানবিমুখ যে ছাত্র এখন বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানই হয়ে উঠল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। পদার্থবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ সন্ধান করতে লাগলেন তিনি।

ওবার্লিনের কর্তৃপক্ষ এবং সহৃদয় অধ্যাপকবৃন্দ বরাবরই রবার্টের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। সকলের চেষ্টায় ওবার্লিনেই শিক্ষকতার সঙ্গে আরও একটা বাড়তি কাজের দায়িত্ব তিনি পেয়ে গেলেন।

পদার্থবিদ্যা পড়ানোর পাশাপাশি রবার্ট ছাত্রদের জিমন্যাস্টিকও শেখাতে শুরু করলেন। স্কুলজীবনে হেলায়ফেলায় রপ্তকরা বিদ্যা কর্মজীবনে দিব্যি কাজে লেগে গেল।

দুটি কাজ থেকে পরিবারের অনটন দূর করবার মতো ভাল আয়ই হতে লাগল। ছোট ভাইবোনদের পড়াশুনার সুবন্দোবস্ত করতে পেরে রবার্টও খুশি হলেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল পদার্থবিদ্যার উচ্চতর শিক্ষালাভের দিকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন খুবই নামডাক। বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য সেখানে তখন বিরাজ করছেন আর. এস. উডওয়ার্ড, ওগডেল এন. রুড ও মাইকেল পিউপিনের মতো স্বনামধন্য বিজ্ঞানী অধ্যাপকবৃন্দ। একদিন আকস্মিকভাবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার বিশেষ বৃত্তি পেয়ে গেলেন রবার্ট।

এই অভাববিত সৌভাগ্যলাভের পেছনে এবারেও রবার্টের আগোচরে সক্রিয় ছিলেন ওবার্লিন কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁদেরই পরামর্শ মতো রবার্ট কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার একটা বৃত্তির আবেদন জানিয়েছিলেন মাত্র।

অধ্যাপকবৃন্দ সম্মিলিতভাবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে রবার্টের মেধা ও পদার্থবিদ্যায় তাঁর শিক্ষকতার কৃতিত্বের বিবরণ দিয়ে সুপারিশপত্র পাঠিয়েছিলেন। তার ফলেই রবার্টের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা হয়ে যায়।

রবার্ট কালবিলম্ব না করে চলে গেলেন কলম্বিয়া এবং সেখান থেকেই ১৮৯৫ খ্রিঃ ডক্টরেট হলেন।

সেইকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা থাকলেও উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে ছিল পশ্চাদপদ। তাই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে গবেষণার প্রয়োজনীয় বৃত্তির আবেদন জানিয়ে বিফল হলেন রবার্ট।

তিনি পড়লেন মহা ভাবনায়। ভবিষ্যতের সংকল্প সবে মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, অঙ্কুরেই কি তা বিনষ্ট হয়ে যাবে? বিজ্ঞানী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন কি তাহলে স্বপ্নই থেকে যাবে? ভেবে কুলকিনারা পান না রবার্ট।

কথায় বলে, উদ্যমী পুরুষের সুযোগের অভাব হয় না। রবার্টের জীবনে এ সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আরও একবার ভাগ্যের আনুকূল্য লাভ করলেন তিনি।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিউপিন সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীর প্রতিভাকে চিনতে পেরেছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি রবার্টকে ৩০০ ডলার ধার হিসাবে দিলেন। আর পরামর্শ দিলেন এই বন্ধ্যা দেশে পড়ে না থেকে ইউরোপে চলে যেতে।

রবার্ট অধ্যাপকের বদান্যতা ও উপদেশ মাথা পেতে নিলেন। ১৮৯৫ খ্রিঃ তিনি পাড়ি দিলেন ইউরোপে। পদার্থ বিজ্ঞানের সমকালীন গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তিনি টানা একবছর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। এই সময়ে তিনি পরিচিত হলেন রণ্টজেন, জে. জে. টমসন, কুরি ও বেকেরেল প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে।

এক বছরের এই ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রবার্টকে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে তুলল। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বদেশের স্থানটিকে নির্দিষ্ট করবার শপথ নিয়ে দেশে ফিরে এলেন তিনি।

সেই সময় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় আলোকতত্ত্বের ওপর গবেষণা করছিলেন অধ্যাপক আলবার্ট এ. মাইকেলসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানী তিনি।

সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর সহকারী হিসাবে পদার্থবিদ্যা বিভাগে চাকরি পেয়ে গেলেন রবার্ট। এই সুয়োগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন তিনি। সময়টা ১৮৯৬ খ্রিঃ।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য একজন গবেষণা সহায়ক হিসাবে যে জীবন শুরু করেন রবার্ট, কালে তা পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে।

তাঁরই অক্লান্ত এবং সার্থক গবেষণার গৌরবে বিজ্ঞান গবেষণায় বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামটি প্রোজ্বল হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক মাইকেলসনের সঙ্গে কাজ করতে করতে ক্রমশই গবেষণার গভীরে আকৃষ্ট হতে থাকেন রবার্ট। পদার্থবিদ্যার জগতের পরিপূর্ণ ছবিটি তিনি ক্রমশই আয়ত্তে আনার চেষ্টা করতে থাকেন।

পদার্থবিদ্যার হালফিলের আলোড়ন তোলা একটি বিষেয়ের সন্ধান খুঁজে বার করার জন্য তিনি আকুল হয়ে ওঠেন যা অবলম্বন করে নিজস্ব সত্য সন্ধানের প্রয়াস নিয়োজিত করবেন।

অধ্যাপক মাইকেলসন রবার্ট মিলিক্যানের বিজ্ঞান প্রতিভাকে চিনতে ভুল করেননি। উপযুক্ত সময়ে তিনি তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজের সঙ্গেও যুক্ত করে নিলেন।

১৯১০ খ্রিঃ রবার্ট শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন। অধ্যাপক মাইকেলসন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশসানিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত কাজের সঙ্গেই রবার্টকে যুক্ত করে নিলেন।

রবার্ট এই গুরু দায়িত্ব যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গেই প্রতিপালন করতে সক্ষম হন। তাঁরই একাগ্র চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমে মাত্র বছর বারোর মধ্যেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় মার্কিযুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে।

একদিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশসানিক কাজকর্ম দেখাশুনা করছেন। অন্যদিকে নিয়মিত ক্লাশ নিয়েছেন। পদার্থ বিদ্যার অধরা বিষয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজসাধ্য করে তুলছেন আনায়স দক্ষতায়। আবার সেই সময়েই গভীর রাত পর্যন্ত জেগে ক্লাসের টেক্সট বই লিখেছেন।

কর্মব্যস্ততার এই নিরবকাশ সময়েই রবার্ট বিয়ে করে সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর পত্নীর নাম গ্রেটা আরউইন। তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দিকপাল বিজ্ঞানীদের নিত্য নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান সাধনার অঙ্গন আলোড়িত হয়ে চলেছে। জে. জে. টমসন পরমাণুর রহস্যময় গর্ভ অনুসন্ধান করে বার করে এনেছেন এক ঋণ বিদ্যুৎবাহী মৌল কণা। তার নাম দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রন।

বিজ্ঞানী টমসন যৌথভাবে কাজ করেছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলসনের সঙ্গে। তাঁদের ইলেকট্রনের অত্যাধুনিক তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তুলেছে ঝড়ো হাওয়ার মাতন।

টমসনকে সঙ্গে নিয়ে উইলসন এই সময় এমন এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন যে তা নিয়ে বিশ্ববিজ্ঞানে আরম্ভ হয় তুমুল আলোড়ন। একটি নতুন যন্ত্র বানিয়ে তিনি ইলেকট্রনের আকার আকৃতি নির্ণয় করে ফেলেছেন। যন্ত্রটির তাঁর নামেই নাম হয়েছে। **Willson's Cloud Chamber**।

পরমাণু নিয়ে গবেষণার চিন্তাটি অস্পষ্ট ভাবে পোষিত হচ্ছিল রবার্টের মস্তিষ্কে। এবারে তিনি কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে জটিল বিষয় ইলেকট্রন নিয়ে। অবিশ্রাম চলতে থাকে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

একসময় তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের আলোয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে একটি বিষয়। টমসন যে পদ্ধতিতে ইলেকট্রনের আকার মেপেছেন তা নির্ভুল ছিল না।

ইউলসন তাঁর Cloud Chamber-এ ইলেকট্রনের আকৃতি মেপেছিলেন জলকণার সাহায্যে।

রবার্ট তাঁর গবেষণায় জানতে পারলেন এসকল সূক্ষ্মাতিশূক্ষ্ম পরীক্ষায় জলকণা সঠিক উত্তর দিতে পারে না। কারণ জলকণার আকার সব সময় সমান থাকে না।

তাছাড়া জলবিন্দুগুলো ক্রমাগত বাষ্প হতে থাকায় ওজনে হাল্কা হয়ে যায় এবং একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় Cloud Chamber-এ জলবিন্দুরা কখনোই ইলেকট্রনের যথার্থ আকার প্রকাশ করতে পারে না।

রবার্ট এই পরীক্ষাটি সফলভাবে করলেন জলবিন্দুর বদলে তৈলবিন্দু নিয়ে। তৈলবিন্দু জলকণার মতো চট করে বাষ্পীভূত হয় না। তাছাড়া তার আকারেরও কোনও নড়চড় হয় না।

এই পরীক্ষাটির জন্য রবার্ট বানালেন তৈল কণাদের নিয়ে তাঁর নিজস্ব একটি Cloud Chamber। এই যন্ত্রের ওপরে দুটি সমান্তরাল ধাতব পাত, তার মধ্যে তড়িতের যোজনা ও বিয়োজনের জন্য সাহায্য নেয়া হয়েছে একটি ৬০০০ ভোল্টের সংরক্ষিত ব্যাটারির।

ধাতবপাত দুটিকে তড়িদাবিষ্ট বা তড়িৎহীন করার জন্য কাজে লাগানো হল একটি সুইচ।

প্রথমে রবার্ট পাতদুটিকে তড়িদাহত করলেন। তারপর পাতের ওপরে স্প্রে করে দিলেন তেল। দেখা গেল, আশ্চর্য সব তৈলবিন্দু ধাতবপাতের মাঝ বরাবর নির্দিষ্ট ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে মেঘকক্ষের নিচে। সূক্ষ্ম তৈল বিন্দুগুলোর ব্যাস এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ।

রবার্ট স্বল্প শক্তির দূরবীণে ১.৩ সেন্টিমিটার জায়গার তৈলকণাগুলির লম্ফঝম্ফ অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু করার সুইচ টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল অদ্ভুত পরিবর্তন।

তৈলকণাগুলো নানা ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন রকম কাজ করতে লাগল। তার একটা অংশ তড়িদাহত ধাতবপাতের নির্দিষ্ট ছিদ্রপথে যেমন নিচে ঝরে পড়ছিল, তেমনি পড়তে লাগল। কিন্তু বেশির ভাগ তৈল কণাই হয় স্থির হয়ে গেছে নয়তো মেঘকক্ষের ওপরের অংশে বেগে ছোটাছুটি জুড়েছে।

দূরবীণের চোখে তৈলকণাদের এই বিচিত্র খেলা রবার্ট যত দেখেন ততই অবাক হতে থাকেন।

একই পরীক্ষা বারবার করলেন তিনি। প্রতিবারেই সেই একই ছবি দেখতে পান। এসব ছবি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর রবার্ট এই সিদ্ধান্তে আসেন যে তৈলকণাগুলোর ঋণ তড়িৎ আধানের হেরফেরের জন্য নানা কণার বেগে তারতম্য ঘটছে। কোনও কণার এক আধান, কোনওটির দুই বা তিন আধান। এক একক তড়িদাধানের ইলেকট্রন একটি, দুইটির দুই আর তিন এককের তিন।

নতুন এই অভিজ্ঞতার পরে আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষার দিকে মনোনিবেশ করলেন রবার্ট। তাঁর যন্ত্রে ভাসমান তৈলকণা রাশির ঠিক নিচে সামান্য যে বাতাসটুকু রয়েছে সেখানে তিনি পর পর পাঠাতে থাকেন আলাদা বিটা ও গামা রশ্মি।

এই শক্তির সংস্পর্শে নির্দিষ্ট তড়িদাধান তৈলকণার বদল হতে থাকে।

এভাবে পরীক্ষার দ্বারা রবার্ট প্রমাণ করলেন যে প্রকৃতিতে ইলেকট্রন হল একক আর তার তড়িদাধানও নির্দিষ্ট।

ইলেকট্রন নিয়ে পরীক্ষায় উইলসন ও টমসন সঠিক পথ ধরেই এগিয়েছিলেন এবং যথাকালে তাঁরা প্রকৃত সত্য উদ্ধারেও সমর্থ হলেন। কিন্তু জলবিন্দুর ব্যবহারের ক্রুটিটুকু তাঁরা ধরতে পারেননি বলে ইলেকট্রনের প্রকৃত পরিচয় তাঁদের কাছে অধরাই থেকে যায়।

১৯২২ খ্রিঃ মধ্যে রবার্ট ইলেকট্রনের স্থির তড়িতের পরিমাণ আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী মহলে সাড়া তুললেন।

এর পরে রবার্ট হাত দিলেন একটি নতুন কাজে। সে-ও জগৎবিখ্যাত এক তত্ত্বের সত্যনিরূপণ পরীক্ষা।

জার্মান পদার্থবিদ মাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে আইনস্টাইন তাঁর সুবিখ্যাত আলোক তড়িৎ সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু রবার্ট মিলিক্যান ও আরও কিছু বিজ্ঞানীর মনে প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে ছিল ঘোরতর সংশয়।

রবার্ট এবারে আলোক তড়িৎ সমীকরণটির যথার্থতা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি নতুন যন্ত্র তৈরি করলেন। উইলসনের মেঘকক্ষের মতো তিনিও তাঁর যন্ত্রের নাম দিলেন ভ্যাকুয়াম বারবার শপ।

এটি একটি কাচের বায়ুশূন্য কক্ষ। সেটি এমনভাবে তৈরি যে তার ভেতরে রাখা একটি ত্রিকোণ টেবিল অনায়াসে যে কোন দিকে চলাচল করতে পারে।

ত্রিকোণ টেবিলের তিন ধারে তিনি রাখলেন তিনটি বিশুদ্ধ ধাতু—সোডিয়াম, পটাসিয়ামে ও লিথিয়াম। রাসায়নিকভাবে সক্রিয় এই ধাতুর ওপরতল চুম্বক-চালিত দণ্ড দ্বারা মসৃণ করা।

এবারে তিনি ভিন্ন ধাতুর গায়ে আলোক বিচ্ছুরণ ঘটালেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ধাতুগুলোর গা থেকে নানান কম্পাঙ্কের আলোকচ্ছটা নির্গত হচ্ছে। আর সেই আলোকে রয়েছে নানা সংখ্যার ইলেকট্রন।

ক্ষরিত ইলেকট্রনের সংখ্যা ও তার শক্তি মেপে দেখলেন রবার্ট। দেখে তিনি বিস্মিত হলেন যে প্ল্যাঙ্ক এবং আইনস্টাইন তাঁদের তত্ত্বের দিক থেকে একেবারে নির্ভুল।

এভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে একের পর এক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে রবার্ট বিশ্ব বিজ্ঞানের আসরে নিজের স্থানটি নির্দিষ্ট করে নেন। তাঁর এসকল কাজের স্বীকৃতিও যথাসময়ে পেলেন তিনি।

১৯২৩ খ্রিঃ পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল দেওয়া হল তাঁকে। বলাবাহুল্য ইলেকট্রনের তড়িদাধান বিষয়ে গভীর গবেষণার ফলেই পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মোচিত হয়ে যায়।

রবার্ট ১৯১৫ খ্রিঃ শুরু করেছিলেন মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা। এই পর্যায়ে তিনি কর্মস্থল শিকাগো ছেড়ে চলে আসেন ক্যালিফোর্নিয়ার সানমারিনো শহরে।

সেখানে রয়েছে পদার্থবিদ্যার বিখ্যাত নরম্যান ব্রিজ ল্যাবরেটরি। রবার্টের তত্ত্বাবধানে অচিরেই এখানে আরম্ভ হয় মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গভীর গবেষণা।

অনতিবিলম্বেই গবেষণার উপযুক্ত অত্যন্ত সুবেদী একটি ইলেকট্রোস্কোপ বা তড়িৎ বীক্ষণ যন্ত্রও তৈরি করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি মহাজাগতিক রশ্মির শক্তির পরিমাপ নির্ণয় করতে সমর্থ হলেন।

পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে যে অসংখ্য নক্ষত্র খালি চোখে তাদের সামান্য আলোক বিন্দুর মতোই আমাদের কাছে ধরা পড়ে। সুদূরের সেসব নক্ষত্রে প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে নানা পরিবর্তন, জন্ম হচ্ছে অসংখ্য নতুন মৌলের।

আমাদের মর্তজগতে মহাজাগতিক রশ্মিচ্ছটা প্রতিনিয়ত বয়ে নিয়ে আসছে এসব মহাসৃষ্টির বার্তা। আর এর মধ্যেই রবার্ট মিলিক্যান পদার্থ বিজ্ঞনের নতুন নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন।

মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে তাঁর এই সাধনাই বিশ্ববিজ্ঞানে সব চেয়ে বড় অবদান। বস্তুতঃ রবার্টের সারা জীবনের বিজ্ঞান সাধনা পদার্থবিজ্ঞানকে দিয়েছে নতুন গতিবেগ। বিশ্ববিজ্ঞানে সেই সব কৃতিত্বের পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

ক্যালিফোর্নিয়ার সান মারিনো শহরের নরম্যান ব্রিজ ল্যাবরেটরিই ছিল রবার্টের শেষ জীবনের কর্মস্থল। এখানেই ১৯৫৩ খ্রিঃ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আলেক্সিস কারেল

মানুষের শরীরে শারীরবৃত্তীয় কোনও অঙ্গ অকেজো হয়ে পড়লে তাকে সরিয়ে কৃত্রিম অঙ্গ বসিয়ে শরীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা আজকের উন্নত বিজ্ঞানের যুগে অতি সাধারণ ঘটনা বলেই মনে করা হয়। এই অতি সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজটি যিনি প্রথম সম্ভব করে তুলেছিলেন তাঁর বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস অতি চমকপ্রদ। চিকিৎসা বিজ্ঞানে নবযুগের দিশারী এই মহাবিজ্ঞানীর নাম আলেক্সিস কারেল।

ফ্রান্সের স্ট-ফঁ-লে-নিয়ন শহরে ১৮৭৩ খ্রিঃ ২৮ জুন কারেলের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন শহরের একজন বিশিষ্ট রেশম ব্যবসায়ী। এই স্বচ্ছল উন্নত পরিবারে বড় হয়ে উঠেছিলেন কারেল একজন বড় চিকিৎসক হবার স্বপ্ন নিয়ে।

স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্য ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। স্কুলের পড়ার পাশাপাশি তিনি পড়তে থাকেন ডাক্তারী শাস্ত্রের নানান বই। গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা ছবি।

এভাবেই স্কুলের দিনগুলো স্বপ্ন ও স্বপ্ন পূরণের পথ খোঁজার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। কারেল ভর্তি হন মেডিকেল কলেজে।

যথাসময়ে ডাক্তারি পাস করলেন এবং উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ঢুকলেন লিয়ঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এখানেই ডুব দেন গবেষণায়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কাটতে থাকে দিন। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়তে থাকে চতুর্দিকে।

ঘটনাচক্রে কারেলের একাগ্র গবেষণায় নানাভাবে বাধাব সৃষ্টি হতে থাকে। জাতিতে অ-ফরাসি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি কর্তাদের সন্দেহের দৃষ্টি তাঁর প্রতি।

ব্যাপারটা বিদ্ধ করে তাঁকে। বাধ্য হয়েই তিনি শিকাগোর ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে অস্ত্র-চিকিৎসকের চাকরি নিয়ে চলে এলেন। সময়টা ১৯০৪ খ্রিঃ।

নতুন পরিবেশে নতুন উৎসাহ নিয়ে অস্ত্র চিকিৎসার গবেষণা আরম্ভ করলেন কারেল। সূক্ষ্ম অস্ত্র চিকিৎসার দক্ষতা তাঁকে অচিরেই সাফল্য এনে দেয়। এখানেই শরীরের বিভিন্ন ধমনীর প্রান্তগুলি সেলাই করার উপায় বার করলেন তিনি।

শারীরবৃত্তীয় অদলবদল ঘটিয়ে শরীরে স্বাভাবিকতা কতটা বজায় রাখা সম্ভব হয় এ নিয়ে একের পর এক পরীক্ষা চালাতে লাগলেন।

কুকুরের শারীরবৃত্তীয় প্রকৃতি মানুষের মতো। তাই প্রথমে কুকুরকেই করলেন গবেষণার সঙ্গী।

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান গবেষণায় এসেছে নতুন জোয়ার। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক গবেষণা ক্ষেত্রে রকফেলার ইনসটিটিউট। প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা সাইমন ফ্লেক্সনার।

তাঁর একাগ্র আগ্রহ ও চেষ্টায় বিশ্বের নানাপ্রান্ত থেকে সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানের প্রতিভা সমবেত হচ্ছে তাঁকে ঘিরে। তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন বিশ্ববিজ্ঞানে রকফেলার ইনসটিটিউটকে মর্যদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে।

গবেষণার উপযুক্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কোনও কিছুরই অভাব রাখেননি তিনি এই নতুন প্রতিষ্ঠানে। গবেষক বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত বাসস্থান, বেতন ও সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধার ঢালাও বন্দোবস্তও হয়েছে।

এক সময়ে সাইমনের সাদর আহ্বান এসে পৌঁছাল কারেলের কাছেও। এই আহ্বান সানন্দে গ্রহণ করলেন তিনি। তারপর পাকাপাকিভাবে চলে এলেন রকফেলারে।

এখানকার কাজের পরিবেশ ও বন্দোবস্ত দেখে মুগ্ধ ও উৎসাহিত হন তিনি। প্রাণখুলে নেমে পড়লেন গবেষণায়। একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে অগ্রসর হতে থাকে তাঁর সাধনা।

অপারেশানের টেবিলে রক্ত নেবার সময় প্রায়শই রোগীর শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে বিপদ ডেকে আনে। তা রোধ করার উপায় বার করলেন কারেল। রক্তনালী বিপদমুক্তভাবে সেলাই করার পথও খুঁজে পেলেন।

ধমনী শিরা ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় যন্ত্র অদলবদলের বিষয়টি অস্ত্রচিকিৎসকের সমস্যা হয়ে ছিল এতকাল। কারেল ধীরে ধীরে সেই সমস্যারও সমাধান করলেন।

এইভাবে অস্ত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রে কারেল নিয়ে এলেন এক নতুন যুগ। সহজ ও দুর্ভাবনামুক্ত হল দুরূহ অস্ত্রচিকিৎসা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি পেতেও বিলম্ব হল না। আলেক্সিস কারেলকে দেওয়া হল ১৯১২ খ্রিঃ চিকিৎসাবিদ্যার নোবেল পুরস্কার।

ততদিনে ইউরোপের ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। দু'বছরের মধ্যেই বেজে উঠল প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা।

বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি ছেড়ে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখালেন বিজ্ঞানী কারেল। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্থায়ী সৈন্য ছাউনিতে চিকিৎসার কাজ অক্লান্ত পরিশ্রমে করতে থাকেন।

সেনাশিবিরে আহত সৈনিকদের অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল দায়সারা গোছের। এসব দেখার পর স্থির থাকতে পারেন না কারেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের ক্ষত চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। ফলে ক্ষতের বিষক্রিয়া অনেকেরই শরীরের সুস্থ অংশে বিপজ্জনক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল।

অস্ত্রচিকিৎসকরা এই অবস্থায় সৈনিকদের বিষাক্ত ক্ষত অংশ কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন নির্মম কসাইয়ের মতো। এর ফলে অনেক সৈনিকই সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। প্রাণহানির ঘটনাও নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেদনাহত কারেল দেখলেন চিকিৎসার নামে প্রকারান্তরে এভাবে সেনাবাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে চলেছে। কারেল আকুল হয়ে ক্ষতে বিষক্রিয়া বোধের উপায় ভাবতে থাকেন।

এই সময়ে হেনরি ডাকিন নামে অন্য এক দরদী অস্ত্রচিকিৎসক কারেলের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। দু'জনে মিলে সেনা ছাউনির চিকিৎসাক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক নানা ব্যবস্থা নিতে লাগলেন। অস্ত্রচিকিৎসার ঘরগুলোকে প্রথমেই অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে দূষণমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করলেন।

অস্ত্রচিকিৎসার অস্ত্রগুলোকেও একইভাবে নিয়মিত অ্যান্টিসেপটিক রাসায়নিক দিয়ে ধোওয়া মোছার ব্যবস্থাও হল।

চিকিৎসার ঘরগুলোতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কঠোরভাবে ফিরিয়ে আনা হল। এর ফলে দেখা গেল, সৈনিকদের ক্ষতে বিষক্রিয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেল।

বিষাক্ত জীবাণুর আক্রমণজনিত দুর্ঘটনা কমে আসায় চিকিৎসার শিবিরগুলি হয়ে উঠল হাস্যোজ্বল। সৈনিকরা সুস্থ হয়ে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে লাগল।

একসময়ে মহাযুদ্ধ শেষ হল, কারেলও ফিরে এলেন স্বস্থানে। রকফেলারে এবারে শুরু করলেন মানব শরীরের টিসু নিয়ে কাজ।

তিনি লক্ষ্য করেছেন, শরীর থেকে নানা টিসু সরিয়ে যদি সংরক্ষণ করা যায় তাহলে উপযুক্ত সময়ে অস্ত্রচিকিৎসক তা নিরাপদে কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন।

টিসু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা কারেল আগেও করেছেন। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি টিসু-কালচার তৈরির পথ খুঁজে পেয়ে গেলেন।

কারেলের এই টিসু কালচারের ফলাফল থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এল নানা পরিবর্তন। আবিষ্কৃত হতে লাগল রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়াই করবার উপায় ও নানারোগের অব্যর্থ ওষুধ।

১৯৩৫ খ্রিঃ নাগাদ কারেলের সঙ্গে আলাপ হয় চার্লস লিন্ডবার্গ নামে এক বৈমানিকের। আকস্মিক এই ঘটনা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এনে দিয়েছে সুদূরপ্রসারী ফল।

বৈমানিক লিন্ডবার্গ ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, সখের বিজ্ঞানী! আকাশচারী মানুষটি যখন মাটিতে থাকেন অবসর কাটান বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের চর্চা ও পরীক্ষা নিয়ে। মনের নানা প্রশ্নের সমাধান করেন তিনি এমনি একান্ত নীরব সাধনায়।

নিজের নিতান্ত ব্যক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবাদে মাঝে মধ্যে দু'চারজন বিজ্ঞানীর কাছেও যাতায়াত করতে হত তাঁকে। এভাবেই এক পার্টিতে পেশাদার অস্ত্রচিকিৎসক ও জীববিজ্ঞানী কারেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর।

পরিচয়ের পরে নীরব বিজ্ঞানী বৈমানিক মানুষটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমে উঠতেও দেরি হল না। কারেল হয়ে উঠলেন লিন্ডবার্গের বিজ্ঞান চর্চার পথপ্রদর্শক।

জীব বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা বিষয়ে দুজনের আলাপ আলোচনা ক্রমেই গভীর থেকে গভীরে পৌঁছতে লাগল। লিন্ডবার্গের বিজ্ঞানপিপাসাও বেড়ে চলল দিনকে দিন।

একজন বিজ্ঞান-পিপাসু বৈমানিক অপরজন জগদ্বিখ্যাত শল্যবিজ্ঞানী। বিজ্ঞান-প্রীতির সূত্রে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে বিলম্ব হয় না।

মাস কয়েক পরেই কারেলের আহ্বান পৌঁছাল লিন্ডের কাছে। নতুন এক গবেষণার কাজে তাঁকে সহকারী হিসাবে পেতে চান কারেল।

লিন্ডের বৈমানিক জীবনে আকস্মিক ছেদ পড়ল। শুরু হল তাঁর বিজ্ঞানী জীবন কারেলের গবেষণা সঙ্গী হিসাবে।

কারেল ও লিন্ডের অক্লান্ত চেষ্টায় অচিরেই এক রোমহর্ষক আবিষ্কারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এ এমনই এক আবিষ্কারের ইঙ্গিত যা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিতে সাহায্য করবে।

তাঁরা জানালেন, সম্পূর্ণ জীবণুমুক্ত এমন একটি পাম্প যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব যা কৃত্রিম হৃদযন্ত্র হিসাবে কার্যকরী হতে পারে। মানব শরীরের অভ্যন্তরীণ জীবাঙ্গ সমূহের স্বাভাবিক কাজকর্মে সামান্যতমও বিকৃতি বা বিঘ্ন না ঘটিয়ে।

প্রাকৃতিক শরীরের জীবাঙ্গ সজীব রাখার নিরাপদ কৃত্রিম উপায়সমূহের সাফল্যের বিবরণ নিয়ে ১৯৩৮ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় লিন্ডবার্গ ও কারেলের জগদ্বিখ্যাত বই কালচার অব অরগানস।

এই বইতেই তাঁরা পারফিউশান পাম্প বা কৃত্রিম হৃয়যন্ত্রের সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলেন।

জীববিজ্ঞানী ও অস্ত্র চিকিৎসক কারেল একজন সমাজবিদ দার্শনিক হিসাবেও ইউরোপের চিন্তানায়কদের অন্যতম রূপে গৃহীত হয়েছিলেন।

মানব জাতির সার্বিক মঙ্গলের বিধি-বিধান চিন্তন ও নিরূপনেও ব্যয়িত হয়েছে কারেলের মনীষা। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত বই ম্যান দ্য আননোন গত শতাব্দীর মধ্যভাগে দার্শনিক চিন্তাবিদদের মনে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল।

এই বইতে কারেল বলেছেন, বিশ্বের সামগ্রিক মনস্তাত্ত্বিক, শারীরবৃত্তীয় ও অর্থনৈতিক মঙ্গল বিধানের জন্য এমন একটি উচ্চতর পরিষদ থাকা উচিত যেখানে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবীগণ। নানা দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেবেন তাঁরাই এবং তা কার্যকরী করবেন সেই সেই দেশের রাজনৈতিক নিয়ন্তাগণ।

ভোটাধিকারের প্রসঙ্গেও এই বইর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মপ্রেরণার নিরিখে সব মানুষ সমান এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস ঘটেছে। সেই কারণেই বুদ্ধিবৃত্তিতে নিকৃষ্ট মানুষের ওপর কখনোই উচ্চশিক্ষা ও ভোটাধিকার ছেড়ে দেওয়া অসমীচীন।

মানবীয় বিভিন্ন সমস্যাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ ও যাচাই বাছাই করার নানা উপায় চিন্তা করেছেন কারেল। এই নিয়ে কাজ করে গেছেন আমৃত্যু।

তাঁর আগ্রহে ও ফরাসি বিত্তবান সম্প্রদায়ের বদান্যতায় গড়ে ওঠে দ্য ফ্রেঞ্চ ফাউন্ডেশান ফর দ্য স্টাডি অব হিউম্যান প্রবলেমস্ নামে সংস্থা।

এই সংস্থা দীর্ঘায়ু হয়নি। আয়ুষ্কালে এই সংস্থার ক্রিয়াকলাপে বাস্তবসম্মত কোনও নিদান পাওয়া সম্ভব হয়নি।

বিজ্ঞানী আলেক্সিস কারেল প্যারিসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৪৪ খ্রিঃ ৫ নভেম্বর।

গণপতি চক্রবর্তী

বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে আধুনিক যাদুবিদ্যার প্রবর্তকরূপে বাঙালীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন যাদুকর গণপতি।

অবিশ্বাস্য অলৌকিক যাদু খেলা দেখিয়ে বিস্ময় সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অনন্য। তেমনি যাদুর মঞ্চে নিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে কৌতুক সৃষ্টিতেও সহজাত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি।

দর্শক সাধারণের মধ্যে ভৌতিক ক্ষমতাসিদ্ধ যাদুকররূপে তিনি জীবিত অবস্থাতেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন।

ম্যাজিক বা যাদু ব্যাপারটা আগাগোড়াই ফাঁকি; হস্তকৌশলের ধাপ্পা। কিন্তু যাদুকর গণপতি এমন অভাবনীয় ক্ষিপ্রতা এবং নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে খেলা দেখাতেন যে দর্শকরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হতেন যে তিনি অলৌকিক সাহায্য নিয়েই এমন অবিশ্বাস্য অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতেন।

যাদু প্রদর্শনীতে সমকালে গণপতির সমকক্ষ এদেশে কেউ ছিলেন না।

গণপতির জন্ম ১৮৫৮ খ্রিঃ শ্রীরামপুর চাতরার জমিদার বংশে। বাল্য বয়সেই তাঁর মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস ফুটে উঠেছিল। লেখাপড়ার নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসত। কিছুতেই তাঁকে বইর সামনে বসিয়ে রাখা সম্ভব হত না।

তাঁর যত ঝোঁক গানবাজনা নিয়ে। আর অলৌকিক উদ্ভট বিষয়ের কথা শুনলেই মেতে উঠতেন।

বালক গণপতিকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টায় অভিভাবকরা হিমসিম খেয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সবরকম শাসন ব্যর্থ হল।

এদিকে পাড়ার গানবাজনার দলে মিশে গণপতি দক্ষ হয়ে উঠলেন গান আর তবলা বাদনে।

জমিদারের ছেলে, তাকে মূর্খ হয়ে থাকলে চলে না। বংশের কলঙ্ক। তাই শেষ পর্যন্ত অভিভাবকরা গণপতিকে জানিয়ে দিলেন লেখাপড়া না শিখলে জমিদারী সম্পত্তির অংশ তাঁকে দেওয়া হবে না।

এই শাসনের ফল হল বিপরীত। গণপতির জেদ এবং আত্মমর্যাদাবোধ ছিল এমনই প্রচণ্ড রকমের যে অভিভাবকদের ওপর চটে গিয়ে তিনি একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালালেন। সেই সময় তাঁর বয়স সতেরো-আঠারো।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গণপতি নাম লেখালেন ভবঘুরে জীবনে। বাংলার বাইরে নানাস্থানে কিছুদিন ঘুরে বেড়ালেন। শেষে ভিড়ে গেলেন সাধু সন্ন্যাসীদের দলে।

নানারকম গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র, ভাগ্য গণনার কৌশল, ঝাড়ফুঁক, নানা রোগের অলৌকিক চিকিৎসা ইত্যাদি শেখার লোভে তিনি সাধুদের খেদমত করলেন অনেকদিন।

তাঁর গুপ্তবিদ্যা শেখার এই অভিযান একেবারে যে ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যায় না। যদিও যতটা আশা করেছিলেন তার তুলনায় পেয়েছিলেন খুবই সামান্য। কিন্তু যতটুকু পেয়েছিলেন তাকেই কাজে লাগিয়ে সময়কালে অসামান্য করে তুলেছিলেন তিনি।

ভবঘুরে জীবনে সাধুসন্ন্যাসী ছাড়া দু-একজন যাদুকরের সংস্পর্শেও

এসেছিলেন গণপতি। তার ফলেই যাদু জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। তাঁর সহজাত প্রবণতাই তাঁকে এ পথের পথিক করে তুলেছিল।

সেইকালে প্রফেসর বোসের সার্কাসের ভারত জোড়া নাম। এই দলে অনেক ভাল সার্কাস খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুশীলাসুন্দরী। সাহস ও দৈহিক শক্তিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তিনি খেলা দেখাতেন বাঘের সঙ্গে। দুঃসাহাসিক বাঘের খেলা দেখিয়ে তিনি বোসেস সার্কাসের সেরা আকর্ষণ হয়ে উঠেছিলেন।

ঘোরাঘুরির জীবন শেষ করে ফিরে এসে গণপতি ভিড়ে গেলেন এই সার্কাস দলের সঙ্গে। গোড়ার দিকে তাঁর কাজ ছিল সার্কাস খেলার ফাঁকে ফাঁকে দর্শকদের সামনে ম্যাজিক দেখানো।

ম্যাজিকে সহজাত প্রতিভা ছিল তাঁর। সেই সঙ্গে ছিল অভিনয় ক্ষমতা, বিশেষ করে কৌতুক অভিনয়ে দক্ষ ছিলেন তিনি। তাই তাঁর যাদুর খেলা খুবই মজাদার হয়ে উঠত। হাসিতে চমকে মজে যেতেন দর্শকরা।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিখ্যাত বোসেস সার্কাসের জনপ্রিয় এবং অপরিহার্য শিল্পী হয়ে উঠলেন যাদুকর গণপতি।

ছোটখাট সাধারণ খেলার সঙ্গে গণপতি পরে যোগ করলেন তাঁর বিখ্যাত দুটি খেলা—ইলিউশান বক্স এবং ইলিউশান ট্রী।

গণপতির এই অবিশ্বাস্য অলৌকিক খেলার কাছে সার্কাসের সব খেলাই নিষ্প্রভ হয়ে গেল। এই খেলা দুটিই হয়ে উঠল বোসেস সার্কাসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

গণপতির যাদুবাক্সের খেলা দেখার জন্য লোক পাগল হয়ে সার্কাসের তাঁবুতে ভিড় করত। সেই সময়কালে শুধুমাত্র এক বাক্সের খেলা দেখিয়েই গণপতি মাসে তিনশো টাকা পেতে লাগলেন।

তখনকার দিনের তিনশো টাকা এখনকার পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার সমান। এই মাস মাহিনার পরিমাণ থেকেই সার্কাসে গণপতির খেলার গুরুত্ব এবং তাঁর প্রতিপত্তি আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

গণপতির অত্যাশ্চর্য খেলার বিবরণ দিতে গিয়ে যাদুকর অজিতকৃষ্ণ বসু লিখেছেন, 'ইলিউশান বক্সটি ছিল একটি কাঠের বাক্স। খেলা দেখাবার আগে বিশিষ্ট দর্শকদের কয়েকজন ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। গণপতির দুখানা হাত পিছমোড়া করে এবং দুখানা পা-ও কষে বাঁধা হল। তারপর তাঁকে একটি থলেতে পুরে থলের মুখ বেঁধে সেই বাক্সে পোরা হল। বাক্সটি চারদিক থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তালা বন্ধ করে বাক্সের সামনে কাল পর্দা ঝুলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ভেদ করে দু'খানা হাত বেরিয়ে এসে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। হাত দুটি সরে যেতেই পর্দাও সরিয়ে দেওয়া হল, দেখা গেল বাক্স বন্ধই আছে।

বাক্সের ওপর বাঁয়া-তবলা রেখে পর্দা ঝুলিয়ে দিতেই দর্শকদের ফরমায়েস মতো তাল বাজতে লাগল বাঁয়া-তবলায়। ভুতুড়ে ব্যাপার! পর্দা সরে গেল, বাক্স পূর্ববৎ। আবার পর্দার আবরণ। সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর নিজে বেরিয়ে এলেন। বলা হল, আপনারা যাদুকরকে এমনভাবে চিহ্নিত করে দিন যেন ওই চিহ্ন দেখে চিনে নিতে পারেন। যাদুকরকে কেউ পরিয়ে দিলেন আংটি, কেউ চশমা। যাদুকর পর্দার আড়ালে যেতেই পর্দা সরিয়ে নেওয়া হল। দড়ি খুলে, তালা খুলে, বাক্স খুলে, মুখ বাঁধা থলি খুলে দেখা গেল দর্শকদের দেওয়া আংটি আর চশমা পরা অবস্থায় থলের মধ্যে রয়েছেন তেমনি হাত-পা বাঁধা যাদুকর গণপতি।

গণপতির অপর আশ্চর্য খেলা ছিল ইলিউশান ট্রী অর্থাৎ যাদুগাছ। গাছটি ছিল গাছ নয় একটি খাড়া ক্রস। সেই ক্রসের সঙ্গে তাঁকে শেকল, হাতকড়া ইত্যাদির সাহায্যে এমনভাবে আটকে দেওয়া হত যে তা থেকে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু যেমন ওই ইলিউশান বক্স ঠিক তেমনি এই ক্রসের বাঁধনও তাঁকে বন্দী করে রাখতে পারেনি। তিনি দ্রুতবেগে তা থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঐ অবস্থাতেই ফিরে যেতেন। তাছাড়া ওই কাঠের ক্রসে আটকানো অবস্থাতেই তাঁকে পর্দা দিয়ে ঘিরে পর্দার ভেতর যে পোশাক ছুঁড়ে দেওয়া হত, সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখা যেত গণপতি সেই ছুঁড়ে দেওয়া পোশাকটি পরে ফেলেছেন। অথচ তাঁর বন্ধন অবস্থা তেমনই রয়েছে।"

গণপতি পরে আরও একটি বিস্ময়কর খেলা প্রযোজনা করেছিলেন। তার নাম কংসের কারাগার। সেই খেলা সম্পর্কে অজিতকৃষ্ণ বসু লিখেছেন, "বোসের সার্কাস প্রদর্শনীয় প্রচারপত্রে খেলাটি ওই নামেই বিজ্ঞাপিত হত এবং দর্শক আকর্ষণ করত। কারাগারটি একটি মানুষকে আটকে রাখবার মতো খাঁচা বিশেষ। এই খাঁচার ভেতর হাতকড়া, ডান্ডাবেড়ি ইত্যাদি প্রচুর সংখ্যায় লাগিয়ে গণপতিকে আটকে রাখা হত। যেন কংসের কারাগারে বন্দী রয়েছেন বসুদেব। ওই বন্দী অবস্থা থেকে কোনো মানবের সাহায্য ছাড়া বেরিয়ে আসা কোনোরকম মানবিক উপায়ে সম্ভব নয়। কিন্তু অনায়াসে এবং দ্রুতবেগে তিনি খাঁচা শূন্য করে বেরিয়ে আসতেন এবং তারপর আবার ঠিক সেই অবস্থাতেই ফিরেও যেতেন। ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাঁচার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দেখা যেত খাঁচার দরজা তেমনি তালা আটকানো এবং তার ভেতরে হাতকড়া, বেড়ি ইত্যাদি দ্বারা অসহায় বন্দী অবস্থায় রয়েছেন গণপতি।

এসব আশ্চর্য খেলা দেখে সহজেই লোকের মনে ধারণা জন্মে যেত যে গণপতির দ্বারা কোনও কাজই অসম্ভব নয়। অলক্ষ্যে থেকে কোনও অলৌকিক শক্তি তাঁকে সাহায্য করে।"

বোসের সার্কাস দলের সঙ্গে গণপতি ভারতের বিভিন্নস্থানে ঘুরে ঘুরে তুমুল

বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সঙ্গে লাভ করেছেন অসামান্য সম্মান এবং খ্যাতি।

গণপতির যাদু খেলার ছিল দুটি দিক। একটি লৌকিক আমোদপ্রমোদের অন্যটি অলৌকিক রহস্যের। তাঁর কতগুলো খেলা দেখে বিস্মিত দর্শকরা তাঁর হস্তকৌশলের প্রশংসা করত। কিন্তু বড় খেলাগুলো দেখে দর্শকরা গণপতির অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হত।

বোসের সার্কাসে বড় খেলাগুলো দেখবার আগে হাস্যকর পোশাক পরে গণপতি রুমাল নাচানোর খেলা দেখাতেন। এ খেলার নাম তিনি দিয়েছিলেন পিকলুমণির নাচ। মজাদার মুখভঙ্গির সঙ্গে এমন অঙ্গভঙ্গি করে দেখাতেন যে দর্শক মহল হেসে গড়িয়ে পড়ত। আধা-ক্লাউন এই লোকটিই যে মারাত্মক সব খেলা দেখিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে দিতে পারেন, তাঁর লোকহাসানো চেহারা দেখে কল্পনাও করা যেত না।

বোসের সার্কাসে মাত্র বছর কয়েকের মধ্যেই গণপতি সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন। বোসেস সার্কাস বললেই লোকে বোঝে গণপতির যাদুখেলা। এমনি যখন অবস্থা গণপতি একদিন ঠিক করলেন এবার নিজেই একটা দল করবেন। সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বে সে দল তিনি পরিচালনা করবেন।

সিদ্ধান্ত স্থির হতেই স্বতন্ত্র দল গড়ার কথা জানিয়েও দিলেন প্রযোজক বোসকে।

গণপতির মাথায় নিজস্ব দল গড়ার চিন্তা ঢুকেছিল আরও কিছুদিন আগে একটা ঘটনা উপলক্ষে।

গণপতি ছিলেন মা কালীর ভক্ত। একবার নবদ্বীপের পোড়ামাতা মন্দির থেকে ডাক পেয়ে গণপতি সেখানে গিয়ে এককভাবে যাদুখেলা দেখিয়েছিলেন।

বোসের সার্কাসে নিয়ম ছিল, দলের মাইনে করা কোন শিল্পী আলাদাভাবে দলের বাইরে খেলা দেখিয়ে উপার্জন করতে পারবেন না। গণপতি এই কড়াকড়ি নিয়মের কথা বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু তথাপি সার্কাসের মালিকের অনুমতি না নিয়েই তিনি দেবীর মন্দিরের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে খেলা দেখিয়েছিলেন।

সেদিন তাঁর সেখানকার যাদুর খেলা দেখে সকলেই স্তম্ভিত রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে দেবীর আশীর্বাদেই গণপতি অলৌকিক শক্তি লাভ করেছেন।

যাদুর খেলা শেষ হলে মন্দিরের পুরোহিত গণপতিকে এক ভবিষ্যদ্বাণী শোনান। তিনি বলেন, পোড়ামাতার আশীর্বাদে গণপতি নিজেই আলাদাভাবে যাদু প্রদর্শনের দল করবেন এবং খেলা দেখিয়ে অসাধারণ খ্যাতি সম্মান ও অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।

গণপতি তখনও স্বনামধন্য গণপতি হননি। দেশজোড়া খ্যাতি জনপ্রিয়তা কিছুই পাননি। সেই অবস্থায় মন্দিরে পুরোহিতের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেরণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল।

পুরোহিতের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তী কালে স্বাধীনভাবে দল গড়ে যাদুখেলা দেখিয়ে অসামান্য খ্যাতি, জনপ্রিয়তা সম্মান অর্থ সবই পেয়েছেন গণপতি।

তিনি বিশ্বাস করতেন পোড়ামাতার আশীর্বাদেই তিনি সব কিছু পেয়েছেন। আর সেই বিশ্বাসে তিনি কাগজপত্রে, সবরকম চিঠি লেখার সময়ে ওপরে সর্ব প্রথমে লিখতেন শ্রীশ্রী পোড়ামাতা ভরসা।

স্বতন্ত্র ভাবে নিজস্ব দল করার প্রসঙ্গে যাদুকর গণপতির সংকল্পের দৃঢ়তা এবং অসম্ভব মনোবলের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেই ঘটনা এখানে উল্লেখ করা দরকার।

গণপতির মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। বলা উচিত নেশা তাঁকে গ্রাস করেছিল। এদিকে প্রফেসর বোসের কড়া নির্দেশ ছিল, সার্কাসের কোন শিল্পী নেশা করতে পারবে না। তাঁর এই নির্দেশ কেউ কখনও লঙ্ঘন করেনি।

কিন্তু গণপতির ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল। প্রফেসর বোস গণপতিকে ঘাঁটাতে সাহস পেতেন না। বড্ড একরোখা জেদী মানুষ ছিলেন তিনি। যেমন চড়া মেজাজ তেমনি রুক্ষ বচন। এজন্য আড়ালে সার্কাসে তাঁর নাম হয়েছিল 'দুর্বাসা মুনি'।

গণপতির বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায় সার্কাসের কোনও কোনও শিল্পী ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু প্রফেসর বোসের মতোই তারা কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পেতেন না।

স্বতন্ত্র দল গড়ার কথা শুনে প্রফেসর বোস গণপতিকে শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন, দল চালানোর হ্যাপা অনেক। সেসব সামলাতে হলে নেশা ছাড়তে হবে। আর গণপতির পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব।

কথাটা গণপতির মনে আঘাত করল। তিনি প্রফেসর বোসকে দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, মদ আমি ছাড়ব। এবং এমনই তাঁর মনের বল যে দীর্ঘ দিনের একান্তসঙ্গী মদকে তিনি চিরতের পরিত্যাগ করলেন।

প্রফেসর বোসের সঙ্গে কথা বলার পর একদিন নিজের ঘরে সারি সারি মদের বোতল নিয়ে বসে গণপতি জন্মের মতো আশ মিটিয়ে পান করলেন। নেশা চড়ে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

তারপর নেশার ঘোর কেটে গেলে, দেখা গেল প্রবল নেশাগ্রস্ত গণপতি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। সেদিনের পর থেকে জীবনে আর একদিনের জন্যও তিনি মদ স্পর্শ করেননি।

এক কথায় মদের নেশা ছেড়ে দেওয়া যে কত কঠিন তা যারা এই রসে মজেছেন তারাই বলতে পারবেন। লোকের মদের নেশা ছাড়াবার জন্য তো আজকাল সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে নানা আন্দোলন, মিটিং সেমিনার হচ্ছে, ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে। অসামান্য মানসিক ক্ষমতার অধিকারী গণপতি এই অসম্ভব কাজটিই করছিলেন একদিনের সঙ্কল্পে।

গণপতি মদ ছাড়লেন। সেইসঙ্গে বোসের সার্কাসও ছাড়লেন। সার্কাস দলের কয়েকজন শিল্পীও বেরিয়ে এসে যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে।

এই শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হিঙ্গনবালা। সার্কাসে তিনি একটি বড় বলের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখাতেন ব্যালানসিং-এর খেলা। খুবই আকর্ষণীয় খেলা এটি।

গণপতি নিজের নামে যাদু প্রদর্শনের দল করলেন। তাঁর দলে তাঁর যাদুর খেলাই প্রধানতম আকর্ষণ।

নিজের দল নিয়ে গণপতি তারপর সারা ভারত দফায় দফায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তখন তিনি কিংবদন্তী যাদুকর গণপতি। যেখানে গেছেন তাঁর প্রদর্শনীর তাঁবু উপছে পড়েছে দর্শকের ভিড়। কেবল বড় বড় শহরেই নয়, ছোট ছোট শহর শহরতলী এমনকি গ্রামেগঞ্জেও ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়েছেন গণপতি।

কেবলমাত্র যাদুকে পেশা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে খ্যাতি, সম্মান, যশ, জনপ্রিয়তা—সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটি সফল জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন যাদুকর গণপতি।

গণপতি বিবাহিত ছিলেন না। শেষ জীবনে কলকাতার কাছে বরানগরে বাড়ি ও মন্দির করে সাধন ভজনে বাকি জীবন কাটিয়েছেন। নিয়মিত পুজো-অর্চনা করতেন, খুব ছোট করে চুল ছাঁটতেন, টিকি রাখতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর আচার ব্যবহার এমন ছিল যে লোকের মনে সহজেই বিশ্বাস হত তিনি তন্ত্রের সাধনা করে অলৌকিক শক্তি লাভ করেছেন। একজন সফল যাদুকর হিসাবে নিজের এই ভাবমূর্তি সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ ছিলেন গণপতি।

লোকের মনে তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভীতি মিশ্রিত বিশ্বাস যাতে বজায় থাকে, সে বিষয়ে তাঁর যত্নের অভাব ছিল না।

অলৌকিক আকর্ষণ মানুষের সহজাত। গণপতির অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে অনেক লোক তাঁর কাছে নানা রোগশোকের প্রতিকার চাইতে আসতেন।

অনেকে আসতেন পারিবারিক অশান্তির প্রতিকার চাইতে কিংবা হাত দেখিয়ে ভবিষ্যৎ জানার জন্য।

গণপতি কাউকেই ফেরাতেন না। বিভিন্ন শক্তির টোটকা, মাদুলি, শেকড় ইত্যাদি তিনি দিতেনও লোককে। আশ্চর্য যে, এসবে অনেকেই উপকার পেতেন। তাঁর টোটকা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন বহু মানুষ। এর পেছনের রহস্য দুর্জ্ঞেয়।

তবে গণপতির জীবনে অলৌকিক ঘটনার কথা যে কিছু নেই তাও নয়। একটি কাহিনী অজিতকৃষ্ণ বসু গণপতির জীবন আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "গণপতির জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনার কাহিনী শুনেছি। ...একবার সাহেবগঞ্জে যাদুর খেলা দেখাতে গেছেন তিনি। সেখানে একরাতে স্বপ্ন দেখলেন এক দেবীমূর্তি তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে একটি বাড়ির ঠিকানা, বর্ণনা, পথনির্দেশ এবং বাড়ির মালিকের নাম দিয়ে বললেন, 'ওরে আমি এই বাড়িতে এক আলমারির মাথায় এক কোণে অবহেলায় পড়ে আছি। তুই আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে আমার পুজো করিস'।"

এই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল গণপতির। রোমাঞ্চিত হল সারা দেহ। এ স্বপ্ন কি অলীক না সত্য?

অলৌকিক ব্যাপারের অস্তিত্বে বরাবরই বিশ্বাসী ছিলেন গণপতি, সাধারণ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। তাই এ স্বপ্নের সত্যতা যাচাই করতে গেলেন তিনি।

স্বপ্নে পাওয়া ঠিকানায় গেলেন। গিয়ে পরম বিস্ময়ে দেখলেন বাড়ির চেহারা, গৃহস্বামীর নাম ইত্যাদি সব মিলে যাচ্ছে। বাড়ির মালিককে বললেন স্বপ্নের কথা।

আলমারির মাথায় দেখা গেল সত্যিই একটি দেবীমূর্তি রয়েছে। হুবহু স্বপ্নবর্ণিত চেহারার।

বাড়ির মালিক দেবী-মাতার স্বপ্নাদেশের কথা শুনে অভিভূত হলেন, মূর্তিটি দিলেন যাদুকর গণপতিকে। গণপতি দেবী-মূর্তিটিকে নিয়ে এসে তাঁর যথাবিধি নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করলেন।"

যাদুকর গণপতি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একেবারে শূন্য থেকে জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এজন্য দুঃখ কষ্টের সঙ্গে কম লড়াই করতে হয়নি তাঁকে।

স্বভাবতই লোকের দুঃখ দেখলে তাঁর মন বিচলিত হত। সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার।

নিজে রোজগার করেছেন আশাতীত অর্থ। সেই অর্থ দুহাতে তিনি বিলিয়েও গেছেন। তাঁর বহু গোপন দানের কথা মানুষ জানে না। যেসব ঘটনার কথা জানা যায় তার একটি এখানে বলছি।

একবার একজায়গায় যাদুর খেলা দেখানো সবে শেষ করেছেন গণপতি। এমন সময় এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

ব্রাহ্মণ সকাতরে জানালেন, হাওয়া থেকে টাকা ধরার বিদ্যেটা তাঁকে শিখিয়ে দিতেই হবে। অর্থাভাবে তিনি বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন। মেয়ের একটি ভাল সম্বন্ধ পেয়েছেন, টাকার অভাবে সেটি হাতছাড়া হতে চলেছে। এখন টাকা ধরার বিদ্যেটা শিখতে পারলে সমূহ কন্যাদায় থেকে তিনি উদ্ধার হতে পারেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতর আবেদন শুনে গণপতি অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি ব্রাহ্মণের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে বললেন যে হাওয়া থেকে টাকা ধরার বিদ্যে তাঁরও জানা নেই। আর সেই কারণেই দলবল নিয়ে ঘুরে ঘুরে টাকা রোজগার করতে হয় তাঁকে। তিনি যা দেখিয়েছেন তা নেহাৎই হাত- সাফাইয়ের কাজ।

শুনে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ খুবই হতাশ হলেন। কিন্তু গণপতি তাঁর আশা অপূর্ণ রাখেননি। ব্রাহ্মণের মেয়ের ভাল বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি—বিয়ের সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করে।

গণপতির জীবনকাহিনী রূপকথার গল্পের মতো। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীটিও অসাধারণ।

শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন গণপতি। সেদিন তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের মন্দিরে অন্নকূট উৎসব। মন্দির প্রাঙ্গণে বহু ভক্তের ভিড়। একদিকে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। এমনি সময় বাইরে রাস্তায় শোনা গেল—রাম নাম সৎ হ্যয় ধ্বনি। শ্মশানপথের যাত্রীরা শব নিয়ে চলেছে।

শেষ যাত্রার ওই সৎনামধ্বনি শুনে বিছানায় উঠে বসলেন বৃদ্ধ গণপতি। বললেন, "চলেছো বন্ধু? আমিও তোমার পেছনেই যাচ্ছি।"

বলতে বলতে মন্দিরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। সিংহাসনে বিরাজ করছেন রাধামাধব বিগ্রহ। দু'হাত প্রসারিত করে আরাধ্য দেবতার বিগ্রহকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাঁর প্রাণহীন দেহ ঢলে পড়ল বিগ্রহের চরণতলে। সেই দিনটা ছিল ২০ নভেম্বর ১৯৩৯ খ্রিঃ।

শীলভদ্র

বর্তমান বিহার প্রদেশের পাটনা জেলাতে অবস্থিত ছিল প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা। বৌদ্ধ যুগে ভারতের মোট ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নালন্দা ছিল অন্যতম।

অন্য পাঁচটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হল, বিক্রমশিলা, তক্ষশিলা, বল্লভি, ধনকটক ও কাঞ্চি বা কাঞ্জিভরম। কালক্রমে জ্ঞানশিক্ষা ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে নালন্দার খ্যাতি সমগ্র বৌদ্ধ জগতে ছড়িয়ে পড়ে।

বৌদ্ধধর্মের সমস্ত সূত্র এবং শাস্ত্র ছাড়াও জ্ঞানের সমস্ত শাখা এমনকি হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও বেদও এখানে পড়ানো হত। খ্রিস্টের জন্মের বহুপূর্ব থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল।

৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দী ছিল নালন্দার সবচেয়ে গৌরবের যুগ। এই সময়ে দশহাজার ছাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অংশে বাস করত এবং সেখানে অধ্যয়ন করত।

হিমালয়ের মতো দুর্লঘ্য পাহাড় অতিক্রম করে, সমুদ্র পার হয়ে দেশ দেশান্তর থেকে দলে দলে ছাত্র নালন্দায় আসতো বিদ্যাশিক্ষার করবার জন্য। এতবড় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জগতে আর হয়নি।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ হতেন, ভারতের যে কোনও রাজ্যের রাজা বা সম্রাট তাঁর কাছে সসম্ভ্রমে মাথা নত করতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্ররা ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম অনুসরণ করে ভিক্ষুর পীতবাস পরে, কম্বল মাত্র সম্বল করে তপস্বী ব্রহ্মচারীর মতো আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করতেন।

এখানকার বিদ্যার্থীরা বুদ্ধের শান্তির বাণী প্রচার করে সমগ্র ভারত ও বহির্ভারতের বহুদেশে কোটি কোটি নরনারীর জীবনে যে পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন তার মর্যাদা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

এই মহাবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিতাগ্রগণ্য শীলভদ্র ছিলেন প্রাচীন ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সকল সূত্র এবং শাস্ত্র বিষয়ে পারঙ্গম। আমাদের মহাগৌরবের বিষয় এই যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শীলভদ্র ছিলেন বাঙ্গালী সন্তান। ভারতে এবং বহির্ভারতে সর্বপ্রথম বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য এবং পণ্ডিত রূপে তিনি সমাদৃত ও পূজিত।

বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট ত্রিপুরা ও নোয়াখালি অঞ্চল নিয়ে ছিল প্রাচীন বঙ্গের সমতট রাজ্য। এই রাজ্যের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন শীলভদ্র।

চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন-সাঙ্ তাঁর লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে শীলভদ্র সম্পর্কে সবচেয়ে বিশদ এবং বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই বিবরণ অনুযায়ী শীলভদ্রের আবির্ভাবকাল আনুমানিক ৫৮৫ খ্রিঃ এবং ৬৫৪ খ্রিঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

রাজার ছেলে শীলভদ্র শৈশব থেকেই ছিলেন জ্ঞানান্বেষী। রাজ সিংহাসন,

রাজকীয় সম্মান, পার্থিব বৈভব ও ভোগ-সুখে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত।

জগৎ ও জীবনের সত্যানুসন্ধানে অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তিনি ভারত ভ্রমণে বার হলেন। সমগ্র ভারত পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করলেন।

যেখানে যেটুকু শেখার মতো পেলেন শিক্ষা করলেন। তারপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হলেন মগধ রাজ্যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে।

সেই সময়ে নালন্দা মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল। শীলভদ্র আচার্য ধর্মপালের কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তাঁর নতুন নাম হয় দণ্ডদেব।

অধ্যাপক রূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর শীলভদ্রকে ধর্মপাল ভিক্ষুব্রত প্রদান করেন। সমতট রাজ্যের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী কাষায়বস্ত্র আর কম্বলমাত্র সম্বল করে জ্ঞানদাতা ভিক্ষুর জীবন যাপন করতে লাগলেন।

মেধাবী ও জ্ঞানপিপাসু শীলভদ্র অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অধিগত করে বৌদ্ধশাস্ত্র ব্যাখ্যায় ধর্মপালের মতোই পারদর্শিতা অর্জন করলেন।

সেই সময় যে সকল পণ্ডিত চূড়ামণি নালন্দা বিহার অলংকৃত করতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানচন্দ্র, জিনমিত্র প্রমুখের ন্যায় শীলভদ্রও তাঁর জ্ঞানের জন্য খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন।

আচার্য ধর্মপালের খ্যাতির কথা শুনে ঈর্ষান্বিত হয়ে দক্ষিণ ভারতের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মগধ রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাজার নিকট শীলভদ্রের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

পণ্ডিতের অভিলাষ অবগত হয়ে রাজা ধর্মপালের নিকট দূত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, "অনেক পর্বত নদী ও দূর পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতের এক পণ্ডিত এখানে এসেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে চান। আপনি অনুগ্রহ করে কি সভাকক্ষে আসতে সক্ষম এবং তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে চান?"

রাজবার্তা পেয়ে আচার্য ধর্মপাল তর্কযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে মহাবিহার থেকে যাত্রার উদ্যোগ করলেন।

সেই সময় তাঁর প্রধান শিষ্য শীলভদ্র বললেন, 'সামান্য এ ব্যাপারে আপনি কেন যাবেন প্রভু?'

ধর্মপাল উত্তর দিলেন, 'বৌদ্ধধর্মের সূর্য অস্তমিত, এসময়ে পণ্ডিতাভিমানী পিপীলিকা ও ভ্রমর মেঘের ন্যায় এদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্মালোচনার দ্বারা তাদের পরাস্ত করতে না পারলে স্বধর্মের উন্নতি নেই।''

তাঁকে নিরস্ত করে শীলভদ্র বললেন, 'আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। আপনি থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমাকে এই ব্যক্তিকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার অনুমতি দিন।'

ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা সভায় ধর্মপালের সঙ্গে শীলভদ্রও যোগদান করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা স্মরণ করে ধর্মপাল প্রিয় শিষ্যের অনুরোধে সম্মতি দিলেন।

সেই সময় শীলভদ্র ত্রিশ বৎসরের যুবক। ধর্মপালের অন্যান্য নবীন শিষ্যরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যুবক শীলভদ্রের ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করা কঠিন হবে আশঙ্কা প্রকাশ করতে লাগলেন।

অধ্যক্ষ ধর্মপাল তাঁর শিষ্যবর্গকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'বয়সে যুবা হলেও শীলভদ্র অপ্রতিম প্রতিভার অধিকারী। আমি নিশ্চিত যে তিনি এই তার্কিক পণ্ডিতকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী।'

শিক্ষাগুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শীলভদ্র আচার্য ধর্মপালের প্রতিনিধি হয়ে দক্ষিণী পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার-যুদ্ধের জন্য মগধের রাজসভায় উপস্থিত হলেন।

ধর্মসভায় যোগ দেবার জন্য যথাসময়ে অগণিত বৃদ্ধ এবং যুবক দর্শনার্থী ও শ্রোতা সমবেত হয়েছেন।

সেই পণ্ডিত তাঁর প্রতিপক্ষকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। সামান্য এক বালকের সঙ্গে তিনি কী বিচার করবেন।

তর্কের শুরুতেই তিনি নানা জটিল প্রশ্নের অবতারণা করলেন। শীলভদ্র যথোচিত মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য শুনলেন। তারপর গভীর জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম যুক্তির মাধ্যমে সেই অবৌদ্ধ পণ্ডিতের সকল যুক্তি খণ্ডন করলেন।

তাঁর সাবলীল ব্যাখ্যায় বৌদ্ধদর্শনের গভীরতা প্রতিপন্ন হল। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে সেই পণ্ডিত বালকের প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো কোনও যুক্তিই খুঁজে পান না।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে তিনি রাজসভা ত্যাগ করে গেলেন।

শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ মগধরাজ শীলভদ্রকে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘরূপে একটি নগর দান করতে চাইলেন।

শীলবান শাস্ত্রবিদ শীলভদ্র বললেন, 'মহারাজ আমি ভিক্ষু, কাষায় গ্রহণ

করেছি। অল্পে সন্তুষ্ট থেকে কি করে পরিশুদ্ধ থাকা যায় তা আমি জেনেছি। আপনার নগর নিয়ে আমি কি করব?'

কাতর হয়ে রাজা বললেন, 'ধর্মরাজপুত্র ভগবান বুদ্ধ বহুদিন গত হয়েছেন। এখন যদি আমরা জ্ঞানের পূজা না করি তাহলে পণ্ডিত এবং মূর্খের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না। ধর্মরক্ষা এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্যই অনুগ্রহ করে আমার এই শ্রদ্ধার দান গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।'

রাজার আন্তরিক আগ্রহ দেখে শীলভদ্র তাঁকে আর পীড়াপীড়ি করলেন না। তিনি বৌদ্ধ সংঘের পক্ষ থেকে রাজার নগরটি দান স্বরূপ গ্রহণ করলেন। নগরের রাজস্ব দিয়ে সেখানে একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করলেন এবং নগরের রাজস্ব থেকে সঙ্ঘারামের বিভিন্ন ধর্মীয় কর্ম ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করে দিলেন।

৬৩৫ খ্রিঃ ধর্মপাল নালন্দার অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করলে শীলভদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রধান এবং নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষপদে বৃত হলেন।

দুই বছর পরে ৬৩৭ খ্রিঃ জগৎবিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বা য়ুয়াং চুয়াং গুরুর সন্ধানে ভারতে আসেন।

জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে হিউয়েন সাঙ্-এর নাম এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পথহীন হিমালয়ের বুকে পথের রেখা এঁকে দিয়ে একদিন এই জ্ঞানভিক্ষু দুটি প্রাচীন সুসভ্য জাতিকে অন্তরঙ্গভাবে পরস্পরকে জানার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। চীন আর ভারত এই দুই জাতির মিলনের পুরোহিত ছিলেন হিউয়েন সাঙ্।

আজ ভাবলেও বিস্ময় লাগে, সেই প্রাচীন যুগে কী অসহনীয় কষ্ট স্বীকার করে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে ঘুরে তিনি জ্ঞানার্জন করেছিলেন।

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করার জন্য তিনি অক্লেশে হাজার মাইল পথ ঘুরে বেড়িয়েছেন।

এই অসাধারণ ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাহায্যে হিউয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষে সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করে অসংখ্য বৌদ্ধ পুঁথি সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিবর্তিকালে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন মহাযান-দেব এবং মোক্ষাচার্য নামে। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি প্রাচ্যদেশ।

এই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ যখন ভারতে আসেন শীলভদ্র তখন নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ। হিউয়েন সাঙ মহাস্থবির শীলভদ্রকেই তাঁর গুরুরূপে বরণ করেন।

তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে তিনি লিখেছেন যে, বহুদেশে নানা গুরুর কাছে বহু

গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁর অন্তরের সংশয় দূর হয়নি। শীলভদ্রের সঙ্গে কথা বলে তাঁর সংশয় দূর হয়েছে।

হিউয়েন সাঙের অধ্যয়নের জন্য শীলভদ্র প্রথমে জয়সেন নামে নালন্দার একজন প্রখ্যাত পণ্ডিতকে নিয়োজিত করেন। পরে অবশ্য নিজেই এই চীনা শিষ্যকে অতি যত্নের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের গূঢ় দর্শন ও আচার সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর এই শিক্ষাদান চলে।

অধ্যয়ন শেষ হলে শীলভদ্রের অনুরোধে হিউয়েন সাঙ এক পণ্ডিত সভায় মহাযানসম্পরিগ্রশাস্ত্র এবং বিদ্যামাত্রসিদ্ধিশাস্ত্র নামক জটিল গ্রন্থ সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করেন।

হিউয়েন সাঙ নালন্দায় অবস্থানকালেই কিংবদন্তীখণ্ডন নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং অধ্যক্ষ শীলভদ্রকে তা উৎসর্গ করেন।

চীনা পরিব্রাজক একবার সিংহলে যাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। তখন সেই দেশে রাজার মৃত্যু হওয়ায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছে, স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এইসব কারণে সিংহলের তিনশো জন ভিক্ষু বৌদ্ধতীর্থগুলি পরিদর্শনে ভারতে আসেন।

হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ ভারতের বর্তমান কাঞ্জিবেরাম নগরে তাদের সাক্ষাৎ পান। তিনি সিংহলী ভিক্ষুদের কাছে যোগশাস্ত্রের কতগুলি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা চেয়ে আলোচনায় বসেন।

কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারেন, আচার্য শীলভদ্রের কাছে তিনি যা শিখেছেন তার চেয়ে উন্নততর ব্যাখ্যা সিংহলী ভিক্ষুদের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়।

ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরে হিউয়েন সাঙ শত শত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এই বিপুল সংগ্রহ সঙ্গে করেই তিনি চীনে ফিরে যান এবং শিষ্যদের সাহায্যে সেসব গ্রন্থ অনুবাদ করান।

আচার্য শীলভদ্রকে হিউয়েন সাঙ দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। স্বধর্মের প্রতি অনুরাগ তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর আচার্য শীলভদ্রের কাছ থেকে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ৬৫৪ খ্রিঃ হিউয়েন সাঙ ভারতে মহাবোধি বিহারে বৌদ্ধ পণ্ডিত স্থবির প্রজ্ঞাদেবকে এক পত্রে মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখেন, "ভারত থেকে আসা এক রাষ্ট্রদূতের কাছে জানতে পারলাম যে মহান অধ্যাপক শীলভদ্র আর জীবিত নেই। এই সংবাদে অপরিসীম দুঃখে আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি।"

সেই সময়ে নালন্দা মহাবিহারে একমাত্র বাঙালী শীলভদ্রই বৌদ্ধধর্মের সমস্ত শাস্ত্র ও বৌদ্ধ যোগের সকল তত্ত্ব অধিগত করেছিলেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের বিশেষত্ব এই যে, ব্রাহ্মণদের সকল শাস্ত্রও তাঁর অবগত ছিল। পাণিনির ব্যাকরণ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর কাছে হিউয়েন সাঙ সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন।

তাঁর সময়ে তিনি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন। নালন্দা মহাবিহারের অধিবাসীরা তাঁর পাণ্ডিত্যে এতটাই শ্রদ্ধাপ্লুত ছিলেন যে তাঁরা কখনও তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন না। তাঁকে ধর্মনিধি বলে সম্বোধন করতেন।

অধিগত বিদ্যার সঙ্গে শীলবান জীবন এবং মধুর স্বভাব তাঁকে সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল।

শীলভদ্রের মাধ্যমেই তর্কশাস্ত্র ও দার্শনিক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে বাঙালী মনীষার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক রূপেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তিব্বতী পণ্ডিতদের কাছেও শীলভদ্র সমাদৃত ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিব্বতের এক মন্ত্রী থোনমি সম্ভোট ছিলেন শীলভদ্রের শিষ্য। তিনি ছিলেন হিউয়েন সাঙের সতীর্থ।

থোনমি সম্ভোট তিব্বতের রাজাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁর চেষ্টাতেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সরকারী ধর্মের মর্যাদা পায়।

জানা যায় শীলভদ্র প্রায় দুশোখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সহজ সরল ভাষায় বহু দুরূহ শাস্ত্রের টীকা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ শীলভদ্রের রচিত গ্রন্থসমূহের মাত্র একখানি গ্রন্থের নাম তিব্বতী পাণ্ডুলিপির গ্রন্থসূচীতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের নাম আর্য-বুদ্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যান।

বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্রের জ্ঞানের আলোক একদিন কেবল ভারত নয়, হিমালয়ের ওপারে চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিল। বাঙালীর দুর্ভাগ্য, শীলভদ্রের নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে।

রানী ভবানী

আঠারো শতকের বাংলা। রাষ্ট্রিক বিপর্যয় ও সামাজিক অবক্ষয় জাতির জীবনে সার্বিক পতন নিশ্চিন্ত করে তুলেছে। সেই সঙ্কটময় যুগে স্বধর্ম রক্ষা ও দীনদুঃখীর দুর্দশা মোচনের ঐকান্তিক চেষ্টার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন নাটোরের রানী ভবানী।

বাঙালীর ইতিহাসে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলার অন্নপূর্ণা নামে। তেজে বুদ্ধিতে দয়া ও সহানুভূতিতে তিনি ছিলেন অনন্যা। ধর্মপ্রাণ রানীর সুমহান কীর্তি ছড়িয়ে আছে বাংলায় ও দেবস্থান কাশীতে।

বর্ধমানের ছাতিনা গ্রামে ১৭২৪ খ্রিঃ রানী ভবানীর জন্ম। তাঁর বাবার নাম আত্মারাম চৌধুরী, মাতা জয়দুর্গা।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান ভবানীর আট বছর বয়সেই বিয়ে হয় নাটোরের ভাবী রাজা রামকান্তর সঙ্গে। কালক্রমে ভবানী রাজপরিবারের কর্ত্রী হিসেবে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে স্বনামধন্য হন এবং নাটোরের রাজবংশের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

রানী ভবানীর জীবনী আলোচনা করতে হলে নাটোর রাজবংশের ইতিহাসকে বাদ দেওয়া চলে না। সংক্ষেপে তা বলা দরকার।

তখন ভারতে মুঘল শাসনের শেষ পর্ব। দিল্লীর মসনদে আসীন বাদশা আলমগীর। সেই সময় পুঁটিয়ার কাছে বৎসরাচার্য নামে এক ঋষি বাস করতেন। ঘটনাচক্রে একদা কিছু বিদ্রোহী জায়গীরদারকে দমন করার জন্য এক মোঘল বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়।

মোঘল সেনাপতি সাধক বৎসরাচার্যের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোঘল বাহিনীর জয় হয়। কৃতজ্ঞ সেনাপতির আগ্রহে সেই সময় বৎসরাচার্য লস্করখানের লস্করপুর পরগনার জায়গীর লাভ করেন।

বৎসরাচার্য ছিলেন সংসারত্যাগী। ফলে জমিদারী তাঁর পুত্ররাই দেখাশোনা করতেন। এইভাবে পুঁটিয়ার রাজবংশের পত্তন হয়।

পুঁটিয়ার এক রাজার নাম নরনারায়াণ। তাঁর সময়ে বারোহাটির তহশীলদার ছিলেন বামদেব মৈত্র। মৈত্র মহাশয়ের তিন ছেলে—রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম।

কালক্রমে এদের মধ্যে দুজন রামজীবন ও রঘুনন্দন পুঁটিয়ার রাজ- সরকারে উঁচু পদে চাকরি পান। তাঁদের দুজনেরই সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় দক্ষতা ছিল। বিশেষ করে রঘুনন্দন বৈষয়িক বুদ্ধি ও হিসাব নিকাশের ব্যাপারে ছিলেন প্রতিভাশালী ব্যক্তি।

ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁকে ঢাকায় নবাবের দরবারে রাজার প্রতিনিধি ও উকিল নিযুক্ত করে পাঠানো হয়।

স্বীয় প্রতিভাব বলে রঘুনন্দন নবাবের দরবারেও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হন। ক্রমে তিনি দরবারে নায়েব কানুনগো পদে নিযুক্ত হন। প্রধান কানুনগোর সহকারী হিসাবে রঘুনন্দনের কাজ ছিল রাজস্বের আয় ব্যয়ের হিসাব তৈরি করে মোঘল সম্রাটের কাছে পাঠানো।

নিয়ম ছিল হিসাব পেশ করার আগে নির্ভুল হিসাবের প্রমাণ স্বরূপ নথির ওপরে একজন কানুনগোর সই ও মোহরের ছাপ লাগাতে হত। রঘুনন্দন যোগ্যতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করতেন এবং এর দ্বারাই তিনি সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

ক্রমাগত মারাঠা যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব খুবই নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। রাজকোষেও টান ধরেছিল। এই সময়ে বাংলা বিহার ওড়িশার সুবেদার ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। সংকট সময়ে বেশি রাজস্ব পাঠিয়ে সম্রাটকে খুশি করার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতায় একজন কানুনগোর সই ও মোহর ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না। ফলে সংগৃহীত অর্থ সম্রাটের দরবারে পাঠানো যাচ্ছিল না।

মুর্শিদকুলি খাঁর এই মুশকিলের আসান করেছিলেন রঘুনন্দন। তাঁর সই ও মোহরের জোরে মুর্শিদকুলি খাঁর মুখরক্ষা হল।

নবাব উপকারের প্রতিদান দিতেও কার্পণ্য করলেন না। রঘুনন্দনকে তিনি তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করলেন।

সেই সময়ে নিয়মিত নবাবের দরবারে রাজস্ব জমা দিতে না পারায় কিংবা বিদ্রোহী হবার জন্য অনেক জমিদারের জমিদারী কেড়ে নেওয়া হত। এই সব স্বত্বহীন জমিদারী নতুন জমিদারকে বিলি করা হত।

এই ধরনের স্বত্বহীন জমিদারী মুর্শিদকুলি খাঁ রঘুনন্দনকে দেবার আগ্রহ প্রকাশ করলে রঘুনন্দন তাঁর বড় ভাই রামজীবনের নাম সুপারিশ করেন। সেই মতো নবাব সব জমিদারী রামজীবনকে দিলেন।

এইভাবে রামজীবন ক্রমে ভাতুরিয়া পরগনা, বঙ্গাচ্ছি, চাকলা এবং রাজশাহী যশোরের বিখ্যাত ভুঁইয়া সীতারাম রায়ের সম্পত্তি সহ এক বিশাল জমিদারীর মালিক হলেন। রামজীবনই ১৭০৬ খ্রিঃ নাটোরে এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। মোঘল সম্রাটের কাছ থেকেও পেলেন রাজা খেতাব। এইভাবে নাটোর রাজবংশের সূত্রপাত হল।

রামজীবন তাঁর বিচক্ষণ দেওয়ান দয়ারাম রায়ের পরামর্শ ও সহায়তায় বিশাল জমিদারী পরিচালনা করতেন।

পরপর দুই পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর শোকাহত রঘুনন্দন মারা যান ১৭১৪ খ্রিঃ। বৃদ্ধ অবস্থায় রামজীবনও জমিদারী পরিচালনা থেকে অবসর নেন। জমিদারীর দায়িত্ব নেন তাঁর পুত্র কালিকাপ্রসাদ এবং বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ।

১৭২৪ খ্রিঃ কালিকাপ্রসাদের অকালমৃত্যু হয়। রামজীবন তখন রাজসাহী জেলার রসিক খাঁ ভাদুড়ীর ছোট ছেলে রামকান্তকে দত্তক নেন। কিন্তু এই দত্তক নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দেবীপ্রসাদ

জমিদারীর মাত্র ছ আনা অংশের মালিকানা নিতে চাইলেন না। সম্পত্তির লোভে তিনি নানা চক্রান্ত করতে থাকেন।

যাইহোক রামজীবনের দত্তকপুত্র রামকান্তই শেষ পর্যন্ত পরবর্তী রাজা সাব্যস্ত হন। আট বছরের ভবানীর এই রামকান্তর সঙ্গেই মহা ধূমধামের সঙ্গে বিবাহ হয়।

সেই কালে সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার চল ছিল না। রানী ভবানী বাড়িতেই সামান্য লিখতে পড়তে শিখেছিলেন।

নাটোরের রাজবাড়িতে বধূ হয়ে আসার পর তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হল। এক বিদুষী ব্রাহ্মণীর কাছে তিনি সংস্কৃত, ব্যাকরণ, পুরাণ ও রাজনীতির শিক্ষা নিতে লাগলেন।

মহারাজা রামজীবনের বয়স হয়েছিল। রানী ভবানীর বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে যুবক রামকান্ত রাজা হলেন এবং দেওয়ান দয়ারামের পরামর্শ মতো সুনামের সঙ্গে নাটোর শাসন করতে লাগলেন।

বালিকা বয়স হলেও বধূরানী ভবানী রাজ্যশাসন কাজে যথাসাধ্য বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে স্বামীকে সাহায্য করতেন।

অনেক জটিল বিষয়ে তাঁর সঠিক পরামর্শ শুনে অনেক সময় দেওয়ান দয়ারামও উপকৃত হতেন।

সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হন আলিবর্দী খাঁ। এই সময়ে নাটোর রাজপরিবারের বৈষয়িক বিবাদ চরম আকার ধারণ করে।

বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ গোড়া থেকেই রামজীবনের দত্তক নেওয়া নিয়ে মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। এখন তিনি নবারের দরবারে আবেদন জানালেন যে মহারাজা রামজীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র হিসাবে তিনিই নাটোরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কেন না যথাযথ নিয়ম মেনে রামকান্তকে দত্তক নেওয়া হয়নি।

নবাব দেবীপ্রসাদের পক্ষেই রায় দিলেন। জমিদারী হারালেন রাজা রামকান্ত। নাটোরের রাজপ্রাসাদে দখল নিলেন দেবীপ্রসাদ।

নিরুপায় হয়ে রাজা রামকান্ত রানী ভবানীকে নিয়ে নাটোর ছেড়ে মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। ক্ষমতাচ্যুত দেওয়ান দয়ারামও এঁদের সঙ্গে এখানে মিলিত হলেন।

বিষয়টা খতিয়ে না দেখেই নবাব ভুল করে দেবীপ্রসাদের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। সকলে মিলে আলোচনা করে স্থির করলেন, রাজা ও রানী ভবানী নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। দেওয়ান দয়ারাম ও জগৎ শেঠ তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু নবাবের নজরানার কি হবে? তার জন্য অনেক টাকার দরকার।

নিরুপায় রানী ভবানী নিজের গয়না বন্ধক রেখে জগৎ শেঠের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন।

দেবীপ্রসাদের চক্রান্তের বিষয় জানতে পেরে নবাব তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। নতুন আদেশ জারী করে তিনি রামকান্তকেই নাটোরের রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

রানী ভবানীকে সঙ্গে করে রাজা রামকান্ত আবার নাটোরের প্রাসাদে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে দেবীপ্রসাদের স্বল্পকালের শাসনে ও উৎপীড়নে প্রজাদের নাভিঃশ্বাস উঠেছিল। রাজা রামকান্তের প্রতি আনুগত্যের অপরাধে অনেক প্রজারই ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেককে জোতজমি কেড়ে নিয়ে ভিটেছাড়া করা হয়েছিল।

রানীর পরামর্শ মতো রাজা রামকান্ত ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন। উৎখাত প্রজারা আবার তাদের পুরনো ভিটায় ফিরে এল।

এই বিপর্যয়ের পর রাজা রামকান্ত আর বেশিদিন বাঁচেননি। নানান ঝড়-ঝাপ্টা ও অশান্তি সামলে অবশেষ ১৭৪৮ খ্রিঃ তিনি মারা গেলেন। একমাত্র কন্যা তারাদেবীকে নিয়ে রানী ভবানী বিধবা হলেন।

রানী ভবানীর একটি ছেলেও ছিল। অল্প বয়সেই তার মৃত্যু হওয়ায় বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারী কেউ ছিল না।

রানী ভবানীর সাধ ছিল কন্যা তারাদেবীকে বিবাহ দিয়ে জামাতাকেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সে সাধ পূর্ণ হয়নি।

তারাদেবীর বিয়ে হয়েছিল খাজুরা গ্রামের রঘুনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে। বিয়ের একবছর পরেই জামাতা রঘুনাথ মারা যান। বাধ্য হয়ে রানী এই সময় রাজশাহী জেলার আটগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে রামকৃষ্ণ রায়কে পোষ্যপুত্র নিলেন।

স্বামীর অবর্তমানে দয়ারামের সহায়তায় রানী ভবানী যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর জমিদারী পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁর শাসনে ও সুব্যবস্থায় প্রজাদের সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

নাটোর ছিল বাংলার সব চেয়ে বড় জমিদারী। বার্ষিক আয় হত দেড় কোটি টাকা। নবাব সরকারে রাজস্ব হিসাবে জমা দিতে হত সত্তর লক্ষ সিক্কা মুদ্রা। অবশিষ্ট অর্থ রানী ধর্মীয় কাজে ও প্রজাদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতেন।

রানী ভবানীর সুশাসন ও পরিচালনার গুণে নাটোরে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সেই সময় বর্গীর অতর্কিত আক্রমণে বাংলা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। স্বয়ং নবাব আলীবর্দী বর্গীর হাঙ্গামা দমন করতে না পেরে চৌথ দিতে বাধ্য হন।

রানী ভবানী নাটোরের সুরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। তাঁর সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আলিবর্দীর আস্থাও এতটাই ছিল যে বর্গীর হাঙ্গামাকালে তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনকে নাটোরের কাছে রামবোলিয়ায় রেখে দিতেন।

রাজরানী হয়েও রানী ভবানী নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করতেন। প্রতিদিন নিজের হবিষ্যান্ন নিজেই রান্না করতেন। ভূমিশয্যায় শয়ন করতেন।

তাঁর প্রতিদিনের কর্মসূচী আরম্ভ হত প্রাতঃস্নান ও গীতাপাঠের মধ্য দিয়ে। দেবদ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস তাঁর জীবনকে মহনীয় করেছে।

বড় নগরে একশটি শিব মন্দির নির্মাণ করেন তিনি। প্রত্যেকটি মন্দিরের গায়েই উৎকীর্ণ ছিল সুষমামণ্ডিত টেরাকোটা শিল্প। এই মন্দিরগুলির কয়েকটি এখনও বর্তমান রয়েছে।

তিনি হাওড়া শহর থেকে কাশীধাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। সেই প্রাচীন রাস্তাটি বর্তমানে বম্বে রোডের অংশ বিশেষ। লোকের মুখে রানী ভবানী রোড বা বেনারস রোড নাম এখনও শোনা যায়।

শিবস্থান কাশীধামে রানী ভবানীর বহু কীর্তি বর্তমান। ১৭৫৩ খ্রিঃ তিনি কাশীধামে ভবানীশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীর বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র তলাও নামে জলাশয়, গোপাল মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির, তারা মন্দির, দণ্ডিভোজসত্র, মথুরাসত্র, দুর্গাবাড়ি, দুর্গাকুণ্ড রানী ভবানীর কীর্তি বহন করছে। এছাড়াও তিনি নাটোর ও ভবানীপুরে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

দেবসেবা ও দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা রানী ভবানীর জীবনের একটি দিক মাত্র। তাঁর জীবন নিয়োজিত ছিল দরিদ্র প্রজাদের সেবায়। এই ক্ষেত্রে তিনি লোকমাতা রূপে বিরাজিতা ছিলেন।

লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে তিনি বড় বড় দীঘি খনন করান। যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করার জন্য বহু সেতু নির্মাণ করেন। শিক্ষাপ্রসারের কাজেও তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়মিত বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন।

প্রজাদের রোগ-পীড়া নিবারণের জন্য তিনি উপযুক্ত চিকিৎসকেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রজাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে চিকিৎসকরা রোগগ্রস্তদের ওষুধ দিতেন।

অসংখ্য দরিদ্র প্রজাকে রানী নিষ্কর জমি বিলি করেছেন। কখনও বর্ণ বা জাতি বিচার করেননি। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতিই রানী সমদৃষ্টি পোষণ করতেন।

আলিবর্দী ছিলেন সুশাসক ও সুবিবেচক। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হন তাঁর দৌহিত্র সিরাজদৌল্লা। কিন্তু তাঁর রাজসিংহাসন নিষ্কন্টক হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যেই উশৃঙ্খল স্বভাবের জন্য সিরাজ প্রজাদের বিরাগভাজন হয়ে উঠতে থাকেন।

একবার রানী ভবানী কন্যা তারাদেবীকে নিয়ে বড়নগরের প্রাসাদে অবস্থান করছেন। সেই সময় ভাগীরথী নদীতে নৌকা বিহারকালে যুবক নবাব প্রাসাদশীর্ষে অপরূপ রূপবতী তারাদেবীকে দেখতে পান। রানী ভবানীর কন্যা জেনেও সিরাজ তারাদেবীকে অপহরণের পরিকল্পনা করেন।

নবারের এই হীন চক্রান্তের কথা জানতে পেরে রানী শঙ্কিত হলেন। নাটোরে এই ঘটনা ঘটলে তাঁর শঙ্কার কারণ থাকত না। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিত। কিন্তু বড়নগরে রানীর প্রাসাদ অরক্ষিত। বুদ্ধিমতী রানী মনোবল হারালেন না।

সেই সময় সান্তারাম বাবাজী নামে একজন প্রভাবশালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বড়-নগরের অপর পারে বাস করতেন। নিরুপায় হয়ে রানী তাঁর শরাণাপন্ন হলেন।

একরাত্রে নবাবসৈন্য গোপনে বড়নগরের প্রাসাদে হামলা করলে সান্তারাম বাবাজীর শিষ্যরা আখড়া থেকে বেরিয়ে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রবল প্রতিরোধের মুখে এঁটে উঠতে না পেরে নবাবসৈন্য পালিয়ে যায়। পরে বাবাজী নিজে রানী ও তারাদেবীকে নিরাপদে নাটোর পৌছে দেন।

ইতিমধ্যে অপক্কবুদ্ধি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একত্রিত হতে আরম্ভ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে রানী ভবানীর সমর্থনও তারা পেলেন।

জগৎ শেঠের বাড়িতে গোপন সভায় মিলিত হতেন সেনাপতি দুর্লভরাম, মীরজাফর, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নন্দকুমার প্রভৃতি। চিকের আড়ালে থেকে রানী ভবানী তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিতেন।

সিরাজের অপসারণের জন্য বেনিয়া ইংরাজের সাহায্য নেবার প্রশ্ন উঠলে রানী সকলকে নিষেধ করেন। ঘরের বিবাদে বাইরের শত্রুকে ডেকে আনার পরিণাম বিচক্ষণা রানীর দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন, সকলে একত্রিত হলে ইংরাজের সাহায্য ছাড়াই সিরাজকে সিংহাসন চ্যুত করতে পারবেন।

সেদিন রানীর এই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ যদি অন্য সকলে গ্রহণ করতেন তাহলে আজ বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হত।

১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধের পর দেশের শাসন ক্ষমতা ইংরাজের কুক্ষিগত

হল। বেনিয়া হল রাজা। শাসনের নামে দেশজুড়ে ইংরাজের অরাজকতা দিন দিন বেড়ে চলল।

শস্যশ্যামলা বাংলার বুকে করাল মূর্তিতে দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসের পাতায় ৭৬-এর মন্বন্তর নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ হারায়।

বুভুক্ষু নরনারীর কাতর আর্তনাদে বাংলার আকাশ বাতাস যখন বিদীর্ণ হচ্ছে, সেই সময় দেশের মানুষ লোকমাতা রানী ভবানীর অন্নপূর্ণা রূপ দেখতে পেল।

তিনি অকাতরে রাজকোষের অর্থ ব্যয় করে দিকে দিকে শত শত অন্নসত্র খুলে অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর নির্দেশে পীড়িতদের চিকিৎসার জন্য রাজবৈদ্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। প্রজাদের সমস্ত খাজনা মকুব করা হল। রানী ভবানীর দয়ায় সেদিন অসংখ্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের প্রাণরক্ষা হয়।

১৭৭২ খ্রিঃ কুখ্যাত ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। তিনি সার্কিট কমিটি গঠন করে জমিদারদের নতুনভাবে রাজস্ব স্থির করে দিলেন। প্রত্যেক জমিদারীতেই বর্ধিত করের বোঝা চাপল। বলপূর্বক অনেক জমিদারীর নতুনভাবে বিলিব্যবস্থা হতে লাগল।

বানী ভবানীর রংপুরের বাহেরবন্দ জমিদারীও বাজেয়াপ্ত করে। নতুন ব্যবস্থায় কান্তবাবুকে দেওয়া হল। এই অপমান রানী সইতে পারলেন না। তিনি পালিত পুত্র রামকৃষ্ণের হাতে জমিদারীর ভার ছেড়ে দিয়ে কাশী চলে গেলেন।

রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন মহাশক্তির উপাসক। নিজের ধ্যানজপ নিয়েই তিনি মগ্ন থাকতেন। বৈষয়িক কোন চিন্তাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। ফলে জমিদারীতে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। দিন দিনই একের পর এক মহাল হাতছাড়া হয়ে জমিদারীর আয়তন কমে আসতে লাগল।

জমিদারীর চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ১৭৯৫ খ্রিঃ রাজা রামকৃষ্ণ মারা যান। তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ তখনও নাবালক। বাধ্য হয়ে কাশীবাসী রানী ভবানী নাটোরে ফিরে এলেন। পৌত্র বিশ্বনাথের অভিভাবক হয়ে বিপর্যস্ত অবস্থা সামলানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু নাটোরের ভাগ্য বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব হল না। নানা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর দিনও ফুরিয়ে এল। ১৮০৩খ্রিঃ ৭৯ বছর বয়সে তিনি মরলোক ত্যাগ করলেন।

যামিনী রায়

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ মহান চিত্রশিল্পী যামিনী রায় ছিলেন শিল্পীর শিল্পী। ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁর স্বকীয়তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর তুলিতে রূপ পেয়েছে বাংলার নিজস্ব রূপ ও শিল্পশৈলী।

কেবল ভারতবর্ষেই নয় সারা বিশ্বজুড়ে তাঁর শিল্পের খ্যাতি ও সমাদর। তাঁর অসংখ্য চিত্র সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তের সুধী শিল্পরসিকবৃন্দ। এই নীরব শিল্পীর ব্যক্তি জীবন ও শিল্প সাধনার ইতিহাস বড় বিচিত্র।

১৮৮৭ খ্রিঃ ১১ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে এক জমিদার বংশে যামিনী রায়ের জন্ম।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁদের পারিবাবিকসম্পর্ক' ছিল। তাঁর বাবার নাম রামতারণ রায়, মা নগেন্দ্রবালা।

জমিদার রামতারণের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। সামান্য চাষবাস যেটুকু ছিল তাতেই পরিবারের ভরণপোষণ চলত।

ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল রামতারণের। পালা-পার্বণ উপলক্ষে আলপনা, ছবি নিজেই আঁকতেন রঙের গুঁড়ো দিয়ে। পুত্র যামিনী উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার এই শিল্প প্রতিভা পেয়েছিলেন।

যামিনীর লেখাপড়া শুরু হয়েছিল স্থানীয় পাঠশালায়। পড়াশুনার অবসরে খেলাধুলো ভুলে তিনি চলে যেতেন বাড়ির কাছের পটুয়া পাড়াতে। সেখানে নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করতেন পটুয়াদের পট আঁকার কৌশল। কখনো তাঁকে দেখা যেত গ্রামের মৃৎশিল্পীদের বাড়িতে। মাটির পুতুল মাটির ঘোড়া ইত্যাদি নিজেও তাঁদের সঙ্গে বসে তৈরি করার চেষ্টা করতেন।

এভাবেই হয় ভবিষ্যতের সার্থক শিল্পী যামিনী রায়ের শিল্পী জীবনের সূত্রপাত।

এক সময় দেখা গেল পড়াশুনার চাইতে পটের ছবি আঁকা, মাটির পুতুল গড়ার দিকেই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন যামিনী। স্বপ্ন দেখছেন নিজেও ছবি এঁকে বড় শিল্পী হবেন।

শিল্পের প্রতি আকর্ষণ রামতারণের সহজাত। পুত্রের মধ্যে তিনি আগামী দিনের শিল্পীর সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন হয়তো। তাই যামিনীর ছবি আঁকার প্রেরণা কখনও ব্যাহত হতে দেখনি। বরং যথাসাধ্য তাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেছেন।

সেইকালে ছবি আঁকা পেশা হিসাবে খুব আশাপ্রদ ছিল না। ছবি এঁকে সংসার চালানো ছিল কঠিন ব্যাপার। তা সত্ত্বেও নিজের শিল্পপ্রীতি ও ছেলের প্রবণতা লক্ষ্য করে একসময় তিনি যামিনীকে ছবি আঁকা শেখানোর জন্য

কলকাতায় মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। যামিনীর বয়স তখন ষোল। ১৯০৩ খ্রিঃ তিনি কলকাতা আর্টস্কুলে ভর্তি হলেন। বর্তমানে ওই স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর্ট স্কুলে গিলার্ডি সাহেবের কাছে যামিনী পাশ্চাত্য রীতির অঙ্কন পদ্ধতি ও তেল রং-এ আঁকা শিখতে লাগলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই এই কাজে খুব দক্ষ হয়ে উঠলেন।

যামিনীর শিল্প প্রতিভার পরিচয় পেয়ে স্কুলের অধ্যক্ষ বিচক্ষণ পার্সি ব্রাউন খুবই খুশি হলেন তিনি। যামিনীকে যে কোনও শ্রেণীতে গিয়ে ক্লাশ করার অনুমতি দিলেন।

ক্লাশে বরাবর কৃতিত্ব দেখানো সত্ত্বেও স্কুলের শিক্ষাক্রম শেষ করতে যামিনীর নির্দিষ্ট সময়েরও বেশি লেগে গেল। কারণ আর কিছুই নয়, অতিরিক্ত ক্লাশ কামাই।

বেশির ভাগ সময়েই যামিনী ক্লাশে অনুপস্থিত থাকতেন। এজন্য স্কুলের খাতায় অনেক সময় তাঁর নামই থাকতো না।

ছাত্রজীবনেই ১৯০৬ খ্রিঃ যামিনী রায় তাঁর জীবনের প্রথম পুরস্কার পেলেন 'সমাজ' নামে একটি ছবি এঁকে। বাঁকুড়ার জেলাশাসক তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ একটি গিনি দিয়েছিলেন।

ওই বয়সেই ইউরোপীয় প্রথায় তিনি ছবি দেখে কিংবা কোনও মডেল সামনে বসিয়ে এমন প্রতিকৃতি আঁকতেন যে তা জীবন্ত বলে মনে হত। তাঁর এই দক্ষতার জন্য শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটা প্রতিকৃতি তিনি যামিনীকে দিয়ে করিয়েছিলেন।

আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ হলে যামিনী স্বাধীন কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। ততদিনে সেকালের সামাজিক রীতি অনুযায়ী তিনি বিবাহিত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ী বিয়ের পরে কিছুদিন গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। আয় রোজগারের ব্যাপারটা একটু সড়গড় হলে যামিনী তাঁকে বাড়ি ভাড়া করে কলকাতায় নিয়ে এলেন।

তাঁর কর্মজীবনে গোড়ার দিকে যামিনী পাশ্চাত্য রীতিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন অনেক। এঁকেছেন বহু প্রতিকৃতিও। প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য তাঁর নামও ছড়িয়ে পড়েছে তখন।

১৯১৮-১৯ খ্রিঃ কয়েকজন শিল্পী মিলে ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় যামিনীর আঁকা ছবি প্রকাশিত হতে থাকে।

ছবি এঁকে বিশেষ করে প্রতিকৃতি আঁকার জন্য যামিনীর অর্থ রোজগার বেশ ভালই হতে লাগল।

এ বিষয়ে তাঁর নৈপুণ্য এতটাই ছিল যে যদি প্রতিকৃতি বা ফটো বড় করে

আঁকার কাজ নিয়ে পড়ে থাকতেন তাহলে তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে প্রতিকৃতি অঙ্কনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে জাত-শিল্পী যামিনী রায়ের শিল্পীসত্তা সৃষ্টির অতৃপ্তিতে একদিন তাঁর অঙ্কন পদ্ধতির পরিবর্তন করলেন এবং তাঁর সৃষ্টিশীল শিল্পপ্রতিভা সার্থক রূপ নেবার সুযোগ পেল। আমরা পেলাম একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী যামিনী রায়কে।

প্রতিকৃতি অঙ্কন যামিনীকে অর্থ যশ দিচ্ছে। কিন্তু একজন প্রতিভাবান শিল্পীর এর মধ্যে আত্মপ্রকাশেব সুযোগ কতটুকু? অতৃপ্তিতে ভুগতে লাগলেন যামিনী। তিনি বুঝতে পেয়েছিলেন, কেবলমাত্র প্রতিকৃতি এঁকে বড় শিল্পী হওয়া যাবে না। ভবিষ্যৎ তাঁকে বেশি দিন মনে রাখবে না।

শিল্পী হিসেবে কালের বুকে স্থায়ী দাগ রাখতে হলে তাঁকে নতুন পথের সন্ধান করতে হবে—যেখানে তিনি স্বকীয় চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের সুযোগ পাবেন। তিনি স্থির করলেন, আর ইউরোপীয় পদ্ধতি নিয়ে পড়ে থাকবেন না। নিজস্ব একটি পথ তাঁকে করে নিতে হবে।

এবার থেকে নতুনভাবে ছবি আঁকার পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন যামিনী।

এই বোধোদয় যখন হল তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ বছর। নিশ্চিত অর্থকরী পথ বন্ধ করে তিনি পা বাড়ালেন অনিশ্চয়তার পথে।

আশাতিরিক্ত টাকা আসছিল প্রতিকৃতি ও তেল রঙের ছবি এঁকে। সেসব আঁকা বন্ধ করে দেওয়াতে সংসারে দেখা দিল অনিবার্য অনটন।

জীবনের এই সময়টা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। সংসার চালাবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে হয়েছে। কখনো ছাপাখানাব কাজ নিতে হয়েছে, কখনো বসেছেন কাপড়ের দোকানে।

এত করেও সংকুলান হচ্ছিল না। এমন অনেক দিন গেছে, স্বামীস্ত্রীকে আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। জীবনের এই সঙ্কটময় সময়ে সেদিন পাশে দাঁড়াবার মতো কাউকে পাননি তিনি।

অনিশ্চয়তা ও কৃচ্ছ্রতার এই দিনগুলিতেও ছবি আঁকার বিরাম ছিল না তাঁর। সৃষ্টিশীল শিল্পীসত্তাটিকে তিনি সংসারের তাপ উত্তাপের স্পর্শে মুহ্যমান হতে দেননি। নিভৃতে ঘরের কোণে বসে নিজের শিল্প ভাবনাকে রূপদেবার সংকল্পে সময় ও সুযোগ বার করে নিতেন। নিরলস চেষ্টায় আত্মপ্রকাশের নতুন পথের সন্ধান করতেন।

অভাব অনটন ও দুঃখভারাক্রান্ত জীবন যামিনীকে বহন করতে হয়েছে ১৯৩৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।

নতুন পথের সন্ধান করতে বসে কিছুদিন ভারতীয় রীতিতে ছবি আঁকলেন। কিন্তু তাতে মন ভরল না। কোথায় যেন একটা শূন্যতা থেকে যাচ্ছে।

যামিনীর অন্তরসত্তায় ছেলেবেলার গ্রামের পটুয়া মৃৎশিল্পীদের সংস্পর্শে পাওয়া লোকশিল্পের একটা গভীর প্রভাব ছিল। শিল্পের এই সহজ সরল রূপটি তাঁকে বরাবরই আকর্ষণ করত।

পাশ্চাত্য রীতি ত্যাগ করেছেন। ভারতীয় শিল্পরীতির পরম্পরাও যখন মন ভরাতে পারল না, স্বভাবতঃই তাঁর দৃষ্টি নতুন পথের সন্ধানে বাংলার লোকসমাজে চির প্রবহমান লোকশিল্পের ধারাটিকেই একসময় নিজস্ব পথরূপে বেছে নিল।

তিনি অনুভব করলেন শহুরে পোশাকী শিল্পীরীতির চাইতে গ্রামীণ শিল্প রচনায় রয়েছে অনেক বেশি সাবলীল সরলতা যা একই সময়ে মন ও দৃষ্টিকে নন্দিত করে।

তিনি লোকশিল্পের এই সরলতাকেই নিজস্ব নতুন শিল্পরীতি হিসাবে বেছে নিলেন। এই সঙ্গে নিরলস অনুশীলনের মধ্যদিয়ে রেখা অঙ্কনের সহজ কৌশলটি রপ্ত করে নেন।

এভাবেই তরুণ শিল্পী যামিনীর লোকজীবনের ঐতিহ্যাশ্রয়ী নিজস্ব বিশিষ্ট চিত্রশৈলী রূপ লাভ করল। তাঁর এই নতুন ধারার ছবি ১৯৩৭ খ্রিঃ এক প্রদর্শনীতে দেখে অধ্যাপক শাহিদ সুরাওয়ার্দি যামিনীকে অভিনন্দন জানান।

স্বীকৃতি অবশ্য পেয়েছেন তাব আগেই ১৯৩৪ খ্রিঃ। তাঁর ছবি 'উত্তরা-অভিমন্যু' অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে ভাইসরয়-এর স্বর্ণপদক লাভ করে।

ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজ উঠেছে। গোটা বিশ্বজুড়ে পড়েছে আলোড়ন। কলকাতায় এসে জুটেছে ইংরাজ আর আমেরিকান সৈন্য। এই সৈনিকদের মধ্যে চিত্ররসিক অনেকেই যামিনী রায়ের ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন। তারা দেশে ফেরার সময় স্মারক হিসেবে কিনে নিয়ে গেলেন অনেক ছবি।

এভাবে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে যামিনী পৌঁছে গেলেন বিদেশেও। এর ফল হল সুদূরপ্রসারী।

বিদেশের চিত্ররসিক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল যামিনী রায়ের ছবি। ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদেশীদের প্রশংসা লাভ করল। তাঁর চিত্রের ওপরে পত্র-পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হতে লাগল।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এটা যে, সাহেবদের প্রশংসা না পেলে এ দেশের মানুষ স্বদেশী কোনও বিষয়ে আগ্রহী হয় না। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ প্রতিভার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার ঘটেছে।

যামিনী রায়ের চিত্রকলার বিষয়েও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। এ সম্ভবতঃ পরাধীনতার অভিশাপ!

বিদেশে খ্যাতিলাভ করার পরে যামিনী রায়ের ছবির ব্যাপারে এদেশের চিত্ররসিকদের নিস্পৃহতা দূর হল। তাঁরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং ক্রমে শিল্পীর দুঃখের দিনের অবসান হল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বি. নিকলসের 'ভার্ডিকট অন ইণ্ডিয়া' বইটির কথা। বিশেষ করে এই বইটিই যামিনী রায়কে বিশ্বখ্যাতি লাভে সহায়তা করেছে বেশি।

এই বই পড়ার পর দেশ-বিদেশে তাঁর ছবি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, অগণিত মানুষ কলকাতায় তাঁর স্টুডিওতে এসেছেন ছবি দেখতে।

স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর তুলিতে এল সৃষ্টির গতি। সেই সঙ্গে পরিবর্তনও ঘটতে লাগল তাঁর অঙ্কন রীতির।

পাশ্চাত্য রীতি ততদিনে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন তিনি। বদলে দেশীয় প্রচলিত রীতির সঙ্গে নিজস্ব চিন্তাভাবনা মিশিয়ে নতুন মাধ্যম ব্যবহার করে ছবি আঁকতে শুরু করলেন।

আগে সমতল ক্যানভাসে ছবি আঁকতেন। এবারে ছবির জন্য তিনি অসমতল ক্যানভাস ব্যবহার করতে লাগলেন। কাগজ, বোর্ড বা কাপড়ের ওপরে কখনও কাদা, কখনও চুনের প্রলেপ দিয়ে ছবির জমি করলেন। এই জমির ওপর পছন্দমতো রঙ বুলিয়ে রেখা টানতেন।

রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যামিনী রায়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি এমন সব সহজলভ্য রঙে ছবি আঁকতেন যে ভেবে বিস্ময় জাগে।

তিনি সাধারণতঃ ছবিতে লাল, নীল, সবুজ, গেরুয়া, ধূসর রঙ ব্যবহার করতেন। কখনও গাঢ় টানে কখনো হালকা ছোঁয়ায়।

আর রঙ তৈরি করতেন গিরিমটি, চুন, খড়ি, হরিতাল, হিঙ্গুল, চিমনির ধোঁয়া প্রভৃতি অত্যন্ত সস্তা জিনিস দিয়ে।

আপাত দৃষ্টিতে নেহাৎই গ্রাম্যরীতির ছবি বা কালীঘাটের পটুয়াদের পটের ছোঁয়া-যুক্ত ছবি মনে হলেও এদেশের বিদগ্ধ কবি সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করল যামিনী রায়ের ছবি। এযুগের বিশিষ্ট শিল্পী বলে স্বীকৃতি পেলেন তিনি। বিশিষ্ট বিদগ্ধ কবি ও সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যামিনী রায়ের ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "যামিনী রায়ের এসব ছবি চিত্রের বিশুদ্ধতা বজায় রেখেও তীব্রভাবে নাটকীয়, মানবিকতায় ধনী এবং চরিত্রের প্রতি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সূচিমুখ"।

শিল্পী যামিনী রায়ের সাফল্যের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে তাঁর

সহধর্মিনী আনন্দময়ীদেবীর কথা। সেকালের সামাজিক রীতি মেনে তাঁর শিল্প-শিক্ষা শেষ হবার আগেই যামিনী বিবাহ করেছিলেন। তাঁর যথার্থ সহধর্মিনী ছিলেন আনন্দময়ী।

কলকাতার ভাড়া ঘরে নিপুণ হাতে তিনি সংসার গুছিয়ে নিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের চরম সঙ্কটময় দিনগুলিতেও দুহাতে তিনি আগলে রেখেছিলেন শিল্পী স্বামীকে।

যামিনী নিশ্চিন্তে তাঁর ছবি আঁকায় মগ্ন থেকেছেন। ক্রমে সংসার বড় হয়েছে। স্বামীর খ্যাতি বেড়েছে, ব্যস্ততা বেড়েছে। সবকিছুর মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে রেখেও আনন্দময়ী অন্তরাল থেকে স্বামীকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে কোলকাতা ছেড়ে অনেক লোক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যামিনীও সপরিবারে চলে গিয়েছিলেন বাঁকুড়ায় নিজের গ্রামে। অনেক দিন পরে গ্রামের মানুষদের সান্নিধ্য শিল্পীকে নতুন ভাবনায় উদ্দীপিত করে তুলল।

তিনি প্রাণখুলে আগে যাঁদের সঙ্গে মিশতেন, সেই কুমোর, কামার, জেলে, তাঁতী, কৃষক, ছুতোর, বাউল, এঁরা এবার এক নতুন রূপ নিয়ে তাঁর মনে ধরা দিল।

শিল্পীর ছবির মধ্যে এই নগণ্য মানুষেরা অসামান্য রূপ নিয়ে বারবার ধরা দিয়েছে।

যুদ্ধের পরে পরেই অসাধারণ চাহিদা বেড়ে যেতে লাগল যামিনীর ছবির। ছবি কেনার জন্য দেশের ও বিদেশের অগণিত শিল্পরসিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগম হতে লাগল তাঁর বাড়িতে। ছবি বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে সংসারেও এল স্বচ্ছলতা।

জীবনের একটা বিশেষ পর্ব কেটেছে ভাড়া বাড়িতে। এবারে নিজস্ব বাড়ি করলেন ডিহি শ্রীরামপুরে, এখন যার নাম বালিগঞ্জ প্লেস ইস্ট। ১৯৪৮ খ্রিঃ এখানকার নতুন বাড়িতে উঠে এলেন।

মনের মতো করে সাজিয়েছেন এই বাড়ি। নিচতলায় হয়েছে স্টুডিও ও আর্ট গ্যালারি। দোতলায় বসবাসের ব্যবস্থা। নিজের আঁকা ছবির সঙ্গে সংগ্রহ করা নানা ছাঁদের পুতুল দিয়ে সাজানো হল ছবি রাখার ঘর।

দেশ-বিদেশের অভ্যাগত ও গুণীজনদের সমাবেশ হতে লাগল এই বাড়িতে। প্রকৃত ভারতীয়ত্বের গুণ সম্বলিত ও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল অসামান্য ছবিগুলি চিত্ররসিক ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলকে অভিভূত করেছে।

যামিনী রায়ের ছবির প্রধান সম্পর্দ সহজ সরলতা। রঙে, রেখায় অলংকরণের বৈচিত্র্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এই সরলতা। তাঁর রেখাচিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দুই বেড়াল, চিংড়ি মুখে বেড়াল, কালো বেড়াল প্রভৃতি।

গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ, গ্রামজীবনের কাজকর্ম, জীবনযাত্রা, ধর্মীয় ও নানা লোকঅনুষ্ঠান তাঁর ছবির প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। চারপাশের গরু, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ, প্রভৃতির সঙ্গে সাঁওতাল রমণীদের বিভিন্ন রূপ তিনি নিপুণভাবে চিত্রায়িত করেছেন। পৌরাণিক চরিত্র নিয়েও অসংখ্য ছবি এঁকেছেন তিনি।

সারাজীবনে হাজার দশেক ছবি এঁকেছেন শিল্পী যামিনী রায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম করা যেতে পারে। যেমন, কৃষ্ণবলরাম, গণেশজননী, যশোদা, বুদ্ধদেব, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রাধাকৃষ্ণ, স্ত্রীলোক, সাঁততাল রমণী, ক্রুশবিদ্ধ যীশু, মায়ের কোলে শিশু, হাতির পিঠে রাজা, লাল ঘোড়া, বাংলার বধূ, গরু, দুই বৈষ্ণব, তিন যোদ্ধার চিত্র, রথের ওপর রাজারানী, বাছুর, চিংড়ি মুখে দুই বেড়াল, বাউল, সাঁওতালের মাথা প্রভৃতি।

একটি বিষয় অবলম্বন করে অনেকগুলি পরপর ছবি এঁকেছেন তিনি। এইভাবে কৃষ্ণ, যীশু, সাঁওতাল, পশুপাখির চিত্রমালা রচনা করেছেন। বাঙলার গ্রামীণ জীবনের গভীর প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয় যামিনী রায়ের ছবি দেখে। তাঁর এক অসাধারণ নতুন সৃষ্টি খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপরে আঁকা যীশুর চিত্রমালা।

বালক বয়সে গ্রামে থাকার সময় থেকেই ছবি আঁকা আরম্ভ করেছেন যামিনী রায়। মূর্তিও গড়েছেন অনেক। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ছবিতে তাঁর নিজস্বতা পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠেনি।

পরবর্তীকালে আঁকা তাঁর শিল্পধারার ছবির মধ্যে পাওয়া যায় পাশ্চাত্য রীতির ছবি, ভারতীয় শিল্পরীতি, সাঁওতাল জীবন ও শিল্পরীতি অনুসরণে আঁকা ছবি, লাইন ড্রইং, ফ্ল্যাট টেকনিক, অলঙ্কৃত আলপনা, নতুন রীতির দ্বিমাত্রিক ছবি, ডাকের কাজের অনুসরণে আঁকা ছবি, যীশু-কাহিনী চিত্র।

কেবল এদেশেই নয়, তাঁর অঙ্কিত দশ হাজার ছবির মধ্যে অধিকাংশই ছড়িয়ে রয়েছ বিদেশে ব্যক্তিগত সংগ্রহে। চিত্র-সংগ্রহশালাতেও রক্ষিত হয়েছে কিছু ছবি। তাঁর মহৎ শিল্পকর্ম তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান দিয়েছে।

তাঁর সাবলীল সরল রীতির ছবির মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় অপার আনন্দ, শান্তি ও মানসিক বিশ্রাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ছবির আবেদন বিশ্বজনীন বলা যায়।

চিত্রশিল্পী যামিনী রায় কিছুদিন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যরচনার কাজও করেছেন। তাঁর আলপনা ও ডাকের সাজের সজ্জায় রঙ্গমঞ্চে এক ভিন্ন মাত্রার সৌন্দর্য সৃষ্টি হত।

নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন তিনি। মঞ্চ সজ্জার ব্যাপারে প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার শিশির ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।

আজীবন শিল্পের সাধক যামিনী রায় ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন রাশভারী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রকৃতির। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। সাধারণ সাদা মোটা কাপড়ের একটা ফতুয়া পাঞ্জাবী আর থান ধুতি এই ছিল তাঁর পোশাক।

শীতকালে গায়ে দিতেন একটা ধূসর রঙের আলোয়ান। সব ঋতুতেই পায়ে থাকত তালতলার চটি।

শিল্পকর্মে যেমন তিনি ফুটিয়ে তুলতেন সহজ সরল অথচ অসামান্য গ্রামীণ জীবনের ছবি তেমনি জীবন চলনাতেও তিনি ছিলেন গ্রামের মানুষের মতোই সরল অথচ খাঁটি মানুষ।

ছকে বাঁধা ছিল প্রতিদিনের জীবন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দুপুরে খাওয়া ও সামান্য বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া দিনেরাতে সারা সময়ই তিনি ছবি আঁকতেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

ছবির বিষয়ের বাইরে দুনিয়ার অন্য কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ একরকম রাখতেন না বললেই চলে। এমন নিয়মনিষ্ঠ মানুষ বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। যথার্থ শিল্পী না হলে এমন নিস্পৃহ ও আত্মমগ্ন থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

শহর কলকাতায় বাস করতেন বটে, শিল্পী যামিনী রায় পাড়াগাঁয়ের জীবনের প্রতিই অন্তরের টান বোধ করতেন বেশি। তাই গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

কাজপাগল মানুষ হিসেবে সময়ের যেমন অপচয় কখনও করেননি তেমনি সাংসারিক জীবনেও ছিলেন অত্যন্ত কড়া হিসাবের মানুষ। হিসেব করে অর্থ ব্যয় করতেন। কিন্তু তিনি কৃপণ ছিলেন না।

একটা সময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয়েছে। তখনও তাঁর জীবন একই লয়ে চলেছে।

সংযম এবং মিতব্যয়িতা, বলা চলে ব্যক্তিজীবনের এই দুই অবলম্বন তাঁর শিল্পীজীবনেরও বিকাশের পথ সুগম করেছিল।

দিনেরাতে সমানভাবে একই নিয়মে শিল্প-লক্ষ্মীর সাধনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন যামিনী। সত্তর বছর অতিক্রম করে শরীর বিমুখ হল। মাঝেমাঝেই অসুস্থ হতে লাগলেন। এই অবস্থাতেও মনের জোরে ছবি এঁকেছেন।

শেষ পর্যন্ত প্রবল নিউমোনিয়ায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। সময়টা ১৯৭০

খ্রিঃ। সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তারদের অক্লান্ত চেষ্টায় সেবারের রোগাক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হল। কিন্তু শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

রং-তুলি তবুও ছাড়েননি। জীবনে শেষ শয্যা গ্রহণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছবি এঁকেছেন।

১৯৭১ খ্রিঃ আবার অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন। এই রোগশয্যাই তাঁর শেষ শয্যা হল। ১৪শে এপ্রিল অক্লান্তকর্মা শিল্পী যামিনী রায় চিরবিশ্রাম লাভ করলেন।

বিশ্বের অন্যতম মহৎ চিত্রশিল্পী ভারতগৌরব যামিনী রায়ের শিল্পকর্মের ওপর সরকারী বা অসরকারী উদ্যোগে কোন তথ্যচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এমন অভিযোগ অনেকের মুখেই শোনা যায়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য তা নয়।

প্রচারবিমুখ শিল্পী কখনও চাননি তাঁকে নিয়ে কোন তথ্যচিত্র নির্মিত হোক। প্রচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। সে কারণেই কয়েকজন চিত্রনির্মাতা পরিকল্পনা নিয়েও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তবে সৌভাগ্যের বিষয়, এই তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজটি অত্যন্ত সংগোপনে শিল্পীর অগোচরে খেপে খেপে ছবি তুলে সম্পূর্ণ করেছিলেন শিল্পীর নিজের নাতি দেবব্রত রায়। তাঁর এই কাজটি পরে যামিনী রায় স্নেহের গৌরবে অনুমোদন করেছেন।

রঙে, রূপে, রেখায় অসামান্য যামিনী রায়ের ছবি লোকজীবনের সার্থক চিত্ররূপ। বাংলা ও বাঙালীর গর্ব। শিল্পীর বাসগৃহটি বর্তমানে দেশে বিদেশে শিল্পরসিকদের কাছে বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্র রূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

লক্ষ্মণ সেন

লক্ষ্মণ সেন বড়ো বীর।
কর্ণরন্ধ্রে ভ্যাজে তীর।।

প্রাচীন বাংলার এই ছড়াটিতে লক্ষ্মণ সেনের বীরত্বের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে। তীরন্দাজিতে তিনি এমনই দক্ষ ছিলেন যে একটি কানবালার মধ্যে দিয়েও তীর গলাতে পারতেন।

লক্ষ্মণ সেন হলেন আমাদের বঙ্গ দেশে মুসলমান অধিকারের পূর্ববর্তী পরাক্রান্ত সুশাসক নরপতি। তাঁর গৌরবঘটিত অনেক কাহিনী কিংবদন্তী হয়ে এদেশে প্রচলিত ছিল।

রাজ্যশাসনের বাইরে বাঙালীর সংস্কৃতি ও জীবনধারায় তাঁর প্রভাব এতটাই গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল যে তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সমসাময়িক প্রাচীন রচনায়, তাম্রশাসনে, মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় এবং পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে ও প্রচলিত কিংবদন্তী বা লৌকিক গল্পে।

কীর্তিমান বাঙালী রাজাদের মধ্যে শৌর্যে, বীরত্বে, রাজ্যশাসনে, বিদ্যায় এবং বাঙালী সংস্কৃতি তথা কলাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতায় লক্ষ্মণ সেন ছিলেন এক সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

লক্ষ্মণ সেনের কথা বলার আগে সংক্ষেপে বাংলার ইতিহাসের গোড়ার কিছু কথা বলা দরকার।

বাঙালীর ইতিহাস বহু প্রাচীন। বৈদিক যুগের পরবর্তী পৌরাণিক তথা মহাভারতের যুগেও বঙ্গদেশের কথা জানা যায়। তারপরে ঐতিহাসিক যুগ। সে যুগে বঙ্গদেশ ছিল বিক্রমশালী গুপ্ত রাজাদের শাসনাধীন।

গুপ্তবংশের শেষ রাজা ছিলেন মহাসেন গুপ্ত। মহাসেন গুপ্তের সেনাপতি অথবা মহাসামন্ত ছিলেন শশাঙ্ক। গুপ্ত শাসনের শেষ দিকে বঙ্গদেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

সেই সময়ে সামন্ত রাজাদের আগ্রহে ও চেষ্টায় লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

সেই রাষ্ট্রের প্রাণপুরুষ ছিলেন শশাঙ্ক। গুপ্ত রাজাদের কাছ থেকে বাঙালী শশাঙ্ক নতুন করে এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন গৌড় রাজবংশের। ভারতের ইতিহাসে শশাঙ্কই ছিলেন প্রথম সাম্রাজ্য বিজয়ী বাঙালী সম্রাট।

শশাঙ্কের পর বঙ্গদেশে পাল রাজাদের রাজত্ব শুরু হয়। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোপ পায় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়।

পাল রাজাদের পর বাংলা দেশে শুরু হয় সেন রাজাদের শাসন। বাংলার শাসন ক্ষমতা আবার আসাম থেকে মিথিলা ও কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

এই সেন রাজাদের আমলেই বাংলা দেশে প্রথম পাঠানদের আক্রমণ ঘটে। তারপর থেকে বাংলার ইতিহাস হল মুঘল পাঠানদের সঙ্গে সংঘর্ষের ইতিহাস যার পরিণতি বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য।

এই হল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস। এই ইতিহাসে সেন রাজাদের আমলই হল আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে সব চেয়ে বিশিষ্ট যুগ।

বঙ্গদেশে সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিজয় সেন। আনুমানিক ১০৯৭ খ্রিঃ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। পালবংশের শেষ বড় রাজা ছিলেন

রামপালদেব। তাঁর পরে বাংলা দেশের অধিকাংশ বিজয় সেনের শাসনাধীন হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোনও সময়ে রচিত 'শেক শুভোদয়া' নামে পুঁথিতে বিজয় সেনের রাজ্য অধিকার সম্বন্ধে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

সেই কাহিনী অনুসারে বিজয় সেন ছিলেন একজন গরীব কাঠুরিয়া। বনে কাঠ কেটে তাঁর সংসার চলত। তিনি ছিলেন পরম শিবভক্ত সাহসী ও বীর শিকারী।

সেই সময়ে গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলে রামাবতী নগর ছিল পাল বংশের শেষ রাজা রামপালদেবের রাজধানী। রাজার তিন ছেলে। কিন্তু তিন জনই বংশের কলঙ্ক। গুরুতর অপারাধের জন্য রাজা জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপালের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন।

রামপাল একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে সজ্ঞানে গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জন দেবেন বলে গঙ্গাতীরে অবস্থান করছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন প্রধান মন্ত্রী সহদেব ঘোষ ও পাত্র-মিত্র-অমাত্যগণ।

গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জন দেবার পূর্বে রামপালদেব মন্ত্রী সহদেব ঘোষকে ডেকে তাঁর শেষ বাসনার কথা জানিয়ে বললেন, আমার ছেলেরা সিংহাসনে বসার অনুপযুক্ত, তাই সিংহাসনের অধিকার তাদের কাউকেই দিইনি। প্রজারাই আমার প্রকৃত সন্তান। তাই আমার প্রজাদের ওপরেই রাজসিংহাসনের ভার দিয়ে গেলাম। একদিন বাংলা দেশের প্রজারাই আমার বংশের আদি পুরুষ গোপালদেবকে ভালবেসে সিংহাসনে বসিয়েছিল।

মন্ত্রী সহদেব ঘোষ সেই সময় বললেন, মহারাজ কাল রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। এক সামান্য কাঠুরেকে দেখিয়ে শিবঠাকুর বললেন, 'একেই তোরা রাজা করবি।'

বৃদ্ধ রাজা গঙ্গাগর্ভে দেহ লীন করবার আগে বলে গেলেন, দেবাদিদেবের যদি তাই ইচ্ছা হয় তবে তাই হোক।

এদিকে সেই বিজয় সেন নামের কাঠুরিয়া ছিলেন শিবের ভক্ত। যেদিন প্রভাতে রামপালদেব গঙ্গা জলে আত্মবিসর্জন দেবেন তার আগের রাত্রে বিজয় সেন এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর সেবা পূজায় সন্তুষ্ট শিবঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, কাল ভোর হলেই গঙ্গার তীরে স্নানের ঘাটে যাবি। সেখানে তোর সব দুঃখের অবসান হবে।

স্বপ্নের নির্দেশ অনুসারে বিজয় সেন পরদিন প্রভাতে যখন গঙ্গার স্নানের ঘাটে উপস্থিত হলেন, সেই সময়ে গঙ্গাগর্ভে রাজা রামপালের দেহ লীন হয়েছে।

সহসা মন্ত্রী সহদেব ঘোষের দৃষ্টি পড়ল তীরের দিকে। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন স্বপ্নে তিনি যে লোককে দেখেছিলেন লাঠি হাতে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তখনই রাজপুরুষদের পাঠিয়ে বিজয় সেনকে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন।

ভয়ে কম্পমান বিজয় সেন রাজবাড়িতে আনিত হলে যথাযোগ্য অভিষেকাদির অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী সহদেব ঘোষ তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন।

এই বিজয় সেনই বঙ্গদেশে স্বাধীন সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সাহসী বীর ও পরাক্রান্ত যোদ্ধা। তাঁর আমলে বঙ্গদেশের সীমানা সুদূর কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

১১১৯ খ্রিঃ থেকে ১১৫৮ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর তাঁর রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

বিজয় সেনের পর রাজা হন তাঁর পুত্র বল্লাল সেন। তিনিও বীর ও কীর্তিমান রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন তিনিই করেন।

একদিকে তিনি বাঙালী ব্রাহ্মণদের রাঢ়ী ও বরেন্দ্র এই দুই থাকে চিহ্নিত করেন। আবার হিন্দু সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন শ্রেণীর ভদ্র বাঙ্গালীর মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন।

১১৭৮/৭৯ খ্রিঃ নাগাদ বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিজ বাহুবলে তিনি চতুষ্পার্শ্বে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন।

যুবরাজ অবস্থায় বল্লাল সেন পিতামহের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন এবং নানা অভিযানে রণনিপুণতার পরিচয় দেন। তাঁর সেই বিজয়কাহিনীকে স্মরণীয় রাখার উদ্দেশ্যে বিজয় সেনের সভাকবি ধোয়ী কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে 'পবনদূত' নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর সুশাসনে গৌড় সাম্রাজ্যে অখণ্ড সুগভীর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্মণ সেনের সুদীর্ঘকালের রাজত্বে বাইরের কোনও শত্রুই বঙ্গদেশ আক্রমণের সাহস করেনি। ফলে দীর্ঘকাল যুদ্ধের প্রয়োজন না হওয়ায় রাজ্যের লোকে ক্রমেই যুদ্ধবিমুখ ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়ে।

বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বাংলা দেশের সাহিত্য কাব্য ও সঙ্গীত চর্চার বিপুল জোয়ার দেখা দেয়। প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর প্রভৃতি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন।

তাঁরা সকলেই লক্ষ্মণ সেনের শৌর্যবীর্যের গুণগান করে গেছেন। কবি শরণ

বঙ্গেশ্বরের বিজয়কীর্তির বর্ণনা করে লিখেছেন, ".....ইনি (লক্ষ্মণ সেন) চোখের পলক মধ্যে গৌড়লক্ষ্মীকে জয় করেছিলেন...... খেলাচ্ছলে কলিঙ্গদেশ অধিকার করেন। .....তাঁর পরাক্রমে চেদীরাজ মুহ্যমান হয়ে পড়েন... তিনি ম্লেচ্ছদের সূর্যের মতো তাপে বারবার দহন করেছেন.... কামরূপের অজেয় রাজাকে পরাভূত করে তিনি তাঁর অভিমান ভঙ্গ করেন....কাশীনরেশের কীর্তি হৃত করেন এবং মগধরাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।"

লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রীদের মধ্যে হলায়ুধ মিশ্র ছিলেন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। বিচার বিভাগের কাজেও তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন। হলায়ুধ তাঁর রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থের প্রারম্ভে লক্ষ্মণ সেনের গুণগান করে বহু শ্লোক রচনা করেন।

রাজার গুণ বর্ণনার পর হলায়ুধ লিখেছেন, "বাংলাদেশে এমন মনীষী বিরল যিনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রশংসা শোনেননি। প্রত্যেকেই তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। দেব মন্দিরের গায়ে প্রস্তরফলকে শিল্পীরা লক্ষ্মণ সেনের কীর্তিকাহিনী খোদাই করে গেছেন। কারুশিল্পীরা রেশম বস্ত্রের পাড়ে রাজার নাম লিখে দিয়েছেন। কবিরা শ্লোক রচনা করে তাঁর জয়গান করেছেন, পণ্ডিতেরা গদ্যে তাঁর কীর্তির স্তব করেছেন। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে তাঁর সুখ্যাতি প্রতিধ্বনিত হয়েছে।"

আশী বছর বয়স পর্যন্ত লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ সময় প্রজারা শান্তি ও প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করে। তাঁর রাজত্বে দেশে ভিক্ষুক ছিল না, চোর ছিল না। সুখময় অবকাশে লোকে সঙ্গীত, নৃত্য, কাব্য সাহিত্য ও শাস্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পায়।

সারাদেশ থেকে প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিক আর পণ্ডিতদের মনোনীত করে লক্ষ্মণ সেন রাজসভায় নিয়ে আসতেন। কবি সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণ যাতে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে সাহিত্য ও রসচর্চা করতে পারেন সেজন্য তিনি তাঁদের বড় বড় ভূ-সম্পত্তি দান করেন।

রাজার উৎসাহ ও প্রেরণায় কাব্য সঙ্গীত ও নৃত্যকলার প্রতি প্রজাদের মধ্যেও তুমুল আগ্রহ জাগরিত হয়। এর ফলে একদিকে যেমন দেশের কাব্য-সাহিত্য ও শিল্পসম্পদের উন্নতি হল, অন্যদিকে অলস রসচর্চার পথে জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিল কর্মবিমুখতা, আলস্য ও বিলাসিতা।

এরই পাশাপাশি ধর্মের জগতে তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম ও বিকৃত আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রভাবে সমাজে বেড়ে গেল অনাচার ব্যভিচার। এর ফল হল সুদূরপ্রসারী। দেশের ক্ষাত্রতেজ হয়ে পড়ল ক্ষীণ ও দুর্বল।

লক্ষ্মণ সেন নিজেও কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর রাজসভায় বড়

বড় কবি সবসময়ে উপস্থিত থাকতেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে কাব্যচর্চা করেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন।

সন্ধ্যার পর নিয়মিত নৃত্যগীতের আয়োজন হত। রাজার নৃত্যগীতপ্রিয়তার বিষয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেই কিংবদন্তীর গল্পাংশটুকু বাদ দিলে নিহীত সত্যটুকু রাজার নৃত্যগীতপ্রিয়তার বাস্তব দিকটি পরিস্ফুট করে তোলে।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার অন্যতম বিশিষ্ট কবি ছিলেন জয়দেব। তাঁর রচিত 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থখানি এদেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সাহিত্যরসিক সমাজে অত্যন্ত প্রিয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এই কাব্যগ্রন্থ সুর-তাল-সহযোগে প্রতিদিন গীত হয়।

জয়দেব বাঙালী ছিলেন না। তিনি বাইরে থেকে বাংলা দেশে এসেছিলেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন তিনি কিছুদিন উৎকলরাজেরও সভাপণ্ডিত ছিলেন।

পণ্ডিতপ্রবর সুকুমার সেন বলেন, "আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি যে জয়দেবের পৈতৃক ভিটে ছিল বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে, এখন যেখানে পৌষ সংক্রান্তিতে কেঁদুলী মেলা হয়। এ কথা ঠিক নয়। এ কথার উৎপত্তি হয়েছে জয়দেবের নিজেকে "কেন্দুবিল্বসম্ভবরোহিণীরমণ" উল্লেখ থেকে। কিন্তু কেন্দুবিল্বসম্ভবরোহিণীরমণ মানে কেন্দুবিল্বসমুদ্র থেকে উত্থিত চন্দ্র। এখানে কেন্দুবিল্ব বংশও বোঝাতে পারে। গ্রাম কখনও নয়। তাহলে কেন্দুবিল্ব ছিল জয়দেবের 'গাঁই' গ্রাম নয়।"

যাইহোক জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় তাঁর প্রতিভার জন্যই বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন।

এই সময় ওড়িশা থেকে বুঢ়ন মিশ্র নামে একজন দ্বিগ্বিজয়ী সঙ্গীতাচার্য লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় উপস্থিত হন। তিনি নিজের প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য সভার পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। তাঁর দাবি, তর্কে বিজয়ী হলে তাঁকে দিদ্বিজয়ী খেতাব দিতে হবে। আর তিনি পরাজিত হলে পরাজয় স্বীকার করে খত লিখে দেবেন।

বুঢ়ন মিশ্রর প্রতাপে ভীত হয়ে সভার কোনও পণ্ডিতই তাঁর সঙ্গে তর্ক করার সাহস পেলেন না। রাজা তখন খত লিখে দেবার জন্য তাঁর মন্ত্রীকে আদেশ করলেন।

এই সংবাদ প্রচারিত হলে জয়দেবের পত্নী পদ্মাবতী রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে জানালেন, 'মহারাজ, আপনি একী কাজ করছেন। আমার স্বামী বর্তমান থাকতে অন্যকে দিগ্বিজয়ী খেতাব লিখে দিচ্ছেন!'

রাজা বললেন, 'তাহলে আপনার স্বামীকে রাজসভায় এসে তর্কযুদ্ধে অংশ

নিতে বলুন। তখন বিচারে যিনি বিজয়ী হবেন তাঁকেই দ্বিগ্বিজয়ী খেতাব দেওয়া হবে।'

এরপর পদ্মাবতী স্বামীকে রাজসভায় নিয়ে এলেন। জয়দেব তখন বুঢ়ন মিশ্রকে বলেন, 'সঙ্গীত শাস্ত্রে আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা কি আছে বলুন।' বুঢ়ন মিশ্র তখন সভার বাইরে একটি গাছকে দেখিয়ে বললেন, 'আমি গান গেয়ে এই গাছের সব পাতা এখনি ঝরিয়ে দিতে পারি।' এই বলে তিনি একটি বিশেষ রাগের গান ধরলেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতাগুলিও ঝরে পড়তে লাগল।

একসময় গান শেষ হল আর গাছটিও সম্পূর্ণ নিষ্পত্র হয়ে গেল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সভায় উপস্থি সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

জয়দেব বললেন, 'আপনি কি আবার গান গেয়ে এই নিষ্পত্র গাছে এখুনি পাতা গজিয়ে দিতে পারনে?'

বুঢ়ন মিশ্র অসম্মতি প্রকাশ করলে জয়দেব বসন্তরাগে একটি গান ধরলেন। তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে ডালে ডালে পাতা গজাতে লাগল।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সম্পূর্ণ গাছটি আবার আগের মতো পত্রময় হয়ে উঠেছে। জয়দেবের কৃতিত্ব দেখে সভার সকল লোক তাঁর নামে সাধুবাদ জানাতে লাগল।

লক্ষণ সেন কেবল সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পচর্চার পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন তা নয়। তাঁর সময়ে রাজআনুকূল্যে ও আগ্রহে দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল।

আমাদের দেশে সেকালে ধর্মীয় নানা বিধিনিষধের বাধার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি রুদ্ধ হয়েছিল। মানুষের শরীর নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি সম্ভব হয়। এই বিশেষ গবেষণার জন্য প্রয়োজন হয় শবদেহ।

আমাদের দেশে সামাজিক বাধার ফলে শবদেহ পাওয়া যেত না। তাই শব-ব্যবচ্ছেদেরও সুযোগ ছিল না। ফলে তাঁদের গবেষণার একটা স্তরে এসে বৈদ্যদের থেমে থাকতে হয়েছিল।

লক্ষ্মণ সেন এক বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বৈদ্যদের গবেষণার এই অসুবিধা দূর করেছিলেন।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের একটি শর্তে তিনি দণ্ড মকুব করতেন। সেই সর্ত হল, রাজার নির্দিষ্ট বৈদ্যরা স্বাধীনভাবে তাদের দেহের ওপর যে কোনও পরীক্ষা করতে পারবেন।

এই সর্ত অনুযায়ী যেসব মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে মার্জনা করা হত,

তাদের বলা হত বোম্‌থা। বোম্‌থাদের কপালে উল্কি দিয়ে রোম্‌থা কথাটা লিখে দেওয়া হত। এরপর বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই বোম্‌থাদের দেহে তাঁদের নানা ওষুধের পরীক্ষা করতেন।

এইভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে কোনও রোম্‌থার মৃত্যু হলে তার জন্য বৈদ্যকে দায়ী বা শাস্তিদান করা হত না। মৃত রোমথার শবদেহ নিয়ে হত শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা।

এভাবেই শস্ত্র ছেড়ে সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প ও চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চায় লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে মগ্ন হয়েছিল বাংলাদেশের প্রজাসাধারণ।

শেষ বয়সে আবার লক্ষ্মণ সেন মেতে উঠেছিলেন জ্যোতিষীদেব নিয়ে। রাজানুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় জ্যোতিষীরা তাঁকে নানা প্রকার মনভোলানো কথায় তুষ্ট করে রাখত।

জ্যোতিষীরা বলেছিল যে তাঁর রাজ্যহানির কোনও আশঙ্কা নেই। রাজাও সেকথা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এসব নানা বিষয় নিয়ে লক্ষ্মণ সেনের পুত্র ও কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে বেশ মতবিরোধ হয়েছিল।

লক্ষ্মণ সেন নিজে পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন। তবুও ইতিহাস বলে, তাঁর রাজত্বের অবসান ঘটেছিল আকস্মিভাবে মাত্র আঠারোজন পাঠান অশ্বারোহীর আক্রমণের ফলে।

অবশ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, বিহার প্রদেশ থেকে একটি ছোট তুর্কীবাহিনী লক্ষ্মণ সেনকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল। রাজা এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে প্রাসাদের খিড়কি পথে পালিয়ে গঙ্গাপথে নিরুদ্দেশ হন।

এই কাহিনী সর্বাংশে সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকদের ভ্রান্তির ফলেই লক্ষ্মণ সেনের ওপর এই কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে। ঘটনা কিন্তু অন্য কথা বলে।

লক্ষ্মণ সেন তাঁর পিতামহ বিজয় সেনের মতোই দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিলেন। শেষ বয়সে, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ, রাজধানী থেকে দূরে নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে প্রাসাদে নিশ্চিন্ত মনে ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত করছিলেন।

সেই কালের নবদ্বীপ একটি শান্ত নিবিড় প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত গ্রাম মাত্র। কোনও সেনাশিবির বা দুর্গ সেখানে ছিল না। রাজার সঙ্গে ছিল কেবল কয়েকজন ভৃত্য মাত্র।

সেটি ১১৯৯ খ্রিঃ ঘটনা। সেই সময় ভারতের সর্বপ্রথম স্বাধীন মুসলমান রাজা কুতুবউদ্দীনের দুঃসাহসিক সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজী বেরিয়েছেন ভারত বিজয়ে।

অধিকার বিস্তার করে তিনি এগিয়ে এসেছেন মগধ অর্থাৎ বর্তমান বিহার পর্যন্ত। দুর্ভাগ্যবশতঃ লক্ষ্মণ সেন এই সংবাদ পাননি।

সুচতুর বক্তিয়ার বাংলার সীমান্তে প্রবেশের আগেই জানতে পারলেন শান্তির নীড় বাংলায় এক অসামরিক শান্ত জীবন প্রবহমান। দেশজয়ের এমন সহজ সুযোগ পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

বক্তিয়ার গঙ্গার তীর ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন। দেশের রাজা নবদ্বীপে বাস করছেন খবর পেয়ে তিনি নবদ্বীপকেই রাজধানী মনে করলেন। তাই নবদ্বীপ প্রবেশের আগে বনের মধ্যে গোপনে সৈন্যদের ছাউনি ফেললেন।

তারপর মাত্র আঠারোজন সৈন্যকে ছদ্মবেশে নবদ্বীপের অবস্থা সরেজমিনে দেখে আসার জন্য পাঠালেন। এই সৈনিকরা প্রত্যেকে একটি করে ঘোড়া সঙ্গে করে নিল। নগরে প্রবেশ করল তারা ভিনদেশী অশ্ববিক্রেতার ছদ্মপরিচয়ে।

নবদ্বীপের অবস্থা দেখে বিস্মিত হয় তারা। সামান্য একটা শান্ত নির্জন গ্রাম। পথে লোকচলাচল তেমন নেই। একটা প্রাসাদ গঙ্গার ধারে। তারা শুনতে পেল, সেই প্রাসাদেই থাকেন রাজা।

পাঠান সৈন্যরা ধীরে ধীরে উপস্থিত হয় প্রাসাদের দ্বারে। তাদের পথ অবরোধ করবার মতো কোনও সৈনিক বা দ্বাররক্ষী নেই সেখানে। নানা কাজে কয়েকজন ভৃত্য কেবল এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছে।

সেই ভৃত্যরাই ছদ্মবেশী অশ্ববিক্রেতাদের পথ আটকাল। দস্যুরা এবার নিজমূর্তি ধারণ করে। মুহূর্তের মধ্যে তারা ভৃত্যদের আক্রমণ করে তাদের হত্যা করল।

বৃদ্ধ রাজা সেই সময় পুজোয় বসেছেন। তাঁর কানে এলো দরজায় চিৎকার চেঁচামেচির সঙ্গে অস্ত্রের শব্দ হচ্ছে।

শঙ্কিত রাজার ধরাণা হল পাঠান সৈন্যরা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। কালবিলম্ব না করে তিনি প্রাসাদের খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে একখানা নৌকায় চেপে পলায়ন করলেন।

পাঠান সৈন্য আঠারো জন বৃথা সময় ব্যয় না করে প্রাসাদে প্রবেশ করল। তাদের বাধা দিতে কেউ এগিয়ে এল না। তারা তখন সঙ্কেত ধ্বনি করল। সেই শব্দ শুনে বনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা বেরিয়ে এসে নবদ্বীপে ঢুকে পড়ল। তাদের বাধা দেবার মতো কোনও আয়োজনই কোথাও ছিল না। বিস্মিত উল্লসিত বক্তিয়ার খিলজি অনায়াসেই নবদ্বীপ দখল করে নিল। এই হল ইতিহাসের আঠারোজন পাঠান সৈন্যের নবদ্বীপ বিজয়ের কাহিনী—কিন্তু বঙ্গ বিজয় নয়। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশ জয় করতে পাঠানদের তারপর আরও দেড় বছর সময় লেগেছিল।

বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ থেকে নৌকাপথে পালিয়ে পূর্ববঙ্গে চলে যান। সেখানেই নতুন রাজধানী স্থাপন করার পর তিনি অল্প কয়দিনই মাত্র বেঁচে ছিলেন।

শান্ত সমরবিমুখ জীবনযাপন করতে গিয়ে যে ভুল করেছিলেন রাজা তার সংশোধন করার সুযোগ আর পেলেন না।

লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ দীর্ঘকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন তাঁর নিজের নামে একটি সংবৎ চালু করেছিলেন। বাংলাদেশে ছাড়াও এই সংবৎ-এর ব্যবহার ছিল উত্তর-পূর্ব গাড়োয়াল থেকে নেপাল তিরহুত পর্যন্ত উত্তরাপথের একটা বড় অংশে। কয়েক শতাব্দী থেকে রাজসভায় ও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্মণ সংবৎ প্রচলিত ছিল। এই সংবতের আরম্ভ ১১১৯ খ্রিঃ থেকে।

সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন সেই বছরেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। পিতামহের রাজ্যাভিষেকের স্মারক হিসাবে লক্ষ্মণ সেন সংবৎটি চালু করেছিলেন। রাজা হিসাবে লক্ষ্মণ সেনের কৃতিত্ব যাই হোক না কেন, বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠাপোষক হিসাবে তাঁব নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

বল্লাল সেন

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের বাঙালী হিন্দুর যে সমাজ জীবন ছিল কালের অভিঘাতে আজ তার অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে এবং তার বহিরঙ্গেও ঘটেছে নানা পরিবর্তন।

কিন্তু সমাজের আদি ব্যবস্থার মূল কাঠামোটি সেযুগে যেভাবে গঠিত হয়েছিল তার কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা ও বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস। কিছু কিংবদন্তী আর কিছু ইতিহাস এ দুয়ের সংমিশ্রণে তৈরি সেই ইতিহাস। সেকারণে তার প্রামাণ্যতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যেও রয়েছে বিস্তর বিতর্ক।

গুপ্ত রাজাদের শাসনের শেষ লগ্নে বাঙালী শশাঙ্ক এক স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গৌড়রাজবংশ।

শশাঙ্কের পরে বাংলাদেশে শুরু হয়, আনুমানিক ৭৫০ খ্রিঃ পাল রাজাদের রাজত্ব। পাল রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ। তাই বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে বৌদ্ধ ধর্ম।

বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারের ফলে বাংলাদেশ থেকে বেদনির্ভর ব্রাহ্মণদের ধর্ম একেবারে লোপ পেয়ে যায়। অর্থাৎ বেদ-উপনিষদের চর্চা, হিন্দুর যাগ-যজ্ঞ পূজা-অর্চনা সমস্তই বাংলার সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়।

পাল রাজাদের পরে বাংলাদেশ ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সময় উত্তর বাংলায় রাজত্ব করতেন শূরসেন। রাজা শূরসেন যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তা হল সেন রাজবংশ।

সেন বংশের আদি পুরুষ বলে শূরসেনের আর এক নাম হল আদিশূর। তিনি ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। তিনি আশপাশের অনেক ছোট রাজ্য দখল করে সম্রাট হন।

একবার তাঁর রাজত্বে দেখা দেয় অনাবৃষ্টি। দেশজুড়ে উঠল হাহাকার। সেইকালের লোকের বিশ্বাস ছিল রাজার পাপেই হয় ঈতি। ঈতি হল অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মড়ক। রাজা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে দূর হবে এই সর্বনাশা ঈতি।

রাজা শূরসেন ছিলেন হিন্দু। প্রজার কল্যাণের জন্য তিনি স্থির করলেন যজ্ঞ করবেন। কিন্তু শাস্ত্রমতো যজ্ঞ করতে হলে চাই উপযুক্ত পুরোহিত। বাংলাদেশে তখন বেদজ্ঞ পুরোহিত বলতে কেউই ছিলেন না।

বহু বছরের বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে দেশ থেকে বেদের চর্চা শাস্ত্রের অনুশীলন উঠে গিয়েছিল।

রাজা শূরসেন তখন পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেশে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন কান্যকুব্জে। সেইকালে ভারতবর্ষে কনৌজী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের খুব নামডাক।

শূরসেনের আহ্বানে কান্যকুব্জ থেকে বাংলাদেশে এলেন পাঁচজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। যথাসময়ে মহাসমারোহে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল।

যজ্ঞের ফলেই হোক কিংবা প্রাকৃতিক নিয়মেই হোক, আকাশে ঘনাল কাল মেঘ। দূর হল অনাবৃষ্টি। শস্যশালিনী হল বঙ্গভূমি। প্রজাদের মুখে ফুটল হাসি।

রাজা শূরসেন কনৌজী পাঁচ ব্রাহ্মণকে আর দেশে ফিরে যেতে দিলেন না। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য ভূসম্পত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ সেই থেকে রয়ে গেলেন বাংলাদেশে।

এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম হল নারায়ণ, সুষেণ, পরাশর, ধরাধর আর গৌতম। অনেকের মতে আবার তাঁদের নাম হল নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ আর ছান্দড়।

এই পাঁচজন কান্যকুব্জ বা কনৌজী ব্রাহ্মণই হলেন আজকে বাঙালী ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ।

পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে এসেছিলেন পাঁচজন অনুচর। সেই পাঁচজন অনুচরের

পদবী ছিল ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র আর দত্ত। তাঁহারই হলেন আজকের বাঙালী কায়স্থদের আদিপুরুষ।

অতীত বাংলার সমাজ পত্তনের পরম্পরায় মহাকালের নির্দেশেই আমরা এক সময় দেখতে পাই বঙ্গরাজ বল্লাল সেনকে।

আদিশূরের প্রায় দেড়শো বছর পরে গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে বসলেন বিজয় সেন।

তিনি ছিলেন সাহসী বীর ও পরাক্রান্ত যোদ্ধা। তাঁর রাজত্বকালে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাহিত্য সংস্কৃতিরও প্রভূত উন্নতি হয়।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেন গৌড় রাজ্য আর বিবাহের সূত্রে পেলেন বঙ্গরাজ্য। এইভাবে তরুণ বয়সেই বল্লাল সেন উত্তরবঙ্গ থেকে পূর্ব আর দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত বিরাট এক রাজ্যের অধিপতি হলেন।

অসাধারণ ছিল বল্লাল সেনের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে দেখা গেছে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ। সঙ্গীত-শিল্পের অনুরাগী এই রাজা যুদ্ধবিদ্যায় যেমন ছিলেন অসামান্য বীর তেমনি বিস্ময়কর কৌশলী সেনাপতি।

শাস্ত্র আলোচনায়, পাণ্ডিত্যেও তাঁর ছিল অগাধ অনুরাগ। সংস্কৃত ভাষায় তিনি প্রতিষ্ঠানসাগর, ব্রতসাগর, আচারসাগর, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বল্লাল সেন রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা বিশেষ করেননি বটে তবে দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিধান ও শক্তিসঞ্চয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

সামাজিক দিক থেকে বাংলাকে আদর্শরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বল্লাল সেন এক সামাজিক সংস্কারের পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তার ফল হয়েছিল বিপরীত। সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল আভিজাত্যের পাঁচিল, ধ্বংস হয়েছিল সমাজের ভেতরকার সংহতি। সেই বিষবৃক্ষ আজও আমরা সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করতে পারিনি।

সব সভ্য দেশেই দেখা যায় রাষ্ট্র প্রজাসাধারণের মধ্যে মহত্তর জীবনের উদ্দীপনার জন্য বিশেষভাবে প্রয়াসী হয়।

এ জন্য প্রত্যেক উন্নত সমাজেই গুণের স্বীকৃতিদানের জন্য বিশেষ বিশেষ সম্মাননার ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে রাজারা গুণিব্যক্তিকে নানা উপাধি দিয়ে সম্মান জানাতেন।

সেই সম্মান বা সম্মানীয় উপাধি লাভের জন্য সমাজের মধ্যে সজীব চেষ্টা বা প্রেরণা প্রবাহিত থাকে। এই প্রেরণাই জাতিকে উন্নততর লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। জাতি হয় উন্নত।

রাজ্যে সুখসমৃদ্ধি ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হবার পর বল্লাল সেন বাংলার সমাজজীবনকে উন্নত ও মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করলেন।

কুলীন অর্থে উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ বোঝায়। প্রজা-সাধারণের মধ্যে যারা গুণে-জ্ঞানে চরিত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বল্লাল সেন তাঁদের সমাজের আদর্শ স্থানীয় রূপে সম্মাননার ব্যবস্থা করলেন।

রাজসভায় গুণিব্যক্তিদের গুণের বিচার করে তাঁদের কুলীন উপাধি দিলেন। এইভাবে যাঁরা কুলীন বলে বিবেচিত হলেন, সমাজে তাঁরা হলেন অগ্রগণ্য এবং বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

কুলীন শ্রেণীতে বিবেচনার জন্য বল্লাল সেন নয়টি গুণ স্থির করে নিয়েছিলেন। বিশেষ বিচারে এই নয়টি গুণ যাদের চরিত্রে দেখতে পেলেন তাঁকেই কুলীন বলে সম্মান দিলেন।

বল্লাল সেন নির্ধারিত নয়টি বিশেষ গুণ হল—সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা, দান, শান্তি, তীর্থদর্শন, এবং তপস্যার শক্তি।

প্রথমে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন নির্বাচন করা হয়। এরপর কান্যকুব্জ থেকে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আসা পঞ্চ সহচর বা ভৃত্য ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র আর দত্তদের মধ্যেও কুলীন নির্বাচন করা হল। ততদিনে এঁদের সকলেরই বংশাবলী বৃদ্ধি পেয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় থাকের কুলীন নির্বাচনের সময় দত্ত পদবীধারীরা বেঁকে বসলেন। তাঁর ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহদের সঙ্গে এক সারিতে পংক্তিবদ্ধ হতে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করলেন।

কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তল্পিবাহক ভৃত্য হিসাবে এসেছিলেন ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্ররা। তাঁরা নিজেদের সে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

কিন্তু দত্তরা বললেন, তাঁরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গ ধরে কান্যকুব্জ থেকে এসেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণদের ভৃত্য ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের পরিচয়ও দিতেন অনুযাত্রিক বা সহযাত্রি বলে।

দত্তদের এরকম অবিনয়ী ও দাম্ভিক উক্তিতে প্রচ্ছন্ন ছিল তাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা। ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্ররা কিন্তু দত্তদের এই দাবি মেনে নিলেন না। তাঁরা সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দিলেন যে দত্তদের দাবি সত্য নয়। দত্তরাও তাঁদের সকলের মতো ব্রাহ্মণদের লটবহর বহন করে এদেশে এসেছেন।

বল্লাল সেন ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্রদের সাক্ষ্যই মেনে নিলেন এবং দত্তদের অবিনয় ও দাম্ভিকতার নিন্দা করলেন এবং দত্তদের মধ্যে থেকে কাউকে কুলীন

করলেন না। তারা নানা গুণের অধিকারী হয়েও সমাজে সাধারণ প্রজা হয়েই থাকলেন।

বল্লাল সেন নিয়ম করেছিলেন, প্রতি ছত্রিশ বছর অন্তর চরিত্র ও গুণ বিচার করে কুলীন নির্বাচন করা হবে।

বল্লাল সেনের এই কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যটি ছিল নিঃসন্দেহে মহৎ। তিনি চেয়েছিলেন আপামর বাঙালী বিশেষ নয়টি গুণের চর্চা করে নিজেদের কুলীন শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রেরণা লাভ করবে।

এভাবে সমাজে যে উদ্দীপনা আসবে তাতে সামগ্রিকভাবে সমাজের ও দেশের উন্নতি হবে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এই কৌলীন্য সম্মান ব্যবস্থাকে নির্ভর করে অনতিকাল মধ্যেই পাশাপাশি এক ভিন্ন প্রথা গজিয়ে উঠেছে।

লোকে আর কৌলীন্যের জন্য নির্ধারিত নবগুণের চর্চা করল না। কুলীনের ছেলে কুলীন হবে এমন একটা সহজ ব্যবস্থাই সমাজে স্থায়ী হয়ে গেল।

কুলীনের সন্তান জঘন্য অন্যায় অপরাধ করলেও তার কুলীনত্ব নষ্ট হয় না। সে কুলীনই থেকে যায়।

অপর দিকে অকুলীনদের মধ্যে কেউ কৌলীন্য বিধির যথাযথ অনুশীলনের দ্বারা মহৎ চরিত্রের অধিকারী হলেও তাকে কিছুতেই কুলীন বলে গণ্য করা হয় না।

বল্লাল সেন চরিত্রের গুণের বিচারে কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি কখনওই, আমরা এখনও সমাজে যা দেখে থাকি, জন্মসূত্রে কুলীন গণ্য হবার রীতি সৃষ্টি করেননি। বাংলার এটাই দুর্ভাগ্য।

রাজা হবার পর লক্ষ্মণ সেন তাঁর পিতার নির্দেশ মতো ছত্রিশ বছর পরে কৌলীন্যের নতুন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সভা বসিয়ে যথানিয়মে বিচারকরা বল্লাল সেন নির্দিষ্ট নটি লক্ষণ মিলিয়ে বিচার করতে বসেন।

এই নির্বাচন উপলক্ষ করে সমাজে এক ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। লোকের মধ্যে হিংসা আর রেষারেষি এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে তারা বিচারকদের সিদ্ধান্তের কোন মূল্যই দিতে চায়নি।

জোর করে কিছু মানতে সমাজের লোককে বাধ্য করা চলে না। তাই লক্ষ্মণ সেন হাল ছেড়ে দিলেন। বিরক্ত হয়ে তাঁর সময়ের নির্বাচন বাতিল করে দিলেন।

ছত্রিশ বছরের মধ্যে সমাজের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে আসল কুলীনত্ব ঘুচে গিয়ে কুলীনত্বের ছায়াটিই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্যটাই এভাবে মুছে গেল। যে নটি বিশেষ গুণের প্রতি মানুষকে তিনি আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছিলেন কুলীন হবার জন্য কেউ আর সেসব গুণের চর্চা নিয়ে মাথা ঘামাল না। কুলীনের ঘরে জন্মালেই কুলীন বলে সম্মান পাওয়া সমাজের রীতি হয়ে গেল। কুলীনের চরিত্র বলে আর কিছু রইল না।

ঠিক একইভাবে ব্রাহ্মণদেরও বৈশিষ্ট্য তথা চরিত্র নষ্ট হয়ে গেল। যেসব গুণ অর্জন করলে আগে ব্রাহ্মণত্বের সম্মান দাবি করা চলতো, সেই বিধি মেনে চলার আর প্রয়োজন রইল না।

সৌভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই সমাজে ব্রাহ্মণত্বের সম্মান পাওয়া যেতে লাগল।

একটি নির্দোষ সামাজিক প্রথা তার বিকৃত পচা গলা আকৃতি নিয়ে সমাজদেহে জেঁকে বসে গেল। আর আমরা তাকেই আঁকড়ে ধরে বয়ে চলেছি। আজও পর্যন্ত আমরা এই অন্ধ সংস্কারের গণ্ডি ছেড়ে পুরোপুরি কি বেরিয়ে আসতে পেরেছি?

বল্লাল সেনের সুশাসনে রাজ্যের প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে সমাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন বণিক সম্প্রদায়। তাঁরাই বর্তমানে সুবর্ণবণিক বলে পরিচিত।

প্রভূত অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয়েও আচারে ব্যবহারে নিয়ম-নিষ্ঠায় তাঁরা ব্রাহ্মণদের চাইতে কোনও অংশে কম ছিলেন না। ব্রাহ্মণদের মতো তাঁরাও নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে উপবীত ধারণের রীতির প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জীবনের শেষ দিকে বল্লাল সেনের এই সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘোরতর গোলযোগ বেধে গেল।

সেইকালের বাংলাদেশে সুবর্ণ বণিকদের নেতৃস্থানে ছিলেন বল্লভানন্দ নামে এক শেঠ। ব্যবসায়-বাণিজ্যে অগাধ অর্থের মালিক হয়েছিলে তিনি।

তখন আজকের দিনের মতো ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা তো ছিল না। ধনশালী মহাজনই ব্যাঙ্কের কাজ করতেন। লোকে প্রয়োজনে তাঁদের কাছ থেকেই উপযুক্ত বন্ধকীর ব্যবস্থা করে টাকা ধার করতো।

যুদ্ধ, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দুর্বিপাকে রাজারাও এই মহাজনদের কাছে হাত পাততেন।

একবার বর্তমান অসমের এক সীমান্ত রাজ্য ওদন্তপুরের রাজার সঙ্গে বল্লাল সেনের ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেল। সেই যুদ্ধে বল্লাল সেন খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সাময়িকভাবে পিছু হটে এলেও তিনি নতুন উদ্যমে ওদন্তপুর আক্রমণের

আয়োজন করতে লাগলেন। এই সময়ে তাঁর এক কোটি টাকার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

রাজকোষে টান ধরেছিল নিশ্চয়, বল্লাল সেন এক কোটি টাকা ধার চেয়ে বল্লভানন্দের কাছে একজন দূত পাঠালেন।

বল্লভানন্দ টাকা ধার দিতে রাজি হলেন তবে একটা বিশেষ শর্তে। তিনি রাজাকে বলে পাঠালেন, যতদিন ঋণের টাকা পরিশোধ না হবে, ততদিন হরিকেলী পরগনার রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁর ওপরে থাকবে। সোজা কথায়, বল্লভানন্দ হরিকেলী পরগনা বন্ধক চাইলেন।

দেশের রাজা বল্লাল সেন। ধনী মহাজন বল্লভানন্দ তাঁর একজন প্রজা মাত্র। একজন প্রজার কাছ থেকে এমন স্পর্ধিত প্রস্তাব শুনে স্বভাবতই বল্লাল সেন খুবই অপমানিত বোধ করলেন। বাধ্য হয়েই তিনি এরপর তাঁর রাজকীয় ক্ষমতার প্রয়োগ করলেন।

কেবল বল্লভানন্দ নয়, তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত অর্থবান সুবর্ণ বণিকদের অর্থভাণ্ডার রাজা রাজ্যের প্রয়োজনে দখল করে নিলেন।

বলা বাহুল্য রাজার এই আচরণ বল্লভানন্দ সাময়িক ভাবে হজম করতে বাধ্য হলেও মেনে নিতে পারলেন না। এর যোগ্য জবাব দেবার জন্য তিনি মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

যুদ্ধে বল্লাল সেন জয়ী হলেন। বল্লভানন্দের অপমানের জ্বালা তাঁর মনে ধূমায়িত ছিল। যুদ্ধজয়ের পর তিনি এক বিজয় উৎসবের আয়োজন করলেন। যথারীতি রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাজভোজে আমন্ত্রণ জানানো হল।

বল্লাভানন্দ সহ অন্যান্য ধনী সুবর্ণবণিকদেরও নিমন্ত্রণ হল। কিন্তু সভায় উপস্থিত হয়ে বল্লভানন্দ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসন দেখে খুবই বিচলিত হলেন।

রাজার আদেশে বল্লভানন্দ এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সুবর্ণবণিকদের আসন করা হয়েছিল আলাদাভাবে বৈশ্যদের আসনের পেছনে।

এই প্রকাশ্য অপমানের পর বল্লভানন্দ সুবর্ণবণিকদের সকলকে নিয়ে ভোজসভা ত্যাগ করে গেলেন।

বল্লভানন্দ কিন্তু নিশ্চুপ বসে রইলেন না। অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি যড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

সেই সময়ে মগধের রাজা ছিলেন বল্লভানন্দর জামাতা। তিনি গোপনে জামাতার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

দূত মারফত যড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিকদের বিরুদ্ধে এক আদেশ জারি করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, স্বদেশের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়কে সমাজে পতিত করা হল।

হীন কাজের জন্য এখন থেকে তারা অন্ত্যজ শূদ্র বলে গণ্য হবে। কোনও সৎ ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিকদের যজনকার্য করতে পারবেন না। যারা এই রাজাদেশ অমান্য করবেন তাঁদেরও সমাজে পতিত বলে গণ্য করা হবে।

রাজা বল্লাল সেনের সেই শাস্তি তারপর থেকে সমাজে বহাল হয়ে গেল এবং সেদিন থেকে সমাজে সুবর্ণ বণিকরা তাঁদের আগেকার মর্যাদা হারালেন।

অপর দিকে অনিবার্য ভাবে এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সমাজে বৈশ্য সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের সঙ্গে সুবর্ণ বণিকদের একটা গোপন রেষারেষি তৈরি হয়ে গেল।

সেন রাজারা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শিব ভক্ত। বৌদ্ধ বাংলাদেশে তাঁদের চেষ্টাতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শিবভক্ত বল্লাল সেন তাঁর রাজ্যে কয়েকটি শৈব মঠের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেকের মতে তিনি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানও করতেন। সেসব গোপন অনুষ্ঠান ভদ্র রুচির বিপরীত ছিল।

তাছাড়া রাজা বৃদ্ধ বয়সে পদ্মিনী নামের এক দুশ্চরিত্রা রূপসী নারীর প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এই নিয়ে রাজ্যে অনেক কুৎসিত রটনা হতে থাকে।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সেই সময় যুবা বয়স। বিদ্যায়, বীরত্বে, সদাচারে তাঁর খ্যাতি প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। পিতার কুৎসায় তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়।

তিনি পিতার মতিগতি বদলানোর জন্য বহুভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বিতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে নবদ্বীপের কাছে এসে বাস করতে থাকেন।

এই সময়ে পিতাপুত্রের মধ্যে কিছু চিঠির আদান প্রদান হয়। চিঠিগুলো লেখা হত সংস্কৃত শ্লোকে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই শ্লোকগুলি থেকে পদ্মিনীর প্রসঙ্গ জানা যায়।

মৃত্যুশয্যায় বল্লাল সেন নিজের ভ্রান্তির কথা বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন এবং লক্ষ্মণ সেনকে ডেকে পাঠান।

পিতার ডাক পেয়ে লক্ষ্মণ সেন যখন রাজধানীতে উপস্থিত হন তখন বল্লাল সেনের শেষ অবস্থা।

পিতার মৃত্যুর পর ১১৬১ খ্রিঃ লক্ষ্মণ সেন সুবিশাল গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর হন।

রোজার বেকন

ইউরোপ তাঁকে Modern Man of Science অভিধায় ভূষিত করেছে। কখনও বা তাঁকে ডাকা হয়েছে Progressive Schoolman বলে। বিজ্ঞানের এই পুরোধাপুরুষের নাম রোজার বেকন।

ত্রয়োদশ শতকের অন্ধকার যুগে বসে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন বিজ্ঞান-আলোকে আলোকিত সম্ভাবনাময় উনিশ শতকের।

কেবল স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত থাকেননি বেকন, নিজের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা সেই স্বপ্ন রূপায়নের পথও বাতলেছেন।

কিন্তু সেকালের প্রাচীনপন্থী আত্মাভিমানী গোঁড়া পণ্ডিতদের কাছে তাঁর কথা ও কাজ বিবেচিত হয়েছে পাগলামো বলে, অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত খেয়াল বলে। বেকনের চিন্তার গভীরতা ও সুদূরপ্রসারী বিজ্ঞানদৃষ্টি তার সমকালে কোনও মূল্যই পায়নি।

বিজ্ঞান-প্রগতির বর্তমান প্রাগ্রসর যুগে আকাশগামী বিমান বা রকেট, সমুদ্রের যন্ত্রচালিত জলযান কিংবা স্থলে রেলগাড়ি কিংবা মোটরগাড়ি—আমাদের চোখে খুবই সাধারণ আবিষ্কার বলে গণ্য হয়। কিন্তু তেরো শতকে এমন সব সম্ভাবনার চিন্তা ছিল রীতিমতো সনাতন বিধি লঙ্ঘনকারী শাস্তিযোগ্য বিদ্রোহী ভাবনা।

সেযুগে সমাজ-শাসনে যাঁরা কর্তৃত্ব করতেন, তাঁদের পথ দেখাতো প্রাচীন বাঁধাধরা অনুশাসনাবলী। যুক্তিবিচারের প্রশ্ন কেউ তুলতো না। অন্ধভাবে প্রাচীন পন্থার অনুসরণই ছিল সামাজিক রীতি।

সমাজ শাসিত হত সর্বশক্তিমান চার্চের নামে। আর সেই চার্চের সর্বেসর্বা মহামান্য পোপ। যার ধ্যানধারণা ছিল গতানুগতিক চিন্তা-ধারণার সংস্কারের বা প্রগতির পরিপন্থী।

এমন এক যুগেই জন্মেছিলেন রোজার বেকন। সমকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর চিন্তা প্রসারিত হত অনাগতের পথে।

কিন্তু যুগের মূল্যায়ন তিনি পাননি। তার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দুই শতাব্দীকাল।

ত্রয়োদশ শতকের অন্ধকার যুগে বসে বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মমগ্ন বেকন নিজের মনে অঙ্কের হিসেব নিকেশ করতেন। তিনি বলতেন তাঁর হিসাব ধরে অগ্রসর হলে মহাসাগরের বুকে সন্ধান পাওয়া যাবে নতুন মনুষ্যবসতির।

কিন্তু সেযুগের কোনও মানুষ তাঁর কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজন বোধ

করেনি। পাগলের খেয়াল বলেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে তাচ্ছিল্য করেছে। উৎসাহিত হয়েছেন বেকন।

বেকনের আত্মবিশ্বাস এতটাই জোরালো ছিল যে মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর আর্জি জানিয়ে চিঠি লেখেন ইংলণ্ডের মহামান্য রানীর কাছে।

তাঁর আবেদন ছিল, তাঁর অঙ্কের হিসেব ধরে একটা জাহাজ কেবল সাগরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। তাহলেই পাওয়া যাবে নতুন আলোর সন্ধান, প্রমাণ হবে তাঁর কথার সত্যতা।

দুর্ভাগ্য এই যে, রানী এই মানুষটির আবেদন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না।

অগত্যা খ্রিস্টীয় ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর মহামান্য পোপের দ্বারস্থ হন বেকন। তাঁর অঙ্কের হিসেব যে ভুল নয় এটা অন্তত অনুগ্রহ করে পোপ একবার যাচাই করে দেখুন।

কিন্তু ভ্যাটিকান থেকেও কোনও সাড়া পেলেন না বিজ্ঞানী বেকন।

সত্যের বার্তা নিয়ে এমনি করেই জনে জনে ধর্ণা দিয়েছেন তিনি। সমকালের চিন্তা তাঁর প্রাগ্রসর ভাবনার নাগাল ধরতে পারেনি।

কিন্তু দুশো বছর পরেই প্রথম যে মানুষটি বেকনের অঙ্কের হিসাবের সত্যতা প্রমাণ করলেন তাঁর নাম ক্রিস্টোফার কলম্বাস।

পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে তিনি বেকনের গণনার সূত্র ধরেই আবিষ্কার করলেন নতুন এক মহাদেশ, নতুন এক সভ্যতা। সেই নতুন ভূমিখণ্ডের নামই আমেরিকা।

অন্ধকার যুগে বসেই বেকন শুনিয়েছিলেন এমন সব অদ্ভুত যন্ত্রপাতির কথা যার বাস্তব রূপ আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। বেকন এমন যন্ত্রের আগাম খবর জানিয়েছিলেন যার সাহায্যে বিনা দাঁড়েই সাগরে জাহাজ চালাবে।

এমন উড়ুক্কু আকাশগামী যানের কথাও তিনি বলেছেন যার পিঠে চেপে মানুষ পাখির মতো স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারবে খোলা আকাশে। সেই উড়ুক্কু যানের আকৃতি পর্যন্ত তিনি ছকে দিয়েছিলেন। বর্তমান রেলগাড়ি বা মোটরযানের সম্ভাবনার কথাও তিনি বলেছিলেন।

ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, আটশো বছর আগে নিজের আকিঞ্চিৎকর কুঠুরিতে বসে তিনি উনিশ শতকের অগ্রগতির ছক কষতে পেরেছিলেন। এই কারণেই এ যুগের মানুষ বেকনের নামকরণ করেছেন 'বিজ্ঞানের জগতের আধুনিক মানুষ' বলে।

ইংলণ্ডের সমারসেট অঞ্চলে ইলচেস্টার গ্রামে ১২১৪ খ্রিঃ বিজ্ঞানী রোজার বেকনের জন্ম। বিজ্ঞান ও অঙ্কের বিষয়ে সহজাত প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন

তিনি। তাই দেখা যায় তিনি মাত্র বারো বছর বয়সের মধ্যেই স্কুলের পড়া কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ করেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সেইকালে উচ্চশিক্ষার পাঠ দেওয়া হত প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় দুই পর্বে। এক পর্বে পড়ানো হত অলঙ্কার ব্যাকরণ ও তর্কবিদ্যা। অন্য ভাগে পড়তে হত অঙ্ক, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা। সেই সঙ্গে সঙ্গীত ও বাদ্য। এই সাতটি বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ হত উচ্চতর শিক্ষাপর্ব।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বেকন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ময়ের আলোড়ন তোলেন।

পাশ করে বেরুবার পর এবার কর্মজীবনের পালা। কিন্তু এমন এক বিরল প্রতিভাকে হাতছাড়া করতে চাইলেন না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অক্সফোর্ডেই অধ্যাপনার চাকরিতে নিযুক্ত করা হল বেকনকে।

চাকরিতে ঢুকে এক সোনারখনির সন্ধান পেলেন বেকন। তা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ লাইবেরী। অধ্যাপনার বাইবে সময়টা তাঁর কাটতে লাগল সেই লাইব্রেরীতেই। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের চর্চায় ডুবিয়ে দিলেন নিজেকে।

অলক্ষ্যে বুঝি কেঁপে উঠল মধ্যযুগের সংস্করাচ্ছন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অচলায়তনের ভিত।

সেই সময়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা প্রাচীন গ্রীক চিন্তাবিদদের পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। বেকন গ্রীক পণ্ডিতদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার প্রয়োজন বোধ করলেন।

ল্যাটিন আগেই শেখা ছিল। এবার শিখে নিলেন গ্রীক ও হিব্রু ভাষা। মূল গ্রীক গ্রন্থগুলো পড়ে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর চিন্তায় ভেসে উঠল নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তিনি দেখতে পেলেন এক নতুন যুগের হাতছানি।

কর্মক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বেকনের অধ্যাপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে। সেই সূত্রেই ১২৪৫ খ্রিঃ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেলেন। গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটলের ওপরে বক্তৃতা দিতে হবে তাঁকে।

গতানুগতিক ধারার পক্ষপাতী কোনও কালেই নন বেকন। তাই তাঁর বক্তৃতাও হল ওজস্বিনী—নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ।

প্রাচীন মনীষার আলোকে নতুন পথ উন্মোচনের দিক নির্দেশ পাওয়া গেল তাঁর বক্তৃতাবলীতে।

বেকন বললেন, প্রাচীন মনীষীদের সত্যসন্ধান আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি

না। তাঁদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি অনেক। কিন্তু কেবল তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরও। উন্মোচিত করতে হবে জ্ঞানের নতুন নতুন দিক। প্রাচীনেরা যা বলেছেন তাকে যাচাই বাছাই করতে হবে, তাঁদের কথাই শেষ কথা নয়। প্রজ্ঞার আলোকে নতুন পথের সন্ধান কর।

সারা প্যারিসে বেকনের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্র অধ্যাপক সকলেই পরিতৃপ্ত।

পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা পর্যালোচনা করতে হল বেকনকে। শিক্ষার এক নতুন আবহাওয়া গড়ে উঠল তাঁকে কেন্দ্র করে, ছাত্র শিক্ষকের সহজতর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। চার বছরের আগে নড়তে পারলেন না তিনি এখান থেকে।

তাঁর বক্তৃতাবলী বই আকারে প্রকাশের পর প্যারিস ত্যাগ করে আবার স্বক্ষেত্রে অক্সফোর্ডে ফিরে এলেন বেকন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সংগৃহীত একরাশ দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি।

বিজ্ঞান ভাবনায় ভাবিত বেকন এর পরেই কোন্ এক রহস্যময় কারণে কে জানে সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে অকস্মাৎ বইয়ে দিলেন তাঁর জীবন। চার্চে নাম লেখালেন। সন্ন্যাস নিলেন। ধর্মেকর্মে মজে গেলেন।

সম্ভবতঃ সমাজের ওপর চার্চের প্রভাব লক্ষ্য করেই এই কাণ্ডটি করেছিলেন তিনি। হয়তো ভেবেছিলেন, তাঁর বিজ্ঞান সাধনার সমর্থনে এগিয়ে আসবে চার্চ। তাই দেখা যায় চার্চের চৌহদ্দিতে বসেই তিনি নির্বিকার মগ্নতায় বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেছেন।

খ্রিস্ট ভজনা পেছনে পড়ে রইল। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নিয়েই দিন কাটতে লাগল বেকনের।

কিন্তু ব্যাপারটা ভালভাবে নিতে পারলেন না যাজকরা। প্রতিবাদে তারা লণ্ডভণ্ড করে দিলেন বেকনের নিজস্ব পরীক্ষাগার। তছনছ হয়ে গেল পাণ্ডুলিপির বাশি।

ভজনালয়ের অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করে বেকনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল প্যারিসে চার্চের এক সংশোধনী আখড়ায়। সেখানে সতর্ক যাজকদের কড়া প্রহরায় নিয়মকানুনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে একরকম বন্দী হয়ে রইলেন বেকন।

দুদিনেই এই দমবন্ধ পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠলেন বিজ্ঞানী। মুক্তির আবেদন জানিয়ে তিনি চিঠি লিখলেন ভ্যাটিকানে পোপ চতুর্থ ক্লেমেন্টের কাছে।

চিঠিতে বেকন সকাতরে জানালেন, ভজনালয়ে বই পড়ার সুযোগ নেই, স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেই, এমন

পরিবেশে তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছেন। চার্চের কোনও বিদ্যানিকেতনে তাঁকে পাঠানো হোক, যেখানে তিনি তাঁর বিজ্ঞান ভাবনাকে রূপায়িত করার সুযোগ পাবেন।

চিঠির উত্তরে পোপ যা জানালেন তার একটা অংশ এরকম -- "that you may declare to us through your writing what remedies sum to you fitting for dealing with those matters which your recently intimated to be of such moment, and do this secretly as far as you are able and with as little delay as possible".

বেকনের বিজ্ঞান দৃষ্টিতে ততদিনে ছায়াপাত হয়েছে যুগান্তকারী সব ভাবনা-সম্ভাবনার ছবি। পোপ সেসব জানতে চাইছেন। ফল বিশেষ হবে না জেনেও ক্ষীণ একটা ভরসা মনে নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে পোপকে লিখে পাঠালেন।

বেকন তাঁর ধ্যান-ধারণা সাতটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে রয়েছে প্রাচীন পন্থার সংস্কার ও তার কারণ, দ্বিতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, তৃতীয় ভাষা চর্চা, চতুর্থ অঙ্কের বিষয় বিভাগ, পঞ্চম আলোক বিজ্ঞান, ষষ্ঠ বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বশেষ হল নৈতিকতা।

ধর্মজগতের সর্বাধিকর্তা পোপ। প্রচলিত প্রথার দোর্দণ্ড প্রতাপ রক্ষক তিনি। সেই অচলায়তনে নাড়া দেবার দুঃসাহস প্রকাশ করেছেন বেকন যা সেই যুগে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তবুও বেকনকে নিজগুণে দয়া দেখালেন পোপ। দণ্ডবিধানের পবিবর্তে তিনি কেবল নীরব রইলেন, বেকনের বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনা চিন্তার বিষয়ে কোনও মতামতই জানালেন না।

বেকনের বিজ্ঞান-ভাবনা কিন্তু তেরো শতকের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। উনিশ শতকের সম্ভাবনার আগাম বার্তা যে তিনি ছকে নিয়েছেন বহু আগেই।

পাখির ওড়া দেখে আগামী দিনের এরোপ্লেনের ভাবনা ভেবেছেন তিনি। পাল নামিয়ে জাহাজ চলছে যন্ত্রের সহযোগে, বজ্রের নির্ঘোষ নামিয়ে আনা যায় বারুদ বিস্ফোরণে। কিংবা লেন্সকে শক্তিশালী করে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকায় ব্যবহার করা চলে—এমনি হাজারো সম্ভাবনাময় ভাবনা গিসগিস করত তাঁর মগজে।

ভাবনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না বেকন। পরীক্ষাগারে নিজের ভাবনাকে রূপ দিতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বসে বেকন অঙ্কের সুদূরপ্রসারী বহুমুখী ব্যবহারের গুরুত্বও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

অঙ্ক দিয়ে প্রচলিত দিনপঞ্জীর ভুল সংশোধনের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। কিন্তু সমকালে তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তবে মাত্র তিন শতাব্দী পরেই তাঁর অঙ্কের হিসাবের সাহায্য নিয়েই ইংরাজি ক্যালেণ্ডারের সংস্কার করা হয়েছিল।

মধ্যযুগের আবহাওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল জড়িবুটি তুকতাক—এসবের গণ্ডির মধ্যে। পারদকে সোনা করার পদ্ধতির নামে জন্ম হয়েছিল অপরসায়নের। সোনার লোভে তারই চর্চায় ডুবে থাকতো অপরা-সায়নিকরা।

সেই রসায়নহীন যুগেই বেকন চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য রসায়নের সাধনাকে যথাযথ করার কথা বলে গেছেন। বর্তমানে তো প্রমাণিত সত্য এটা যে প্রাণ-রসায়নের ভিতের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে গোটা চিকিৎসাবিজ্ঞান। কিছু রাসায়নিক যন্ত্রপাতিও তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন।

বারুদ নিয়েও কম নাড়াচাড়া বেকন করেননি। তিনি জানতে পেরেছিলেন বারুদকে শক্ত ধাতব চোঙে ঠেসে বিস্ফোরণ ঘটালে অসম্ভবকে সম্ভব করা চলে। বর্তমানে বোমা বা ডিনামাইটের ব্যবহারে বেকনের কণ্ঠস্বরেরই প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয়।

বেকনের বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রকৃতির রাজ্যের অগণিত রহস্যের মীমাংসার সূত্র খুঁজে বেড়িয়েছে। বৃষ্টির ফোঁটার গায়ে সূর্যের রশ্মি ঠিকরে পড়ে আলোর যে বর্ণ বিচ্ছুরণ ঘটে তাতেই মেঘের গায়ে ভেসে ওঠে রামধনু—আলোকবিজ্ঞানের এই সত্যটিও বেকনের পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানেও নতুন সম্ভাবনার পথ তৈরি হয়েছে বেকনের তেরো শতকের দূরবীন ভাবনাকে রূপায়িত করেই।

গণিতের অঙ্ক কষেই বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছিলেন বেকন। কিন্তু বিশুদ্ধ গণিতের চেয়ে ব্যাবহারিক গণিতের দিকেই ঝোঁক ছিল তাঁর বেশি। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যবহারিক গণিতের সাহায্যেই মানুষের সীমাহীন মঙ্গল সাধন সম্ভব।

ব্যবহারিক জ্যামিতির হাতে কলমে ব্যবহার করে তোলপাড় কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন বেকন সেই ত্রয়োদশ শতকেই। তিনি তৈরি করেছিলেন আলোকবিজ্ঞানের যন্ত্র, শল্য চিকিৎসার যন্ত্র।

বিজ্ঞান যাঁর এমন মজ্জাগত, সেই মানুষই কিনা ঢুকে পড়েছিলেন খ্রিস্ট ভজনার অন্ধকূপে। চেতনায় ত্রয়োদশ শতকের অলক্ষ্য প্রভাবেই হয়তো এমন অঘটন ঘটে থাকবে।

প্যারিসের চার্চের গণ্ডি থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছিলেন বেকন। কিন্তু দুভার্গ্য এই যে চার্চের রোষের তাপ তিনি এড়াতে পারেননি।

যাইহোক, মুক্তির নিশ্বাস নিয়ে একসময় অক্সফোর্ডে নিজের বাড়িতেই ফিরে আসেন তিনি।

বয়সের ভারে ও ব্যর্থতার গ্লানিতে তখন তিনি বিধ্বস্ত। কিন্তু কাজের উদ্দীপনা হারাননি। জীবনের শেষ লগ্নে বিজ্ঞানের এক সুকঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

তখনও পর্যন্ত জ্ঞাত অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যাবতীয় কাজের ফিরিস্তি নিয়ে বিশাল আকারের কোষগ্রন্থ রচনা করলেন। এই গ্রন্থের ভাঁজে ভাঁজে গুঁজে দিলেন সমসাময়িক শিক্ষা ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে নিজের প্রতিবাদী মতামত।

কাল হল সেটাই। বেকনের চিন্তাধারা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল তাঁকে। ১২৭৭ খ্রিঃ বেকন কারাবন্দী হলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর কাটল অন্ধকার কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

যখন মুক্তি পেলেন, তাঁর জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষিত। এরপর বেশিদিন আর বাঁচেননি তিনি।

১২৯২ খ্রিঃ বিদ্রোহী বিজ্ঞান সাধকের জীবনে ছেদ নেমে এল। গ্রেফায়ারের কবরখানায় সমাহিত করা হল তাঁর মরদেহ।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞানের অগ্রপথিকের মর্যাদা নিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন রোজার বেকন।

স্বামী প্রণবানন্দ

ভারতবর্ষের অগণিত সন্ন্যাসী সঙ্ঘের মধ্যে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ একটি বিশিষ্ট নাম। প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে এই সংঘ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ ভারতের বাইরেও পরিব্যাপ্ত। ধর্ম প্রচার, তীর্থ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, জনসেবা, সমাজসল্যাণ, সমাজ সংগঠন, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন, অনগ্রসর উপজাতির কল্যাণ, সংস্কৃতির উন্নয়ন ইত্যাদি বহুমুখী কর্মযজ্ঞের সূচনা ওই সঙ্ঘের মাধ্যমে করেছিলেন শিবকল্প কর্মযোগী আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ।

ব্যক্তিগত মুক্তি বা মোক্ষ লাভ নয়, দেশ সমাজ এবং আর্ত পীড়িত মানুষের মুক্তিই ছিল এই যুগন্ধর মহাপুরুষের একমাত্র কাম্য।

এই আন্তর প্রেরণাতেই তিনি একদল সর্বত্যাগী ভক্তকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘ।

আর্ত মানবের কল্যাণ সাধনের জন্যই হয়েছিল স্বামী প্রণবানন্দের আবির্ভাব। আর এই উদ্দেশ্যেই তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি।

প্রণবানন্দ ছিলেন আজন্ম সন্ন্যাসী। আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে তিনি ছিলেন আজন্ম সাধক। আজন্ম নেতা।

দেহ ও মনের শক্তিতে তিনি বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অদম্য ও দৃঢ়চেতা। তাঁর বয়স যখন মাত্র পনেরো ষোল সেই সময় থেকেই রাতের পর রাত অতিবাহিত করেছেন নিদ্রাহীন অবস্থায় যোগ সাধনায়। তাই সেই সময় থেকেই অভিহিত হতে থাকেন সাধু বা ব্রহ্মচারী নামে। ব্রহ্মচারী বিনোদ নামেই স্বগ্রামে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি।

অবিভক্ত বঙ্গের পূর্ববঙ্গের বর্তমান নাম বাংলাদেশ। ভারতের প্রতিবেশী এক নতুন রাষ্ট্র। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ভুঁইয়া পরিবারে ব্রহ্মচারী বিনোদের জন্ম। সময়টা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ ১৮৯৬ খ্রিঃ ২৯শে জানুয়ারী। পিতা বিষ্ণুচরণ ভুঁইয়া ও মাতা সারদা দেবীর তিনি ছিলেন তৃতীয় পুত্রসন্তান।

দেবদ্বিজে নিষ্ঠা ভক্তি ও আর্ত পীড়িতের সেবায় ভুঁইয়া পরিবার দূর অঞ্চলেও সুবিদিত ছিল। পরিবারের কুলদেবতা নীলরুদ্র। বিষ্ণুচরণ ও সারদা বিগ্রহের নিত্য সেবাপূজায় ছিলেন সমর্পিত প্রাণ।

সারদা একদিন স্বপ্নে জানতে পারেন কুলদেবতা নীলরুদ্র শিব তাঁর গর্ভে পুত্ররূপে আবির্ভূত হচ্ছেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই শুভ স্বপ্নের কথা তিনি স্বামীকে জানান।

তারপর চলতে থাকে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সাগ্রহ প্রতীক্ষা আর কুলদেবতার স্মরণ মনন।

যথাকালে মাঘী পূর্ণিমার গোধূলিলগ্নে পরিবারের ঢেঁকিশালে ভূমিষ্ঠ হন বিনোদ। দিনটি ছিল বুধবার। বুধবারে জন্ম বলে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল বুধ বা বুধা। অন্নপ্রাশনের সময় নতুন নামকরণ হয় বিনোদ।

সেদিন সেই নবজাতককে দেখে ঘুণাক্ষরেও কি কেউ বুঝতে পেরেছিলেন বুধার বিনোদ নামও একদিন পরিবর্তন হবে, দেশে ও বিদেশে বুধা বা বিনোদ নয়, স্বামী প্রণবানন্দ নামেই তিনি একদিন মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রণাম লাভ করবেন।

ছেলেবেলা থেকেই বালক বিনোদের স্বভাবের কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিবারের ও পাড়াপ্রতিবেশী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ বালকের মতো আমোদপ্রমোদে মন বসত না তাঁর। অস্বাভাবিক এক গাম্ভীর্য ও চিন্তাশীলতা সর্বদা তাঁর মুখভাবে ফুটে থাকত। আকাশ-ভরা চিন্তাভাবনায় যেন ঘিরে ধরেছে বালককে।

আপনজনের ভাবনা তাঁকে নিয়ে। এত ধৈর্য স্থৈর্য, এত শান্ত, উদাসীন আনমনা ভাব কেন বালকের? স্বভাবে নেই কোন বালকসুলভ চঞ্চলতা।

বালকের আনন্দঘন মূর্তি ও সুন্দর সুঠাম চেহারা দেখে পাড়াপ্রতিবেশী সকলেরই চোখ জুড়ায়, সকলেরই মন কেড়ে নেয় বিনোদ। আবার ওই বয়স থেকেই বিনোদ যেন শূচিতার প্রতিমূর্তি।

বিন্দুমাত্র অশুচিতা ও অপবিত্রতা সহ্য হত না তার। বালক যেন তার স্বভাবশতই জেনে ফেলেন কে ভাল কে মন্দ।

ভাল লোকের কাছে যেতে, আদর পেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা আপত্তি হয় না তার। কিন্তু দুষ্ট অনাচারীর সংস্পর্শ আদৌ সহ্য করতে পারেন না, পছন্দও করেন না।

অবাঞ্ছিত কেউ কাছে এলেই দৌড়ে পালিয়ে যান কিংবা কান্না জুড়ে দেন পালাবার জন্য।

সবদিক থেকেই স্বতন্ত্র বালক বিনোদ। অতটুকু বয়স থেকেই বেছে নিয়েছেন আমিষ আহার। কেবল আলুসিদ্ধ আর ভাত খেয়েই পরম তৃপ্তি লাভ করেন। ঘি-দুধও যেন না খেতে পারলেই স্বস্তি পান। কিন্তু অভিভাবকদের তাড়নায় সব সময়ই তা এড়াতে পারেন না।

বালকের মধ্যে স্বভাবযোগীর লক্ষণ দেখতে পেয়ে গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলেই বিনোদকে ভালবাসে, মনে মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। নিজে থেকেই তারা তাকে সম্বোধন করতে শুরু করে ব্রহ্মচারী সাধু নামে।

যথাকালে বিনোদের লেখাপড়া আরম্ভ হয় বাজিতপুরের প্রিন্স এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলে।

তিনি স্কুলে যান বটে, লেখাপড়ায় কিন্তু তেমন মন বসে না। পাঠ্যপুঁথির পাতার বাইরে ঈশ্বরীয় বিষয়েই যেন তার আগ্রহ বেশি।

জগৎ সংসারের প্রতিটি বিষয়েই তার মনে সদা প্রশ্ন তোলপাড় করে—কার সৃষ্টি এই বিশ্বসংসার. গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্র সূর্য এসব। লোকে যে এত দেবদেবীর পূজা করে এরাই কি সৃষ্টি করেছে সবকিছু? নাকি তাদের বাইরেও এমন কেউ আছেন যিনি জগৎ সৃষ্টি ও প্রতিপালন করে চলেছেন সকলের অলক্ষ্যে?

দেবদেবীরাই বা কারা? তেমন কাউকে পেলে তিনি দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে উত্তর জানতে চাইবেন।

এমন সব ভাবনাচিন্তায় যার মাথা বোঝাই তার লেখাপড়া চলে কি করে? বিনোদের মন কেবলই চায় নির্জনতা, জনকোলাহলের বাইরের নিভৃত পরিবেশ, যেখানে তিনি একান্তে বসে নিঃসীম আকাশের বুকে দৃষ্টি প্রসারিত করে মনের ডানা উন্মুক্ত করতে পারবেন।

এই ভাবনাচিন্তার পাশাপাশি নিজের পরিবেশের পরিচিত অপরিচিত মানুষদের অবস্থার কথাও তাঁর মনের আয়নায় প্রতিফলিত হতে থাকে। দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, সমাজের মানুষের বিপুল সমস্যা তাকে ভাবিত করে তোলে।

কী এক দুর্নিবার যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হয় বিনোদের মন। ক্রমেই তাঁর মন যেন ঘর ছেড়ে বাইরের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার কথা তার মাথায় ঘুরতে থাকে।

তিনি বইতে পড়েছেন, বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা অসহায়তা দেখে রাজ্যপাট স্ত্রী সন্তান আপনজন ছেড়ে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। দীর্ঘ সাধনার পর মানুষের মুক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন।

নিজের অজ্ঞাতেই দিনে দিনে বিনোদের মন সন্ন্যাস আর সাধনার দিকে ঝুঁকতে থাকে।

ছেলেবেলা থেকেই বিনোদ স্বভাবযোগী। কোনও এক বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

এই তন্ময়তা তাঁকে সবকিছু ভুলিয়ে রাখে। বেলা গড়িয়ে যায়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুল হয়ে যায়।

কতই বা বয়স তখন—বছর চোদ্দ পনেরো। এর মধ্যেই বিনোদের নির্জনে ধ্যানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। বিনিদ্র রাত অতিবাহিত হতে থাকে গভীর ভাব-তন্ময়তায়।

ঘোর অমাবস্যার রাত্রে গ্রামের জনহীন শ্মশানে কিংবা গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী বটগাছের নিচে তিনি ধ্যানে ডুবে থাকেন।

প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদে সমৃদ্ধ বাজিতপুর গ্রাম এক আধ্যাত্মিক চেতনার পবিত্র লীলাভূমি। গ্রামের একদিকে কুমার নদের খাল। সেই খাল দিয়ে দিনে রাতে যাতায়াত করে গ্রামগঞ্জের অসংখ্য ছোটবড় নৌকা।

খালের অপর পাড়ে জনমানবহীন এক দুর্গম অরণ্য অঞ্চল। অরণ্য ঘনীভূত হয়েছে বড় বড় শ্যাওড়া গাছ আর বেতের ঝোপ জঙ্গলে। বড় বড় গাছের

ডালে পাতায় এমনই বাঁধুনি যে দিনের বেলাতেও তলায় সব জায়গায় সূর্যের আলো পৌঁছায় না।

বাজিতপুর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনদুর্গা। খাল পাড়ের এই অরণ্যে একটি শ্যাওড়া গাছের নিচে বনদুর্গার বেদী। পালা-পার্বণে বা বিশেষ মানসিক আদায়ের জন্য মাঝে মধ্যে বাজিতপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন খাল পেরিয়ে এখানে আসে বনদুর্গার পুজো দিতে। আসে তারা দল বেঁধে। দিনে দিনে এসে দিনে দিনেই ফিরে যায়। সন্ধ্যার পর কেউই এই অঞ্চলে থাকতে সাহস পায় না।

সন্ধ্যার পর গোটা অরণ্যভূমি এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে অতি বড় সাহসীও আতঙ্কিত না হয়ে পারে না।

পার্শ্ববর্তী শ্মশান ক্ষেত্রটিও নানারকম গাছপালায় আচ্ছাদিত। গোটা অঞ্চলে রাতের বেলা জেগে থাকে সেখানে নিশাচর পাখির দল আর শিয়াল। ভয়ঙ্কর এই শ্মশানভূমি দিনের বেলাতেও মানুষ সভয়ে এড়িয়ে চলে।

কিশোর বিনোদ কিন্তু অকুতোভয়। সন্ধ্যার অন্ধকারের আড়ালে তিনি সেই নির্জন আতঙ্কভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হন। গিয়ে আসন নেন কোনও শ্যাওড়া গাছের নিচে।

সেই অন্ধকার বনভূমিতে তিনি তন্ময় হয়ে যান ধ্যানে। নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মতো স্থির অচঞ্চল মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করে তার কলেবর।

প্রথম প্রথম বাড়ির কাছেই একটা ঘরে বসতেন। সেখানেই ধ্যানের শুরু। এরপরে শ্মশান আর এই অরণ্য হয়েছে তাঁর ধ্যানের আসন।

জ্যোৎস্নালোকিত রাতে যখন খালের বুক বেয়ে নৌকো যেত সেই সময় ছায়াান্ধকার অরণ্যে ব্রহ্মচারী বিনোদের প্রতি কারো কারো নজর পড়ে যেত। ভয়ে আতঙ্কে তারা নানা কথা বলাবলি করত। দ্রুত অতিক্রম করে যেত অরণ্য অঞ্চল।

কখনও বা কেউ এতই আতঙ্কিত হত যে কোলাহল আর হৈ হট্টগোলে বিনোদের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যেত। তবে কিছুদিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করে নিয়েছিলেন বিনোদ।

নৌকোর মানুষ যাতে ভয় পেয়ে কোলাহল জুড়ে না দেয়, তাঁর ধ্যানে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেইজন্য তিনি তাঁর ছোটভাই ভোলাকে ত্রিশূল হাতে খালের পাড়ে পাহারায় নিযুক্ত করে রাখেন।

বিনোদের এই নিভৃত গোপন সাধনা চলতো লোকচক্ষুর অগোচরে। জানতেন কেবল একজন। তিনি হলেন তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য। তিনি প্রাণের চাইতেও ভালবাসেন বিনোদকে।

১৯১৩ খ্রিঃ পুজোর ছুটিতে তিনিই বিনোদকে নিয়ে উপস্থিত হন উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে। সেদিন ছিল একাদশী তিথি। মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়লেন ভাবীকালের আর এক মহাযোগী।

তরুণ সাধকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি সহাস্যে বলে ওঠেন, তোমার সাধনা তো হয়েই আছে।

শুভযোগে বিনোদ মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষা লাভ করলেন।

বাজিতপুরে ফিরে এসে শুরু হয় বিনোদের দুশ্চর তপস্যা। শেওড়া গাছের অরণ্যে এবং শ্মশানে যেখানে সূত্রপাত ঘটেছিল বালক বিনোদের ধ্যান-তপস্যার, গুরুর কৃপায় সেখানেই ঘটল তাঁর পরম সিদ্ধি। তন্ত্রমতে তিনি হলেন শিবত্বে অধিষ্ঠিত।

গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষা লাভ করার পর তৃতীয় বছরে চূড়ান্ত যোগসিদ্ধি লাভ হয় তাঁর।

সাধনায় সিদ্ধযোগী বিনোদের কণ্ঠে এবার ঘোষিত হল মহাবাণী—এ যুগ মহাজাগরণের যুগ। এ যুগ মহামিলনের যুগ, মহা সমন্বয়ের যুগ। এ যুগ মহামুক্তির যুগ।

গৌতম বুদ্ধের আদর্শে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হিন্দুজাতির মহাসমন্বয়ে এক মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখতেন বিনোদ। এবার দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। অস্পৃশ্যতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

গোটা বাংলা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে তখন দুর্বার স্বাধীনতা আন্দোলন। ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর বিপ্লবী কেন্দ্রের সংগঠক বিপ্লবী পূর্ণদাস বাজিতপুরে এসে যোগাযোগ করলেন প্রণবানন্দের সঙ্গে। তারপর একে একে বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা থেকেও বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী তরুণরা আসতে থাকে।

ব্রহ্মচারী বিনোদ এই বিপ্লবীদের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন আধ্যাত্মিকতার মহামন্ত্র। তিনি বলতেন, বিপ্লবী যুবকেরা ছিল এক একটি যেন দেবশিশু। পরবর্তীকালে দেবশিশু এই বিপ্লবীরাই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ব্রহ্মচারী বিনোদের কাছে বিপ্লবী যুবকদের যাতায়াতের খবর ব্রিটিশ পুলিশের সন্দেহ উদ্রেক করল। তাদের নজর পড়ল তাঁর ওপর। ফলে অচিরেই ১৯১৪ খ্রিঃ ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অসামীরূপে গ্রেপ্তার হলেন ব্রহ্মচারী বিনোদ।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রমাণের অভাবে তিনি ছাড়া পেয়ে যান।

তারপর বিনোদ ১৯৪২ খ্রিঃ প্রয়াগ কুম্ভে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন গোবিন্দানন্দ গিরির কাছে। তাঁর নতুন নামকরণ হল স্বামী প্রণবানন্দ। এই বছরেই মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে তিনি তাঁর প্রথম সারির সাতজন শিষ্যকে নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন।

ভারতের তীর্থসংস্কার এবং সেই সঙ্গে তীর্থযাত্রীর নিরাপত্তা বিধানে স্বামী প্রণবানন্দের রয়েছে এক ঐতিহাসিক অবদান।

একবার গোরক্ষপুর যাওয়ার পথে তিনি পিতৃতীর্থ গয়ায় নেমেছিলেন স্বর্গত পিতার শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু গয়াধামে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হতে হল তাঁকে।

তীর্থপাণ্ডার ছড়িদাররা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করল টানাহ্যাঁচড়া। এদের এই কুৎসিত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ না করে পারলেন না প্রণবানন্দ।

ক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িদাররা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তার ওপর আক্রমণ চালাবার উদ্যোগ করলে প্রণবানন্দ দুষ্ট দমনে ধারণ করলেন রুদ্রমূর্তি। তাঁর সেই ভীমরুদ্র মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল ছড়িদাররা।

এই প্রসঙ্গে তিনি পরে বলেছেন, "সেইদিন আমার সঙ্কল্প জাগল, গয়াতীর্থের সংস্কার কবব।" তাঁর এই সঙ্কল্প সাধিত হল ১৯৪২ খ্রিঃ গয়াতে মহাসিদ্ধ যোগাসন স্থাপনের পর। আজ গয়াযাত্রী হিন্দুদের কাছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

কেবলমাত্র গয়া নয়, একে একে সমস্ত হিন্দু তীর্থগুলি সংস্কারের কাজে হাত লাগালেন তিনি। দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু মিলন মন্দির। সেই সঙ্গে ভারতের দিকে দিকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন চারণদল।

জাতি গঠনের মহান কর্মযজ্ঞ শুরু হয় দেশে এবং বিদেশে। কালক্রমে প্রণবানন্দের প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছে সেবাব্রতের মহান ইতিহাস। এই সেবাব্রত পরিব্যাপ্ত দেশে দেশান্তরে।

মহাযোগী প্রণবানন্দ মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ১৯৪১ খ্রিঃ ৮ই জানুয়ারি কলকাতায় মহাসমাধিতে লীন হয়ে যান।

প্রতিষ্ঠাকালে আচার্য প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ঘোষিত আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

* ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠন, বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য সখ্য মিলন ও সহযোগিতা স্থাপন।

* প্রথমে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে মিলন স্থাপনপূর্বক এক সুদৃঢ় হিন্দু সংহতি সংগঠন, তৎপর সেই সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দু সমাজের সহিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলন সাধন।

* হিন্দু জনসাধারণ যাহাতে ধর্মানুষ্ঠান নীতি, সদাচার, ধর্মাদর্শ প্রভৃতি ভুলিয়া দুর্নীতিপরায়ণ ও উশৃঙ্খল হইয়া না উঠে তার জন্য গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত প্রচারক পাঠাইয়া সকলকে হিন্দু ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, সাধনা ও আচরণ সম্পর্কে সজাগ সচেতন রাখা।

* প্রত্যেক হিন্দু যাহাতে প্রত্যহ কোন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিতভাবে ভগবদুপাসনা, পূজারাধনা করে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা রাখা।

* বিপন্ন হিন্দুর ধর্ম, মান, ইজ্জত, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা।

* অসহায় হিন্দু জনসাধারণের উপরে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার।

* স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাহারো সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া (সর্বপ্রকার আঘাত, আক্রমণ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন প্রতিরোধপূর্বক) সংখ্যালঘু দুর্বল হিন্দু জনসাধারণের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

* প্রতি গ্রামে গ্রামরক্ষীদল গঠন করিয়া পল্লীবাসী হিন্দু জনসাধারণকে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়া নিরাপদে রাখা।

* দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ সমূহ সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা।

* অসহায়া বিপন্না নারীকে নিরাপদে রাখা ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ হইতে রক্ষা করা।

* কোথাও কোনও নারী যাহাতে কোন দুর্বৃত্ত কর্তৃক লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা বা অপর্হিতা হইতে না পারে তৎপ্রাতি সুতীব্র দৃষ্টি রাখা।

* বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু বিধবা যাহাতে কঠোর নীতি নিয়ম, সংযম ও সদাচার অনুসরণ করিয়া ধর্মাদর্শে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে প্রচারকার্য দ্বারা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যবস্থা।

* নানা প্রকার অনাচার ও সামাজিক কুসংস্কার দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে যে ঈর্ষা-দ্বেষ, ভেদ-বিবাদ ও আত্মকলহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করা।

* যে কোনও স্থানে যে কোনও একজন হিন্দুর গায়ে আঘাত লাগিলে সেই আঘাতের বেদনা যাহাতে সমগ্র হিন্দু সমাজ অনুভব করিতে পারে, মিলন মন্দির আন্দোলনের ভিতর দিয়া হিন্দু জনসাধারণের ভিতর এমন এক সম্বন্ধ ও সংযোগসূত্র স্থাপনপূর্বক সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগ্রত করা।

* সঙ্ঘ মিলন মন্দিরের মধ্য দিয়া সমগ্র পল্লীবাসীকে এমনভাবে গ্রথিত করিতে চায় যাহাতে সুদূর পল্লীগ্রামের একজন মাত্র হিন্দুও সমাজের সমবেত শক্তি তাহার পশ্চাতে সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান এইরূপ অনুভব করিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারে।

* যদি কোনও স্থানে কখনও জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় তবে সমস্ত হিন্দু জনসাধারণ মিলন কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া সম্মিলিতভাবে তাহার সমাধান চেষ্টা করিবে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে মিলন মন্দিরের সহায়তা গ্রহণ করিবে।

সঙ্ঘবাণীরূপে প্রচারিত আচার্য প্রণবানন্দের নির্দেশ ঃ

লক্ষ্য কি?

—মহামুক্তি, আত্মোপলব্ধি।

মহাপাপ কি?

—দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা।

ধর্ম কি?

—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য।

মহাশক্তি কি?

—ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা।

মহামৃত্যু কি?

—আত্মবিস্মৃতি।

প্রকৃত জীবন কি?

—আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি, আত্মানুভূতি।

মহাপুণ্য কি?

—বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব।

মহাসম্বল কি?

—আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্যদা।

মহাশত্রু কি?

—আলস্য, নিদ্রা, জড়তা, রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ।

এ যুগের আকাঙ্ক্ষিত কি?

—মহাজাগরণ, মহাসমন্বয়, মহামিলন, মহামুক্তি।

গৃহীভক্ত ও সাধক শিষ্য ভক্তদের প্রতি স্বামী প্রণবানন্দের উপদেশ ঃ

* রিপুদমন ও ইন্দ্রিয় সংযমই ধর্মজীবনের ভিত্তি। এর ওপর দৃষ্টি না দিয়ে যত যোগ-যাগ-তপস্যা করা যাক না কেন, তা সবই ভস্মে ঘৃতাহুতি। বীর সাধককে অবশ্যই সর্বদা সংগ্রামশীল হতে হবে। সংগ্রামহীন যে নিরিবিলি জীবন, তাই হচ্ছে সাধকের পতনের কারণ। সেই আত্মসন্তোষ ও আরাম-প্রিয়তার ছিদ্রপথে সব শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

* পতি-পত্নীর পৃথক গুরু হলে তাদের দাম্পত্য জীবনে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর প্রথম গুরু। প্রথমতঃ তাহাদের নিয়ে একসাথে বসিয়া সেই সম্বন্ধ ঠিক করে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে স্বামীর কানে যে গুরুমন্ত্র দেওয়া হবে তাই সে তার স্ত্রীর কানে দেবে। যে গুরু স্বামী স্ত্রীর এই পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ ঠিক না করে দীক্ষা দিতে অগ্রসর হয়, দীক্ষার নামে পারিবারিক জীবনে সে আনে নিদারুণ অশান্তি বিশৃঙ্খলা। মোটের ওপর গার্হস্থ্য আশ্রমের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে পতি-পত্নী উভয়কে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের উভয়ের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা। ...

* এতকাল ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সংযম ও ব্রহ্মচর্যের আদর্শের প্রচারে প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এখন হতে গৃহীদের পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হবে। হিন্দুর গার্হস্থ্য আশ্রম আজ নানভাবে কলুষিত হয়েছে। এমন সংসার ও পরিবার অতি বিরল যেখানে পতি-পত্নীর, পিতা-পুত্রের, ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় মধুর বা স্নেহ-প্রীতিভরা আছে। পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি ও প্রেম-প্রীতির ওপর নির্ভর করে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নতি অভ্যুদয়। যত লোক আমার কাছে আসছে, তাদের প্রায় সকলের মুখেই অভিযোগ, তাদের পারিবারিক জীবনে নেই কোনও ঐক্য, সখ্য, প্রেম-প্রীতি ও সুখ-শান্তি। সুতরাং এখন হতে গার্হস্থ্য আশ্রমের পুনঃ-সংস্কারের জন্য নূতন আন্দোলন আরম্ভ করা হবে।

* প্রকৃত ধর্ম বোঝে কয়জন? আর সত্যিকার জ্ঞান বা ধর্মপিপাসা কয়জনের মধ্যেই বা আছে? এক জায়গায় বেশিদিন থাকলে কি লোকজনের অধিক উপকার হবে? আমার প্রচার রহস্য তারা কতটুকু কী বোঝে? আমি চাই—এমনিভাবে দেশের মধ্যে একটা ধর্মভাবের প্রচণ্ড অনুকূল আবহাওয়ার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে। মানুষের ভিতর আকুলতা ব্যাকুলতা যতই বেড়ে যাবে, ততই তারা সত্যকার ধর্ম বা জ্ঞান লাভের জন্য উৎসাহী ও আগ্রহশীল হবে। আমার সময়ও নির্দিষ্ট, এ জন্য একস্থানে বেশিদিন থাকা আমার নিয়ম-নীতি বিরুদ্ধ। যা করা হচ্ছে এর দ্বারাই লোকের অশেষ কল্যাণ হবে।

হরিচাঁদ ঠাকুর

জগতের ধর্মগুরুদের ইতিহাস থেকে জানা যায়, সংসারতাপে জর্জরিত নিপীড়িত, নির্যাতিত, সাধারণ মানুষের আর্তি যখন গগনভেদী হয়ে ওঠে, তখনই তাঁরা আবির্ভূত হন আশ্বাস, নির্ভরতা ও শান্তি মৈত্রীর অমৃতবাণী নিয়ে।

সমাজের নীতি-শৃঙ্খলা যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, মানবতা, প্রীতিমমত্ব হয় দলিত মথিত, দম্ভ ও আস্ফালন সৃষ্টিকর্তার আকাশ বিদীর্ণ করে দিতে শুরু করে, সবলের প্রমত্ততায় চাপা পড়ে যায় দুর্বলের অসহায় আর্তনাদ, সেই সময় বুঝি দুলে ওঠে বিধাতা পুরুষের আসন।

প্রেম ভালবাসা ও অহিংসার অমৃতবাণী দিয়ে তিনি তখন প্রেরণ করেন এমন কাউকে যিনি এসে চূর্ণ করেন বলদর্পী অত্যাচারীর অহংকার, পদানত উৎপীড়িতের ভগ্ন হতাশাক্লীষ্ট বুকে প্রদান করেন বল ভরসা ও প্রেরণা। বিপর্যস্ত বিশৃঙ্খল সমাজে পুনর্জাগরিত হয় শৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতির ধারাবাহিকতা।

যুগের ক্রান্তিলগ্নে এ ভাবেই আমরা আবির্ভূত হতে দেখি এক একজন মহামানবকে।

সৃষ্টিকর্তার বাজ্যে সকলই নিয়মের অধীন। সৃষ্টিকর্তা নিজেও নিজেরই সৃষ্ট শৃঙ্খলার অধীন। এই নিয়মনিষ্ঠ শৃঙ্খলা প্রকৃতিরাজ্যের অণুতে পরমাণুতে।

মানবজীবন এবং মানুষের সমাজও একই শৃঙ্খলাবন্ধনে অবাদ্ধ। এই শৃঙ্খলার মূলসূত্র মানবপ্রেম। মানুষে মানুষে পবস্পর আত্মিক বন্ধনের মধ্যেই গ্রথিত থাকে সৃষ্টিকর্তার অমেয় আশিস। যা উজ্জীবিত উদ্দীপিত করে সমাজ রাষ্ট্র সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে।

পারস্পবিক প্রীতি শিথিল হয়ে পড়লে কিংবা কোনও কারণে বিপর্যস্ত হলে টলে ওঠে গোটা সভ্যতা—রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এসে দাঁড়ায় ধ্বংসের মুখোমুখি।

মূলসূত্র মানবমৈত্রীবন্ধন। আর সেই সূত্র বিধৃত যিনি জীবসৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। অবিশ্বাসীর দম্ভ-আস্ফালনই ছিন্ন করে যত শৃঙ্খলা বন্ধন। ডেকে আনে অমঙ্গল ও অশুভকে।

বিপর্যস্ত শৃঙ্খলা তথা দলিত মানবমৈত্রীবন্ধন সংস্থাপিত করবার জন্যই প্রয়োজন হয় মানবপ্রেমী মহামানবের।

তাঁরা এসে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, পরমেশ্বরের অমৃতবাণী। ভক্তি বিশ্বাস ও সরলতায় বিধৃত ও পরিবর্ধিত তাঁদের জীবনধারা আলোকিত করে তোলে অবিশ্বাসী, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষের অন্তরলোক।

মানুষে মানুষে আবার তৈরি হয় মৈত্রীবন্ধন প্রেমপ্রীতির শৃঙ্খল। দূরীভূত হয়

সমাজের যত অনাচার অত্যাচার উৎপীড়ন। প্রশমিত হয় নিপীড়িত মানুষের হুতাশ্বাস। ধর্মের নামে অর্ধমের আস্ফালন পরিশুদ্ধ হয়ে আবার মানুষের পৃথিবী হয়ে ওঠে বাসযোগ্য।

প্রেমবন্ধনই শ্রেষ্ঠ বন্ধন। সে প্রেম ঈশ্বরপ্রেম। ঈশ্বরপ্রেমই জীবপ্রেমে সম্প্রসারিত। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই অণু রেণু হয়ে মিশে থাকেন। তাই তো দেখা যায় যুগে যুগে ঈশ্বরের বার্তাবাহী হয়ে যাঁরা আসেন, মানুষকে আহ্বান করে তাঁরা বলেন, ভালবাসো। আত্মঅহংকার দূরে সরিয়ে সরল হৃদয়ে একবার বল, জীব হয়ে তুমিই রয়েছো আমাদের পাশে পাশে, অহৈতুকী কৃপায় সুযোগ করে দিয়েছো তোমাকে সেবা করার, তোমাকে জানবার, তুমিই আমাকে তোমার ভালবাসার উপযুক্ত করে তোল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ। ভারতের বুকে ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে ধর্মোম্মাদের দম্ভ ও আস্ফালন। অপরিসীম ঘৃণা ও অবহেলা মানুষে মানুষে রচনা করেছে বিভেদ ও বিসংবাদ। ধর্ম আবদ্ধ হয়েছে ধর্মব্যবসায়ীদের অতি যত্নে রচিত বিগ্রহ ও প্রতিষ্ঠানে। মানবতা, নীতি ও মূল্যবোধ দলিতমথিত। ব্রাহ্মণ্যবাদের ব্যবচ্ছেদে সমাজে রচিত হয়েছে জাতিভেদের চূড়ান্ত ব্যবস্থা।

ধর্মের ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণ ও শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও অবজ্ঞা সঞ্চারিত হয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দলিত অশিক্ষিত, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ মানুষের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে দেবভূমি ভারতের আকাশবাতাস।

যুগজীবনের এই সংকট লগ্নে মানবপ্রেমী সাধক গুরু নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ আবির্ভূত হয়ে শোনালেন মানবতার জয়গান। ঘোষণা করলেন, ঈশ্বরের রাজ্যে সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। মানুষে মানুষে যারা বিভেদ রচনা করে তারা ঈশ্বরের বিরোধী. মানবতার শত্রু। সমাজ ও মানুষের বৈরী। পুঁথিতে ধর্মস্থানে ভগবান আবদ্ধ হয়ে নেই। তিনি আপন মহিমায় ছড়িয়ে রয়েছেন জীবনরূপে জীবমাত্রেরই মধ্যে।

জীবে প্রেমই ঈশ্বর প্রেম। জীবসেবাই ভগবদারাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ঈশ্বরের রাজ্যে ঘৃণার বিদ্বেষ বিভেদের স্থান নেই।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে এই বার্তা ঘোষণা করলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। আচণ্ডালে ঈশ্বরপ্রেম বিতরণ করে বুকে টেনে নিলেন জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে।

প্রচার করলেন বৈষ্ণবধর্ম। অধার্মিক অজ্ঞান অন্ত্যজ আর জাত্যাভিমানী শিক্ষাভিমানী ধর্মাভিমানী গ্রথিত হল এক প্রেম-বন্ধনে। প্রেম ও প্রীতির

জয়গানে মুখর হয়ে উঠল দিগ্বিদিক। ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল বৈষ্ণবীয় ভাবধারা।

প্রাচীন বঙ্গদেশের ফরিদপুর জেলার সফলডাঙা গ্রামে হরিভক্তিপরায়ণ পরম বৈষ্ণব যশোমন্ত ঠাকুরের বাস। হরিনামগানে আর কীর্তনে গৃহ তার নিত্যবৃন্দাবন।

স্বামীঅনুগতপ্রাণা স্ত্রী অন্নপূর্ণা দুহাত দিয়ে স্বয়ং অন্নপূর্ণার মতোই সংসার আগলে রাখেন। বিষয়কর্মের আঁচ যাতে স্বামীর হরি আরাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টি। সকাল সন্ধ্যায় নিত্য ভোগারতি সময়ে তিনি স্বামীর সহযোগিনী।

সফলডাঙা গ্রামের ঠাকুর বাড়ির হরিভক্তির ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামদাস ঠাকুরের সময় থেকেই সূত্রপাত। রামদাস মিথিলা থেকে বাংলায় রাঢ় ভূমিতে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন।

তাঁর পুত্র চন্দ্রমোহন শূদ্রকন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করে সমাজে পতিত হয়েছিলেন। সেই থেকে অন্ত্যজ শূদ্রসমাজে প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিয়ে জীবনধারা প্রবাহিত হয়েছে তাঁর।

রাঢ়ভূমি ত্যাগ করে চন্দ্রমোহন সপরিবারে চলে আসেন পূর্ববঙ্গের পাথরঘাটায়। পরে ফরিদপুরে সফল ডাঙায়। তাঁরই উত্তরপুরুষ যশোমন্ত।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে পতিত হলেও ব্রাহ্মণ্য সদাচার নিষ্ঠা ও দেবসেবাপূজার বিঘ্ন এই বংশে কখনো ঘটেনি।

বাড়িতে বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহের সেবাপূজাকে কেন্দ্র করেই সংসারযাত্রা আবর্তিত।

ঠাকুরবংশের সংসার যেন ভক্ত ভগবানের সংসার। বিশ্বাস ভক্তি আর নিষ্ঠা নির্ভরতা এই বংশের শ্রেষ্ঠ বিত্ত সম্পদ।

পূর্বপুরুষ রামদাসের সার্থক উত্তরসূরী যশোমন্ত। ভক্তপরিবারের ঐতিহ্যের এক পরিপূর্ণ বিকাশ তার মধ্যে পরিলক্ষিত হত। দীর্ঘ গৌরবর্ণের সদানন্দময় পুরুষ, সর্বভূতে সমজ্ঞান তাঁর সহজাত। ত্যাগ ও বৈরাগ্য স্বভাবে প্রকৃতিতে ওতপ্রোত।

গৃহলক্ষ্মী অন্নপূর্ণা তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। প্রতিকাজে প্রতিক্ষেত্রে স্বামীভক্তি ঈশ্বরনির্ভরতা তাঁর জীবনের অলঙ্কার।

যশোমন্ত অন্নপূর্ণার পাঁচ সন্তান। কৃষ্ণদাস, হরিচাঁদ, বৈষ্ণবদাস, গৌরদাস ও স্বরূপদাস।

এই পাঁচ পুত্রের দ্বিতীয় হরিচাঁদের জন্মের পূর্বে অন্নপূর্ণা একরাত্রে স্বপ্ন

দেখেন কুলদেবতা বাসুদেব তাঁকে বলছেন, তোমার গর্ভে এবারে আমি পুত্ররূপে জন্ম নেব।

স্বপ্নবৃত্তান্ত জানতে পেরে ভক্ত যশোমন্ত আনন্দে আপ্লুত হয়ে বারবার কুলদেবতা বাসুদেবের শ্রীচরণে প্রণাম জানান।

বাংলা ১২১৮ সনের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে বারুণী দিনে পিতা ও মাতার অধীর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভূমিষ্ঠ হন হরিচাঁদ। সাধক পরিবারে জন্মগত হরিভক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এই শিশু।

শৈশব থেকেই হরিচাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামের অন্য বালকেরা যখন খেলাধুলোয় মগ্ন থাকে তখন হরিচাঁদ সর্ব অঙ্গে ফোঁটা তিলক এঁকে বৈরাগী সেজে আপন মনে হরিকীর্তনে বিভোর হয়ে থাকেন।

বাড়ির প্রান্তে নিজহাতে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করেছেন। সেখানে যখন তখন আনন্দে করতালি দিয়ে প্রদক্ষিণ করেন।

বাড়িতে কোন বৈষ্ণব অতিথি এলে সবার আগে এগিয়ে গিয়ে পিতামাতার সঙ্গে তাঁর পরিচর্যায় সঙ্গী হন।

মাঝে মাঝে গ্রামের রাখালদের সঙ্গে হরিচাঁদও গোচারণে যান। প্রাণাধিক ভালবাসে রাখলেরা হরিচাঁদকে। তাদেরই একজন বিশ্বনাথ, তাকে কেন্দ্র করেই ভাবীকালের পরম ভাগবত অগতিরগতি ঠাকুর হরিচাঁদের প্রথম আত্মপরিচয় প্রকাশ লাভ করে।

দুরারোগ্য কাল ব্যাধি বিসূচিকায় অকালে বিশ্বনাথের প্রাণবিয়োগ হয়। হরিচাঁদ মুখে হরিনাম কীর্তন করতে করতে তার অঙ্গ স্পর্শ করতেই মৃদদেহে প্রাণের সঞ্চার হয়।

সেই দিন থেকে অলৌকিক বালক হরিচাঁদের স্বরূপ প্রচারিত হয়ে পড়ে চতুর্দিকে।

কৈশোর উত্তীর্ণ হবার আগে থেকেই যশোমন্ত হরিচাঁদকে বিবাহ দিয়ে ঝিকাবাড়ি গ্রামনিবাসী লোচন প্রামাণিকের কন্যা শান্তিময়ীকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনেন।

উত্তরকালে শান্তিময়ী স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ভক্ত ও শিষ্যদের অন্তরে মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

বিবাহের কিছুদিন পরেই হরিচাঁদ বৈষ্ণব মহাজন সাধু রামকান্তর কাছে স্বেচ্ছায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। অব্যবহিত পরেই যশোমন্ত সজ্ঞানে ধ্যানাসনে বসে সাধনোচিতধামে গমন করেন। যশোমন্তের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যান্য পুত্রগণ

পৃথগন্ন হয়ে গেলে হরিচাঁদ পার্শ্ববর্তী ওড়াকান্দি গ্রামে নতুন ভাবে বসবাস শুরু করেন।

ইতিমধ্যে হরিচাঁদকে কেন্দ্র করে বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে। নিত্য হরি সংকীর্তন আর সাধন ভজনে তাদের দিন কাটে। ভক্ত ব্রজনাথ আর বিশ্বনাথ তাঁর নিত্য সঙ্গী। মাঝে মধ্যেই এই তিন সাধককে ঘিরে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

এক অলৌকিক রূপ হরিচাঁদেব কীর্তনেরও কীর্তনের হরিবল ধ্বনির সঙ্গে চলে উদ্দন্ড নৃত্য। সেই সঙ্গে গগনভেদী রবে বাজে মৃদঙ্গ করতাল আর জয়ডঙ্কা। উল্লম্ফন হুহুঙ্কার আর হরিবোল ধ্বনির মিশ্র ব্যঞ্জনায় ভক্তগণের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় অপূর্ব ভাবাবেশ।

দিনে দিনে এই নামকীর্তনের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। হরিবোল নামে মাতোয়ার হয়ে ওঠে দলে দলে মানুষ। সে যেন নামগানের এক নেশা।

সেই নেশায় মাতিয়ে তুলেছেন তাদের ভক্তি ও সাধনার মূর্ত বিগ্রহ নামপ্রেমী হরিচাঁদ।

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ হরিচাঁদ। এরা হিন্দু সমাজের অবহেলিত অবজ্ঞাত শিক্ষাহীন এক সম্প্রদায়। উচ্চবর্ণের সমাজপতি ও ধর্মব্যবসায়ী ব্রহ্মণদের ভাষায় নমঃশূদ্র।

হরিচাঁদের অশেষ কৃপায় হরিভক্তি আর হরিনামের আস্বাদনে নমঃশূদ্র সমাজে এক নবজাগরণের সূত্রপাত হল।

সমাজপতিরা উচ্চৈঃস্বরে হরিনামের সঙ্গে প্রকাশ্যে ডঙ্কা পিটিয়ে মাতোয়ারা হওয়ার এই নিম্নবর্গীয় ব্যাপারটিকে অবজ্ঞা উপেক্ষা করেই নাম দিল হরিবলা মাতুয়া দল। ক্রমে সেই নামেই পরিচিত হয়ে উঠল হরিচাঁদের ভক্ত সম্প্রদায়। দিনে দিনে হরিচাঁদ হয়ে উঠলেন নমঃশূদ্রের ঠাকুর।

হরিভক্তিপরায়ণ জাত্যাভিমানবর্জিত বর্ণশ্রেষ্ঠ কোন কোন ব্রাহ্মণও নামের আকর্ষণে তাঁর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে জীবন ধন্য করল। স্বজন ও সমাজের কটাক্ষ নিন্দা উপেক্ষা করে মিশে গেল তারা হরিনামে পাগল মাতুয়াদের দলে।

তাঁর কীর্তন দল নিয়ে হরিচাঁদ ওড়াকান্দির পার্শ্ববর্তী রাউৎখামাব মল্লকাঁদি সহ দূরদূরান্তের বহু গ্রামেও পরিভ্রমণ করেন।

ভক্তদের গৃহে হরিচাঁদ হরিবাসর করে হরিনামের মহিমাকীর্তন করেন। বলেন, নামই মন্ত্র, মন্ত্রই নাম। নিষ্ঠাভরে যে হরিনাম গান করতে পারে তার

পূজাব্রত বাহ্যানুষ্ঠান বা গুরুদীক্ষার দরকার করে না। নামেতেই তার ধর্মঅর্থকামমোক্ষ চুতর্বর্গ লাভ হয়। নামে প্রেম আর নামপ্রেমিককে ভালবাসা ঈশ্বরের এই শ্রেষ্ঠ পূজা।

নাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে থাকে হরিচাঁদের নানা বিভূতির প্রকাশ। তাঁর স্পর্শে মৃতের দেহে সঞ্চারিত হয় প্রাণ, রোগজীর্ণ দেহে ঘটে রোগমুক্তি, ধনহীন লাভ করে ধন। ঘোরতর অবিশ্বাসী-দূরচারের অন্তরে হয় বিশ্বাসের সঞ্চার।

কমলা দাস কালামৃধা গ্রামের বাসিন্দা। শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাবান ভক্ত। ইষ্টদেবের পবিত্র লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন দর্শন মানসে রওয়ানা হয়েছেন। সফল ডাঙায় পৌঁছে তিনি হরিচাঁদকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সেই সময় ঠাকুর হরিচাঁদ পরমভক্ত বিশ্বনাথ ও ব্রজকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ক্ষেতের ফসল কেটে আঁটি বাঁধছিলেন। কমলা দাসের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ হতে স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সহসা ভক্ত কমলা দাসের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অপরূপ দৃশ্য। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশী হাতে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর পরনে পীত বসন, মস্তকে শিখিপাখা। গলায় দুলছে বনমালা।

এই মূর্তি দর্শন করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তো তিনি চলেছেন বৃন্দাবন তীর্থের পথে। পুলকানন্দে রোমাঞ্চিত কলেবর কমলা দাস মূর্ছিতপ্রায় অবস্থায় হরিনাম কীর্তন আরম্ভ করেন।

কিন্তু একী! খনেক পরেই যেন ঘোর কাটে। সম্মুখের বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি অপসৃত। সেখানে দাঁড়িয়ে ধানের আঁটি বাঁধছেন হরিচাঁদ।

হরিবল হরিবল বলতে বলতে কমলা দাস ছুটে এসে লুটিয়ে পড়েন হরিচাঁদের শ্রীচরণে। দুহাত ভরে পদধূলি নিয়ে সর্বাঙ্গে মাখতে থাকেন। বিস্মিত হয়ে হরিচাঁদ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কমলা দাস তার বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

হরিচাঁদ বলেন, তুমি ভাগ্যবান, শ্রীহরির পুণ্য লীলাক্ষেত্র দর্শন মানসে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছো। শ্রীহরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

দু'চোখে আনন্দাশ্রুর ধারা নিয়ে করজোড়ে কমলা দাস নিবেদন করেন, প্রভু, আর বৃন্দাবনে যাবার দরকার হবে না আমার। তোমাকে দর্শন করেই প্রাণপ্রিয়র দর্শন আমার সম্পূর্ণ হল। আর কেন, যদি অধমকে দর্শনই দিলে তবে এবারে করুণা করে চরণে ঠাঁই দাও।

এই বলে করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন।

লীলাময় হরিচাঁদের লীলার অন্ত নেই। ভক্ত যেই মানস নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয় তার মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করেন।

হরিচাঁদ-শান্তিময়ীর দুই পুত্র, গুরুচাঁদ ও উমাচরণ। ইতিমধ্যে তারাও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। পিতার সার্থক উত্তরসাধক দুই ভাই ভক্ত সমাজে বড় কর্তা ও ছোটকর্তা নামে পরিচিত হন। হরিচাঁদের সঙ্গেই প্রায় সর্বক্ষণ তাঁরা থাকেন।

খড়রিয়া পরগনার দুর্গাপুর গ্রামের হরিভক্ত আনন্দ সরকার। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া বংশের সন্তান তিনি। কবিগানের রচক-গায়ক রূপে দেশজোড়া খ্যাতি তাঁর।

আনন্দ সরকারের মধ্যম ভ্রাতা হীরামন। তার প্রথম পুত্র সূতিকাগৃহেই মারা যায়। বংশে এই প্রথম এক পুত্র সন্তানের আগমন। তার অকাল মৃত্যুতে গৃহে হরিষে বিষাদ নেমে আসে।

বুকফাটা কান্নায় বুক চাপড়াতে থাকেন আনন্দ সরকারের মাতা আয়ুবতী। আনন্দ নিজেও শোক দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন। সহসা ছুটে ঘরের বাইরে চলে যান তিনি।

পুণ্যভূমি ওড়াকান্দির দিকে মুখ করে পর পর তিনবার চিৎকার করে বলেন, বাবা হরিচাঁদ, এই দুর্দৈব থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার কর। আমাদের শান্তি ফিরিয়ে দাও।

ভক্তের সেই আকুল আহ্বান ওড়াকান্দি গ্রামে বসে হরিচাঁদ শুনতে পান। মুহূর্তে তিনি উপস্থিত হন ভক্ত আনন্দের বাড়িতে। তাঁর পবিত্র স্পর্শে সদ্য মৃত নবজাতকের দেহে প্রাণ সঞ্চার হয়। সহর্ষ হরিবল হরিবল ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গৃহাঙ্গন।

ঠাকুর হরিচাঁদ লীলা সম্বরণ করলেন অকস্মাৎ। ওড়াকান্দির বাড়িতে ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে হরিপ্রসঙ্গ করতে করতে সহসা অপ্রকট হন। সময় ১২৮৪ সন।

ঠাকুর হরিচাঁদ মানবলীলা সম্বরণ করলেও তাঁর ভক্তদের মনে আজও তিনি লীলীময় রূপে চির বিরাজিত। জয়ডঙ্কার মেঘমন্দ্র স্বরে সেই অভয়বার্তাই যেন ঘোষিত হয় দিক থেকে দিগন্তরে।

ভোলাগিরি মহারাজ

সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদাসের বাস খুরদা গ্রামে। তাঁর লক্ষ্মীস্বরূপিণী সহধর্মিনীর নাম নন্দাদেবী। স্বামী স্ত্রী দুজনেই শিবের একনিষ্ঠ উপাসক। পতি-পত্নী কিছুদিন যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন। একমাত্র পুত্র সন্তান রতনদাস। বাল্যের দুরন্ত দিনগুলিতে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠছে এক অবর্ণনীয় উদাস-ব্যাকুল ভাব।

পিতামাতা তার যথোচিত বিদ্যাশিক্ষার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু কিছুতেই শিক্ষার দিকে উৎসাহবোধ করছে না বালক। কৈশোরে পা দিতে না দিতেই রতনদাস মাতাপিতা বিষয়-সম্পত্তির মোহ ছিন্ন করে একদিন রাত্রির অন্ধকারে ঘর ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান।

একমাত্র পুত্র রতনদাস-এর গৃহত্যাগে ব্রহ্মদাস এবং নন্দাদেবী শোকে ভেঙ্গে পড়েন। একমাত্র পুত্রের অবর্তমানে ভগ্নহৃদয়া নন্দাদেবী ঘরসংসারের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ছিন্ন করে আশ্রয় নিলেন ঠাকুরঘরে।

গৃহদেবতা শিবের স্তবস্তুতি আর পূজাপাঠের মধ্যে দিয়েই কাটিয়ে দেন দিনের একটি বড় ভগ্নাংশ।

এক গভীর রাত্রে নন্দাদেবী স্বপ্ন দেখলেন, দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁর শিয়রে উপস্থিত হয়েছেন। বিস্ময়-বিমূঢ়া নন্দাদেবী অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার দেবাদিদেবের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন। বিস্ময়-আনন্দে অভিভূতা তাঁর কথা বলার মতো সামান্য শক্তিও যেন অন্তর্হিত হয়েছে।

মহাদেব স্মিতহাস্যে আশ্বস্ত করে তাঁকে বললেন, পুত্র রতনদাসের জন্য কেন মিছে শোক করছো? আমার আশীর্বাদে তোমার গর্ভে আরও তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। আর এ-ও বলছি, তোমার গর্ভের দ্বিতীয় সন্তানটি রতনদাসকেই অনুসরণ করবে।

দেবাদিদেবের কথায় নন্দাদেবী হতচকিত হয়ে পড়লেন। বাক্যস্ফুর্তি হয় না তাঁর। দেবাদিদেব পুনরায় বললেন, কেন মিছে মনঃক্ষুণ্ণ হচ্ছ? তোমার কাছেই অবস্থান করবে তোমার তৃতীয় সন্তানটি। তাকে দিয়েই তোমার প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানের অভাব পূর্ণ করতে হবে। পেতে হবে মাতৃত্বের শান্তিসুখ।

নন্দাদেবী কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাবেন, অমনি স্বপ্নের দেবতা অন্ধকারে বিলীন হয়ে যান।

ঘুমভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসেন তিনি। অন্ধকার ঘর। স্বামী পাশে অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। মনের অস্থিরতা দূর করতে না পেরে স্বামীকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুললেন। পরে কাতর কণ্ঠে স্বপ্নের বিবরণ স্বামীর কাছে ব্যক্ত করলেন।

সহধর্মিনীর মুখে দেবাদিদেব শঙ্করের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনে বিষণ্ণ মুখে মুহূর্ত কয়েক নীরবে বসে রইলেন ব্রহ্মদাস। একটি কথাও বললেন না। একসময় চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়লেন।

যথাসময়ে নন্দাদেবী একটি ফুটফুটে সন্তান প্রসব করলেন। সময়টা ছিল ১৮৩২ খ্রিঃ এক শুভ মুহূর্ত। দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হল ভোলানন্দ।

পূর্বজন্মলব্ধ বৈরাগ্য সংস্কার নিয়ে জন্মেছেন ভোলানন্দ। সংসারের প্রতি ঔদাসিন্য অতি শৈশব থেকেই তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। পুত্রের সংসার-বিরাগী মন এবং উদাসীভাব দেখে নন্দাদেবী আড়ালে চোখের জল ফেলেন।

পুত্র কৈশোরে পা দিতে না দিতেই নন্দাদেবীর চিত্তচাঞ্চল্য ও হাতাশা দানা বাঁধতে লাগল। প্রতিমুহূর্তে তাঁর ভাবনা, এই বুঝি আঁচলের ধন ঘর ছেড়ে অজানার পথে পা বাড়ায়।

একদিন দেবাদিদেবের বর বাস্তবে পরিণত হল। তাঁর তৃতীয় পুত্রের জন্মের কিছুকাল পরেই পিতামাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরদাসের মায়ামোহ ছিন্ন করে ভোলানাথ গৃহত্যাগ করলেন।

ঈশ্বরমুখী ভোলানাথ গৃহত্যাগ করে বহু গ্রাম ও নগর ঘুরে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলেন। এখানকার পস্তানা গ্রাম তাঁর গন্তব্যস্থল। সেই গ্রামে ছোট্ট একটি আশ্রম তৈরি করে শিষ্য ভক্তদের নিয়ে গোলাপগিরিজ মহারাজ সাধন ভজনে লিপ্ত। সেই মহর্ষির চরণে আশ্রয় লাভই এ মুহূর্তে ভোলানাথের একমাত্র কামনা।

বহু খোঁজাখুঁজি করে একে তাকে জিজ্ঞাসা করে ভোলানাথ বহুবাঞ্ছিত গোলাপগিরিজীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

আশ্রম প্রাঙ্গণে পা দিয়েই ভোলানাথ থমকে গেলেন। কৌতূহলী দৃষ্টি আশ্রমের চতুর্দিকে বুলিয়ে নিয়ে আপন মনে বলতে লাগলেন, এই কী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আশ্রম! এ যে রাজা-জমিদারদের আবাসস্থল থেকেও অধিক ভোগসুখের আবাস। বাগান, পুকুর, গোয়াল, ধানের গোলা, প্রভৃতি নিয়ে এক ঘোরতর সংসারীর গৃহাঙ্গন।

সর্বত্যাগী ঈশ্বরসন্ধানী সাধকের আশ্রম যদি এই হয় তবে আর ঘরসংসার ছেড়ে এসে ভড়ং করার কি দরকার ছিল!

আশ্রমের দরজায় দাঁড়িয়ে ভোলানাথ নিদারুণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আলোড়িত হচ্ছেন। ভোগবিলাসের জায়গা ছেড়ে এসে আর এক ভোগবিলাসের নিশ্চিন্ত আবাসে প্রবেশ করবেন, নাকি অন্যত্র, অন্য কোথাও গিয়ে সাধুসন্তের চরণে আত্মনিবেদন করবেন?

ভোলানাথ যখন এমনি দ্বিধা দ্বন্দ্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছেন, কর্তব্য স্থির

করতে না পেরে অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন ঠিক তখনই ভেতরের প্রাসাদের বারান্দা থেকে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, কিরে, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন আয়, ভেতরে আয়।

দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভোলানাথ এগিয়ে গেলেন আহ্বানকারী বৃদ্ধের কাছে। দিব্য আনন্দের জ্যোতিতে তাঁর চোখ মুখ উদ্ভাসিত। সদাহাস্যময় এই বৃদ্ধই যে গোলাপগিরি মহারাজ তা বুঝতে ভোলানাথের অসুবিধা হল না। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

মহর্ষি গোলাপগিরি মহারাজের অনিন্দ্যসুন্দর দেহলাবণ্য এ বয়সেও এতটুকু জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়নি, ভোলানাথ লক্ষ্য করলেন। একটু আগেও যাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব অন্তরের অন্তস্তলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তা মুহূর্তে যেন তাঁর মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠল তাঁর মন প্রাণ।

ঈশ্বর সন্ধানে উদ্বুদ্ধ ভোলানাথকে সহজেই অন্তর থেকে গ্রহণ করে নিলেন গোলাপগিরি মহারাজ। দু'চারটি বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমেই তাঁর মুমুক্ষু মনের খোঁজ পেলেন। তাঁর মন যে ঈশ্বরমুখী হয়ে উঠেছে তাও আপ্তকাম সাধক উপলব্ধি করতে পারলেন।

গোলাপগিরি মহারাজ নিজ সাধনলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, আগন্তুক যুবক একদিন ভারতের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে আনবেন নতুন ভাবধারা, অধ্যাত্মসাধনার নতুন পথের সন্ধান দিয়ে পাপী-তাপীকে করবেন উদ্ধার।

যোগীরাজ গোলাপগিরিজি এক সকালে ভোলানাথকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দিলেন। তাঁর নামকরণ করলেন নারায়ণ গিরি। নারায়ণ গিরিই উত্তরকালে পৃথিবীর উচ্চকোটি সাধক সমাজে ভোলানন্দ গিরি নামে পরিচিতি লাভ করেন। মহাসাধক রূপে তিনি ভারতের সাধকমণ্ডলীতেও নিজের যথাযোগ্য স্থানটি নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন।

ভোলানাথকে দীক্ষাদানের পর কিছুদিন গুরু গোলাপগিরি মহারাজ নিজের কাছে রেখে তাঁকে সাধনোপযোগী করে তোলার জন্য অন্যান্য শিষ্যের সঙ্গে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন।

গোলাপগিরি মহারাজের আশ্রমে অবস্থানরত শিষ্যদের গো-চারণ, বাগান তৈরি, নৈমৈত্তিক হোমের ব্যবস্থাদি প্রভৃতি কাজ নিয়মিত করত হত। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন দেহবোধের বিনাশ সাধন। সেই সঙ্গে আমিত্বের অহং বিসর্জন। গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সাধিত হয় এই পারমার্থিক সাধন।

গোলাপগিরি মহারাজের আশ্রমবাসী শিষ্যদের, রাত্রি তিনটায় শয্যাত্যাগ করে সাধনায় লিপ্ত হতে হত। ভোলনানন্দকেও তিনি দিলেন কঠিন কর্মভার। শিবপূজার যাবতীয় দায়য়ায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করলেন। অতিথি অভ্যাগত কেউ আশ্রমে এলে প্রয়োজনে তাকেই তাদের আহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

দায়িত্বপালনে কোথাও এতটুকু ত্রুটি হলে শিষ্যদের ওপর কঠোর নির্যাতন করতেন গোলাপগিরিজী। প্রয়োজনে দৈহিক নির্যাতন করতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

গুরুজীর মধ্যে কখনও দেখা যেত পিতৃসুলভ স্নেহ-ভালবাসা কখনও নির্বিকার কঠিন কঠোর আচরণ। গুরুজীর এই দ্বিমুখী স্বভাবের আচরণ ভোলানন্দকে যারপরনাই বিস্মিত করল।

ভোলানন্দ অচিরেই বুঝতে পারলেন, শিষ্যদের পরিশুদ্ধির জন্যই গুরুজী মুহুর্মুহু আচরণ পরিবর্তন করে থাকেন। তাই গুরুজী কর্তৃক যতই নির্যাতিত হন না কেন; সবই হাসি মুখে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে তাঁর কোন পীড়া হত না।

একবার গুরুজীর ঘরে ভোলানন্দের ডাক পড়ল। তিনি উপস্থিত হতেই গোলাপগিরি মহারাজ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। স্পষ্ট ভাষায় জনিয়ে দিলেন, তাঁকে আশ্রম ছেড়ে যেতে হবে। তাঁর মতো শিষ্যের কোনও প্রয়োজন তাঁর নেই। কিন্তু কারণ কিছুই প্রকাশ করলেন না।

গুরুজীর আকস্মিক উষ্মা প্রকাশে ভোলানন্দ হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু উপায় নেই। গুরুজীর আদেশ অমান্য করলে নরকগামী হতে হবে।

কোনওরকম প্রশ্ন বা তিলমাত্র প্রতিবাদ না করে ভোনানন্দ আশ্রম ত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়ালেন। জানা হল না কি তাঁর অপরাধ! কেনই বা গুরুজী এমন ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁর ওপর?

মাঘ মাসের রাত। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। সারা রাত্রি আশ্রমের সদর দরজার বাইরে কনকনে শীতের মধ্যে সামান্য একচিলতে উত্তরীয় গায়ে চাপিয়ে ভোলানন্দ রাত্রি কাটালেন।

কাক-ডাকা সকালে গোলাপগিরি মাহাজ আশ্রমের সদর দরজায় এসে দেখেন ভোলানন্দ করজোড়ে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে চলেছেন।

গোলাপগিরি মহারাজ এগিয়ে গিয়ে শিষ্যের মাথায় সস্নেহে হাত বোলাতে লাগলেন। স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, একবারটি বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। তোর মাকে প্রণাম করে আয়। তবে হ্যাঁ ভুলেও যেন নিজের পরিচয় কারো কাছে ব্যক্ত করবি না।

গুরুজীর কৃপায় ভোলানন্দের অন্তরের অন্তস্তলে পূর্বস্মৃতি জেগে উঠতে লাগল। মনের কোণে ভেসে উঠল তাঁর স্নেহময়ী মার বেদনাভরা মুখটি।

গুরুজীর আদেশে ভোলানন্দ স্বগ্রামের দিকে রওনা হলেন।

গ্রামে ফিরে ভোলানন্দ নিজের বাড়ির দরজায় উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসীকে দরজায় দেখে নন্দাদেবী ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন।

মা কাছে আসতে সন্ন্যাসী ভোলানন্দ তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

সন্ন্যাসীর প্রণাম গ্রহণে পাপ হয় নন্দাদেবী শুনেছিলেন। তাই আতঙ্কিত ব্যস্ত হয়ে পা সরিয়ে নেবার উদ্যোগ করলেন।

স্মিতহাস্যে ভোলানন্দ বললেন, কেন কুণ্ঠিত হচ্ছ মা। মাতৃবুদ্ধিতে প্রণাম করছি। নির্ভয়ে থাকতে পার। এতে কিছু মাত্রও পাপ তোমার হবে না।

ভোলানন্দ আর মুহূর্ত মাত্রও সেখানে অপেক্ষা করলেন না। নন্দাদেবী বিস্ময় মাখানো দৃষ্টি মেলে সন্ন্যাসীর ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে হইলেন। কিন্তু তিলমাত্রও চিনতে পারলেন না আগন্তুক সন্ন্যাসীই তাঁর আদরের দুলাল ভোলানন্দ।

ভোলানন্দ বিদায় নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলে নন্দাদেবী যেন অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। এক অবর্ণনীয় হাতাশ আর হাহাকার তাঁকে অস্থির করে তুলল।

ইচ্ছে হল, দৌড়ে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন আকস্মিভাবে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত যুবক সন্ন্যাসীকে। কিন্তু উপায় নেই। পাখি যে খাঁচা ছাড়া।

স্বগ্রাম থেকে ফিরে ভোলানন্দ আবার উপস্থিত হলেন গুরুজীর আশ্রমে। আবার শুরু হল আশ্রমের কঠিন-কঠোর জীবন।

কিন্তু এবার বেশিদিন পাস্তানায় গুরুজীর সান্নিধ্যে ভোলানন্দের থাকা সম্ভব হল না।

এক সকালে গুরুজীর ঘরে ভোলানন্দের ডাক পড়ল। ভোলানন্দ উপস্থিত হলে গোলাপগিরি মহারাজ তাঁকে বললেন, ভোলা, তোর এখানের প্রয়োজন মিটে গেছে। আশ্রম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আসন স্থাপন কর। আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, ধৈর্য আর অধ্যবসায় সম্বল করে সাধনায় লিপ্ত হয়ে যা। তোর ওপর আমার আশীর্বাদ থাকবে। যোগ ও ভোগ দুই তোর জীবনে আসবে, আশীর্বাদ করছি।

গুরুজীর উপদেশ মত ভোলানন্দ গুরুদেবের সান্নিধ্য ও পস্তানার আশ্রম ত্যাগ করে যাত্রা করলেন হিমালয়ের নির্জন অঞ্চলের উদ্দেশ্যে।

কঠোর পরিশ্রম করে, দীর্ঘদিন পায়ে হেঁটে ভোলানন্দ উপস্থিত হলেন হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে।

অত্যুগ্র আগ্রহ এবং সাধনার প্রত্যাশা বুকে নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলেন ওপরে।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, তার ওপর প্রতিনিয়ত তুষারপাত ভোলানন্দ সহ্য করতে পারলেন না। পথেই নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন।

জনমানবশূন্য পার্বত্য অঞ্চলে অসুস্থ ভোলানন্দকে কে দেখবে? কে-ই তাঁকে সেবা যত্ন করে রোগ নিরাময়ের উপায় করে দেবে?

উপায়ান্তর না দেখে তিনি অসুস্থ শরীরটিকে কোনও রকমে বয়ে নিয়ে এলেন ছোট একটি গুহার সামনে।

ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নিলেন। ফাঁকা। গুহায় ঢুকে বরফশীতল পাথরের ওপরেই গা এলিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সংজ্ঞা লোপ পেল।

কখন রাত্রি হয়েছিল, কখনই বা সকাল হয়েছে তার কিছুই বুঝতে পারেন না ভোলানন্দ। পরদিন দুপুরের দিকে রোগ জর্জরিত তরুণ সাধক চোখ মেলে তাকালেন।

শিয়রে বসে আছে এক অতিবৃদ্ধ পার্বত্য উপজাতীয় পুরুষ। সস্নেহে ভোলানন্দের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

চোখ মেলে বৃদ্ধকে দেখে ভোলানন্দ যারপরনাই বিস্মিত হলেন। গুরুজীর উদ্দেশ্যে অলক্ষ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, গুরুজীর অপার করুণা বলেই এই নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে এই অশীতিপর বৃদ্ধের আগমন ঘটেছে।

ভোলানন্দের অনুমানই সত্য। তাঁর গুরুজী গোলাপগিরি মহারাজ যোগবলে প্রিয় শিষ্যের দুর্গতির কথা জানতে পেরে আত্মীক প্রভাবে বৃদ্ধকে সেখানে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বৃদ্ধটি জরুরী কাজে এপথ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ গুহার ভেতরে কাতর আর্তস্বর শুনতে পেয়ে গুহায় প্রবেশ করেছিল। তরুণ এক সন্ন্যাসীকে রোগাক্রান্ত হয়ে কষ্ট পেতে দেখে দুদিন তার সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। এর বেশি কিছুই তার জানা নেই।

কিসের যোগবল, কে-ই বা গোলাপগিরি মহারাজ, কে-ই বা তার ভেতরে অধিষ্ঠান করে তাকে এ পথে এখানে নিয়ে এসেছেন, এসবই তার অজ্ঞাত।

ভোলানন্দ খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। একে রোগের প্রকোপ, তার ওপর অনাহার। শরীর আর চলে না। কিন্তু পাহাড়ি বৃদ্ধটি তাঁকে নিজের ঝুপড়িতে নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য, দু-চারদিন একটু বিশ্রামের মাধ্যমে সন্ন্যাসী সুস্থ হয়ে উঠুন।

বৃদ্ধের ঝুপড়িতে সেবাযত্নে দু'দিনেই শরীরে বল ফিলে পেলেন ভোলানন্দ। এবার তাঁকে আবার নিজের কর্তব্য সাধনের পথে অগ্রসর হতে হবে।

বৃদ্ধটির স্নেহ ও সেবাযত্নে মুগ্ধ হয়ে এবং তার অন্তরের ভক্তি নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে ভোলানন্দ স্বেচ্ছায় তাকে দীক্ষা দিলেন। এই পাহাড়িয়া আশীতীপর বৃদ্ধই ভোলানন্দের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য।

ভোলানন্দ পস্তানার আশ্রমে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ শিষ্যটিও তাঁর সঙ্গে এলেন। গুরুজী গোলাপগিরি মহারাজ শিষ্যের মুখে তাঁর কঠিন অসুখের কথা এবং পাহাড়িয়া বৃদ্ধের সেবা যত্নের কথা শুনে একটিও কথা বললেন না।

কেবল দেখা গেল এক চিলতে হাসির রেখা তাঁর ঠোঁটের কোণে খেলা করছে। এমন একটি ভাব তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে যে, তিনি যেন সবই জানেন।

গোলাপগিরি মহারাজ সন্তুষ্ট হয়ে বৃদ্ধকে পঁচিশটি টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই তা নিতে রাজি হয় না।

ভোলানন্দ তখন তাঁর বৃদ্ধ শিষ্যকে অনেক করে বুঝিয়ে টাকাগুলো তার হাতে জোর করে গুঁজে দিলেন।

বৃদ্ধ শেষ পর্যন্ত আর টাকা না নিয়ে পারল না।

কিছুদিন গুরুজীর সান্নিধ্যে কাটিয়ে ভোলানন্দ আবার তপস্যার জন্য পস্তানার আশ্রম ত্যাগ করলেন।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে ভোলানন্দ কন্‌খল হরিদ্বারের কাছে বিল্বকেশ্বর পর্বতে উপস্থিত হলেন। কিছুদিন পাহাড়ের ওপরে এক ছোট্ট গুহায় সাধনায় লিপ্ত রইলেন।

তারপর সেখান থেকে আবার ফিরে গেলেন হিমালয়ের নির্জন নিরালা পার্বত্য পরিবেশে। চলতে লাগল ধ্যান, জপতপ আর যোগক্রিয়া।

কঠিন কঠোর সাধনের মাধ্যমে ভোলানন্দ নানান অনুভূতি লাভ করতে লাগলেন। অধ্যাত্মজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল তাঁর মন প্রাণ। তাঁর মধ্যে পরম প্রাপ্তির সঙ্কল্প ক্রমেই প্রগাঢ় হয়ে উঠতে লাগল।

নির্জন পার্বত্য গুহার অভ্যন্তরে অনাহারে অনিদ্রার মধ্য দিয়ে কাটতে লাগল সাধকের দিন।

পরম সম্পদ দীর্ঘ বাঞ্ছিত পরম পুরুষকে লাভের জন্য কঠিন কঠোর সাধনার নিরবচ্ছিন্ন কৃচ্ছ্রতায় শরীর শুকিয়ে কাঠ হতে লাগল। কোনও দিকে খেয়াল মাত্র নেই তাঁর। যে করেই হোক, পরম প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত আসন ত্যাগ করলেন না।

ভক্তি ও ঐকান্তিক আকুলতায় অবশেষে ইষ্টদর্শন লাভে ধন্য হলেন ভোলানন্দ। অনাস্বাদিত পুলকানন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর অন্তর্লোক। স্ফুরণ ঘটল অক্ষয় সম্পদ তত্ত্বজ্ঞানের।

সাধনলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে আপ্তকাম ভোলানন্দ এবার নির্জন পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে নেমে এলেন লোকালয়ে।

এরপর ভেলানন্দকে দেখা গেল লোকগুরুর ভূমিকায়। তাঁর সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদ লোকসমাজে বিতরণ করে অসহায় আর্ত মানুষকে প্রকৃত সুখের সন্ধান, মুক্তির প্রেরণা দানের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গ্রামে গঞ্জে লোকসমাজে বিচরণ করতে লাগলেন। তারপর একসময়ে উপস্থিত হন গুরুজীর পদপ্রান্তে।

গুরুদেবের তিরোধানের পর ভোলানন্দ গিরি পস্তানার আশ্রম ত্যাগ করে হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

১৮৯৩ খ্রিঃ প্রয়াগক্ষেত্রে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভোলানন্দ তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে কুম্ভমেলায় উপস্থি হলেন। মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে তিনি অগণিত সাধুসন্ন্যাসী এবং জনগণের সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন।

সেখানে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। বিজয়কৃষ্ণ ভোলাগিরি সম্বন্ধে অনেক আগে থেকেই শুনেছেন। তাঁর মতে ভোলগিরি সাক্ষাৎ শিব।

ভোলাগিরি মহারাজ সর্বদা শিষ্যদের জীবন গঠন এবং তাঁদের আত্মিক উন্নতির কথা মনেপ্রাণে চিন্তা করতেন। শিষ্য ভক্তদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম মমত্ববোধ।

ভক্তদের তিনি কখনই বলতেন না ঘর-সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনে লিপ্ত হতে। সংসারের মধ্যে থেকে ও ভক্তিপথে দানকর্ম এবং জনসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে নির্দেশ দিতেন।

আবার সন্ন্যসী শিষ্যগণ যদি লোক দেখানো বৈরাগ্য ফুটিয়ে তুলতেন তবে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। মন যদি রাঙানো নাই যায় তবে বসন রাঙিয়ে মিছে লোক ঠকিয়ে লাভ কি?

মনে প্রাণে ঈশ্বরের সাধন ভজন করতে না পারলে বৃথা সাধন ভজন। কেবলই পণ্ডশ্রম। প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্য দিয়েই সংসারী মানুষের অধ্যাত্মসাধনে লিপ্ত হওয়া সম্ভব।

কথা আর কাজের মধ্যে ফাঁক থাকলে কার্যসিদ্ধি অসম্ভব। কর্মই জীবন। কর্মের মধ্য দিয়েই পরম প্রাপ্তির জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই অধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে।

মানবসমাজে সাধনলব্ধ জ্ঞান অকাতরে বিতরণ করে ভোলাগিরি মহারাজ এবার মানবলীলা সম্বরণ করার কথা চিন্তা করলেন।

অবশেষে ১৯২৮ খ্রিঃ ৮ই মে কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে মহাসাধক ভোলগিরি

মহারাজ হরিদ্বারে লালতারাবাগে অগণিত শিষ্য ভক্ত এবং অনুরাগীবৃন্দের উপস্থিতিতে মানবলীলা সম্বরণ করলেন।

শিষ্যভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোলাগিরিজীর কয়েকটি বর্জনীয় ও গ্রহণীয় বিষয়ে উপদেশ ঃ

(১) **পরদার গমন**—পরদার গমন করিলে পরিত্যক্ত শুক্র পিতৃপুরুষের পিণ্ডে পতিত হইয়া তাহাদিগকে নরকগামী করে এবং পরস্ত্রীগমনকারীও তীব্রতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করা—জীবমাত্রেই ভগবানের অংশ। নারায়ণ স্বরূপ। তোমরা নিজেদের রাক্ষসীবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য জীবহত্যাপূর্বক মাংসাদি ভক্ষণ কর। কিন্তু ভেবে দেখ না তাহাদের কত কষ্ট হয়। তোমাদিগকে যদি কেহ হত্যা করিতে উদ্যত হয় তবে তোমার মনের অবস্থা কি প্রকার হয়? হে বৎস! জীবে দয়া রেখো, জীবের দুঃখে নিজেকে দুঃখী মনে কর। সর্বভূতে অহিংসা ভাব না আসিলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না।

পরনিন্দা করা—প্রত্যেক জীবেই দোষ-গুণ উভয়ই লক্ষিত হয়। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রভাবে সৃষ্ট জীবমাত্রেই গুণত্রয় অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তুমি নিজের দোষ দর্শন কর এবং অপরের গুণ গ্রহণ কর। তাহাতে প্রাণে শক্তি পাবে। লোকসমাজে আদরণীয় হবে। অপরপক্ষে পরদোষ কীর্তন করিলে লোকসমাজে পরনিন্দুক আখ্যা লাভ করিয়া অশ্রদ্ধেয় হবে। তোমার হৃদয়ও পরদোষ দর্শনজনিত তাপে দগ্ধ হইতে থাকিবে, সুতরাং বৎস, পরনিন্দা সর্বতোভাবে ত্যাগ কর।

গালাগালি করা—কাহাকেও গালাগালি করিলে তাহার হৃদয়ে তীব্র দুঃখের সঞ্চার হয়। যে কটূক্তি করে সে নিজেও তীব্র অশান্তি ভোগ করে। কটূক্তি প্রয়োগকারী ব্যক্তি ও কসাইয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মধুর বাণীদ্বারা সকলের প্রাণে শান্তি দেওয়া যায়। ইহাতে কোনও প্রকার খরচও নাই। সুতরাং বৎস! বাক্যের সংযম কর, কাহাকেও গালাগালি করিও না। সকলের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হও। ধর্মরাজ্যে বাক্যের সংযম অবশ্যকর্তব্য।

জুয়াখেলা—জুয়া খেলতে গিয়ে কত সংসারের সর্বনাশ হয়েছে। কত লোকের স্ত্রী, পুত্র অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম—অতি কিছুই ভাল নয়। অতি লোভে জুয়াখেলা রূপ পাপে লিপ্ত হয়ে অনেককেই সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। নিজের পুরুষকার দ্বারা অর্থোপার্জনপূর্বক গৃহের স্বচ্ছন্দতা বিধান কর। অতিলোভ পরিত্যাগ কর।

মদ্যপান করা—মদ্যপানের পরিণাম ভয়াবহ। মদ্যপান করিলে লিভার

ইত্যাদি খারাপ হয়ে অত্যুৎকট রোগের উৎপত্তি ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়ে জীবন বিষময় হয়। অগাধ অর্থও সর্বনাশকর এই মদ্যপানে ব্যয়িত হয়। লোক-সমাজে মদ্যপায়ী উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হয়। অধিকন্তু মদ্যপায়ীর মন সূক্ষ্ম ধর্মরাজ্যে বিচরণ করিতে অসমর্থ। সুতরাং বৎস! মদ্যপান বিষবৎ পরিত্যাগ কর।

দিব্য করা—প্রতিজ্ঞা করা মহাপাপ। শপথ গ্রহণ করে তদনুযায়ী কার্য অনুষ্ঠান না হলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ মহাপাপে লিপ্ত হতে হয়। অনেক সময়েই আমরা শপথ গ্রহণ পূর্বক তদনুযায়ী কার্য করিতে অক্ষম হই। সুতরাং শপথ গ্রহণ বা দিব্য করিবে না।

ঈর্ষা-দ্বেষ করা—অপরকে ঈর্ষা দ্বেষ করিলে নিজের চিত্ত কলুষিত হয়। ঈর্ষা দ্বেষাগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। সে দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি বা ধর্মের স্থান কোথায়? সুতরাং বেটা, কাহাকেও ঈর্ষা বা দ্বেষ করিও না।

চুরি করা—চুরি করা মহাপাপ। চোর ব্যক্তির ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়। চোরকে সকলেই ঘৃণা ও ভয়ের চোখে দেখে। চোরের মনও সর্বদা সঙ্কুচিত থাকে। সংকুচিত মনদ্বারা কখনও ধর্মাচরণ হতে পারে না।

গ্রহণীয় নয়টি

ভূমিকে প্রণাম—ভূমিতে প্রণাম পূর্বক ধৈর্য ও ক্ষমাগুণ প্রার্থনা করবে। দেখ, ভূমির ওপর আমরা মলমূত্র পরিত্যাগ করি, ভূমি কর্ষণ করি! কিন্তু ভূমি বা মাতা পৃথিবী সেজন্য আমাদের প্রতি ক্রোধ করা ত দূরের কথা, অধিকন্তু মাতার ন্যায় আমাদিগকে বুকে করে ধরে রেখেছেন। কী অসীম তাহার ধৈর্য। এত অপরাধ সত্ত্বেও তিনি আমাদিগকে মাতার ন্যায় আশ্রয় দিচ্ছেন, কী অপরিসীম তাঁহার ক্ষমা। তুমিও ভূমির নিকট এই ধৈর্য ও ক্ষমাগুণ প্রার্থনা কর। ধৈর্য ও ক্ষমাশীল ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী। ধৈর্য ও ক্ষমা এই দুইটি গুণ যাহার ভিতরে নাই তার পক্ষে ধর্মরাজ্যে উন্নতি লাভ করা আকাশ কুসুমবৎ অসম্ভব।

জল নারায়ণকে প্রণাম—জল শুধু নিজে পবিত্র নয়, অপবিত্রকেও পবিত্র করার শক্তি তাহার অমোঘ। নিজের হৃদয় যাতে জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও পবিত্র হয় এজন্য প্রত্যহ জলকে প্রণাম করে প্রার্থনা করা উচিত। পবিত্র বা সুদ্ধ হৃদয় না হলে জ্ঞান, প্রেম কিছুই লাভ হয় না।

সূর্যদেবকে প্রণাম—সূর্যদেব সর্বব্যাধিনাশক। তিনি প্রকাশ স্বরূপ। সূর্যদেব হতে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তাই তাঁহার অপর নাম সবিতা অর্থাৎ যিনি প্রসব করেন। হৃদয়ে যাতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হয় এই জন্য সূর্যদেবকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম করলে সাধন রাজ্যে অনেক উপকার হয়। অপিচ ব্যাধিযুক্ত শরীর দ্বারা

তপস্যা হয় না। শরীরের সুস্থতার জন্যও সূর্যদেবকে প্রত্যহ প্রণাম করা উচিত। সূর্যদেবের কৃপায় রোগমুক্ত আত্মজ্ঞান সকলই হতে পারে।

ভগবদগীতা পাঠ—শ্রীভগবানের মুখপদ্ম হতে নির্গতা অমৃতময়ী গীতা অবশ্যই রোজ পাঠ করবে। গীতার এক একটি শ্লোক অমৃতের খনি। অন্যান্য শাস্ত্র সম্ভব হলে পড়বে, কিন্তু গীতা পাঠ প্রত্যহ নিয়মপূর্বক করা উচিত। গীতা মাহাত্ম্যে গীতাপাঠের ফল বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ হলে অন্ততঃ রোজ এক অধ্যায় অবশ্যই পড়বে। প্রত্যহ নিয়মপূর্বক গীতাপাঠের মাধ্যমে মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়, আধ্যাত্মিক রহস্য জ্ঞাত হবার জন্য প্রাণ স্বভাবতঃই উদগ্রীব হয়।

মাতাপিতাকে প্রণাম—মাতাপিতা গুরুস্থানীয়। গুরুদেবকে যে প্রকার ভক্তি করা উচিত, মাতাপিতাকেও তদ্রুপ করা বিধেয়। দেখ, মাতাপিতা আমাদিগের জন্য কত কষ্ট করেছেন। যখন বালক ছিলে তখন মাতাপিতার ক্রোড়ে কত মলমূত্র ত্যাগ করেছ। রাতে নিজের শয্যায় প্রস্রাব করে দিয়েছ, মা তোমাকে শুষ্ক স্থানে শুইয়ে দিয়ে নিজে তোমার সেই প্রস্রাবসিক্ত স্থানে শুয়েছেন। মাতাপিতা না খেয়ে তোমাকে খাইয়েছেন। মা একাধারে তোমার দাসী, মেথর, রাঁধুনী ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কাজ করেছেন, উদ্দেশ্য তোমার যাহাতে কোনও কষ্ট না হয়। তোমার সুখেই তোমার পিতামাতা সুখী—কী অসীম তাহাদের ভালবাসা। এখন বড় হয়ে অর্থোপার্জন করেও যদি তাহাদিগকে তুমি ভক্তি না কর, যদি তাহাদিগকে সেবা করিতে তুমি পরাঙ্মুখ হও, তবে তুমি অকৃতজ্ঞতারূপ মহাপাপে লিপ্ত হবে, কৃতঘ্নের আবার ধর্ম কি?

অতিথি সেবা—অতিথি অর্থ যে একরাত্রি মাত্র পরগৃহে বাস করে। যেহেতু পরগৃহে এক তিথির অধিক অবস্থান করে না, অতএব তাহার নাম অতিথি।

অতির্যস্য ভগ্নাংশে গৃহাৎ প্রতিবর্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতর দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।।

(মহাভারত)

অর্থাৎ যে গৃহস্থের গৃহ হতে অতিথি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়, সে গৃহস্থকে নিজের সমূহ পাপ প্রদান করে গৃহস্থের পুণ্য গ্রহণ করে থাকে। অতএব বৎস, অতিথিপরায়ণ হও।

হরিভজন—খেলাধূলায় আমাদের সময়ের অভাব হয় না, পরনিন্দা, পরচর্চা করতে আমরা যথেষ্ট সময় পাই, আলস্য তন্দ্রা ইত্যাদি তমোগুণে লিপ্ত থাকতেও আমরা সময়ের অভাব অনুভব কবি না। এইভাবে অমূল্য মানবজন্ম নষ্ট করতে আমদের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু যদি কেহ বলে, ওরে হরির ভজন কর, ভগবানের নাম জপ করে তপস্যা কর, তবে আমরা বলি, ভাই

সময় নেই, সংসারে কাজ করেই সময় পাই না, আবার হরির ভজন করব? খেটে খেটে প্রাণ বেরুচ্ছে। হরির ভজন করার সময় কোথায়, ওসব বৃদ্ধকালে দেখা যাবে। কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে যদিও বা একটু সময় করে মালা নিয়ে জপ ধ্যান হরির ভজন করতে বসলে, মন অমনি বিষয়ের ধ্যানে মগ্ন হল। এত বৎসরের সেই বিষয় সংস্কার মনকে চেপে ধরবেই। বৃদ্ধাবস্থায় স্বভাবতই শরীর ও মনের শক্তি হ্রাস পায়। এর ওপর সারাজীবনের বিষয় সংস্কার দ্বারা মন প্রভাবিত সুতরাং আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করবার সৌভাগ্য হয়ে ওঠে না। তাই বলি—

যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতম্।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালে ভবিষ্যতো।।

অর্থাৎ যুবা অবস্থায় ধর্মাচরণ করতে প্রবৃত্ত হও, কখন কে মৃত্যুমুখে পতিত হবে তার কোনও স্থিরতা আছে কি?

তোমার সর্ব বিষয়ে সময় মিলে কিন্তু হরিভজনেই সময়ের অভাব—এ যুক্তি অর্বাচীনতার লক্ষণ। মৃত্যুর পর ধন, জন, এমন কি নিজের প্রিয় শরীর পর্যন্ত এই জগতেই পড়ে থাকবে, তুমি কোনও অজ্ঞাত লোকে চলে যাবে। সেখানে একমাত্র ধর্মই তোমার সহায় হবে—টাকাকড়ি নয়। সুতরাং বৎস! এই চুরাশি লক্ষ যোনিরূপ ভবসমুদ্র পার হতে হলে, হরিভজনারূপ পাথেয় একান্ত আবশ্যক। হরিভজন ব্যতীত জীবনে শান্তি মিলে না। জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। বুদ্ধিমান আত্মার কল্যাণকামী ব্যক্তি প্রত্যহ অন্ততঃ সকালে দেড়ঘণ্টা ও সায়ংকালে দেড়ঘণ্টা হরিভজনে ব্যয় করবে।

সাধুসঙ্গ—কুসঙ্গ যেমন সাধন রাজ্যের অন্তরায়, সাধুসঙ্গ তেমনি পথের সহায়—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন জায়তে—,

ভক্তি ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ হতে জন্মে থাকে। সুতরাং সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্তব্য।

আয়ের দশমাংশ দান—চুল্লী, পেষণী (শিলনোড়া) সম্মার্জনী, উদুখল (হামানদিস্তা) ও জলকলস এই পাঁচটির নাম সূনা। এগুলি আপন আপন কার্যে বিনিয়োজিত হলে তদ্দ্বারা যে জীবহিংসা হয় সেই পাপকে পঞ্চসূনা বলে। চুল্লী প্রভৃতি দ্বারা লক্ষ প্রকারে উৎপন্ন পাপ অর্থাৎ পঞ্চ সূনা পাপের নাশের জন্য গৃহস্থগণ প্রতিদিন যথাক্রমে পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃ তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, দেবতোদ্দেশে হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ (কাক, কুকুর, পিপীলিকা ইত্যাদি প্রাণীকে অন্নাদি দেওয়া) ও অতিথিসেবাকে নৃ-যজ্ঞ বলা হয়। সৎ-অসৎ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানই প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়ে। কিন্তু হিন্দুগণ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে

অক্ষম, তাই অগত্যা স্বীয় আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দান করিবেন। এই দান দ্বারা পঞ্চসূনা পাপ নাশ হয়। বেটা, এই সব উপদেশ পালন করতে সচেষ্ট হও, দেখবে ধীরে ধীরে তোমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হয়ে ক্রমশঃ তা দৃঢ়তর হবে এবং পরিশেষে এই আধ্যাত্মিক বা ধর্মভাবই তোমাকে চিরশান্তি প্রদান করবে। তবে হতাশ হইও না। প্রথমতঃ এই রাজ্যটি বিষবৎ দুঃখপ্রদ। কখনও তীব্র অশান্তি, কখনও সংশয়, কখনও অবিশ্বাস তোমার হৃদয়কে আচ্ছাদিত করবে। কিন্তু তখন ধৈর্য ধারণপূর্বক সাধনায় মগ্ন হতে হয়—প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ম পালন করতে হয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন উনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের এক পুরোধাপুরুষ। তাঁর বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানানুশীলন আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

ভারত-বিদ্যাচর্চার একনিষ্ঠ সাধকরূপে রাজেন্দ্রলালের প্রধান পরিচিতি হলেও জ্ঞানের নানা শাখাতেই ছিল তাঁর বিস্ময়কর অনায়াস বিচরণ। উনিশ শতকের নবজাগরণের অগ্রগতি ও বিস্তৃতি সূচীত হয়েছিল যেসকল ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের জ্ঞানানুশীলনের অবদানে, রাজেন্দ্রলাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

ম্যাক্সমুলার রাজেন্দ্রলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি কেবল পণ্ডিত নন, তিনি গবেষক ও মুক্তমন সমালোচক।

রাজেন্দ্রলালের কর্মকৃতিত্ব বলেই বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সাহিত্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর জীবিতকালেই রাজেন্দ্রলাল সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুপণ্ডিতের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন।

১৮২২ খ্রিঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে রাজেন্দ্রলালের জন্ম। তাঁর এক পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র মিত্র এবং তস্য পুত্র অযোধ্যারাম মুর্শিদাবাদের নবারের দেওয়ান ছিলেন।

তাঁর অন্য এক পূর্বপুরুষ পীতাম্বর মিত্র দিল্লীর বাদশাহের দরবারে অযোধ্যার নবাবের উকিল ছিলেন। নিজ প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি বাদশাহের কাছ থেকে রাজা বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন।

পীতাম্বর ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র ও দর্শনে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। অবসর গ্রহণের পর তিনি শুড়া অর্থাৎ বর্তমান বেলেঘাটায় বসবাস করতেন।

পীতাম্বরের পৌত্র জন্মেজয়, তিনি সংস্কৃত, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। রামায়ণ শাস্ত্রেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

জন্মেজয়ের ছয় পুত্র ও এক কন্যা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন জন্মেজয়ের তৃতীয় পুত্র সন্তান।

জন্মেজয় বৈষয়িক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তিনি সারাজীবনই জ্ঞানানুশীলনে অতিবাহিত করেন। ফলে পরিবারের আর্থিক অবস্থা দিন দিনই দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রধানতঃ আর্থিক অস্বাচ্ছন্দতার জন্যই তিনি পুত্র রাজেন্দ্রলালকে বালক বয়সে পাথুরিয়াঘাটায় তাঁর নিঃসন্তান বিধবা বোনের কাছে প্রতিপালন করতে দেন। রাজেন্দ্রলাল পিসীমার স্নেহে-যত্নেই বড় হয়ে ওঠেন।

সেইকালেব নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ বছর বয়সেই রাজেন্দ্রলালের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। বাংলা ও ফারসী দুটি ভাষাই একসঙ্গে শিক্ষা করেন তিনি।

আট বছর বয়সে পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেম বোসের স্কুলে ভর্তি হবার পর তাঁর ইংরাজি শিক্ষা শুরু হয়। বিদ্যালয় জীবনের সূচনা থেকেই তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পড়াশুনার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ।

ক্ষেম বোসের স্কুলের পড়া শেষ হলে রাজেন্দ্রলালকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় ওবিয়েন্টাল সেমিনারিতে।

স্কুলের পড়া শেষ হলে ১৮৩৭ খ্রিঃ রাজেন্দ্রলাল ভর্তি হন মেডিকেল কলেজে।

ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য মাত্র দুই বছর আগেই কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জ্ঞানের এই নতুন শাখা স্বভাবতই দেশীয় বিদ্যোৎসাহী মহলে অত্যন্ত উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

মেধাবী ছাত্র রাজেন্দ্রলাল চিকিৎসাবিদ্যার পাঠক্রম যথোপযুক্ত মনোযোগের সঙ্গেই অধ্যয়ন করতে থাকেন।

এই সময় মহামতি ডেভিড হেয়ার ছিলেন মেডিকেল কলেজের সম্পাদক। রাজেন্দ্রলাল তাঁর অসাধারণ মেধা ও পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য অনেক পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মেডিকেল কলেজের পড়া শেষ হবার আগেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং রাজেন্দ্রলালকে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিজ ব্যয়ে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু পিতার অনুমতি না পাওয়ায় রাজেন্দ্রলালের ইংল্যাণ্ড যাওয়া সম্ভব হল না।

দুর্ভাগ্য এমনই যে চিকিৎসাবিদ্যায় গভীর আগ্রহ ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও মেডিকেল কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না রাজেন্দ্রলাল।

কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের কোনও বিষয়ে গণ্ডগোল বেঁধেছিল। রাজেন্দ্রলাল অভিযুক্ত ছাত্রদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় দোষী ছাত্রদের সঙ্গে তাঁকেও শাস্তি পেতে হয়।

অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তাঁকেও শেষ পর্যন্ত ১৮৪১ খ্রিঃ মেডিকেল কলেজ ছাড়তে হল। ফল হল চিকিৎসাবিদ্যার শেষ পরীক্ষা আর তাঁর দেওয়া হয়ে উঠল না।

এরপর রাজেন্দ্রলাল ভর্তি হলেন আইন কলেজে। আইন বিষয়েও তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেন। যথাসময়ে আইন পরীক্ষা সম্পূর্ণও করলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরীক্ষার সমস্ত উত্তরপত্র খোয়া যাওয়াতে সেবছর পরীক্ষাটি বাতিল হয়ে গেল। ফলে আইনের ডিগ্রিও রাজেন্দ্রলালের অধরাই থেকে গেল। পরে তিনি আর আইন পরীক্ষা দেননি।

ভাগ্যের কী আশ্চর্য পরিহাস, অধ্যবসায়ী মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল না পারলেন চিকিৎসক হতে না পারলেন আইনজীবী হতে। দুই বিদ্যারই প্রথাগত শিক্ষালাভ তাঁর জীবনে অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করতে না পারলেও চিকিৎসাবিদ্যা এবং আইন বিষয়ে অধীত জ্ঞান রাজেন্দ্রলালের জীবনে সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করেছিল।

পরবর্তী জীবনে জ্ঞান চর্চায় ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তা ছিল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষারই ফলশ্রুতি।

তাঁর আইনের শিক্ষাও তাঁকে বিভিন্ন বক্তৃতায় ও বিতর্কের সময়ে নিজস্ব শাণিত যুক্তির যথাযোগ্য উপস্থাপনায় প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

ছাত্রজীবনে অধীত কোনও শিক্ষাই তাঁর ব্যর্থ হয়নি। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন প্রকৃত অর্থেই স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত।

আপাতদৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ডিগ্রি না পাওয়ায় রাজেন্দ্রলালের জীবন ব্যর্থ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিধিবদ্ধ শিক্ষার আওতার বাইরে

রাজেন্দ্রলালের জীবনে সাফল্যের শুরু এই আপাত ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই। তাঁর প্রকৃত বিদ্যাচর্চা তথা জ্ঞানচর্চার সূচনা হয় এই অবস্থার পর থেকেই।

প্রথমে ভাষা চর্চার প্রতি মনোযোগী হলেন রাজেন্দ্রলাল। বিদ্যালয়ে তিনি বাংলার সঙ্গে শিখেছিলেন, ইংরাজী ও ফারসী।

সেই ভাষাগুলির সঙ্গে এবারে তিনি নতুন উদ্যমে শিখতে লাগলেন স্বদেশীয় সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দুর সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি। ক্রমে গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলিও তিনি আয়ত্ত করতে থাকেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করার ফলে রাজেন্দ্রলাল অনিবার্যভাবেই ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠেন। প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারততত্ত্বের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

এইভাবেই এই দুই বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যতের মৌলিক গবেষণার ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষার ফলে তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। ফলে তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের মাধ্যমে মুক্তমনা যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা তাঁর পক্ষে সহজতর হয়েছিল।

আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল রাজেন্দ্রলালের পিতার পক্ষে বৃহৎ পরিবারটির ভার বহন করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই রাজেন্দ্রলালকে মাত্র তেইশ বছর বয়সেই ১৮৪৬ খ্রিঃ এশিয়াটিক সোসাইটিতে চাকরি নিতে হল। তিনি সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দেন।

দীর্ঘ দশ বৎসর, ১৮৫৬ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল এই চাকরি করেন। পরে এই বৈতনিক পদ ত্যাগ করে তিনি সোসাইটির সদস্য ও সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন।

এই অবৈতনিক দায়িত্ব প্রতিপালন করে তিনি আমৃত্যু এশিয়াটিক সোসাইটির অক্লান্ত সেবা করে গেছেন।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ইংরাজরাই এদেশের মানুষের পরিচয় ঘটিয়েছিল। বিদ্যোৎসাহী ইংরাজরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল এশিয়াটিক সোসাইটি।

এই সোসাইটির আগ্রহে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সেই সঙ্গে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মূর্তিতত্ত্ব, শিলালেখ, অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা ও গবেষণার জন্য প্রাচ্যবিদ্যা নামে জ্ঞানের এক শাখা সৃষ্টি হয়েছিল।

তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মেডিকেল কলেজের পড়া শেষ হবার আগেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং রাজেন্দ্রলালকে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিজ ব্যয়ে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু পিতার অনুমতি না পাওয়ায় রাজেন্দ্রলালের ইংল্যাণ্ড যাওয়া সম্ভব হল না।

দুর্ভাগ্য এমনই যে চিকিৎসাবিদ্যায় গভীর আগ্রহ ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও মেডিকেল কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না রাজেন্দ্রলাল।

কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের কোনও বিষয়ে গণ্ডগোল বেঁধেছিল। রাজেন্দ্রলাল অভিযুক্ত ছাত্রদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় দোষী ছাত্রদের সঙ্গে তাঁকেও শাস্তি পেতে হয়।

অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তাঁকেও শেষ পর্যন্ত ১৮৪১ খ্রিঃ মেডিকেল কলেজ ছাড়তে হল। ফল হল চিকিৎসাবিদ্যার শেষ পরীক্ষা আর তাঁর দেওয়া হয়ে উঠল না।

এরপর রাজেন্দ্রলাল ভর্তি হলেন আইন কলেজে। আইন বিষয়েও তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেন। যথাসময়ে আইন পরীক্ষা সম্পূর্ণও করলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরীক্ষার সমস্ত উত্তরপত্র খোয়া যাওয়াতে সেবছর পরীক্ষাটি বাতিল হয়ে গেল। ফলে আইনের ডিগ্রিও রাজেন্দ্রলালের অধরাই থেকে গেল। পরে তিনি আর আইন পরীক্ষা দেননি।

ভাগ্যের কী আশ্চর্য পরিহাস, অধ্যবসায়ী মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল না পারলেন চিকিৎসক হতে না পারলেন আইনজীবী হতে। দুই বিদ্যারই প্রথাগত শিক্ষালাভ তাঁর জীবনে অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করতে না পারলেও চিকিৎসাবিদ্যা এবং আইন বিষয়ে অধীত জ্ঞান রাজেন্দ্রলালের জীবনে সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করেছিল।

পরবর্তী জীবনে জ্ঞান চর্চায় ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তা ছিল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষারই ফলশ্রুতি।

তাঁর আইনের শিক্ষাও তাঁকে বিভিন্ন বক্তৃতায় ও বিতর্কের সময়ে নিজস্ব শাণিত যুক্তির যথাযোগ্য উপস্থাপনায় প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

ছাত্রজীবনে অধীত কোনও শিক্ষাই তাঁর ব্যর্থ হয়নি। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন প্রকৃত অর্থেই স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত।

আপাতদৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ডিগ্রি না পাওয়ায় রাজেন্দ্রলালের জীবন ব্যর্থ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিধিবদ্ধ শিক্ষার আওতার বাইরে

রাজেন্দ্রলালের জীবনে সাফল্যের শুরু এই আপাত ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই। তাঁর প্রকৃত বিদ্যাচর্চা তথা জ্ঞানচর্চার সূচনা হয় এই অবস্থার পর থেকেই।

প্রথমে ভাষা চর্চার প্রতি মনোযোগী হলেন রাজেন্দ্রলাল। বিদ্যালয়ে তিনি বাংলার সঙ্গে শিখেছিলেন, ইংরাজী ও ফারসী।

সেই ভাষাগুলির সঙ্গে এবারে তিনি নতুন উদ্যমে শিখতে লাগলেন স্বদেশীয় সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দুর সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি। ক্রমে গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলিও তিনি আয়ত্ত করতে থাকেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করার ফলে রাজেন্দ্রলাল অনিবার্যভাবেই ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠেন। প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারততত্ত্বের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

এইভাবেই এই দুই বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যতের মৌলিক গবেষণার ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষার ফলে তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। ফলে তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের মাধ্যমে মুক্তমনা যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা তাঁর পক্ষে সহজতর হয়েছিল।

আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল রাজেন্দ্রলালের পিতার পক্ষে বৃহৎ পরিবারটির ভার বহন করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই রাজেন্দ্রলালকে মাত্র তেইশ বছর বয়সেই ১৮৪৬ খ্রিঃ এশিয়াটিক সোসাইটিতে চাকরি নিতে হল। তিনি সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দেন।

দীর্ঘ দশ বৎসর, ১৮৫৬ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল এই চাকরি করেন। পরে এই বৈতনিক পদ ত্যাগ করে তিনি সোসাইটির সদস্য ও সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন।

এই অবৈতনিক দায়িত্ব প্রতিপালন করে তিনি আমৃত্যু এশিয়াটিক সোসাইটির অক্লান্ত সেবা করে গেছেন।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ইংরাজরাই এদেশের মানুষের পরিচয় ঘটিয়েছিল। বিদ্যোৎসাহী ইংরাজরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল এশিয়াটিক সোসাইটি।

এই সোসাইটির আগ্রহে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সেই সঙ্গে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মূর্তিতত্ত্ব, শিলালেখ, অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা ও গবেষণার জন্য প্রাচ্যবিদ্যা নামে জ্ঞানের এক শাখা সৃষ্টি হয়েছিল।

স্যার ইউলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ খ্রিঃ প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি। এখানে বিশাল সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব পাওয়ায় রাজেন্দ্রলাল স্বাভাবতঃই প্রাচ্যতত্ত্ব গবেষণার নতুন নতুন দিকের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

ভারতীয়দের মধ্যে রাজেন্দ্রলালই প্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিদ্যাচর্চার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণার কাজে লিপ্ত হন।

সংস্কৃত, ফারসী ছাড়াও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা জানা থাকায় তিনি সোসাইটির বিভিন্ন ভাষার পুঁথি পাঠ করার সুযোগ পেলেন।

ক্রমে অক্ষর ও লিপি বিষয়েও তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে এবিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান শিলালেখ, লিপিমালা, অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে নতুন নতুন দিকের সন্ধান দেয়।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক ও প্রামাণিক উপাদান নিয়ে তিনি গবেষণা করতে থাকেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে যোগদানের পরের বছর থেকেই রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির সাময়িক পত্রে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন।

সোসাইটি প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ব্যক্তিগত গবেষণা ছাড়াও ভবিষ্যতে গবেষকদের সহায়তার জন্য এই সময় থেকেই তিনি নিরলস ভাবে এমন কিছু কাজ করেন যা গবেষকদের কাছে তথ্যের প্রামাণিক উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য সন্ধানের কাজে পুঁথিই হল একমাত্র অবলম্বন। রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত অসংখ্য সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ সংবলিত একটি তালিকা তৈরি করে।

এছাড়াও অদম্য উৎসাহ ও কঠোর পরিশ্রমে তিনি প্রস্তুত করেন অযোধ্যার সংস্কৃত পুঁথির তালিকা, স্থানীয় গ্রন্থাগারের সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ, বিকানীর মহারাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা।

এই সমস্ত তালিকা তিনি একত্র গ্রথিত করেন নোটিশেস অব সানস্ক্রিট ম্যানাসক্রিপটস নামে।

কেবল পুঁথির কাজ নয়, সোসাইটির মিউজিয়মে বক্ষিত প্রত্নবস্তুর তালিকা প্রস্তুত, সোসাইটির বই ও মানচিত্রের তালিকা, সোসাইটির জার্নালের লেখক-সূচী ও রচনাসূচী প্রণয়ন প্রভৃতি রাজেন্দ্রলালের উদ্যম ও কঠোর পরিশ্রমের পরিচয়।

১৮৩৯ খ্রিঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গেও রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

এই পত্রিকায় অত্যন্ত উচ্চমানের মননশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। রাজেন্দ্রলাল দীর্ঘকাল এই পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্বাচনী সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁর নিজেরও অনেক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জনসাধারণের জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও স্বল্পমূল্যে বিতরণের জন্য কলকাতায় ১৮১৭ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্কুলবুক সোসাইটি।

এদেশীয় ও ইউরোপীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও পন্ডিত ব্যক্তি এই সংস্থার উদ্যোক্তা ছিলেন। সমিতির কার্যকরী সভার সক্রিয় সদস্য ও গ্রন্থকার হিসাবে রাজেন্দ্রলালের অপরিসীম অবদান ছিল।

স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের বইগুলি হল, প্রাকৃতিক ভূগোল অর্থাৎ ভূমণ্ডলের নৈসর্গিকাবস্থা বর্ণন-বিষয়ক গ্রন্থ, ব্যাকরণ প্রবেশ অর্থাৎ বঙ্গভাষার ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ, পত্রকৌমুদী, পত্রাদি লেখনের উপদেশক গ্রন্থ প্রভৃতি।

গ্রন্থ রচনা ছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজেন্দ্রলাল সঙ্কলিত কয়েকটি মানচিত্র, অ্যাটলাস, ভৌত ভূগোল সংক্রান্ত বিবরণ, বাংলা ও ওড়িশার জেলাগুলির অ্যাটলাস, দেওয়াল মানচিত্র ইত্যাদি সোসাইটি প্রকাশ করেছিল।

নিজের গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য রাজেন্দ্রলাল অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। শিক্ষা বিস্তারের কাজকে তিনি তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

দেশের বিদ্বৎসমাজ ইংরাজির সঙ্গে বাংলায় পঠন-পাঠনের অগ্রগতির জন্যও সচেষ্ট ছিলেন। ফলে ক্রমশই বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকায় বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য স্কুলপাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৮৫০ খ্রিঃ কলকাতায় একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙালী পণ্ডিতের সম্মিলিত সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ তথা ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন এই সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা।

এই সমিতির পক্ষে তিনি সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় বিচিত্র বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। তাঁর রচিত শিল্পিক দর্শন অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পদার্থ কতিপয়ের প্রস্তুতকরণের বিবরণ গ্রন্থ, শিবাজীর চরিত্র, অর্থাৎ যবন প্রমর্দক মহারাষ্ট্রীয় বীর প্রধানের জীবন বৃত্তান্ত, মেবারের রাজেতিবৃত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ এই সমিতি থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম গ্রন্থরচনা করেন রাজেন্দ্রলাল।

সমিতির অর্থসাহায্যে রাজেন্দ্রলাল নিজ সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রিঃ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির পরিচয়জ্ঞাপক সূত্র ছিল এরকম— "পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণীবিদ্যা-শিল্পসাহিত্যাদি-দ্যোতক-মাসিক পত্রিকা।"

রাজেন্দ্রলালের বহুমুখী জ্ঞানচর্চার প্রসার কত বিস্তৃত ও বিচিত্র ছিল তা বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার বিষয়সূচী থেকেই বোঝা যায়।

প্রসিদ্ধ মহাত্মাদের জীবনী, পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস, প্রাচীন তীর্থ, স্বভাব-সিদ্ধ রহস্যবিষয়, জীবসংস্থার বিবরণ, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নীতিগর্ভ উপন্যাস, প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও গ্রন্থ সমালোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার প্রথম ছয়টি পর্ব রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

স্বল্পায়ু পত্রিকাটির সপ্তম ও শেষ পর্বটি সম্পাদনা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

এই সমিতির পক্ষ থেকে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৬৩ খ্রিঃ রহস্য সন্দর্ভ নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটি ছিল সচিত্র এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর রচিত তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও রচনা এতে প্রকাশিত হত।

দেশীয় যুবকগণ যাতে অঙ্কনশিল্প, স্থাপত্য ও কারিগরিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে Hodgson Pratt -এর উৎসাহ ও উদ্যোগে কলকাতায় ১৮৫৪ খ্রিঃ মার্চ মাসে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা তথা সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সভার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন রাজেন্দ্রলাল এবং তিনি হন সম্পাদক। অঙ্কনশিল্প, স্থাপত্য ও মূর্তিশিল্প প্রভৃতি সুকুমার কলা ও কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষা লাভের জন্য তিনি যুবকগণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতেন।

শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার পরিচালনাতেই এদেশে প্রথম যে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাই বর্তমানের সরকারী আর্ট কলেজ নামে পরিচিত।

বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের প্রসারে রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল অসাধারণ। বৃত্তিমূলক শিল্পবিদ্যার প্রতিও যাতে যুবকদের আগ্রহবৃদ্ধি পায় এবিষয়ে তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না।

১৮৫৪ খ্রিঃ তাঁরই চেষ্টায় শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে চিৎপুরে পক্ষকালব্যাপী একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়।

১৮৫৬ খ্রিঃ জানুয়ারী মাসে ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত

হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই রাজেন্দ্রলাল এই সমিতির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

এই সোসাইটির যে মুখপত্র প্রকাশিত হয় তার প্রথম তিনটি সংখ্যায় ফটোগ্রাফিক টেকনিক্যাল বিষয়ে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় পত্রিকা থেকে এই প্রবন্ধগুলি রাজেন্দ্রলাল অনুবাদ করেছিলেন।

১৮৪৬ খ্রিঃ রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর ১৮৫৬ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এখানে সবেতন কাজ করেন।

তবে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অটুট ছিল আমৃত্যু। কখনও সহ-সভাপতি, কখনও সম্পাদক এবং সব শেষে তিনি সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি হন।

১৮৫৬ খ্রিঃ রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির বৈতনিক পদ ত্যাগ করে সরকার প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ডস ইনসটিটিউশনে অধ্যক্ষপদে যোগ দেন।

লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মোতাবেক সরকারি কোর্ট অব ওয়ার্ডস দেশের জমিদারদের মধ্যে যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক উত্তরাধিকারী রেখে মারা যেতেন তাদের জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

এই ব্যবস্থায় জমিদারী রক্ষা হত বটে তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদারতনয়দের উপযুক্ত শিক্ষালাভের কোনও ব্যবস্থা করা হত না।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সরকার অপ্রাপ্ত বয়স্ক জমিদারপুত্রদের শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ডস ইনসটিটিউট স্থাপন করেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের অধ্যক্ষতায় ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এখানে জমিদারপুত্রগণ বিদ্যাশিক্ষা, চরিত্রগঠন ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করত।

১৮৮১ খ্রিঃ গভর্নমেণ্ট ওয়ার্ডস ইনসটিটিউশন বন্ধ হয়ে গেলে রাজেন্দ্রলাল সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

রাজেন্দ্রলাল দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। প্রশাসনিক বিষয়েও তিনি কার্যকরী অংশগ্রহণ করতেন।

রাজেন্দ্রলালের বহু-বিচিত্র মনীষার স্বীকৃতি হিসেবে ১৮৭৬ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সর্বপ্রথম সম্মানসূচক ডক্টর অব ল উপাধি প্রদান করেন।

এই সালেই কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন এবং এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার জন্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় পৌরপ্রতিষ্ঠানে ও বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে রাজেন্দ্রলালের ওজস্বিনী বক্তৃতা ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

তাঁর সময়কালে রাজেন্দ্রলাল দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এমনই বিস্ময়কর ছিল তাঁর বহু বিচিত্রগামী মনীষা ও কর্মোদ্যম।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। এদেশে মূলত বৃটিশদের উদ্যোগেই রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। রাজেন্দ্রলাল এই সভার সক্রিয় সদস্য ছিলেন ও পরে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি নামক সমাজ সংস্কারমূলক সমিতি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। রাজেন্দ্রলাল এই সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই সভার পক্ষ থেকে প্রচলিত আইনের সংস্কার, নতুন আইনের প্রবর্তন বা বিতর্কিত কোন আইন প্রসঙ্গে নানা প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভার কাছে পাঠানো হত।

সেকালের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় রাজেন্দ্রলালের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

সর্ববিষয়ে রাজেন্দ্রলালের সর্বজনমান্যতা ও জনপ্রিয়তা এমনই ছিল যে সেকালে যেসব সাধারণ সভা, কিংবা শিক্ষাসংক্রান্ত বা গবেষণা বিষয়ক, সমাজসংস্কার বিষয়ক, রাজনৈতিক, আইন বিষয়ক, এমনকি স্মৃতিসভা অথবা সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হত, সেখানে রাজেন্দ্রলালের উপস্থিতি ছিল অবধারিত।

সভাপতি অথবা প্রধান বক্তা হিসাবে সভায় উপস্থিত থেকে তিনি সুচিন্তিত যুক্তি ও তথ্য সহকারে চিত্তগ্রাহী ভাষায় নিজ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতেন। তিনি যে কোন বিষয়ে যে কোন অবস্থায় সারগর্ভ বক্তব্য রাখতে পারতেন, এমনই ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা।

তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, রসবোধ, অটল প্রত্যয়, যুক্তিজাল বিন্যাসের নৈপুণ্য ও অন্তর্দৃষ্টি শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রাখত।

সেকালের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেই রাজেন্দ্রলাল সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতেন। সকল ক্ষেত্রেই তাঁর নেতৃত্ব ছিল প্রশ্নাতীত।

তাঁর মূল্যবান গবেষণা ও অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য রাজেন্দ্রলালকে যেমন দেশের তেমনি বিদেশেরও বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সারস্বত সভার সম্মানীয় সদস্য করা হয়েছিল।

১৮৬৪ খ্রিঃ তিনি জার্মানীর ওরিয়েন্টাল সোসাইটির সদস্য হন। ১৮৬৫ খ্রিঃ হাঙ্গেরীর রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ড-এর সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৬৭ খ্রিঃ আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য হন। ১৮৬৭ খ্রিঃ সদস্য হন লন্ডনস্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের।

এই সমস্ত সমিতির পত্রিকাতেই রাজেন্দ্রলালের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি অব ইটালি, রয়্যাল সোসাইটি অব নর্দার্ন অ্যান্টিকুইটিজ (ডেনমার্ক), এনথোলজিক্যাল সোসাইটি অব বার্লিন, ইটালিয়ান ইনসটিটিউট ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব নলেজ প্রভৃতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

রাজেন্দ্রলালের অতিমানবীয় কর্মধারা ও প্রতিভার অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ভারতের ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৭ খ্রিঃ রাজেন্দ্রলালকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়ে সম্মানীত করেন। পরের বছরই তিনি কম্যাণ্ডার অব ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার (সি. আই. ই) উপাধি লাভ করেন। পরে ১৮৮০ খ্রিঃ তিনি রাজা উপাধিতে ভূষিত হন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির উদ্যোগে ১৮৮২ খ্রিঃ সারস্বত সমাজ নামে একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পাদক।

এই সমিতি বাংলা পরিভাষা রচনার কাজের উদ্যোগ নিলে মুখ্যতঃ রাজেন্দ্রলালের একার চেষ্টাতেই এ কাজ হতে থাকে। ভৌগোলিক পরিভাষা রচনার বেশ কিছু কাজ তিনি এসময় করেছিলেন।

তবে এই শ্রমসাপেক্ষ কাজ সদস্যদের উৎসাহের অভাবে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

রাজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বাধীনচেতা নীতিনিষ্ঠ পুরুষ। যেখানে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থ জড়িত, সেখানে তিনি কখনও আপোষ করতেন না।

পুরসভার কমিশনার নির্বাচিত হবার পর তিনি সেখানকার দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের মূলোৎপাটন করেন। জনস্বার্থের পরিপন্থী নীতি বা কাজ তিনি কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করেছেন।

তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "...তিনি কেবল মননশীল লেখকই ছিলেন না.......তাঁহার মূর্তিতে মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ হইত। অথচ যোদ্ধাবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল। মিউনিসিপ্যাল, সেনেটের সভায় সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।...রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান — কখনো পরাভূত হইতে জানিতেন না।

স্পষ্টবক্তা ও স্বাধীনচেতা রাজেন্দ্রলালকে ইংরাজরা সহ্য করতে পারত না। টাউন হলের এক সভায় ইংরাজ নীলকর বণিকদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে ভারতে যেসব ইংরাজ আসে তার অধিকাংশই বিলাতী সমাজের আবর্জনা।

তাঁর এই মন্তব্যে ঔপনিবেশিক ইংরাজদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করার সাহস কারও হয়নি।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রাজেন্দ্রলালের কি সাংস্কৃতিক, কি সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা এবং কৃতিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর মনন, মনীষা এবং কর্মকৃতিত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন এখনও আমরা করে উঠতে পারিনি।

ইতিহাস গবেষণা, সামাজিক সংস্কার এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির ধারায় বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রাজেন্দ্রলালের ভূমিকা ছিল পথিকৃতের।

বাংলার নবজাগরণের এক শ্রেষ্ঠ মনীষা ও সংগ্রামী অগ্র-পথিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৯১ খ্রিঃ ২৬ জুলাই পরলোকগমন করেন।

শশাঙ্ক

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাঙালী সম্রাট ছিলেন মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব। তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে জানার মতো ঐতিহাসিক মালমশলা অপ্রচুর হলেও বিভিন্ন স্থানে তাঁর যে মুদ্রা বা শিলালিপি উদ্ধার হয়েছে, তা থেকেই তাঁর অপূর্ব শৌর্য ও মহাপুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমান উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নাম ছিল গৌড়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে সেখানেই রাজত্ব করতেন শশাঙ্ক। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণপুর।

আধুনিক মুর্শিদাবাদের বহরমপুর সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাঙামাটি নামক স্থানে ছিল প্রাচীন কর্ণসুবর্ণপুরের অবস্থান। সমসাময়িক কালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল এই রাজধানীনগর।

সম্রাট শশাঙ্কই গৌড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে উৎকল, মগধ ও কম্বোজ পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করে তিনি এক সুবিশাল স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চেষ্টাতেই লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক অখন্ড বাঙালী জাতিসত্তা।

একটি প্রাচীন শিলালিপিতে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য" উল্লেখ থেকে জানা যায়, প্রথম জীবনে শশাঙ্ক স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। তাঁর চেয়েও বড় কোনও নৃপতির অধীন ছিলেন তিনি।

ঐতিহাসিকদের অনুমান শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত বংশের শেষ রাজা মহাসেন গুপ্তের মহাসামন্ত।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছে। অরাজক হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ। দিকে দিকে ছোট ছোট রাজারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর রাজ সিংহাসনের অধিকার পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম পুত্র কুমারগুপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল গোবিন্দগুপ্ত।

কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষদিকেই গুপ্ত সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এবং তাঁর বংশও লোপ পায়। সেই সময়ে গোবিন্দগুপ্তের বংশধরগণ মগধ ও গৌড় প্রভৃতি দেশে রাজত্ব করতেন। এই বংশেরই অন্যতম বংশধর মহাসেনগুপ্ত ছিলেন মগধের অধিপতি। শশাঙ্কদেব তাঁরই মহাসামন্ত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

শশাঙ্কদেবের পূর্বপুরুষদের কথা কিছু জানা যায় না। তাঁর পূর্বজীবন সম্পর্কেও ইতিহাস নীরব। তাঁকে আমরা পাই গৌড়ের সামন্ত রাজা রূপে এবং পরে, উত্তরপূর্ব ভারতব্যাপী বিশাল এক সাম্রাজ্যের স্বাধীন সম্রাট রূপে। কামরূপ ব্যতীত সমগ্র বঙ্গ, মগধ (বিহার), উৎকল ও কম্বোজ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

একজন সামন্ত রাজা থেকে স্বাধীন সম্রাট — শশাঙ্কের এই ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল ভারতবর্ষের এক সঙ্কটময় অবস্থার সুযোগে। উদ্যোগী পুরুষসিংহ শশাঙ্ক আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সুযোগকে ব্যর্থ হতে দেননি।

মগধ-গৌড়ের অধিপতি ছিলেন মহাসেনগুপ্ত। মধ্যপ্রদেশের কালচুরী বংশীয় এক রাজার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিব্বতের শক্তিশালী রাজা স্রং সান্-এর প্রবল আক্রমণে রাজ্য তছনছ হয়ে যায়।

এই সুযোগে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয় রাজা কীর্তিবর্মণ ঘোষণা করলেন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করে তিনি নিজ অধিকারে এনেছেন।

এই ভাবে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে নেমে আসে এক চরম অরাজকতা। একজন যোগ্য নায়কের অভাবে দেশব্যাপী এই অরাজকতা ক্রমেই বিপ্লবের রূপ নিতে থাকে।

আমরা অনুমান করতে পারি শশাঙ্ক ছিলেন একাধারে তেজস্বী, সাহসী, সুচতুর ও সুকৌশলী যোদ্ধা। ক্ষুদ্র গৌড় রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেই তিনি তুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট থাকেন নি।

বিদেশী শত্রুর আক্রমণে সোনার গৌড়-বঙ্গ ছারখার হবার আগেই শশাঙ্ক বাংলার বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের সংগঠিত করে সর্বপ্রথম বাঙালী জাতীয়তাবোধের

উদ্বোধন ঘটালেন এবং সুসংগঠিত এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শত্রুসৈন্যের ওপরে।

ইতিহাসের অন্ধ যবনিকায় আচ্ছন্ন এই পর্বের পরেই আমরা দেখতে পাই উত্তর-পূর্ব ভারতের সিংহাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত রয়েছেন প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন সম্রাট নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্কদেব। দেশ ও জাতির মুক্তিদাতা রূপে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে প্রথম বাঙালী সম্রাট শশাঙ্কের কীর্তিগাথা।

এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে, বর্তমান পাঞ্জাব প্রদেশে ছিল শক্তিশালী থানেশ্বর রাজ্য। সেখানে বাজত্ব করতেন প্রভাকরবর্ধন। তাঁর দুই পুত্র রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন ও এক কন্যা রাজ্যশ্রী।

রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়েছিল কনোজের মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্মণের সঙ্গে।

মৌখরি বংশ মগধ ও গৌড়ের পুরাতন শত্রু। এই বংশের রাজারা বারবার চেষ্টা করেছেন মগধ ও গৌড়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। থানেশ্বর রাজ্যের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে যুক্ত হওয়ার ফলে গ্রহবর্মণ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন।

গৌড় রাজ্যের পূর্বে আধুনিক আসাম প্রদেশে ছিল কামরূপ রাজ্যের অবস্থান। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ ছিলেন শশাঙ্কের পূর্বশত্রু।

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, পূর্বে কোনও এক সময়ে সম্ভবতঃ শশাঙ্ক সম্মুখযুদ্ধে কামরূপরাজকে পরাস্ত করেছিলেন। সেই কারণে ভাস্করবর্মণ শত্রুতা পোষণ করতেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ সন্ধানে তৎপর ছিলেন।

শশাঙ্কের নবপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের দুই প্রান্তে ছিল এই দুই পরম শত্রুরাজ্যের অবস্থান। এই পরিস্থিতিতে বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ শশাঙ্ক বুঝতে পারলেন শত্রুকে শিয়রে রেখে নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন অসম্ভব। তিনি শত্রুর আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষা না রেখেই উত্তরাপথ অভিমুখে তাঁর বিজয়বাহিনীকে চালনা করলেন।

গ্রহবর্মণ আক্রান্ত হলে তাঁর শ্বশুর থানেশ্বররাজ নিশ্চিতভাবেই জামাতার সাহায্যের জন্য সসৈন্যে এগিয়ে আসবে। শশাঙ্ককে যুদ্ধ করতে হবে দুই রাজার সঙ্গে।

নিজের রাজ্য থেকে এতদূরে গিয়ে দুই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবার আগে সুকৌশলী শশাঙ্ক মধ্যভারতের মালব প্রদেশের দেবগুপ্তের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

দেবগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশীয় রাজা। গুপ্তবংশের রাজত্ব লোপ পেলেও সেই সময়ে ভারতের নানান দিকে এই বংশের কয়েকজন নৃপতি রাজত্ব করতেন।

মালবরাজ দেবগুপ্ত তেমনই একজন এবং মৌখরিরা ছিল গুপ্তদের চিরশত্রু। এই দুই বংশের শত্রুতাকেই শশাঙ্ক ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হলেন।

দেবগুপ্ত সাগ্রহেই শশাঙ্কের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্বীকার করে নিলেন।

ঘটনাচক্রে এই সময়ে থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধণ পরলোক গমন করলেন। মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণকে আক্রমণ করার এই উপযুক্ত সুযোগ। শশাঙ্ক দূত মারফত দেবগুপ্তকে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার বার্তা পাঠালেন এবং তিনি নিজেও দেবগুপ্তের সাহায্যে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন।

শশাঙ্কের নির্দেশে দেবগুপ্ত অবিলম্বে মৌখরিদের রাজ্য আক্রমণ করলেন। প্রবল যুদ্ধ হল। যুদ্ধে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণ পরাজিত ও নিহত হলেন।

দেবগুপ্ত গুপ্তবংশের চিরশত্রু মৌখরিরাজ্যের রাজধানী কনোজ অধিকার করলেন। থানেশ্বরের রাজকন্যা ও মৌখরিরাজের পত্নী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হলেন।

ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধণ থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহন করেছেন। ভগ্নীপতি গ্রহবর্মণের মৃত্যু ও ভগ্নী রাজ্যশ্রীর বন্দিদশার সংবাদ যথাকালে তাঁর কাছে পৌঁছল। তিনি অবিলম্বে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সঙ্গে মিলিত হবার আগেই ঝড়ের বেগে অগ্রসর হয়ে কনোজ আক্রমণ করলেন।

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না দেবগুপ্ত। রাজ্যবর্ধনের আক্রমণ তিনি প্রতিরোধ করতে পারলেন না।

শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সাহায্যে সসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগেই দেবগুপ্ত যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হলেন। দেবগুপ্তের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের প্রচুর সৈনক্ষয় হয়েছিল। যুদ্ধজয়ের উন্মাদনায় নতুন করে সৈন্যবলবৃদ্ধির অপেক্ষা না করে তিনি এক হঠকারী কাজ করে বসলেন। তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে অভিজ্ঞ যোদ্ধা শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ফল যা হবার তাই হল। রাজ্যবর্ধন পরাস্ত ও নিহত হলেন।

থানেশ্বরের রাজকন্যা ও কনোজের রানী রাজ্যশ্রী কারাবন্দিনী ছিলেন। যুদ্ধের গোলযোগের সুযোগে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে বিন্ধ্যারণ্যের দিকে পলায়ন করেন।

শশাঙ্ক যে উদ্দেশ্যে গৌড় থেকে উত্তর ভারতে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, রাজ্যবর্ধনের পতনে তাঁর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। চিরশত্রু মৌখরিদের দর্প চূর্ণ হয়েছে, কনোজ গৌড়ের রাজপতাকার অধীন হয়েছে।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল, থানেশ্বরের নতুন রাজা রাজপুত্র হর্ষবর্ধন বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শশাঙ্ককে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন।

ওদিকে শশাঙ্কের অবর্তমানে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণও মাথাচাড়া দিয়েছেন। তিনি হর্ষবর্ধনের পক্ষ অবলম্বন করে সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে হানা দিয়েছেন।

শশাঙ্ক পড়লেন উভয়সঙ্কটে। দুই দিকে দুই প্রবল শত্রু; রাজধানী অরক্ষিত। বিচক্ষণ গৌড়াধিপ অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি পরাজিত ও নিহত মৌখরিরাজের ছোটভাই অবন্তীবর্মণকে সামন্তরাজা করে কনোজের সিংহাসনে বসিয়ে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এদিকে হর্ষবর্ধন সংবাদ পেয়েছেন, ভগ্নী রাজ্যশ্রী বিন্ধ্যপর্বতে আদিবাসীদের আশ্রয়ে রয়েছেন। তিনি রাজ্যশ্রীর সন্ধানে অরণ্যে প্রবেশ করে একস্থানে এসে দেখতে পেলেন, রাজ্যশ্রী জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জনের উদ্যোগ করছেন।

ভগ্নীকে উদ্ধার করে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের সন্ধানে ধাবিত হলেন। এরপরের ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের কোথাও যুদ্ধ হয়েছে কিনা তার কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এটা জানা যায় শশাঙ্ক তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে নির্বিঘ্নেই নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন।

হর্ষবর্ধনও অগ্রসর হয়ে যে মগধ ও বঙ্গদেশ আক্রমণ করেননি এবং সে যাত্রা স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা এই যুদ্ধঘটনার পরেও সম্রাট শশাঙ্কদেব নিজের সাম্রাজ্যে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শশাঙ্কদেব মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশ বৎসর সগৌরবে রাজত্ব করেন।

জীবতিকালে তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। একদিকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ হর্ষবর্ধন এবং আর একদিকে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ, এই দুই পরাক্রান্ত শত্রু মগধ ও বঙ্গদেশের কোনও ক্ষতি সাধন করতে পারেননি বা শশাঙ্কের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে পারেননি। ৬১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত গৌড়বঙ্গ, উৎকল, মগধ ও কম্বোজ্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত শশাঙ্কদেবের শাসনাধীন ছিল।

সম্রাট শশাঙ্কের মৃত্যুর তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ৬১৯ খ্রিঃ পরেও এবং ৬৩৭ খ্রিঃ কিছু আগে পর্যন্ত তিনি জীবতি ছিলেন একথা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে। শশাঙ্কের শক্তি ও বীরত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে তাঁর শাসনকালের অব্যবহিত পরেই সাম্রাজ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটে।

পূর্বদিক থেকে হানা দেন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আবির্ভাব ঘটে আর্যাবর্তের সম্রাট হর্ষবর্ধনের। হর্ষবর্ধন মগধ ও গৌড়বঙ্গ অধিকার করে নেন।

অথচ শশাঙ্কদেব বর্তমান থাকতে এমন ক্ষমতা বা সাহস তাঁদের কারুরই হয়নি।

সম্রাট শশাঙ্কের এক পুত্রের নাম জানা যায়। তাঁর নাম মানব। কিন্তু তিনি ছিলেন কীর্তিমান পিতার অযোগ্য পুত্র। মাত্র আটমাস পাঁচদিন তিনি রাজ্যশাসন করতে পেরেছিলেন।

লর্ড র‍্যালি

উনিশ শতকের পদার্থবিদ্যার আধুনিক গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ লর্ড র‍্যালি। তাঁর গবেষণালব্ধ ভূমির ওপরেই পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যতের গভীরতর গবেষণার বিস্তার ঘটে।

পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক গবেষক হিসাবে র‍্যালির প্রারম্ভিক বিষয় ছিল আলো ও কম্পাঙ্ক। পরবর্তীকালে বহুধা বিস্তৃত হয় তাঁর গবেষণা—পদার্থবিদ্যার প্রায় সকল শাখাতেই।

তড়িৎ চুম্বকতত্ত্ব, তড়িৎগতীয় বিদ্যা, আলোক বিক্ষেপ, শব্দ, বর্ণদর্শন, তরঙ্গতত্ত্ব, বায়বীয় পদার্থের ঘনত্ব, স্থিতিস্থাপকতা, আলোকচিত্র, তরলের প্রবাহ, ইত্যাদি ছাড়াও রোধ, প্রবাহ ও তড়িৎচালকবলের একক প্রতিষ্ঠার বিষয়েও তিনি কাজ করেছেন।

বিশেষ করে তড়িৎ ও চুম্বক বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত।

বিশ্ব বিজ্ঞানে লর্ড র‍্যালির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বাতাস থেকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিসাবে আর্গনের আবিষ্কার ও পৃথকীকরণ।

বিজ্ঞানী র‍্যালির জন্ম ইংলন্ডের এসেক্সের মালডন শহরে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে। সময়টা ১৮৪২ খ্রিঃ। তাঁর পিতার নাম জেমস স্ট্রট। মায়ের নাম ক্লারা এলিজাবেথ।

র‍্যালির প্রকৃত নাম, জন উইলিয়াম স্ট্রট। পিতার মৃত্যুর পর থেকে তিনি পরিচিত হন লর্ড র‍্যালি নামে।

র‍্যালির মাতামহ রিচার্ড ভিকার্স ছিলেন তাঁর সময়ের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভাই সঞ্চারিত হয়েছিল দৌহিত্র র‍্যালির মধ্যে।

বিশিষ্ট জমিদার পরিবারে আদরে যত্নে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও শৈশবে র‍্যালির শরীর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। একে ক্ষীণ শরীর তার ওপরে বছর ভর পেটের অসুখ আর সর্দি-কাশিতে ভোগা। সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধুলো করবেন তার উপায় ছিল না।

টিটকিরির জ্বালাতনে অস্থির হতে হত। ফলে বাড়িতে সারাক্ষণ মায়ের পাশেপাশেই ঘুরঘুর করতেন। রোগভোগা ছেলেটাকে পড়াশোনার জন্য চাপ দিতেও ভয় হত স্নেহময়ী মায়ের।

দশ বছর বয়স পর্যন্ত বইপত্রের ছায়া মাড়াননি র‍্যালি। ছেলের পড়ালেখার ব্যাপারে বাবা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। শেষে একরকম জোর করেই তিনি র‍্যালিকে ভর্তি করিয়ে দেন স্থানীয় র‍্যালিক স্কুলে।

কিন্তু দিনকতক স্কুলে যাতায়াত করেই প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ক্ষীণতনু র‍্যালির। সহপাঠীদের জ্বালাতন মাত্রা ছাড়িয়ে অত্যাচারের রূপ নিল। বাধ্য হয়েই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয় তাঁকে।

এমনি করে একে একে তিনবার স্কুল পরিবর্তন করতে হল। শেষ পর্যন্ত পনেরো বছর বয়সে ভর্তি হলেন টর্কি স্কুলে।

এখানে পড়াশুনায় বরাবরই ক্লাশে ভাল ফল করলেন। স্কুলের পড়া শেষ করে ১৮৬১ খ্রিঃ র‍্যালি ভর্তি হলেন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে।

এই জগদ্বিখ্যাত কলেজের আবহাওয়ায় মিশেছিল মহাবিজ্ঞানী নিউটনের কর্মকৃতিত্বের বিজ্ঞানময় সৌরভ। তাঁর অধ্যাপক জীবনে এই কলেজের নির্দিষ্ট গবেষণাগারেই করেছেন বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কারের গবেষণাগুলি। ফলে এখানে বিজ্ঞানের আবহাওয়াটি ছিল সদা জাগরুক।

স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী স্বভাবের র‍্যালি অল্পদিনেই বিজ্ঞানের ভাবনায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। বিজ্ঞানপুরুষ নিউটনের আদর্শকে সামনে রেখে তিনি স্থির করে নিলেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

বিজ্ঞানই হবে জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। তাঁকেও হতে হবে নিউটনের মতো মহাবিজ্ঞানী।

লক্ষ্য যাঁদের উন্নত, আর লক্ষ্যসাধনে নিষ্ঠা থাকে অবিচল, পথের বাধা কখনও তাঁদের বিচলিত করতে পারে না।

বিজ্ঞান বিষয়ের প্রাণবস্তু হল অঙ্ক। অঙ্কের সোপান বেয়েই পৌঁছতে হয় বিজ্ঞানের অন্তর্লোকে। র‍্যালি অঙ্কে এত সড়গড় নন। কিন্তু তবুও হাল ছাড়লেন না তিনি।

সঙ্কল্প নিলেন, দুঃসাহসিক হলেও অঙ্ক নিয়েই তিনি অগ্রসর হবেন বিজ্ঞানের পথে।

সঙ্কল্প সাধনে শিথিলতা ছিল না র‍্যালির। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই অঙ্কের মতো জটিল বিষয়টিকে বলতে গেলে হাতের মুঠোয় নিয়ে এলেন। পরীক্ষায় অঙ্কে তাঁর ফলাফল কেমব্রিজের ছাত্র ও শিক্ষকদের চমকিত করল। সর্বোচ্চ নম্বর র‍্যালির।

এভাবেই একাগ্র নিষ্ঠা ও অক্লান্ত অধ্যবসায় সহায়ে নিজেকে তৈরি করেছিলেন র‍্যালি। মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৮৬৫ খ্রিঃ স্নাতক হলেন। অঙ্কে পেলেন ট্রাইপস বৃত্তি।

অঙ্কে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে দেওয়া হল স্মিথ পুরস্কার। রোগাভোগা প্যাকাটি চেহারার দুর্বল ছেলেটি প্রতিভার ঝলকে রাতারাতি যেন সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিল।

পরের বছরেই র‍্যালিকে পাঁচ বছরের মেয়াদে ট্রিনিটি কলেজ দিল ফেলোশিপ। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার মুখেই ১৮৭১ খ্রিঃ র‍্যালি বিয়ে করলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিদুষী এভেলিনকে।

নিরন্তর অক্লান্ত পরিশ্রমে তরুণ র‍্যালির শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই কঠিন রোগে শয্যা নিতে হল তাঁকে। তবে স্ত্রীর সেবা যত্ন ও সুচিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়ে উঠলেন অচিরেই। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সস্ত্রীক বিদেশ ভ্রমণে গেলেন।

ইজিপ্ট ও গ্রিসে অবসর যাপন করে এসেক্সে ফিরে এলেন ১৮৭৩ খ্রিঃ। এই সময়ে মারা গেলেন তাঁর বাবা জন জেমস।

পরিবারের উত্তরাধিকারী হিসাবে সাত হাজার একরের বিশাল জমিদারীর দায়িত্ব চাপল র‍্যালির কাঁধে।

গণিতের জটিল গবেষণার কিন্তু বিরাম ছিল না। বিদেশে অবসরের দিনগুলোতেও নিজের মনে ডুবে থাকতেন গণিত নিয়ে। এখন বিষয়-ভাবনার চাপে স্বভাবতই বিচলিত হলেন। বুঝি ব্যাহত হয় নিজের বিজ্ঞান সাধনা। বাধ্য হয়ে ছোট ভাইয়ের সহায়তা নিয়ে সামলাতে লাগলেন দুই দিক।

কিন্তু এভাবে বেশি দিন দুই দিক সামলানো সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত বিষয়সম্পত্তির দায়িত্ব ছোট ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন বিজ্ঞান গবেষণায়।

১৮৭৭ থেকে ৭৮ খ্রিঃ-এর মধ্যে প্রকাশিত হল র‍্যালির প্রথম গবেষণা গ্রন্থ। দুই খন্ডের এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে গেল বিজ্ঞানী মহলে। অচিরেই বিশ্ববিজ্ঞানের অঙ্গনে পদার্থ বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল র‍্যালির নাম।

সেই সময় কেমব্রিজের বিশ্ববিখ্যাত ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরি হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের মহাতীর্থ। দেশ-বিদেশের তরুণ বিজ্ঞানীর সমাবেশ সেখানে। চলছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের অত্যাধুনিক গবেষণা। বিশাল এই গবেষণাগারের যিনি পরিচালক-অধিকর্তা, তিনিও পদার্থবিদ্যার স্বনামধন্য বিজ্ঞানী। জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, — তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার উভয় শাখাতেই তাঁর অনায়াস বিচরণ।

১৮৭৯ খ্রিঃ ম্যাক্সওয়েলের আকস্মিক মৃত্যুর পর ক্যাভেন্ডিশ গবেষণাগার অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল।

পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক গবেষক হিসেবে গণিতবিদ র‍্যালি সবে তরুণ বিজ্ঞান প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ক্যাভেন্ডিশের হাল ধরার জন্য ডাক এল তাঁর কাছেই।

ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না তিনি। গ্রহণ করলেন ক্যাভেন্ডিশের সর্ব্বোচ্চ পদের দায়িত্বভার।

এই দায়িত্বশীল পদে র‍্যালি কাজ করেছেন পাঁচ বছর। এই সময়টা তাঁর অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতাবলে ক্যাভেন্ডিশে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার চর্চায় যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার হল।

তাঁর তত্ত্বাবধানে ও সুযোগ্য পরিচালনায় দলে দলে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার তরুণ গবেষক তৈরি হতে থাকে।

এখানকার দুরন্ত পরিশ্রমে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন র‍্যালি। বাধ্য হয়ে কেমব্রিজের কাজ ছেড়ে বিশ্রামের জন্য চলে আসেন এসেক্সের প্রাসাদে। কেমব্রিজের গবেষণাগারে নিজেও শুরু করেছিলেন গবেষণা। তাই নিজের বাসভবনেই গড়ে তুললেন গবেষণাগার।

১৮৮৪ থেকে ১৮৮৭ খ্রিঃ এই তিন বছর তাঁর নির্জনবাসে গবেষণার কাজেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন র‍্যালি।

১৮৮৭ খ্রিঃ আবার ফিরে গেলেন বাইরের কর্মজীবনে। লন্ডনের রয়াল ইনসটিটিউশনের প্রাকৃতিক দর্শন বিভাগে প্রধান অধ্যাপকের চাকরি নিলেন। জীবনের পরবর্তী কর্মমুখর আঠারো বছর তাঁর এখানেই অতিবাহিত হয়।

প্রাচীনকাল থেকে বাতাস নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভাবনাচিন্তার অন্ত ছিল না। গোড়ার দিকে বাতাসকে মৌলিক পদার্থ বলেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন। অষ্টাদশ শতকে উন্নততর গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, ব্ল্যাক, ল্যাভয়সিঁয়, ক্যাভেন্ডিশ, প্রিস্টলি প্রমুখ বিজ্ঞানীর অক্লান্ত সাধনায় বাতাসের স্বরূপ উন্মোচিত হয়।

ল্যাভয়সিঁয় ঘোষণা করেন, বাতাস কখনোই মৌলিক পদার্থ নয়। এতে সংমিশ্রণ রয়েছে বিভিন্ন পদার্থের। এই পদার্থগুলো হল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

তবে মোটামুটিভাবে একভাগ অক্সিজেন ও চার ভাগ নাইট্রোজেন মেশালেই বাতাস পাওয়া যেতে পারে।

যুগন্ধর বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারের পরে বাতাস সংক্রান্ত ভৌত রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রও প্রসারিত হল। বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাতাসের বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ নিয়ে।

বাতাস থেকে নাইট্রোজেন পৃথক করার পরে দেখা দিল এক নতুন রহস্য। পরীক্ষাগারে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের ঘনত্ব দেখা গেল প্রকৃতি থেকে আহৃত নাইট্রোজেনের চেয়ে শতকরা এক ভাগ কম।

দুই নাইট্রোজেনের ঘনত্বের এমন পার্থক্য স্বভাবতঃই বিজ্ঞানীদের এক মহাবিস্ময়ের মুখোমুখি এনে ফেলল।

বারবার পরীক্ষা করে একই ফলাফল পাওয়া যেতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা নিয়ে হিমসিম খেতে লাগলেন। সমাধান আর পাওয়া যায় না।

দুরন্ত এই সমস্যার মীমাংসা করেছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী র‍্যালি। তিনি ঘোষণা করলেন, প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত নাইট্রোজেনে রয়েছে অপর একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এই গ্যাসের নাম আর্গন। আর্গন শব্দটি গ্রীক। এর অর্থ নিষ্ক্রিয়।

র‍্যালির মতামত সমর্থন করলেন অপর এক বিজ্ঞানী—স্যার উইলিয়াম র‍্যামসে। তিনি বললেন, বাতাসের নাইট্রোজেনে কেবল আর্গনই নয়, আরও একটি নিষ্ক্রিয় বা জড় গ্যাস বর্তমান। তার নাম হিলিয়াম।

ইতিপূর্বেই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন যে সৌর আবহাওয়ায় মিশে রয়েছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়াম। গ্যাসটির নামকরণও করা হয়েছিল সূর্যকে নির্দিষ্ট রেখে।

গ্রীক ভাষায় হিলিয়াম শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্য-উৎসারিত গ্যাস তাই হল হিলিয়াম।

বিজ্ঞানী র‍্যালি এবং র‍্যামসে—দুজনের আবিষ্কারই চমকপ্রদ। বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান মিলে গেল।

পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানী ট্রাভার্সে ও র‍্যামসের গবেষণায় বাতাসের আরও তিনটি নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক মৌলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই গ্যাসগুলি হল নিয়ন, ক্রিপটন ও জেনন।

বাতাসের নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কারের সুবাদে র‍্যালি ও র‍্যামসেকে একই সময়ে দেওয়া হল বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার ১৯০৪ খ্রিঃ। তবে দুজনেরই বিষয় ছিল আলাদা।

র‍্যালিকে নোবেল দেওয়া হয় পদার্থবিদ্যায়। র‍্যামসেকে রসায়নে। আর্গন আবিষ্কার ছাড়াও র‍্যালি বাতাসের অন্তর্গত সমস্ত গ্যাসের ঘনত্বের সঠিক মাপ নির্ণয় করেছিলেন।

এই সমস্ত গবেষণার মূল্যায়নের ভিত্তিতেই র‍্যালিকে দেওয়া হয়েছিল নোবেল পুরস্কার।

নোবেল পুরস্কারের স্বীকৃতি পদার্থবিদ্যার পথিকৃৎ বিজ্ঞানী হিসাবে র‍্যালির নাম বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করল। পরের বছরেই ১৯০৫ খ্রিঃ তিনি সর্বসম্মতভাবে রয়াল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আরও তিন বছর পরে র‍্যালি নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে ব্রীত হলেন।

পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত অজস্র গবেষণা করেছেন র‍্যালি তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই। তাঁর সমস্ত গবেষণা ১৮৮৯ খ্রিঃ থেকে ১৯২০ খ্রিঃ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে মোট ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

অসামান্য বিজ্ঞান প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন লর্ড র‍্যালি। বিজ্ঞানের পাশাপাশি সাহিত্য বিষয়েও তাঁর অধিকার ছিল বিস্ময়কর। সাহিত্যের যে কোনও বিষয় নিয়েই তিনি আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত দিতে পারতেন। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলো ছিল সাহিত্যের সৌরভে সম্পৃক্ত।

বিশ্ববিজ্ঞানেব অন্যতম যুগন্ধর বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালি ১৯১৯ খ্রিঃ ৩০ জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এমিল অ্যাডলফ ভন বেহরিং

রোগ প্রতিরোধ বিজ্ঞানকে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন জার্মান চিকিৎসাবিদ এমিল অ্যাডলফ ভন বেহরিং।

১৮৫৪ খ্রিঃ ১৫ মার্চ প্রাশিয়ার মানসডর্ফ শহরে এক সামান্য স্কুল শিক্ষকের পরিবারে জন্ম হয় ভন বেহরিং-এর। তাঁর বাবা ছিলেন অতি মাত্রায় ধর্মভীরু। ফলে তিনি বিজ্ঞানকে ধর্মজ্ঞানের শত্রু বলেই বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। সাধারণ স্কুলে ভর্তি হলে বিজ্ঞান শিখে ছেলের জীবন নষ্ট হবে এই ছিল তাঁর ধারণা। তাই স্থির করলেন ছেলেকে গীর্জার স্কুলেই ভর্তি করাবেন। যাতে সে ধর্মশাস্ত্র পড়ে যাজক হতে পারে।

বাবার সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে বেহরিং-এর। কিন্তু বাবার কথার প্রতিবাদ করে নিজেব পছন্দের কথা বলতে পারেন না। বলতে পারেন না যে বিজ্ঞানের পাঠ নেবার জন্যই তার মন তৈরি হয়ে আছে।

তখনও গির্জার স্কুলে পাঠানো হয়নি বালক বেহরিংকে। এমনি দিনে বাবার এক বন্ধু বাড়িতে বেড়াতে এলেন। তিনি প্রাশিয়া সেনাবাহিনীর একজন ডাক্তার।

বিজ্ঞান তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সমর্থক হলেও ভদ্রলোক ধর্ম বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নন। তবে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, মানুষের সত্যিকারের উন্নতি করতে পারে বিজ্ঞান তথা চিকিৎসা বিজ্ঞান। কেননা অসুস্থ অবস্থাতেই

সত্যিকার বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে একজন মানুষ। বিপদমুক্ত করে তাকে সুখী করতে পারে কেবল মাত্র একজন সুচিকিৎসক।

বালক বেহরিং-এর সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনের কথাটি ধরতে পারেন বাবার ডাক্তার বন্ধু। শেষ পর্যন্ত তাঁর উৎসাহ ও সাহায্যেই বেহরিং-এর গীর্জার স্কুলে যাওয়া রদ হয়ে যায়। তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় বার্লিনের মিলিটারি মেডিকেল অ্যাকাডেমিতে।

সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এখানে বেহরিং-এর চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ শুরু হয়।

সেনাবাহিনীতে সেকালে ডাক্তারদের প্রধানত করতে হত অস্ত্রোপচারের কাজ। অ্যাকাডেমি থেকে ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে বেহরিংকেও সেই কাজই করতে হতে লাগল। আহত সৈনিকদের মধ্যে ছুরি-কাঁচি নিয়েই দিন কাটতে থাকে তাঁর।

এসব নিয়মবদ্ধ কাজ করতে হলেও বেহরিং-এর মনে নিরন্তর অন্য ভাবনা আলোড়ন তোলে।

এই সামান্য কাজ নিয়ে তৃপ্তি পান না তিনি। চিকিৎসা গবেষণায় ডুব দিতে না পারলে যেন মনের অস্থিরতা শান্ত হবার নয়।

নিজের রুটিন বাঁধা কাজের ফাঁকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের হালফিলের সব খবরই রাখেন বেহরিং।

পাস্তুর ও কখ রোগ চিকিৎসার জগতে ততদিনে আলোড়ন তুলেছেন। গোড়াপত্তন হয়েছে জীবাণুবিদ্যার।

দুশ্চিকিৎস্য অ্যানথ্রাস ও জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেছেন পাস্তুর। ওসব রোগের প্রতিষেধকও বার করে ফেলেছেন তিনি তাঁর নিজের গবেষণা ঘরে বসে।

এপাশে রবার্ট কখ স্বয়ং রয়েছেন বার্লিনে। জীবাণু সংক্রান্ত গবেষণায় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বিভিন্ন সংক্রামক রোগের জীবাণুকে চিনিয়ে দিয়ে মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী পাস্তুরকে গবেষণায় উজ্জীবিত করেছেন তিনিই।

এখন তিনি ডুবে আছেন ভয়ঙ্কর এশিয়াটিক কলেরা সংক্রান্ত গবেষণায়। রোগটির উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি তিনি মিশর ও ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সব খবরাখবরের ওপরেই নজর রেখে চলেন বেহরিং। আর নীরবে চলে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি। গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার স্বপ্ন যে তাঁর দীর্ঘ দিনের।

১৮৮৮ খ্রিঃ দুরারোগ্য ডিপথেরিয়ার জীবাণু সংক্রান্ত গবেষণায় পাস্তুরের দুই সুযোগ্য ছাত্র রাউক্স ও ইয়ারসিন রোগজীবাণুটির অস্তিত্ব উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন।

এই খবরে আলোড়ন সৃষ্টি হল জীবাণু গবেষকদের মধ্যে। ডিপথেরিয়ার রক্তরস নিয়ে আরম্ভ হল গবেষণা।

বছর দুইয়ের মধ্যেই চিকিৎসা বিজ্ঞানী হ্যান্স বুখনার ঘোষণা করলেন, ডিপথেরিয়া রোগীর রক্তরসেই রয়েছে এক বিশেষ ধরনের জীবাণু।

এই খবরে উৎসাহিত হলেন বেহরিং। তিনি এবারে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন গবেষণায়।

১৮৯০খ্রিঃ কখ-এর গবেষণাগারেই ডিপথেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণা আরম্ভ করলেন। তাঁর সঙ্গী হল এক জাপানী সতীর্থ কিতাসাতো।

কিতাসাতো ইতিপূর্বে ধনুষ্টঙ্কার সংক্রান্ত গবেষণায় সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি কুকুর-মুরগী ইত্যাদি ইতর প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে ধনুষ্টংকারের নিরাময়ের উপায় বার করতে পেরেছিলেন। একই ভাবে গবেষণা আরম্ভ করলেন বেহরিংও।

তিনি কুকুর, গিনিপিগ, মুরগী ইত্যাদির ওপর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। দেখা গেল ডিপথেরিয়া রোগীর রক্তরস এসব প্রাণীদেহে ইঞ্জেকশান করলে, সুস্থ রক্তে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

পরে এই রক্ত ডিপথেরিয়া রোগাক্রান্ত দেহে প্রবিষ্ট করালে রোগীর রোগ নিরাময় সহজ হয়ে ওঠে।

মনুষ্যেতর প্রাণীদের নিয়ে এই গবেষণাতেই কেটে গেল তিনটি বছর। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রিঃ পর্যন্ত কোনও মানুষের দেহে এই পরীক্ষা চালাবার সুযোগ করে উঠতে পারলেন না।

পরের বছর ১৮৯৪ খ্রিঃ গভীরতর গবেষণার জন্য বেহরিং চলে এলেন হালে শহরে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে। ডিপথেরিয়া সংক্রান্ত তাঁর গবেষণার সাফল্য মানুষের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ কিনা তা নিয়ে এখানেই শুরু হল তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সঙ্গে চলল অধ্যাপনা। কিন্তু বছর ঘুরতেই তিনি হালে ছেড়ে চলে এলেন মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেও অধ্যাপনার সঙ্গে চলল নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা।

হালে-এর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রেই বেহরিং তাঁর গবেষণার ফল পেয়েছিলেন হাতে হাতে। তিনি জানতে পেরেছিলেন, ডিপথেরিয়া রোগের রক্তরস মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট করিয়ে ডিপথেরিয়া রোগীকে নিরাময় করে

তোলা সম্ভব। মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপর্যুপরি পরীক্ষার পর এবিষয়ে স্থির নিশ্চিত হলেন।

বেহরিং এবারে তাঁর সাফল্য এবং গবেষণার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করলেন। এর ফলে রোগ চিকিৎসা গবেষণা ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। ডিপথেরিয়া রোগাক্রান্ত রোগীদের মন থেকে দূর হল মৃত্যুভয়।

বেহরিং-এর গবেষণার পথ ধরে চিকিৎসা গবেষকরা আরম্ভ করলেন অন্যান্য সংক্রামক রোগ নিয়ে গবেষণা। এভাবেই ক্রমে গড়ে উঠল চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা। যার নাম নিরাময় বিজ্ঞান বা ইমিউনোলজি।

সুদীর্ঘ অক্লান্ত গবেষণার সাফল্যের স্বীকৃতি পেতেও বিলম্ব হয় নি। ১৯০১ খ্রিঃ ডিপথেরিয়া রোগ নিরাময় সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বেহরিংকে দেওয়া হয়েছিল চিকিৎসাবিদ্যায় প্রথম নোবেল।

প্রথম সাফল্যের পর বেহরিং হাতে নিলেন যক্ষ্মা রোগ সংক্রান্ত গবেষণা। মারবার্গের গবেষণাগারেই নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ১৮৯৮ খ্রিঃ তিনি যক্ষ্মারোগের ভ্যাকসিন তৈরি করতে সমর্থ হলেন। গরুর দেহে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ সাফল্য পান তিনি।

সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার পরে তাঁর নতুন আবিষ্কারের গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেন বেহরিং। তাঁর ধনুষ্টংকার সংক্রান্ত গবেষণা প্রবন্ধটিও তিনি প্রকাশ করেন কয়েক বছর পরে। নোবেল পাওয়ার চার বছরের মাথায় ১৯০৪ খ্রিঃ।

ক্রমাগত গবেষণা কাজে ব্যাপৃত থাকলেও অধ্যাপনাতে বেহরিং-এর ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

বিশেষ করে মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশে তিনি বিবিধ সংক্রমাক রোগের জীবাণু পর্যালোচনা ও ওই জীবাণু নিয়ে কালচার তৈরি করার পর তা প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে তিনি এমন প্রাঞ্জল ভাবে পূর্বাপর আলোচনা করতেন যে ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত।

এর ফলে সফলকাম অধ্যাপক হিসেবেও ভন বেহরিং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেন।

চিকিৎসা জগতে অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হয়েছেন ভন বেহরিং। তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতিতে পেয়েছেন সম্মান, যশ, ঐশ্বর্য। কিন্তু তবুও থেমে থাকেননি তিনি।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর আবিষ্কৃত ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক সিরাম মানুষের শরীরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হচ্ছে।

বেহরিং সিরাম নির্মাণের পদ্ধতি আরও কার্যকরী করার প্রয়োজন বোধ করলেন, যাতে থাকবে একশো ভাগ রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা।

বেহরিং ডিপথেরিয়া সিরাম তৈরির পদ্ধতি সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন এবং সাফল্যও লাভ করলেন। তাঁর এই নবাবিষ্কৃত ভ্যাকসিনটির নাম দিলেন ভ্যাকসিন টি. এ.।

ভন বেহরিং সারাজীবন মানুষের কল্যাণের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। বিশ্ব মানবের সেবাই ছিল তাঁর সংগ্রামী জীবনের আদর্শ ও ব্রত। সেই ব্রত পূর্ণ করে মানবতার মহান পুরুষ জার্মানীর মারবার্গ শহরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯১৭ খ্রিঃ ৩১ শে মার্চ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজও ভন বেহরিং নামটি আলোকবর্তিকার মতো রয়েছে দেদীপ্যমান।

ইমহোটেপ

ইউরোপীয়দের লিখিত ইতিহাস অনুযায়ী ইতালির রেনেসাঁর প্রাণপুরুষ লিওনার্দো দাভিঞ্চিকেই পৃথিবীর প্রথম বহুমুখী প্রতিভা বলে আমরা জানি।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা সম্ভব হয়েছে আরবের ইবনসিনা ওরফে আভিসিন্নার নামও।

তবে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বহুমুখী প্রতিভা যে মিশরের ইমহোটেপ, এ বিষয়ে এখন দ্বিমত নেই। ইমহোটেপ ছিলেন একাধারে লেখক, জ্যোতিষী, স্থপতি এবং চিকিৎসক।

মিশরের লিখিত ইতিহাসের প্রথম ফারাও বা রাজা জেনেস। তাঁর পরের উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন জোসের। তাঁরই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইমহোটেপ।

তাঁর পরিচয় এখানেই শেষ নয়। মিশরীয়দের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। তাঁর প্রতি মিশরবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি পরবর্তীকালে তাঁকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

গ্রিকরা হিপোক্রেটিসকে বলেছেন চিকিৎসার জনক। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখনও চিকিৎসকদের মধ্যে হিপোক্রেটিক ওথ বা শপথ গ্রহণের নিয়ম চালু আছে।

হিপোক্রেটিস জন্মেছিলেন খ্রিস্টের জন্মের ৪৬০ বছর আগে। গ্রিসের কস দ্বীপে। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা এবং অধ্যাপনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

গ্রিকরা তাঁকে চিকিৎসা শাস্ত্রের দেবতা এসকেলেপিয়াসের বংশধর বলে মনে করত। তাঁদের এই কল্পনা মিশরীয়দের কাছ থেকে ধার করা।

ইমহোটেপ সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ হয়েও মিশরীয়দের শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁকে দেবতার পদে বসিয়েছিল।

গ্রিকরা মিশর অধিকার করার পর ইমহোটেপ-এর নামের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং কালক্রমে তারাও তাঁকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দেবতা বলে মনে করতে থাকে।

পরবর্তী সময়ে ইমহোটেপের অনুকরণে নিজেদের দেশেও গ্রিকরা প্রতিষ্ঠিত করে এসকেলেপিয়াসের মূর্তি।

ফারাও জোসের মিশরে রাজত্ব করেছিলেন আনুমানিক ২৬৮৬ খ্রিঃ পূর্ব থেকে ২৬১৩ খ্রিঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত। ইমহোটেপ ছিলেন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা এবং রাজচিকিৎসক।

ইমহোটেপের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। আজ আর সঠিক জানার কোনও উপায় নেই।

তবে বিভিন্ন সূত্রে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা হয়, ইবনসিনা ইমহোটেপের প্রায় তিন হাজার বছর এবং লিওনার্দো সাড়ে তিন হাজার বছর পরে জন্মেছিলেন।

প্রাচীন পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম হল কায়রোর গিজা প্রান্তরের পিরামিড। প্রায় পাঁচ হাজার বছরেব প্রাচীন পিরামিডগুলি এখনও পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে বিরাজ কবছে।

প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পর্যটক গিজার পিরামিড দেখতে কায়রোয় উপস্থিত হন।

পিরামিডের বিস্ময়কর নির্মাণ এবং তার জ্যামিতিক গঠন বর্তমান কালের ইঞ্জিনিয়ারদেরও চমৎকৃত করে।

গিজার পিরামিড কিন্তু পৃথিবীর প্রথম পিরামিড নয়। পৃথিবীর প্রথম পিরামিডটি নির্মাণ করেছিলেন ইমহোটেপ — গিজার পিরামিড নির্মাণের অন্ততঃ একশো বছর আগে।

বর্তমান কায়রো থেকে কমবেশি পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে বালুকাময় প্রান্তর সাক্কারা। ইমহোটেপেব নির্মিত পৃথিবীর প্রথম পিরামিডটি এখানেই অবস্থিত।

পৃথিবীর আদিতম সভ্যতাগুলির অন্যতম মিশরের অধিবাসীরা হিন্দুদের মতোই বিশ্বাস করত, আত্মা অমর, অবিনাশী।

মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটাই নষ্ট হয় কেবল, আত্মা থাকে অবিকৃত।

মিশরীয়দের বিশ্বাসমতে, মানুষের দুটি করে আত্মা থাকে। একটি আত্মার নাম 'কা' অপর আত্মার নাম 'বাই'। মৃত্যুর পর 'বাই' আত্মা আকাশের ওপারে স্বর্গে চলে যায়। আর কা আত্মা মৃতদেহের মধ্যে ফিরে আসে।

যতদিন 'কা' আত্মা সেই দেহে তৃপ্ত থাকে, ততদিন 'বাই' আত্মাও নির্বিঘ্নে স্বর্গসুখ ভোগ করে।

'কা' আত্মার তৃপ্তি এবং প্রয়োজনের জন্য সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, যেসব জিনিস জীবিত দেহে থেকে সে ভোগ করত।

এই বিশ্বাস থেকেই প্রাচীন মিশরে মৃতদেহ সংরক্ষণের প্রথা প্রচলিত হয়।

মাটির নিচে কবরে মৃতদেহের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সব জিনিস, থরে থরে সাজিয়ে দেওয়া হত।

বিশেষ করে ফারাও এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবর হত খুবই জাঁকজমকপূর্ণ।

ফারাওদের কবরের ওপরে তৈরি হত পাথরের পিরামিড যা কিনা কালের প্রহরীকেও এড়াতে সক্ষম হবে।

অবিনশ্বর 'কা' আত্মার জন্য মৃতদেহকে চিরস্থায়ী করে রাখার তাগিদে কালক্রমে মমি প্রথার উদ্ভব হয়েছে এবং যতদূর জানা যায়, মিশরে এই মমি প্রথার উদ্ভাবন করেন ইমহোটেপ।

এই কাজে যেসব দ্রব্য ও ভেষজ ইমহোটেপ ব্যবহার করেছিলেন, তার অনেক কিছুই আজও পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

মমি করার পদ্ধতির কথা অনেকটাই জানতে পারা গেছে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বিবরণ থেকে।

প্রথমে মৃতদেহের নাকের মধ্যে দিয়ে লোহার হুকের সাহায্যে ঘিলুর যতটা সম্ভব বার করে আনা হত। বাকিটা ওষুধ পুরে দিয়ে বার করা হত।

তারপর ধারাল পাথরের ফালি দিয়ে পেট চিরে নাড়িভুড়ি বার করে ভাল মদ দিয়ে পেট ধুয়ে গুঁড়ো সুগন্ধি যুক্ত ভেষজ পুরে সেলাই করে দেওয়া হত।

দেহটি সত্তরদিন তরল ভেষজে ডুবিয়ে রাখার পর ভাল করে ধুয়ে মোম লাগান কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে মানুষের আকারে কাঠের বাক্সের মতো তৈরি করে তার মধ্যে পুরে রাখা হত।

এই মমিটি কাঠের শবাধাবে রেখে কবর দেবার জন্য প্রস্তুত করা হত।

মিশরতত্ত্ববিদদের মতে অতি পুরনো দিনে অর্থাৎ ইমহোটেপের আমলে মমিকে কাপড়ে জড়ানোর প্রয়োজন হত না। এরকম একটি সম্পূর্ণ নগ্নদেহ মমি কবর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ এখনও পর্যন্ত এটিই সব চেয়ে পুরনো মমি।

ইমহোটেপের বিদ্যা একসময় হারিয়ে যায়, তার ফলে পরবর্তীকালে মমি তৈরি হয় তেল, মলম ইত্যাদি লাগানোর পরে তার ওপরে বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়ে।

ইমহোটেপের আগে মিশরীয় ফারাওদের দেহ কবর দেবার পর স্থানটি চিহ্নিত করা হত তার ওপরে একটি লম্বা চ্যাপটা ঢিবি বানিয়ে।

আরবী ভাষায় সেই ঢিবিকে বলা হয় মাসতাবা। এর আকার আয়তক্ষেত্রাকার এবং বালির ওপর ছাদটা বেঞ্চির আকারে উঁচু হয়ে থাকত।

আরবী মাসতাবা শব্দের অর্থ বেঞ্চি। মিশরতত্ত্বে মাসতাবা শব্দটাই চালু হয়ে গেছে।

মিশরের প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের ফারাওদের যেসব সমাধি পাওয়া গেছে, সেগুলো সবই মাসতাবা।

সম্ভবতঃ ইমহোটেপও সাক্কারাতে ফারাও জোসেরের সত্তর ফুট গভীর কবরের ওপরে প্রথমে একটি বড় মাসতাবা তৈরি করেছিলেন।

পরে কোনও কারণে সেই মাসতাবার ওপরে তৈরি করেন আরেকটি মাসতাবা, আকারে একটু ছোট।

এভাবে পর পর সব মিলিয়ে ছয়টি বড় থেকে ছোট ধাপ তৈরি করেছেন তিনি।

মাটি থেকে ওপর পর্যন্ত ছয়টি স্তরের এই স্থাপত্যকে নাম দেওয়া হয়েছে Step Pyramid। জোসেরের সমাধিটির উচ্চতা দুশো ফুট। এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম পিরামিড।

পরবর্তীকালে এই ধাপ পিরামিডের গঠনশৈলীর ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে কায়রোর গিজা অঞ্চলের তিনটি পিরামিড।

কেবল পিরামিড হিসেবেই নয় ইমহোটেপের ধাপ পিরামিড, পৃথিবীর সর্বপ্রথম শৈল স্থাপত্য হিসেবেও চিহ্নিত।

প্রাচীন মিশরে আগে বাড়িঘর মাসতাবা ইত্যাদি তৈরি হত স্রেফ মাটি দিয়ে। পাথর কাজে লাগানো হত না।

ঘরের কোণাগুলো পোক্ত করা হত নলখাগড়ার বান্ডিল জড়ো করে।

ইমহোটেপের অল্পকাল আগে ফারাও উসাফাই-এর আমল থেকে অল্প পরিমাণে পাথরের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ইমহোটেপের সময় থেকেই পাথরের ব্যবহার চালু হয় ব্যাপকভাবে।

এর ফলে স্থাপত্য শিল্পে ঘটল যুগান্তর। পাথর দিয়েই তৈরি হতে লাগল সব কিছু— ঘরবাড়ি, মন্দির, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে জগৎবিখ্যাত পিরামিডও।

সাক্কারার আশপাশ ঘিরে চুনাপাথরের পাহাড়। স্থানীয় কারিগরেরা চুনাপাথর দিয়ে বাসনকোসন তৈরি করত, পাথর কাটার কাজে তারা ছিল দক্ষ।

ইমহোটেপ এই কারিগরদের তাঁর কাজে নিয়োজিত করলেন। শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগালেন চাষীদের।

প্রতিবছরই নির্দিষ্ট একটা সময়ে নীল নদে জলপ্লাবন দেখা দিত। তাতে ভেসে যেত খেত খামার জনবসতি। চাষীরা বেকার হয়ে পড়ত।

তাই বেকার চাষীদের কাজে লাগিয়ে ইমাহোটেপ দেশের বেকার সমস্যারও সমাধান করেছিলেন।

ইমহোটেপের পর থেকে মিশরে পাথর দিয়ে ব্যাপকভাবে মাসতাবা তৈরি হতে থাকে। প্রত্ন-অনুসন্ধানের ফলে উচ্চ রাজবংশের হাজার হাজার মাসতাবার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ফারাও জোসেরের সমগ্র সমাধিস্থলের সম্পূর্ণ নির্মাণ সম্পন্ন করেছিলেন ইমহোটেপ। ধাপ পিরামিডটিকে কেন্দ্র করে একশো দশ বিঘা এলাকা পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রাচীর বেষ্টনির ভেতরে রয়েছে আরও বেশ কিছু দালান। একটি চৌকো মাসতাবাও আছে, সম্ভবতঃ তার ভেতরে জোসেরের নাড়িভুঁড়ি কবর দেওয়া হয়েছে।

মাটির নিচেও রয়েছে বেশ কিছু ঘর। বড় বড় স্তম্ভযুক্ত একটি হলঘর, গ্যালারি এবং একটি উপাসনা ঘর।

মাটির তলায় রীতিমতো রাজপ্রাসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল জোসেরের সমাধির জন্য। অনেকটা জোসেরের রাজধানীব অনুকরণে।

নীলনদের ব-দ্বীপের দক্ষিণে নদের পশ্চিমপারে মেমফিস শহর সেখানেই ছিল রাজধানী।

খ্রিঃ পূঃ তিন হাজার দুশো অব্দে ফারাও মেনেস উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে একত্রিত করে সম্মিলিত মিশরের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন মেমফিসে। প্রায় পাঁচশো বছর ধরে মেমফিসই ছিল মিশরের রাজধানী।

পরের যুগে অনেকটা দক্ষিণে থিবস সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

ফারাও জোসের মেমফিসে তাঁর রাজধানী এবং সাক্কারাতে তাঁর সমাধি প্রায় একই রকম করে তৈরি করিয়াছিলেন ইমহোটেপের সাহায্যে।

উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত মেমফিস সহরটিকে অত্যন্ত কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করেছিলেন ইমহোটেপ

তাঁর পরিকল্পনা রূপায়নের প্রধান বাধা ছিল নীলনদ। সোজাসুজি জমি

পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ইমহোটেপ এমনভাবে বাঁধ নির্মাণ করলেন যে নদীকে বাধ্য হয়ে তার গতিপথ বদলে পুবদিকে সরে যেতে হলো।

ইমাহোটেপ আশ্চর্য কারিগরি কৌশলে নদীর প্রবাহকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আগে এ কাজ আর কেউ করেনি। পরেও অন্ততঃ কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত কেউ করেনি।

এই দিক থেকে ইমহোটেপকেই বলা চলে পৃথিবীর প্রথম হাইড্রোলিক ইনজিনিয়ার।

বর্তমান মিশরের দক্ষিণে বিরাট অসোয়ান বাঁধের মডেলরুমে ইমহোটেপের মূর্তি বসানো আছে।

ইমহোটেপের ব্যক্তিগত জীবনের প্রায় সমস্ত তথ্যই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তাই মিশরতত্ত্ববিদদের অনেকেই তাঁকে কোনও পৌরাণিক চরিত্র বলেই মনে করতেন।

খুব বেশি দিন হয়নি, ইমহোটেপ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার হয়েছে। জানা গেছে ওই নামে সত্যিই একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন। তাঁর বাবার নাম ছিল কানুফের এবং মা ছিলেন খ্রেদুয়োঙ্ক।

মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যেই মিশরীয়দের কাছে তিনি দেবতুল্য মর্যাদা পেতে থাকেন। আরও হাজার দুয়েক বছর পরে তিনি হন দেবতা।

দেবতা প্তাহ এবং দেবী সেখমেণ্টের পুত্র হিসাবে তাঁকে কল্পনা করা হতে থাকে।

প্তাহ হচ্ছেন মিশরের সৃষ্টির দেবতা। বলা চলে আমাদের ব্রহ্মা এবং বিশ্বকর্মার যুগ্মরূপ। সেখমেণ্ট ছিলেন যুদ্ধ ও মহামারীর দেবতা।

হোমার তাঁর ওডিসি কাব্যে মিশরের চিকিৎসকদের গুণগান করেছেন। হেরোডোটাসও তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন, পারস্য সম্রাট সাইরাস এবং দরায়ুস মিশরীয় চিকিৎসকদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

প্রাচীন মিশরের চিকিৎসকদের খ্যাতি ছিল দিগন্ত বিস্তৃত। তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতির লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে। প্যাপিরাসের একটি পুঁথিতে কিছু রোগ ও সেসবের নিরাময়ের ওষুধের বিবরণ পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছে অনেক মন্ত্রতন্ত্র।

মন্ত্রতন্ত্রে অসুখবিসুখ ভাল হয় বলে মিশরীয়রা বিশ্বাস করত।

অন্য একটি প্যাপিরাসে পাওয়া গেছে অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি এবং ক্ষত ও আঘাতের ওষুধের নাম। অনেকে মনে করেন, এসব তথ্যের রচয়িতা ইমহোটেপ।

দক্ষিণ মিশরে নীল নদের ওপরে ছোট্ট দ্বীপ ফিলে। সেখানে ছিল একটি

মন্দির। সেই মন্দিরে রোগীরা তাদের রোগ নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা জানাতে আসত। তারা প্রার্থনা করত ইমহোটেপের কাছে।

দেবতা ইমহোটেপ স্বপ্নে তাদের রোগের ওষুধ বলে দেবেন এই বিশ্বাসে রোগীরা মন্দিরে রাত কাটাত।

দক্ষিণ মিশরেই কর্নাক সহরে একটি মন্দিরের দরজায় লেখা রয়েছে, "প্তাহর পুত্র দয়াময় দেবতা ইমহোটেপ, তিনি সকলের ডাকে সাড়া দেন, তিনি সকলকে জীবন দান করেন।"

মিশরে রোমানদের আধিপত্যকালে রচিত একটি স্তবগাথায় ইমহোটেপকে থিবস সহরে থাকবার অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়েছে — "হে দেবতা ইমহোটেপ, তোমাকে প্রণাম। তুমি থিবস নগরে অধিষ্ঠান কর। এখানে তোমার মন্দিরের চারপাশেই রয়েছে দেবতাদের মন্দির। এখানকার সকল অধিবাসী তোমার ভজনা করে কারণ তুমি তাদের রোগ-ব্যাধি হরণ কর। তুমি তাদের জীবন দাও।"

ইমহোটেপের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইংরাজ চিকিৎসাবিদ উইলিয়াম অসলার লিখেছেন, "He is the first figure of a physician to standout, clearly from the mist of antiquity."

ইমহোটেপ গ্রিকদেরও পুজো পেয়েছেন লিপির দেবতা হিসেবে। তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে এভাবে — পরনে ধবধবে সাদা পোশাক, হাতে একটি পুঁথি। জনৈক গ্রিক পুরোহিত তাঁর স্তুতি করে বলেছেন, 'হে লিপির দেবতা, লিপির স্রষ্টা ইমহোটেপ, তুমিই আমাদের লিখতে শিখিয়েছো। তোমার পুজোর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হল লিখন। এখন থেকে সেই অর্ঘ্যেই করব তোমার পুজো। হে ইমুথেস, গ্রিক ভাষা চিরকাল তোমার বন্দনা করে যাবে।"

গ্রিকরা ইমহোটেপকে বলত ইমুথেস। গ্রিক পুরোহিত তাঁকে লিপির স্রষ্টা বলে বন্দনা করেছে। প্রকৃতপক্ষে মিশরের চিত্রলিপির স্রষ্টা ইমহোটেপ নন। এই লিপির উদ্ভব হয়েছিল আরও অনেক আগে।

ফারাও মেনেসের যুগেরও আগে থেকেই এরোগ্লিফস হরফে খোদাই করে লোকের নাম, গোষ্ঠীর নাম লেখা হত। সেই সময় শব্দের সংখ্যা ছিল সীমিত।

ইমহোটেপের সময়ে এই লিপিব সংস্কার ও উন্নতি হয় খুবই দ্রুত। শব্দ সংখ্যাও বেড়ে যায়।

জোসেরের স্মৃতিসৌধের ফলকে লিখিত হয় উৎসর্গলিপি, মন্দির তৈরির সংক্ষিপ্ত' বিবরণ। সেই সঙ্গে জোসেরের নাম, উপাধি এবং প্রধানমন্ত্রী ইমহোটেপেরও নাম।

সমস্ত মিশরে ফারাও জোসেরের পিরামিডটিই একমাত্র ব্যতিক্রম, যার ফলকে খোদিত হয়েছে স্থপতি ইমহোটেপের নাম। পরবর্তীকালের কোনও স্থপতির নামই এভাবে আর কোনও স্মৃতিসৌধের ফলকে লেখা হয়নি।

লেখক হিসেবেও প্রাচীন মিশরে কীর্তিমান ছিলেন ইমহোটেপ। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা একটি কবিতায় —

লেখক হতে কে না চায়—
সৌধের চেয়ে মূল্যবান,
দুর্গের চেয়ে সুন্দর কি আছে?
আছে গ্রন্থ।
জেডেফরার সমকক্ষ কেউ আছে?
ইমহোটেপের সমকক্ষ কে আছে
আমাদের মধ্যে?

লেখক ইমহোটেপের একটি বইয়ের নাম জানা গেছে, 'উপদেশাবলী'। এই বইতে লিপিবদ্ধ ছিল ঘর, বাড়ি, পিরামিড নির্মাণের কৌশল ইত্যাদি। মিশরের লোকেরা এই বইয়ে লিখিত নিয়মানুসারে সব কাজ করত।

কতদিন পর্যন্ত এই বইয়ের নীতি-নিয়ম প্রচলিত ছিল, কিভাবে, কবে বইটি হারিয়ে গেছে, তা কেউ জানে না। তাই জানা যায় না মমি তৈরির কৌশলও বইটিতে লিখিত ছিল কিনা। কিংবা ঘরবাড়ি, পিরামিড ইত্যাদির মতো আরও কিছুর নির্মাণ রীতি তাতে লেখা ছিল কিনা।

মিশরের কবর-ভূমিতে অফুরন্ত খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে বহুকাল থেকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, আজও পর্যন্ত ইমহোটেপের কবর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অনুমান করতে কষ্ট হয় না, ইমহোটেপের কবর পাওয়া গেলে সেখানে তাঁর অনেক মূল্যবান লেখা পাওয়া সম্ভব হবে। মিশরতত্ত্বের অনেক অজ্ঞাত কথাও তা থেকে জানা যাবে।

তবে এটা ঠিক যে, তাঁর সমাধি সাক্কারার মাটির নিচেই কোথাও সংগুপ্ত রয়ে গেছে। হয়তো জোসেরের সমাধিরই আশপাশে কোথাও। কেননা তিনি ছিলেন জোসেরের প্রধানমন্ত্রী।

রাধানাথ শিকদার

বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের নামকরণ হয়েছে একজন বিদেশীর নামে, অথচ এই পর্বতশৃঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন একজন ভারতবাসী। আরও গৌরবের কথা, এই ভারতীয় আবিষ্কারক ছিলেন একজন বঙ্গসন্তান।

কেন এই বঞ্চনা? এই প্রশ্ন নিয়ে বহু বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে।

পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তি এভাবেই বহুক্ষেত্রে ভারতীয় আবিষ্কারকদের বঞ্চনা করে আবিষ্কারের গৌরব আত্মসাৎ অথবা নস্যাৎ করেছে।

ব্রিটিশের এই তস্কর মনোবৃত্তি এবং হীন কূটকৌশলের কথা আজ আর কারও অবিদিত নেই।

পরিতাপের বিষয় এটাই যে, স্বাধীনতা লাভের অর্ধ-শতাব্দী পার হয়ে এসেও স্বদেশবাসীর গৌরব ও কীর্তিকলাপের একটি যথাযথ সারণী আমরা আজও পর্যন্ত উত্তরপুরুষের জন্য প্রস্তুত করতে পারিনি।

পারিনি যথাযথভাবে আমরা তুলে ধরতে জাতির গৌরবময় ইতিহাসকে, আলোকপাত করতে ব্যর্থ হয়েছি সেই সব মহান পুরুষদের জীবনের ওপরে, যাঁদের অক্লান্ত সাধনায় ও জীবনপাতে প্রদীপ্ত হয়েছে সমগ্র জাতির জীবন, প্রশস্ত হয়েছে আমাদের অগ্রযাত্রার পথ।

এই কারণেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছে অসংখ্য গৌরব-গাথা, অসংখ্য মহৎ জীবনের উদ্দীপনাময় কাহিনী, দুর্জয় সংগ্রামের ইতিহাস, ব্যর্থতা ও সাফল্যের ইতিবৃত্ত।

হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের মহান আবিষ্কারক ও কর্মযোগী রাধানাথ শিকদারও এমনি এক বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস-পুরুষ যাঁর ব্যক্তিগত জীবন স্বমহিমায় এভারেস্টের মতোই উজ্জ্বল।

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ কালেব অন্যতম ব্যক্তিত্ব রাধানাথের জন্ম ১৮১৩ খ্রিঃ কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের শিকদার পাড়ায়।

রাধানাথের পিতা তিতুরাম ছিলেন সেকালের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও বিবিধ সদগুণের অধিকারী। তাঁর মাতাও ছিলেন জ্ঞানে গুণে স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিনী।

তিতুরামের দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। তন্মধ্যে রাধানাথ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ।

পিতা ও মাতার সব গুণই জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন রাধানাথ। তৎকালীন আর্যদর্শন পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, "পিতা ও মাতা দুজনের স্বভাবের সদ্‌গুণগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করে। রাধানাথ পিতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, অকপটতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি

লাভ করিয়াছিলেন। আত্মীয়দের যত্নে প্রতিপালন ও বিশেষ সাহায্য করার প্রবৃত্তি তিনি মায়ের স্বভাব থেকে প্রাপ্ত হন।''

বাড়িতেই পণ্ডিতের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে রাধানাথ ভর্তি হন চিৎপুরে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বিদ্যালয়ে। পরে ভর্তি হন হিন্দু কলেজে ১৮২৪ খ্রিঃ।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি সুবিখ্যাত ডিরোজিওর ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।

রাধানাধ ও শ্রীনাথ দুই ভাই-ই ছাত্র হিসাবে ছিলেন মেধাবী ও বুদ্ধিমান। ক্লাশের পরীক্ষায় বরাবরই তাঁরা বৃত্তি লাভ করতেন।

সেইকালে অতি অল্প বয়সেই মেয়েদের পাত্রস্থ করার রীতি প্রচলিত ছিল। পরপর তিনটি কন্যার বিবাহ দেবার পর তিতুরামের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। সংসারে নেমে আসে চরম অর্থসঙ্কট।

এমন দিনও গেছে যখন প্রতিদিন পরিবারের সকলের দুইবেলা খাবারের সংস্থানও হত না।

রাধানাথ যে বৃত্তির টাকা পেতেন, তার বেশির ভাগটাই খরচ হয়ে যেত দুই ভাইয়ের বইপত্র ইত্যাদি কিনতে।

শ্রীনাথের বৃত্তির টাকা পুরোটাই ধরে দেওয়া হত তিতুরামের হাতে। তাই দিয়েই কায়ক্লেশে সকলের প্রাণযাত্রা নির্বাহ হত।

এই সময়ের দুঃখকষ্টের কথা জানাতে গিয়ে রাধানাথ নিজেই লিখেছেন, ''কলেজে একমনে পড়িতে পাইতাম না। একবার পড়ার কথা মনে পড়িত, পরক্ষণেই বাটীতে ফিরিয়া যাইয়া কি খাইব; মা বুঝি এখনও কিছুই খান নাই, এই সকল ভাবনা মাথায় উদয় হইয়া পড়ার ব্যাঘাত ঘটাইত।''

এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও রাধানাথ কখনও নিজের উদ্দেশ্য ও মনোবল হারাননি। কঠোর অধ্যবসায় ও একাগ্রতা বলে তিনি কলেজের পড়া অব্যাহত রেখেছেন।

ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখে সর্বতোভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। অসম্ভব চারিত্রিক দৃঢ়তায় পারিবারিক দারিদ্র্যকে তিনি তাঁর জীবনে আশীর্বাদ রূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দু কলেজে রাধানাথ সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখকে। এঁরা সকলেই ছিলেন ডিরোজিওর সংস্কারমুক্ত উদার আদর্শে প্রাণিত।

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতেন। সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় সকল বিষয়েই তিনি যেমন যুক্তির আলোকে

নিজের মতামত প্রকাশ করতেন, ছাত্রদেরও সেভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন। এইভাবে তিনি ছাত্রদের মধ্যে যুক্তির ভিত্তি পাকা করে দিতেন।

ক্রমে ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী ছাত্ররা জড়ো হতে থাকে এবং তাদের নিয়ে চলতে থাকে বাংলা তথা ভারতের প্রগতিমূলক আন্দোলনের ভিত্তি রচনার কাজ।

পরবর্তীকালে ডিরোজিওর শিষ্যদলের যে আটজন তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারমূলক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন রাধানাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অন্য সাতজন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, প্যাঁরীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

শিষ্যদল ও অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে ডিরোজিও অ্যাকাডেমি অ্যাসোসিয়েশান নামে বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সভা থেকে ক্রমে সাতটি পৃথক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি সভাতেই ডিরোজিও যোগ দিতেন এবং এখানে জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও মতামত বিনিময় হত।

এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রদল সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস পরিহার করে ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁরা ক্রমেই ইউরোপীয়দের অনুকরণে মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন।

বলাবাহুল্য রাধানাথও এই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর্যদর্শন পত্রিকার একটি রচনার অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, "ডিরোজিও সাহেবের জীবন চরিতের এক স্থানে রাধানাথের বিষয়ে এই মর্মে লেখা আছে যে তাঁহার ধারণা ছিল আহারীয় বস্তুর উপর লোকের স্বভাব ও কার্যকারিতা নির্ভর করে। তিনি বলিতেন, গো-খাদক জাতিরা পৃথিবী শাসন করে। যদিও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই তথাপি তিনি সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ছিলেন এবং ইংরাজী ধরনে জীবন নির্বাহ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসীগণ অধিক পরিমাণে গো মাংস ভক্ষণ না করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা প্রধান জাতির মধ্যে পরিগণিত হইবে না।"

ডিরোজিও সাহেবের উক্ত জীবন চরিত থেকে রাধানাথের প্রবল শারীরিক শক্তি ও অসাধারণ সাহসের কথাও জানা যায়।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্য পড়াতেন। তাঁর শিক্ষায় রাধানাথ ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন ডঃ টাইটলার। তাঁর প্রিয় ছাত্ররূপে রাধানাথ উচ্চ গণিতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।

ডঃ টাইটলার রাধানাথের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিভা বিকাশে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

সাহিত্যের প্রতিও রাধানাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য পাঠ করে আনন্দ লাভ করতেন। পাঠ্যাবস্থায় প্রবন্ধাদি রচনা করেও তিনি প্রশংসা লাভ করেন।

ডিরোজিওর প্রভাবে তাঁর ছাত্ররা সমাজ সেবাতেও ব্রতী হয়েছিলেন। নিজ অঞ্চলের ছাত্রদের ইংরাজি শিক্ষা দেবার জন্য প্যাবীচাঁদ মিত্র তাঁর বাড়িতেই একটি অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় চালু করেছিলেন।

এই বিদ্যালয়ে রাধানাথ কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। শিবচন্দ্র দেব ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকও প্রকৃত ডিরোজিয়ানরূপে রাধানাথের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৩০ খ্রিঃ রাধানাথ কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবার সামনে কর্মজীবনের হাতছানি। পেছনে সংসারের চাপ।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাধানাথ নতুন করে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

সেইকালে সমাজে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ সমাদর ও প্রভাব ছিল। তাই রাধানাথের মনে হয়েছিল বিশেষ বিশেষ ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হলে এ দেশের প্রভূত উপকার সাধন হবে।

সেইসময়ে ভারতের ত্রিকোণমিতি ভিত্তিক (Trigonometry) সার্ভে বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন ডঃ টাইটালারের বিশেষ বন্ধু, গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী স্যার জর্জ এভারেস্ট।

সঠিক জরিপ কাজের জন্য তিনি X-Ray System নামে এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই পদ্ধতি কাজে নিয়োগ করবার মতো গণিত বিশেষজ্ঞ একজন উপযুক্ত কর্মঠ কর্মীর সন্ধান করা হচ্ছিল।

স্যার জর্জ তাঁর প্রয়োজনের কথা গণিতাধ্যাপক ডঃ টাইটলারকে জানালে তিনি তাঁর প্রিয়ছাত্র রাধানাথের নাম করেন। এই যোগাযোগের ফলে রাধানাথ অবিলম্বেই জরিপ বিভাগে সার্ভেয়ার পদে কর্মনিযুক্ত হন। তাঁর মাসিক বেতন ধার্য হয় ত্রিশ টাকা।

স্যার এভারেস্ট প্রথমে রাধানাথকে হাতে কলমে কাজ শিখবার জন্য কলকাতা থেকে দেরাদুন অফিসে পাঠিয়ে দিলেন।

ত্রিকোণমিতি ভিত্তিক জরিপ কাজের দুই বিভাগ — জরিপ বিভাগ ও গণনা বিভাগ।

জরিপের সমস্ত কাজ অঙ্কের সাহায্যেই হয়ে থাকে। সেই অনুযায়ী জরিপ বিভাগের কর্মীদের বিভিন্ন স্থান পর্যবেক্ষণ ও জরিপ করে গণনা বিভাগে রিপোর্ট জমা দিতে হয়।

এই রিপোর্টের শুদ্ধাশুদ্ধ হিসাব করতেন গণিত বিভাগের কর্মীরা। সবটাই অঙ্কের কাজ। তাই এই বিভাগের প্রত্যেক কর্মীকেই অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হতে হত।

সেই সময় এই বিভাগে কোনও বাঙালী গণিতজ্ঞ ছিলেন না। রাধানাথই বাঙালীদের মধ্যে প্রথম এই বিভাগে কাজ পান।

স্যার এভারেস্টের আনুকূল্যে কাজ জুটলেও রাধানাথ বেতন পেতেন খুবই সামান্য। অথচ তাঁর সতীর্থগণ এই সময়ে অনেক বেশি বেতনে ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি করতেন।

সতীর্থ বন্ধুদের পরামর্শে রাধানাথও কিছুদিন পরে ওই পদের চাকরির জন্য তৎপর হলেন।

যথাসময়ে কথাটা সার্ভে-অধিকর্তা স্যার এভারেস্ট জানতে পারলেন। রাধানাথের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কে তিনি এতটাই নিঃসন্দেহ এবং আশাবাদী ছিলেন যে, কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে রাজি হলেন না।

তিনি অবিলম্বে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে এক চিঠি লিখে জানালেন যে, রাধানাথের ন্যায় দক্ষ কর্মী তাঁর বিভাগের পক্ষে অপরিহার্য। রাধানাথ যাতে অন্য বিভাগে না যান তার অনুকূলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। রাধানাথের সমকক্ষ যোগ্যকর্মী বিলাতেও পাওয়া অসম্ভব।

স্যার এভারেস্টের পত্র পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ রাধানাথকে জরিপ বিভাগে রাখার জন্য রাতারাতি একটি নতুন সার্কুলার প্রকাশ করলেন। তাতে জানানো হল, কর্মরত কোনও দেশীয় ব্যক্তি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে অন্য কোনও সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবে না।

রাধানাথের আর ডেপুটি কালেক্টরের পদে চাকরিতে যাওয়া হল না। তবে তাঁর পদোন্নতি হল। সেই সঙ্গে কাজের দায়িত্বও বাড়ল।

স্যার জর্জ এভারেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলেন ১৮৪৩ খ্রিঃ। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন কর্নেল এন্ড্রু।

এই বছরেই একজন সাধারণ দেশীয় রাজকর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনচেতা রাধানাথ এক উদ্ধত রাজপুরুষের অন্যায় কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চারদিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

সেদিন রাধানাথের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীক চরিত্রের পরিচয় পেয়ে দেরাদুন অফিসের ইংরাজ কর্মচারিরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

দেরাদুন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এইচ ভ্যানসিটার্ট। তিনি একদিন

রাধানাথের অফিসের কয়েকজন কুলিকে জবরদস্তি নিয়ে গিয়ে তাঁর অফিসের মাল বহনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এজন্য রাধানাথের আগাম অনুমতি নেবার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি।

একজন পদস্থ রাজপুরুষ হিসাবে অফিস সংক্রান্ত কাজের স্বাভাবিক রীতিনিয়ম ও সৌজন্য সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য করেছিলেন তিনি।

ভারতীয় কুলিদের সম্পর্কে সাহেবের এমন অবজ্ঞার মনোভাব ও অশোভন অন্যায় কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন রাধানাথ। তিনি মালপত্রসহ কুলিদের আটকে দিয়ে সমান অপমান ফিরিয়ে দিলেন ম্যাজিস্ট্রেটকে।

ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট রাজার জাত। অপমানের জ্বালায় তাঁর গায়ে ফোসকা পড়ল। একজন ভারতবাসী হয়ে তাকে এ হেন অপমান, রাধানাথকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট মিথ্যার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হলেন না।

রাজকাজে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগ এনে তিনি রাধানাথের নামে মামলা দায়ের করলেন।

রাধানাথ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, তাঁর নমনীয় হবার প্রশ্নই নেই। যদিও সহকর্মীদের অনেকেই তাঁকে অনুরোধ করলেন মার্জনা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে। রাধানাথ এসব পরামর্শে কর্ণপাত করলেন না।

এই মামলা চলেছে দীর্ঘদিন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইংরাজ বিচারকের পক্ষপাতমূলক রায়ই প্রকাশিত হল। ম্যাজিস্ট্রেট ভ্যানসিটার্ট-এর কাজে বাধা দানের দায়ে রাধানাথকে দুশো টাকা জরিমানা করা হল।

কিন্তু ব্যাপারটার নিষ্পত্তি এখানেই হল না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চারদিকে এমন জোরদার আন্দোলন শুরু হল যে ভারতীয় কুলিদের জবরদস্তিমূলক বেগার খাটিয়ে নেওয়া চিরতরে বন্ধ হল।

নতুন সার্ভে-অধিকর্তা কর্নেল এণ্ড্রুর অধীনে বছর কয়েক চাকরি করার পরে রাধানাথ হঠাৎ ঠিক করলেন ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নেবেন। তিনি পূর্বোক্ত সার্কুলারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন।

আগের বারে তাঁকে আটকেছিলেন স্যার জর্জ এভারেস্ট। এবারে কর্নেল এণ্ড্রুও বেঁকে বসলেন। রাধানাথের মতো দক্ষ ও অভিজ্ঞ গণিতজ্ঞ জরিপ বিভাগ ছেড়ে চলে গেলে সমূহ ক্ষতি। যে করেই হোক তাঁকে আটকাতে হবে।

এণ্ড্রু রাধানাথ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তাঁর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের উচ্চ প্রশংসা করে অনুরোধ জানালেন যেন রাধানাথের বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

এণ্ড্রুর অনুরোধ মতো কর্তৃপক্ষ রাধানাথকে চিফ কম্পিউটার পদে উন্নীত

করে কলকাতার কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। এই নতুন পদে রাধানাথের বেতন হল ছয়শো টাকা।

রাধানাথের জন্মস্থান কলকাতা। দীর্ঘকাল জন্মস্থানের সঙ্গ বঞ্চিত হয়ে ছিলেন তিনি। এত বছর পরে ফিরে এসে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন।

ডিরোজিওর আদর্শে ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত রাধানাথ কলকাতায় ফিরে এসে প্রথমেই বেছে নিলেন সমাজ সেবার ক্ষেত্র।

কলকাতায় বহু পূর্বেই পাদ্রিদের উদ্যোগে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান কেবল দুঃস্থ অসহায় ইংরাজ ও অন্য বিদেশী খ্রিস্টানদেরই সাহায্য সহায়তা করত। ১৮৩০ খ্রিঃ এই সংস্থা ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি নামে পরিচিত হয়।

এই সংস্থার সাহায্য যাতে কেবল দুঃস্থ খ্রিস্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, দেশীয় দুঃস্থ নরনারীও পেতে পারে এই দাবি উঠতে থাকে। ফলে ভারতীয় ধনী ব্যক্তিরাও এগিয়ে আসেন এবং সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন।

তাঁদের চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে এই সংস্থা কুষ্ঠ আশ্রম, ভিক্ষুকদের স্থায়ী আবাস নির্মাণ ইত্যাদি কাজে উদ্যোগী হয়।

রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ ধনাঢ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তায় এই সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হল। রাধানাথও এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেন। ১৮৪৯ খ্রিঃ তিনি সংস্থার সদস্যভুক্ত হয়ে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা দিতে থাকেন।

জরিপ বিভাগে চিফ কম্পিউটার হিসাবে রাধানাথকে অফিসে কঠিন হিসাব-নিকাশের অঙ্ক নিয়ে ডুবে থাকতে হত।

হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে জরিপ ও পর্যবেক্ষণের কাজ চলছিল। সেসব কাজের নিখুঁত ফলাফল অঙ্ক কষে নির্ণয় করতে হয় তাঁকে।

১৮৪৫-৫০ খ্রিঃ মধ্যে হিমালয়ের উনআশিটি শৃঙ্গের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এর মধ্যে উনচল্লিশটি শৃঙ্গ চিহ্নিত করতে কোনও অসুবিধা দেখা দেয় নি। কেননা এই উনচল্লিশটি শৃঙ্গের নেপালী বা ভূটানী নাম পাওয়া গিয়েছিল। অবশিষ্ট অনামা শৃঙ্গগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করা হয় ইংরাজি সংখ্যা—1, 2, 3, এই ভাবে।

১৮৫২ খ্রিঃ এক সকালে রাধানাথ ক্রম অনুযায়ী শৃঙ্গগুলির উচ্চতার হিসাব নির্ণয় করতে বসেছেন। পনেরো নম্বর শৃঙ্গের জরিপ পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত গণনাকালে তিনি সহসা থমকে গেলেন। চরম উত্তেজনার মধ্যে তিনি এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের শিহরণ অনুভব করলেন।

তখনই ছুটে গেলেন স্যার এণ্ড্রুর ঘরে। আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে জানালেন, স্যার, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ আমি আবিষ্কার করেছি।

১৯২৮ খ্রিঃ ১০ নভেম্বর তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকায় Himalayan Romances নামক প্রবন্ধে এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে কেনেথ মেশন এই কথাগুলিই লিখেছিলেন।

স্যার এণ্ড্রুই হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পনেরো নম্বর শৃঙ্গটির নামকবণ করেন এভারেস্ট।

এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারটি এমনই নিঃশব্দে ঘটে গিয়েছিল যে, তাৎক্ষণিকভাবে তাকে কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয় নি।

সমকালীন কোনও পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়নি। বিস্ময়করভাবে সরকারি নথিপত্রেও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য অনুপস্থিত।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন একমাত্র স্যার এণ্ড্রু এবং স্বয়ং রাধানাথ ছাড়া জানতে পেরেছিলেন কেবল তাঁর সহকর্মীরা।

রাধানাথ জীবিতকালে যা লেখালেখি করেছেন. তার কোথাও এই ঘটনার উল্লেখ তিনি নিজেও করেননি। এর কারণ কি তাঁর ক্ষোভ না অভিমান?

সরকারিভাবে কোনও প্রকার প্রচার বা উল্লেখ না থাকার ফলে এভারেস্ট শৃঙ্গের আবিষ্কারক কে এই বিষয়ে একটা প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা থেকেই গিয়েছিল।

রাধানাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই জিজ্ঞাসা প্রকাশ্যে তুলে আনা হয়। সেই সময় বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠলে ১৮৭৬ খ্রিঃ ২৬ আগস্টের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় সম্পাদক মন্তব্য করেন, ''Had Radhanath Sickdar been alive we would have left him to fight his own battle.''

বিষয়টা অনুচ্চারিত রাখা হলেও এই আবিষ্কারের জন্য রাধানাথ পুরস্কৃত হয়েছিলেন বলা চলে। ১৮৫২ খ্রিঃ শেষ দিকে তাঁকে চিফ কম্পিউটার পদের সঙ্গে অবজারভেটরির সুপারিন্টেন্ডেন্টের দায়িত্বও দেওয়া হয়।

রাধানাথ ছিলেন অকৃতদার। তাই কর্মস্থলের গুরুদায়িত্ব প্রতিপালনের পর অবশিষ্ট সময় তিনি সমাজ সেবামূলক নানা কাজের সঙ্গে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন।

এইসময় তিনি বেথুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। এই সোসাইটির অধিবেশনে জাতীয় নানা সমস্যা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হত।

কলকাতার বিশিষ্ট সারস্বত প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও রাধানাথের সংযোগ ছিল।

ডিরোজিয়ান হিসাবে সমাজের প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ঘোরতর

বিরোধী ছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহের তিনি সমর্থক ও উৎসাহী ছিলেন।

রাধানাথ নিজ আদর্শে এতটাই অবিচল ও সনিষ্ঠ ছিলেন যে একটি অল্প বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করতে হবে বলে যৌবনে দারপরিগ্রহ করেননি। বলাবাহুল্য সেই সময়ে সমাজে বালিকা বয়সেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হত। মায়ের শত অনুরোধও মাতৃভক্ত রাধানাথকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি।

তিনি বিবাহ না করায় তাঁর পিতাও অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। এই মর্মবেদনা নিয়েই তিনি ১৮৫৩ খ্রিঃ ২২ জুলাই পরলোক গমন করেন।

এই সময় লিখিত রাধানাথের ডায়েরির অংশ বিশেষ পরে আর্যদর্শন পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় পিতার শেষ বয়সের দুঃখ-যাতনার কথা রাধানাথ সম্যক অবগত ছিলেন।

গণিত জগতের মানুষ হলেও শিল্প বিষয়েও রাধানাথ অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কলকাতায় শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রিঃ কলকাতা আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট সোসাইটি তথা শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই শিল্প বিদ্যালয়ই বর্তমানে গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল নামে পরিচিত।

এই বছরেই তিনি নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সহপাঠী ও অন্যতম ডিরোজিয়ান প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল, সহজবোধ্য; সংস্কৃতবাহুল্য বর্জিত।

স্বল্পায়ু এই পত্রিকাতেই প্যারীচাঁদ মিত্রের বিখ্যাত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। রাধানাথ গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা জানতেন। তিনি প্লুটার্ক, জোনোফোন-এর অনুবাদ ছাড়াও উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ ও গল্প এই পত্রিকায় লিখতেন।

তাঁর বাংলা রচনার কিছুটা নমুনা এখানে দেওয়া হল।

"ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীনে মেয়ে দিলে যেমন বাপমার মুখ উজ্জ্বল হয়, সেরূপ স্পার্টাবাসিদের মধ্যে ছেলে লড়াইয়ে মরিলে বাপমার মুখ উজ্জ্বল হইত। এই নিমিত্তে ছেলে যখন লড়াইয়ে যাইত, মা আপনি তাহার হাতে ঢাল-তরবাল দিতেন। দিয়া বলিতেন, বাপু, লড়াইতে যাও। দেখ, যেন জয়ী হইয়া এই ঢাল তরবাল লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আইস। তাহা যদি না পার, তাহা হইলে এই ঢালের উপর চড়িয়া বাড়িতে ফিরিয়া আইস।"

এই পত্রিকায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বাল্য ও বহুবিবাহের কুফল এবং বিধবা বিবাহের সমর্থন বিষয়ক রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত।

হিন্দুকলেজে পড়ার সময়ে রাধানাথ প্যারীচাঁদ মিত্রের বাসভবনে অবৈতনিক

স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। শিক্ষকতার মহান ব্রত তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত। পরিণত বয়সে কলকাতায় দরিদ্র ভদ্র পরিবারের বালক বালিকার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি পোষণ করতেন। একথা জানা যায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা থেকে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রূপায়ন সম্ভব না হলেও রাধানাথ কিছুদিন জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনসটিটিউশনে অঙ্কের অধ্যাপনা করেন।

১৮৬২ খ্রিঃ রাধানাথ জরিপ বিভাগের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি এই বিভাগে দক্ষতা ও মর্যাদার সঙ্গে কর্মনিযুক্ত ছিলেন।

অবসর গ্রহণের পরে ১৮৬৪ খ্রিঃ ব্যাভেরিয়ার প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক সোসাইটি (Society of Natural History) রাধানাথকে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও গণিতশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের জন্য সাম্মানিক সদস্য পদ দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি এই সংস্থার লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

রাধানাথ রচিত 'Auxiliary Tables' গ্রন্থ ভারতীয় সার্ভের অপরিহার্য দলিলরূপে স্বীকৃত।

ভারতবর্ষে জরিপ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় ক্যাপটেন আর স্মিথ ও ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল এইচ এল থুলিয়ের সম্পাদকতায় ১৮৫১ খ্রিঃ। এই গ্রন্থের বিজ্ঞান বিভাগের সুলিখিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধটি রাধানাথেরই রচিত। এই গ্রন্থের প্রকাশনার ব্যাপারেও নানাভাবেই তিনি জড়িত ছিলেন।

ভারতের ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ আবিষ্কারের গৌরব থেকে রাধানাথকে বঞ্চিত করলেও আজ এ সত্য অবিসংবাদিত। বঙ্গভূমি তথা ভারতবর্ষের কৃতী সন্তান রাধানাথ তাঁর আদর্শদৃঢ় ব্যক্তিজীবন ও অতুলনীয় কর্মকৃতিত্বের জন্যই চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৮৭০ খ্রিঃ ১৭মে তারিখে চন্দননগরে নিজ বাসভবনে রাধানাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কালাপাহাড়

'কালাপাহাড়' এক আতঙ্কের নাম। নির্মম অত্যাচার আর ধ্বংসকান্ডের মর্মন্তুদ ইতিহাস এই নামটির সঙ্গে জড়িত।

আজও চরম নাশকতার ঘটনার বিবরণ দেবার সময় ভারতবর্ষের মানুষ *'কালাপাহাড়ি কান্ড' কথা কয়টি অবলীলায় ব্যবহার করে থাকে। আজ থেকে*

প্রায় পাঁচশো বছর আগে কালাপাহাড়ের নামে হিন্দুদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হত।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রান্তে আজও ছড়িয়ে রয়েছে কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর।

হিন্দুদের দেবমন্দির, দেববিগ্রহ, নির্বিচারে চূর্ণ বিচূর্ণ করেছেন কালাপাহাড়, নির্মম অত্যাচার করেছেন হিন্দুদের ওপর—এই কুকীর্তির জন্য ইতিহাসে তিনি এক কলঙ্কিত নায়ক রূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন। কালাপাহাড় শব্দটি এখন ব্যবহার হয় নাশকতার প্রতীক রূপে।

এই অতি ভয়ঙ্কর নামটির সঙ্গে পরিচয় থাকলেও নামের আড়ালের বিদ্রোহী বিক্ষুব্ধ মানুষটির প্রকৃত পরিচয় খুব কম লোকই জানে।

কালাপাহাড়ের ইতিবৃত্ত ছড়িয়ে আছে ইতিহাস এবং জনশ্রুতিতে। সেসব উপাদান ভিত্তি করেই আমাদের এই কাহিনী রচিত।

এই কুখ্যাত মানুষটির প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। এই নাম কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে কবেই। কিন্তু কালের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে আজও বেঁচে আছে কালাপাহাড় নামটি, যে নাম লোকে তাঁকে দিয়েছিল তাঁর কুকীর্তির জন্য।

ইনি ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রাজশাহী জেলার বীরজাগুণ গ্রামের প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার বংশে তাঁর জন্ম হয়। সময়টা ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

একটাকিয়া জমিদার বংশের উপাধি ছিল ভাদুড়ী। এই বংশেই জন্মেছিলেন জগদানন্দ রায়, যাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ের মধ্যে।

কালাপাহাড়ের বাবার নাম ছিল নয়ানচাঁদ রায়। তিনি গৌড়ের বাদশাহের ফৌজদারী বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

রাজসরকার থেকে তাঁকে ভুঁইয়া উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

কালাপাহাড়ের মাতার বংশ ছিল পরম বৈষ্ণব। বাল্যবয়সে পিতৃহীন হওয়ার ফলে মাতুলালয়েই তিনি মানুষ হন। এই পরিবারের পরিবেশের প্রভাবে শৈশব থেকেই তিনি হরিভক্তিপরায়ণ হয়েছিলেন।

সহজাত মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে তিনি যেমন ছিলেন অসাধারণ তেমনি দৈহিক বল ও শক্তি চর্চাতেও ছিলেন অসামান্য। অশ্বচালনা ও অসিচালনাতে যুবা বয়সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রূপ ও গুণের প্রশংসা লোকের মুখে মুখে ফিরত।

সেই সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন সুলতান নাসিরুদ্দীন শাহর পুত্র বরবাক শাহ। কালাপাহাড়ের শক্তি সামর্থ্য ও গুণের কথা শুনে তিনি তাঁকে ডেকে রাজসরকারে উচ্চপদে নিয়োগ করলেন।

সেইকালে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের রাজপ্রাসাদের কাছেই নির্দিষ্ট আবাসে থাকতে হত। কালাপাহাড়েরও থাকার ব্যবস্থা হল হিন্দু কর্মচারীদের সঙ্গে।

ভক্তিমান নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলতে যা বোঝায় প্রথম জীবনে কালাপাহাড় ছিলেন তাই। প্রতিদিন সকালে তিনি কোশাকুশি নিয়ে মহানন্দায় প্রাতঃস্নান করতে যেতেন।

নদীতীরে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে সুমধুর কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে স্তোত্র পাঠ করতে করতে গৃহে ফিরে আসতেন।

নদীতে যাতায়াতের পথে এই রূপবান বলিষ্ঠ যুবককে প্রত্যহ প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখেন একজন। তিনি হলেন পরমাসুন্দরী রাজকুমারী সদ্য-যুবতী দুলারী বিবি।

নিজের নিত্যকর্মে আত্মমগ্ন ব্রাহ্মণ যুবক এসব কিছুই জানেন না, বুঝতেও পারেন না।

এভাবেই দিন গত হতে থাকে।

একদিন কালাচাঁদ প্রাতঃস্নান সেরে গৃহে ফিরে চলেছেন। অলিন্দপথে দাঁড়িয়ে মুগ্ধচোখে তাঁকে দেখছেন রাজকুমারী। হঠাৎ তিনি সহচরীকে ডেকে বললেন, জানি না এই যুবাপুরুষ কে। যিনিই হোন, এঁকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে বিয়ে করব না।

সহচরী প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, রূপবান হলেও এই যুবা অজ্ঞাত কুলশীল তো বটে। এঁর সামাজিক মর্যাদা রাজকুমারীর সমকক্ষও নয়। এমন মানুষকে নিয়ে এরকম আব্দার শোভন নয়।

রাজকুমারী দুলারী বিবি বললেন, তা কেন, ইনি যে ব্রাহ্মণ গলার উপবীত দেখেই বোঝা যায়। এঁর বিত্তের প্রমাণ হাতের সোনার কোশাকুশি। বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করেন—ইনি বিদ্বান তাতে সন্দেহ কি! সুগঠিত দেহের সৌন্দর্যে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। শক্তি ও সামর্থ্যে অতুলনীয় এই যুবা।

রাজকুমারীর এই মুগ্ধ অনুরাগ গোপন থাকে না। একদিন বাদশাহ ও বেগমের কানেও পৌঁছল কথাটা। তাঁরাও কালাচাঁদের সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী হলেন।

খোঁজখবর নিয়ে বাদশাহ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। একটাকিয়ার বিখ্যাত

ভাদুড়ী বংশের সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি রাজা-বাদশার চাইতে কম কিছু নয়। যুবক কালাচাঁদ নিঃসন্দেহে রাজকুমারী দুলারীর উপযুক্ত পাত্র।

বরবাক শাহ্ কালাচাঁদকে ডেকে তাঁর কন্যার অনুরাগ ও জেদের কথা জানালেন। তিনি তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাজকন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেন।

নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান কালাচাঁদ। তাছাড়া ইতিপূর্বে তিনি শ্রীপুরনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই মেয়েক বিবাহ করেছেন।

স্বভাবতঃই বাদশাহের প্রস্তাব তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখের ওপরেই সতেজে প্রত্যাখ্যান করলেন।

অপমানিত ক্রুদ্ধ বাদশাহের আদেশে কালাচাঁদ কারারুদ্ধ হলেন। তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার রাজাদেশ ঘোষিত হল।

যথা নিয়মে নির্দিষ্ট দিনে শৃঙ্খলিত কালাচাঁদকে বধ্যভূমিতে উপস্থিত করা হল। তারপর ঘাতক তার কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এমন সময় ঘটল এক অঘটন।

রাজকুমারী দুলারী বিবি অকস্মাৎ প্রাসাদ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। পাগলের মতো আছড়ে এসে পড়লেন ঘাতকের পায়ের কাছে।

সকাতরে বললেন, আমাকে হত্যা না করে তুমি এঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না।

এই আকস্মিক ঘটনায় সবকিছুই ওলট-পালট হয়ে গেল। রাজকুমারীর পরিচয় পেয়ে কালাচাঁদ বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনের পরিবর্তন হল। তিনি দুলারী বিবিকে বিবাহ করতে সম্মত হলেন।

তবে বাদশাহ্কে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করবেন না। অতঃপর রাজকুমারী দুলারী বিবির সঙ্গে কালাচাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হল।

এদিকে এই অসামাজিক বিবাহকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজে আলোড়ন উঠল। কালাচাঁদ তাঁর পূর্বের সামাজিক মর্যাদা হারালেন। হিন্দু সমাজপতিরা তাঁকে সমাজচ্যুত করলেন।

কালাচাঁদের বহু অনুনয় বিনয়েও সমাজের নিষ্করণ বিধান বদল হল না। সমাজপতিদের সন্তুষ্ট করার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করলেন তিনি। কিন্তু সবই নিষ্ফল হল। সমাজের কাছ থেকে অপমান আর লাঞ্ছনা ছাড়া কিছু পেলেন না।

এরপর নিজের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কোনও মানুষের ওপর নির্ভর না করে কালাচাঁদ দেবতার শরণাপন্ন হলেন। দৈব প্রত্যাদেশের আশা নিয়ে তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গিয়ে হত্যা দিলেন।

ঐকান্তিক প্রার্থনা নিয়ে অনাহারে সাতদিন পড়ে রইলেন মন্দির প্রাঙ্গণে। কিন্তু দেবতার দয়া হল না।

কোনও দৈব প্রত্যাদেশ পেলেন না কালাচাঁদ—যা পেলেন তা হল অপমান আর বেদনা, জগন্নাথ দেবের পাণ্ডাদের কাছ থেকে।

অপমান লাঞ্ছনায় জর্জরিত কালাচাঁদ। নিজ সমাজের মানুষ তাঁর প্রতি বিমুখ, দেবতাও বিরূপ। তবে আর কেন?

নিদারুণ মর্মযাতনার দুঃসহ জ্বালা বুকে নিয়ে গৌড়ে ফিরে এলেন তিনি। হৃদয়হীন হিন্দু সমাজের নিষ্পেশনে রাতারাতি এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে।

নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ অচিরেই চরম হিন্দু-বিদ্বেষী কালাপাহাড় হয়ে উঠলেন। হিন্দু আর হিন্দু মন্দির ধ্বংসই হল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

গৌড়ে ফিরে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁর নতুন নাম হল মোহম্মদ ফর্মুলি।

এই সঙ্গে উন্মোচিত হল ভারত ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

এখন থেকে কালাচাঁদ তথা মোহম্মদ ফর্মুলিকে কালাপাহাড় নামেই অভিহিত করব আমরা।

লক্ষ্য হিন্দু নিগ্রহ আর হিন্দু মন্দির ধ্বংস।

লক্ষ্য হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা—ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা।

এই লক্ষ্য সাধনে কালাপাহাড় বাদশাহী সৈন্য নিয়ে ধ্বংস অভিযানে বেরলেন।

তাঁর বিজয় অভিযান সমগ্র উত্তর ভারতে অসংখ্য হিন্দু বিগ্রহ অপবিত্র ও চূর্ণ বিচূর্ণ করল।

অসংখ্য দেবমন্দির ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে গেল। অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতনে হিন্দুদের জীবন বিপর্যস্ত হতে লাগল।

ওড়িশার জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের অপমানের জ্বালা তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছিল কালাপাহাড়ের অন্তরে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নিলেন তিনি ওড়িশা আক্রমণ করে। যুদ্ধে উৎকল রাজ পরাজিত ও নিহত হলেন।

তারপর শুরু হল বাদশাহী সৈন্যের উন্মত্ত ধ্বংস-তাণ্ডব। একের পর এক মন্দির ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

ক্ষতবিক্ষত বিকৃত হল দেববিগ্রহ। অকথ্য অত্যাচার চালান হল ওড়িশাবাসী হিন্দুদের ওপর।

ওড়িশার মন্দির ধ্বংসের পর কালাপাহাড় তাঁর জন্মভূমি ভাদুড়িয়ায় অভিযান করার সঙ্কল্প করলেন।

এই খবর জানতে পেরে সচকিত হলেন ভাদুড়িয়ার রাজা। তিনি অত্যাচারের ভয়ে আগেভাগে কালাপাহাড়ের বৃদ্ধা মা ও দুই স্ত্রীকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

কী ভেবে অভিযানের গতিপথ পাল্টে কালাপাহাড় অভিযান করলেন পূর্ববঙ্গে। দিনাজপুর, রংপুর, কুচবিহার হয়ে প্রবেশ করলেন অসমে।

একই ধারায় ধ্বংস আর রক্তপাতের পুনরাবৃত্তি চলল সর্বত্র।

কথিত আছে, এই সময় বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিজেদের আবাসে বিপন্ন হিন্দুদের লুকিয়ে রেখে কালাপাহাড়ের অমানুষিক অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন।

কালাপাহাড়ের ধ্বংসকাণ্ডের ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু আমলের অসংখ্য অমূল্য স্থাপত্য ও কলাশিল্পের অনিষ্ট সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতার এমন সব নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়েছে যা অটুট থাকলে বাঙালীর ইতিহাস আরও গৌরবান্বিত হত।

প্রায় সমস্ত হিন্দুতীর্থেই কালাপাহাড়ের ধ্বংসের নিদর্শন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। বহু দেববিগ্রহ কালাপাহাড়ের ভয়ে নদীতে বা হ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তা পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হয়নি।

কালাপাহাড়ের কুকীর্তির কিছু প্রমাণ আমাদের কলকাতার জাদুঘরেও সংরক্ষিত রয়েছে।

কালাপাহাড়ের সময়ে দিল্লীর সিংহাসন ছিল লোদী বংশের দখলে। ক্ষমতাসীন ছিলেন বাদশাহ বেলোল লোদী।

তাঁর সঙ্গে জোয়ানপুরের নবাবের দীর্ঘ দিনের বিবাদ অমীমাংসিত ছিল। এই বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার জন্য নবাব একজন উপযুক্ত সেনাপতির সন্ধানে ছিলেন।

কালাপাহাড়ের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পেয়ে নবাব তাঁকে সেনাপতি পদ দিয়ে গৌড় থেকে নিয়ে এলেন। বাদশাহের বিরুদ্ধে জোরদার যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল।

এই সংবাদ পেয়ে বেলোল লোদী শঙ্কিত হলেন। কালাপাহাড়ের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বিপক্ষের সেনাপতিত্বে থাকলে যুদ্ধজয় দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে বুঝতে পেরে বাদশাহ কূটকৌশলে এই সমস্যার সমাধান করলেন।

তিনি চক্রান্ত করে একজন কুশলী কর্মচারীর সাহায্যে কালাপাহাড়কে গোপনে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে এলেন।

কালাপাহাড়কে শেষ পর্যন্ত বেলোল লোদীর সেনাপতি হয়েই জোয়ানপুরের নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হল।

কালাপাহাড়ের হাতে নবাবের পরাজয় হল। নবাব নিহত হলেন। এইভাবে বাদশাহ ও নবাবের মধ্যে দীর্ঘ চব্বিশ বছরের যুদ্ধের অবসান হল। জোয়ানপুর দিল্লীর বাদশাহের শাসনাধীন হল।

জোয়ানপুর থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের পথে কালাপাহাড় নির্বিচারে হিন্দু নির্যাতন ও মন্দির ধ্বংসের তান্ডব চালিয়েছেন।

পথিমধ্যে দেবভূমি কাশীতে উপস্থিত হলে তাঁর অত্যাচার ও ধ্বংসকাণ্ডের মাত্রা চরম রূপ নিল।

কাশীর একমাত্র কেদারেশ্বর লিঙ্গ ছাড়া আর একটি দেববিগ্রহও অক্ষত রইল না। হিন্দু নারী-পুরুষ-শিশুর রক্তে প্লাবিত হল কাশীর পবিত্র ভূমি।

বিধির কী বিচিত্র পরিহাস কালাপাহাড়ের রক্তাক্ত ইতিহাসের পটপরিবর্তন ঘটল এই কাশীর পবিত্র ভূমিতেই। এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

কালাপাহাড়ের এক বালবিধবা মাসীমা কাশীতেই বাস করতেন। তিনি নগরে কালাপাহাড়ের সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচার ও নির্যাতনের সময়ে চরম ভাবে লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি কাঁদতে কাঁদতে কালাপাহাড়ের কাছে এসে তাঁর অপমানের কথা জানিয়ে বিষ খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

ধ্বংসোন্মত্ত কালাপাহাড়ের চৈতন্যোৎপাদনের জন্যই যেন এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। তাঁর বিবেক জাগ্রত হল। গভীর মর্মবেদনা ও অনুশোচনায় তাঁর সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হল। তিনি তৎক্ষণাৎ নগরে অত্যাচার বন্ধ করার আদেশ দিলেন।

সেই সময় পর্যন্ত অক্ষত ছিল কেদারেশ্বর লিঙ্গ এবং এভাবেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

কাশী ধ্বংসের তৃতীয় দিবসে ঘটেছিল এই ঘটনা। সেদিন রাতের পর থেকে কালাপাহাড়কে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রহরীরা গভীর রাতে চিন্তামগ্ন কালাপাহাড়কে তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে দেখেছিল। কিন্তু সকালে তাঁকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে কালাপাহাড়ের মৃত্যু নিয়ে অনেক মতভেদ। কেউ বলেন তীব্র আত্মদহনে তিনি লোকলোচনের অগোচরে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

কারও মতে, কাশীর পাণ্ডারাই তাঁকে গোপনে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলেছে।

আবার অনেকে বলেন, তাঁর ক্ষমতায় শঙ্কিত হয়ে বেলোল লোদী গুপ্তঘাতকদের দিয়ে তাঁকে হত্যা করেছেন।

প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটার মতো ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে আবির্ভাব হয়েছিল কালাপাহাড়ের। জ্ঞানে, গুণে, শক্তিতে, সামর্থ্যে তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সিংহপুরুষ। মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বছরের জীবন পেয়েছিলেন তিনি। এই সময়ের মধ্যেই হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসের কুকীর্তির জন্য তিনি কলঙ্কিত হয়েছেন।

কিন্তু একথাও সত্য যে, তিনি হিন্দুসমাজের অমানবিক বিধি-বিধানের জীবন্ত প্রতিবাদ রূপে নিজেকে ইতিহাসের বুকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন।